# সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৭১

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
কম দামে সেরা চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LLC-10BEN

# AMBASSADOR

## faces the future with a broader outlook !

The re-styled radiator grille gives the new Ambassador a face-lift matching her numerous other attractive features. For, mark you, her face is not her only good fortune. With new front and rear bumper over-riders, the "Mark II" flash on each front wing, side-lights placed at the base of the grille, improved front-seat design, addition of two-tone trim, ash trays for the front and rear seats and at the centre of the facia panel, new designs for the roof lining and door trim pads and provision of the HM emblem at the bottom centre of the rear glass, the new Ambassador presents a definite new look.

With graceful modern styling, spacious comfort, a powerful 1489 c.c. O.H.V. engine and modest fuel consumption, the Mark II boasts of beauty as enchanting as her performance.

## the old favourite with the new look

THE NEW
AMBASSADOR MARK II

HM
HINDUSTAN MOTORS
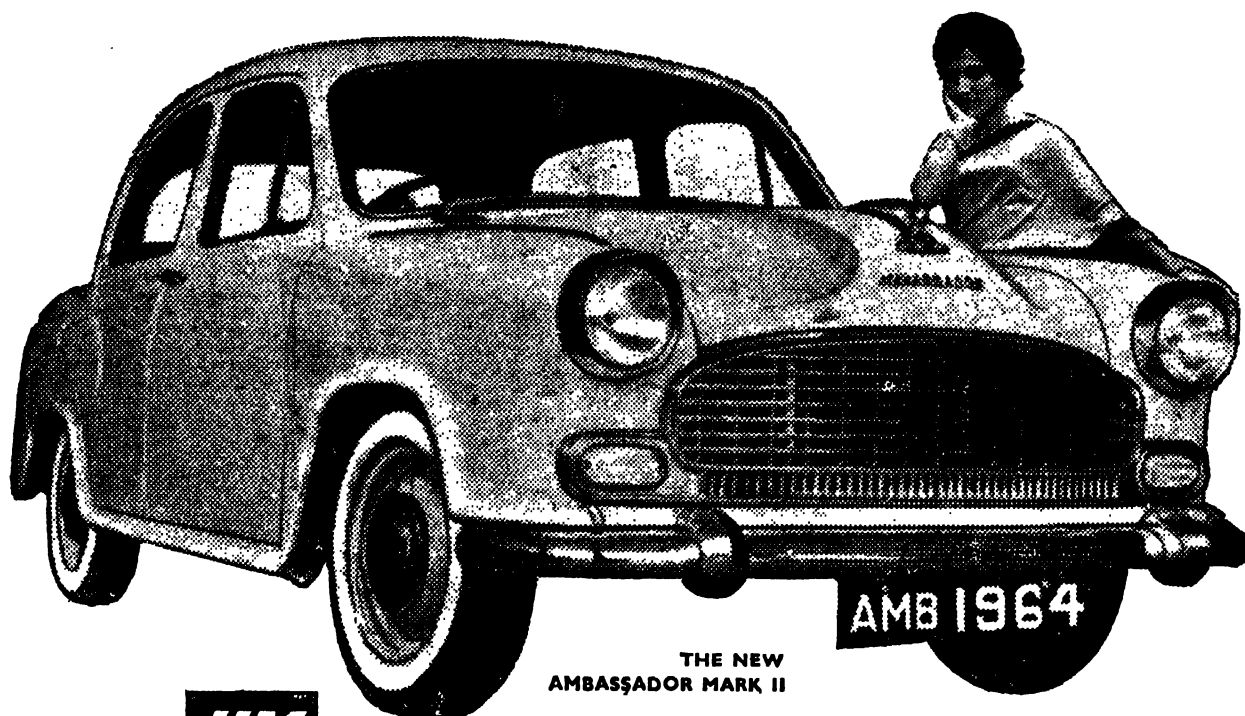
HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1.

ASP/HM-49

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন্. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
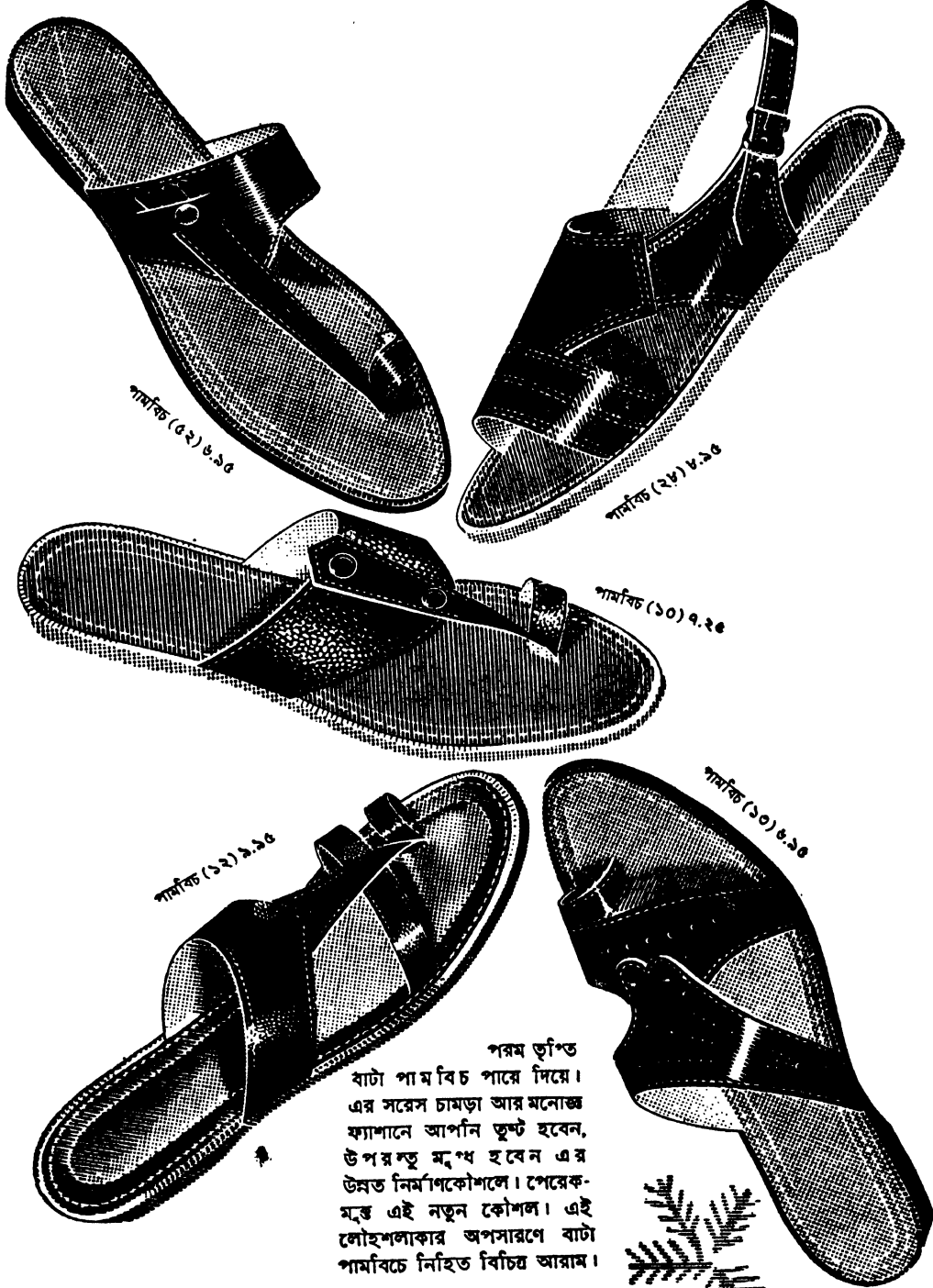
পামবিচ (৫২) ৬.৯৫
পামবিচ (২৮) ৮.৯৫
পামবিচ (১০) ৭.২৫
পামবিচ (১২) ৯.৯৫
পামবিচ (১০) ৬.৯৫
পরম তৃপ্তি
বাটা পামবিচ পায়ে দিয়ে।
এর সরেস চামড়া আর মনোজ্ঞ
ফ্যাশানে আপনি তুষ্ট হবেন,
উপরন্তু মুগ্ধ হবেন এর
উন্নত নির্মাণকৌশলে। পেরেক-
মুক্ত এই নতুন কৌশল। এই
লৌহশলাকার অপসারণে বাটা
পামবিচে নিহিত বিচিত্র আরাম।
Bata
PALMBEACH

গর্ব করবার মতন
চুল এঁর, এঁকেই
জিজ্ঞেস করুন
উনিই বলে দেবেন যে টাটার হেয়ার অয়েল
মেখেই ওঁর অমন সুন্দর চুল হয়েছে !
টাটার হেয়ার অয়েল • মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ
ও সবল রাখে • চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম। • টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল — ৪টি
বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল — গোলাপের সুরভিযুক্ত।
• ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
HAIR OIL
THOY-48-BEN

দ্বাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



**সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বৈশাখ
তেরশ' একাত্তর

সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

# সেকালের সংবাদপত্র ও দ্বারকানাথ

**অমৃতময় মুখোপাধ্যায়**

মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র হল জেমস্ অগাষ্টাস হিকি সাহেবের সম্পাদনায় বেঙ্গল গেজেট। এর প্রথম প্রকাশ শনিবার ২৯শে-জানুয়ারী ১৭৮০। এতে স্থানীয় কিছু খবর ছাড়া ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালিও যথেষ্ট ছাপা হত। তখনকার বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে রাশিয়ান চিত্রকর ব্যারণ ইম্পহফের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা ছাপার জন্য হিকি সাহেবকে নির্যাতিত ও শেষ পর্যন্ত ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কাগজটা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এই সময়ের কিছু পরেই ইণ্ডিয়া গেজেট ও আরো কয়েকটি সংবাদপত্র বার হয়। তাদের কোনটিরই লেখা উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল না। তখনকার এইসব কাগজের সম্পাদনা করতেন ভারতপ্রবাসী সাহেবরা। এঁদের অনেকে ছিলেন কোম্পানীর কর্মচারী। তখনকার শাসকরা এই খবরের কাগজ বের করাটাকে সুনজরে দেখতেন না। টিপুসুলতান ও ফরাসীদের সঙ্গে ১৭৯৯ সালে যুদ্ধ বাঁধলে লর্ড ওয়েলেসলি ছাপা কাগজ সম্বন্ধে কয়েকটি আইন করে স্বাধীনভাবে খবর পরিবেশন ও সমালোচনা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেন। ওয়েলেসলি যে খবরের কাগজের সম্পাদকদের কি চোখে দেখতেন তা কলকাতায় স্যার আলফ্রেড ক্লার্ককে লেখা একটা চিঠি থেকে বোঝা যায়—'সমস্ত সম্পাদকগোষ্টীর ব্যবহারের জন্য নিয়মাবলী আমি সুবিধামত পাঠাবো। দয়া করে ইতিমধ্যে এইসব ইতর প্রকাশকদের কাগজ বন্ধ করে তাদের ধরে বিলাত পাঠিয়ে দিন'। পাছে শত্রুপক্ষ খবর পায় তাই সেন্সরসিপের প্রবর্তন হয়। এমন কি ভারতীয় বন্দর থেকে জাহাজ যাতায়াতের খবর প্রকাশ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্রমে যখন ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ মিটে গেল, অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির প্রাধান্য অন্তর্হিত হ'ল, সরকারের ভয়ও কমে গেল তখনও কিন্তু এ স্বাধীনতা রোধক আইন তুলে দেওয়া হয় নি।

বরং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নিয়মের আরো কড়াকড়ি করা হ'ল।

যখনই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা-সরকার আলোচনা করতেন তখনই সরকারী কর্মচারীরা নানারকম যুক্তি দেখিয়ে স্বাধীনতা দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। এমন যুক্তিও তাঁরা দেখিয়েছেন যে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে বড় বড় রাজকর্মাচারীদের জাঁকজমকে। সেইটা প্রজাদের মনে বিস্ময় ও ভয়-ভক্তির-ভাব উদ্রেক করে। যদিও এ ঠাট দেশের রাজস্ব হতেই রাখা হয় তবুও এ সম্বন্ধে ছাপা অক্ষরে মন্তব্য করতে দেওয়া অনুচিত।

এইরকম মত প্রকাশ সত্বেও লর্ড হেস্টাংস্ ১৮১৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলীর প্রবর্তিত 'সেন্সরসিপ্' তুলে দিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে 'ছাপাখানার স্বাধীনতাকে তিনি প্রজাদের এমন একটা মৌলিক অধিকার বলে মনে করেন যা একমাত্র বিশেষ জরুরী কারণে সীমাবদ্ধ করা যায়।'

এইরকম অভূতপূর্ব মত প্রকাশের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা খুব চটে গেলেন এবং সেন্সরসিপ ফের বসাতে হুকুম দিয়ে এক চিঠি লেখেন কিন্তু তা' শেষপর্যন্ত মন্ত্রী ক্যানিং অনুমোদন না করায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

ওয়েলেসলীর আইন তুলে দিলেও লর্ড হেস্টিংস তার নিজের কৌন্সিলের সদস্যদের, বিশপ, জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা সমাজ বিরুদ্ধ কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করলে নির্বাসন বা সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করে বিচারের দফাটি রেখে দেন।( ১ ) কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের কাছে যখন প্রথম এবিষয়ে দরখাস্ত আসে তখন কোর্ট এটা ফৌজদারী বিধির মধ্যে আনতে অস্বীকার করেন এবং হেস্টিংসও তাঁর আমলে সম্পাদককে নির্বাসন দণ্ড দিতে রাজি হন নাই।

হেস্টিংসের দেওয়া এই ছাপাখানার স্বাধীনতার ফলে ঐ সময়ে নতুন নতুন কয়েকটি কাগজ দেখা দেয় এবং পুরাণো কাগজগুলি নব কলেবর ধারণ করে। বেঙ্গল হরকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রথমে সাপ্তাহিক আকারে প্রতি মঙ্গলবার ছোট 'ফোলিও' আকারে ছাপা হয়ে বের হত। এইবার ১৮১৯ এর ২৭ এপ্রিল হতে দৈনিকরূপে বের হতে থাকে। গোড়ায় 'কোয়ার্টো' সাইজের একখানা কাগজে ছাপা হত। দু'বছর বাদে ( ১৮২১ এর ২১-এ জুলাই ) দেখা যায় তিন খণ্ড কাগজ সম্বলিত হয়ে দৈনিক বের হচ্ছে।

ততদিনে এ কাগজের প্রধান অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কর্ণেল ইয়ং ও স্যামুয়েল স্মিথ। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন যে পাদ্রী ব্রাইস সাহেবের 'জনবুল' পত্রিকার ভারত বিদ্বেষী লেখার সমুচিত উত্তর দেবার জন্যই দ্বারকানাথ হরকরার অংশ খরিদ করেন। এই 'জনবুল' ( প্রথমের দিক নাম ছিল জনবুল ইন দি ইষ্ট ) আত্মপ্রকাশ করে ১৮২১ সালের ৩রা জুন। ১৮৩০ সালে দ্বারকানাথের বন্ধু হেওয়ার্ড ষ্টকেলার(২) সাহেব দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যে এটিকে কিনে নিয়ে ঐ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ইংলিশম্যান নাম দিয়ে বের করতে থাকেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত স্বাতন্ত্র রক্ষা করার পর ইহা ষ্টেটস্ম্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ইংলিশম্যান প্রতিষ্ঠার কথায় ষ্টকেলার সাহেব নিজেই লিখেছেন—পকেটে আমার একশিলিং না থাকলেও দৈবের উপর আস্থা ছিল অগাধ। আসল টাকাটা মেটাবার জন্য সময় পাওয়া গিয়েছিল এবং আমি সেই

অবসরে এমন একজন বন্ধু খুঁজতে লাগলাম যে অন্ততঃ কারবার চালু করবার পয়সাটা জোগাবে ; এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর নামে এক হিন্দু রূপে সেটি জুটে গেল। তিনি সাহেবদের পছন্দ করতেন ও ও রামমোহন রায়ের হিন্দুধর্ম প্রচার থেকে রক্ষণশীলপন্থী (যেটা ওর বিরুদ্ধপন্থী) যে কোন প্রচেষ্টাতেই মুক্তহস্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং এবার বেঙ্গল হেরাল্ডকে বিদায় দিয়ে 'ইংলিশম্যানে'র সম্বর্ধনা করলাম ; কারণ প্রগতিশীলদের নাকে যে দুর্গন্ধের আভাষ 'জন-বুল' নাম আনতো তা বদলিয়ে এখন থেকে কাগজের নামকরণ করেছিলাম 'ইংলিশম্যান'( ৩ )

অনেকের মতে কিন্তু 'জনবুল'এর প্রতিষ্ঠা জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের(৪) 'ক্যালক্যাটা জার্ণল'কে ঠেকাবার জন্য। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জন পামারের সহযোগিতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শুক্রবার এর প্রথম সংখ্যা বের হয় এবং সপ্তাহে দুবার আট পৃষ্ঠা করে প্রকাশ করা হত। এই কাগজের উদ্দেশ্য প্রচার করা হয়েছিল 'শাসকদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা, তাঁদের দোষত্রুটি দেখানো ও অপ্রিয় সত্যকথা প্রকাশ করা।' এ পত্রিকায় অভাব-অভিযোগ জানিয়ে কেউ চিঠি লিখলে তা ছাপা হত। এই আদর্শে চলার ফলে খুব অল্পদিন মধ্যে কাগজটী যেমনি জনপ্রিয় হল তেমনি হল সরকারের চক্ষুশূল। এর আগে খবরের কাগজে থাকত কেবল বিজ্ঞাপন, বিলাতের কাগজ থেকে উদ্ধৃতি, খুব সাধারণ দরের প্রবন্ধ 'পুলিশ রিপোর্ট ও কিছু খোসগল্প। ক্যালকাটা জার্ণালে বাকিংহাম সাহেবের সহকারী হলেন ষ্টানফোর্ড আর্নট। হেনরি মেরেডিথ পার্কার প্রমুখ অনেক সরকারী কর্মচারী অথচ সুলেখক স্বনামে বা বেনামে লিখতেন। ফলে সরকারের অনেক কাজের সুচিন্তিত সমালোচনা এতে বের হয়। এই সময়ে ক্যালকাটা জার্ণালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হরকরা। ক্যালক্যাটা গভর্ণমেণ্ট গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট, এসিয়াটিক নিউজ ও জনবুল। এর কোনটাই কিন্তু জনপ্রিয়তায় ক্যালকাটা জার্ণালের কাছে তখন পৌছাতে পারে নি।

'জন বুল' ও তার সম্পাদক সরকারী বড় কর্তাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্পাদক ডাঃ ব্রাইস ছিলেন প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মযাজক—গভর্ণমেণ্টের হয়ে কলকাতা জার্ণালকে গালাগাল করার পুরস্কার হিসাবে সরকার তাঁকে গভর্ণমেণ্ট ষ্টেশনারী অফিসে মোটা মাইনেতে কেরাণীর চাকুরী দিলেন। এই ব্যাপারটা তাঁর সম্প্রদায় বা ডিরেকটারগণ, কেহই অনুমোদন করলেন না। এই সম্বন্ধে বাকিংহাম রসিকতা করে লিখলেন যে, যে সময় ধর্মযাজকের উপদেশ রচনা করে ব্যয় হত, সেটা এখন ব্যয়িত হবে ফিতার বাণ্ডিল আর গালার বাতি গণিয়া।

ইতিপূর্বে 'জন বুল'এর একাধিক প্রবন্ধ সুপ্রীম কোর্টে 'গ্লানিকর' বলে আখ্যাত হয়েছিল ; তখন সরকার চুপ করেছিলেন কিন্তু বাকিংহামের ব্যাঙ্গোক্তিতে তাঁরা যে সুযোগ খুঁজছিলেন তা' পেয়ে গেলেন।

যে সকল সরকারী কর্মচারী হেষ্টিংস্‌কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে মানা করেছিলেন তার মধ্যে লাটসাহেবের উপদেষ্টা অ্যাডাম সাহেব অন্যতম। ১৮২৩ সালে হেষ্টিংস বিলাতে গেলে পর এই অ্যাডাম সাহেবই অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হলেন। হয়েই ৪ঠা এপ্রিল এক 'প্রেস আইন' জারি করে জানালেন যে অতঃপর পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হলফ করে সেই হলফনামা প্রধান সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে সরকারী লাইসেন্স

নিতে হবে। এই আইনের বলে এডাম সাহেব বাকিংহামের কাগজের লাইসেন্স নাকচ করে দিয়ে তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত করলেন। বাকিংহাম বিলাতে ডিরেক্টরদের নিকট ক্ষতিপূরণের নালিশ করে নিষ্ফল হলেন। ইতিমধ্যে সহকারী সম্পাদক আর্নটকেও রীতিমত ভাবে ধরে জাহাজে তুলে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যে আইনের দ্বারা এডাম সাহেব ছাপাখানার স্বাধীনতা হরণ করলেন, সেই আইনেরই আরেক ধারায় সেরিফের দ্বারা সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে সাধারণ সভাও আহ্বান করা বন্ধ করা হল। এই আইন করবার সময় এডাম সাহেব বিলাতের ডিরেক্টারদের লিখিত একটা পত্র থেকে বিশেষ জোর পেয়েছিলেন। তাতে লেখা হয়েছিল—"আমাদের ইচ্ছা যে পত্র প্রাপ্তি মাত্র সাধারণকে বিজ্ঞাপিত হউক যে সরকারের পুর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে আমাদের কর্মচারীদের অথবা বেসরকারী ব্যবসায়ীদের বা অন্য যে কোন রকমের অধিবাসীদের কোন সাধারণ সভা অবিলম্বে নিষিদ্ধ। ইহাও আমাদের আদেশ যে কোন সভা করিবার দরখাস্তের সহিত উহাতে আলোচনীয় বিষয়গুলি আপনাদের বিবেচনার্থে পুর্ব হইতেই আপাততঃ সেরিফের মাধ্যমে উপস্থিত করা হইবে যাহাতে আলোচনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করিতে পারেন ; এবং সেরিফ বা যিনি সভাপতি হইবেন তিনি কোনমতেই আপনাদের বিবেচনার্থে পুর্বে প্রেরিত বিষয় ছাড়া আলোচনা করিতে দিবেন না। এ বিষয়ে অবশ্য আমরা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষস্থ আমাদের সরকার অনুমোদিত বিষয়ে আমাদের কর্মচারীদের বা অন্য ইউরোপীয় অধিবাসীদের মত প্রকাশের জন্য সভা আহ্বানে বাধা দিবেন না।'

এডাম সাহেব তাঁর আইন সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনের জন্য যখন পাঠান তখন ছয়জন ভারতীয় এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট ও কিংইন্-কাউন্সিলের কাছে এর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। সেই ছয়জন হলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও গৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায়। সে সময়ে কোন ইংরাজকে তাঁরা সে দরখাস্তে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করেন নি, কারণ তার ফলে সেই ইংরাজকে ভারতবর্ষ হতে অবিলম্বে বিতাড়িত হবার ভয় ছিল কিন্তু দেশীয়দের সে বাধা ছিল না, কারণ তখনকার বিদেশী প্রজাতন্ত্রবিরোধী সরকার এইসব কারণে দেশীয়দের নির্বাসন দিতে সাহস করতেন না। তবু রামমোহন ও দ্বারকানাথ অন্যান্য দেশীয়দিগকে ঐ দরখাস্তে স্বাক্ষর করাতে কিছুতেই পারেন নি। তাঁহাদের ধারণা হয়েছিল যে সই করলেই সাংঘাতিক কিছু ঘটবে এমন কি পরদিনই স্বাক্ষরকারীদের ফাঁসিকাঠে হয়তো লটকিয়ে দেবে।

বলা বাহুল্য এই দরখাস্ত সুপ্রীম কোর্ট ও বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল দু জায়গায়ই অগ্রাহ্য সাব্যস্ত হয়েছিল।

লর্ড আমহার্ষ্ট শাসনভার গ্রহণ করার পর গোড়ার দিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাধ্বংসী আইনের স্বপক্ষেই ছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি সংবাদপত্রগুলিকে কার্যতঃ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—এমন কি তাঁর নিজের কার্যের সমালোচনাতেও বিরক্ত হতেন না। কিন্তু তিনি সেই সকল আইন উঠিয়ে দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলনেন যে সেই আইন যখন রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তিদ্বারা

প্রস্তুত এবং ডিরেক্টারগণ কর্তৃক অনুমোদিত, তখন তিনি সে বিষয় ঘাঁটাতে প্রস্তুত নন, তবে নিজের সম্বন্ধে সেই আইনের কোন সাহায্য গ্রহণ করতে তিনি চান না।

ক্যালকাটা জার্নালের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকদের জোর করে বিলাতে পাঠানোর ফলে কাগজটী যখন উঠে গেল, তখন হরকরাই উদারনীতির প্রধান পত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন হরকরার সম্পাদক জেমস্ সাদার্ল্যাণ্ড(৫)। তারপর হরকরার অংশীদার স্যামুয়েল স্মিথ সম্পাদক হন। যখন একবার ইংগ-ভারতীয় ব্যবসায় মহলে বিপর্যয় আসে তখন ইনি এলেক্‌জাণ্ডার কোম্পানীর কাছে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ধারতেন বলে ঐ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছু লিখতেন না। সে সময়ে হরকরাতে অনেক নামকরা লোক লিখতেন। সরকারী কর্মচারী হেন্‌রি মেরেডিথ পার্কার যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'এদেশে যত ইংরাজ এসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত ব্যক্তি', সরকারের ঔষধ বিভাগের কর্তা ( এপথিকারী জেনারেল ) ডাঃ জন গ্রাণ্ট, কলিকাতার করোনার ও ইংলণ্ডের সঙ্গে দ্রুত জাহাজ চলাচলের অন্যতম উদ্যোগী চার্লস্ গ্রীন্‌ল, স্যার জন কে প্রভৃতি অনেকেই এ কাগজে রীতিমত লিখতেন। হরকরার আফিসে একটী ভালো গ্রন্থাগার ক্রমশঃ গড়ে ওঠে এবং লিটেরারী গেজেট নামে একটী সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রও এখান থেকে ছাপা হত। দ্বারকানাথ প্রায়ই বই পড়বার ও দেখবার জন্য হরকরা আফিসে যেতেন। 'এই হরকরা আফিসের পুস্তকালয়েই প্রথম প্রথম রাজা রামমোহন রায় ও মিঃ আড্যাম্‌সের ধর্মকথার আলোচনা হয় এবং আত্মীয়সভার সূত্রপাত হয়।' সেই চৌঘুড়ী আট ঘোড়ার গাড়ীর যুগে দ্বারকানাথ ব্যবহার করতেন এক ঘোড়ার সবুজ পাল্কী গাড়ী। একবার গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপে ছুটে গাড়ী উল্‌টিয়ে ফেলে। দুর্ঘটনায় দ্বারকানাথের একটি পা ভাঙ্গিয়া যায়। হরকরা আফিসের পাশেই ডাক্তার মণ্ড গোমারী মার্টিন নামে এক অস্ত্র চিকিৎসক থাকতেন। তিনিই দ্বারকানাথকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেন ও পরে চিকিৎসার দ্বারা পা ভালো করে দেন। এই প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ ও মার্টিন সাহেবে বেশ ভাব হয় এবং এঁরা দুজনে রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও রাজকৃষ্ণ সিংহ মিলে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশ আরম্ভ করেন। এর প্রথম প্রকাশ ১৮২৯ সালের ৯ই মে। এ কাগজের motto ( উদ্দেশ্য ? ) ছিল সিসেরোর (৭) আপ্তবাক্য 'বিচারে যাহা অনুমোদিত তাহা করাই স্বাধীনতা'। এই বেঙ্গল হেরাল্ড বা সাপ্তাহিক বার্তাবহ দুই অংশে ছাপানোর প্রস্তাব হয়—ইংরাজী ও দেশী অংশ। দুইটি পৃথক পৃথক ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শনিবার রাত্রে প্রকাশ হত। প্রথম প্রকাশের সময় 'ঘেঁসা-ঘেঁসি অক্ষরে ৪৮টি কোয়ার্টো কলামে উৎকৃষ্ট বিলাতী কাগজে ছাপা হয় এবং বিদেশী বা এদেশী প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য খবরের সারাংশ দেওয়া হয়।' এর বিশেষত্ব ছিল যে দৈনিক কাগজ থেকে দরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির সারাংশ ছাপা হ'ত, যাতে বিদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা দৈনিক কাগজের উপর চড়া ডাকমাশুল না দিয়েও দরকারী খবরাখবর পান। সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ কোন গুরুতর খবর এলে বিশেষ সংখ্যা বা suppliment বের করবারও ব্যবস্থা ছিল। বিলাতে এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন ২৩ নং কর্ণহিল, লণ্ডনের জাস্, এম্, রিচার্ডসন। কলকাতার আফিস হয় 'লাট প্রাসাদের নিকট ৫নং ডেকর্‌স্ লেন'এ। দেশী অংশ বাংলা, পার্সী ও নাগরী হরফে ছাপা হত এবং এই অংশের দেখাশুনার ভার 'শিক্ষিত হিন্দুদের'

হাতে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজী অংশের চাঁদার হার করা হয় মাসে ছয় টাকা ও দেশী অংশের এক টাকা।

এই সাপ্তাহিকের বাংলা অংশেরই নাম ছিল বোধহয় 'বঙ্গদূত' কারণ তাহাতেও দেখা যায় অংশ ছিল দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায় ও মার্টিন সাহেবের এবং সম্পাদক ছিলেন নীলরতন হালদার। প্রগতিশীলদের মুখপত্র হিসাবে এর বিশেষ নাম ছিল। (৮)

বেঙ্গল হেরাল্ডে বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিরূপ সমালোচনা বার হলে, সত্বাধিকারী হিসাবে দ্বারকানাথকে একাধিক মানহানির মামলায় পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল হেরাল্ড, বেঙ্গল হরকরার কাছে বিক্রীত হয়।

বেঙ্গল হরকরার জন্যও দ্বারকানাথকে যে মামলায় নামতে হয় নি তা নয়। সুপ্রীম কোর্টে ২৪শে অক্টোবর ১৮৩৮, বুধবারের কার্যাবলীতে দেখি যে জজ 'স্যার ই, রায়াল ও স্যার এস, গ্রান্টের এজলাসে কাপ্তেন রবার্ট এডাম ম্যাকলউন, বেঙ্গল হরকরার অন্যতম সত্বাধিকারী হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে ঐ পত্রিকায় 'ক্ল্যারেটের প্রেম' শীর্ষক চিঠি ছাপার জন্য যে মানহানির মামলা এনেছিলেন তাহা খারিজ হইয়া গিয়াছে।' ( ৯ )

সমসাময়িক যে সব বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগ ছিল তন্মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশিত 'অনুবাদিকা' ও ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর অন্যতম। বুধবার ২৭শে শ্রাবণ ১২৪৪ সালে যখন সংবাদ প্রভাকর 'পুনর্বার বারত্রয়িকরূপে' প্রকাশ পায় তখন পাথুরিয়াঘাটার গোপাললাল ও কানাইলাল ঠাকুর এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'ন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন যখন প্রভাকর দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয় (১০) তখন দ্বারকানাথ ইহার একজন 'বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক'। 'কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তকে তিনি সর্বদা ডাকাইতেন এবং সংবাদপত্র পরিচালন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের একখানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার সম্পাদক ছিলেন। একবার রসিকবাবু দ্বারকানাথকে নিজের কাগজে বিশেষরূপে নিন্দা করিয়া অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। অনেকে সেজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রসিকবাবুকে চাব্‌কাইয়া দিবার উপদেশ দেন, কিন্তু দ্বারকানাথ কি কৌশলে শত্রু বশ করিতে হয়, তাহা জানিতেন। তিনি একদিন রাত্রির ভোজে রসিককৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বুঝাইয়া দিলে- সুপণ্ডিত রসিককৃষ্ণ আপন ভুল বুঝিতে পারেন এবং দ্বারকানাথের আদরে ব্যবহারে প্রীত হইয়া দ্বেষভাব ত্যাগ করেন।'

'কেবল রসিককৃষ্ণ নহেন এই সময়ে হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি প্রধান। দ্বারকানাথ তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য অতি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর বংশের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও এই সকল নব্য যুবকদলের একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদ্বারা দ্বারকানাথ প্রত্যেককে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রত্যেকের সহিত কথাবার্তা কহিয়া কাহার কি আশা ও উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়া লইতেন।" (১১) দ্বারকানাথের সাহায্যেই রামগোপাল ঘোষ বণিকসম্প্রদায়ের

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং দিগম্বর মিত্র কাশিমরাজারের রাজা হরিনাথের পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

দ্বারকানাথের সময়ে পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল কমবেশী পনেরোখানা।(১২) বাংলা দেশ থেকে ইংরেজীতে ছাপা পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল ৩৩টি। এর মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে দ্বারকানাথ জড়িত ছিলেন।

১৮৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে যে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ বের হতে আরম্ভ করে তা হরকরার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে বেঙ্গলকুরিয়ার ও ইণ্ডিয়া গেজেট দ্বারকানাথ খরিদ করে বেঙ্গল হরকরার সঙ্গে জুড়ে দেন। বেঙ্গল কুরিয়ারের সম্পাদক ছিলেন কারঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার উইলিয়াম প্রিন্সেপের ভাই জেমস্ প্রিন্সেপ। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক দ্বারকানাথ ও রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়াম এড্যাম্‌স্। ১৮৩৪ সালের পয়লা ও ৪ঠা অক্টোবরের সমাচারদর্পণে খবর দেওয়া হয় যে—গত শনিবার দেউলিয়া সম্পত্তির অংশ হিসাবে বিক্রীত ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রেসের তিন অংশ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩৪,০০০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছেন। তাহার পূর্বেই ইহাতে একটি অংশ ছিল, এখন তিনি সম্পূর্ণ মালিক হইলেন। তার তিন দিন বাদে দেখি যে সমাচার দর্পণ আরও খবর দিচ্ছেন যে—ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসকে হরকরার ছাপাখানার সঙ্গে একত্রীভূত করা হয়েছে। দৈনিক ইণ্ডিয়া গেজেট আর বাহির হইবে না। যাঁহারা উহার গ্রাহক ছিলেন তাহাদের তৎপরিবর্তে বেঙ্গল হরকরা দৈনিক সরবরাহ করা হইবে। ত্রৈ-সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়া গেজেট অবশ্য যথারীতি প্রকাশিত হবে তবে হরকরা ছাপাখানা থেকে। যিনি গত কয়েক বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে এর সম্পাদনা করেছেন তিনিই সম্পাদক নিযুক্ত থাকবেন।

ইতিমধ্যে ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিংক যখন 'দেশীয়দের উন্নতির সহায়তা করিতে' বদ্ধপরিকর সেই সময়ে কয়েকজন ইংরাজ ও ভারতীয় মিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দাবী জানান। এ বৎসর ৫ই জানুয়ারী সপারিষদ বড়লাট সাহেবকে ও বিলাতে পার্লামেণ্টে আবেদন করার জন্য টাউন হলে এক সাধারণ সভা হয়। ঐ সভায় তখনকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার টি, ডিকেন্স এই বিধি নিষেধের তীব্র নিন্দা করে ঐগুলিকে 'স্বেচ্ছাচারিতার ঈর্ষাপূর্ণ, কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালের প্রকাশ' বলে অভিহীত করেন।

ডিকেন্স সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে দ্বারকানাথ বলেন—মহোদয়গণ, এই আবেদনপত্রের সমর্থন করে আমি দশ বৎসর পূর্বেও যা করেছি, আজও তাই করছি। এই আইন যখন সরকার প্রথম করেন তখন কেবলমাত্র আমি, আমার তিনজন আত্মীয় ও আমার স্বর্গত সুহৃদ রাজা রামমোহন রায় এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করি। আজ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় লোকে টাউনহল পূর্ণ দেখে আমি সমগ্র সমাজকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সে সময়ে কোন সাহেবকে আমি আবেদনপত্রে সই করিতে অনুরোধ করি নাই, কারণ উহাতে সাক্ষর তাঁর নির্বাসনের কারণ হইতে পারিত। কিন্তু এদেশীয়দের পক্ষে ঐরূপ কোন বাধা ছিল না কারণ এদেশবাসী কাহাকেও এই কারণে নির্বাসন দেওয়া তখনকার সরকারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদেশীয় কাহাকেও আমি আমার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে

পারি নাই, কারণ আমার ধারণা, তাঁরা ভেবেছিল যে আমার দুঃসাহসের জন্য পরদিনই হয়ত আমার ফাঁসি হবে।

এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পক্ষে আমার মনেহয় এই প্রকৃষ্ট সময় কারণ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে গত আট বৎসর আইনের বিধি নিষেধ সত্ত্বেও আমরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করছি। কেবল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিককে বড়লাট হিসেবে পেলে আবেদনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর বর্তমানে, কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের অন্যান্য বহু আইনের মতই নিঃসার। কিন্তু এঁর পর কে আসবেন তা' ত' জানা নাই। পরবর্তী বড়লাট যে সাদার্লাণ্ড বা ষ্টকেলার সাহেবকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন না তা কে বলতে পারে? অতএব এখনই আমাদের করা যুক্তিযুক্ত। লর্ড বেন্টিংকের চরিত্রের যা পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং এদেশীয় ও সমস্ত সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁর যে প্রয়াস তাতে মনে হয় এ আইন তিনি রহিত করবেন; আর একবার রহিত হলে কোন ভবিষ্যৎ বড়লাটের পক্ষেই তা' পুনরায় বিধিবদ্ধ করা সহজ হবে না।

এই সভার ফলে, একমাস পরে, ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার দেশী ও বিদেশী সংবাদসেবীদের তরফ থেকে এক দরখাস্ত দেওয়া হয়। যে সময়ে সাহেব ও এদেশীদের একত্রে সরকারের কাছে কোন বিষয়ে দরবার করা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল। এতে সই করেন উইলিয়াম এডাম; দ্বারকানাথ ঠাকুর; রসিকলাল মল্লিক; ই, এম্, গর্ডন; রসময় দত্ত; এল্, ক্লার্ক; সি, হস্; টি, এইচ, বার্কিং; ডেভিড হেয়ার; টি, ই, এম্, টার্টন; ইয়ং ও ও জে সাদার্ল্যাণ্ড।

এডাব সাহেবের ১৮২৩ সালের সংবাদ ও ছাপাখানা সংক্রান্ত আইনের সমস্ত বাধানিষেধের সম্বন্ধে আবেদনে উল্লেখ করে বলা হয় যে ঐগুলি কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, দুরভিসন্ধিপূর্ণ এবং সংবাদসেবী ও সরকার উভয়ের পক্ষেই হেয়কর। সরকারী চাকুরে ছাড়া যেসব সাহেব এদেশে আসেন তাঁদের দয়া করে এদেশে আসিতে দেওয়া হইতেছে, না ভাবিয়া তাঁরাও সরকারের ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায়ে সরকারী লোকদের মতই তৎপর এরূপ ব্যবহার করাই উচিত এবং স্বদেশে তাঁদের যে অধিকার ছিল এদেশে আসায় তাঁরা সেই অধিকারচ্যুত হয়েছেন এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। ইংরাজীতে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা শাসকগোষ্ঠীর শৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী নয়, কারণ ইংরাজীজানা ভারতীয়ের সংখ্যা নগণ্য এবং তাহাও কলিকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন পত্র পত্রিকা শাসকমণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষার হয়ত পরিপন্থী হতে পারে এই ভয়ে বিনা অনুমতিতে কোন কিছু প্রকাশেই বাধা দেওয়ার যৌক্তিকতা নাই। প্রকাশিত অপেক্ষা অপ্রকাশিত পত্রের মাধ্যমেই দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে নিন্দা ও অপপ্রচারের ভয় বেশী। বরং যাহাদের বিপথগামী করাই ঐ সব লেখার উদ্দেশ্য, প্রকাশিত পত্রিকা তাহাদের অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাস দূর করিবে। নিন্দনীয় দেশীয় পত্রিকার জন্য এই আইন অনাবশ্যক কারণ ডাকশুল্ক মারফতেই সরকার ঐ সব প্রচার বন্ধ করিতে পারেন। ছাপা পত্রিকার উপর ডাকশুল্কের হার যে যথেষ্ট বেশী সেবিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তৎকালীন সংবাদ পত্র সংক্রান্ত আইন ও বিধানগুলি ও সাধারণ সভা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ১৮০৭ সালের আইনের বিলোপের জন্য এই দরখাস্তে আবেদন করা হয়।

দরখাস্তকারীরা আরও বলেন যে যদি যে আইন লোপের জন্য আবেদন করা হইতেছে

তৎপরিবর্তে অন্য কোন আইন করিতে সরকার মনস্থ করেন ; যারা সে আইনের আওতায় পড়িবেন তাঁদের আপত্তি জানবার উপযুক্ত সুযোগ যেন দেওয়া হয়। (১২)

এর উত্তরে সরকার জানান যে—সপারিষদ বড় লাটবাহাদুর এ বিষয়ে আপনাদের সহিত একমত যে কোন আইন বলবৎ করিবার পূর্বে সাধারণকে জানাইয়া জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই সেবিষয়ে মন্তব্য গ্রহণ করা উচিত। সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরের ধারণা যে কলিকাতা-বাসীদের কোন আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হওয়ার বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনে বাধা নাই। তাঁহারা যে স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন তাহা তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভোগ করিতেছেন এবং ঐ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন অভিপ্রায় সরকারের নাই। কিন্তু লর্ড বেন্টিংক সংবাদপত্রের আইন কাগজে কলমে রহিত করিলেন না। এর কারণ অবশ্য কতকটা অনুমান করা যায়।

বেন্টিংক যখন ভারতের রাজ্যভার প্রথম গ্রহণ করেন তখন বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সৈন্য বিভাগের ভাতা হ্রাস করেন এবং সেই উপলক্ষে ভারতস্থ ইংরাজ মহলে তুমুল আন্দোলন হয় এবং তিনি তাহাদের বিশেষ অপ্রিয় হন। সাহেবদের খবরের কাগজগুলিতে তাঁহাকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি করিতেও বাদ দেয় নাই। তখন ছাপাখানা শাসনের আইন ব্যবহার না করিলেও আইনের দফাটি একদম তুলে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না ; হয়ত অসহ্য হইলে ব্যবহার করিতেন। তা' ছাড়া তিনি যখন মাদ্রাজের লাট ছিলেন তখন ১৮০৬ সালে মত প্রকাশ করেছিলেন যে আমার মনে হয় সাধারণের নিরাপত্তার জন্য ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকার উপর বিশেষ সতর্ক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ক্ষতিকর লেখা কে লিখিল তাহাতে কিছু যায় আসে না, বরং লেখক যত উচ্চপদস্থ, ক্ষতি তত বেশী।

বেন্টিংকের সভাসদ স্যার চালস্ মেটকাফ বলিতেন যে তিনি যদি কোনদিন ক্ষমতা পান ত' মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন। সে সময় বড়লাটের আরেকজন সভাসদ্ মেকলে সাহেব। তিনি তখন মিল্টনের জীবনীতে স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন এবং সর্ব-বিষয়ে নিজেকে স্বাধীনতা ও প্রগতির স্বপক্ষে প্রচার করছেন। ফলে যখন বেন্টিংক বিলাতে গেলেন এবং মেটকাফ তাঁর জায়গায় বড়লাট হলেন তখন তাঁর প্রথম কাজ হল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আইন প্রণীত হয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর পাশ হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার স্বপ্ন যখন সত্যে পরিণত হল তখন কলিকাতাবাসীরা ১৮৩৫ সালের ৮ই জুন টাউন হলে সভা করে বড়লাটসাহেবকে ধন্যবাদ জানাবার প্রস্তাব করেন।

বড়লাটসাহেবকে এক অভিনন্দন দান করা হউক বলে প্রস্তাব করেন বাগ্মী ব্যারিষ্টার টার্টন সাহেব। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে দ্বারকানাথ বলেন যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অন্তরায় যত কিছু ছিল তার প্রত্যেকটী দূর করিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রত্যেকটী জনসভায় তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। সুতরাং এই প্রচেষ্টার সাফল্যে তাঁর আনন্দ স্বাভাবিক। এই সংগ্রামে তিনি যখন সাহায্য করেছেন তখন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করাই তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পথ।

এই সভার ফলে একটি লিখিত অভিনন্দন দ্বারকানাথ প্রমুখ একদল সদস্য স্যার চার্লস্

মেটকাফকে রাজভবনে ১৮৩৫ সালের ২০শে জুন দেন।

আইন পাশের তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর এই আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ার আনন্দে এক ভোজ-সভার আয়োজন করেন। ঐ ভোজ সভায় সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার টি, ই, টার্টন ও সহ সভাপতি এইচ, এম্, পার্কার। এই সভায় দ্বারকানাথকে একাধিক বক্তা ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—তৃতীয় আরেক ব্যক্তি কয়েক বৎসর ছাপাখানার মালিক হয়েছেন কিন্তু বরাবরই তিনি উদার নীতির পক্ষে লড়েছেন ও অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করেছেন। আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলছি যিনি উদার মতবাদের জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করেছেন অথচ সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কখন নিজে প্রশংসালাভে চেষ্টা করেন না। তবে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী তিনি, লাভ হাতে পেলে তা অস্বীকার করবেন না নিশ্চয়ই।

সভাপতি টার্টন সাহেব তাঁর বক্তৃতার শেষ করেন ( proposing a toast ) একটী সাফল্য কামনা করে—'চেম্বার অফ্ কর্মাস্ ও কলিকাতা ব্যবসায়ীদের প্রতি—যাদের দুই পকেটেই পয়সা।'

উপস্থিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হিসাবে দ্বারকানাথ এর উত্তরে ধন্যবাদ দিতে উঠে বলেন—

এই আইনে সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার হয় নাই বলিয়া তিনি দেশবাসীর প্রশংসা করেন। যদিও ইংরাজী পত্রসমূহ দেশজ ছাপাখানার দাবী সম্বন্ধে একমত হন নাই, তথাপি সেই দাবী এত জোরের সঙ্গে পেশ করার জন্য তাঁর দেশবাসী বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই মতের বিভিন্নতার জন্য তিনি রাজনীতিকে দায়ী না করে ভাল মনে এই ধরে নিচ্ছেন যে তাহা সংখ্যালঘুদের স্বঃ স্বঃ স্বার্থরক্ষার চেষ্টামাত্র। ( সকলের হাস্য ) * * *

ক্যাপ্টেন টেলরের বক্তৃতায় যে ভারতবাসীদের শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে দ্বারকানাথ বলেন যে প্রধানতঃ বন্ধুবর ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রচেষ্টায় এদেশীয়গণ যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তখন তাহাতে একজনমাত্র ছাড়া কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্য ছিল না। (১৩)

১৮৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্মরণ উপলক্ষে এবং এই স্বাধীনতাদান-কারী স্যার ( পরে লর্ড ) মেটকাফের সম্মানার্থে এক সাধারণ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এই সভার পরিদর্শক মনোনীত হল কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ। দেশীয় পরিদর্শক ছিলেন তিনজন—রুস্তমজী কাওসজী, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কিন্তু এই আনন্দোৎসবে দ্বারকানাথ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ জানিয়ে তিনি ঐ উৎসবের সভাপতি ব্যারিষ্টার লংভিল ক্লার্ককে লেখেন—

একজন এদেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসাবে এবং আপনাদের সঙ্গে এবং যে শাসনপদ্ধতির দ্বারা এই সুপ্তোত্থিত দেশ ইংলণ্ডের সহিত জড়িত তাহার সহিত এদেশের সাধারণ অধিবাসীদের চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকায় বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে কিছু বলা আমার কর্ত্তব্য। আমার গভীর

বিশ্বাস যে ভারত সরকারের বিবিধ অবদানের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান অন্যতম। এই আইনের দ্বারা সরকার এ বৃহৎ দেশ শাসনে চক্ষু কর্ণ ও বাহুর শক্তি বিস্তৃততর করিয়াছেন। তৎব্যতীত প্রজাবর্গকে নিজ কাজের বিচার করিতে দিতে ভীত ন'ন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁরা প্রজাদেরও আশ্বাস দিয়াছেন যে সরকার ন্যায়বিচারের দ্বারা দেশ শাসন করিতে চাহেন।

ঐ ভোজ সভায় স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করে সহ সভাপতি এইচ, এম্ পার্কার সাহেব বলেন—

To the principal survivor amongst the native champion of a Free Press.

Thank God, the honour due to the name connected with my toast, depends upon a more solid foundation than my feeble words. That name is inscribed foremost amongst the foremost, on the roll of those most distinguished for mercantile liberality and commercial enterprise. It is among the first, if not the very first, on the list of active, able and munificent citizens to whom the whole community is indebted the name of my friend is revered by many whom he has saved or established in life by his judicious advice, or his liberal assistance. It is written in the hearts of thousands who have fortaken of his inexhaustible charity ; who have had cause to bless his boundless benevolence confined to no caste, colour or creed. It shines brightly, surrounded by all that is urbane and kind and courtious, on the tablets of social hospitality. It is heard in the halls of our Colleges, in the porticos of those library and scientific institutions which he has supported and enriched. It shines gloriously through one act,—a recent act of charity so princely, so magnificent that I tax my memory in vain to discover a parallel to it within my own knowledge and experiencc. (১৪) Above all, the name of this admirable citizen is inseperably connected with that good and just cause whose triumph we have met this might to celebrate.

Gentlemen, need I say after this that it is the name of Dwarkanath Tagore ?

At the time when all was apathy or dismay at the time of the passing of the Press Law, Dwarkanath Tagore and his illustrious friend (Rammohan Roy who sleeps with the just) alone stood forth to fight the good fight. On the first celebration of this anniversary we were told by no mean authority that Dwarkanath Tagore had spent thousands with no other object than the freedom of the Indian Press. They entertained Councel to argue against the registration of the law in the Supreme Court ; they pitltioned Parliament. Manfully did this little band of patriots stand in the breach ; manfully did they continue to hope when "hope seemed none." In the hour of our triumph let not the brave

hearts be forgotten. One has, as the French happily express it, "gone to immortality." But the noble, the admirable survivor can still enjoy the applause of his fellow citizens ; can still know that his name "is in our flowing cups freely remembered." (১৫)

বাংলা দেশে সে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় বহু ব্যক্তি জীবিত ছিলেন কিন্তু অতিশয়োক্তি না করে বোধহয় তাঁদের আর কাহারও সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী প্রশংসা করা সম্ভব হইত না।

(১) প্রধান সেক্রেটারী জন আডাম ১৯ অগষ্ট ১৮১৮ এবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদককে জানান যে সম্পাদক মাত্রেই যেন এবিষয়ে নজর রাখেন।

(২) জোয়াকিম হেওয়ার্ড স্টকেলার ১৮০৯এ জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন কাগজে কাজ করার পর তিনি বেঙ্গল হেরাল্ডে যোগ দেন। সেখান থেকে ছেড়ে "ইংলিশম্যান" কাগজ প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। এই ইংলিশম্যান প্রেসেই লর্ড মেকলের ক্লাইব ও হেষ্টিংস সম্বন্ধে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।" বম্বে কুরিয়ার, ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি বিবিধ পত্র সম্পাদনা ও বহু পুস্তক প্রকাশ করেন। (তার মধ্যে অন্ততঃ একটী দ্বারকানাথকে উৎসর্গীকৃত)। তিনি সুগায়ক ও নিপুণ অভিনেতাও ছিলেন। বিলাতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

(৩) ন্যাশন্যাল পেপার জুলাই ৩১, ১৮৭২এ উদ্ধৃত "স্টকেলারের মেময়ের্স অফ্ এ জার্ণালিষ্ট"-এর অংশ থেকে।

(৪) "ভাগ্যের বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাকিংহাম ভারতে বাস করবার লাইসেন্স সংগ্রহ করে কলকাতায় আসেন।" প্রথম জীবনে নাবিক হিসাবে চাকুরীর সময় ভূমধ্যসাগরে বন্দী হয়ে প্রায় ক্রীতদাস হয়ে কাজ করার পর পালিয়ে বিলাতে ফিরেন। পরে ম্যাডাগাস্কার থেকে ক্রীতদাসবাহী জাহাজের কর্তা হন। সে কাজ বিবেককে আঘাত দেওয়ায় কলিকাতায় এসে অর্থ ও প্রতিপত্তির আশায় খবরের কাগজ ছাপাতে আরম্ভ করেন।

(৫) ইনি ১৮০৯এ হুগলীতে মাষ্টারি ও পরে কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ইনি মেরিন বোর্ডের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। (৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

(৭) মার্কাস টুলিয়াস সিসেরো (খৃঃ পূঃ ১০৬—৪৩) রোমের সাধারণ তন্ত্রের যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ও বাগ্মী। (৮) হিস্টরি অফ্ ইণ্ডিয়ান জার্নালিজ্‌ম্—নটরাজন্।

(৯) বেঙ্গল হরকরা ২৫ অক্টোবর ১৮৩৮। (১০) ইহাই প্রথম এ দেশীয় দৈনিক সংবাদপত্র।

(১১) নটরাজন ১৮৩০ খৃঃ বাংলা সংবাদ ও মাসিকের তালিকায় ১৬টি নাম করেছেন কিন্তু ঐখানে উল্লিখিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আরও পরে।

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। (১২) নটরাজন, হিষ্টরি অফ্ ইণ্ডিয়ান জার্ণালিজম্ পৃঃ ৩৩।

(১৩) ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল ১৮৩৫, প্রথম খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ।

(১৪) ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবিল সোসাইটীকে একলক্ষ টাকা এককালীন দান।

(১৫) "Sixty-four years ago." The Bengalee. Feb 14, 1902.

# রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বাংলার লোক-সাহিত্য

অধীর দে

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের এক স্মরণীয় ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র! বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও মনীষায় তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইমারত তৈয়ারী করিয়া যে দুর্লভ শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা আজও বিস্ময়ের সামগ্রী। বিজ্ঞান-সরস্বতীর এই বরপুত্র রামেন্দ্রসুন্দর কেবলমাত্র রসায়ন শাস্ত্রেরই অধ্যাপক ছিলেন না, জীবন-রসায়ন-বিদ্যারও তিনি ছিলেন যোগ্য পুরোহিত। মনুষ্য-হৃদয়ের রস-সম্পুট আবিষ্কারে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিচরণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর আকর্ষণ ছিল এবং বাঙ্গালীর এই প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া তিনি লিখিয়াছেন—'বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলাদেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। * * বাঙ্গলার পুরুষ-পরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নারী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি।.........'

বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য কেবলমাত্র চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সাহিত্যই নহে, লোকমুখ হইতে সংগৃহীত অজ্ঞাত লেখকের বহুবিধ রচনা অর্থাৎ লোক-সাহিত্যকেও প্রাচীন সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত করা যায়। লোক-সাহিত্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের যে গভীর অনুরাগ ছিল, তাহা বিভিন্ন প্রসঙ্গসূত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, লোক-সাহিত্যকে দেশ ও জাতির আদিতম নিদর্শন হিসাবে আখ্যাত করা অসংগত নহে। দেশের মাটিতেই সৃষ্টি হয় লোক-সাহিত্যের। দেশের সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ, গণমানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনন্দ-ব্যথা-বেদনার ছবি লোক-সাহিত্যের মাধ্যমে নিখুঁত-ভাবে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিমানসসৃষ্ট সাধু বা উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের প্রকৃতি বা স্বরূপগত পার্থক্য আছে। উচ্চতর সাহিত্যে বহুলক্ষেত্রেই ব্যক্তিমনের একজাতীয় কৃত্রিম আবরণে দেশের মাটির সঙ্গে তাহার নিবিড় সম্পর্ক ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু লোক-সাহিত্যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতার আবরণ নাই। জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতির সংস্কৃতির জীবনের মর্মমূলের সহিত ইহা বিধৃত। দেশ ও জাতির স্বরূপ ও সভ্যতার পরিচয় উপলব্ধি করিতে হইলে যে সেই দেশের লোক-সাহিত্যের সহিত পরিচয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আজ কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের লোক-সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আধুনিককালে যিনি বিশেষভাবে কৌতূহলী

হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি স্বনামধন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোক-সাহিত্যের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে, তাহা তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অদ্ভুত রস-বিচারণাশক্তির সাহায্যে বাঙ্গালী সমাজের নিকট প্রকাশ করিলেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়া সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নিজের আসন স্থায়ী ও মহিমময় করিয়াছে। বাংলা লোক-সাহিত্য সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের পথিকৃতের ভূমিকা এবং তাঁহার কবিসুলভ ভাষায় লোক-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। বহু সুধীজনই রবীন্দ্রনাথের এই নূতন ভূমিকায় বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকে সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্তিগতভাবে লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ব্রতী না হইলেও লোক-সাহিত্যের প্রতি যে তিনি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা যে রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য-প্রীতির প্রতিক্রিয়া, এ'কথা অস্বীকার করা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আজীবন ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল সুনিবিড়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'র সম্পাদকপদ কয়েক বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর অলংকৃত করেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১০ অব্দ পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সহিত এই বিশিষ্ট পত্রিকা সম্পাদনা করেন। লোক-সাহিত্যে তিনি যে অনুরাগী ও উৎসাহী ছিলেন তাহা তাঁহার সম্পাদনাকালে 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিভিন্ন ছড়া, গ্রাম্য কবিতা ও ব্রতকথার সংগ্রহ হইতে প্রমাণিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহে আবদুল করিম সংগৃহীত 'চট্টগ্রামী ছেলেভুলান ছড়া', রামপ্রাণ গুপ্ত সংগৃহীত 'ব্রতবিবরণ' ও ব্রজসুন্দর সান্যাল সংকলিত গ্রাম্য কবিতা 'শরৎ-কালী' সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া 'লোক-সাহিত্য' নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে বহু-সংখ্যক ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে ছড়ার সংকলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দর সংগ্রাহক ছিলেন না এবং লোক-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাকার্যেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হন নাই। লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁহার যে কয়েকটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা কয়েকজন লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকের সংকলন গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। রামেন্দ্রসুন্দরের এই ভূমিকামূলক রচনা হইতেই তাঁহার লোক-সাহিত্যের প্রতি গভীর প্রীতি ও এই জাতীয় রচনার যথার্থ মূল্যায়ণের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক, সেই সময়েই অর্থাৎ ১৩০৬ সনে তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণি'র ছড়া'র ভূমিকা রচনা করেন। এই ভূমিকার সুরুতেই রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় যখন আমাকে এই ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন আহ্লাদের ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি এই ভার গ্রহণ করি। আহ্লাদের কারণ, আমি এইরূপ

ছড়া সংগ্রহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্তিগতভাবে লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতরণ না করিলেও লোক-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে সুগভীর অনুরাগ এবং বাংলার সমাজ-জীবনে লোক-সাহিত্যের যে উপযোগিতা, সেই সম্পর্কে তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধির পরিচয় বুঝিয়া লইতে অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। তাঁহার কবিত্বময় রসসৃষ্টিই লোক-সাহিত্য বিচারে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব বা তথ্য অপেক্ষা রসের আবেদনই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র রূপ ছড়া, তাহার বিচারে রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি বা মানদণ্ড তিনি লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ বিচারেও অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'আমাদের ভাষা ও সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্য বিচারে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয় বা অনুভূতির নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে, রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচারের পক্ষপাতী। তাঁহার নিকট অনুভূতিজাত রক্ষাশক্তি অপেক্ষা বুদ্ধি-বিচারসমৃদ্ধ মস্তিষ্কের আবেদনই ছিল সর্বাধিক। লোক-সাহিত্যের আলোচনা অর্থাৎ বিচারবিশ্লেষণে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনীষা নিছক রসতত্ত্বের দিকে অগ্রসর না হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা সামাজিক তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের লোক-সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড নির্ণয় করিতে তাঁহারই রচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই। এবং আমার বিশ্বাস, এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্যজীবনের সত্য ঘটনা হইয়া কারবার করে; সুতরাং বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গ্রহণের জন্য যতটা লোলুপ ও সত্যের আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্ সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই। *** কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই ছড়া-সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশবজীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজ কবিদৃষ্টির সহায়তায় ছড়া-সাহিত্যের অরূপলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সহজাত বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ছড়া-সাহিত্যের স্থূল রূপলোকের রেখাচিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। শিশু প্রকৃতির মনোবিজ্ঞানসম্মত

ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছড়া-সাহিত্যের স্বরূপ-প্রকৃতি রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানব-শিশু সদ্য সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কিন্তু কখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্তিও সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযম-রহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতিপ্রাকৃত ; অথবা বয়স্কলোকে যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিতে চায় ও যাহার অস্তিত্বে শঙ্কিত বা চিন্তিত বা হতবুদ্ধি হয়, যাহাকে প্রাকৃতের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধিশক্তিকে বিনিয়োগ করে, তাহাই তাহার নিকট একমাত্র প্রাকৃত। শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্ধনের ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না।'

ছড়ার মধ্যে অধিকাংশ সময়ে কোন ভাবেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। কখনও কখনও কোন ভাবের ইঙ্গিত থাকে মাত্র, কিন্তু তাহারও প্রকাশ হয় অতি অসংলগ্নভাবে। যুক্তিসংগতিশূন্য স্বয়ং সম্পূর্ণহীন ভাবের রেখাচিত্র যে এই ছড়া, তাহার মধ্যে শিশুর উল্লাস বা আনন্দের খনি যে নিহিত আছে, সেই সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে কে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। প্রকৃতির কাব্যে একটু ছন্দঃপাত দেখিলেই আমাদের মত বয়স্কের কানে ও প্রবীণের কানে কেমন কেমন ঠেকে ; কিন্তু শিশুর নিকট সেই কাব্যখানা আদ্যোপান্ত ছন্দোহীন। উহাতে কোনরূপ মিলের বিচার নাই, কোনরূপ বিরামের নিয়ম নাই। সঙ্গীতটার আগাগোড়াই বেসুরো ও বেতালা। অথচ, এই ছন্দের ও মিলের অভাব, এই সুরের ও তালের সম্পূর্ণ অসদ্ভাবই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও পরিতোষ উৎপাদনে সমর্থ। ছন্দের অস্তিত্ব ও তালের অস্তিত্বই হয়ত তাহার অসংযত মুক্ত স্বাধীনতাকে ব্যাঘাত দিয়া তাহার আনন্দের তীব্রতম হানি জন্মায়।'

'খুকুমণির ছড়া'র এই ভূমিকাটি রামেন্দ্রসুন্দরের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনা। 'লোক-সাহিত্য' সম্পর্কিত তাঁহার আরও অন্য যে দুইটি রচনা আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছড়া ও গল্পের ভূমিকা রচনা করেন। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার মধ্যে তিনি লোক-কথার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের কোন অবকাশই পান নাই। বরং ভূমিকার অধিকাংশ স্থানই জুড়িয়া আছে তাঁহার আক্ষেপোক্তি। বাংলাদেশের লোক-কথার প্রতি সাধারণ, এমন কি বিদ্যোৎসাহী সমাজেরও ঔদাসীন্যের জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এ দেশে অতি প্রাচীনকালে ছেলেদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, আমাদের দেশেই এই শ্রেণীর কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প এই দেশ হইতেই বিস্তারলাভ করিয়া দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই

কথাগুলি আমাদের কোলের কাছে রহিয়াছে, অথচ বাঙ্গালীর ছেলেদের আনন্দবর্ধনে এতাবৎ এই কথাগুলির বিনিয়োগ হয় নাই কেন ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষার্থী বালকের জন্য পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প ঋজুপাঠ প্রথম ভাগে সংকলন করিয়াছিলেন। আধুনিক শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা হইয়াও তিনি কথামালা গ্রন্থে বিদেশী গল্পের সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এই খাঁটি স্বদেশী গল্পগুলিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই কেন ?'

লোক-সাহিত্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের যে গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহা তাঁহার এই জাতীয় মন্তব্য হইতে উপলব্ধি করা সহজ হয়। লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহকদিগকে তিনি যেমন উৎসাহ দিতেন, তেমনি তাঁহাদের সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্যও করিতেন। অখ্যাত, অপরিচিত লোক-সাহিত্য সংগ্রহকারী ব্যক্তির গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া সাধারণ জনসমক্ষে লোক-সাহিত্যের প্রচারে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বদাই সহায়তা করিয়াছেন। পাঁচথুপী নিবাসী পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দাসী তাঁহার নিকট সম্পূর্ণই অপরিচিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকলিত 'ব্রত-কথা'র ভূমিকা রচনা করিয়া দিতে রামেন্দ্রসুন্দর কোনপ্রকার ইতস্ততঃ করেন নাই। বরং অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি 'ব্রত-কথা'র উপযোগিতা ও তাহার প্রভাব সম্পর্কে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিরণবালা দাসীর 'ব্রত-কথা'র ভূমিকাটি রামেন্দ্রসুন্দর ১৩১৯ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। অতি অল্প কথায় অথচ সারগর্ভ মন্তব্যে তাঁহার ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান হইয়াছে। এই ভূমিকার শেষে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সংকলন-কার্যে এই ব্রত-কথাগুলির স্থান কত উচ্চে, তাহা এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এইরূপ সঙ্কলন প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্যের পুষ্টি সহকারে বাঙ্গালার সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে।'

রামেন্দ্রসুন্দর লোক-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা-বিধিরই যে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতি ও এই প্রকার মন্তব্য হইতে উপলব্ধি করা কঠিন হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে লোক-সাহিত্যের প্রভাব যেভাবে অনুভব করা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক রচনায় সেই জাতীয় প্রভাব বিরল। তিনি মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই রচনা করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক কারণেই কল্পনা-সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারের অবকাশ সেখানে কম। তথাপি রামেন্দ্রসুন্দরের কোন কোন প্রবন্ধে যেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিচারে রহস্যময়তার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানে রূপকথার জগতের আনন্দ-আস্বাদ লাভ করা একেবারে অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের 'মায়াপুরী' প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়।

লোক-কথার আখ্যানধর্মী আবহাওয়া বা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর অনেক সময় জটিল গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধের বিষয়ালোচনায় প্রবেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার 'ধর্ম-প্রবৃত্তি' প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—

'রাজা দিলীপ বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জীবনদানে উদ্যত হইলে, মায়াসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, একটা গরুর জন্য জীবন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ; তুমি বাঁচিয়া

থাকিলে তোমার প্রজাগণকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

দিলীপ দুই কথায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রথম, আমি ক্ষত্রিয়, আর্তত্রাণ আমার ধর্ম; দ্বিতীয়, আমি এক্ষণে পরাধীন, প্রাণান্তেও প্রভুর নিয়োগ পালনে আমি বাধ্য।

আজকাল যাহাকে ইউটিলিটি বা হিতবাদ বলে, যাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা অধিক লোকের অধিক হিত, সেই অনুসারে ধরিলে, দিলীপের হিসাবে ভুল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভুয়া সেন্টিমেন্টের বা ভাবপ্রবণতার জন্য একটা সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিচারমূঢ়তাই দেখাইয়াছিলেন। গরুর জীবনের অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য, বশিষ্ঠের নিকট না হউক, সমস্ত সমাজের নিকট অনেক অধিক ছিল, তাহা বোধহয় বশিষ্ঠকেও স্বীকার করিতে হইত।

দিলীপ ঠিক বুঝেন নাই, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ইউটিলিটি-তত্ত্বের জয়-জয়কারের দিনেও এমন লোক অনেক দেখা যায় যে, কর্তব্য নির্ণয়ের সময় ইউটিলিটি বা সমাজের হিত পরিমাণের হিসাব না করিয়া সেন্টিমেন্টেরই বা ভাবপ্রবণতারই বশবর্তী হইয়া থাকে।'

লোক-সাহিত্যের অন্যতম শাখা 'ব্রত-কথার রূপ-রীতিকে রামেন্দ্রসুন্দর উচ্চতর অভিজাত আসরেও উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক প্রবন্ধের শিরোনামা ও রচনারীতি হইতে লোক-সাহিত্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর প্রীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের কার্য সম্পন্ন হইবে—এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইলে বাংলাদেশে ইহার বিরোধিতা করিয়া এক বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর বিক্ষুব্ধচিত্তে অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনেয় বিপর্যয়ে জাতির মনকে অন্তর্মুখী করিয়া বুঝিতে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব গ্রামীণ সংস্কৃতসুলভ মনোভাবপ্রসূত পরিকল্পনা যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। লোক-সাহিত্য ব্রতকথার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যে সনাতন ধারা প্রচলিত আছে, তাহারই সাদৃশ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে। পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পাশে উপবেশন করিবেন । বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখী বন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিযোগ করিবেন।'

সাধারণ ব্রতকথায় যেভাবে একটি নির্দেশনামা থাকে, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার ব্রতকথা প্রচারের

পূর্বেও সেই জাতীয় এক নির্দেশ-নির্ঘণ্টের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণোদিত অনুষ্ঠানের নিয়ম পালন-পদ্ধতির ভিতর দিয়া কোন কৃত্রিম আচরণের স্পর্শ লাভ করা যায় না। লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা ব্রতকথার রূপা রীতি ও রসকে রামেন্দ্রসুন্দর এমনভাবে আত্মস্থ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচনায় লোক-সাহিত্যের অকৃত্রিম সৌন্দর্য ও আন্তরিকতার সৌরভ অনুভূত হয়। তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধ রচনাটিও হইয়াছে অনবদ্য। লোকসাহিত্যের কোন বিশেষ ধারাকে নিয়মানুগ পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া যে উচ্চতর সাহিত্যের আসরে উন্নীত করা যায়, তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র সহিত পরিচিত না হইলে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হইল।

'বন্দে মাতরম্। বাঙ্‌লা নামে দেশ' তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্‌লেন। বাঙ্‌লার লক্ষ্মী বাঙ্‌লাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরের শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

এই সময় মধ্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম-কর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাংলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; বাংলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন,—না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে যেও না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে বসে পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালো। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাংলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গায়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাংলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।'

বাঙলা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের যে বিশিষ্ট ভূমিকা তাহা তাঁহার নিজস্ব রচনা ও সমালোচনা হইতে প্রমাণ করিতে অসুবিধা হয় না। বর্তমান কালে বাঙলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সংগ্রহ-কার্য যেমন হইতেছে, তেমনি তাহার তত্ত্ব, তথ্য ও রসগত বিচার-বিশ্লেষণের দিকেও সাধারণ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙলা লোক-সাহিত্যেরআলোচনায় যে বৈজ্ঞানিক অন্তর দৃষ্টিকে আজ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাঙলার লোক-সাহিত্য আলোচনায় যিনি সর্বপ্রথম প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তিনি যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাহা এখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

# মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার এক পল্লীগ্রামে এক শ্রোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারে গঙ্গানাথের জন্ম হয়। ঝা পরিবারের সহিত দ্বারভাঙ্গা রাজ পরিবারের আত্মীয়তা থাকিলেও গঙ্গানাথের পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ দ্বারভাঙ্গারাজ স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ একাদশ স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এই পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি, এ, ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ নব প্রতিষ্ঠিত দ্বারভাঙ্গা রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন। দ্বারবঙ্গাধিপ মহারাজা সার লক্ষেশ্বর সিংহের ইচ্ছাক্রমে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারটিকে একটি আদর্শ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করার জন্য তিনি দ্বারভাঙ্গার এই মেধাবী ও কৃতী যুবককে গ্রন্থাগারিকের পদে নিয়োগ করেন। বিদ্যাচর্চার পথ সুগম হইবে চিন্তা করিয়া গঙ্গানাথ সামান্য বেতনে এই কর্ম্মটি গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারিকের কার্য করার সময় গঙ্গানাথ দ্বারভাঙ্গা ও সন্নিহিত অঞ্চল হইতে বহু মূল্যবান সংস্কৃত ও মৈথিল পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

গঙ্গানাথ বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠাগারে কার্য করার সময় তিনি স্বাধীনভাবে হিন্দু আইন ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতশাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করার সুযোগ পান।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গানাথ দ্বারভাঙ্গা রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কর্ম করেন। এই সময়ে তিনি শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তিকল্লোলিনী নামে একটি পুস্তক রচনা করেন(১) প্রামাণ্য মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ দ্বারা এই সমস্ত গ্রন্থগুলির অন্তর্নিহিত অমূল্য রত্নরাজি সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের গোচরীভূত করাই গঙ্গানাথের জীবনের প্রধান সাধনা ছিল। দ্বারভাঙ্গায় অবস্থিতিকালেই গঙ্গানাথের এই সাধনার সূত্রপাত হয়। এই সময়েই তিনি বিজ্ঞান ভিক্ষু রচিত যোগ সংগ্রহ (২) বাচস্পতি মিশ্র রচিত সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী (৩) শঙ্করাচার্য রচিত ছান্দোগ্য উপনিষদ ভাষ্য (৪) প্রভৃতি দুরূহ দর্শন গ্রন্থ ও মম্মট ভট্টকৃত অলঙ্কার গ্রন্থ কাব্য প্রকাশ (৫) ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিদ্বৎসমাজের প্রশংসা অর্জন করেন। কৃতবিদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভের পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ এলাহাবাদের Muir College এ সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ উইলিয়ম জর্জ ফ্রেডরীখ থিবো ( Dr.

Thibant, 1848-1914 ) মুইর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৭খৃষ্টাব্দে ডাঃ থিবোর সহযোগিতায় গঙ্গানাথ 'Indian Thought' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় সাধারণতঃ দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত, ডাঃ থিবো ও গঙ্গানাথের রচনাগুলি ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯১৮ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় ( Indian Thought, 1907-1918 )

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অল্পজ্ঞাত প্রভাকর সম্প্রদায়ানুযায়ী পূর্বমীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে গবেষনামূলক নিবন্ধ লিখিয়া গঙ্গানাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অফ্ লিটারেচার' উপাধি লাভ করেন (৬)।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতসরকার গঙ্গানাথকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ে তিনি ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। এইগুলি পরে পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় (৭)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ জৈমিনী রচিত পূর্ব মীমাংসা দর্শনের সূত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন ( ৮ )। পূর্ব মীমাংসা দর্শন প্রচারে গঙ্গানাথ যে অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানানুরাগ প্রদর্শন করেন তাহার স্বীকৃতি স্বরূপ উত্তরকালে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখা কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাম্বেল স্বর্ণপদক লাভ করেন ( ১৯৩৭ )। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। প্রাতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবৎ এই কলেজে কোন ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন নাই, প্রমুখ বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাই এ পর্যন্ত এই পদে কার্য করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ "ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশনেল সার্ভিসে" ( I. E, S. ) উন্নীত হন। এই বৎসর গঙ্গানাথকে গভর্ণর জেনারেল দিল্লীর কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার পদে নিযুক্ত হন, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত নয় বৎসর কাল ধরিয়া গঙ্গানাথ অতি যোগ্যতার সহিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচলেনা করিয়াছিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে গঙ্গানাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বৎসরই তিনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় গঙ্গানাথকে ডক্টর অফ্ ল উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গঙ্গানাথ Kamala Lectures ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতামালার বিষয় বস্তু ছিল দার্শনিক শৃঙ্খলা ( ৯ )। হিন্দু আইনের উৎস সম্বন্ধে গঙ্গানাথের কতকগুলি রচনা দুই খণ্ডে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয় ( Hindu Law in its sources, 2 Vols. Allahabad 1930, 31 ) এই দুই খণ্ড পুস্তকে হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে গঙ্গানাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঙ্গানাথ ডি, লিট্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বরোদায় আমন্ত্রিত হইয়া গঙ্গানাথ শঙ্করাচার্য ও জাতি গঠনে তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে

কয়েকটি বক্তৃতা দেন, পরে এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১০)। এই বৎসর লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন (Hony fellow) গঙ্গানাথের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এই সময়ে দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যমণি রূপে পরিগণিত হইতেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার গঙ্গানাথকে Knight (Sir) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। জগতের প্রমুখ বিদ্বৎসংস্থা ব্রিটিশ একাডেমী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথকে তাঁহাদের "করেসপণ্ডিং মেম্বার" শ্রেণীভুক্ত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন স্পল্ডিং অধ্যাপক ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ব্যতীত এই সময় পর্যন্ত অন্য কোন ভারতীয় পণ্ডিত এই সম্মান লাভ করেন নাই।

আজীবন অধ্যয়নশীল গঙ্গানাথ তরুণ বয়সেই হিন্দুদর্শনের সমস্ত শাখাগুলি অতি মনোযোগ সহ অধ্যয়ন করেন। সারাজীবন শিক্ষাদান কার্যে রত থাকার সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে দুরূহ হিন্দুদর্শনের ভাষ্যগুলিও কম দুরূহ নহে, হিন্দু দর্শনগুলির সারতত্ত্ব প্রচার করিতে হইলে ভাষা সহ দর্শনগুলির ইংরাজী অনুবাদ প্রচার আবশ্যক, সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি এই সাধনাতেই ব্রতী ছিলেন এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগদর্শন সংক্রান্ত প্রায় ৫০টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শান্তরক্ষিত কৃত বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থ "তত্ত্ব সংগ্রহের" ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন (১১)। মেধাতিথির ভাষ্য সহ সমগ্র মনুসংহিতার তুলনামূলক টীকা সহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশও গঙ্গানাথের জীবনের একটি বিশেষ কীর্তি (১২)। গঙ্গানাথকৃত কয়েকটি মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ (১৩-১৬), সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ (১৭-৩১) অপরাপর ইংরাজী অনুবাদ (৩২-৪৩) এবং হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির (৪৪-৪৭) বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। এই পুস্তক তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গঙ্গানাথের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে ঝা মহাশয় অত্যন্ত সরল, সত্যনিষ্ঠ ও উদারহৃদয় ছিলেন। অধ্যাপক জীবনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন ছিলেন। ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথের ষষ্ঠীবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁহার ছাত্র, সুহৃদ ও অনুরাগীবৃন্দ তাঁহাকে একটি স্মারক গ্রন্থ উপহার দেন, এই গ্রন্থে ভারত ও বহির্ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকটি মুদ্রিত হয় (Jha Commemoration Volume—Essays, Poona, 1937)।

গঙ্গানাথের পুত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। গঙ্গানাথের জীবদ্দশাতেই তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র অমরনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। কৃতী অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ রূপে অমরনাথও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। [ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে অমর নাথের মৃত্যু হয়। ]

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে গঙ্গানাথ এলাহাবাদে পরলোকগমন করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানাথের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে এলাহাবাদেও গঙ্গানাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত এই গবেষণাকেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন

মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। গঙ্গানাথ কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি ও পুস্তকাদি এই গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত হয়। কয়েক বৎসর এলাহাবাদের হিন্দু বোর্ডিং হাউসে গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কাজ চলার পর এই ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার মরিস হ্যালেট এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানে এই ইনষ্টিটিউট নানা সংস্কৃত গ্রন্থ ও একটি ভারতবিদ্যা বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। ইনষ্টিটিউটের পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহও সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। গঙ্গানাথের মৃত্যুর পর পুর্বমীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে গঙ্গানাথের আরও একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে (৪৮)।

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক, ভারতীয় দর্শনের সার্থক মর্মব্যাখ্যাতা, কৃতী অধ্যাপক এবং একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাবিদ্‌রূপে গঙ্গানাথ ঝার নাম চিরস্মরণীয়।

---

(১) ভক্তি কল্লোলিনী—বারাণসী, ১৮৯৫
(২) যোগসংগ্রহ ( বিজ্ঞান-ভিক্ষু )—বোম্বাই, ১৮৯৪
(৩) সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ( বাচস্পতি মিশ্র )—বোম্বাই, ১৮৯৬ ; পুনা ১৯৩৪
(৪) ছান্দোগ্য উপনিষদ ভাষ্য ( শঙ্করাচার্য কৃত ), ২ খণ্ড, মাদ্রাজ ১৮৯৯
(৫) কাব্য প্রকাশ ( মম্মট ভট্ট ), বারাণসী, ১৮৯৬, এলাহাবাদ, ১৯২৫
(৬) Pravakara School of Purva Mimangsa—Allahabad, 1911.
(৭) Sadodha Lal lectures on Nyaya—Allahabad 1912.
(৮) Purva Mimangsa sutras of Jaimini—1916.
(৯) Philosophical discipline, (Kamala Lectures 1926), Calcutta—1928.
(১০) Sankaracharya and his work for the uplift of the country.
(১১) শান্ত রক্ষিত কৃত কমলশীল টিকাসহ তত্ত্বসংগ্রহ, ৩ খণ্ড, বরোদা, ১৯৩৭
(১২) Manusmriti with Medatithis commentary, 8 Vols, 1920-29. Calcutta-
(১৩) ভাবোদ্ধনী ( জয়দেব রচিত প্রসন্ন রাঘব টিকা ), বারাণসী ১৯০৬
(১৪) খদ্যোৎ—( বাৎস্যায়ণ রচিত ন্যায়ভাষ্য টিকা ), বারাণসী, ১৯২৫
(১৫) মীমাংসা মণ্ডনম্‌, বারাণসী, ১৯৩০
(১৬) প্রভাকর প্রদীপ :
(১৭) কবি কর্পটিকা ( শঙ্কর কবি ) দ্বারভাঙ্গা, ১৮৯২
(১৮) প্রায়শ্চিত্ত : কদম্ব ( গোপাল ন্যায়পঞ্চানন ), বারাণসী, ১৮৯৩
(১৯) শঙ্করাচার্য কৃত পঞ্চীকরণ, বারাণসী, ১৮৯৩
(২০) অমৃতোদয় ( গোকুলনাথ কৃত ), বোম্বাই, ১৮৯৭
(২১) মীমাংসা পরিভাষা—বারাণসী, ১৯০৫
(২২) মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ—বারাণসী, ১৯০৫
(২৩) বাদী—বিনোদ ( শঙ্কর মিশ্র কৃত )—এলাহাবাদ, ১৯১৫
(২৪) ভবন বিবেক—( মণ্ডন মিশ্র ), বারাণসী, ১৯২২-২৩

(২৫) ন্যায় কলিকা ( জয়ন্ত ভট্ট)—বারাণসী, ১৯২৫
(২৬) ন্যায় সূত্রম ( বাৎস্যায়ন ভাষ্য )—বারাণসী, ১৯২৫
(২৭) জলাশয়োৎসর্গ পদ্ধতি ( হর্ষনাথ ঝা )—বারাণসী, ১৯২৭
(২৮) তন্ত্র রত্নম্ ( পার্থ সারথি কৃত ), ১ম খণ্ড বারানসী, ১৯৩০
(২৯) মেধাতিথি কৃত মনুভাষ্য, ২য় খণ্ড, ১৯৩২
(৩০) পারিজাত হরণ ( মৈথিলী, উমাপতি উপাধ্যায় কৃত )—দ্বারভাঙ্গা, ১৮৯৩
(৩১) মাধবানন্দ ( মৈথিলী, হর্ষনাথ ঝা ), দ্বারভাঙ্গা,
(৩২) অনু শ্লোক বার্তিক ( কুমারিল ভট্ট কৃত )—কলিকাতা, ১৯০০
(৩৩) ব্যাসকৃত যোগসূত্র ভাষ্য—বোম্বাই, মাদ্রাজ, ১৯৩৪
(৩৪) তর্কভাষা ( কেশব মিশ্র ), এলাহাবাদ, ১৯১০ ; পুনা-১৯২৪
(৩৫) কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি ( বামন রচিত ), এলাহাবাদ, ১৯১২
(৩৬) খণ্ডনখণ্ড খাদ্য—২য় খণ্ড, এলাহাবাদ
(৩৭) অদ্বৈত সিদ্ধি—মধুসূদন সরস্বতী—
(৩৮) বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ ( বিদ্যারণ্য রচিত, ডাঃ থিবোর সহযোগিতায় )
(৩৯) ন্যায়সূত্র ভাষ্য—৪র্থ খণ্ড, এলাহাবাদ, ১৯১৫-১৯১৯
(৪০) ন্যায়কন্দলী সহ প্রশস্তপাদভাষ্য, বারাণসী, ১৯১৬
(৪১) তন্ত্রবার্তিক ( কুমারিল )—কলিকাতা, ১৯২৪
(৪২) মীমাংসা সূত্র ভাষ্য ( শবর স্বামী )—৩য় খণ্ড, বরোদা, ১৯৩৩-৩৬
(৪৩) বাচস্পতি মিশ্র কৃত বিবাদ চূড়ামনি
(৪৪) বৈশেষিক দর্পণ ( হিন্দী ) বারাণসী, ১৯২১
(৪৫) ন্যায়প্রকাশ " " ১৯২১
(৪৬) কবি রহস্য " এলাহাবাদ ১৯২৯
(৪৭) বেদান্ত দীপিকা ( মৈথিল ) দ্বারভাঙ্গা
(৪৮) Purva Mimangsa in its sources—Varanasi 1942

# ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্র চর্চা

## বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

মহারাষ্ট্রের চেয়েও বাংলার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গুজরাতের সঙ্গে। চেহারায়, ভাষায় ও মনোবৃত্তিতে। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা গুজরাতী পাঠক-সমাজে পরিচিতি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রমেশ দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায় এবং দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। গুজরাতী কথা-সাহিত্যের গঠনে এঁদের অল্পবিস্তর প্রভাবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়। (বাংলা সাহিত্যকে সে-যুগে যিনি গুজরাতী ভাষায় রূপান্তরিত করার গৌরব লাভ করেন, তাঁর নাম নারায়ণ হেমচন্দ্র)। পরবর্তী যুগে গুজরাতী ভাষায় অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন শরৎচন্দ্র। এই বাঙালি কথাশিল্পীর কোনো কোনো গ্রন্থের পাঁচখানা পর্যন্ত অনুবাদও প্রকাশিত হয়। আর এই অনুবাদের কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন প্রায় ডজন খানেক অনুবাদক।

গুজরাতী ভাষায় শরৎচন্দ্রের অনুবাদ শুরু হয় ১৯২১ সালে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদ হয় তার ছ'বছর আগে—১৯১৫ সালে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর একান্ত সচিব-রূপে যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই মহাদেব হরিভাঈ দেসাই "চিত্রাঙ্গদা" এবং "বিদায় অভিশাপ"-এর অনুবাদ দিয়ে গুজরাতী ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের গোড়া পত্তন করেন। তখনও ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটে নি।

কিন্তু গুজরাতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও পরিচয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। গান্ধীজী ভারতবর্ষে এলেন ১৯১৫ সালে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত তাঁর Phoenix আশ্রমের আশ্রমিকবৃন্দ শান্তিনিকেতনে ঠাঁই পেলেন অতিথিরূপে। দুই শক্তিধর পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় হল; কর্ম-সাধনায় প্রায় বিপরীত-পন্থী হয়েও তাঁরা একে অন্যকে চিনতে ভুল করেন নি।

১৯২০ সালের রাজনৈতিক কর্ম-যজ্ঞের মধ্যেও গান্ধীজী কী ভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেছিলেন, তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। এই সময়ে অমদাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাতী সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন। গান্ধীজী উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দিলেন কবিকে আহ্বান জানাতে। রবীন্দ্রনাথের সুবিধার কথা বিবেচনা করে অধিবেশনের তারিখ পরিবর্তিত হল। গান্ধীজী কবিকে লিখলেন—I sincerely hope that the Capital of Gujarat will have the honour of receiving you during the Easter. কবি গুজরাতী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিলেন, ইংরেজীতে তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন; এবং সেই ভাষণের গুজরাতী অনুবাদ করে শোনালেন স্বয়ং গান্ধীজী।

গুজরাতী সাহিত্য পরিষদ কবির সেই স্মরণীয় উপস্থিতির কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছে, এবং তার নিদর্শন স্বরূপ ১৯৬১ সালের গুজরাতী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—অমদাবাদে নয়,

গুজরাতের কোনও শহরে নয়, কবির জন্ম-নগরী এই কলকাতায়। কবির জন্ম শতবার্ষিকীতে গুজরাতী সমাজের এই শ্রদ্ধা-নিবেদন বিশেষ প্রশংসনীয়।

১৯২০ সালের পরে কবি ও তাঁর কর্ম সাধনার সঙ্গে গুজরাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত হল। বহু গুজরাতী নর-নারী শান্তিনিকেতনে আসেন বিদ্যার্থী-রূপে। নগীনদাস পারেখ, প্রহ্লাদ পারেখ, কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী—এঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। অনেকের সঙ্গে এঁরাও রবীন্দ্র ভাবধারাকে পশ্চিম ভারতে জনপ্রিয় করার কাজে ব্রতী হন। কিন্তু এক্ষেত্রে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল যে-দুটি নাম, তাঁদের একজন পরলোকগত মহাদেব দেসাঈ। দ্বিতীয় জন দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকর, সংক্ষেপে যিনি কাকা কালেলকর নামেই অধিকতর পরিচিত। এঁরা দুজনেই গান্ধীজীর অনুগামী। গুজরাতের আরও অনেক গান্ধী-ভক্ত লেখক গান্ধীজীর "গুরুদেব"কে নিজেদের গুরু বলে ভাবতে শেখেন। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ হলেন গুজরাতে "চিরপরিচিত আত্মীয় মহাপুরুষ"—যে-গুজরাতের মোগল প্রাসাদে বসে কিশোর কবি একদিন শুনতে পেয়েছিলেন ক্ষুধিত পাষাণের কান্না।

কেবল গুজরাতে নয়, গোটা পশ্চিম ভারতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন কাকা কালেলকর। মারাঠী ও গুজরাতী—পশ্চিত ভারতের দুটি ভাষাতেই তাঁর সমান অধিকার। জন্ম সূত্রে তাঁর মাতৃভাষা মরাঠী এবং কর্মসূত্রে তাঁর দ্বিতীয় "মাতৃভাষা" হল গুজরাতী। গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে কাকা কালেলকর শান্তিনিকেতনে কিছুকাল কাটিয়েছেন Visiting Professor বা অতিথি অধ্যাপকরূপে। ১৯২০ সালে অমদাবাদে অনুষ্ঠিত সেই স্মরণীয় গুজরাতী সাহিত্য সম্মেলনে কবিগুরুকে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার মহৎ গৌরব যাঁর উপর অর্পিত হয়, তিনিই হলেন এই কাকা কালেলকর। **গুজরাতী** জনসমাবেশে **বাঙালি** কবির পরিচয় দিলেন **মরাঠী** পণ্ডিত। গুজরাতী ভাষায় কালেলকরের সেই প্রথম রচনার রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ অপেক্ষা ব্যাখ্যার কাজেই ইনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মরাঠী ও গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত অনেক রবীন্দ্র-গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কালেলকর। এই সমস্ত ভূমিকাসহ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯৬১ সালে গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত হয় কালেলকরের বিশিষ্ট গ্রন্থ—"রবিছবিনুঁ উপস্থান অনে তর্পণ।" তার কথা বলা হবে আলোচনা পর্বে।

## গুজরাতী গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী গুজরাতী ভাষায় গীতাঞ্জলি প্রকাশের কালানুক্রমিক বিবরণ হচ্ছে এইরূপ :

| প্রকাশকাল | অনুবাদক |
|---|---|
| ১৯১৮ | মণিভাঈ হরিভাঈ দেসাঈ |
| ১৯১৯ | কানুবহেন দবে |
| ১৯১৯ | নন্দকুঁবার বা |
| ১৯২৩ | রামচন্দ্র অধ্বর্যু |

| প্রকাশকাল | অনুবাদক |
|---|---|
| ১৯২৮ | সুরথ গান্ধী সাহিত্য মন্দির ( প্রকাশক ) |
| ১৯৪২ | নগীনদাস পারেখ |
| ১৯৫০ ( ৩য় সং ) | মণিশংকর রত্নজী ভট্ট |
| ১৯৫৬ | গৌরীশংকর গোবর্ধন জোষী |
| ১৯৫৮ | গাণ্ডাভাঈ দেসাঈ |
| ১৯৫৮ | গুরুদয়াল মল্লিক |

উল্লিখিত দশখানি গ্রন্থের মধ্যে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্য শেষোক্ত চারখানি মাত্র দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। নগীনদাস পারেখের "গীতাঞ্জলি" আমরা দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁর অনুবাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত গুরুদয়াল মল্লিকের গ্রন্থে। বস্তুত গুরুদয়াল মল্লিক 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ করেন নি, আলোচনা করেছেন। এবং তাঁর সেই আলোচনা-গ্রন্থের নাম "গীতাঞ্জলি : এক অধ্যয়ন।" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে নগীনদাস পারেখের অনুবাদ থেকে। ২১টি নিবন্ধ-বিশিষ্ট এবং ৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্রীমল্লিকের গ্রন্থের নিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯২০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এবং সুযোগ-সুবিধামতো পূজনীয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর সঙ্গে গুরুদেবের গীতাঞ্জলি সম্পর্কে আলোচনা করে যথেষ্ট উপকৃত হন। শ্রীমল্লিকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু বলার স্থান এ নয়। আমরা নগীনদাস পারেখের অনুবাদ সম্পর্কে দু'এক কথা বলছি।

নগীনদাস পদ্য-ছন্দে অনুবাদ করেছেন এবং সে-অনুবাদ যথাসম্ভব মূল্যানুযায়ী। ধরা যাক প্রথম কবিতাটি—Thou hast made me endless, such is thy pleasure. এই অংশের endless এবং pleasure শব্দ দুটির মূলে আছে 'অশেষ' এবং 'লীলা'। নগীনদাস লিখেছেন—

তেঁ তো মনে **অশেষ** বনাব্যো এবী ছে তব **লীলা**······৪৯ সংখ্যক কবিতার ইংরেজী, বাংলা ও গুজরাতী সংস্করণ পাশাপাশি তুলে দিলেই নগীনদাসের মূলানুগত্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ইংরেজী : Yoo came down from the throne and stood at my cottage door.

বাংলা : **তব সিংহাসনের আসন** হতে এলে তুমি নেমে—
মোর **বিজন ঘরের দ্বারের** কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।

গুজরাতী : **তব সিংহাসন না আসন** থী আব্যো তুঁ উতরীনে,
মুজ আ **বিজন ভবন নে দ্বারে** উভো তুঁ থংভীনে।

নগীনদাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। মণিশংকর রত্নজী ভট্টের অনুবাদের যে-দুটি সংস্করণ আমরা দেখেছি তার প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৫০ ( তৃতীয় সংস্করণ ) এবং ১৯৫৮ ( চতুর্থ সংস্করণ )। প্রথম প্রকাশকাল তাতে দেওয়া নেই বটে, কিন্তু প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে : "গুজরাতের মহান্ 'চিন্তক', সাহিত্যকার এবং কবিশ্রী মণিশংকর রত্নজী ভট্ট ভারতের মহান্ কবি ও গান্ধীজীর 'পরমস্নেহী' শ্রীরবীন্দ্রনাথ টাগোরের বিশ্ববিখ্যাত কৃতি গীতাঞ্জলিকে আজ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির **ত্রিশি** বছর পরে সরল এবং 'রসিক' ভাষায় গুজরাতী জনসাধারণের সামনে উপস্থিত

করছেন।" নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির তিরিশ বছর পরে হলে এই গ্রন্থের প্রকাশকাল দাঁড়ায় ১৯৪৩ অর্থাৎ নগীনদাসের গীতাঞ্জলি-প্রকাশের এক বছর পরে। নগীনদাসের বাংলা-নির্ভর অনুবাদ হয়েছে পদ্য-ছন্দে, আর মণিশংকরের ইংরেজী-নির্ভর অনুবাদ হয়েছে গদ্যে।

ইংরেজী-নির্ভর আর একটি গদ্যানুবাদ করেছেন গৌরীশংকর গোবর্ধনরাম জোষী—"ধূমকেতু" ছদ্মনামে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে গুজরাতে যিনি আজ অসামান্য কীর্তির অধিকারী। অনুবাদের সঙ্গে 'ধূমকেতু'র নাম অঙ্কিত থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। এর যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই পীড়াদায়ক ত্রুটি। এই গুজরাতী গীতাঞ্জলির আগাগোড়া রঙ্ চঙে সাজানো, অনেকটা মেঘদূতী বা ওমর খৈয়ামী ধরণে। গ্রন্থের সূচনায় গুজরাতী লিপিতে একটি মূল বাংলা কবিতা মুদ্রিত। কিয়দংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি :

জে গান কানে জায় না শোনা,
শে গান জে থায় নীত্য বাজে
প্রাণের বীণা নীয়ে জাবো
শেই অলতের শাভার মাঝে……ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে কবিতা সাজানোর ক্ষেত্রে কোনও ক্রম মানা হয় নি। এতে না আছে মূল Gitanjali-র অনুসরণ, না আছে অনুবাদকের নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অগোছালো, অথচ তার সূচীপত্রও কিছু নেই। প্রস্তাবনায় অনুবাদক জানিয়েছেন যে, তিনি 'অক্ষরশ' বা 'শব্দশ' অনুবাদ করেন নি। কারণ তা করতে গেলে রচনার ক্লিষ্টতা ও অস্পষ্টতা অনিবার্য হয়ে উঠতো ?

ভাবানুবাদে আমাদেরও আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি আছে তার বিকৃত প্রকাশ-ভঙ্গিতে। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে'—এই অংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য চারটি, ইংরেজীতে তিনটি—Chanting and singing and telling of beads. সংখ্যা যাই হোক, কোনোটি অনুবাদে 'রঘুপতি রাঘব'-এর কথা আসতে পারে না, আসা উচিত নয়। বস্তুত মণিশংকরে অনুবাদে আসেনি তিনি লিখেছেন :

'আ **ভজন** অনে **গায়ন** অনে **মালা ফেরববানুঁ** ছোড়ী দে।' এবার 'ধূমকেতু-র অনুবাদ দেখুন :

'আ বধী মালা নে **মালা** নে **প্রার্থনা** নে **রঘুপতি রাঘবনী ভজনধুনো** হবে বংধ্ করো।' আমি গান্ধীবাদী নই, রঘুপতিরাঘবের ভক্তও নই, কিন্তু আমার পক্ষেও রবীন্দ্রকাব্যের এই ধরণের অনুবাদ বরদাস্ত করা শক্ত। 'ধূমকেতুর অনুবাদে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল আরবী ফারসীর প্রতি অনুবাদকের অতিরিক্ত ঝোঁক। Ihave had my invitation this world festival—চুয়াল্লিশ সংখ্যক এই কবিতার অনুবাদে মণিশংকর লিখছেন : আ **সংসার না উৎসবমাঁ** মনে আমংএণ মলুঁ্য ছে…। ধূমকেতুর অনুবাদে আছে : আ **দুনিয়ানী মহেফিলমাঁ** মনে পণ নোতরুঁ মলুঁ্য ছে…।

গুজরাতী ভাষায় গীতাঞ্জলির একটি দোষেগুণে-স্মরণীয় অনুবাদ করেছেন গাণ্ডাভাঈ দেসাঈ।

এই অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। হরিগীত, শিখরিণী, বসন্ততিলক, অনুষ্টুপ্, মালিনী, তোটক, মন্দাক্রান্তা, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, শার্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, ঝূলনা, সরৈয়া ইত্যাদি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নানা ছন্দের মালায় গীতাঞ্জলিকে গাঁথা হয়েছে। মাঝে মাঝে একই কবিতায় একাধিক ছন্দ ব্যবহৃত। 'তখন আকাশ তলে ঢেউ তুলেছে' ( নিরুদ্যম—খেয়া )—৪৮ সংখ্যক এই কবিতাটির ছয়টি স্তবক অনুবাদে ছয়টি ছন্দে গ্রথিত,

মূল গ্রন্থ শুরু হওয়ার আগে অনুবাদক গাণ্ডাভাঈ চার-পক্তি-বিশিষ্ট স্তবকের ৫২টি স্তবকে অর্থাৎ ২০৮ ছত্রে 'গীতাঞ্জলি-মধু' নামে একটি সুদীর্ঘ স্বরচিত কবিতা মুদ্রিত করে গীতাঞ্জলি তথা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন গাণ্ডাভাই তাঁর গুজরাতী গীতাঞ্জলিকে বলেছেন 'অনুগান'। অর্থাৎ বাঙালি কবির গান থেকে প্রেরণা গুজরাতী কবি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে গান রচনা করেছেন। সুতরাং এ গ্রন্থ ভাবানুবাদের পর্যায়ে পড়ে, নগীনদাসের মতো বিশ্বস্ত অনুবাদ নয়। ইতিপূর্বে একাধিক ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির ভাবানুবাদের দোষগুণ দুই-ই আমরা দেখেছি এক্ষেত্রেও দেখব।

পঞ্চম কবিতাটি ধরা যাক। নগীন দাসের অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুযায়ী। কিন্তু গাণ্ডাভাঈ ইংরেজী গানের অনুসরণে গুজরাতী 'অনুগান' রচনা করেছেন। মূল ও অনুবাদ পরপর তুলে দিচ্ছি।

বাংলা :　　তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
　　　　আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
　　আজি হাতে আমার যা-কিছু আছে
　　　　আমি সাঙ্গ করব পরে।

ইংরেজী : I ask for a moment's indulgence to sit by the side. The works that I have in hand I will finish afterwards.

নগীন দাস :　ক্ষণভর বেসূঁ হুঁ তব পাশে,
　　কাম পড়্যাঁ ছে বাকী জে তে পাছলথী থঈ জাশে।

গাণ্ডাভাঈ ( শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে ) :
　　কার্যোনা ব্যবসায়মাঁ ভটকতী আ জিন্দগী মাহরী,
　　শুঁ ছে কার্য শুঁ? নহি কদী পূরুঁ পিছানী শকী।
　　থাক্যো হুঁ, প্রিয়দেব! এ মুংঝবণে, না কার্য ব্হাললঁ মনে,
　　গোবিন্দ! পল এক রাখ পডখে, কার্যো পছী সৌ থশে।

গাণ্ডাভাঈ কৃত অনুবাদ পড়তে পড়তে পাঞ্জাবী অনুবাদক নরেন্দ্র সিং-এর কথা মনে আসে। অবশ্য গুজরাতী অনুবাদক গাণ্ডাভাঈ নরেন্দ্র সিং-এর মতো অতটা অসংযত হন নি। তিনি কোথাও বাড়িয়েছেন, কোথাও কমিয়ে দিয়েছেন। অনুবাদ কোথাও দীর্ঘতর, কোথাও হ্রস্বতর। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" কবিতার অনুবাদে গোড়ায় দুটি অতিরিক্ত স্তবক বসানো হয়েছে। আবার "কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো" কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক বর্জিত হয়েছে। এ অবস্থা

সর্বত্র নয়। তাছাড়া ঈষৎ পরিবর্তনের সাহায্যে গুজরাতী কবি কোনো কোনো স্থানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য" কবিতাটি একটি বাক্যের রচনা। অনুবাদক সমস্ত কবিতাটিকে তিনটি স্তবকে ভাগ করে প্রত্যেক স্তবকের শেষে দিয়েছেন—"পিতঃ! ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত"—

পিতা! জাগো মারু প্রিয় ওয়তন তে মুক্তিস্বরগে! এতে মূলের রস অনুবাদে ঘনীভূত হয়েছে বৈ তরল হয়নি।

সত্যেন দত্তের পরে বাঙালি কবিও কাব্য পাঠকের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের চর্চা বড় একটা নেই। মন্দাক্রান্তা তাঁদের কাছে ম্যুজিয়মের বস্তু। অথচ গুজরাতী অনুবাদক "ভজন পূজন সাধন আরাধনা"-র মতো কবিতাকেও মন্দ্রাক্রান্তায় পরিবেশন করতে দ্বিধা বোধ করে নি। ব্যাপারটা কৌতুকাবহ বলেই প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি :

ছোডী দে আ স্তবন করবা- মন্ত্র উচ্চারবা আ,
রে'বা দে আ জপতপ বধাঁ, ত্যাগ আ অক্ষমালা ;
শোধে কোনে ? তুজ প্রভু নথী বন্ধ্ আ মন্দিরে মন্দিরো না
খূণে আহীঁ বিজন তিমিরে ; নেত্র তুঁ খোল তাঁরা।

গঙ্গাভাঈ-কৃত অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করতে হয় এই কারণে যে, যেখানে মণিশংকর প্রভৃতি অনুবাদকগণ গুজরাতী গদ্যে গীতাঞ্জলির রস ও আবেগ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছেন, পদ্যছন্দে ইনি সেখানে রস ও আবেগের সঙ্গে অর্থের স্বাভাবিক দ্যোতনাকেও মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছেন। আমরা কেবল একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। "যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই"—এই কবিতার প্রথম ও শেষ দুটি ছত্রের অনুবাদে মণিশংকর লিখলেন :

"জ্যারে হুঁ অহীঁথী জাউ, ত্যারে আ মারো ছেবটনো। সন্দেশ থাও কে, জে মেঁ জোয়ুঁ ছে তেথী কশুঁ চডী শকে নহি…অহীঁ জো অন্ত্ আবতো হোয় তো ভলে আবো—আ মারো ছেবটনো সন্দেশ থাও।"

এই অনুবাদে ভাবের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিতার প্রাণস্পন্দনকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে। গাণ্ডাভাই এ দিক থেকে অনেকটা সফলকাম। হরিগীত ছন্দে তিনি লিখেছেন :

"জোয়ুঁ অহীঁ জে জীবনে তে দর্শনে অনুপম রহো।"
জাতাঁ অহীঁ থী অন্ত্ না উদ্‌গার মারা এ হজো!……
"নে মৃত্যু আবে জো হবে তো তে নিরান্তে আবজো!"
জাতাঁ অহীঁ থী অন্ত না উদ্‌গার মারা এ হজো!

# বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ

**চণ্ডী লাহিড়ী**

ইতিপূর্বে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের আগমনের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ও তাদের সঙ্গে সংযোগের ফলে কিভাবে ভাষাক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল তার আলোচনা করেছি। বাংলা ভাষার শব্দাবলীর মধ্যে পর্তুগীজ শব্দের প্রাধান্য আজও অক্ষুন্ন আছে। কেন সেটা সম্ভব হয়েছে তা পূর্ব প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এবার শব্দগুলি পরীক্ষা করা যাক।

Alcatrao (tar)—মূল শব্দ আর্বী আলকাত্‌রাণ্‌ কিন্তু বাংলায় শব্দটি পর্তুগীজদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। আলকাতারা।

Alfinate—আলপিন্‌। ইংরেজী পিন্‌ এসেও আলপিনকে হটাতে পারেনি।

Anona—নোনা-আতা।

Ananas—আনারস! ব্রেজিলে Nanas নামে পরিচিত। কেবল রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য আনানাসকে আনারস বানানো হয়েছে।

Aya—অর্থাৎ ঝি। দাসী বা চাকরাণীর চেয়ে আয়া বেশী চালু।

Banana- শব্দের অর্থ যে কলা সেটা সবাই জানেন। কিন্তু ব্যানানা দেশী ইংরাজীতেই কেবল চালু। ইংরেজরা বলে প্ল্যানটেন। পর্তুগীজেরা কলা এদেশে আমদানী করেনি। কিন্তু শব্দটি আর্বী 'ব্যানান' থেকে ধার করে ব্যানানা বলে চালু করেছে। আর্বী 'ব্যানান' কথাটির অর্থ আঙ্গুল। আঙ্গুলের মত দেখতে যে ফল তারই নাম হল ব্যানানা। এটা রবার্টসন স্মিথের মত। ডেলগাডো এ অভিমত স্বীকার করেন নি।

বেনিয়ান—সংস্কৃত বণিক। গুজরাটে বলত বানিয়া বা বেনিও। ইউলের মতে আরব বণিকদের কাছে প্রথম পর্তুগীজরা শব্দটি শোনে। গুজরাটীরা ব্যবসাসূত্রে আরব ও পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসে। সুরাটে ইংরেজ ও ডাচরা গুজরাটী বণিকদের সাহচর্য লাভ করে। ধর্মে হিন্দু, সেজন্য প্রাচীন রীতি অনুসারে তারা দিনে বহুবার স্নান করত। এই স্নানের জন্যই ভিন্‌সেন্‌ জো গুজরাটীদের নাম দিয়েছিলেন বাগনানী। ইতালিয়ানে বাগনেয়ার মানে হল স্নান করা। কলকাতায় যাদের বেনিয়ান বলত তারা ঠিক ব্যবসায়ী নয়, তাদের বলা যায় দালাল। কোম্পানীর সঙ্গে কারবারে তারাই হত মধ্যস্থ। পরবর্তীকালে কোম্পানীর নতুন কর্মচারীদের টাকা ধার দিত এই বেনিয়ানরাই।

বেনিয়ান-ট্রি—কথাটির অর্থ যে বটগাছ সেটা সবাই জানে। বার্নিয়ে তার ভ্রমণ কাহিনীতে বলেছেন—"ফিরিঙ্গীরা এই গাছকে 'বেনিয়ানদের-গাছ' আখ্যা দিয়েছে। কারণ যেখানেই এই গাছ আছে সেখানেই বেনিয়ানরা এই গাছের তলায় সমবেত হয় ও রান্না করে। তারা এই গাছকে খুব ভক্তি করে এবং এর তলায় বা এই গাছের কাছাকাছি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

Bacio—বাসন। থালা বা পাত্র বলেও কাজ চালানো হত। কিন্তু বাসন শব্দটির ব্যবহারও কম নয়।

Biscoito—বিস্কুট এদেশে এসেই পর্তুগীজরা চালু করেছিল। বাষ্টারহেডা বলেছেন, আলফানসো আলবুকর্ক ( গোয়ার গভর্ণর ও ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি ) দিউতে মালিক ও আয়াজের সঙ্গে বিস্কুট (bizcoito) তৈরীর বন্দোবস্ত করেন। কারণ সেখানে গম হত প্রচুর। বিস্কুট তৈয়ীর জন্য আনড্রেড নামক এক খৃষ্টধর্মে সদ্যদীক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

Boiao—( বাংলায় বোয়েম বা পাত্র )।

Botelha—( বোতল ) পর্তুগীজ বা ইংরেজী বট্‌ল্‌ থেকেও আসতে পারে।

Cadeira—কেদারা। ইংরেজী চেয়ার।

Botao—বোতাম। ইংরেজী বাটন্‌ পরে প্রচলিত। বোতাম ভারতীয় পোষাকে পূর্বে ব্যবহৃত হত না। সূতো বা দড়ি দিয়ে বেঁধে কাজ চালানো হত।

Caju—বাংলায় বলা হয় কাজু বাদাম। ইংরেজীতে কেশু নাট। ব্রেজিলে বলা হয় আকাজু। পর্তুগীজরা সেখান থেকেই ভারতে আমদানী করে ও অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে এই গাছ এদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ডাচ্‌ পর্যটক লিনসোটেন ১৫৯০ সালেই কাজু বাদামের গাছ এদেশে বিপুল পরিমাণে জন্মাতে দেখেছেন।

Camisa—কামিজ। জামা। জেণ্ট জেরোম তাঁর এপিষ্টল টু ফেবিওলা গ্রন্থে কামিজের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ল্যাটিন থেকেই আরবরা কামিজ কথাটি গ্রহণ করেছে।

কানা ডা বেঙ্গলা—বাংলা দেশের বেত। ইওরোপে পর্তুগীজদের কল্যাণে একদা জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা দেশের বেত দিয়ে তৈরী বেড়াবার ছড়ি ছিল পর্তুগালের বিলাস সামগ্রী।

Canja—পান্তাভাত, বা চালের খুদ দিয়ে তৈরী ভাত। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কাঞ্জি মানে হল ভাতের ফেন। সম্ভবতঃ পর্তুগীজেরা এই অর্থেই করেজা কথাটি গ্রহণ করেছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজীতেও কোন্‌জি কথাটি একই অর্থে ব্যবহৃত।

Capa—বিশেষ ধরণের পোষাক। এখনও কেপ কথাটি প্রচলিত। আর্বী শব্দ হল কাবা, জাপানে বলে কাপ্পা। মূল পর্তুগীজ কাপা। Capitao—কাপ্তান, ইংরেজী ক্যাপ্টেন।

Caril—কারী, তরকারী। তামিলে কারি, মারাঠীতে কাঢ়ি। সম্ভবতঃ মারাঠা কাঢ়ি থেকেই পর্তুগীজরা কারিল করে প্রয়োগ করেছে। শব্দের শেষে 'এল' থাকায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ মারাঠা কাণ্ডি কথাটি পর্তুগীজে কাণ্ডিল হয়েছে। যার ইংরেজীতে হয়েছে ক্যাণ্ডেল।

Carrane—কেরাণী। কারাণী শব্দের আসল অর্থ হল এজেণ্ট বা ফ্যাক্টর। জাহাজ থেকে যে সব মাল আমদানী হত তার হিসাব রাখা কোম্পানীর পক্ষে থেকে তার তদারকী করাই ছিল কারাণীদের কাজ। বাংলা দেশে কেরাণী অর্থে ক্লার্ক বোঝায়। ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্যকার্যে সুবিধার জন্য যে সব সহকারীদের আনতেন তারা ছিল রাইটার। পরে এদেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যখন রাইটাররূপে নিয়োগ করা সুরু হয় তখন হীন অর্থে তাদের রাইটার না বলে কেরাণী বলা হত। মালয়ালীতে কারেণা, হিন্দুস্তানীতে কারাণী, ও আদি সংস্কৃতে করণ বা করণিক শব্দ আছে। এর থেকেই কেরাণী শব্দটির উৎপত্তি।

Cartucho—কার্তুজ, ইংরেজী কার্টি্‌জ।

Cha—চা—ইংরেজী টি। সবাই জানেন, চা-এর উৎপত্তি চীনদেশে। ঐ চীনেই চা এবং টি উভয় শব্দ দুটি স্বতন্ত্র মহলে প্রচলিত। মাণ্ডারিণ অর্থাৎ চৈনিক রাজপুরুষরা যে চীনা ভাষায় কথা বলেন তাতে বলা হয় চা। আর ফুকিয়েনে বলা হত তে। ইওরোপীয় উচ্চারণেতে হল টে বা টি। চা-কথাটি জাপান, ইন্দোচীন, পর্তুগাল, গ্রীস ও রাশিয়ায় প্রচলিত হয়। আর টি কথাটি অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় এবং ভারতের চারটি ভাষায় ( তেলেগু, মালয়ালম্, তামিল ও সিংহলী ) প্রচলিত হয়। ভারতের সঙ্গে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী হলেও চা কবে এসেছিল এবং সরাসরি চীন থেকে ভারতে এসেছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে একথা ঠিক চা-কে এদেশে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে পর্তুগীজদের মূল্যবান ভূমিকা ছিল। মাকাও ও চীনের অন্যান্য ঘাঁটি থেকে চা নিয়মিতভাবে আমদানী করত পর্তুগীজরা। মাণ্ডেলস্লো তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে (১৬৩৮) লিখেছেন যে সুরাটে প্রতি সাধারণ বৈঠকে তাঁরা চা ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না এবং ভারতে চায়ের ব্যবহার খুব সন্দেহ নেই, ভারতস্থ ইওরোপীয় মহলে চায়ের প্রচলন সে সময় ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। কিন্তু সাধারণ ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে চা পানের বিরুদ্ধে সংস্কার ছিল প্রবল। বাংলাদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে চা-কে জনপ্রিয় করবার জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করতে হয়েছে এবং তাতেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমর্থন পাওয়া যায়নি।

ইওরোপে চা কথাটি প্রচলন করে পর্তুগীজরা। তারা মাকাওতে চায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। Te বা Tea ইওরোপে প্রচলন করে ডাচ বণিকরা। তারা মালয় বা বাণ্টামে এর স্বাদ পায়। মেয়ারের কনভারসেসন-লিক্সিকোনের মতে পর্তুগীজরা ১৬৫০-১৬৫৫ সালের মধ্যে ইওরোপে চায়ের প্রচলন করে।

Batata—রাঙ্গালু। রাঙ্গালু অর্থাৎ মিষ্টি আলু দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এদেশে পর্তুগীজরাই আমদানী করে। এদেশেও বাটাটা নামটিই বহাল থাকে কিছুদিন। পরে ইংরেজরা পটেটো বা গোল আলু আমদানী করে। রাঙ্গালুর পুরো নাম হল বাটাটো ডোস অর্থাৎ মিষ্টি আলু। পরে সুরাটের ইংরেজরা যখন গোল আলু আমদানী করল তখন পর্তুগীজরা তার নাম দিল বাটাটো ডি সুরাটী বা বাটাটো ডি ইংলেস। দেশী আলু যা ছিল একালে তা অখাদ্য বলে পরিগণিত। খাম আলু, চুবরী আলু ইত্যাদি এখন আর বাজারে দেখা যায় না।

Chave—চাবি। ইংরেজী 'কী'। Chocolate—চকোলেট।

Cobra—গোখরো সাপ। ফ্রানসিস্কো ডি সুজা তাঁর ওরিয়েণ্টাল কনকুইষ্টাডো গ্রন্থে এই সাপের নাম কেন 'কোব্রা ডি কাপেলো' বলা হত তার কাহিনী শুনিয়েছেন। একদা জনৈক রোমান অধ্যাপক এক পর্তুগীজ নাবিকের কাছে এই সাপের বর্ণনা শোনেন। সাপের ফণা, তার সঙ্কোচন-প্রসারণের কথা বর্ণনাকালে পর্তুগীজ নাবিকটি কাপেলের সঙ্গে তুলনা করে। ইতালীয়ানে কাপেলো শব্দের দুটি অর্থ—রমণীর মাথার পরচুলা এবং মেয়েদের মাথার টুপি। পর্তুগীজটি ব্যাখ্যা করে বলেছিল ফরাসী মেয়েদের মাথার মত দেখতে সাপের ফণা ; মনে হয় ববছাঁট চুল দিয়ে মাথাটি ঢাকা।

রোমান ভদ্রলোকটি তাঁর গ্রন্থে কোব্রার যে ছবি দিয়েছিলেন তাতে তার সর্বাঙ্গে চুল ছিল

"বোধ করি ভালুকের গায়েও এত চুল থাকেনা। আমরা সেই বিচিত্র সাপের ছবি দেখে পরবর্তী কালেও হেসেছি।"

Chilly—লাল লঙ্কা। একদা দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাজ্য থেকে এই লঙ্কা আমদানী করা হয়েছিল। এদেশে ছিল গোল-মরিচ বা ব্ল্যাক পেপ্পার।

Gamela—পর্তুগীজরা কেবল কাঠের বড় পাত্রকেই গামলা বলত। এদেশে মাটি বা পিতলের পাত্রকেও গামলা বলা হয়।

Janela—জানালা। ইংরেজী উইণ্ডো। সংস্কৃত অলিন্দ।

Leilao—নীলাম। নীলাম আদৌ ভারতীয় ব্যাপার নয়। ইংরেজরা যদিও অকসন সেলে দ্রব্যাদি কিনে থাকে তথাপি তাদের জাতীয় চরিত্রে পূর্বে নীলামের তেমন প্রবল প্রভাব ছিলনা। ইংরেজ দোকানদারের জাতি, পর্তুগীজ নীলামদারের জাতি, যেখানেই পর্তুগীজ সেখানেই নীলাম। কেউ মারা গেলে বা দূরবর্তী কোনস্থানে বদলী হলে তার যাবতীয় দ্রব্য নীলামে বিক্রী করাই পর্তুগীজ রীতি। পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস কেনার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই বলেই তারা মনে করে। ডাচ পর্যটক লিনসোটেন ১৫৯৮ সালের গোয়ার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—গোয়ায় ভাইসরয়ের সম্পত্তি পর্যন্ত নীলামে বিক্রী হয়। সেখানকার সর্বত্র নীলামঘরের সাইনবোর্ড। তিনিই মন্তব্য করেছেন—যেখানেই পর্তুগীজ সেখানেই নীলাম।

Meia—মোজা, ইংরেজী সকস্।

Mesa—টেবিল। কিছুদিন পূর্বেও টেবিলকে মেজ বলা হত। মেজ আসলে পর্তুগীজ মেসা।

Mosquito—মশা। প্রাচীন পর্তুগীজ শব্দ মশ্‌কা। অবশ্য সংস্কৃতে মশক বলে যে শব্দ আছে, তার সঙ্গে মশ্‌কার কোন সংস্রব নেই। ব্রেজিলে উপনিবেশ স্থাপনের সময় পর্তুগীজরা এক শ্রেণীর পতঙ্গের আক্রমণে জর্জরিত হয়। সে পতঙ্গ আদৌ মশা নয়। পর্তুগীজরা সেই মারাত্মক পতঙ্গকে বলত মসকুইটো। পরে মোরেস সিলভা (১৫১৬) যখন ভারত সম্পর্কে অভিধান লিখতে বসলেন তখন মশার পর্তুগীজ প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে মশকুইটো বলে অভিহিত করলেন। তিনি লিখলেন—এ দেশের বেনিয়ারা দিনে বা রাত্রে প্রদীপ জ্বালায় না। কারণ প্রদীপের আগুনে একশ্রেণীর মশকুইটো পুড়ে মারা যায়।

Popaia—পেঁপে। আফ্রিকা ও এশিয়ায় পেঁপের প্রচলন পর্তুগীজদের মারফৎ। আফ্রিকার কেপ ভার্ডি ও এঙ্গোলায় ব্যাপকভাবে পেঁপের চাষ হয়। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে পর্তুগীজরা ভারতে পেঁপের আমদানী করে। ডাচ পর্যটক লিনসোটেন ১৫৯৭ সালেই ভারতে পেঁপে দেখেছেন ও পেঁপের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। অথচ ১৫৯০ সালের আইন-ই-আকবরীতে পেঁপের উল্লেখ করেননি। ওভিডোর (১৫৩৫) মতে পেপেইয়া কথাটি কিউবায় প্রচলিত। দক্ষিণ আমেরিকার বহু রাজ্যে এই ফলকে মামা বলা হয়। পাপ শব্দটির ( স্পেনীয় শব্দ ) অর্থ স্ত্রীলোকের স্তন, সামঞ্জস্য হেতু, পেপে নামকরণ হয়েছে।

Pipa—পিপে, ইংরেজী ব্যারেল। Pena—কলম, ইংরেজী পেন। Pistola—পিস্তল।

## নাটকে বাদ্যপ্রয়োগ—প্রাচীনকাল

ভরত মুনির সময় সঙ্গীত ও নাটক ছিল অঙ্গাঙ্গী। সঙ্গীতকে বলা হত নাট্যশয্যা এবং নাট্যশাস্ত্র সংকলনের রীতি ও তার অধ্যায় সন্নিবেশ সেই কথাই প্রমাণ করে; নাটকের মধ্যে সঙ্গীত প্রয়োগ ও তার পরিকল্পনাই সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে উক্তি। পরবর্তীকালের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ সেই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নয়। সঙ্গীত পারিজাত বা সঙ্গীত রত্নাকরে নাটকের সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীত বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়েছে। মোটকথা ভরতমুনির কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি পড়ে দেখলে একথা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগই ছিল ভরত মুনির কালে সঙ্গীতের প্রধান প্রয়োগ ক্ষেত্র যদিও পরবর্তীকালে ক্রমশঃ নাট্যনিরপেক্ষ সঙ্গীতের বহুল প্রচলন হয়েছিল।

ভরতমুনির সময় নৃত্য, গীত এবং বাদ্য এই তিনটি সঙ্গীতের বিভাগ ছিল বটে তবে নৃত্য ছিল নাট্যধর্মী এবং গীত ও বাদ্যের সহযোগেই পরিবেশিত হত। গীতের যে স্বাতন্ত্র্য ছিল বাদ্য বা নৃত্যের তা ছিল না। শার্ঙ্গদেবও "বাদ্যং গীতানুবর্তীচ" এই কথা বলেছেন। তাছাড়া ভরতমুনি বা শার্ঙ্গদেবও গীত সম্পর্কে যে ঢালাও আলোচনা করেছেন গীত নিরপেক্ষ বাদ্য সম্পর্কে সে রকম আলোচনা করেননি।

প্রাচীন ভারতে নাট্যনিরপেক্ষ বাজনার উদাহরণ কদিচ পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক নাটকের আরম্ভে অনেক রাত্রে রেভিলার গৃহপ্রত্যাগত চারুদত্তের মনের উপর বীণাবাদনের প্রভাববিস্তারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বীণা বাদন নিশ্চয়ই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়,—কেন না বাসভবন নাট্যশালা নয়। তবে নাচের সহযোগীতায় বাজনা হলেও হতে পারে যদিও সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। এ ছাড়া নাটকে বা কথিকায় একক যন্ত্রবাদনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ বাদ্যযন্ত্রব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুঁজতে গিয়ে অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত কাব্যের একাংশ চোখে পড়ে। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ পর্যায় বর্ণনার সময় সুপ্ত সহচরীবর্গের ভঙ্গিমা উল্লেখ প্রসঙ্গে বেণু, বীণা ও পুষ্কর অথবা মৃদঙ্গ, পবন, দর্দুর ইত্যাদি ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এই যন্ত্রগুলি বাজাতে বাজাতে সহচরীরা নিদ্রাভিভূতা হয়েছিলেন এই রকম চিত্র আঁকা হয়েছে।

বিগত ১৫ বা ১৬ শতক থেকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে গীত নিরপেক্ষ বাদন আদরণীয় হয়েছে। অধুনা বীণা, সেতার, সরোদ ইত্যাদি তন্ত্রী যন্ত্রের ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বাজানো হচ্ছে। এই সমস্ত বাজনা তবলা সঙ্গত সহযোগে পরিবেশিত হলেও "মনোটোনাল" বলা চলে। সম্বাদী সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি স্বরবিন্যাসে রাগ রাগিণীর প্রয়োগ ও বিস্তারের সহযোগীতায় পরিবেশিত বাক্য বা পদ নিরপেক্ষ এই রাগ বা রাগিণী সঙ্গীতকে ক্রমশঃ রস সৃষ্টির তাগিদ থেকে রূপ সৃষ্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ

করছে। রাগরাগিণীর রূপ থেকে রস সৃষ্টি সম্ভব হয় বটে তবে নির্দিষ্ট রস সৃষ্টি হয় না। ইমন বাজনা শোনবার পর শ্রোতাদের মানসে রূপ সৃষ্টি হয় বটে তবে রসসৃষ্টি বিভিন্ন শ্রোতার কাছে বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের ইমন রাগ সম্বলিত গানগুলির রসবস্তু বিভিন্ন এবং তার প্রকাশ কেবল সুরের মধ্যে দিয়ে নয়—পদবিন্যাস, ছন্দ, লয় এই সবগুলিই রস সৃষ্টি কাজে যোগান দিচ্ছে।

প্রাচীন কালের যন্ত্রসঙ্গীতকে একক বাদ্য হিসাবে শার্ঙ্গদেব 'শুষ্ক' এই আখ্যা দিয়েছেন। নাট্যসঙ্গীতের মধ্যে যন্ত্র সঙ্গীতের যেমন প্রধানতঃ গীত বা নৃত্যের আনুগত্যে প্রয়োগ করা হত তেমনি গীত বা নৃত্য নিরপেক্ষ বাদ্য প্রয়োগও সূচিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যবস্তু থেকেই সেই প্রয়োগ তার রস আহরণ করতো বা নাট্যপ্রয়োগ কালে অনুরূপ রসের যোগান দিত। ভরত পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ বর্ণনায় যন্ত্রসঙ্গীত প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রঙ্গপীঠের ছিল দুটি যবনিকা,—অন্তর্যবনিকাও বহির্যবনিকা। পূর্বরঙ্গের আরম্ভে বহির্গীতি। বহির্যবনিকা তখন উন্মুক্ত থাকবে অথচ অন্তর্যবনিকার অন্তরালে থেকে যন্ত্রীরা তন্ত্রী ও ভাণ্ড, অর্থাৎ বীণ এবং মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনায় বহির্গীতি প্রয়োগ করবেন। এই প্রয়োগের সময় বাদ্যযন্ত্রীরা অন্তর্যবনিকার অন্তরালে এবং নেপথ্যদ্বারে ( উইংস ) তাঁদের আসন গ্রহণ করতেন। এবং ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বা আবহসঙ্গীতকে "ষ্টিরিয়োফোনিক" করবার জন্যে একই বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ করা হত কোনটি নেপথ্যে বাম দিকে কোনটি বা দক্ষিণ দিকে যাতে করে নট বা নটীর অবস্থান নির্ভর এই বাজনাগুলি প্রয়োগ করা যায়। এ পর্যন্ত আধুনিক ষ্টেজের আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ ও প্রাচীন রঙ্গপীঠের প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে মিল রয়েছে। কিন্তু বাদ্য প্রয়োগের মূলে নীতিগত বিভেদ বেশ সুস্পষ্ট। তুলনা করলেই বোঝা যায় যে তৎকালীন নাট্যবাদ্য প্রয়োগের মধ্যে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল আধুনিক ভারতীয় ষ্টেজ তারও অনেক পিছনে পড়ে আছে। প্রাচীন পরিকল্পনার সঙ্গে একমাত্র আধুনিক ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতেরই তুলনা করা চলে। বস্তুতঃ নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে পরিবেশিত হলে আধুনিক সঙ্গীত সমালোচকেরা তাকে ইউরোপীয় পদ্ধতির নকল বলে থাকেন। প্রাচীন যন্ত্রসঙ্গীত প্রয়োগ পরিকল্পনার আলোচনায় সেদিক থেকে একটা মস্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায় হল বাদ্যাধ্যায়। তার প্রথম শ্লোকেই বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ,— "ততংচৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেবচ। চতুর্বিধংতু বিজ্ঞেমাতোদ্যং লক্ষনান্বিতম্॥" বাদ্যযন্ত্র চার রকমের। "তত" বা তন্ত্রীবাদ্য, যেমন বীণা। তন্ত্রীবিন্যাস ও শব্দ উত্থাপন পদ্ধতি ভেদে বীণা ছিল বহু রকমের। "অবনদ্ধ",—অর্থাৎ চামড়ায় ঢাকা ভাণ্ডবাদ্য। বিভিন্ন বস্তু দিয়ে নির্মিত ভাণ্ড বা খোল ভেঙ্গে আওয়াজের বিভিন্নতা প্রকাশ পেতো। মৃদঙ্গ, পনব, দর্দুর ইত্যাদি নাম ছিল এই সব বাদ্যযন্ত্রের। এছাড়া ছিল "ঘন" অর্থাৎ করতাল জাতীয় বাজনা যার আকৃতি ছিল বিভিন্ন এবং বিভিন্ন বস্তু দিয়ে তৈরি আর ছিল সুষির বা বংশী জাতীয় বাদ্য। এরও অনেক রকমফের ছিল।

প্রাচীনকালে বাজনার গুরু লঘু ধ্বনির ওপোর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। বিভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সম্বন্ধে "অবনদ্ধ" শ্রেণীর বাজনা সৃষ্টি সম্পর্কে

একটি ছোট কথিকা ভরতমুনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

মহর্ষি স্বাতী অধ্যয়নের ফাঁকে এক জলাশয়ে জল আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও ঝড় শুরু হল। বিভিন্ন আকারের পদ্মপাতার ওপর বারিপাতের আওয়াজ যে ধ্বনির সৃষ্টি করেছিল তাই স্মরণ করে মহর্ষি গৃহে ফিরে এসে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে মৃদঙ্গ, পনব, দদ্রু্র, ঝাল্লারী পটাহ, মুরজ, আলিঙ্গ্য, উর্দ্ধক, অঙ্কিক ইত্যাদি তৈরী করালেন। এই সমস্ত যন্ত্রই ছিল চামড়া দিয়ে ঢাকা ও তন্তু নিয়ে বাঁধা। খোল বা ভাণ্ডটি, মাটি, কাঠ ও ধাতুর তৈরী।

এখন রঙ্গপীঠে বাদ্যপ্রয়োগের কথায় ফিরে আসা যাক। বহির্গীতি প্রয়োগের সময় প্রথমে তন্ত্রী ও ভাণ্ডবাদ্য সহযোগে প্রত্যাহার, অবতরণ ও আরম্ভ এই তিনটি পর্যায় নিষ্পাদিত হবার পর সর্বপ্রকার গীতবাদ্য শিল্পীদ্বারা অবশিষ্ট ছয়টি অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। বহির্গীতির উৎপত্তি কাহিনী বলতে গিয়ে ভরত দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক কলহের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বর্গের দেবসভায় ও দানবগণের সামনে যে নির্গীত পরিবেশিত হয়েছিল সেই থেকেই বহির্গীতির উৎপত্তি। দেবতা ও দানবগণের তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে মহর্ষি নারদ এই নির্গীতের সপ্তরূপ প্রবর্তন করেছিলেন। সপ্তরূপ হল,—একক গীত, একক বাদ্য, একক গীতবাদ্য, গীতনৃত্ত, বাদ্যনৃত্ত ও গীতবাদ্যনৃত্ত। ধাতুবাদ্য প্রয়োগে এই নির্গীতের প্রবর্তন করলেন নারদ। এই নির্গীতের প্রয়োগ হয়েছিল গান্ধর্ব প্রয়োগকালে, নাট্য প্রযোজনায় নয়। ভরত এই প্রয়োগকে নাট্যে সংযোজিত করলেন কারণ নির্গীতের হল গীতবর্জিত সঙ্গীত ও ধাতুবাদ্যাশ্রয়ী। এক কথায় অর্কেষ্ট্রা। এই অর্কেষ্ট্রাকে বলা হয়েছে বাদিত্রকরণ।

বিভিন্ন আখ্যায়িকা থেকে নাটকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। ইদানীংকালের যাত্রায় ও ক্রমশঃ থিয়েটার ও সিনেমায় "কনসার্টের প্রচলন হয়েছে এবং ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকেরও প্রচলন হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীত পুস্তকাদিতে এই কনসার্ট বা ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক পদ্ধতির বিশেষ উল্লেখ নেই। অনেকগুলি যন্ত্র সমাবেশে একই সুর অনুধাবন করাই হল কনসার্টের রীতি আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক ডিরেক্টর ও সঙ্গীত পরিচালকের পরামর্শনির্ভর। বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োগ বৈচিত্র বা ধ্বনি বৈষম্যের কথা চিন্তা করে হয়ত কদাচ বা সঙ্গীত প্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে করা হয় তবে প্রায়ই এই সঙ্গীত গতানুগতিক রাগ সঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত হয়ে শিল্পীর দক্ষতাকে ফুটিয়ে তোলে, নাট্যরসকে নয়। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের ২৯ অধ্যায়ে অর্কেষ্ট্রাইজেশনের প্রসঙ্গে আশ্রাবণাবিধি ও বহির্গীতির প্রয়োজনে ধাতু-বাদ্যপ্রয়োগ পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন। ব্যবস্থা যে ইদানীং কালের চেয়েও অনেক সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত ছিল তার প্রমাণ নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে। প্রয়োগের প্রয়োজনে এখানকার কেউ তার উদ্ধার না করে বিলাতী অর্কেষ্ট্রার অনুকরণ করতে থাকলেন।

ভরতমুনি বাদ্যপ্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন, শুভকাজে, যুদ্ধযাত্রায় ও নাটকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হবে। নাটকে প্রধানতঃ গান বা নৃত্যের সঙ্গেই বাজনা বাজানো হত। বাদ্যোত্থিত ধ্বনি ও সুরের লক্ষ্য ছিল রসসৃষ্টি। নাটকের আরম্ভে, অঙ্কচ্ছেদে এবং রস থেকে রসান্তরে—নাটককে ঘোরানোর কাজে বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ করা হত। তাছাড়া গানের ভেতরেও একক যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহারের যথেষ্ট অবসর থাকতো। এছাড়া ছিল পশুপক্ষীর,—বিশেষ করে দেবদেবীর বাহনদের স্বরের অনুকৃতি,

ঝড়বৃষ্টি বা মেঘগর্জনের অনুকৃতি। এর মধ্যে রসোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাদ্যবৃত্তি সম্পর্কে উপদেশই ভরতমুনির প্রধান কীর্তি। এবং প্রসঙ্গতঃ অর্কেষ্ট্রাইজেশন সম্পর্কে যন্ত্রব্যবহার পদ্ধতির বিচিত্র সমাবেশও উল্লেখযোগ্য।

ইদানীংকালের রাগসঙ্গীত বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন প্রহরের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হয়। মিউজিক কনফারেন্সে বা নাট্যপ্রয়োগকালে এই একই নিয়ম। বর্ষাঋতু বর্ণনায় মল্লার বা সকালের দৃশ্যে ভৈরবী সুরারোপের গতানুগতিক রীতির ব্যতিক্রম আধুনিক নাট্যপ্রয়োগে বড় একটা দেখা যায় না,—বিশেষ করে যে সঙ্গীতপরিচালক সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী। ভরতমুনি এই ধরণের নাট্য-পরিবেশকে বলেছেন বিভাব। বিভাব অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবসংযোগে রসনিষ্পত্তির কথা বলেও ভরতমুনি বিভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও স্বরবিশেষ বা জাতিরাগবিশেষের প্রয়োগ নির্দেশ দেননি। জাতিরাগের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গানে সুরারোপের আলোচনা করেছেন। যেমন তাঁর মধ্যে ষড়জোদীচ্যবতী এবং ষড়জমধ্যা এই দুই জাতি, যথাক্রমে মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের বহুল ব্যবহার নির্দেশ থাকায়, শৃঙ্গার ও হাস্যরসের অবতারণায় প্রযোজ্য অথবা নৈষাদী ও ষড়জকৈশিকী জাতি দুটিতে যথাক্রমে নিষাদ ও গান্ধার স্বরের বাহুল্য থাকায় জাতিরাগ দুটি করুণ রসে প্রযোজ্য।

জাতিরাগের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হতে হলে সপ্তস্বর ও তাদের মধ্যে সম্পর্কগুলি জানা দরকার। সাত স্বরের মধ্যে চার রকমের সম্পর্ক, বাদী- সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী। স্বরের শ্রুতি স্থাপনার বৈশিষ্ট্যে স্বরবিশেষের মধ্যে এই সম্পর্কগুলি স্থাপিত হয়। ভরতমুনির মতে ষড়জ ও মধ্যম এই দুইটি গ্রামের স্বরে শ্রুতি স্থাপনার তফাৎ হওয়ায় সম্বাদী, অনুবাদী বিবাদী সম্পর্কেও তফাৎ হয়েছে। এমনি করে একই গ্রামের মধ্যে স্বরস্থান বিভিন্ন করে বিভিন্ন গ্রামরাগেরও সৃষ্টি করা হত। এই বিভিন্ন গ্রামরাগ ও জাতিরাগগুলি রসসৃষ্টির বিভিন্নতায় ব্যবহার করা হত।

এমনি করে রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার জাতিরাগ বা গ্রামরাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হত বটে কিন্তু এই জাতিরাগ বা গ্রামরাগের বাঁধন আধুনিক রাগরাগিণীর বাঁধনের চেয়েও ছিল অনেক ঢিলে এবং স্বরবিশেষের প্রয়োগ বহুলত্বের নির্দেশই ছিল তার মূল কথা। এছাড়া বিভিন্ন অলঙ্কার, লয়, তাল, ছন্দ ও স্বরের গতি বল ও প্রসার এই রসসৃষ্টিতে সাহায্য করত। নাট্যশাস্ত্রে তেত্রিশটি অলঙ্কারের প্রয়োগ পদ্ধতির উল্লেখ আছে সেগুলি স্বরের ও চতুর্বর্ণের প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভর।

সঙ্গীত স্বরের চারটি বর্ণ ( টোন কালার ) আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। আরোহী, স্বরের ক্রমোচ্চতা বোঝায় ( ইংরাজী অ্যাসেণ্ডিং বা ক্রেসেণ্ডো )। অবরোহী অর্থে স্বরের ক্রমনিম্নতা ( ইংরাজী ডিসিউনেণ্ডো )। স্থায়ী অর্থে স্বরের সমতা ( ইংরাজী- ষ্টেডি ) এবং সঞ্চারী অর্থে স্বরের বা ধ্বনির মিশ্র ব্যঞ্জনা বোঝায় ( ইংরাজী "শক" )। রসসৃষ্টিতে আধুনিক ইংরাজী অর্কেষ্ট্রাও এই টোন কালারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এ ছাড়া গানে ও বাজনায় স্বরের গুরু-লঘু ধ্বনিভেদও সূচিত হয়েছে। যেমন গেয় পদ বা শব্দের গুরু-লঘু ভেদ আছে তেমনি বাদ্যস্বরেরও গুরু লঘু ধ্বনি ভেদ আছে। নাট্যসঙ্গীতে বিশেষ করে যেখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশে গান ও

নাচ হচ্ছে তখন লঘুগুরুধ্বনি ভেদ প্রয়োগশিল্পীর একান্তই জানা দরকার। বহির্গীতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে ভরতমুনি তাই বলছেন যে,

"ধাতুভিশ্চিত্রবীণায়াং গুরুলঘ্বক্ষরান্বিতম্।
বর্ণালংকারসংযুক্তং প্রযোক্তব্যং বুধৈরথ ॥"

অর্থাৎ নাট্যপ্রয়োগ কালে বিচক্ষণ বাদ্যশিল্পীরা চিত্রা বীণার সাহায্যে গুরু-লঘু অক্ষর ও বর্ণালঙ্কার-সংযুক্ত বাদ্যপ্রয়োগ করবেন। বহির্গীতি আসলে গান্ধর্ব নাট্য নয় কিন্তু নাটকে এর প্রয়োগ হয়েছে। আর গান্ধর্বের বৈশিষ্ট হল তন্ত্রীবাদ্যপ্রাধান্য, সুতরাং বহির্গীতি প্রয়োগকালে কোনও তন্ত্রীবাদ্যকেই প্রাধান্য দিতে হত। অর্থাৎ তন্ত্রীবাদ্যকে কেন্দ্র করে "স্বরতালপদাশ্রিত" নিবদ্ধ গীত ও নৃত্য প্রয়োগ বহির্গীতির আসল রূপ। এই তন্ত্রীবাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে ভরতমুনি অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যেহেতু একসঙ্গে চিত্রা, বিপঞ্চী, ঘোষকা কচ্ছপী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বীণা এই বহির্গীতিতে বাজানো হত সেহেতু এই সমস্ত বাদ্যোত্থিত ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলি ফোটাবার জন্য আশ্রাবণাবিধি বা অর্কেষ্ট্রাইজেশন সূচিত হয়েছে। সে আর এক অধ্যায়।

**নরেন্দ্রকুমার মিত্র**

## শিল্পে কল্পনা

চোখের দেখায় যাকে পাই নে, কানের শোনার কিংবা হাতের ছোঁয়ার বাইরে যা থেকে গেল, অভাবের ক্ষণটুকু ভাবের পাওনা দিয়ে পুরিয়ে নেবার জন্যে তাকে আমরা মনের কারুশালায় গড়ে তুলি। এই খেয়ালী মন-বিলাসের নাম কল্পনা। শিল্পকে একই সাথে চটকদার আর চমকদার করতে গেলে কল্পনার পরশটুকু না পেলেই নয়। তবেই ভাব জাগবে, ভাবনা জাগবে' আবেগের চাপরাস এঁটে অনুভূতির নকিব চলবে আগে আগে, স্মৃতির হাজারদুয়ারীতে পড়বে যা, সুর উঠবে অভিজ্ঞতার ঝালর-ঝোলানো নহবৎখানায়। এমনিধারা পরাণভরা ভোরাই যে সব শিল্পকেই সমান ডগমগ করে তুলবে তা হলপ করে বলা যায় না। তাছাড়া কল্পনা তো আর কলের জল নয় যে, চাবি ঘুরিয়ে দিলেই ঝরে পড়বে অঝোরে; বরং এটি নদীর জল,—জোয়ারের বান আছে, ভাঁটার টান আছে। সেদিন থেকে কল্পনার দুটো চেহারা আমাদের নজরে ধরা পড়ে—আমেজী কল্পনা আর গরজী কল্পনা।

একটা মৌতাতী আবেশে মৌজ হয়ে যে-কল্পনার স্বাদ নিই, কিংবা কথাটাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করালে—যে-কল্পনার আওতায় রসিকমন একটা মৌতাতী আবেশে মৌজ হয়ে ওঠে, হালকাভাবে তাকেই আমরা আমেজী কল্পনা বলতে পারি। কিন্তু আতশ কাচের চশমা এঁটে যদি খুঁটিয়ে পরখ করি তবে দেখব, এটি শিল্পীর মরমছোঁয়া অনুভূতির প্রতিমা গড়বার কারিগরি, এটি শিল্পীর নিজেকে সবকিছুর মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সবকিছুকে নিজের এক্তিয়ারে আনার অগাধ ইচ্ছের আরেক রূপ। এই আমেজী কল্পনা কোনো জিনিস আর কোনো বিশেষ চরিতরীতির ভেতরে কুটুম্বিতের সাঁকো দেয় বেঁধে, আর শিল্পীর দরদী ভাবনা সে কাজে সবার সেরা বাঁধনদার। বড়োকে বনেদী নজরে যে দেখতে জানে, রূপে রূপে গাঁটছড়া বেঁধে যে মনমজানো অরূপকে গড়তে জানে, তাকে মনের নীচুতলার বেসাত বলি কোন্ মুখে। কাজেই আমেজী কল্পনা হোলো হীরে-মনের বালাখানার সরফরাজ।

আর গরজী কল্পনা বলতে বলতে বুঝি যেখানে কল্পনার গরজটা বড়ো, তাগিদটা বেশি—মানে, যে-কল্পনা আমাদের মন জোগায়, কিন্তু মন জাগায় না। শিল্পের কাজকারবারে বোধের চেয়ে বুদ্ধিকে এর জরুরী দরকার, ভাবের চেয়ে জ্ঞানের খাতির এর কাছে দুনো। গরজী কল্পনা তাই মনের নীচমহলের বাসিন্দে। কারণ, এ অনেক হাল্‌কা, অনেক ঠুন্‌কো; সাবানের ফেনার মতো রঙকে এ ধরতে পারে, কিন্তু তাকে রূপের মাঝে পাকা ঠাঁই দিতে পারে না। শিল্পীর বারমুখো সদাসজাগ চেতনা থেকে জন্ম নিয়ে শিল্পের ওপরকার জলুসটাকে পালিশ করে গরজী কল্পনা চায় আসর মাতাতে; শিল্পের অতলছোঁয়া পাতালপুরে অরূপতনের আশা তার নেই।

শিল্পীর গণ্ডিছাড়া চেতনায় কিন্তু গড়ে তুলবার জন্যে যে চিরকেলে দামালপনা চলেছে, আমেজী কল্পনা তারই ঢেউ হয়ে আসে পাড়বাঁধা মনে। চোখের সুমুখে যে জিনিস নেই, এই নিমেষে যা রয়েছে জানাশোনার বাইরে, শিল্পীর লজ্জাবতী অনুভূতি তার আলতো পরশটুকুও বড়ো বেশি করে টের পায়। সেই পরশের রোমাঞ্চকে সাঁচ্চা প্রতিমায় যিনি ঠারেঠোরে সুডোল করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাঁকে আমরা আমেজী কল্পনার কারিগর বলে হাজারোবার কোর্‌নিশ জানাই। আর, নানান মালমশলা জড়ো করে কোনো জিনিসকে শিল্পের মাঝে নিখুঁতভাবে যিনি পারেন শোভন করে সাজিয়ে দিতে, আমাদের সেলাম রইলো সেই গরজী কল্পনার বাহাদুরের জন্যে। আমেজী কল্পনা সাড়া জাগায় একরোখা নিপুণ নজরের মধ্যে দিয়ে, গরজী কল্পনা তাড়া লাগায় মনের আবহাওয়াবদলে চটুল ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে। তাই গরজী কল্পনা বাহারে হলেও একেবারে স্পষ্ট; সে তুলনায় আমেজী কল্পনা নিছক ইসারা হতে পারে, কিন্তু অনেক বেশি খাঁটি।

গরজী-কল্পনা যে-সব রসদ নিয়ে কারবার করে তাদের চেহারা পালটায় না, আর পালটালেও তা এতই সামান্য যে, স্বচ্ছন্দে হিসেবের বাইরে রাখা চলে। এর বিধিবিধান রীতিরেওয়াজ মনের খুশিমাফিক আবহাওয়াবদলের মতোই থাপছাড়া। তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে সরাসরি প্রকাশ করে তাড়তাড়ি কাজ সেরে নেওয়াই এর মতে সেরা কানুন। ওদিকে আমেজী কল্পনার চলন নেহাৎই ভিন্ ছাঁদের। যে যখন তুলনা নিয়ে আসে, তখন মনের গোপনথোকে গড়ে ওঠে একটি অনুরূপতার বোধ। এই অনুরূপতা শিল্পের রঙ আর ঢঙের চেয়ে প্রকাশের দাম দেয় বেশি; আবার সরাসরি প্রকাশের ওপর মোটেই ভর না রেখে আঁকড়ে ধরে শিল্পের ভেতরকার জোরালো বাঁধুনিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধির সাথে সই পাতিয়েছে গরজী কল্পনা, আর বোধ ঐ আমেজী কল্পনার মিতে। এখন, বোধ হচ্ছে অনুভূতিজড়ানো নজর। সে নিজেকে ছড়াতে পারে, নিজের ছাপটি এঁকে দিতে পারে আন পটে। কিন্তু বুদ্ধি অনড়। নিজেকে সে নিজেই জড়িয়ে ধরে। তার কাছে সবচেয়ে বড়ো। বুদ্ধি হচ্ছে নিরেট সত্যের একটি জমাট দিক, জ্ঞানের সাথে তার খানদানী মেলামেশা। ফলে, বাইরের অভিজ্ঞতাই বোধের সড়ক বেয়ে চলতে চলতে একসময় আমেজী কল্পনা হয়ে ওঠে। আর জ্ঞানের আরকে বুদ্ধিকে চাঙা রেখে সম্ভাদরের শিল্পের পশরা সাজায় যে-ব্যাপারী, গরজী কল্পনা তার নাম।

মোটামুটি দুটি শক্তি রয়েছে জীবনবেশের আনন্দে—একটি হচ্ছে বস্তু, অপরটি বিষয়—যেমন বাঁশী আর সুরের রাগিণী। এই বস্তু, আর বিষয়কে একাকার করে মিলিয়ে দিতে পারে বলেই আমরা আমেজী কল্পনাকে প্রতিভা বলব, নিছক বস্তুপুঁজি গরজী কল্পনাকে নয়। কারণ গরজী কল্পনা যেখানে জীবনের বাইরেটাকেই নানান রঙে রাঙিয়ে তুলতে থাকে, আমেজী কল্পনা সেখানে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে জীবনের স্বরূপকে এবং সব স্বরূপের মূল প্রেরণাটিকে প্রকাশ করে।

শিল্প একেবারে নিশ্চিন্তভাবে নিজেকে বাইরের জগতের হাতে সঁপে দিয়ে বসে আছে। কারণ দৃশ্যই বলি, ধ্বনিই বলি, কিংবা হৃদয়কে দোলা দেবার মতো অন্য কোনো জিনিসই বলি—সব রসদই তো জোগাড় করতে হবে বাইরের জগৎ থেকে। এদের মিহি কারুকাজ ছাড়া কেউ জাতশিল্পী হতে পারেন না। তবে, অনুভূতি যদি মনের পাতালপুরে মাতন না লাগায়, ঝাপ্‌সা

আবেগ যদি পায়ে পায়ে স্পষ্ট আর জীবন্ত ভাষ না হয়ে ওঠে তাহলে কারিগর যে শিল্পের কারুশালায় ফেল করবেন, এতে আর সন্দেহ নেই। তাই কবুল করতে হচ্ছে, খাঁটি শিল্প গড়তে হলে আবেগ-অনুভূতি-সেঁচা আমেজী কল্পনার জীয়নকাঠিকে মুঠোয় রাখতেই হবে।

কোনো জিনিস চোখের সুমুখ থেকে সরিয়ে নেবার পরও, কিংবা কোনো জিনিসের সুমুখ থেকে চোখ দুটিকে সরিয়ে নেবার পরও সেই জিনিসের প্রতিমা ভাসে চোখের ওপর; তবে আসল জিনিষটির তুলনায় সে প্রতিমা ঝাপ্সা। এমনি করে প্রতিমার ভেতর দিয়ে আসলকে দেখা আর সেই দেখার ভিতর দিয়ে ভেতরমহলের সব অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলাই শিল্পের বনেদী রেওয়াজ। প্রতিমা যে-অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে তার পুলক একদিন থিতিয়ে এলেও কোনোদিন হারিয়ে যায় না, জমা হয়ে থাকে মনের মৌকুঠুরিতে। এখান থেকেই আমেজী কল্পনা প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। কাজেই স্মৃতি আর আমেজী কল্পনা একই ঘরের পড়শী—যেমন মোম আর মোমের আলো।

একথা একশোবার সত্যি যে, আমেজী কল্পনার আবেগ বুদ্ধি থেকে আসে না, আসে আনন্দ থেকে। সৃষ্টির হাত রয়েছে আনন্দের রাখী পরানো। শিল্পী চিরকেলে আনন্দের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকে রূপ দেন, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চিরকালের আনন্দকে। আবার, আনন্দের সাথে সুন্দরের গলায় গলায় ভাব। আপনা থেকে বেরিয়ে-আসা আমেজী কল্পনার গোড়ায় সুন্দর অবশ্যই দরকার, সে সাথে রুচির 'বাঁধনও।' প্রশ্ন হচ্ছে; বাঁধন কে দেবে। নিশ্চয়ই বুদ্ধি। জ্ঞানের ছাঁচ না থাকলে শিল্প শুধুই কূলভাসানো আবেগউচ্ছ্বাসের ছলকলা হয়ে উঠবে। তখনই শিল্পকে পরাণদোলার নিশানায় নিয়ে যেতে গেলে ডাক পাঠাতে হয় গরজী কল্পনাকে।

তাছাড়া মনের দুটো মহল রয়েছে—একটা ভাবের মহল, আর একটা জ্ঞানের মহল। আমেজী কল্পনার মধ্যে দিয়ে গড়ে-তোলা প্রতিমা তখনই পয়লা নম্বরের শিল্প হয়ে ওঠে যখন তার মাঝে জ্ঞান আর ভাব নিয়ে শিল্পীর পুরো মনটিই ধরা দেয়। কাজেই, গরজী কল্পনাকে একেবারে খারিজ করা গেল না। শিল্পী তো সব সময়েই বাইরের জিনিসকে ভেতরের করে তুলছেন, ভেতরকে নিয়ে আসছেন বাইরে। এমনি করে জ্ঞানের তরী দেখতে দেখতে ভাবের সোনার-তরী হয়ে উঠছে, আবার এই সোনার-তরীই শিল্পের জগতে নোতুন করে জ্ঞানের রসদ জোগাচ্ছে। এ যেন অনেকটা সেই, কথা গেঁথে কবিতা লেখা, আবার কবিতায় সুর গেঁথে গান শোনানোর মতো। তাই আমরা মেনে নিলুম, শিল্প গড়ার কারিগরিতে আমেজী কল্পনাকে তো নিতেই হবে, সে সাথে আসন দিতে হবে গরজী কল্পনাকেও। তবে নজর রাখতে হবে, গরজী কল্পনা যেন কারুকলায় রাজা না হয়ে বসে। শিল্পকে শোভন করবার জন্যেই তাকে দরকার। তার জারিজুরি আমেজী কল্পনাকে ছাপিয়ে গেলে শিল্প একেবারে দুঁদে পণ্ডিতের খুঙিপুঁথি হয়ে উঠবে।

**দেবব্রত চক্রবর্তী**

## সমালোচনা

**জীবন জিজ্ঞাসা।** আইনস্টাইন ॥ সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২ ॥ আট টাকা ॥

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বইকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান ধারণার সীমান্ত-চুম্বী সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।'···রবীন্দ্রনাথ। আলবার্ট আইনস্টাইন বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সেবী। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এবং নিউটনের পাশাপাশি, এক সারিতেই তাঁর আসন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনাড়ম্বর নিরহংকার এবং আত্মভোলা একটি বিরল মানসের প্রতীক—সর্বোপরি ঋষিতুল্য। আইনস্টাইন 'বিজ্ঞানরাজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রদের মত কৌতূহলাবৃত অসীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানী'।

আইনস্টাইনের পরিচয় শুধুমাত্র মহাবিজ্ঞানী হিসেবে পরিব্যাপ্ত নয়; বহু যুগ ধরে মানব সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজকে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জাতিবৈষম্য এবং পাশপাশি বিজ্ঞান ও ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত অতি জটিল সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে সে সম্পর্কে আইনস্টাইন নিজে অবকাশ মতো গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন; বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি তাঁর নানাবিধ সারগর্ভ ঋজু নির্ভীক মত ও পথনির্দেশ ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। আইনস্টাইনের সাধারণ রচনাবলীর মধ্যেও বর্তমান কালের এক অদ্বিতীয় মানবদরদী মহামানবের মানসপ্রকৃতির গঠন ও প্রকাশের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করা যায়। নিজের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন···সরল জীবন যাত্রার পদ্ধতির প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ এবং মাঝে মাঝে এই ভাবনা আমাকে পীড়িত করে যে, আমার সাথী-ভাইদের অনেকখানি পরিশ্রম আমি অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করছি। শ্রেণী-বৈষম্যকে আমি ন্যায় বিচার বিরোধী ও হিংসা আধারিত বলে মনে করি। আমার মতে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সরল জীবনযাত্রা সকলের পক্ষে মঙ্গলকর।'···'আমার চলার পথে আমি নিঃসঙ্গ পান্থ এবং নিজ দেশ, গৃহ, বন্ধুবান্ধব বা একান্ত অন্তরঙ্গ পরিবারের সঙ্গেও আমি সর্বান্তঃকরণে একাত্ম হতে পারিনি। এই সব বন্ধন-ডোরের সামনে আমি কদাপি আমার এক রোখা অসম্পৃক্ত ভাব, নিভৃতি-পিপাসা প্রকাশ করতে ছাড়ি নি। আর দেখেছি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব আরও বাড়ছে। অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে হৃদয় বিনিময় ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের পথে এ কত বড় অন্তরায় সে বিষয়ে আমি তীব্র ভাবে সচেতন; তবুও আমার কোন খেদ নেই।' এবং 'রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ব্যক্তি হিসাবে যেন প্রত্যেকের সম্মান করা হয় এবং কাউকে যেন দেবতা বানানো না হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, নিজের কোন দোষ বা গুণ বিনাই আমি আমার সঙ্গী সাথীদের কাছ থেকে অত্যধিক প্রশস্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। নিরবধি প্রচেষ্টা দ্বারা দু' একটি বিষয় বোঝার মত যৎসামান্য ক্ষমতা আমি আয়ত্ত করেছি। এইটা অনেকে পেরে ওঠেন না বলেই বোধ হয় আমার এত সম্মান। একথা আমি ভাল ভাবেই জানি যে, কোন জটিল কার্যের সাফল্যের জন্য একজন লোকের উপরই সে সম্বন্ধে চিন্তন ও পরিচালন ভার থাকা উচিত এবং কাজের মোটামুটি দায়িত্বও তাঁর উপর থাকা প্রয়োজন। তবে যারা পরিচালিত হবে, তাদের বাধ্য করা চলবে না। নায়ক নির্বাচনের সুযোগ তাদের থাকা চাই। আমার বিশ্বাস আনুগত্য আদায় করার স্বৈরতন্ত্রী প্রথা শীঘ্র কলুষিত হয়। কারণ হিংসাশক্তি সর্বদাই নিম্নস্তরের নীতিজ্ঞান বিশিষ্ট লোকেদের আকর্ষণ করে এবং একথা আমি এক অপরিহার্য বিধান বলে বিশ্বাস করি যে, প্রতিভাশালী স্বৈরতন্ত্রীদের উত্তরসাধকরা অপদার্থ হয়ে থাকে।' মানবজীবন নাট্যপ্রবাহ ও জগৎ সম্পর্কে আইনস্টাইনের অভিমত হলো : মানবের জীবন-নাট্যপ্রবাহে সত্যকার মূল্যবান জিনিস রাষ্ট্র নয়, তা হচ্ছে সৃজনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। যা কিছু মহৎ, তার স্রষ্টা ব্যক্তি; অন্তর্বৃত্তির বন্ধন মোচন করার ক্ষমতা রাখে ব্যক্তি। পক্ষান্তরে গোষ্ঠীভাবনা চিন্তা এবং সংবেদনশীলতা—উভয় ক্ষেত্রেই রসস্পর্শহীন থেকে যায়।

বলা বাহুল্য, 'জীবন-জিজ্ঞাসা' এক আশ্চর্য অদ্বিতীয় প্রতিভার বিভিন্ন চিন্তা ও দর্শনের অনুপম আকরগ্রন্থ। বর্তমান সংকলনের সংখ্যাগুরু অংশই, একদা আইন স্টাইনের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, প্রধানত সে সমস্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং অনুবাদিত। অবশ্য আলবার্ট আইনস্টাইনের উচ্চতর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী, মূলত যে সমস্ত রচনাবলী, বিশেষজ্ঞদের জন্যই বিশেষভাবে লিখিত, সেগুলি আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক এবং অনুবাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছে করেই বর্জন করেছেন। অনুবাদক ও সংকলক বর্তমান গ্রন্থের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আইনস্টাইনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশেষভাবে বর্তমান সংকলনের রচনা নির্বাচন করেছেন। ইতোপূর্বে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আইনস্টাইনের কয়েকটি প্রবন্ধও বর্তমান সংকলনে গ্রথিত হয়েছে—যেগুলি নিঃসন্দেহে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহলে উৎসাহের সঞ্চার করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের ভিত্তিতে বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর বিন্যাস পরিকল্পনা করা হয়েছে : 'অভিমত'; 'স্বাধীনতা'; 'ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র'; 'শিক্ষা'; 'মিত্রবর্গ'; 'রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শান্তিবাদ'; 'ইহুদীদের কথা'; 'বিবিধ' তৎসহ 'পরিশিষ্ট'। বর্তমান গ্রন্থের ভুমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু। এ ছাড়া গ্রন্থের পরিশেষে অধ্যাপক বসু লিখিত আইনস্টাইন সম্পর্কিত একটি মৌলিক মূল্যবান প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। প্রবন্ধটি নানা কারণেই উল্লেখ্য; বলা বাহুল্য বর্তমান সংকলনের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক-ও। আইস্টাইনের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব প্রসঙ্গে বিশ্ববাসী একই সঙ্গে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের নামোচ্চারণ করে থাকেন। আইনস্টাইনের প্রতি আচার্য বসুর শ্রদ্ধা অপরিসীম এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত তাঁর লেখা আইনস্টাইন সম্পর্কিত

প্রবন্ধ এবং প্রারম্ভের 'ভূমিকা' ইত্যাদি শুধুমাত্র উক্ত মহাবিজ্ঞানীর জীবনী ও কৃতির পরিচায়ক নয় পরন্তু মানবদরদী এবং বিশ্ব শান্তি সংস্থাপনায় এই মহামানবের অনন্যতর প্রয়াসও একযোগে সমুপস্থিত।

'মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই'—আইনস্টাইনের মানুষ সম্পর্কে আন্তরিকতা ও সহানুভূতি শুধুমাত্র উপযুক্ত একটি উক্তির মধ্যেই উদ্ভাসিত। মনুষ্য জীবন সম্পর্কে আইনস্টাইনের জিজ্ঞাসা ছিল অন্যতর—তিনি ছিলেন মানবদরদী মনীষী। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পাশাপাশি মানুষ আইনস্টাইনেরও সর্বকাল সর্বযুগের মহামানবদের সঙ্গে প্রথম সারিতেই স্থান। 'বিশ্বের কোন কোণে অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে—এখবর পেলেই এই মানবদরদী মনীষী প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠতেন। এইজন্য তাঁকে হিটলারের জার্মানী ত্যাগ করতে হয় ও আমেরিকাতে বসবাসকালীন এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা রাজনৈতিক নেতার বিরাগভাজন হতে হয়।'

আলবার্ট আইনস্টাইনকে জীবনে অনেক ঝঞ্ঝা এবং অনাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবং মহাপুরুষের ধর্মই এই, তার জন্য ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র দমিত হয় না। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইন আজীবন ন্যায়ের পক্ষে তাঁর ঋজু মতামত ঘোষণা করেছেন। এবং তা যে কোন ক্ষেত্রেই পরিণাম রমণীয় নয় সেকথা তিনি জানতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেজন্য বহুবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হতে তিনি কখনো ভীত হননি। জাতিতে ইহুদি ছিলেন তিনি—ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সেজন্যই বোধ হয় জীবনে মাথা তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। আরো বেদনাদায়ক এই যে, 'যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবকরূপে বহুবৎসর যাবত তিনি এক মনে যে দেশের সেবা করেছিলেন, উৎকট জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের কারণে তাঁকে সেদেশ ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় পথচারী পথিক হতে হয়েছিল। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেও স্বজন এবং প্রিয়জন থেকে বহু দূরে প্রবাসে তাঁকে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।' আইনস্টাইনের অভিজ্ঞতা সেজন্যই বোধকরি ব্যাপক তৎসহ জীবন জিজ্ঞাসা আশ্চর্য দিগন্তপ্রসারী।

ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি আইনস্টাইনের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাঁকে আশ্চর্য গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের দুটি বিবরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ( পৃঃ ৪৯।১৫০ )।

আইনস্টাইন মূলত অহিংসাবাদী যদিচ পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের প্রতি তাঁর ছিল একমাত্র আস্থা। সেজন্য মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথকেই তিনি আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাত্মার পথেই মানবমুক্তি সম্ভব। মানব সভ্যতার সংকট ও সেই সংকট উত্তরণ সম্পর্কে ১৯৫০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উল্লেখ করে আইনস্টাইন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন: 'সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার বিশ্বাস আমাদের যুগের তাবৎ রাজনীতিজ্ঞের ভিতর গান্ধীর দৃষ্টিকোণই সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। স্বীয় আদর্শ রক্ষার জন্য আমরা হিংসা প্রয়োগ করব না। আমরা যা

অন্যায় বিবেচনা করি, তার সঙ্গে অসহযোগ করব।' গান্ধীজীর জীবনবেদ আইনস্টাইনের চোখের আলোয় ও মনের ভাষায় কী রূপলাভ করেছিল তা তাঁর আর একটি ছোট উক্তির মধ্য দিয়েই পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন: আজ থেকে বহু যুগ পরে লোকে হয়তো এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাংসের শরীরধারী এই রকম কেউ কোন কালে এই ধরাতলে বিচরণ করতেন।' আইনস্টাইন ছিলেন একান্ত ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। নিপীড়িত মানবতার প্রতি আন্তরিকতা, দরদের মধ্যেই তাঁর আস্তিক্যবোধ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত। তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিও নানা কারণে অন্যতম এবং বিশিষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন: আমি এমন এক ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারি না, যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের শাস্তি ও পুরস্কার দেন বা আমাদের মত যাঁর ইচ্ছাশক্তি আছে। মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির সূক্ষ্ম দেহে জীবিত থাকার ব্যাপার আমার ধারণার বহির্ভূত, আর আমি চাইও না যে এরকম হোক।'

বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা নানা কারণেই প্রশংসার্হ। বর্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠক আইস্টাইনের ব্যক্তিত্বে বিজ্ঞান ব্যতীত তাঁর অন্তর ও বাহিরের প্রকৃত স্বরূপ জানবার সুযোগ পাবেন পরন্তু এক মহত্তর প্রতিভার সাহচর্য লাভ করে উৎসাহিত হবেন। এজাতীয় একটি সংকলনের উদ্যম অভিনন্দিত যোগ্য; অবশ্য এজন্য সংকলক ও অনুবাদক শ্রীশৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠাই একান্ত ভাবে দায়ী। সংকলিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মূলত অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের প্রতি আলবার্ট আইনস্টাইনের শ্রদ্ধা ও একান্ত ভাবনা-নির্ভর মানসিকতা তৎসহ প্রগাঢ় বিশ্বাসের একটি নিবিড় ঐক্য অনুসন্ধিৎসু পাঠক আবিষ্কার করবেন। দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অনুবাদ প্রাঞ্জল—যা সাধারণ পাঠককেও আকর্ষণ করবে। এজাতীয় সংকলনে সামান্যকিছু মুদ্রণপ্রমাদ যদিচ বিশেষ ত্রুটির পরিচায়ক নয় তথাপি মনকে পীড়িত করে। গ্রন্থটির রূপসজ্জা আকর্ষণীয় ॥

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

**বিশ্ববিবেক** ॥ সম্পাদনা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করী প্রসাদ বসু, শংকর। বাক্‌সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

"বিশ্ববিবেক" সংকলন গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে মনে হলো, বহুদিন বাদে হাতে একটি মূল্যবান বই পেলাম! এক মহামানবের সত্তা—সাগর সঙ্গমে পৌঁছে নূতন করে যুগ সমীক্ষার সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম! বিবেকানন্দের মূল্যায়ন প্রচেষ্টা নূতন নয়; বাংরবার হয়েছে; আরও হবে। সংকলক ত্রয়ী ভূমিকায় বলেছেন; 'আজকের নূতন পরিবেশে স্বামীজীর সর্বজনীন মানবমুক্তি ও বিশ্বধর্মের আদর্শ ক্রমশঃ বরণীয় হয়ে উঠছে।' বিশ্বলোকের সম্মুখে কেমন করে বিবেকানন্দ শাশ্বত ভারতের অপূর্ব বাণীটি উন্মোচন করেছিলেন তারি আলোকে এই সংকলন সার্থক ভাবে স্মরণীয়।

নিবন্ধগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সম্পাদকত্রয় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

"প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দের জীবন," প্রসঙ্গের রচনাগুলি স্বামীজীর জীবনসূত্রকে বিশ্বস্ত ভাবে গ্রথিত করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের সংগ্রহটি আকর্ষণীয় ও নীতি পরিচিত। 'মনীষীসঙ্গমে'র চব্বিশটি সংগ্রহের মধ্যে প্রায় দশজন পাশ্চাত্য মনীষীর বক্তব্য ধৃত হয়েছে। প্রতীচ্য জগতে বিবেকবাণী কি বিস্ময়কর আলোড়ন তুলেছিল তা নূতন করে প্রচারণার প্রয়োজন এঁরা অনেকটা মিটিয়েছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধির কথা যে আজ আমরা ভুলতে বসেছি সম্ভবত, সংগ্রাহকদের সে কথা স্মরণে ছিল। এই প্রসঙ্গে মার্কিন কবি এলা হুইলারের লেখাটি উল্লেখ্য। রফফেলারকে পর্যন্ত বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রও স্বামীজীর ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'স্বামীজী ছিলেন পৌরুষ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক।' স্বামীজী মূলত দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। সুভাষচন্দ্রের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের স্বরূপটিও প্রচ্ছন্ন থাকেনি। বিবেকানন্দের প্রতি জগদীশচন্দ্রের মনোভাব সমালোচনা মিশ্রিত হলেও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যখন উপলব্ধি করলেন—দেশের মানুষের মধ্যে পৌরুষ সৃষ্টিই তাঁর জীবনব্রত। স্মরণ রাখতে হবে কালের বিচারে এঁরা সবাই স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাই এঁদের মূল্যায়ন উপেক্ষণীয় তো নয়ই এবং বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের প্রেরণাবাহী।

'আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ' পর্যায়ের লেখাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সমসাময়িকদের চোখে বিবেকানন্দের মূল্যায়নে আমাদের শরিকানা অস্বীকার করি না। এবং উত্তরকালের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব অসীম। সংগ্রাহকদের ধন্যবাদ। এর অধিকাংশ প্রবন্ধই দায়িত্বশীল ও চিন্তামূলক।

শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বেদান্ত ও বিবেকানন্দ,' প্রবন্ধটিতে ভারতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব ও বৈদান্তিক আলোকে বিবেকানন্দের মানব হিতবাদের প্রসঙ্গটি সুমিত সংক্ষিপ্ত হলেও চিন্তার গভীরতা বহন করে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করছি। স্বামীজীর সকল জীবের প্রতি সুগভীর প্রেমের পশ্চাতে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার শঙ্করের ন্যায় তিনি যে নিছক মায়াবাদী ছিলেন না তার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন, কেন না বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তত্রাচ প্রশ্ন থেকে যায়, শঙ্কর কি নিছক মায়াবাদী? তবে একথা হিরন্ময়বাবু যথার্থ বলেছেন, 'তাঁর ( বিবেকের ) হৃদয়বৃত্তি যে খুব প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি 'জ্ঞানযোগে' মায়াবাদকে বিজ্ঞানসম্মত বলেছেন। আবার 'ভক্তিরহস্যে' বলেছেন, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের ভিতরেই তিনি প্রকাশিত।' এই মায়াবাদ ও মানবমুক্তির ভিতরেই বিবেকানন্দের বিশ্বধর্মের আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত।

'স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদ' ও 'বিবেকানন্দ ও স্যোসালিজম' প্রবন্ধ দুটি সময়োচিত। সাম্যবাদ এবং স্যোসালিজম নিয়ে দেশে দেশে যখন এত উত্তেজনা তখন তার আলোকে বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ ঘটবে এ আর আশ্চর্যের কি!

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যবহুল প্রবন্ধে মার্ক্সবাদের সঙ্গে স্বামীজীর পার্থক্য বিচার করে তাঁকে বৈদান্তিক স্পোসালিষ্ট বলেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শশীভূষণের বক্তব্যটি চিত্তস্পর্শী। মানুষের প্রতি স্বামীজীর অসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ব বোধ এবং এই মমত্ব বোধ থেকেই স্বাভাবিক ভাবে এসেছে সমত্ব বোধ। এই সমত্ব বোধই একত্বে পর্যবসিত। বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্বামীজীর আধুনিকতা, স্বাদেশীকতা, শিক্ষাতত্ত্ব থেকে গদ্য রচনা সঙ্গীতসাধনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই আলোচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শংকরের 'বিবেক-বাণী' ব্যাঙ্গাত্মক রচনাটি সুখপাঠ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এই সংকলনে যে স্থানোচিত হয় নি সে কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। শ্রীকুমার বাবুর রচনাটির বঙ্গানুবাদ গৃহীত হলে সংকলনটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেত।

এই সংকলনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের সামগ্রীক রূপ তুলে ধরবার প্রয়াস অনেকাংশেই সফল শ্রমে পরিণত হয়েছে। বহুজনের হৃদয়ে যিনি স্থিত, বহুমননের প্রতিফলনে তিনিই পল্লবিত। তথাচ তিনি এক এবং সেই একক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিপ্রতিভাটির নবরূপ, সমাজরূপ এবং প্রজ্ঞারূপ প্রকাশনে সম্পাদকত্রয় যে পরিমাণ শ্রম, রুচি ও মননের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বহুদিনের অভাব মোচন করে তাঁরা সবার প্রশংসা ধন্য হয়ে রইলেন।

প্রতিমা মজুমদার

# আহারের পর দিনে

# সব ঋতুতে লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 May. '64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

টাসানল

দ্বাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

# আহারের পর দিনে দু'বার..

# সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

একটা জাতির ভিতরকার মনটিকে বুঝতে হলে তার জনতার বাইরের কার্যকলাপের চেয়েও বেশি করে দেখতে হয় তার শিল্প আর সাহিত্যকে। মনের সন্ধান এরই মধ্যে মেলে, তার শান্ত গম্ভীর চিন্তাধারার সাক্ষাৎ, কোনো-একটি মুহূর্তের সাময়িক উত্তেজনা বা সংস্কার তাকে ব্যাহত করতে পারে না।

—জওহরলাল নেহেরু

শ্রদ্ধানত চিত্তে
আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

# অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার কর্মস্থল অবিভক্ত বাঙ্গলার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত অবিভক্ত বাঙ্গলার বাখরগঞ্জ জেলার ( বরিশাল ) গৈলা গ্রামের এক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পরিবারের সন্তান। কালীপ্রসন্নের পিতামহ কবীন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বব্যয়ে নিজ নামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এই বিদ্যায়তনের নাম ছিল কবীন্দ্র কলেজ। এই কলেজে দেড়শত ছাত্র বিনা বেতনে শুধু অধ্যয়নই করিত না, বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানও লাভ করিত। এই বিদ্যালয়ে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও আয়ুর্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। জীবদ্দশায় কবীন্দ্র নিজেও এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত এই অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয়টি বর্তমান ছিল।

এই সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারে কালীপ্রসন্নই প্রথম ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন এবং সরকারী সার্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত হন। শিশুকালে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির বিকাশ দেখা দেয়। ৫ বৎসর বয়সে আদৌ সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় দিতে পারিতেন। কীর্তন শুনিতে শুনিতে অথবা গঙ্গাতীরে তিনি অনেক সময় ধ্যান মগ্ন হইয়া যাইতেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথের পিতা কলিকাতার কালীঘাটে বাস করিতেন। বহুলোক এই সময় কালীপ্রসন্নের গৃহে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন, এই সমস্ত দর্শকদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভু জগবন্ধু, শিবনারায়ণ পরমহংস প্রভৃতির মত মহাপুরুষেরাও থাকিতেন। তদানীন্তন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রাদিতে এই অদ্ভুত বালকের অলৌকিক শক্তির কথা বিস্তারিত প্রচারিত হইয়াছিল। অচিরকালের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের মধ্যে "খোকা ভগবান" নামে বিখ্যাত হইয়া পড়েন। সদাসর্বদা লোক সমাগমে

পুত্রের মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কায় সুরেন্দ্রনাথের পিতা সুরেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের এই অলৌকিক শক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেলেও তাঁহার অসাধারণ মেধা শক্তি ও পাঠানুরাগ সকলের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিত। ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই কারণ পাঠ্য অপেক্ষা পাঠ্য বস্তু বহির্ভূত বিষয় পাঠেই তাঁহার সময় নিয়োজিত হইত। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাকালেও তিনি অতি দুরূহ বিষয় সমূহ এমন কি বিজ্ঞানের নীরস বিষয়ও অধ্যয়ন করিতেন। সুরেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরও দুষ্পাঠ্য ছিল, পরীক্ষকেরা তাঁহার হাতের লেখা পড়িতে না পারায় তাঁহার প্রদত্ত উত্তর পত্রের প্রতি সুবিচার দেখাইতে পারিতেন না। কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল, ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীতে সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, বহু ভাষাবিৎ হরিনাথ দে ও উত্তরকালের সুবিখ্যাত চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন এই পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল যাহাই হউক না কেন সুরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই জনসমাজে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ রূপে খ্যাতি লাভ করেন। পাণিনি ব্যাকরণ এবং হিন্দু দর্শনে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ অধ্যাপকেরা দুইবার সুরেন্দ্রনাথের বিদেশে অধ্যয়নের জন্য State scholarship এর ব্যবস্থা করেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ দুইবারই এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজে সংস্কৃতের অস্থায়ী লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরেই তিনি চট্টগ্রাম্ কলেজের সংস্কৃতের স্থায়ী অধ্যাপকরূপে চট্টগ্রামে আসেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পতঞ্জলির যোগদর্শন সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীফীথ্ পুরস্কার লাভ করেন (১)। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। চট্টগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ দৈনিক ১৪ ঘণ্টা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের চিত্তে উদিত হয়। খৃষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য তাঁহার "সর্বদর্শন সংগ্রহে" প্রথম ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। মাধবাচার্যের আলোচনা অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত এবং অপূর্ণাঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথ শাখা প্রশাখা সহ সমস্ত ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও বিশ্লেষণে কৃতসঙ্কল্প হন। ভারতীয় দর্শনের শাখাপ্রশাখাগুলি সম্বন্ধে বহু পুস্তক এখনও অমুদ্রিত আছে। বহু অমুদ্রিত পুঁথি এবং হিন্দু দর্শনের মূল গ্রন্থ ও তাহাদের ভাষ্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পিত গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে বহু পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন। চট্টগ্রামের ন্যায় মফঃস্বল সহরে এইগুলি কোন পাঠাগার হইতে পাওয়ারও সুবিধা নাই। সুরেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা ও সাধনার বিষয় জানিতে পারিয়া এবং পুস্তকাভাবে তাঁহার

অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য মাসিক তিনশত টাকা সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের বিদ্যানুরাগ দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে তিনি তাঁহাকে নিজব্যয়ে ইউরোপীয় দর্শন পাঠের জন্য ইউরোপ পাঠাইতে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহারাজের নির্বন্ধাতিশয্যে ও নিজের অপরিসীম জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে আগমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Trinity collegeএ প্রসিদ্ধ দার্শনিক Dr. Md. Teggartএর নিকট ইউরোপীয় দর্শন পাঠ আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D উপাধি লাভ করেন। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকপদ লাভ করেন। কেম্ব্রিজে অবস্থিতিকালেই, তাঁহার পরিকল্পিত ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হয় ( A hisrory of Indian Philosophy Vol I—1922 )। এই খণ্ডে বেদ ( সংহিতা ), ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও শঙ্করাচার্যমতানুযায়ী বেদান্তদর্শনের চিন্তাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মাধবাচার্যের পর সুরেন্দ্রনাথই প্রথম সকল ভারতীয় দর্শনগুলির ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে ব্রতী হন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইউরোপের দার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যায় সুরেন্দ্রনাথের অপূর্ব মনীষার দীপ্তিতে বিস্মিত হইয়া যান। অতঃপর কেম্ব্রিজে শিক্ষার্থীরূপে আগত সুরেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ত্বজ্ঞ ও সংস্কৃতবিদ্ কেড্ রীথ্ উইলিয়ম টমাস সুবিখ্যাত Hibbert Journal পত্রিকায় এই পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"Our Dasgupta's work is the first attempt at a comprehensive exposition of the Indian Philosophies generally. He is thoroughly at home in all the difficult and important texts...His intelligence is alert and candid and has the historical sense"—(Hibbert Journal. Vol. 20, 1921-22).

কেম্ব্রিজে অবস্থিতিকালে সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডনের Aristotleian Society ও কেম্ব্রিজের Moral Science Club নামে দার্শনিক সংস্থাগুলির আলোচনাচক্রে যে সব বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হইত তাহাতে যোগদান করিতেন। এই সব বিতর্ক সভায় প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের তিনি প্রায়ই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে International Philosophical Congressএর যে অধিবেশন হয়, সুরেন্দ্রনাথকে তাহাতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এই অধিবেশনের প্রতিনিধিগণ বিশেষ উৎসাহিত হন। তাঁহার ভাষণাদিও সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে তাঁহার কার্যে যোগদান করেন। এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয় (২)।

ইংল্যাণ্ডের সর্বজনমান্য দার্শনিক অধ্যাপক ডাঃ ম্যাক্‌টেগার্ট, ডাঃ ওয়ার্ড প্রভৃতি যাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক মনে করেন এবং বিদেশী হওয়া সত্বেও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহাকে নিজেদের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিক দার্শনিক সম্মেলনে প্রেরণ করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করেন, সেই ব্যক্তিকে প্রাদেশিক সার্ভিসের গ্রেডে আবদ্ধ রাখিতে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ সম্ভবতঃ লজ্জিত বোধ করিয়াছিলেন। বহু বিলম্বে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন সার্ভিস পর্যায়ে উন্নীত হন ও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান দর্শনাধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এই বৎসরই যোগদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৩)। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেই সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে নেপলসে (ইটালী) অনুষ্ঠিত International Philosophical Congressএ যোগদান করেন। এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করেন যে বিশ্ববিশ্রুত প্রসিদ্ধ দার্শনিক Beneditto Croce তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় যাহা কিছু বলিয়াছেন বৌদ্ধদর্শনের মধ্যেই তাহার বীজ নিহিত আছে। বৌদ্ধদর্শনের চিন্তার সঙ্গে ক্রোচের মতের যেখানে মিল নাই সেখানে ক্রোচের মতটিকেই তিনি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। ক্রোচে স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অভ্রান্ত যুক্তিজাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড সহরে অনুষ্ঠিত International Philosophical Congress-এ সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। অধিবেশনান্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দশ বারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। এই সময়ে Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি Harris foundation নামীয় বক্তৃতামালায় হিন্দুর অধ্যাত্ম চিন্তা সম্বন্ধে ছয়টি ভাষণ দান করেন (৪)। আমেরিকা ভ্রমণান্তে অধ্যাপক দাসগুপ্ত নিমন্ত্রিত হইয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে অষ্ট্রিয়ায় আসেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র ও তাঁহার নিজের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি দিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দিকপাল পণ্ডিতগণই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকিতেন তাঁহার উপর শুধু সংস্কৃত কলেজ নহে উপরন্তু সমস্ত বঙ্গের চতুষ্পাঠীগুলির শিক্ষা ও পরীক্ষা পরিচালনের ভারও ন্যস্ত থাকিত। ১৯৩১ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে এই গুরু দায়িত্ব অতি যোগ্যতার সহিত বহন করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বারাণসীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্ম মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন থাকা কালে ১৯৩৫—৩৬ ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে—এই কয়টি বৎসর অধ্যাপক দাসগুপ্ত ভিজিটিং প্রফেসররূপে আমন্ত্রিত হইয়া রোম, মিলান, ব্রেজলাউ' কনিগস্‌বুর্গ, বার্লিন, বন, কোলোন, জুরিখ্, প্যারিস, ওয়ারস ও ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক অনেকগুলি বক্তৃতা দান করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে একটি অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতাদান কালে প্রতিনিধিগণ পুনঃ পুনঃ হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুরেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান ছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময়ে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র তাঁহার ভাষণগুলি বিদগ্ধ জনমণ্ডলীকে এরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল যে এই সময়ের কথা উল্লেখ পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতজ্ঞ M. Reonow লিখিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের প্যারিসে বাসকালে তাঁহাদের মনে হইত যে স্বয়ং পতঞ্জলি অথবা শঙ্করাচার্য তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের শৈশবকালে বহুলোক তাহাকে কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। মনীষী রেণোর উক্তিতে তৎকালীন ব্যক্তিগণের এই ধারণারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয় সুরেন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক ডি, লিট্ উপাধি দান করেন। এই উপলক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ ইটালীয় সরকারের অতিথিরূপে এই দেশে আগমন করিলে তাঁহাকে সামরিক অভ্যর্থনা সহকারে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ইউরোপে ইতিপূর্বে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা আর কেহই পান নাই। ডিগ্রি গ্রহণকালে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পকলার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ইটালীয়ান ভাষায় একটি অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এই অপূর্ব বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৫)। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ওয়ারস (পোল্যাণ্ড) এর Academy of science এর সম্মানিত ফেলো ও লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি অফ লিটারেচর নামক বিদ্বজ্জন সংস্থার সভ্যরূপে সম্মানিত হন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে stephanos Nirmalendu Ghose বক্তৃতা মালায় ভাষণ দান করেন। তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাগুলি বিশ্বের দর্শনভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলিয়া বিবেচিত হয় (৬)।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ভারত সরকার কর্তৃক C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধানাধ্যাপক নিযুক্ত হন (King Gearge V Professor of mental & moral science)। সুরেন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন এইপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিন বৎসরকাল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকদের দ্বারা অলঙ্কৃত এই বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদে কার্য করার পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরেন্দ্রনাথ হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন কিন্তু অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও ইচ্ছাশক্তির জন্য তিনি রোগের বশীভূত হইয়া শয্যা গ্রহণ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে অবসর গ্রহণের পরেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ আসে। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ ব্যারিডেল কীথের মৃত্যুতে এই পদটি শূন্য হয়। চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া সুরেন্দ্রনাথ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে যোগদান করার জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ড পৌঁছিয়া তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিনীতি কলেজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা দান করেন। জনসাধারণের সম্মুখে ইহাই তাঁর শেষ বক্তৃতা। ইহার পর পাঁচ বৎসরকাল তিনি শয্যাশায়ী হইয়া ইংল্যাণ্ডেই অবস্থান করেন। অদম্য জ্ঞানপিপাসার বলে শয্যাশায়ী অবস্থাতেও এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান সাধনা অব্যাহত ছিল। ' অধ্যাপক দাসগুপ্ত রচিত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এই খণ্ডে শঙ্কর বেদান্ত, যোগবাশিষ্ঠ, ভগবদ্গীতা ও আয়ুর্বেদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় আদর্শবাদ নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭)। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ভাস্কর সম্প্রদায়, পঞ্চরাত্র, আড়বার সম্প্রদায় বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ, যামুন, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতগুলি এই খণ্ডের উপজীব্য ছিল। ইংল্যাণ্ডে পাঁচবৎসর কাল রোগশয্যায় থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করেন। ভাগবতপুরাণ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য ও শ্রীচৈতন্যের মতগুলি এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পাদন করেন। প্রায় সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকের প্রায় অর্ধেক অংশ (ভূমিকা, অলঙ্কার সাহিত্য ও টিকা, টিপ্পনি) সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে স্বয়ং রচনা করেন। বাকী অংশগুলি সুপণ্ডিত ডাঃ সুশীলকুমার দে কর্তৃক রচিত হয় (৮)। এই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইংরাজীতে রচনা করেন (৯)।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রোগজীর্ণ শরীরে কোনরূপে ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লক্ষ্নৌ-এ তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা ডাঃ সুরমা দাসগুপ্তার তত্ত্বাবধানে বাস করিতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ও ভারতীয় অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থরাজি এবং ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্বৎসংস্থায় ভারতসংক্রান্ত তাঁহার ভাষণাবলী শুধু তাঁহাকেই যশোমণ্ডিত করে নাই, পরাধীন ভারতের উচ্চকোটির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বিশ্বজগতকে অবহিত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, ডাঃ বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির ন্যায় এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের নামও অবশ্য স্মরণীয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার নিজস্ব দর্শন লিপিবদ্ধ করিতে ও তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্রনাথ আজীবন তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনায় সময় ক্ষেপ করিয়াছিলেন, ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি বহু লুপ্ত দার্শনিক গ্রন্থ উদ্ধার করেন ও সেইগুলি সযত্নে পাঠ করিয়া ইহাদের মর্মার্থ তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। পণ্ডিত নেহেরুর নির্বন্ধাতিশয্যে ও ব্যক্তিগত

সহায়তা লাভ করিয়া রোগজীর্ণ শরীরে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের শেষ খণ্ড রচনার জন্য পরিশ্রম করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এই শেস খণ্ডে তিনি প্রধানতঃ ভারতের শৈবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এই আলোচনার মূল অংশ দক্ষিণ ভারতের শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা রচনা শেষ করিয়া উত্তর ভারতীয় শৈবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা রচনা শেষ করার পূর্বেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বেও তাঁহাকে দার্শনিক আলাপে রত থাকিতে দেখাগিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ ছিল। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনায় মনঃসংযোগ করার জন্য তিনি তাঁহার এই মত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ ও ডাঃ মুইরহেড্ সম্পাদিত Contempory Indian philosophy (London,1936) গ্রন্থের ২৫১—২৮৫ পৃষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব দার্শনিক মতটি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে (philosophy of dependent emargence)। সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব মতে ঈশ্বর শুধুই বিশ্ব নির্মাতা আমাদের দুঃখ পরিত্রাতা অথবা আমাদের ইচ্ছা পূরণের অধিকর্তা নহেন। আমাদের মনে যে ন্যায়নীতি ও প্রজ্ঞাবুদ্ধি আছে তাহার মধ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, এইভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্বাকে তিনি উর্ধমুখী করিয়া তুলেন এবং আমরা তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হই। প্রেমই এমন এক বস্তু যাহা আমাদিগকে জৈবিক প্রয়োজনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উর্ধে লইয়া যায়। এই প্রেমের উৎস একান্ত সৎআদর্শপরায়ণতা। প্রেমই জীবকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করে, আর অন্যদিকে প্রেমের প্রভাবে ঈশ্বর জীবের সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত অংশটুকু তাঁহার ভারতীয় দর্শনের শেষ ও পঞ্চম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলিয়া—মনে করা যাইতে পারে যে, সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার কাজ তিনি তাঁহার আজীবন সাধনায় সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন (১০)।

সুরেন্দ্রনাথ রচিত আরও কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রচারিত হইয়াছে (১১-১২)। সুরেন্দ্রনাথ রচিত একটি ইংরাজী কবিতাসংগ্রহ ইংরাজসমালোচকদের সবিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল (১৩)।

এ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের রচিত ইংরাজী গ্রন্থগুলির কথাই আলোচিত হইয়াছে, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ইউরোপ প্রবাসকালে জার্মান ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান প্রভৃতি ভাষাগুলিও যত্ন সহকারে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিবিধ ভাষাভিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি মাতৃভাষা বাঙ্গলার পরম অনুরাগী সেবক ছিলেন। 'ভারতবর্ষ,' 'বিচিত্রা,' 'প্রসাসী' প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রগুলিতে সুরেন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলা-ভাষায় তত্ত্বকথা নামে একটি দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে অন্যান্য হিন্দুদর্শন এবং ইউরোপীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা পূর্বক তিনি দেখাইয়াছিলেন যে মতবাদের দিক হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (১৪)। বাঙ্গলা ভাষায় দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার আরও দুইটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫-১৬)।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—

বিজয়িনী (১৯৩৯), চারণ (১৯৪২) চারণী—(১৯৪০) ও ক্ষণলেখা প্রভৃতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে ক্ষণলেখা কাব্যগ্রন্থটি এইভাবে উৎসর্গীকৃত হয়ঃ

'নিখিলমনুজ পূজাদীপ্ত রশ্মি প্রবাহে অমল শরীর ধারে মিশ্রনং যাতু ভৌমঃ
জ্বলতু মম শিখেয়ং ম্লানশোভাবগাহে। কবিরবতু রবীন্দ্রো বাক্‌পতি সার্বভৌমঃ।'

ক্ষণলেখা পাঠ করিয়া কবিগুরু সুরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন 'ক্ষণলেখা' নামটি সঙ্গত হয়নি। সময়ের সীমার দ্বারা এর পরিচয় নয়······ইংরাজীতে যাকে classic কবিতা বলে তোমার কবিতা সেই রীতির······এ বড়ো সভার জন্যে পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত, এর মধ্যে অনবধানতা ও অপরিপাট্য নেই।' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫)। শিল্পকলা ও রসতত্ত্ব বিচারে সুরেন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার রচিত 'কাব্যবিচার,' 'রবি-দীপিতা' 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা' ও 'সাহিত্য পরিচয়' এই চারিটি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পুস্তকে বিধৃত রহিয়াছে। এই চারিখানি পুস্তকই বাঙ্গলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ (১৭—২০)।

"রবি-দীপিতা" গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল", "ফাল্গুনী" ও "বলাকা"র আলোচনা এবং "রবীন্দ্র সাহিত্যে কান্তা প্রেম" ও "কান্তা প্রেম-মহুয়া" নামে আরও দুইটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকের পূর্বভাগে একটি সংস্কৃত শ্লোক যুক্ত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই পুস্তক কবিগুরুকে উৎসর্গ করেন—"যদানন্দাভিষেকেন চেতো মম নবায়তে।
তৎপ্রীতিপূতাচিত্তেন তুভ্যমেতৎ প্রদীয়তে॥"

রবিদীপিকা পাঠ করিয়া কবিগুরু তাঁহাকে লেখেনঃ "ইতিপূর্বে কোন কোন গ্রন্থে আমার কাব্যের আলোচনা দেখেছি কিন্তু সে যেন শরীরতত্ত্বগত দেহের বিশ্লেষণ, তাতে মর্মগত প্রাণের সন্ধান পাইনি। তুমি সেই প্রাণরহস্য উদ্ঘাটন করেছ বলে মনে করি।"

প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক থাকাকালে এই কলেজে রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার জন্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের লইয়া "রবীন্দ্র পরিষদ্" গঠন করেন। সুরেন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর কাল এই পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের এই পরিষদের সভাপতি থাকাকালে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কবিকে সম্বর্ধিত করা হয় (দ্রঃ—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৪)। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩৩৬) সুরেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কবি স্বয়ং রবীন্দ্র পরিষদে "সাহিত্যের স্বরূপ" (২রা ভাদ্র) ও "সাহিত্য বিচার" (৫ই ভাদ্র) নামে দুইটি ভাষণ দান করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতাকালে কবিগুরুকে সংস্কৃত কলেজ হইতে "কবি সার্বভৌম" উপাধি দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ রচিত অভিনন্দন পত্রটি বিচিত্রা পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৩৮)।

সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গ কবিগুরুর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কবিগুরু চারিবার দার্জিলিং জেলার মংপুতে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" (১৯৪৩) নামক একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কবির মংপুতে অবস্থিতি কাহিনীর একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে কিরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন "সেঁজুতি" কাব্যগ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত একটি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পত্রোত্তর

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত—

বন্ধু;

চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্রললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গন দ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা ;
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণা তারে
পরমের সুরে চরমের গীতি কলা।

*　　*　　*

কী আছে জানিনা দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে,
এ প্রাণের কোন ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।
জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

মংপু, দার্জিলিং ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থ হইতে ( রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ৫৫২-৫৩)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে মাজুতে ( হাওড়া ) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ দর্শন শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি পদেও বৃত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর সুরেন্দ্রনাথ ১৫,০০০ পুস্তক সমন্বিত তাঁহার বিপুল পুস্তক-সংগ্রহ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্মৃতি রক্ষার্থ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসুলভ বিজীগিষা সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি দুর্বলতা ছিল। প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিতেন। এইজন্যই অনেকে তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিতেন। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতেন, ব্যক্তিহিসাবে তিনি কখনই প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেন নাই। ছাত্রবৎসলতা তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। "অধ্যাপক" (১৯৪৪) নামক স্বলিখিত একটি উপন্যাসে আদর্শ অধ্যাপকের যে চরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন উহা মূলতঃ তাঁহারই নিজের প্রতিকৃতি। সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যাহা অন্যায় মনে করিতেন না অথচ যাহা লোকচক্ষে দূষণীয় এরূপ কার্য করিতে তিনি কখনও পশ্চাদপদ্ হইতেন না।

বাল্যকালে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি দেখা যাইত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা অদৃশ্য হইলেও তাঁহার অধ্যাত্ম চেতনা অতি উচ্চস্তরের ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি না হইলেও তিনি সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় থাকিতেন ও বলিতেন যে ঈশ্বর সর্বত্রই তাঁহাকে তাঁহার কর্মপথে পরিচালিত করেন ও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এই গভীর অনুভবের প্রেরণাতেই সুরেন্দ্রনাথ দারুণ রোগযন্ত্রণা, সাংসারিক ক্ষয়, ক্ষতি ও লাঞ্ছনাকে প্রসন্নচিত্তে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু বৃত্তিতে নহে জীবনধর্মেও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রকৃত দার্শনিক।

(১) The Study of Patanjali, Griffith Prize Essay—1915, Calcutta, 1920.

(২) General Introduction of Tantra Philosophy, Calcutta, 1922.

(৩) Yogo as Philosophy and Religion, London, 1924,

(৪) Hindu Mysticism (Norman Harris Foundation Lectures, 1926), Chicago, 1927. (৫) Fundamentals of Indian Art, Bombay, 1954.

(৬) Religion and Rational outlook, Allahabad, 1954.

(৭) Indian Idealism—Cambridge 1933, Reprinted 1962.

(৮) A History of Sanskrit Literature, Vol I, Calcutta University, 1947 Reprinted 1962. (৯) Rabindranath the poet and philosopher, Calcutta 1948.

(১০) A History of Indian Philosophy—Vol I Cambridge, 1922 (Reprinted 1932, 1951) ; Vol II—Cambridge 1932 ( Reprinted 1952 ) ; Vol III, Cambridge, 1940 (Reprinted 1952) ; Vol IV—Cambridge 1949 ; Vol V—Cambridge 1955. (১১) Philosophioal Essays, Calcutta 1941.

(১২) The Yoga Philosophy in relation to other systems of thought, Calcutta University. (১৩) The Vanishing Lines, Calcutta, 1956.

(১৪) তত্ত্বকথা—১৯১৭। (১৫) দার্শনিকী—কলিকাতা, ১৯৩৬। (১৬) ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। (১৭) রবি-দীপিতা, কলিকাতা, ১৯৩৪। (১৮) কাব্য-বিচার কলিকাতা ১৯৩৯। (১৯) ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা „ ১৯৪২। (২০) সাহিত্য পরিচয় কলিকাতা।

# রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মন

## অমিয়কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ কবি, বিজ্ঞানী নন। একথা বলার কারণ এই যে বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে নিরীক্ষণের সমুদ্র অতিক্রম ক'রে প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত কোন রহস্যকে উন্মোচিত করেন অথবা কোন নূতনতর সিদ্ধান্তে উপনীত হন—কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে তদ্রূপ কোন ঘটনার সম্ভাবনা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ আশ্চর্যের এই যে উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান-বিমুখ বঙ্গভূমিতে লালিত হয়েও এবং কাব্য-সরস্বতীর আরাধনায় সাধন-ভূমিতে একনিষ্ঠ সাধকের গৌরব অর্জন করেও তাঁর অন্তরে বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভূত হতো। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এ-জন্যেই নয় যে 'ছিন্ন কবুতরের পুনর্জীবন লাভ' বা 'শ্যামদেশীয় যমজ ভগ্নী' অথবা 'হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি চমকপ্রদ সংবাদের মতো লেখকও রবীন্দ্রনাথকে 'বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ' ক'রে তুলবার অপপ্রয়াসে ব্রতী হবেন।

একথা চিন্তা করলে অবশ্যই বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে যথার্থ বিজ্ঞানীদের অনেকে জীবনের ক্রমাগ্রসরতার পক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগে অলৌকিক তত্ত্বকে মিশিয়ে ফেলেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই অতি অলৌকিকতাকে পশ্চাতে রেখে যথার্থ বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে গেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের বক্তব্যকে তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে বিচার করেছেন রূপের পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মতো পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ ঘটাননি। এ-কারণেই হয়তো তাঁর রচিত 'বিশ্ব পরিচয়' বইটি স্বধর্মচ্যুত হয়নি। কবি বা দার্শনিকের কোন তত্ত্ব এতে স্থান পায়নি। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর একটি নিজস্ব দর্শন গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে। কাণ্ট, বের্গসঁর সংগে উপনিষদের পরমতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। অথচ বিজ্ঞানের প্রতি কখনো তাঁর অনীহা তো জন্মেইনি, বরং তাঁর সমগ্র রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে কোনদিনই তিনি বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেননি।

জীবন-সায়াহ্নে ভগবানের উপর তাঁর বিশ্বাস আগেকার মত দৃঢ় ছিল একথা জোর দিয়ে বলা চলে কিনা তাতে যথেষ্ট সংশয় আছে, তবে মানুষের আত্মশক্তির উপর, বিজ্ঞানশক্তির উপর যে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছিল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কবির বিজ্ঞানপ্রীতি নিয়ে শ্রীযুত অন্নদাশংকর তাঁর এক গ্রন্থে ১ লিখেছেন, "তাঁর (কবির) সংগে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯২৪ সালে। সে সময় লক্ষ্য করি তিনি আহারের পর বিশ্রাম করছেন হেলান দিয়ে। হাতে একখানা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর রুচি ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি আমার গৃহিণীর মুখে শোনা। কবির মহাপ্রয়াণের বছর খানেক আগে আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি। কয়েক মাস থাকি। বিশ্বভারতীর একটি ছাত্র আমাদের কাছ থেকে হগ্‌বেনের বিখ্যাত বই "ম্যাথেমেটিকস্ ফর দি মিলিয়ন" পড়তে নেয়। পরে তাই দেখে অঙ্ক কষে অধ্যাপককে অবাক

ক'রে দেয়। প্রণালীটা কোথায় পেলে, জানতে চান অধ্যাপক। তখন সে বইখানা তাঁকে দেখায়। বই আর আমাদের বাড়ীতে ঘুরে আসে না। খোঁজ, খোঁজ। আমার গৃহিণী অবশেষে শুনতে পান বই চলে গেছে গুরুদেবের হাতে। তিনি তন্ময় হয়ে পড়ছেন। একেই বলে "গৃহীত এব কেশেষু"। মৃত্যু যখন তাঁর কেশ স্পর্শ করেছে তখনো তিনি নিবিষ্টচিত্তে অংকশাস্ত্র পড়ে নিচ্ছেন। শুধালে উত্তর দেন, যাবার আগে ভরিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে কেবল যে আপনাকে ভরিয়ে নিয়েছিলেন তাই নয়, ধর্মের সংগে বিজ্ঞানের মেল বন্ধন করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে অনুমান করলে অযথা হবে না।"

১৯৩৭ সালে রচিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে। মানুষের বিবর্তন তো কেবলমাত্র বাইরেকার ব্যাপার নয়, সংস্কৃতিগত—অর্থাৎ অন্তরের দোরগোড়াটা পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায়। অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদের ধারা দেখতে গেলে শুধু দেহের দিকে তাকালেই হয় না, তাকাতে হবে মনের দিকে। দৈহিক ও প্রাণগত বিবর্তনের সংগে সংগে মানসিক এবং সামাজিক দিকের বিবর্তন কতটা হয়েছে তাও লক্ষ্য করতে হবে। জুলিয়ান হাক্সলী এই মত পোষণ করেন এবং আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ বা অভিব্যক্তিবাদের বিজ্ঞানীরাও এই মত স্বীকার করেন। মানুষতো গাছ বা জন্তুর মত কালের হাতের ক্রীড়নক নয় আবার যান্ত্রিক পুতুলও নয়। নানা পরিবেশ তার মনে নানাধরণের প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টি ব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে রইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানতঃ প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষ এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল।"২

মানুষ একদিকে একক আবার অন্যদিকে সে বহুধা বিভক্ত। মানব দেহের জীবকোষের জন্ম-মৃত্যু কবি অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন—"মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অনুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ, সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবন সীমায় বর্ত্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবন সীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সেখানে তারা আশ্চর্য।"২

সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি বোঝাবার জন্য কবি সুন্দর উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন "একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎ মণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেই রকম দেখা যেত, তাহলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত পৃথকই হোক এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। আমরা যখন লোহা দেখছি তখন বিদ্যুৎকণা দেখছিনে, দেখছি সংঘরূপকে।"২

উপনিষদের নানা তত্ত্বকে বিজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটিকে খুবই সরসভাবে হাজির করা হয়েছে। "উপর থেকে নিচে পড়ল একটা পাথর। দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই যে পড়েছে। নিচের দিকে উপরের বস্তুর যে টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই-যে'। কিন্তু 'এই যে, কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান। উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন, প্রতিবোধবিদিতম।"

মানুষের স্বভাব অনির্দিষ্টের দিকে ঝুকে পড়া। প্রকৃতি তাকে যে আবর্তনের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা সে সব সময় মেনে চলতে চায় না। অজ্ঞাত, অচেনা জগতের দিকে তার আকর্ষণ হয়ে ওঠে প্রবল। মানুষ নিজের কল্পনাতে সৃষ্টি করেছে দেবলোক। সে হঠাৎ ভাবাবেগে বলল দেবলোক থেকে এই আদেশ এসেছে সেই হুকুম অমান্য করবার জো নেই। মানুষ বলছে দেবলোক আমাদের আকর্ষণ করছে কিন্তু সেই দেবলোকের দেবতার অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মধ্যেই আবার দ্বন্দ্ব চলছে। এই অদৃশ্য শক্তিমান বস্তুটি যাই হোন না কেন, তিনি মানুষকে স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। এই আকর্ষণের সত্যটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে গেছেন বিজ্ঞানের উপমার সাহায্য নিয়ে। "জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহমনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতি নির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি ক'রে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে।"৩

মানব মনের বিচিত্র ভাবের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন আমাদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন ধরণের 'আমি' আছে। এক হচ্ছে 'ছোটো-আমি' বা 'ব্যক্তিগত আমি' আর একটি হচ্ছে 'বড় আমি' আমাদের চেতনাকে মহত্তর পথের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ত্যাগে আর ওরই পাশে যে 'ছোটো আমি' আছে সে চায় সঞ্চয় করতে। দুই বিপরীত সত্তা আমাদের ভিতরে নিরন্তর তাদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এক সত্তার টানে আমরা পার্থিব ধন সম্পদ ক্রমাগত সঞ্চয় করে চলেছি, ঠিক তারই বিরোধী সত্তার প্রভাবে ত্যাগ করে যাচ্ছি সঞ্চিত বস্তুকে। এই দুই ধরণের বেগ জ্যোতির্লোকেও বর্তমান। এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন, "পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলছে সেও এই দুই রকমের বেগে। একদিকে ব্যক্তিগত আমির টানে ধন-সম্পদ প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে, আর একদিকে অমিত মানবের প্রেরণায় পরস্পরের সংগে তাঁর কর্মের যোগ, তাঁর আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি।"

মানুষ একসময় ছিল বর্বর, তার জীবন ছিল পশুর মতো, তখন কেবলমাত্র 'ভৌতিক জীবনের' সীমায় তার কর্ম আবদ্ধ থাকতো। ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল ধী-শক্তি তার তমসাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে—চৈতন্যে রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে। কবি রজুবের একটা বাণী আছে। তিনি বলেছেন—

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁট।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥"

অর্থাৎ সব সত্যের সংগে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর। কথাটা বিজ্ঞানীর কাছে অতি সত্য। বিজ্ঞানী যা সত্য বলে উপলব্ধি করবেন তাকে সমস্ত মানুষের বিরোধীতার সামনেও বলতে হবে। শুধু বিজ্ঞানীকে নয়, যিনি মানবাত্মা পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রে চৈতন্য লোকে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন, তাঁকে সমস্ত বিভীষিকার মধ্যেও বলতে হবে ওই কথা 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও একদিন তাঁর উপলব্ধির কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে গিয়েছিলেন বলেই চরম বিপদের মধ্যে যেতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবল শত্রুর কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না। এ সম্বন্ধে কবি লিখছেন "একদা যেদিন কোনো একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেদিন এই একজন মাত্র মানুষই বিশ্ব মানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেছেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ; তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েছে, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে; তাদের সংখ্যা যত বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক্, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করলে। সেদিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেছে সোঽহং, অর্থাৎ আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক—তিনিই বলেছেন যাঁকে সেদিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।"[৪]

১৯৩৮ সালে লেখা 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে কবি তাঁর ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যেভাবে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন তা দেখলে অবাক হতে হয়। ভাষার মমতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশ শক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে। জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ে বৈচিত্র্য আছে; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই।" ভাষা বিজ্ঞানীরা কাঠামো বিচার ক'রে ভাষার জাত নির্ণয় করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রায় সমস্ত শব্দেরই একটা মূলধাতু আন্দাজ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে কবি বলেছেন "প্রাণজগতে প্রাণী সৃষ্টির আরম্ভ দেখা দেয় একটি একটি ক'রে জীবকোষ, তার পরে তাদের সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব। এক-একটি জীব এক-একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে। জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।" ( বাংলা ভাষা পরিচয় )

বিজ্ঞানের ছাত্ররা 'পদার্থ' বলে একটি শব্দের সঙ্গে খুবই পরিচিত। সত্যি কথা বলতে পদার্থ বলে কোন জিনিষ নেই। জল, মাটি, পাথর, লোহা নানা বস্তু আছে। এমন ধরণের অনির্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বেঁধে দেয়। কিন্তু কেন? দরকার আছে বলেই বাঁধে।

কবি বলেছেন, 'বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটি বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে বলে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এইসব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি। বোঝা হাল্কা করা এইসব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা।" ( বাংলা ভাষা পরিচয় )

বিজ্ঞানের ভাষা কেমন হওয়া উচিত তাও কবি বলছেন—'মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।' সাহিত্যের ভাষা এবং বিজ্ঞানের ভাষা এক নয়। পার্থক্য দেখিয়ে কবি বলেছেন 'হৃদয় বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। ভাবের ভাষা যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ, ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।'

'বাংলা-ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না। উদ্ধৃতি দেবার আগে কোন টীকা নিষ্প্রয়োজন ও বাহুল্যমাত্র। 'আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধিপ্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল ও জটিল। ......আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস—তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার যাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহ তারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষা রঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণী লোকের রহস্যে বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহুলক্ষ তারা—চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌছল ; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্র-লোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।' রবীন্দ্রনাথ যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মেজাজের লেখক তা সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে।

কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে বলেছেন, 'বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয়নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে।'

---

তথ্যপঞ্জী : (১) রবীন্দ্রনাথ (২) (৩) (৪) মানুষের ধর্ম

# ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

**বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য**

উত্তর ভারতের মধ্যদেশীয় ভাষা (Mid-land Speech) বলে ভৌগোলিক দৃষ্টিতে হিন্দীর (ঠিক ঠিক বলতে গেলে 'খড়ীবোলী' হিন্দীর) যে স্বাভাবিক সুবিধা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে এই ভাষার একটা, ত্রুটিপূর্ণ হলেও, সহজবোধ্য রূপ, তাতে উত্তরভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা হিন্দীর পক্ষে সহজ হয়েছে। বাংলা ও মরাঠী, ওড়িআ ও গুজরাতী, অসমীয়া ও পঞ্জাবীর মধ্যে যে সম্পর্ক তার চেয়ে প্রতিটির সংগে হিন্দির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। আমি ভাষাতত্ত্বের কথা বলছি না, বলছি পারস্পরিক আদানপ্রদানের কথা। হিন্দীর সঙ্গে কারবার চালাতে সকলেই উৎসুক। হিন্দী সত্যই মহাজন। বাংলাসমেত অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বই হিন্দীতে যত অনূদিত হয়েছে, অন্যভাষার অনুবাদসাহিত্য একসঙ্গে জড়ো করলেও তার কাছাকাছি আসতে পারে না। যে-দক্ষিণভারতের একাংশে (তামিলনাড়ে) হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়, সেখানকার দ্রাবিড় ভাষা-চতুষ্টয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বিচার করলে উত্তর ভারতের হিন্দীকেই অগ্রণী বলতে হয়। দক্ষিণভারতীয়েরাও হিন্দী শিখে নিয়ে তাতে মাতৃভাষার গ্রন্থাদি অনুবাদ করার কাজে লেগে গেছেন। হিন্দীর এই সৌভাগ্য কেবল রাষ্ট্রভাষার দৌলতে নয়, এই সৌভাগ্যের দৌলতেই হিন্দী আজ রাষ্ট্রভাষা।

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রেও হিন্দী পুরোভাগে অধিষ্ঠিত। বাংলার বাইরে ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র-অনুবাদ প্রথম হয়েছে হিন্দীতে—কবির নোবেল পুরস্কার লাভের আঠারো বছর আগে। গোপালরাম গহমরী-অনূদিত 'চিত্রাঙ্গদা'ই (অনুবাদের প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রীঃ) বোধকরি ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে আরও যে-কতগুলি গল্প-উপন্যাস-নাটক হিন্দীতে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে আছে মুকুট, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট ও চোখের বালি। রবীন্দ্রগ্রন্থের অনুবাদ-সংখ্যায় হিন্দী অগ্রণী। রবীন্দ্রসাহিত্যকে স্বতন্ত্রভাবে ২৭টি খণ্ডে অনুবাদ করবার পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে হিন্দীতে। এক একখানি গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদের মর্যাদাও হিন্দিরই প্রাপ্য। গীতাঞ্জলির অনুবাদ সম্পর্কেও কথাটি প্রযোজ্য।

**হিন্দী গীতাঞ্জলি ঃ**

হিন্দী গীতাঞ্জলি পর্যায়ে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে যে-কুড়িটি নাম দেওয়া হয়েছে, জাতীয় গ্রন্থাগারে তার মধ্যে সাতটির কোনো সন্ধান পাইনি। এই সাতটির একটি মৈথিলী অনুবাদ। একটি ছাপা হয়েছে দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল (Braille) পদ্ধতিতে। গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী উক্ত সাতখানির বিবরণ দেওয়া গেল—

| প্রকাশকাল | অনুবাদক বা প্রকাশক | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১৯২৪ | গিরিধর শর্মা নবরত্ন | পদ্যানুবাদ |
| ১৯২৬ | যদুনাথ ঝাঁ | মৈথিলী অনুবাদ |

| প্রকাশকাল | অনুবাদক বা প্রকাশক | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১৯৪৯ | চন্দ্রসেন | |
| ১৯৫৭ | বেদপ্রকাশ, রত্নকুমারী ও শুকদেব | |
| ১৯৬০ ? | কৈলাস কল্পিত | নির্বাচিত গানের পদ্যানুবাদ |
| ১৯৬১ | ভারত সরকার | ব্রেইল পদ্ধতিতে ছাপা |
| ? | সুষমা সাহিত্যমন্দির, জব্বলপুর | |

বাকি তেরোখানি আমরা নাড়াচাড়া করে দেখেছি। এগুলির মধ্যে একখানি হল সত্যকাম বিদ্যালঙ্কারের অনুবাদ। এই গ্রন্থের দুটি সংস্করণ পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীতে। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৫৯ খ্রীঃ, প্রকাশক—হিন্দী পকেট বুক্‌স্‌, দিল্লী। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬০ খ্রীঃ, প্রকাশক—রাজপাল এণ্ড সন্স, দিল্লী। এই দুটিকে এক ধরে নিয়ে অনুবাদের সংখ্যা দাঁড়াল বারোখানি।

হিন্দী অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। হিন্দীভাষায় অনুবাদ ছাড়া মূল বাংলা কবিতার ব্যাপকতর প্রচারের উদ্দেশ্যে গীতাঞ্জলির একাধিক নাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থকেও আমরা হিন্দী অনুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয় নি এমন দুখানি গ্রন্থ (হিন্দী গীতাঞ্জলি) দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। একখানি প্রয়াগের ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এবং তার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে Gitanjaliর মূল বাংলা কবিতাগুলো (সংখ্যায় ১০৩) মুদ্রিত। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে—'গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি যদি নাগরী হরফে ছেপে দেওয়া যায় তাহলে বাংলা-অনুরাগী অনেক বাঙ্গালীরই বাংলা অক্ষর পড়বার অসুবিধা আর থাকবে না।' এইদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকাশক এই নাগরী-গীতাঞ্জলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। প্রকাশকের নিবেদনের নিচে তারিখ দেওয়া আছে ১৮-১১-১৪। এর থেকে মনে হচ্ছে, এই গ্রন্থের প্রকাশ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, কবির নোবেল পুরস্কার লাভের কিছু পরে। রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জীতে এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ নেই।

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে অনুল্লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশকরূপে যাঁর নাম পাই তিনি হলেন ঠাকুর মহেশ্বরবৎ সিংহ। সম্পাদক-প্রকাশকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এর অনুবাদ-কর্তা হলেন হিন্দীর প্রসিদ্ধ লেখক রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়। এতে বাংলা গীতাঞ্জলির নাগরী-রূপ সহ যে হিন্দী গদ্যানুবাদ দেওয়া হয়েছে তাতে মোট কবিতার সংখ্যা ১৫৬ অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা-সংখ্যা ১৫৭ থেকে একটি কম। অনুসন্ধান করে দেখা গেল, হিন্দী গ্রন্থখানিতে বর্তমান গীতাঞ্জলির দু'টি কবিতা অনুপস্থিত—(১) যাবার দিনে এই কথাটি (২) জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই। আবার বাংলা গীতাঞ্জলির বহির্ভূত একটি কবিতা উপস্থিত। কবিতাটি হল—'বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।' সুতরাং যোগ-বিয়োগের ফলে এই হিন্দী অনুবাদে কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৬। আমরা বর্তমান-প্রচলিত গীতাঞ্জলিতে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-স্বাক্ষরিত এবং '২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৯'-তারিখ-চিহ্নিত একটি মন্তব্য পাই এইরূপ—'১৩৩৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণে

'যাবার দিনে এই কথাটি' গানটি গীতাঞ্জলিতে প্রথম সন্নিবিষ্ট হয়।...গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' গানটি **পরবর্তী কোনো** সংস্করণে বর্জিত হয়'। এই 'পরবর্তী কোনো' থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে হিন্দী গীতাঞ্জলিখানাতেও প্রকাশকাল দেওয়া হয়নি। বাংলা গীতাঞ্জলির কোন্ সংস্করণ অবলম্বনে এই হিন্দী গীতাঞ্জলি প্রস্তুত হয়েছিল তার সন্ধান হয়ত দিতে পারেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

আর একখানি হিন্দী গীতাঞ্জলির উল্লেখ করা হচ্ছে, যে-বই আমরা দেখিনি এবং রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীর হিন্দী পর্যায়ে যার উল্লেখ নেই। উক্ত পঞ্জীর গুজরাতী বিভাগে এই সংবাদটুকু পাওয়া যায় যে, কানুবহেন দবে গুজরাতী ভাষায় গীতাঞ্জলির স্বীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯১৯ সালে এবং তিনি এই অনুবাদ করেছিলেন হিন্দী অনুবাদ থেকে। আমাদের মনে হয় কানুবহেন-অবলম্বিত হিন্দী সংস্করণই গীতাঞ্জলির প্রথম হিন্দী অনুবাদ। কারণ, এ পর্যন্ত ১৯২৪ সালের আগে প্রকাশিত অন্য কোনো হিন্দী গীতাঞ্জলির সন্ধান পাওয়া যায়নি। কবির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তেলুগু ও উর্দু ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশিত হল, অথচ হল না হিন্দীতে—ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের দেখা হিন্দী গীতাঞ্জলির কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হল :

| ক্রমসংখ্যা | প্রকাশকাল | অনুবাদক বা প্রকাশক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯১৪ | ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রয়াগ) | নাগরী লিপিতে Gitanjali |
| ২ | ১৯২৬ | মহাশয় কাশীনাথ | Gitanjaliর গদ্যানুবাদ |
| ৩ | ১৯২৭ | ভীমরাও শাস্ত্রী | নাগরী হরফে স্বরলিপি |
| ৪ | ১৯৪১ | শ্রীদত্ত শাস্ত্রী | Gitanjaliর গদ্যানুবাদর |
| ৫ | ১৯৪২ | সূর্যনারায়ণ চৌবে | ঐ |
| ৬ | ১৯৪৬ | জীবনলাল 'প্রেম' | ঐ |
| ৭ | ১৯৪৬ | লালধর ত্রিপাঠী | পদ্যানুবাদ |
| ৮ | ১৯৪৭ | ভবানীপ্রসাদ তিবারী | ঐ |
| ৯ | ১৯৫৪ | পৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী | নাগরী লিপ্যন্তর সহ Gitanjaliর গদ্যানুবাদ |
| ১০ | ১৯৫৭ | বিশ্বভারতী | গীতাঞ্জলির নাগরী রূপ |
| ১১ | ১৯৫৯ | সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার | গদ্যানুবাদ |
| ১২ | ১৯৬০ | মুরলীধর শ্রীবাস্তব | পদ্যানুবাদ |
| ১৩ | ১৯৬১ | হংসকুমার তিবারী | ঐ |
| ১৪ | ? | রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় | গীতাঞ্জলির নাগরীলিপ্যন্তর সহ গদ্যানুবাদ |

১ নং ও ১৪ নং সম্পর্কে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। ৩নং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা হয়েছে মরাঠী গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে। ১০ নং বিশ্বভারতী প্রকাশিত এবং আচার্য সুনীতিকুমারের

ইংরেজী মুখবন্ধ-সম্বলিত গীতাঞ্জলির নাগরী রূপ মাত্র। বাকি দশখানির ছয়খানি ( ২, ৪, ৫, ৬, ৯, ১১ ) গদ্যানুবাদ। ৪ ও ৫ নং বিশেষত্ব-বর্জিত। বর্তমান প্রবন্ধে ২, ৬, ৯ ও ১১ নং গ্রন্থের আলোচনা করে ৭, ৮, ১২, ও ১৩ নং গ্রন্থ সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনার ইচ্ছা রইল। কারণ শেষোক্ত চারখানি গ্রন্থই পদ্যছন্দে রূপান্তরিত এবং সবকটি মোটামুটি সার্থক অনুবাদ।

২ নং অনুবাদক 'মহাশয় কাশীনাথ' সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, আমাদের দেখা হিন্দী অনুবাদগ্রন্থের ( গীতাঞ্জলি ) মধ্যে এঁর রচনাই সর্বপ্রথম প্রকাশিত ( ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ )। আমরা দেখেছি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। অনুবাদকের নিবেদনে বলা হয়েছে : 'ইংরাজী ও বাংলা গীতাঞ্জলির তুলনা করে আমরা দেখেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'য়ের মধ্যে বেশ তফাৎ রয়েছে। এই গ্রন্থ ইংরেজী গীতাঞ্জলির অনুবাদ।' গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদের অসুবিধা সম্পর্কে নিবেদনের এক স্থানে আছে : 'সূক্ষ্মভাব প্রকাশের জন্য হিন্দীভাষায় উপযুক্ত শব্দ পাওয়া দুর্ঘট। তাছাড়া যে-অর্থ আমরা বুঝেছি, এমনও হতে পারে, তা হয়ত কবির অভিপ্রেত ছিল না। কবির চিন্তাধারা হয়ত এত উঁচু ও গূঢ় যে সে-পর্যন্ত পেঁাছনো আমাদের শক্তির বাইরে।' এই অনুবাদের প্রত্যেক কবিতার এক-একটি শীর্ষক দেওয়া হয়েছে এবং অনুবাদকের স্বীকারোক্তি মতে মূল ভাব অনুযায়ী এক একটি শীর্ষক স্থির করে নিতে সময় বড় কম লাগেনি। শীর্ষকের কয়েকটি নমুনা—(১) তোমার কৃপা (২) গানের মহিমা (১০) দীনবন্ধু (১১) প্রকৃত উপাসনা (১২) দীর্ঘ যাত্রা (৭৪) বিদায় বেলায় (৯৬) আমার শেষ কথা.........

গীতাঞ্জলি কাব্যপাঠে অনুবাদকের আনন্দ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে—রবীন্দ্রনাথের প্রভাতবর্ণনার কবিতা আপনি একবার ঘরের মধ্যে বসে পড়ুন। তারপরে সেই গান আবার পড়ুন ভোরবেলায় নদীর তীরে, অরণ্যের ছায়ায় বা গ্রামের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে—আপনি স্পষ্ট তফাৎ বুঝতে পারবেন।......একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, কবির অনেক গানের মূল ভাবটি এতটা রহস্যময় যে, সহসা তার তাৎপর্য বোঝা কঠিন। কিন্তু একবার অর্থোদ্ধার করা গেলে বিচিত্র আনন্দের অনুভূতি জন্মে ।

৬ নং অনুবাদক জীবনলাল 'উদ্‌ঘাটন' নামে চার পৃষ্ঠার একটি আবেগময়ী ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকায় কবির নিসর্গ-জগৎ ও মনুষ্য-জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনুবাদক হিন্দী কবি মহাদেবী বর্মার যে লাইন দুটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারেন নি তা হল—

মেরে হঁস্‌তে অধর নহীঁ, জগ কী আঁসূ লড়িয়া দেখো।
মেরে গীলে পলক ছুও মৎ, মুর্‌ঝাঈ কলিয়াঁ দেখো।

গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকে সংখ্যাচিহ্নিত না করে এক একটি কবিতার শেষে বিরাম-দ্যোতক × × এইরূপ দুটি চিহ্ন দিয়ে, সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যে যে একটা অখণ্ড গীতধারা প্রবাহিত, অনুবাদক সেই দিকেই বোধ করি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। অনুবাদ গদ্যছন্দে হলেও পদ্যকারে সাজানো। ইরেজী থেকে অনুদিত হওয়ার ফলে জীবনলালের অনুবাদ মূল বাংলা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। প্রথম কবিতার প্রথম দুটি পংক্তির হিন্দীরূপ দেখুন :

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব ॥
তুমনে মুঝে অনন্ত্ বনায়া,
তুম্হারী প্রসন্নতা ইসীমেঁ বিকসিত হুঈ।
য়হ জীর্ণ কায়া তুম্ বারম্বার রিক্ত করতে হো,
তথা বার বার হী অপনে কোমল স্পর্শসে
নবীন জীবন সঞ্চার করতে রহতে হো।

৯ নং অনুবাদক পৃথ্বীনাথ শাস্ত্রীর গদ্যানুবাদ অনুবাদ-কলার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও দু'একটি বিষয়ে এর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে দেখি, ইংরেজী গীতাঞ্জলির সবকটি কবিতার (সংখ্যায় ১০৩) মূল বাংলা রূপ দেওয়া হয়েছে নাগরী লিপিতে, এবং প্রায় প্রতিটি কবিতার নিচে রয়েছে মূল আকর-গ্রন্থের (যেমন নৈবেদ্য, খেয়া, চৈতালি ইত্যাদির) নাম। একজন অবাঙ্গালী লেখকের পক্ষে Gitanjalir মূল আকর-গ্রন্থগুলি খুঁজে বের করা বিশেষ আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও ধৈর্যবোধের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য হল—যে-গীতাঞ্জলির কবিতা বিশ্বজয়ী পুরস্কারে সম্মানিত, হিন্দীভাষী পাঠকদের সামনে তার মূল রূপ তুলে ধরা এবং অনুবাদের সাহায্যে তার ভাবটি বুঝিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারেও অনুবাদকের আগ্রহ লক্ষণীয়। এই দিক্‌টিতে হিন্দী পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' এবং 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' এই দুটি গানের স্বরলিপিও দেওয়া হয়েছে।

১১ নং অনুবাদক সত্যকাম বিদ্যালঙ্কারের গদ্যানুবাদ সাজানো হয়েছে পদ্যের ভঙ্গিতে। প্রতিটি কবিতায় একটি করে শীর্ষক বসানো হয়েছে। 'পরিচয়' নামক ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন: 'মৌলিক রচনায় যে প্রবাহ, মাধুর্য ও সরসতা, অনুবাদে তা কখনও আসতে পারে না। গল্প, নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদ করা গানের অনুবাদ অপেক্ষা সহজ। গানের অনুবাদ কখনও মূল রচনার মতো সরল হতে পারে না। মূল গীত ছন্দোবদ্ধ, তাতে আছে সঙ্গীত, স্বর-প্রবাহ এবং শব্দের মধুর বিন্যাস। অনুবাদে অনুরূপ সঙ্গীত, স্বরপ্রবাহ ও শব্দবিন্যাস অসম্ভব। **যিনি রবীন্দ্রকাব্যের যথার্থ আনন্দ পেতে চান, তাঁকে বাংলা শিখতে হবে।** শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখলে কেবল রবীন্দ্র-কাব্যের রস গ্রহণের জন্য বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন।' অনুবাদক আরও বলেছেন: 'প্রস্তুত পুস্তকে রবীন্দ্রের মৌলিক গীতাঞ্জলির যাবতীয় কবিতার সঙ্গে ইংরেজী গীতাঞ্জলির অবশিষ্ট কবিতাগুলির অনুবাদ সমাবিষ্ট হয়েছে। যতদূর জানি, **রবীন্দ্রের মূল গীতাঞ্জলির হিন্দী রূপান্তর আজ পর্যন্ত করা হয়নি। সুতরাং এদিক থেকে এই গ্রন্থকেই প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে।'** অনুবাদকের এই দাবী সত্য নয়, কারণ এর ১৩ বছর আগে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় লালধর ত্রিপাঠী-অনূদিত পূর্ণ গীতাঞ্জলি, এবং সে-অনুবাদ গদ্যে নয়, পদ্যে। হিন্দী গীতাঞ্জলির পদ্যরূপ প্রসঙ্গে যথাস্থানে তার আলোচনা হবে।

# জর্জ বার্ণাড শ

**মনোজ রায়**

১৮৮৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। উনবিংশ শতকের শেষের দিক বুর্জোয়া ধনতন্ত্রে তখন ফাটল ধরেছে। আত্মরক্ষার জন্য বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক বিপর্যয় শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে হাজারে হাজার। বিপর্যস্ত শ্রমিকেরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর দলবদ্ধ হয়ে হাইড পার্কের দিকে সভা করতে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ক্লাব আর হোটেল থেকে বুর্জোয়ারা তাদের বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করেন শ্রমিকেরা সহ্য করতে না পেরে ক্লাবঘর প্রভৃতি আক্রমণ করেন আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ ডাকা হয়—পুলিশ পশ্চাৎধাবন করে হাইড পার্কের সভা পণ্ড করে দেয়।

১৮৮৭ অব্দে ১৩ই নভেম্বর রবিবার শ্রমিকেরা এই নিষেধ আজ্ঞা অমান্য করে হাইডপার্কে সমবেত হওয়ার জন্য স্থির করেন। এই সব শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন শ। হাইড পার্ক ১৩ই নভেম্বর রবিবার রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। বহু শ্রমিক হতাহত হন—বহু গ্রেপ্তার হন, শ, এ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় লোকেরা কোনক্রমে সেদিন পুলিসের হাত থেকে বেঁচে যান।

এই হলো শ'র জীবন পরিক্রমা—যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জীবন আরম্ভ। আর সারা জীবনব্যাপী দুঃসহ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যেন তাঁর বিশ্রাম। পরিসমাপ্তি।

দারিদ্র্যের কোলেই তাঁর জন্ম, ১৮৫৬-র ২৬শে জুলাই মাসে ডাবলিন শহরে; তাঁর বাবা জর্জ কার শ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তার উপর ছিলেন প্রচণ্ড মদ্যপায়ী। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি এলিজাবেথ নামে তাঁর চেয়ে বহু বৎসরের ছোট সুন্দরী একটি ধনী কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়ে এলিজাবেথের কাকীমা, তাঁকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করেন। ফলে যতদিন বেঁচেছিলেন, নিদারুণ দারিদ্র্যের জ্বালায় তাঁরা অস্থির হয়ে ওঠেন। এলিজাবেথ শেষপর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে তাঁর কন্যাদের সহ লণ্ডনে চলে যান—সেখানে জর্জ জন ভাণ্ডালিউর লি নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন।

বাড়ীতে এই পরিবেশে স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতির কোন সম্পর্কই ছিল না। ছেলেমেয়েরা 'যেমন দুধওয়ালা একটা আকস্মিক ঘটনা, তেমনি এরাও আকস্মিক প্রকৃতির উপাদান' —এই ধরণের ভাব ছিল বাবা আর মার মনে। ছেলেমেয়েরা কোথায় কি ভাবে যায়, থাকে কারো জানার তেমন আগ্রহ ছিল না; বার্ণাড শকে একজন পরিচারিকার সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো—পরিচারিকা নিয়ে যেতো তাঁকে নোংরা বস্তিতে—সেখানকার পরিবেশ অতিশয় জঘন্য।

নিজে দরিদ্র আর দরিদ্রতম পরিবেশ—তা থেকে উৎপাদিত পাঁক—শ অতি শৈশব থেকেই মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করেছিলেন—তাই বিদ্রোহের বীজও তাঁর অতি শৈশব থেকেই অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করে। যখন তিনি বড় হয়ে এই দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করেন, তখন একেবারে

সৈনিকের মতই সমস্ত অস্ত্র নিয়ে এর বিরুদ্ধে সজ্জিত হয়ে ওঠেন—'আমি দারিদ্র্যকে চিরকাল অবিচ্ছন্ন, নির্মম আর আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি—আর আমার সারা জীবনে সংগ্রাম, এই দারিদ্র্যকে নির্মূল করা, যেন বিধাতার মত এ আবার কবর থেকে না বেরিয়ে আসতে পারে'।

ভালবাসা তাঁদের বাড়ীতে ছিল না—ভালবাসা অর্থ দিয়ে কেনা যায় এটা আদর্শবাদীদের ছলনা, বুর্জোয়া সভ্যতার একটা 'বাই-প্রোডাক্ট', এই ধরণের বাস্তব অভিজ্ঞতা যেন তাঁর শৈশব থেকেই সুরু হয়ে যায়। সন্তান-সন্ততিদের ঝামেলা বাবা মা সহ্য করতে চান না—তাই তাদের বিদ্যালয় পাঠিয়ে দেন—শ'র এইমত এই সময় হতেই গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধেও তাঁর মতামত হয়—'বিদ্যালয়গুলি বেঁচে আছে তার কারণ, বাপ মা সন্তান-সন্ততিদের ঝামেলা পোহাতে চান না, অথচ তারা যে গণ্ডগোল করে, বা বিপদে পড়ে, এও তাঁরা চান না, আর দ্বিতীয় যে কারণে বিদ্যালয়গুলি বেঁচে আছে তা হচ্ছে—শিক্ষকদের জন্য—যাঁরা এই কাজ করে বেঁচে থাকার মত অর্থ উপার্জন করতে পারেন, আর বিদ্যালয়গুলি বেঁচে আছে নিজেদের তাগিদে—অর্থাৎ ছাত্রদের ঘাড় ভেঙে অর্থ সঞ্চয় করতে পারে বলে'।

শ প্রথমে ওয়েসলিয়ান ক্যানেকস্যানেল বিদ্যালয়ে পরে আরো কয়েকটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র বলে তাঁর সুনাম ছিল না; স্কুলের পড়া তাঁর কাছে বরাবরই বিতৃষ্ণা জাগাতো। তিনি বরং পাঠ্য বহির্ভূত বই সব পড়তে ভালবাসতেন—যেমন, পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেশ, আরব্য উপন্যাস, চার্লস লোভারের,-এ ডেজ রাইড্, ডিফেন্সের-এ টেল অফ্ টু সিটিজ, লিটিল ডোরিট্, পিক্উইব্ পেপারস্, ব্লীক হাউস প্রভৃতি—তাঁর সমবয়স্ক ছেলেরা যে সবের নাম পর্যন্ত তখন শোনে নি। লোকে পরে তাঁর এই প্রবণতা দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'এই সময় হতে তিনি লেখক বা নাট্যকার হবার স্বপ্ন দেখতেন কিনা,' তাতে শ স্পষ্ট করেই বলেছেন—'কোন কালেই তাঁর মনে হয় নি, লেখা বিশেষ একটা গুণ—সত্যিকারের লেখা আসে প্রয়োজনের তাগিদে আর তখনি হাঁসের সাঁতার কাটার মত এটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে'।

'সাহিত্যিক হওয়ার জন্য লেখা'—এ অঘটন শ-র জীবনে কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ। সেটা তাঁর স্বাভাবিক বা অতি মাত্রায় স্বাভাবিক ছিল, তা হচ্ছে জানার আগ্রহ। দিবা রাত্র তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন; আর যতটুকু সময় থাকতো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক প্রতিটি সভায় তিনি হয় সভা পরিচালনা করতেন, সভাপতিত্ব করতেন, বক্তৃতা দিতেন, নয় তো শ্রমিকদের নেতৃত্ব করে মিছিলে অগ্রসর হতেন। এইটাই ছিল তাঁর সত্যিকারের স্বাভাবিক জীবন—অন্যান্য সমস্ত জিনিষ, যেমন নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, প্রচারপুস্তিকা প্রভৃতি লেখা যেন বাহুল্য ছিল, আর সেগুলো তিনি রচনা করতেন, যখন বাসে বা ট্রেনে তিনি যাতায়াত করতেন। তাঁর নোট বইতে সর্ট হ্যাণ্ডে এই সব নাটক বা প্রবন্ধ লিখে লিখে রাখতেন; এ ছাড়াও ভোজন আর শয়নের মধ্যকার সময়টুকুতেও তিনি সামনে বই রেখে কাপড় জামা ছাড়তেন, আর অধ্যয়ন করতেন—'আর যখন বেরোতেন ব্যস্তবাগীশ মানুষটিকে দেখে মনে হতো তিনি যেন নিজের কাছে জবাবদিহি করার জন্য ছুটেছেন'।

বেশীদিন বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন করার মত সামর্থ তাঁর ছিল না। যখন তাঁর তেরো বছর

বয়স—সংসারে সাহায্য করার জন্য তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। কাজটা ছিল একটা দালালের অফিসের—সপ্তাহে সপ্তাহে বস্তীতে গিয়ে ভাড়া আদায় করা। হয়তো ভবিষ্যতে 'উই ডোয়ারস্ হাউস' লেখার সময় এই পাতি-বুর্জোয়াদের শোষণ-নীতি তাঁকে লেখায় উদ্দীপিত করেছিল। কিন্তু যে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো এর চেয়ে গারদ বা জেলখানা শতগুণে ভাল। এই কাজ করেন তিনি দীর্ঘ সাত বছর ধরে—শেষের চার বছর এইখানকার ক্যাস বিভাগে কম মাহিনায় কাজ করেন! কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে একদা ন্যাকড়ার থলিতে তাঁর সামান্য জিনিষ নিয়ে তিনি লণ্ডনে তাঁর মার কাছে এসে উপস্থিত হন।

এবার আরম্ভ হয় তাঁর দুঃসহ সংগ্রাম। খাওয়ার পয়সা সেই, জামা-কাপড় যোগানের সঙ্গতি নেই। তাঁর দশায় এমন কি লণ্ডনের একজন ভিখারী পর্যন্ত তাঁকে অনুকম্পার ভাব দেখিয়ে গেলো—'কিছু না করার চেয়ে ভিক্ষে করাও ভাল অন্ততঃ নিঃস্ব অবস্থার চেয়ে তা সুখকর'। পিকাডেলিতে একদিন রাত্রে যাওয়ার সময় ল্যামপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একজন তরুণী তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলে সামান্যতম জিনিষ দিয়েও তিনি তাকে উপভোগ করতে পারেন। শ আলোর সামনে নিজের 'ম্যানিব্যাগ' ঝেড়ে ঝুড়ে দেখালেন—মেয়েটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। শ ভাবলেন 'সত্যি মেয়েটির বৃত্তি আর আমার বৃত্তি এক। আমি একজন ঔপন্যাসিক যে কোন প্রকাশক পায় নি, আর মেয়েটিও তেমনি কোন সঙ্গতিপন্ন লোককে খুঁজে পাচ্ছে না'।

১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর তাঁকে এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। এই নয় বৎসর তিনি একখানামাত্র পোষাকে কাটিয়েছেন। পোষাকের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, দিনের বেলায় সে পোষাক পড়ে তিনি কারো সামনে বার হতে পারতেন না। ভাঙ্গা জুতো, পেছন ছেঁড়া পাজামা, আর কালো রংএর একটা কোট—নয় বছর ধরে ব্যবহারে কোটটা সবুজ হয়ে গিয়েছিল; জামার হাতগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়াতে কাঁচি দিয়ে কাটতে কাটতে সেগুলো ছোট বেমানান আর বেঢপ হয়ে গিয়েছিল, আর টুপিটা লম্বা হতে হতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, যে সেটাকে অনবরত সামনের দিকে ঠেলে রাখতে হোত, নয়তো মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে অর্দ্ধেক মুখটাই ঢেকে ফেলতো। কালেভাদ্রে কখনো এক শিলিং পেলে সেদিন তিনি থিয়েটারে ঢুকে পড়তেন, তা না পেলে লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন।

এই সময়ে একটা টেলিফোন কোম্পানীতে এক বছরের জন্য তাঁর একটা চাকরী হয়। আর এই সময়েই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। কিন্তু কোন প্রকাশকই তা প্রকাশ করতে রাজি হন না। দ্বিতীয়টির দশাও ঠিক তেমনি হয়; 'পর পর পাঁচটি সন্তান যেন একই ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শ ব্রাউন কাগজে মোড়া বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছ থেকে ফিরে আসা পাঁচটি বিবাহের অযোগ্যা পাঁচটি কন্যার মা যেমন অনুভব করেন, শ যেন ঠিক তেমনি মায়ের উৎকণ্ঠা, বেদনা অনুভব করিতে পারেন। প্রত্যেকটিকে প্রত্যেকবার সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের যাতায়াতের খরচ (প্রত্যেকবারই প্রতি প্রকাশকের কাছে পাঠানোর ছয় পেনী খরচ) বাপ মার আর্থিক দুশ্চিন্তা যেন ঘোরতর করে তোলে। শেস পর্যন্ত প্রকাশকদের চেয়ে বেশী সাহসী ইন্দুরগুলো অন্ততঃ পঞ্চাশবার ফেরৎ আসা পাণ্ডুলিপিগুলো কাটতে আরম্ভ করে কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত তা কেটে শেষ করতে

পারে না।" এর পর দুর্ভাগ্য শ-কে আরো একধাপ নীচে নামিয়ে দেয়। শ-র মা যাঁর সহায়তায় গানের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন, সেই ভ্যাণ্ডার লি মারা যান্। আর শ-র বোন সিসিল টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে শ-র কোলেই মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লব্ধজ্ঞানের বিকাশ শেষ পর্যন্ত তাঁকে দরিদ্রতম ক্লাব জেটিক্যাল সোসাইটির বিতর্কমূলক সভায় ঠেলে দেয়। এটা যেন ছিল তাঁর শিক্ষানবীশের সময়। পরে এইখান থেকেই যেন তিনি দীর্ঘতর সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সুযোগ পান। এখানকার আলোচনা হতেই তাঁর 'প্রগ্রেস এণ্ড পোভার্টি' কার্ল মার্কসের 'ডাস্ ক্যাপিট্যাল' প্রভৃতি পড়ার সূচনা—আর এখান থেকেই তাঁর জীবনের উপলব্ধি, চেতনা আর সংগ্রাম—যা উত্তরকালে কেউই সহ্য করতে পারেনি। এইখান হতেই যেন তিনি বুঝতে পারেন উপরের ভড়ং থাকলেও "গ্লাডষ্টোনের কোথায় চাপা বুর্জোয়া মনোবৃত্তি; যেন এবার থেকে স্পষ্ট তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়, কেন দারিদ্র্যের জন্য, প্রগতি, বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে মাথা বিক্রী করে রেখেছে; কেন লেখকেরা রোমান্টিক ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু করে রেখেছে। এই স্পষ্ট চেতনা হতে তাঁর জীবন আর সাহিত্যের রোমান্টিক ধারায় প্লাবিত হয়ে উঠলো না—তিনি হয়ে উঠলেন সক্রিয় সৈনিক, আর তাঁর কাজ হোল রোমান্টিক কৃষ্টি জগতের মুখোস খুলে ধরা।"

এর পর থেকে তিনি বিভিন্ন কৃষ্টি জগতকে আক্রমণ সুরু করেন ১৮৮৫ অব্দ থেকে কোরোণা দি বাসেতো এই ছদ্মনামে। স্টার, ওয়ার্লড, স্যাটার ডে রিভিউ, পলমল গেজেটে অজস্র ধারায়, বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটকের সমালোচনা সুরু করলেন। এর আগেই ১৮৮৪ অব্দে সমাজতন্ত্রী ভিত্তিতে ফেবিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন আর সেখান থেকে অজস্র ধারায় বক্তৃতায়, পুস্তিকায়, রচনায় রীতিমত সংগ্রাম সুরু করেন।

এতো অজস্র পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে—প্রায় মরণাপন্ন হতে হতে মিস্ চার্লোটি প্যানের সেবা শুশ্রূষায় তিনি ভাল হয়ে ওঠেন আর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে বিয়ে করে সহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসবাস সুরু করেন। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় তাঁর তেমনি ছিন্ন মলিন বেশ, পুরোহিত ভাবতেও পারেননি ক্রাচে ভর করে আসা একটি ভিখারীর মত লোকের সঙ্গে সুন্দরী চার্লোটির কি করে বিবাহ হতে পারে! তিনি ভেবেছিলেন সাক্ষ্য দানের জন্য উপস্থিত সুসজ্জিত বন্ধু গ্রাহাম ওয়ালেসই বুঝি বিবাহের বর আর তাঁর হস্তেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে যাচ্ছিলেন।

সামাজিক ও কৃষ্টির সত্যিকারের রূপ, এবার পুস্তিকা আর প্রচার কার্য ছাড়া শ নাটকের মধ্যে তা রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেন—যেহেতু এটা একটা স্থায়ী ভাবে আক্রমণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। ১৮৯৪ সন থেকে মোটামুটি তাঁর এই নাট্য জীবন সুরু হয়। পর পর তিনি আটখানি নাটক লিখে ফেলেন। কিন্তু এদের দশাও তাঁর উপন্যাসদের মত হয়। কোন কোম্পানীই সে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে রাজি হল না। এমন কি কোন অভিনেতা তাঁর নাটকে অভিনয় করতে স্বীকৃত হল না। দশ বছর পর্যন্ত নাটকগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। শেষকালে গ্রেণভিল বারকার নামে শ-র অনুরাগী একজন তরুণ অভিনেতা ১৯০৪ অব্দে ওয়েষ্ট এণ্ডএর একজন থিয়েটারের মালিককে সব নাটক মঞ্চস্থ করতে রাজি করান। ওয়েষ্ট এণ্ডএর ধনিক গোষ্ঠি, সম্রাট, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি সম্মানিত

আসনগুলিতে বসে জন বুলস্, আদার আইল্যাণ্ড, ম্যানস্থপারম্যান, মেজর বারবারা, ডকটরস্ ডিলেমা, ইউ নেভার ক্যান্ টেল্ প্রভৃতি বইয়ের মজার মজার কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন। মজার লেখক হাসাতে পারেন—ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটার তাঁকে অভিনন্দিত করে। কিন্তু মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাবুকে মার খাওয়ার মত সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়—হাস্য বিদ্রূপের মধ্যে লোকটি কখন তাঁদের আক্রমণ করতে আরম্ভ করছে স্পষ্টভাবে আর উন্মুক্তভাবে! লর্ড চেম্বারলেন সঙ্গে সঙ্গে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন। সারা অভিজাত সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তাঁর নাট্য-জীবনেরও প্রায় সমাপ্তি হবার উপক্রম হয়।

লোকে আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন এই সংগ্রামী লোকটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্পষ্টভাবে ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের মুখোস খুলে ধরেন। ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া শাসক সম্প্রদায় বেলজিয়ামকে সাহায্য করতে যখন অগ্রসর হয়েছে, তখন বেলজিয়ামের স্বার্থ বা সাহায্যের জন্য নয়, বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আর টাইটেনিক জাহাজ ডোবার সময় যে বিরাট আখ্যা দেওয়া হয়েছে সৈনিকদের তার পেছনে রয়েছে শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থপর মনোবৃত্তি—যা মানুষকে মূঢ় করে মূর্খতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।' এই সব সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধনিক গোষ্ঠি যেন আক্রমণের বন্যা তাঁর উপরে বিছিয়ে দেন। 'বন্ধুরা এমন কি পরিচিতেরাও তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান আর তাঁর মতামত সম্বন্ধে আজও লাখে লাখে চিঠি তাঁকে গালি বর্ষণ করে প্রতিবারে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়। যুদ্ধ থেমে যায়, শও সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের প্রচারের ত্রুটি বুঝতে পেরে, সাধারণ লোককে বোঝানোর জন্য 'দি ইন্টেলিজেণ্ট উইমেন্সস্ গাইড টু সোস্যালিজম লেখেন ( ১৯২৪-১৯২৭ )।

পারিপার্শ্বিকের চাপে বুর্জোয়ারা এবার তাদের নীতি পাল্টাতে আরম্ভ করেন। লেবার গভর্ণমেণ্ট শ এবং তাঁর সমগোষ্টিদের সমাজতান্ত্রীক নীতিগুলি প্রচার হিসাবে গ্রহণ করে ভোট যুদ্ধে জয়ী হন। তারপর অবশ্য তাঁদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে দেরী করেন না। কিন্তু এবার তাঁরা শ-কে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হন। তাঁকে নানা রকম উপাধিতে ভূষিত করতে অগ্রসর হন। শ ঘৃণায় সেগুলি পরিত্যাগ করেন। সাহিত্যে তাঁকে 'নোবেল পুরস্কার' দেওয়ার জন্য ঘোষণা করা হয়। তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন। লেবার পার্টি তাঁকে 'পিয়ারেজ' দিয়ে পুরস্কৃত করতে চান্ তিনি তাতে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন; তারপর যখন তাঁকে অর্ডার অফ মেরিট্ উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তিনি বিদ্রূপভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন—যেন তাঁদের ধারণা যা অন্তরতম প্রদেশ হতে যা তিনি করেছেন সবই সাময়িক এবং লোকচক্ষুতে পড়ার একটা কৌশল। আসলে তিনি একটা খ্যাতি, অর্থ—চটকদার কথা বা লেখা লিখে উপার্জন করতে চান।

এই মহান পুরুষ জীবনের শেষদিকে আরো একখানি নাটক লিখতে সুরু করেন। তখন তাঁর ৯২ বৎসর, অথচ সংগ্রাম তাঁর শেষ হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর তাঁর ভেঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছে। অনেক সময় ঘুম তাঁকে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছে। ক্লান্ত সৈনিকের মত একদা ১৯৫০ সনে তিনি আর জাগরিত হলেন না। অক্লান্ত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে। হাইড্ পার্কে শ্রমিকদের রক্তাক্ত রবিবারে সংগ্রামের যেন এতদিনে পরিসমাপ্তি ঘটে। পশ্চিম জগৎ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ মাত্র দুই একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য উপস্থিত

হল। অতি সামান্যভাবে সে ঘটনা কাগজে প্রকাশিত হয়। 'স্টেটসম্যান' কাগজ মাত্র কুড়ি লাইন লিখে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গ্রন্থসত্বের উপর পরে কর বৃদ্ধি করা হয়, তাঁর শেষ নাটকের প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়; পিগ্‌ম্যালিয়ন, মেজর বারবারা ছবি দুইখানি দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়; শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেখানে আবেদন জানানো হয় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড, সেখানে সংগৃহীত মাত্র চারশত পাউণ্ড!

তাঁর কারণ বাস্তব জগতের নগ্নরূপ এমন উৎকটভাবে বোধ হয় কৃষ্টি জগতে কেউ তুলে ধরতে সক্ষম হন নি। কৃষ্টি জগতে হয় কেউ দাসত্ব করেছে,.নয় সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুভব করতে সক্ষম হয় নি—আর এই স্বার্থ বা অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার জন্য তাঁরা গোষ্ঠি করে নিজেদের মধ্যে পিঠ চুলকাচুলকি করেছেন। সাভাইল ক্লাবে শ লণ্ডনের সাহিত্যিক সমাজকে তাই যেন কশাঘাত করছেন—"আমি কখনো সাহিত্যিক হবো না বা তাদের সঙ্গে মিশবো না। আমি হয়তো সারাজীবন এই লোকগুলোকে প্রত্যেকের পিঠ চুলকাচুলকি করতে দেখতে দেখতে সারাজীবন কাটিয়ে ফেলতাম, অথচ নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হলে আমি টাইপ মেসিনের টিক্ শব্দটা ছাড়া এদের কাছ থেকে অন্য কিছুই শিখতে পারতাম না।" অসকার ওয়াইল্ড সে সময়কার রোমান্টিক জগতের অধিকর্তা; যারা পৃথিবীব্যাপী তখন এই রোমান্টিক অধিকর্তারা লোকদের ভাঁওতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের পরিচ্ছন্ন, লেখার পদ্ধতি আর কৃত্রিমতা দিয়ে, আর চারিদিকে এঁদের প্রতিভাবান্ বলে সম্মান ছড়িয়ে যাচ্ছে—। শ বিদগ্ধভাবে বলেন—"ওয়াইল্ড রীতিকে এতো বেশী ভালবাসেন, যে বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে তাঁর রীতিটাই এগিয়ে যায়—সেটা তাঁর পোষাকে হোক, ব্যবহারে হোক, তাঁর নাটকে হোক কিংবা কঠিন জীবনের বাস্তবতার দিকটাই হোক।" যেমন "আমরা চাকরকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি তার সততা, সংযম, পরিশ্রম—এই বিষয়ে তার কোন প্রশংসাপত্র আছে কিনা; কেননা এগুলো যে একেবারেই থাকে না তা আমরা পরে বুঝতে পারি, আর বুঝতে পারি প্রতিভা? হাজারে হাজারে সাধারণ ইঁদুরের মত অজস্র প্রতিভা ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

জীবনে যদি তোমার প্রেরণা না আসে, সে প্রতিভা ইঁদুরের মত অতি সাধারণ। এই প্রেরণা আসে ইবসেন, টলষ্টয় প্রভৃতিদের যাঁরা পৃথিবীকে দেখেন চোখের জলে ভাসা আর্ত পৃথিবী। আর যখন এই চোখের জল, আর্তনাদ মানুষের কৃত হয় তখন তাঁরা উত্তেজনায় জ্বলতে থাকেন। আর এই বিচারে, কৃষ্টি তখনি এবং ততখানি ভাল এবং মন্দ যখন এবং যতখানি তারা এই চোখের জল দূর করতে সমর্থ হয়। এইজন্য টলষ্টয় সেক্সপীয়ারের প্রতিভাকে আর সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে চেয়েছিলেন যা মানুষের সাম্য, শান্তি আর প্রেম এই নিয়ে না সৃষ্টি করে। শ বলেন—"সেক্সপীয়ার আর মলিয়েরকে খুব বেশী ভাল বলা হয়, আর তা তরুণদের ভাল করে পড়তে অভিনন্দিত করা হয়, তার কারণ তাঁদের সত্যিকারের কলহ ভগবানের সঙ্গে—কেন তিনি মানুষকে ভাল করেন না। যদি তাঁরা সমাজের কোন বিশিষ্ট স্তরের লোকদের যাঁরা চার সংখ্যাযুক্ত অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করেন, অথচ কোন কাজ করেন না, যা ভাল করে করেন না—তাঁদের সঙ্গে সংগ্রামের ব্যাপার নিয়ে লিখতেন তবে তাঁদের বলা হোত রাষ্ট্রদ্রোহী, অধার্মিক আর মানুষের নৈতিক

চরিত্রকে নষ্টকারী আর ধ্বংসকারী বলে তাঁদের বর্জন করে দূর করে দেওয়া হোত।"

এই বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া শ প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। 'যা বৈষ্ণবী মনোভাব, উদ্দেশ্যহীন, অসাম্য, অসামাজিক, অত্যাচারী, অপকারী, নির্বোধ, সংকীর্ণ, অজ্ঞান, অলস, অপরিচ্ছন্ন, অর্থগৃধ্ন এবং আতিশয্যপূর্ণ' শ অন্তর থেকে তা ঘৃণা করতেন—অসহ্য হয়ে উঠতেন।

শ বার বার বলতেন বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় যেমন শাসকগোষ্ঠি, তেমনি সাধারণ লোক। 'এই সাধারণ লোক সেইজন্য হচ্ছে একজন অসামাজিক পাপী। তাঁরা বাস্তবকে উপেক্ষা করার জন্য বাস্তবপথদ্রষ্টার মুখের উপর উপহাস করেন। এককালে এই ধরণের দ্রষ্টাদের ইট ছুড়ে হত্যা করতো—অন্য সময়ে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারা হোত, নয়তো নির্যাতন করা হোত ; কিন্তু ইদানিং এই সব লোকদের আরো ভাল রকম শায়েস্তা করার উপায় উদ্ভাবিত করা হয়েছে ;" তা হচ্ছে—"তাঁকে সামাজিক বক্তা হিসাবে দাঁড় করিয়ে প্রতিবেশীদের উপর তাঁর গালাগাল উপভোগ করা ; কিংবা রঙ্গমঞ্চে আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁকে ভালভাবে বখশিস্ করা—আর এইভাবে সুন্দর আর সুচারুরূপে তাঁর আত্মাকে নষ্ট করা।"

শ বুঝতেন, ধনিকশ্রেণীর চাতুরী আর কুহেলিকায় সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয়ে বাস্তব পটভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়েছে—তাই বিদ্রূপবাণীও তাঁর কষাঘাতের মত হয়ে উঠতো। "ছোট বড় প্রতিটি জিনিষকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে চেষ্টা করো। তাহলে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উন্নততর হবে। একবার যদি এই রোমান্টিক মিথ্যুকদের দল বিতাড়িত হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ থাকবে না, কোন শোষণ থাকবে না, আলস্য, পরনির্ভরশীলতা কিছুই থাকবে না। রোম্যান্টিকেরা শুধু যা সত্যি নয়, বাস্তব নয় তাই দেখিয়ে শুনিয়ে মিথ্যে দিয়ে ঢাকিয়ে মন্দকে বাঁচিয়ে রাখে।"

'এই রোম্যান্টিক গোষ্ঠি যখন তাঁকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক গোষ্ঠিদের নিয়ে P. E. N নামে একটা চক্রতে তাঁকে সভ্য হতে অনুরোধ করলো তিনি কঠিন ভাষায় লিখলেন—"এই চক্রের ভেতর ঢোকা আমার ঘোরতর আপত্তি, এতে যে তাঁদের মধ্যে 'ক্লিক' করা, বা নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর ঈর্ষা বেড়ে ওঠে তা নয়, তাঁদের মনগুলোও যেন গর্ভপাত' করে—অর্থাৎ যথাসময় যথার্থ পরিপক্ক জিনিষ উৎপাদন করতে অক্ষম হয়ে বিকৃত জিনিষ সৃষ্টি করে।"

লোকে তাঁকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করে, শ নিজেই স্বীকার করে সাঁত্রোকে ১৯২৪ সনে সাহিত্যিকদের ভোজ সভার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে চিঠিতে জানিয়ে দেন—'All the literary blocks loathe me, and I should spoil the dinner.' তাঁর সখ্য জগৎও তাঁর মুখের ওপর যবনিকা টানে। হারলে গ্র্যানভিল বারকার যাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর নাটকগুলির ওয়েষ্ট এ্যাণ্ড এ মঞ্চস্থ হচ্ছিল, সেই বারকার লীলা ম্যাকার্থিকে বিয়ে করেন। আর লীলা ম্যাকার্থির প্ররোচনায় তিনি বুঝতে পারেন, শ শুধু কৌতুক করেন না—কৌতুকের মধ্যে তিনি সাংঘাতিক কথা বলতে চেষ্টা করেন—তিনি 'লাল', সঙ্গে সঙ্গে বারকার তাঁর সংস্রব পরিত্যাগ করেন। বাকীটা জীবন শ-কে একার প্রচেষ্টাতেই চলতে হয়।

নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়ে বাধা সৃষ্টি হবার পর ১৯৩০ সন থেকে শ নাটকগুলিকে প্রকাশ

করবার চেষ্টা করেন। হাই নেম্যান তখন প্রসিদ্ধ প্রকাশক। শ তাঁকে তাঁর নাটকগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেন। 'হাইনেম্যান প্রসিদ্ধ নাট্যকার পিনেরোর নাটক বিক্রীর খতিয়ান তাঁকে দেখান—কতকগুলি সৌখিন সংস্থার মাত্র দশ বারোখানা কপি বিক্রী ছাড়া পিনেরোর আর একখানি কপিও বিক্রী হয়নি। তাছাড়া তিনি বলেন পলিটিক্যাল একোনমির ওপর কোন বইয়েরই এখন বিক্রী নেই'। 'জন মারে ম্যান সুপারম্যান বইখানা পাণ্ডুলিপি পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। এই বইয়ের প্রকাশ? তিনি শ কে সঙ্গে সঙ্গে লিখে জানান, 'কেবল বিক্রীত মস্তিষ্কের লোকেরাই এ ধরণের অনিষ্টকর বই লিখতে পারে। তার বিবেক এই বই প্রকাশ করতে বাধা দিচ্ছে উপন্যাসের মতই শ-র নাটকগুলিও অনূঢ়া যুবতীদের মত প্রকাশকদের দ্বারে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। শ তখন নিজেই কমিশন হিসাবে বইগুলি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন'।

শ-র মূল আক্রমণ হলো এ যুগের ধনতন্ত্রবাদকে—ধনতন্ত্র মানুষকে শোষণ করে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিচ্ছে পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে চলেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও পচিয়ে তুলেছে; সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কৃষ্টিজগৎকে ক্রীতদাসত্বে পরিণত করছে। তাই এই শোষণ যন্ত্রকে তিনি অতি তীব্র আর শাণিত তরবারি নিয়ে আঘাত করেন সমস্ত দিক হতে। মিসেস ওয়ারেণস প্রফেসানে তিনি এই সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাপার উদ্ঘাটন করে তার সত্যিকারের মুখোস খুলে ধরেন আসলে কি এই সমাজ—? 'মিসেস ওয়ারেন তাঁর মেয়েকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য ভর্ৎসনা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—'একটি মেয়ের স্বচ্ছল ভাবে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে তাকে স্বচ্ছল অবস্থায় রাখতে পারবে তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করা। ……লণ্ডনের সমাজের যে কোন ভদ্রমহিলা যাঁর কন্যা আছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনিও ঠিক একই কথা বলবেন—তফাৎ হচ্ছে আমি তোমার মুখের ওপর স্পষ্টভাবে বলছি, আর তিনি একটু ঘোরালো ভাবে ইঙ্গিতে বলবেন—এই পার্থক্য'। পুঁজিবাদীদের শ মিসেস ওয়ারেণের মুখ দিয়ে, ধনিক শ্রেণীর ক্রফট্ আর ভি, ভি, ওয়ারেণের সামনে প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করেন—'শয়তানের নামে শপথ করে বলছি, কেনই বা আমি দেহদান করার অর্থ, সেই ভাবেই খাটাবো না? (বেশ্যালয়গুলিতে—যা আজকাল হোটেল নামে পরিচিত? যেমন ধনিক গোষ্ঠি টাকার ওপর সুদ নেয়, তেমন আমিও নিই।……তুমি কি আশা করো, যখন বুদ্ধিমান, বিবেচক ভদ্রসন্তানেরা যে যা পারছে পকেটে পুরছে, আমি তখন শতকরা ৩৫ ভাগ ছেড়ে দি? —না কখনই না। আমি নিশ্চয়ই এমন বোকা নই। যদি নৈতিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে তোমার বন্ধু-বান্ধব পরিচিতবর্গকে স্থির করতে চাও, তবে বরং এদেশ থেকে দূর হয়ে যাও; অবশ্য তুমি যদি ভদ্রসমাজে মেলামেশা না করে ছোটলোক হয়ে থাকতে চাও, তবে অন্য কথা'। মিসেস ওয়ারেন শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর মেয়েকে তিরস্কার করে বোঝাচ্ছেন—'তরুণীরা অন্তর থেকে কি, আমি জানি—আর এও জানি, যখন তোমরা মনে মনে আমার কথাগুলোর সত্যতা আলোচনা করবে তখন নিশ্চয়ই তা মেনে নেবে'। এ-তো উন্মুক্ত আলোচনা সমাজ গোষ্ঠির মাতব্বরেরা সহ্য করতে পারলেন না। লর্ড চেম্বারলেন বইটার ওপরনিষেধ আজ্ঞা জারি করে দিলেন।

শ-র কৃষ্টির ওপর আঘাতে সকলে যেন কম্পিত অসহনীয় হয়ে উঠতেন—তীব্র ভাষায় তিনি বলেন, 'কিন্তু আমাদের পুরুষদের মধ্যেও বেশ্যাবৃত্তিতে নিমজ্জিত এমন দলে দলে লোক আছে।

নাট্যকার, জার্ণালিষ্ট, উকিল, ডাক্তার, পাদ্রী, রাজনৈতিক নেতারা—দৈনিক তাঁরা নিজেদের সত্যিকারের, বাস্তব মূর্তি লুকোনোর জন্য সবচেয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রয়োগ করছে—যার তুলনায় একটি মহিলার কয়েক ঘণ্টার জন্য তার দেহকে উপভোগ করতে দেওয়া নিতান্তই নগণ্য; তিনি বলেন—আধুনিক সমাজে বিশ্বাস হীন ধনীর শ্রেণী চরিত্রহীনা হতভাগা নারীর চেয়ে অনেক বেশী ভীষণ।'

আধুনিক সমাজের প্রতিটি ছদ্মবেশী স্তরকে তিনি আক্রমণ করেন। ১৯·৫ সনে মেজর বারবারাতে তার ধর্মগুরুদের অন্তর্নিহিত তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থালভেসন আর্মীর একজন কর্মী অস্ত্র তৈরীকারী একজন ধনী লোকের সঙ্গে কিভাবে সংঘর্ষে আসেন—তারপরে দুইজনের কিভাবে মিতালি গড়ে ওঠে—ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য এই যোগাযোগ তিনি বিদ্রূপের কষাঘাতে উদ্ঘাটন করেন।

১৯২৪ সনে লেবার পার্টি শ-দের প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে ক্ষমতা লাভ করে—রামসে ম্যাক্ ডোন্যাল্ড প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিসিক্ত হন। রামসে ম্যাক্ ডোল্যাণ্ড বহুদিন ফেবিয়ান স্যোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাথি মেরে স্যোসালিষ্টদের বহিস্কৃত করেন। শ 'এ্যাপল কার্টে' ম্যাকডোন্যাল্ডের আসল মূর্তি তুলে ধরেন। এ্যাপল কার্টে প্রটিউস লোকের কাছে ধাপ্পা দিয়ে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা করতে গিয়ে গড়ে তুলছিলেন বিরাট একচেটিয়া একটা কারবার—যা স্বার্থ-সিদ্ধি হতো সমাজতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয়দের।

১৯৩১ সনে শ রাশিয়ায় যান আর সেখানকার সমাজব্যবস্থায় উচ্ছসিত হয়ে, তাকে তুলে ধরেন 'টু গুড্ টু বি ট্রু'। ইংলণ্ডের লোকে মহা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি তাদের সামাজিক জীবনে যাঁরা সর্বাপেক্ষা দায়িত্বশীল ব্যক্তি' যাঁদের হাতে মানুষ নিঃসংশয়ে নিজেদের সমর্পণ করে বসে থাকে—তাঁদের আসল রূপ খুলে ধরেন ডক্টরস্ ডিলেমা নাটকে। একজন বুর্জোয়া ডাক্তার সাধারণ বুর্জোয়াদের মতই ঠক তেমনি অসাধু—অথচ এই অসাধুতার জন্যই তাঁর প্রচণ্ড বিত্ত—আর এর জন্যই সরকার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছেন! তেমনি 'আরমস্ এণ্ড দি ম্যানে' তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধবাজদের ভুয়া বিরাটত্বের প্রচারের অন্তর্নিহিত ব্যাপার—সত্যিকারের মানুষ কি—সত্যিকারের সৈনিকদের জীবন, উদ্ঘাটিত করেন।

প্রচারের দ্বারা ছলনা বা মিথ্যার ধোঁয়া অপসারিত হলে আসলে মানুষটা কি? সে যুদ্ধ চায় না। সে চায় শান্তি। লম্বা লম্বা বক্তৃতাদানকারী সারজিয়াস অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চান—'তিনি সবচেয়ে সুখী হবেন, যদি তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়'।

গণতন্ত্রের মুখোস নিয়ে পার্লামেণ্ট সত্যিকারের কি ধরণের ফাসিষ্ট, তিনি ১৯৩৩ সনে 'অন্ দি রকস্' বইতে তুলে ধরেন। প্রথম অঙ্কে দেখানো হয় একজন উদারপন্থী প্রধান মন্ত্রী ব্যবসার মন্দার সময়, একেবারে ভেঙ্গে পড়েন; পলমল ট্র্যাফালগার স্কোয়ার তখন উত্তেজিত জনতার পদভরে কাঁপছে—প্রধান মন্ত্রী আদেশ দিলেন—'পুলিশ দিয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ করো। পুলিশ কমিশনার এসে তাঁকে নিবৃত্ত করে তাঁকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বললেন। একজন শ্রমিক প্রতিনিধি তাঁকে মার্কস আর লেলিনের দুই খণ্ড বই উপহার দেন। দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রধান মন্ত্রী মার্কস আর লেলিন পড়ছেন

আর তা থেকে কৌশল আয়ত্ব করতে পেরেছেন ; কি ভাবে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হয়, তিনি আর একটা ছক্ তৈরী করে ফেলেছেন, কি ভাবে খানিকটা জাতীয়করণের দ্বারা আর অনুপার্জিত আয়ের ওপর কর স্থাপন করে, অন্য দলগুলিকে প্রলোভন দেখিয়ে স্তব্ধ করিয়ে রাখা যায়, কি ভাবে শেষকালে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাসনতন্ত্র বজায় রাখলেন, তারই ইতিবৃত্ত। তিনি বলছেন—"Do you think I did not know, in the days of my great speeches and my roaring popularity, that I was only white washing the slums ? I could not help knowing as well as any of these damned socialists that though the West End of London was chockful of money and nice people, the lives of the millions of people whose labor was keeping the whole show going were not worth living ; but I was able to put it out of my mind because I thought it could not be helpful......Why dont I lead the revolt against it all ? Because I am not the man for the job......And I shall hate the man who will carry it through, for his cruelty and the desolation he will bring on us and our like."

"সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কৃষ্টি প্রভৃতি সমগ্র ছলনার রাজত্বের উপর আক্রমণ—আর এই আক্রমণের জন্যই তাঁর সংগ্রাম—আর এই আক্রমণের জন্যই লেখার প্রয়োজন—মানবিক সহৃদয়তার জন্য—যা না থাকলে সমস্ত লেখক, নাট্যকার, আর্টিষ্ট, কৃষ্টির ধার ধারেন, তাঁরা হ'ন, শ-র মতে— "mere panderers of intellectual debauchery, to be locked up as the puritants locked up the stage players".—কিন্তু এই বিরাটত্বের ভূমিকায় কোন লেখক তেমনি নেমে আসেন না। সমস্ত সাহিত্য জগৎ তাঁকে পরিত্যাগ করে। শ একা রঙ্গমঞ্চে শেষ জীবন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যান।

## শিল্পে রূপ

কোনো জিনিস আমাদের মনে যে-ভাব জাগায়, তারই ভেতরকার চরিতকথাটি হচ্ছে রূপ। আরো তলিয়ে যদি নজর করি তবে দেখতে পাব, রূপের জিম্মেদারিতে ভাবটুকুই সব নয়, একটা ডাগর ইচ্ছেও আছে। যা-কিছু নিমেষে নিমেষে নোতুন হয়ে উঠছে, গুটি কেটে কেটে যারা চলেছে সুন্দর থেকে আরো-সুন্দরের দিকে, তাদের পেছনে রয়েছে অশেষ-হতে-চাওয়া অবাধ ইচ্ছের তাড়া এই চিরকেলে আর চূড়ান্ত ইচ্ছেই রূপের ছকটি দেয় এঁকে, ভাব তারই ওপর তুলি টেনে গড়ে তোলে নিটোল রূপের চেরাগদান। কাজেই, মনের নকাশিপাড়ায় জন্ম নেয় রূপ, মন তাকে বরণ করে শিল্পের রাজাসনে।

মালমশলা দিয়ে শিল্প গড়া হয়, তা মানি ; কিন্তু শিল্প জিনিসটা যে কী, সে কথা যে বড়ো করে জানিয়ে দেয় তার নাম রূপ। মজবুত কাঠামো বেঁধে ভেতরকার চরিতরীতিটি যাতে সুঠাম গড়নের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয় তেমনি করে শিল্পকে একটা মানানসই আকার দেওয়াই এর কাজ। রূপই হচ্ছে শিল্পের সব—সাত রাজার ধন এক মানিক। রূপই শিল্পের মানে। এদিক থেকে রূপ বলতে কোনো একপেশে বাঁধা ধারণা বোঝায় না, বোঝায় শিল্পের ঠাট আর ঠমকের, নিভাঁজ ধরণ আর গহীন মরমের যোগফল। এই যোগফল যখন আড়ালে আড়ালে জড়ানো থাকে শিল্পের মাঝে—বাদলমেঘের হৃদয়ভরা বৃষ্টি ধারার মতো, শিল্প তখন সত্যিকারের রূপবতী।

বস্তু থেকে চোলাই করা রূপ শিল্পলোকে ঠাঁই পেলে মন তাকে বস্তু বলে কবুল করে না, বরং তার স্বাদ নেয় গড়ে-তোলা শিল্পের বিষয় বলে। তাই রূপ যেখানে আছে বিষয় সেখানে থাকবে, তেমনি বিষয়ের বসতকোঠায় রূপও। বস্তুকে নাকচ করে কোনো কোনো সময় রূপ দানা বাঁধতে পারে, কিন্তু বিষয়কে বরবাদ করে কখনোই নয়, কারণ চুলচেরা বিচারে শিল্পের বিষয় বলতে বুঝি শিল্পীর আবেগ আর ভাবনা।

কেউ যদি বলেন, শিল্পের মানে যে রূপ তা তো বোঝা গেল ; এখন, এই রূপের কি কোনো মান আছে। আমি বলব, আছে। কোনো কিছুকে শিল্প হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যে কারিগরের মনে যে-ভাবনা জাগে সেটাই রূপের আসল মানে। সব জিনিসের ভেতরেই একটি রূপ আছে সেই জিনিসটিকে গড়বার কারিগরি হয়ে। শিল্পকে শিল্প বলে মেনে নেবার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণই হচ্ছে রূপ। কাজেই, আমি আছি—এইটেই এর প্রাণের কথা, এ কথাকেই মন্ত্র করে নিয়ে জপছে অহরহ।

এই রূপ আর কারিগরির হাতে রয়েছে জোড়পিরীতির কুশাঙ্কুর। কারণ ছন্দ শুধুই যে তাল-মানের ভেতর দিয়ে সুন্দরের পথ বেঁধে দেয় তা নয়, শিল্পীর ভাবনা আর আবেগের রূপ দেবার আসল

খোদাইকরও সে। ছবির পটে তুলির আঁচড়েরও সেই কাজ, নাটমহলে দেহের ভঙ্গিরও। রূপ আর কারিগরির এমনিধারা আশনাই গড়ে দিচ্ছে সব শিল্পের গোড়াকার বনেদটি।

শিল্পের বিষয় গড়াবার কাজে শিল্পীর চল্‌তি কালের চালু ভাষা আর রঙের বুননের ভূমিকাটিকে..একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিল্পী যখন এই ভাষা আর রঙ নিয়ে কাজ সুরু করেন তখন তারা নিছক রূপহীন রসদমাত্র। বিষয়কে রূপের ছাঁচে ঢালতে গিয়েই এরা রূপকার হয়ে ওঠে। ভাষার ভিত হচ্ছে ধ্বনি, রঙের ভিত আলো। এখন, দরকারমতো ছাঁটাই করে, বাছাই করে, পাশাপাশি সাজিয়ে গুছিয়ে, কানের শোনার আর চোখের দেখার মর্জিমাফিক খাপ খাইয়ে রূপের গণ্ডিতে এদের খুবসুরৎ করে তোলাই কারুশালায় শিল্পীর সেরা মেহনৎ-আনা। ফলে বেখাপ বেমানান হলেই রূপ একেবারে কানামাছি হয়ে উঠবে। তাছাড়া খাপ-খাওয়ানো ব্যাপারটা বস্তুর মুখ চেয়ে ঘটে না, বাইরের জগতের সাথে এর গাঁইগোত্তোরের কোনো যোগ নেই, এটি সরাসরি শিল্পীমনের সৃষ্টিসুখের উল্লাস।

বিষয়কে সুষ্ঠু আকার দিতে গিয়েই শিল্পের একটা রূপ তুরস্ত হয়ে যেতে থাকে। শিল্প গড়া সাঙ্গ না হলে এই রূপ অনেকটা যেন ধারণা হয়ে বাস করে শিল্পীর দরদে। ধারণা জিনিসটা যে কী নিজের মনে তার আঁচ করতে পারি, কিন্তু এ ব্যাপার কাউকে আঁচ করিয়ে দেওয়া যায় না। শুধু কোনো কিছুর গড়নের ভেতর দিয়েই একে মেলে ধরা সম্ভব। বাইরের জগৎ শিল্পীর মনে হাজির হয় এলোমেলো বেশে জট পাকিয়ে। মনের ধারণা তখন প্যাঁচালো হিজিবিজিকে আপন রূপের বাঁধুনিতে সাজিয়ে তোলে—চিক্কন সুতো দিয়ে কুরুশকাঠিতে বোনা খুঞ্চিপোষের মতো।

ভেতরকার কড়া বাঁধুনির জোরেই রূপ সত্যিকারের রূপ হয়ে উঠতে পায়। আর, এ তো জানা কথা, শিবের আলুথালু জটায় প্রলয়ের ছবি ফুটে ওঠে, তার বাঁধনেই ধরা পড়ে গঙ্গা। তেমনি নানানখানাকে একখানা করে তুলবার মাঝেই সুন্দরের জন্ম; রূপ যখন ঐ নানানখানার আড়ি ভেঙে দিয়ে বনিবনা গড়ে তোলে, ভেতরমহলের সুন্দর তখন বেরিয়ে আসে শিল্পের মণিমেলায়, রসিকমনে চাঁদপানা টিপ দেয় এঁকে। হরেক রকম শিল্পের বৈঠকেও একই হাল। এক ধরণের শিল্পের সাথে আরেক ধরণের শিল্পের বোঝাপড়াটা খোলসা হলেই সেরা রূপের ঠাঁই মেলে। যেমন, কথা যেখানে ছবি আঁকে, ছবি যেখানে কথা কয়, সুর যেখানে পটলেখা হয়ে ওঠে, কিংবা নাচের মুদ্রা যেখানে মুখের ভাষাকে বোবা আখরে ফুটিয়ে তোলে, রূপ সেখানে অপরূপ।

কিছু প্রকাশ করতে গেলে বিষয়কে আনতে হবে রূপের আওতায়; ঘুরিয়ে বলা যায়—বিষয়কে রূপের আওতায় আনা মানেই কিছু প্রকাশ করা। রূপ কখনো প্রকাশের ধরণটিকে পাথরে কষে যাচাই করে না, বরং বনেদী ঠাটের মাঝখানে তাকে সাদাসিধে করে মেলে ধরে। এরকম সাদাসিধে করতে গেলে ভাবনা প্রকাশের রীতি আর রূপ গড়বার রীতি—এই দুই শরিকের মালিকানার সীমারেখাটি স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া চাই। নইলে একের পক্ষে অপরের বেড়া ডিঙিয়ে গোটা ব্যাপারটাই কাঁচিয়ে দেবার আশঙ্কা রয়েছে।

নিচুদরের শিল্পে শুধুই বিষয় আর রূপের হরগৌরী মূর্তি রয়েছে সাজানো। আর উঁচুদরের শিল্প বলে নজরানা দিই তাকেই যার মাঝে বিষয় আর রূপের বাহার তো আছেই, আরো আছে

সেই রূপের ছোঁয়ায় জাগানো শিল্পীমনের অনুভূতি। এই যে রূপের বাহার আর শিল্পীমনের অনুভূতি—এরাই হচ্ছে রীতির কাফিলায় ওয়াকিবহাল ছড়িদার। বিষয়ের গড়নের দিক থেকে রূপের দরকারী টুকিটাকি অনেক সময় রীতিরও কাজে আসতে পারে। তুলির আঁচড় যেমন করে একটা বিশেষ ঢঙ ফুটিয়ে তোলে, বেহালার তারে ছড় টানতে টানতে যেমন করে একটা বাঁধা গৎ ধরা পড়ে। হিন্দুরাজদের আমলের গবাক্ষের যে রূপ, মোগলাই ঝরোখার রূপ তার থেকে আলাদা। আসলে দুটোই জানালা, কিন্তু এদের রূপের ফারাকই রীতির অমিল ঘটিয়েছে। এদিক থেকে, গড়ে তোলা বিষয়ের রূপ বিষয়কে গড়ে তুলবার রীতি হতে পারে নিঃসন্দেহে।

রূপের দুটো ঘরানা আছে—চরম রূপ আর পরম রূপ। বাইরের জগতের সকলখানে, আর বাস্তব শিল্পের মাঝে সেই জগতের নিখুঁত অনুকরণে চরম রূপের মজলিস। নিজেকে পুরোপুরি সফল করে তুলতে বাইরের চেহারাটির ওপরই এ জোর দেয় জোরালো ভাবে। ওদিকে, বস্তুকে পেরিয়ে গিয়ে বস্তুর নামগন্ধছাড়া বিদেহী শিল্পের ভাবনামেশা ভাববিলাসে পরম রূপের ঠিকানা মেলে। একেই আমরা আটপৌরে কথায় অরূপ নাম দিয়েছি। অন্য কারও পাশে দাঁড় করিয়ে এই অরূপের বা পরম রূপের সুন্দরকে পরখ করতে গেলে ঠকতে হবে। কারণ এ নিজেই নিজের উপমা। মোদ্দা কথা, চরম রূপের তালুকে শিল্পী যেন রাজমিস্ত্রির মতো নিরেট মালমশলায় হাবেলি গড়েন, আর পরম রূপের মুলুক জুড়ে দূর-রাগিনীর আলাপের মতো ভেসে বেড়ায় শিল্পীর ইসারা।

ঐ হাবেলি গড়ার সাজগয়নার ভেতরে যে চরম রূপ রয়েছে তাকে আমরা শিল্পের ছাঁদ বলতে পারি। অমনিধারা জড়োয়া-জামদানির খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারলেই কারুশালার পর্ষদে সে পরম রূপের খেলাত পাবে। কারণ পরম রূপের পুরোটাই মনের ঋতুরঙের ব্যাপার। শিল্পের প্রতিটি কণার সাথেই আবেগের সুর জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে থাকে। এখন, আবেগটিকে ফলাও করে মেলে ধরতে গেলে প্রতীক হচ্ছে একমাত্র ভরসা। এই প্রতীকের তেপল কাচের ভেতর দিয়েই পরম রূপ রামধনু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

**দেবব্রত চক্রবর্তী**

## আধুনিক বাংলা গান—গঠন প্রকৃতি

আলোচনার বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে পরিচয় না দিলে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হয় না। 'আধুনিক গান' এই পরিচয়ে রেডিওতে, জলসায় সঙ্গীত পরিবেশন চলছে বেশ কিছুকাল ধরে। গ্রামোফোন রেকর্ডেও অনুরূপ পরিচিতি চলছে অথচ সম্যক সংজ্ঞা কেউ নির্দ্ধারণ করেছেন বলে মনে হয় না। আধুনিক গান বলতে কেউবা বুঝিয়েছেন আলোচ্য কালের সমকালীন রচিত বাংলা গান। কেউবা এখনও রবীন্দ্রনাথের গানকেও 'আধুনিক' আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের গানগুলিকেই আধুনিক বলেন। হয় তো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সম্যক যুক্তি প্রয়োগেও সক্ষম। আমরাও তাই আলোচনার আগে আধুনিক গানের পরিধি স্থির করে নেব।

নামেই সূচিত করে, আধুনিক গান পুরাতন সঙ্গীত পদ্ধতি থেকে আলাদা। আলাদা কাঠামোতে আলাদা সুরে, আলাদা তালে, আলাদা পরিবেশন পদ্ধতিতে। সুতরাং আধুনিক গান রচনার পদ্ধতিটিও যে আলাদা হবে তাতেও সন্দেহ নেই। আধুনিক সঙ্গীতবিদ 'বাণীব্রত' বলেছেন * আধনিক গান রচনার ঢঙ ভাল হওয়া চাই বক্তব্য স্পষ্ট ও আবেদনপূর্ণ হতে হবে। প্রকাশভঙ্গী হবে যত সোজা গান হবে ততই হৃদয়গ্রাহী। আধুনিক গীতিকার হতে গেলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি কবিদের কবিতা পড়তে হবে। ভাল ভাল গীতিকারদের লেখা পড়তে হবে তারপর চেষ্টা করতে হবে। বেশী কবিতাধর্মী হবে না কেননা কবিতাধর্মী গান ঠিক গানের পর্যায়ে পড়ে না। প্রকাশভঙ্গীতে নতুনত্ব থাকবে এবং মিষ্টি হওয়া চাই। পরে গীতিকার যশপ্রার্থী নবীন লেখককে বলেছেন,—'প্রচলিত এবং জনপ্রিয় গানগুলি মনস্থ না করে রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রভৃতিদের আরও হৃদয়ঙ্গম করলে প্রকাশভঙ্গী উন্নত হবে। আপনার ছন্দ, ভাষাজ্ঞান আছে। আছে রচনার মুন্সীয়ানা। একটু নতুনত্বের দিকে ঝোঁক দিলে সত্যই সম্ভাবনা আছে।······বাস্তবধর্মী গান লেখার আঙ্গিক আলাদা। সুস্থ গান কিছু কিছু পড়বার চেষ্টা করুন।" দু'এক জায়গায় স্ববিরোধি মন্তব্য থাকলেও বক্তব্য থেকে আধুনিক গানের মোটামুটি পরিচয় মেলে।

সুরকার ও শিল্পী শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক গানের সুরকার ও শিল্পীর পদমর্যাদা সম্বন্ধে বলেছেন,—"শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালকের মধ্যে সম্বন্ধটা অবিভক্ত। পরিচালকের অনুভূতিতে যে সুরের জন্ম তা যথার্থভাবে শিল্পীর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠলেই পরিচালকের সৃষ্টির সাফল্য এবং শিল্পীও যথার্থভাবে পরিচালিত না হলে কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। সুরকার ও শিল্পী যেখানে

* 'সুর ও শিল্পী' পাক্ষিক পত্র—জুলাই-আগষ্ট সংখ্যা ১৯৫৭ এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী সংখ্যা ১৯৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য।

এক সেখানে একই লোকের মধ্যে দু'রকম ব্যক্তিত্ব কাজ করে। যখন তিনি সুর দেন তখন তিনি সুরকার মাত্র আবার যখন গান করেন তখন খাঁটি শিল্পী।' সুরকার, গীতিকার ও শিল্পীর প্রাধান্য সম্পর্কে বলেছেন, 'একটি গানকে প্রাণস্পর্শ করে তুলতে সকলেরই প্রয়োজন।' গানের ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, 'গান সাধারণতঃ প্রেম, বিরহ, প্রিয়া এর মধ্যেই রচিত হয়েছে। ইদানিং এ ছাড়া অন্য গান হয় যেমন পাল্কীর গান, রেলগাড়ীর গান, কারখানার গান ইত্যাদি। এগুলিকে প্রগেসিভ··· অনেকেই বলে থাকেন।' ভাষা ও সুর সম্পর্কে বলেছেন 'ভাষা এবং সুর কোনটারই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দুটির ওজন সমান হলেই শুনতে ভাল হয়। আর একজায়গায় বলছেন, আমাদের গান বাজনা সম্বন্ধে যা ধারণা তা হলো মিষ্টি ছন্দ ও মিষ্টি সুর তা সে যে রকম ধরণের কথাই হোক না কেন।'

এই সমস্ত বক্তব্য থেকে একটা পরিচয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আধুনিক গানে থাকবে তিনটি ব্যক্তিত্ব,—গীতিকার, সুরকার, ও শিল্পী এবং যাঁরা এই তিনেরই সমন্বয় তাঁরা একাধারে তিনটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রজনীকান্ত ইত্যাদি সঙ্গীতকারেরা যখন নিজেরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন তখন হয়েছে তিনটি ব্যক্তিত্বের একত্র প্রকাশ। এখনও তাঁদের গানে দু'টি ব্যক্তিত্বের পরিচয় রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্বকে প্রশংসা করতে হয়! ভারতীয় ঐতিহ্যে সঙ্গীতকার বলতে অদারঙ্গ, সদারঙ্গ, বৈজু, নায়কগোপাল, তানসেন থেকে আরম্ভ করে বাংলার আউল বাউল, রামপ্রসাদ ইত্যাদি সঙ্গীতকারেরা সকলেই দুই বা তিনটি ব্যক্তিত্ব নিয়ে অসাধারণের পর্যায়ে রয়ে গেলেন এবং অন্যান্য বিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতকারেরাও বাদ গেলেন না!

এখানে বাংলাগান সম্বন্ধেও একটা সীমারেখা টেনে রাখা দরকার। বাংলা ভাষায় খেয়াল গান পরিবেশন করা নিয়ে সম্প্রতি একটি মতামত গড়ে উঠেছে। তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করা এখানে অবান্তর তবু বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সুবিধার জন্যেই উত্তর ভারতীয় ক্লাশিকাল গানের সঙ্গে বাংলাগানের একটা পার্থক্য টেনে রাখবো। বাংলাগান মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। একশ্রেণীর গান হচ্ছে সুর অপরিবর্তনীয় রেখে বিভিন্ন কবিতায় সেই একই সুরে গান করা, যেমন কীর্তন, বাউল ভাটিয়ালী ইত্যাদি। এইগুলির ঐতিহ্য লোকবিশ্রুত এবং আধুনিকের পর্যায়ে পড়ে না। অধুনা যে সমস্ত গান পল্লীগীতি বলে প্রচারিত হচ্ছে সেগুলির রচনা অধুনিক গীতিকারের অবদান বটে কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত সুরের আওতায় রচিত বলে আধুনিক আখ্যা লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার গান সঙ্গীত রচয়িতাদের রচনা। অর্থাৎ যাঁরা লিখে তা'তে নিজেরাই সুর বসিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সঙ্গীত রচয়িতাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের গানগুলি ক্রমশঃ মিউজিয়াম জাত করা হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণীর গানই হল প্রকৃত আধুনিক গান। আগেই বলেছি এর বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গীত পরিকল্পনায় শ্রমবিভাগ। গীতরূপ ও সুরদানের দায়িত্ব একজনের নয় দুইজনের পৃথক্‌ভাবে। অর্থাৎ গীতিকার কেবল ভাষা, ছন্দ ভাব ও কবিতার গঠনের দিকে নজর দেবেন। সুরকার নিজের সুবিধা মত গীতিকারদের গান বেছে নিয়ে তা'তে সুর বসাবেন,—উদ্দেশ্য দুজনেরই শ্রোতার মনোরঞ্জন করা।

এখানে আর একটা কথা আছে। আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে বাংলা-গানের প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা দরকার। বাংলাদেশের গান হল বাংলা কাব্যের প্রাণ; গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে সুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্তের পরিব্যাপ্তি। সুতরাং একদিকে বাংলার সঙ্গীত'ঐতিহ্য যেমন গীতি কবিতার ভাণ্ডারে, ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যও তেমনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে। এই দুএর মিলনে বাংলা গানের একটা বর্ণসঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের হাজার অনুশীলনী সত্ত্বেও এই সত্যটি আর মুছে ফেলা যাবে না। ওস্তাদপন্থীর কাছে এই বর্ণসঙ্কর তাই আধুনিক। এই মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও আধুনিক যদিও আমাদের মতে ঠিক তাই নয়। এবং আধুনিক গানের বর্ণসংকরতাকে কয়েকটি দিক থেকে বিচার করলেই তা ধরা পড়বে যথা—ফর্মের দিক থেকে; ভাষা ও ভাবের দিক থেকে, সুরের দিক থেকে, ছন্দ বা তালের দিক থেকে, এবং পরিবেশন পদ্ধতির দিক থেকে। আমরা ক্রমশঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করব।

আধুনিক গান ফর্মের দিক থেকে বেশ পুরাতন। অধিকাংশ গানই ধ্রুপদী পদ্ধতিতে চারটি তুকে বাঁধা। সেদিক থেকে ধ্রুপদ, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক গান একই পর্যায়ভুক্ত। এর কারণ অবশ্য গীতিকারদের রক্ষণশীলতা নয় সুরকারদের প্রয়োজনের তাগিদ। ছোট গান অর্থাৎ এক বা দুই তুকের গান সুরকারদের স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারে এবং এর ফলে হয়ত গানটি সুরবসানোর যোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে, এই ভয় গীতিকারদের থেকে যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অবশ্য চারতুকের ব্যতিক্রমও রয়েছে যথেষ্ট এবং অনেক মিষ্টি গান চার বা ছয় লাইনের তৈরী। সেদিক থেকে, অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে, বন্ধু রহ রহ সাথে, সখী আঁধারে একেলা ঘরে, নীলাঞ্জন ছায়া, বা হৃদয় মন্দ্রিল ডমরু ইত্যাদি ধরণের "সতাল" বা "অতালের" গানের উদাহরণ আধুনিক গানে বড় একটা মেলে না। অন্যদিকে চারতুকের বেশী ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের গানে যে অনুপাতে আছে তার তুলনায় আধুনিক গানে আছে অনেক বেশী। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গান পথিকৃৎ হলেও আধুনিক গানে তার পরিবেশন পদ্ধতি বদলেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি" বড় গান হলেও নিছক সঙ্গীত, তার বেশী আর কিছু বক্তব্য এতে নেই। সত্যেন দত্তর লেখা "পাল্কী চলে" কবিতায় সুরারোপ করবার মোট ফলাফল কিন্তু সঙ্গীত নয়। মাঝে মাঝে "উহুমনা"...কথাটি গানটির নাটকীয়তা বাড়াতে অনেক সাহায্য করেছে একথা সত্যি কিন্তু সুরের মূল্য বাড়ায়নি। "গাঁয়ের বধু" গানটিতে ছোট গল্পের আবেদন পাওয়া যায়, ঘটনার পরিণতি বর্ণনার ফলে। দরদী গলায় গানখানি যতটা রসসিক্ত সুরের বিচারে সেই তুলনায় অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে।

এমনি করে প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে ফর্ম সম্বন্ধে একটা সচেষ্ট পরিকল্পনা আধুনিক গীতিকারদের মধ্যে দেখা যায়। উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী গানে কিন্তু এই ফর্মের ব্যাপারটার এত প্রাধান্য নেই। শুধু তাই নয় প্রাচীন বাংলা গান, যাতে হিন্দুস্থানী সুরের প্রাধান্য ছিল, সেখানেও ফর্মের বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল না। এইখানে আধুনিক গান একটা নতুন পথ দেখিয়েছে, এটা মানতেই হবে। বাংলা গানের অগ্রগতির পথে এটা প্রতিবন্ধক কিনা সেকথা এখন মুলতুবী রাখা গেল।

এইখানেই বাংলা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক গানের একটা মস্ত মিল রয়েছে। কোনও গানের ভাব পরিবেশন করতে হলে ভাষা ও সুর এই দুইএরই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যেখানেই এক বা দুই তুকের সাহায্যে সঙ্গীত রচনা করেছেন সেখানেই সুর ভাষার পরিপূরক হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুর ও ভাষার একক পরিকল্পনা সঙ্গীত রচনার আগেই করে ফেলা সম্ভবপর হয়েছিল। আধুনিক গীতিকারদের কাছে সে সম্ভাবনা উপস্থিত হয় না। কবিতা রচনার পর যেহেতু সুর দেওয়া হবে সেহেতু কবিতার মধ্যেই ভাব স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া চাই। সুতরাং অল্প কথায় এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প জেনেই আধুনিক গীতিকারেরা চার বা ততোধিক তুকের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ফর্ম সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার কারণ বোধ করি এইটাই।

আধুনিক গানের গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেটি হল গীতিকারদের গান রচনার সচেতন প্রয়াস। শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব সাধারণ সমঝদারীতেই ধরা পড়ে। গীতিরচনার ব্যাপারেও ফরমায়েসী প্রচেষ্টা নিষ্ঠাহীনতার নামান্তর বলেই গণ্য। গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আধুনিক গঠনের স্তবকগুলির মধ্যে যেন একটা কষ্টকল্পিত সামঞ্জস্যের ছাপ। প্রত্যেকটি চরণে সংগঠন রীতির প্রতি অতিরিক্ত নীতিবোধ ভবিষ্যৎ সুরারোপের সম্ভাব্য উদ্বেলিত অংশটুকুকে যেন অতি মাত্রায় ভারাক্রান্ত করবার ইঙ্গিত যোগায়। গীতিকারদের ব্যর্থ সংগঠন প্রচেষ্টা সেই কারণেই মনে হয় যেন শিল্প পরিবেশনের এক গোপন ষড়যন্ত্র, যেখানে পাণ্ডিত্য ঘেঁষা (সোফিসটিকেটেড) কাব্যের রীতি, পয়ারের অবশ্যম্ভাবীতা ও ফর্মের গোঁড়ামী একসঙ্গে জোট বেঁধে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতমন্যতার একনিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিকে হত্যা করবার জন্যে ক্রমাগত আঘাত হানছে।

**নরেন্দ্রকুমার মিত্র**

## সমালোচনা

**অ্যারিও প্যাগিটিকা ॥** জন মিল্টন। শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। সাহিত্য অকাদেমী নিউদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৫ পৃষ্ঠা। প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল। মূল্য ৩·০০ টাকা।

মিল্টনের ভাবগম্ভীর কাব্য-জগতের অতীন্দ্রিয়লোকে মনশ্চারণা করে পাঠকসমাজ এযাবৎ যে আনন্দের অনুভূতিতে আপ্লুত হয়েছেন তাঁদের কাছে মিল্টনের সৃষ্টির অপর এক কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা অজানা না হলেও, তাঁর গদ্যরচনা যে বহুল পঠিত এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। কবিখ্যাতি লাভের বহুপূর্বে মিল্টনের গদ্যসম্ভার সমকালীন ইংলণ্ডে যে বিতর্কের প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল, তার কাহিনী ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে বিধৃত আছে। কিন্তু সেই গদ্যসাহিত্য আজও মুষ্টিমেয় বিদগ্ধমনকে আকৃষ্ট করলেও, আপামর পাঠকসমাজে তার কোনও বৃহৎ আবেদন আছে বলে মনে হয় না। অথচ মিল্টনের গদ্যরচনা মহত্তর সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ। যদিও মিল্টন পরিহাস ছলে এগুলিকে তাঁর বামহস্তের রচনা বলে অভিহিত করেছিলেন।

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজসংস্কারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন মিল্টন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তৎকালে ধর্মের নামে চার্চ এবং পুরোহিতসম্প্রদায় যে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছিল তার মসীলিপ্ত কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সেই কলঙ্কময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল ১৬৭২ সালের গৃহযুদ্ধে এবং আমূল সংস্কারের জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারে এক ধর্ম সম্মেলনেব অধিবেশন বসল। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ কট্টর পিউরিটান। কিন্তু তাঁদের নিজেদের মতামত ছিল বহুধা বিভক্ত সুতরাং যাঁরা দলে ভারী ছিলেন তাঁরা একটা নূতন মতবাদের প্রচলন করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। এঁরা ছিলেন ক্যালাভিনপন্থী; বা প্রেসবিটার এবং এই শেষোক্ত পরিচয়েই তাঁরা সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রেসবিটারগণ ইংলণ্ডের চার্চসমূহে যাজকতন্ত্রের পরিবর্তে প্রেসবিটারতন্ত্রের প্রবর্তন চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মন্ত্রগুপ্তি ধর্মের ক্ষেত্রে নূতন কিছু দিতে সক্ষম হয়নি। এই সব ধর্মীয় বিতর্কের ধূম্রজালের অন্তরালে কিছুসংখ্যক সৎ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেসবিটারগণের মতবাদ পরিপূর্ণভাবে মেনে নিতে পারলেন না। সুরু হল ধর্মের নামে এক প্রচণ্ড ক্ষমতালাভের কলঙ্কময় কলহ।

প্রেসবিটারগণের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের উপর যে সকল বিধিনিষেধ ছিল তা কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ায় বিরুদ্ধশক্তি সমালোচনার যে প্রশস্তক্ষেত্র লাভ করলেন তা ছিল তাঁদের পক্ষে আশাতীত। এই সুযোগ তাঁরা অতিমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না। বিরোধী পক্ষের সেই ক্রমবর্দ্ধমান প্রচারসুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তিতে প্রেসবিটারগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ১৬৪৪ সালে পার্লামেণ্টের সভ্যগণকে প্রভাবান্বিত করে এক জরুরি বিধান জারি করলেন, বলা হল—

পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার পুস্তক মুদ্রণ চলবে না। এই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার জন্য পূর্বগঠিত 'কমিটি ফর এগজামিনেশন' নামক সমিতির উপর ভার ন্যস্ত করা হল। এক নির্দেশে বলা হল যে এই সমিতি মুদ্রণালয় অথবা প্রকাশক যাই হোক না কেন সন্দেহভাজন হলে তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে অবশ্য তাঁদের কাছে পার্লামেন্টের অনুজ্ঞাপত্র থাকবে। এটাই হল ১৬৪৩ সালের ১৪ই জুনের আদেশ।

দুর্ভাগ্যক্রমে মিল্টন ইতিপূর্বে 'ডক্ট্রিন্ এণ্ড ডিসিপ্লিন অব ডাইভোর্স' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এখন মুদ্রাযন্ত্রের অপমৃত্যু লক্ষ্য করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেসবিটারগণের সেই কুখ্যাত বিধানের প্রতিবাদে লিখলেন অপর একটি ভাষণ। পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্বোধন করে যে ভাষণটি রচনা করলেন তা প্রেসাবিটারগণের অথবা পার্লামেন্টের সদস্যদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু মিল্টনের মানসিক অবস্থা এই সময়ে কেমন ছিল আমাদের অজানা নয়—স্ত্রী কর্তৃক প্রতারিত মিল্টন, নিষ্ফল বিবাহের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধীয় পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন। পুস্তিকাটি তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং সেজন্য তাঁকে বহু লাঞ্ছনা এবং ঘৃণা সহ্য করতে হয়েছিল। এমন কি তাঁকে আদালতে কাঠগড়ায় হাজির করার জল্পনা-কল্পনাও চলেছিল। এই অত্যাচার মিল্টনের মনটিকে এক ধূমায়িত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করে। এবং যখন শুনলেন যে মুদ্রাযন্ত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছে তখন তাঁর মনোগর্ভে সঞ্চিত বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুরণ ঘটল—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে ভাষণের আঙ্গিকে এক প্রতিবাদপত্র রচনা করেন। জন্ম নিল মিল্টনের গদ্যরীতির এক অপূর্ব নিদর্শন—অ্যারিওপ্যাগিটিকা।

অ্যারিওপ্যাগিটিকা অবশ্য মিল্টনের প্রথম গদ্য রচনা নয় এবং ইতিহাস এমন কথা বলে না যে তৎকালীন ইংলণ্ডে ধর্মের ধ্বজা যাঁরা ধারণ করেছিলেন তাঁদের বধির কর্ণে পুস্তিকাটি কোনও দুন্দভিধ্বনি করতে সক্ষম হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত ওয়েজউড সাহেব বলেছেন অ্যা রওপ্যাগিটিকা মিল্টনের ব্যক্তিগত আর্তনাদ। সম্ভবতঃ তাই, কিন্তু সেই আর্তনাদ কট্টর প্রেসবিটারদের কর্ণমূলে কোন গুঞ্জন তুলতে সক্ষম হয়নি কারণ স্বেচ্ছাচার এবং গোঁড়ামি ছিল তাঁদের জপমালা। মিল্টনের ব্যক্তিগত আর্তনাদ সেকালে মহাশূন্যে বিলীন হলেও আজ তা ক্লাসিক সাহিত্যে পর্যবসিত।

স্বাধীনতার উপাসক মিল্টন তাঁর ধ্যান-ধারণাগুলি এমনভাবে অ্যারিওপ্যাগিটিকায় সুসংবদ্ধ করেছেন যে তার প্রভাব চিরকাল এ পৃথিবীর বুকে সৎচিন্তার ইন্ধন যুগিয়ে যাবে যদি না সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে। যদিও একটি সামান্য ব্যক্তিগত কারণের পশ্চাৎপটে অ্যারিওপ্যাগিটিকা রচনার উৎস লুকিয়েছিল কিন্তু একথা সত্য যে গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা জন্মলাভ করেছিল তার মধ্যে অ্যারিওপ্যাগিটিকাই অমরত্ব লাভ করেছে। যে সব প্রসাদগুণ থাকলে রচনা কালজয়ী হয়ে ওঠে, তা হয় তো সর্বতোভাবে অ্যারিওপ্যাগিটিকায় নেই তাহলেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি স্বতস্ফূর্ত ধারণার সার্থক রূপায়ন এই পুস্তিকাটিতে আমরা পাই।

গ্রন্থ মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে মিল্টন যখন অ্যারিওপ্যাগিটিকা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সম্ভবতঃ তখন তাঁর মানসলোকে সিসেরোর আদর্শবাদ গভীর ছায়াপাত করেছিল এবং তারই ক্লাসিক প্রতিচ্ছায়া অ্যারিওপ্যাগিটিকার রচনাশৈলীতে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং গ্রীক মনীষী আইসোক্রাটিসের প্রভাবও পুস্তিকাটিতে প্রস্ফুটিত আছে। আইসোক্রাটিস অনুসরণে ভাষণের ভঙ্গীতে অ্যারিওপ্যাগিটিকা রচিত। এইভাষণের মহত্ব তৎকালীন ইংরাজ শাসকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম না হওয়ার প্রধান কারণ অ্যারিওপ্যাগিটিকার বাকধারা কাব্যসুষমামণ্ডিত। যার মধ্যে বজ্রের কাঠিন্য নেই আছে শব্দচয়নের চমৎকারিত্ব এবং ধ্বন্যাত্মক গাম্ভীর্য। সুতরাং দেখাযাচ্ছে যে রাজনৈতিক কর্ণপটাহে আঘাত করতে হলে যে জ্বালাময়ী এবং বিস্ফোরক রচনাশৈলীর প্রয়োজন অ্যারিওপ্যাগিটিকার বাকধারায় তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। সেকালের রাজনৈতিক পরিবেশে হয় তো পুস্তিকাটির আবেদন নিষ্ফল হয়েছিল কিন্তু এই প্রসাদগুণ সমন্বিত রচনা যে কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় অ্যারিওপ্যাগিটিকা পুস্তিকাটি অনুবাদ করেছেন। এমন একটি গুরুগম্ভীর রচনার অনুবাদ স্বভাবতঃই অতি কঠিন কার্যক্রম। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে অ্যারিওপ্যাগিটিকার বঙ্গানুবাদে শশীভূষণবাবু যে রীতি অবলম্বন করেছেন তা হৃদয়গ্রাহী। কয়েকটি পরিচয়মূলক শিরোনামার সাহায্যে মূল রচনাটি যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলেই আমাদের ধারণা। অ্যারিও প্যাগিরিটিকার মূল বাকধারা অতি দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসপূর্ণ গদ্যের নিদর্শন। কিন্তু অনুবাদক প্রায়শঃই সেই অধুনা অপ্রচলিত বাকধারাকে সরল বাক্যের সাহায্যে অনুবাদ করেছেন, যার ফলে পাঠক রচনা পাঠে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাবেন। অনুবাদক সূচনাতে যে ভূমিকাটি লিখেছেন, তা একটি সুন্দর গদ্য রচনার নিদর্শন, যতদূর মনে পড়ে কয়েকমাস পূর্বে ভূমিকাটি সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আমাদের আনন্দ দান করেছিল। এমন একটি সুকঠিন গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য আমরা শশীভূষণবাবুর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বলতে চাই যে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদশাখা তাঁর কাছে আরো অনেককিছুর প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করে পরিশেষে আমরা এ কথাই বলবো যে এই পরিচ্ছন্ন এবং সুমুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এবং বিষয়বস্তুর নির্বাচনে সাহিত্য অকাদেমীর প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে দ্বিধান্বিত নই, এবং সৎসাহিত্য প্রচারের যে ভূমিকা অকাদেমীর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত কালোপযোগী এবং সাহিত্য সেবার সুচিন্তিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন কার্যক্রম।

A R U N A

*more* DURABLE
*more* STYLISH

**SPECIALITIES**

***Sanforized :***

**Poplins**
**Shirtings**
**Check Shirtings**
**SAREES**
**DHOTIES**
**LONG CLOTH**

***Printed :***

**Voils**
**Lawns Etc.**

***in Exquisite Patterns***

AHMEDABAD

A R U N A

d. No. C3597 Phone : 23-5155 June. '64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Ceiling
India's most popular fans
All-purpose
Ambassador
Orient
FANS
YEARS AHEAD IN LOOKS AND PERFORMANCE

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

ডঃ হরিহর মিশ্র ॥ **কান্তা ও কাব্য** ৫·০০ রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ **কবি স্বরূপের সংজ্ঞা** ৪·০০০

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ **চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি** ১২·৫০ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি ॥ **চৈতন্য পরিকর** ১৬·০০

॥ রবীন্দ্র সাহিত্য ॥

বিমানবিহারী মজুমদার
**রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান** ৬·০০

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
**রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়** ১০·০০

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
**রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য** ১০·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
**শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী** ৫·০০

ধীরানন্দ ঠাকুর
**রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা** ১২·০০
**রাবীন্দ্রিকী** ৪·৫০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
**সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ** ৪·০০
**রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য়** প্রতি খণ্ড ৬·০০

॥ মনোরম সমালোচনা ॥

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
**বিষ্ণুপুর ঘরাণা** ৫·০০

মোহিতলাল মজুমদার
**শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র** ১০·০০

শিশির দাশ
**মধুসূদনের কবি মানস** ২·০০

অহীন্দ্র চৌধুরী
**বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরীশচন্দ্র** ৫·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
**বিদেশী ভারত সাধক** ৩·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর
**বাংলা উচ্চারণ কোষ** ৩·০০
গোপালদাস চৌধুরী

ডঃ অসিতকুমার হালদার
**রূপদর্শিকা** ১০·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
**অনুন্নত দেশের অর্থনীতি** ৫·২৫

প্রিয়রঞ্জন সেন
**প্রবাদ বচন** ৬·০০

দ্বাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

সর্ব্ব যুগে সর্ব্ব কালে ..
কেয়ো-কার্পিন কেশের সৌন্দর্য্যলাভের অবধারিত উপায়। কেয়ো-কার্পিনের মহাফলপ্রদ ভেষজ উপকরণ আপনার মস্তিষ্ক শীতল রাখে। কেয়ো-কার্পিনে আপনার কেশ নিখুঁত পরিপাটি থাকে এবং সুন্দর দেখায়।
Keo Karpin
HERBAL HAIR OIL
কেয়ো-কার্পিন
মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল।
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটি, কটক, জয়পুর।

# বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার

**নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

বিহারীলালের কবিত্বকর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বক্তব্য (যা এই কবি সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংস্কার তৈরী করেছে) দুটি মূল সূত্রের ওপর স্থাপিত; তাঁর কাব্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম কবির নিজের কথার প্রকাশ মেলে এবং তাঁর ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নেই। বিহারীলাল তৎকালীন 'ইংরাজি ভাষায় নব্য শিক্ষিত' কবিদের মত 'যুদ্ধ বর্ণনাসংকুল মহাকাব্য উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা' লিখতে অগ্রসর হন নি, প্রাচীন কবিদের পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও ঝোঁকেন নি, নিভৃতে বসে 'নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা' বলেছেন। তথ্যের দিক থেকে এ সমস্তই সত্য, কিন্তু শিল্পকর্মের দিক থেকে তা কতখানি মূল্যবান সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ বোধ করেন নি। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ বা রবীন্দ্রনাথের মত গীতিকবিদের রচনায় নিজের মনের কথাই গভীর জীবনাভিজ্ঞার ঐশ্বর্যে পরিণতি পায়, বিহারীলালের আত্মকথা কি সেই জাতীয়? অথবা সেই বিস্তারের ঐশ্বর্য না থাকলেও, জীর্ণ অভ্যাসিকতায় কলুষিত সমাজ জীবনে লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণময় উৎস সন্ধানী যে আবেগ কাব্য ঐতিহ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে, তার মর্যাদা কী এই কবির 'নিজের কথার' প্রাপ্য? বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের বিবর্তনে তাঁর স্বগত ভাবনা কোন ভূমিকা পালন করেছিল এবং কীভাবে? বলা বাহুল্য এ সমস্ত প্রশ্ন আভাষে ইংগিতেও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আসেনি।

এই মৌল সাহিত্যজিজ্ঞাসা এড়িয়ে যাবার ফলেই বিহারীলালের ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনিশ্চিত। ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নেই, একথা বললে একজন কবি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় না। এই প্রসংগেই তিনি বলেছেন: 'ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে।' কবি স্বেচ্ছায়ই মাঝে

মাঝে ভাষাকে অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক করে তুলেছেন বা অকারণে ছন্দের বাঁধ ভেঙ্গেছেন স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন ওঠে, এ ধরনের ইচ্ছা তাঁর কবিতার দিক থেকে প্রয়োজনীয় ছিল কিনা, থাকলে তা কতটুকু সিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ বিন্যাসের নিজস্ব যুক্তিতেই কাব্যভাষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রচলিত ছক বর্জন করে, প্রসংগ ও প্রকরণের সমন্বয়ের সূত্রেই ছন্দ নিজের বাঁধ ভেঙ্গে ভিন্নতর ছাঁচ গড়ে; সেই পরিবর্জন ও পরিবর্তনকে আর আকস্মিক, অশিষ্ট কর্ণপীড়ক বা স্বেচ্ছাচারী বোধ হয় না। কবির শিল্পমাধ্যমগত সংকল্প বা লক্ষ্যই বিচার্য, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অন্য কোনও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা মূল্যহীন; সেখানে ভাষা ছন্দ আকস্মিক বা কারণহীন হতে পারে না, হলে সার্থক কবিত্বের দিক থেকে ঘাটতি পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর প্রথম সর্গের প্রথম স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর কবিপ্রশস্তি সুরু করেছেন ঃ

> সর্বদাই হু হু করে মন,
> বিশ্ব যেন মরুর মতন ; উঃ কি জলন্ত জ্বালা !
> চারিদিকে ঝালাফালা, অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

নিতান্ত ব্যক্তিগত আকর্ষণের পক্ষপাত ছাড়া স্তবকটিতে পাঠকের কল্পনায় 'একটি ভাবের দৃশ্য উদ্ঘাটিত, হওয়া কঠিন। দৃশ্যের সংহত চিত্রলতায় 'ভাব' রূপায়িত হয়নি, কবি তাঁর ভাবনাকে ভাষণের আড়ম্বরে প্রকাশ করেছেন মাত্র। পংক্তিগুলো কোনও কেন্দ্রীয় সংলগ্নতায় বাঁধা পড়েনি যা রসোত্তীর্ণ কবিতার প্রাথমিক লক্ষণ ঃ মন সর্ব্বদাই হু-হু করে, বিশ্ব মরুভূমির মত, কবির মানসিক অবস্থার প্রথম দুটো পংক্তির বিবৃতিতে একটি অনির্দিষ্ট, উদাস অশান্তিময় অস্থিরতার ভাবই ব্যক্ত। শেষ দুটো পংক্তিতে প্রায় শারীরিক যন্ত্রণার কাতরোক্তির ভাষায়, অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতনের উপমায় কবি তার জলন্ত জ্বালাকে প্রকাশ করেছেন ; সর্বদাই হু হু করা মন থেকে তিনি আকস্মিক ভাবেই 'উঃ কি জলন্ত জ্বালা'র আর্তনাদে চলে আসেন, মাঝখানে একটি পংক্তি প্রায় স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করে, 'চারিদিকেই ঝালাফালা'। এই বিশৃঙ্খল ভাবনায় ছন্দও শিথিল হয়েছে, 'ঝালাফালার' পর 'জলন্ত জ্বালা' সুরময় ছন্দে অনুরণিত হয়ে ওঠে না।

| ২ | ৪ |
|---|---|
| লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি, | সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে |
| বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ; | অগ্নিভরা, বিষভরা, |
| মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে, | রে রে স্বার্থভরা ! |
| ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি। | কত আর থাকিবি বহিয়ে ? |

কবির এই ভাষণাত্মক চালে কি লিরিকের শুদ্ধ মেজাজ ও ভঙ্গি মেলে ? 'লোক মাঝে দেঁতো হাসি হাসি, ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।'—এখানে অমসৃণ ছন্দের অপরিচ্ছন্নতা সহজেই ধরা পড়ে। রাত্রির স্তব্ধতায় কবির হৃদয়বেদনা ধ্যানমগ্নতার গাঢ়বন্ধ রূপে আসে না, 'ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি'—তাকে এভাবে উচ্চ প্রগল্ভ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ স্তবকটিতে ত হেমচন্দ্রীয় বক্তৃতাত্মক ঢং স্পষ্ট।

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
　যথায় নগর গ্রাম
　নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
　বৃক্ষলতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
　যথায় শ্বাপদদল
　করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লি সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
　আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

উদ্ধৃত স্তবকগুলোও কবির অন্তরের কোনও গভীর অন্বেষার সঙ্গীতময় রূপায়ণ নয়, তাঁর চিন্তা ও বাসনার সাড়ম্বর ঘোষণা। মানুষের বাসহীন নির্জন ভগ্নাবশেষপূর্ণ অঞ্চলে, বৃক্ষলতায় আছন্ন, শ্বাপদ কোলাহলমুখর জীর্ণ অট্টালিকায়, যেখানে ক্ষীণ প্রাণী মানুষ সন্ত্রস্ত হয়, সেখানেই তিনি বাস করবেন, মানুষ জন্তু ছাড়া ব্যাঘ্র সর্প কোনও হিংস্র পশুকেই তাঁর ভয় নেই—সমগ্র সত্তা মন্থিত করে যে প্রত্যয় রূপ ও সঙ্গীতময়তায় আমাদের গভীরতর চৈতন্যের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, এ চিন্তা সে জাতীয় নয় এবং চিন্তা হিসেবেও তা এমন কিছু মহার্ঘ নয়, বরং তার মধ্যে আত্মমহিমা বিজ্ঞাপনের এমন একটা স্থূলতা ফুটে বেরিয়েছে যা আমাদের পীড়িত করে। বিশ্ব মরুময়, স্বার্থপরতায় বিষাক্ত, মানুষ জন্তুর মত ভীতিপ্রদ আর কিছু নেই—কবি জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে আত্মশ্রেষ্ঠত্বের অহংকারবিলাসে বহুলব্যবহারজীর্ণ স্থূল দার্শনিক তত্ত্বের বুলি আউড়েছেন মাত্র, কবির কাছে প্রত্যাশিত জীবনের কোন মৌল অভিজ্ঞতা যা বিশেষের আধারেই নির্বিশেষকে বাঁধে তার কোনও সন্ধান দিতে পারেন নি।

নিজের অহংবাদী চিন্তাভাবনায় নিবিষ্টতার ফলে তিনি তাঁর চিত্রকে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায় সজীব করে তুলতে পারেন না, শব্দবিন্যাস সম্পর্কেও অসতর্ক থাকেন্। 'গর্বভরা অট্টালিকা যায়, এবে সব গড়াগড়ি যায়', 'যথায় শ্বাপদদল করে ঘোর কোলাহল'—মানবসমাজ ক্লান্ত কবির প্রকৃতির শুদ্ধ নির্জ্জনতা সন্ধানের ঐকান্তিকতার বদলে নিজের অগভীর বাসনা তথা স্বাতন্ত্র্যের অসাধারণত্ব প্রদর্শনের আগ্রহে এই উক্তিগুলোয় অরণ্যসমাছন্ন ভগ্ন অট্টালিকার স্তব্ধতা ও গাম্ভীর্যের পরিবেশ ফোটে না। 'গর্বভরা অট্টালিকা যায়'—এই পংক্তিটির 'যায়' ক্রিয়াপদের ব্যবহার অর্থহীন এবং একই ক্রিয়াপদের মিল ছন্দসুষমাবর্জিত।

অতঃপর কবি ভাবেন, কোনও ঝর্ণার সান্নিধ্য তাঁকে তৃপ্তি দেবে ;

১০

গিয়ে তার তীর তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,

১১

যে সময় কুরঙ্গিনীগণ
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,

ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

আমার সে দশা দেখে
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,

মৃত্যুকালে মিত্র এসে
লোক যেমনি চক্ষু মেলে,

তেম্নিতর থাকিবে চাহিয়ে।

এই প্রথাসিদ্ধ বর্ণনায় রোমান্টিকম্মন্য ভাবালুতা ছাড়া অস্তিত্বের যন্ত্রণার পটে প্রকৃতি অন্বেষণের উষ্ণ আবেগ উজ্জ্বল রূপ পায়নি। বাংলা সাহিত্যে নিজের মনের কথা প্রথম শোনাবার গৌরবে যে কবি অভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁর কাছে সংস্কৃতসাহিত্যশোভন বা আলংকারিক প্রকৃতি চিত্রের অনুবর্তনের বদলে দেশের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক রূপের পটভূমিতে প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের গূঢ় সম্পর্কের অভিজ্ঞতাতপ্ত নতুন মৌলিক চিত্রকল্পই প্রত্যাশিত ছিল। শব্দ প্রয়োগে বিহারীলালের অন্যমনস্কতা লক্ষণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত শাদ্বলের অর্থ নব তৃণাচ্ছাদিত স্থান, সুতরাং তার সম্বন্ধে বহুবচনবোধক 'পুরু পুরু' এই বিশেষণ দিরুক্তি অযৌক্তিক। দশম স্তবকটিতে তবু প্রকৃতি প্রীতির কিছু আন্তরিক পরিচয় আছে কিন্তু কুরঙ্গিনীদের বর্ণনা একেবারেই গতানুগতিক রীতির অনুসরণ মাত্র। ঝর্ণার পর সমুদ্র :

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে.
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসংঘ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেন পুঞ্জে ধব ধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণরঙ্গস্থলে
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
( বাতাসের হু-হু রবে
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে ;
দেখিগে, শুনিগে, সে সকলে।

প্রথম তিনটি স্তবকের পরীক্ষায় দেখা যায়, সমুদ্রের রূপবর্ণনাকে বেশ জাঁকালো করে তোলার জন্য কবি নিছক শব্দগত আড়ম্বরের উপর নির্ভর করেছেন : তাঁর সমুদ্রের শুধু বাইরের গর্জন আছে, অন্তঃপ্রকৃতির কোনও গম্ভীর সংগীত নেই, কারণ এখানেও ত প্রকৃতি কবির কাছে বিবরণ দেবার মত দৃশ্য মাত্র। তিনি 'উত্তাল তরঙ্গের'মন্দ্রমুখর গতির কোনও চিত্র আঁকতে না পেরে অত্যন্ত লঘু, সঙ্গতিবিহীন বিবৃতি দেন—'গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার'। ১৫ সংখ্যক স্তবকে মহাবেগে প্রবহমান পবনের সঙ্গে সমুদ্রের সংঘাতের প্রান্তে শব্দের বর্ণনার পর, পরবর্ত্তী স্তবকে এই পরিবেশকে মহা রণ-

রঙ্গস্থল রূপে উল্লেখ করেই তিনি অত্যন্ত লঘু চালে লিখতে পারেন—'বাতাসের হু হু রবে, কান বেশ ঠাণ্ডা রবে ;…দেখিগে, শুনিগে, সে সকলে' !

১৯ থেকে ২৩ সংখ্যক স্তবক পর্যন্ত কবি পল্লীগ্রামে গিয়ে নামধাম সমস্ত কিছু লুকিয়ে, চাষীদের মত হয়ে তাদের মাঝখানে থাকার বাসনা প্রকাশ করছেন তার মধ্যে দুটি স্তবকে কবির মানসিকতা অনুধাবনীয় :

| ২২ | ২৩ |
|---|---|
| বরষার যে ঘোরা নিশায় | সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে, |
| সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ; | নড়্ বোড়ে পাতার কুটিরে, |
| ভীষণ বজ্রের নাদ, | স্বচ্ছন্দে রাজার মত |
| ভেঙ্গে যেন পড়ে ছাদ, | ভূমে আছি নিদ্রাগত |
| বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ; | প্রাতে উঠি দেখিব মিহিরে। |

এই পল্লী প্রকৃতি বাসনা আপাতদৃষ্টিতে যতই মনোমুগ্ধকর ঠেকুক, একটু সতর্ক পরীক্ষায়ই বোঝা যায় যে প্রকৃতিতে আত্মনিবেদনের আকৃতির সুর এখানে বাজেনি, কবির প্রকৃতি প্রীতি আসলে আত্মবিলাস। ঝর্ণার দুর্যোগময় রাত্রিতে ভীষণ বজ্রের শব্দে ছাদ যখন ভেঙ্গে পড়ার মত হয় এবং শহরের বাবুরা কোঠায় কাঁপতে থাকেন, তখন কবি ক্ষেতের ধারে নড়বড়ে পাতার কুটিরে স্বচ্ছন্দে রাজার মত মাটীতে ঘুমোবেন,—প্রকৃতি এখানে আত্মগরিমাময় শহুরে, সৌখীন কল্পনার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় কিংবা তার প্রাণময় স্মৃতিতে জীবন্ত নয়। তাই এই প্রকৃতি আমাদের অস্তিত্বে নতুন কোনও তাৎপর্য বহন করে আনে না।

বঙ্গসুন্দরীতে বিহারীলাল বিভিন্ন নারীরূপের যে প্রশস্তিমূলক বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে অবিশ্যি প্রথম সর্গের এই উপক্রমণিকার কোনও ভাবগত সম্বন্ধ নেই। নারীবন্দনা শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গেই আখ্যানধর্মী কাব্যটির প্রকৃত প্রস্তাবনা প্রদত্ত হয়েছে। প্রতিটি অংশেই উদ্ভাসিত যে সামগ্রিক সংহতির ছন্দোময়তা জীবনবোধের দায়িত্বনিষ্ঠ শিল্পকর্মের লক্ষণ, বিহরীলালের রচনায় তা মেলে না। নারী বন্দনার প্রথম স্তবকেই দেখি :

জগতের তুমি জীবিতরূপিনী,　　পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
জগতের হিতে সততা রতা ;　　বিজন কানন কুসুম-লতা।

নারী জগতের জীবিতরূপিনী এবং তার হিতে সর্ব্বদাই রত, এই মহিমাকীর্ত্তনের সঙ্গে 'তপোবন সরলা হরিণী' এবং 'বিজন কানন কুসুম লতা' চিত্রকল্প দুটি মেলেনি। বিহারীলাল যখন নারীর মাতৃমূর্ত্তির বন্দনা করেন, তখনও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রায় আলংকারিক প্রথাগত বর্ণনার অভ্যাসিকতা ছেড়ে বাস্তবজীবনোৎসারিত আবেগে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অপারগ হন : ধুলায় ধূসর দুঃখীর সন্তানকে ডেকে এনে কোলের উপর বসিয়ে নারী—

পরম করুণ জননীর মত,　　মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত ;
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি　　গায়েতে বুলাও কোমল পানি।

এই স্নেহপ্রদর্শনের ঘটার তুলনায় মধুসূদনের মাতৃস্নেহের চিত্রকল্পটি প্রত্যক্ষ আবেগের অভিজ্ঞতায় কত সত্য ও প্রাণবন্ত বোধ হয় :

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসারণে, খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি কর পদ্ম-সঞ্চালনে!

কবি নানাভাবে নারীর স্নেহ প্রেম প্রীতি মমতা করুণার কথা উল্লেখ করে (১ থেকে ৩৩সংখ্যক সর্গ) বলেছেন, হিমালয়ে যোগাসনে মহাদেব তারই চরণ কমল ধ্যান করেন। তারপরেই, তিনটি স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনির চিত্র আসে:

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে সঘনে,
রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয়;
ফলফুলে সাজে তরুলতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বয়;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

নারীমহিমা বন্দনার সঙ্গে এই বৃন্দাবনলীলার সম্পর্কের কোনও ইংগিতই কবি দেননি, প্রাসংগিকতা বর্জিত বিচ্ছিন্ন কল্পবিলাসে কাব্যটিকে ভারাক্রান্ত করছেন। কোকিলের কুহু রব, ভ্রমরের গুঞ্জরণ, সুধীর মলয় সমীরের বাদন (বায়) প্রভৃতি পাগলিনী গোপিনীদের ধাবনক্রিয়ার সঙ্গে কিভাবে তুলনীয়? এ জাতীয় অসংলগ্ন এবং বিসঙ্গত উপমাও কি প্রমাণ করে না যে কবির ঠুনকো ভাববিলাস আর জীবননিষ্ঠ ধ্যানের একাগ্র তন্ময়তা এক বস্তু নয়?

নারীবন্দনার ৪২ সংখ্যক স্তবকে কবি বলেছেন, নারীর দেহের মনের চেহারা ভাবতে ভাবতে তিনি যখন বিহ্বল হবেন, তখন—'আচম্বিতে এক আসিবে আমার, আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর':

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমতি মূরতি স্ফুরতি পাবে,
আপনা আপনি হৃদি দরপনে
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে
আদরা মাফিক দু-চারি রেখা;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন ঘুঁটে;
দেখিব কেমন হইল লেখা।

এই উক্তিগুলো কেবল বঙ্গসুন্দরী নয়, বিহারীলালের অন্যান্য রচনা সম্পর্কেও সমান সত্য: কবি এমনি আকস্মিক মুহূর্তজীবী কল্পনামত্ততার ওপর অন্ধভাবে নির্ভরশীল, শিল্পমাধ্যমের দৃঢ়, সুশৃঙ্খল, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে কল্পনাকে বিন্যস্ত করার দিকে তাঁর কোনও লক্ষ্য বা আগ্রহ-ছিল না। বঙ্গসুন্দরীর তৃতীয় সর্গে সুরবালাকে কল্পনারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এই নারী 'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিনী স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী' এবং যতদিন মনের চেতনা শরীরে প্রাণ থাকবে, 'ততদিন এই রূপসী কল্পনা, হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান।' কবি প্রথমে নীল পদ্মের চিত্রকল্পে স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের ব্যঞ্জনায় তার রূপ বর্ণনা করেন ('নীল কমল আসন' 'বিলোচন নীল' 'আলো করে নীল কমলবরণ' 'নীল নলিনী বালিকা' 'তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী' 'লহরীলীলায় নলিনী দোলায়, দোলেরে তাহার সে

নীলমনি') কিছু পরেই এই নীল নলিনীর সম্বন্ধে সঙ্গতিবিহীন উপমাটি দেন : 'দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা : কালরূপে আলো করি চরাচর'।

সম্ভবত সর্গটির কাহিনীগত কাঠামোটিকে স্পষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ করতে গিয়ে কবি রূপকের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারেন নি, রূপকের আবরণ কখনও কখনও অত্যন্ত তরল, কখনও বা ভেঙ্গে পড়েছে ; যেমন ১৫সংখ্যক স্তবকের এই অংশে 'সকলেরে ভাবে' ভেয়ের মতন—সুরবালার রূপকল্পনা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায়। অন্য দিকে কবির সখা, এই সর্গের নায়ক, সুরবালা যার মর্মসহচরী, তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত ফলাও ভাবে বর্ণনা করে তিনি সেই বিষম উপাদানে রূপককে খেলো করে তুলেছেন :

২৬

ছেলেবেলা এই সরল সুজনে,<br>
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান ;<br>
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে<br>
মিলিত না এঁর কেহ সমান।

২৮

জ্বলে জ্বলে যেন মাথার ভিতর,<br>
বুদ্ধি-বিদ্যুতের বিলাস ছটা।<br>
ঘেরি ঘেরি চারিদিকে কলেবর,<br>
বিরাজিছে যেন তাহাদেরই ঘটা।

২৯

তখনই যেন বসি বসি শিশু,<br>
জটিল জগত ভেদিতে পারে ;<br>
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু<br>
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে।

৩০

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান,<br>
দাদা মহোদয় উদার মতি ;<br>
বুদ্ধি বিভাকর পুরুষ প্রধান<br>
সদাকৃপাবান ভেয়ের প্রতি।

৩১

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,　যত খুসী, ছুটে বেড়াত অনায়াসে,<br>
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী-মালা ;　কাটিতে নারিত, করিত খেলা।

'একদিন দেব তরুণ তপন হেরিলেন সুরনদীর জলে 'অপরূপ এক কুমারী রতন, খেলা করে নীল নলিনী দলে'—প্রথম স্তবকের সুরবালার এই চিত্রটির ভাব ব্যঞ্জনার সঙ্গে সখার শৈশবলীলার এই ছন্দালালিত্যহীন বিবৃতির গদ্যময়, স্থূল জগতটিকে মেলানো যায় না। উদ্ধৃত স্তবকগুলোর বিস্বাদ স্থূলতায় প্রথম অংশের রূপককল্পনা খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণীয় : এই কাব্যের বারো এবং এগারো অক্ষরে বিভক্ত ছন্দে যুক্তাক্ষর স্থাপন কষ্টকর, সেটা এর গুরুতর অসুবিধে (তিনি তার উদাহরণও দিয়েছেন)। রবীন্দ্রনাথ অবিশ্যি সেই সঙ্গে বলেছেন, বিহারীলাল এখানে যথাসাধ্য যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করে গিয়েছেন। কিন্তু কবি এই ছন্দের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে শব্দ ও ধ্বনিগত আড়ম্বরের মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। জ্বলে জ্বলে ঘেরি ঘেরি, ফুটে ফুটে-ইত্যাদি পুনরাবৃত্তিতে কৃত্রিম গুরুত্বসৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়।

কবির সখা বড়ো হলে যখন 'গেল যে ছেলেমো খেয়াল দূরে' তখন কল্পনাকন্যা তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হল :

৩৯

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,　পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,<br>
শ্যামলবরণা নবীন বালা ;　গলে দোলে পারিজাতময়।

সুরবালার পেশোয়াজ সাজ অসমঞ্জস কুশ্রী ; পারিজাতের সঙ্গে মিলিয়ে অনুপ্রাসাত্মক শব্দতরংগ সৃষ্টির জন্যই এই শব্দটি ব্যবহৃত। আলোচ্য অধ্যায়ে কবি বর্ণনাময় কাহিনীতে এমন স্থূল ঘটনার ঘনঘটা পরিবেশন করেছেন যা তাঁর প্রাথমিক রূপক কল্পনার বিরোধী। সখার হৃদয় সেই দেবকন্যার জ্যোতিস্তে আলোকিত ও আনন্দময় হয়ে উঠল, এমন সময় বাড়ীতে বিয়ের কথা উঠলে তিনি বেঁকে গেলেন : 'মোর করে আহা তবু গুরুজনে, পরালেন বেড়ি চেয়ে না দেখে'! নিজের কল্পনামূর্ত্তির সঙ্গে ত বধূ কিছুতেই মিলন না ; 'কনে দেখে ফাটে বরের পরাণ, পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয়? যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান, এ কনে তাহার কিছুই নয়।' তাঁর নৈরাশ্য পীড়িত মনের অন্ধকারে আবার স্বর্গীয় শোভার পটে সুরবালা আবির্ভূত হয়, তিনি যেন দেহে প্রাণ ফিরে পান। কিন্তু তারপরেই সখার দাদার মৃত্যু ঘটল : 'আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জন, বজ্রপাত হল ভীষণ বেগে ; পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন, মরমে বিষম আঘাত লেগে।' অচেতন অবস্থার জাঁকালো বর্ণনাও কবি দিতে ভোলেন না : 'বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ, নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ ; নড়ে না চড়ে না, শবের মতন, পাণ্ডাশ বরণ বিহীন জ্ঞান।' অবশেষে জ্ঞানবলে তিনি নিজেকে প্রবোধ দিলেন, সেই থেকেই তাঁর—'বিষণ্ণ হইয়ে রয়েছে মুখ।' কবি তাই সুর ললনাকে এসে সখার মুখে হাসি ফুটিয়ে দেবার জন্য আহ্বান জানান : 'সখা—শক্তিশেল—বিশল্যকরণী, মৃত সঞ্জীবনী ধরণীতলে।'

'চির-পরাধীনী' নামাংকিত চতুর্থ সর্গে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে বিদ্যাচর্চায় আলোকপ্রাপ্তা এক বঙ্গনারীর পরাধীনতার ক্ষোভ বর্ণিত। চতুর্থ স্তবকে সর্গটির নায়িকা সরস্বতীকে সম্বোধন করে বলে, তিনি না থাকলে তার 'পোড়া কপালে' এতদিনে কি হত সে জানে না : 'হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী, ঝুলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোরা'। এই আত্মহত্যার বাসনা তথা তার পশ্চাতপটের যন্ত্রণা যে নিতান্ত অগভীর, 'ডোর' শব্দটির ব্যবহারই তার প্রমাণ। আকর্ষণ, আবেগমূলক বন্ধন অর্থেই ডোর বাংলা ভাষায় প্রচলিত, যেমন মায়াডোর, প্রেমডোর ইত্যাদি। গলায় ডোর বেঁধে আত্মহত্যার বাসনা কল্পনার শৌখীন বিলাসে বেশ কাব্যিক হতে পারে, কিন্তু কবিতা হয় না। এক একটি শব্দ নির্বাচনেই ত বোঝা যায় কবির জীবনবোধের গভীরতা, তাঁর শিল্প মাধ্যমে জীবনকে তিনি কি ভাবে আয়ত্ত করেছেন। সার্থক জীবননিষ্ঠ রচনায় শব্দ ত হৃদপিণ্ডের মতই স্পন্দিত হয়, তাতে রক্তের উজ্জ্বল, গাঢ় বর্ণ ফোটে।

তারপর নায়িকার নিজের পরাধীন দুঃস্থ জীবনের ভাষণ আসে :

৭

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাঝে,
দাসীদের মত খাটি অনিবার
গুরুজন মন মতন কাজে।

৮

পান থেকে চুণ খসিলে হঠাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই ;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বোসে কুণো গুঁতুনি খাই।

পুরুষদের প্রতি ধিক্কারও উচ্চারিত হয় :

২৪

বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে,
　ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
　যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

২৫

হায় রে কপাল ! পুরুষ সকল,
　বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
　ঠ্যাঁঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি !

এই বক্তৃতার জোলো ভঙ্গিতে নারীর অস্তিত্বের যন্ত্রণা কোনও আকার পায় নি, এবংবিধ বাণী প্রদানের প্রগল্‌ভতার তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গার্হস্থ্য জীবনের সীমায় গৃহবধূর সাধারণ বেদনার চিত্রকেও আন্তরিক ও জীবন্ত মনে হয়। আলোকপ্রাপ্তা নারীটি অতঃপর বিদ্যাচর্চাজনিত তার জ্ঞানোদয়ের সমস্যা উল্লেখ করে। জ্ঞান লাভের পর শুধু খেয়ে পরে 'ভবের ভাণ্ডার' ক্ষয় করার গ্লানি বহন করতে সে আর প্রস্তুত নয়, তাকে নিজেই জগতের ঋণ শুধতে হবে : 'কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে, শুধিবে আমার নিজের ধার ?' সুতরাং—

৪১

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
　বড়ই আমার উঠেছে মন ;
আজ কথনই হটিব না পিছু,
　সাধন অথবা হবে পতন !

এই বক্তৃতাত্বক ঘোষণায় ব্যক্তিত্ববোধের আস্ফালনের পরই জ্ঞানবতী নায়িকা অভিমানে ও অনুনয়ে কাতর হয় আকাঙ্খিত ভাবপরিবর্তনের অসংলগ্নতায় :

৪৩

আহা, ঘরে আমি আজি প্রিয়তম,
　কোয়ো কোয়ো দুটো নরম কথা !
যেন হে হঠাৎ হইয়ে গরম,
　ব্যথার উপরে দিও না ব্যাথা !

৪৪

আপনা তুলিয়ে তোমায় লইয়ে,
　রাজি আছি আজো ধরিতে প্রাণ ;
অপমান করা তুমি তেয়াগিয়ে,
　অধিনার যদি রাখহে মান।

নায়িকার আত্মসচেতনতা ত ভাবের বুদ্বুদবিলাস, কবির আত্মতোষণমূলক কল্পনা চরিতার্থতার একটি উপাদান মাত্র, তাই কতকগুলো নাটুকে প্রায় গদ্যময় উক্তি ছাড়া তার কোনও নতুন কাব্যভাষা তিনি গড়তে পারেন না।। শেষ স্তবকটি ত বিচ্ছিন্ন নাটকীয়তায় চূড়ান্ত রকমের স্থূল, বিশৃংখল :

প্রাণের ভিতর উদাস নিরাশ,
　ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর ;
ওঠো ওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস,
　অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর !

ভাষণের গুরুগম্ভীর ভঙ্গিটিকে জমিয়ে তোলার জন্য 'ওঠো-প্রায়' এর মত উদ্ভট শব্দযোজনাও করতে হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গের নায়িকা 'ছাদের উপরে চাঁদের কিরণে'র ঘরোয়া পরিবেশেই প্রথাসিদ্ধ আলংকারিক বর্ণনায় উপস্থাপিত : 'ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে', 'বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা', 'হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন', 'মধুকরকুল পাছু পাছু ছোটে, বুঝি পরিমল লোভেই ধায়'। এ জাতীয় বর্ণনায় যেমন নায়িকার রূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি, তেমনি তা পরবর্তী অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন : রূপময়ী নায়িকা হঠাৎ কেন বিষাদময়ীহয়ে পড়ল, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কবির মনে হয়, তার বাবা মা বোধ হয় তাকে—'করেছেন দান সে কাল নিশিতে, ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে'। কবি প্রার্থনা জানান, তার সেই 'বেদড়া' বর যেন মানুষ হয় এবং 'আমোদে প্রমোদে দম্পতি দু-জন, ছেলেপুলে লয়ে সুখেতে রয়!' সপ্তম সর্গের প্রিয়-সখীও আসে গতানুগতিক বর্ণনার ছকে :

৬

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে,
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় ;
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে,
মানস মোহিয়ে সতত বয়।

৭

যখন তোমার সুললিত তনু,
কুসুম কাননে প্রকাশ পায় ;
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু,
আদরে তোমার পানেতে ধায়।

১১

ভ্রমর নিকর ত্যজি ফুল ফুল,
গুন্ গুন্ স্বরে ধরিয়ে তান ;
চারিদিকে তব হইয়ে আকুল,
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান।

অষ্টম স্বর্গের বিরহিনীর বিরহবেদনাও আলংকারিক কৃত্রিম। কবি এই ক্ষেত্রেও ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগযন্ত্রণার কোনও ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ কাব্যভাষার পরিবর্তে ভারতচন্দ্রীয় শব্দাড়ম্বড় বর্ণনার ঘটনাশ্রয়ী স্থূল নাটকীয়তাকেই গ্রহণ করেন। বিরলবনে বিচরণরত প্রেমপাগলিনী উদাসিনীর চিত্র এই : 'পদ কাঁপে থর থর, টলমল কলেবর, এলোথেলো জটাজাল লটপট সমীরণে।' দয়িতের প্রেম প্রত্যাখ্যানের পর যে তিমির তাকে গ্রাস করে তার বর্ণনায় নায়িকা বলে :

১০

কটমট করি বিকট দামিনী,
ভাসিল সে মোর তিমির-রাশে ;
হাসে খলখল কালী উলঙ্গিনী,
অট অট হিহি শমন হাসে!

লঘু তরল ছন্দেই কৃত্রিম ধ্বনিগাম্ভীর্যে ব্যাপারটাকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টাই এখানে দেখি। গৃহের সংকীর্ণ সীমায় নয়, প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশেই তাদের মিলন হবে এই আশ্বাস দিয়ে নায়িকা বলে: 'আর কুরঙ্গিনী নাই কারাগারে, হয়েছে বনের সচলা লতা।' নিজের আত্মভাবসর্বস্বতায় কবি বাইরের জগত ও জীবনের দিকে বিশেষ তাকান নি বলেই 'বনের সচলা লতা'র অসঙ্গত চিত্রকল্পটি দিয়েছেন, কুরঙ্গিনীর তুলনায় (কারাগারে থাকা সত্ত্বেও) বনের লতা নিশ্চয়ই খুব সচল হতে পারে না, অন্তত তার মধ্যে স্বাধীন গতির দ্যোতনা আসে না।

কি হল বুকের মাঝে,
যেন এসে বজ্র বাজে;
কে এলরে রণসাজে ঝনঝনা বিকট বাজনা!

এই উৎকট যন্ত্রণার মুহূর্তেই বিরহিনী দয়িতের দেখা পায়, এ সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও তার ভাষণে কম নাটকীয় হয়নি:

হা হা নাথ! ওকি!—পোড়না পোড়না,
ভীষণ শিখর—ওখান থেকে;
এই, আমি! দেখ না, দেখ না,
সেই আদরিণী ডাকিছে ডেকে।

তাদের মিলও আসেই সেই একই প্রথানুগত বর্ণনায়: 'উড়ে উড়ে পড়ে ফুল, আকুল ভ্রমর কুল, নির্ঝরিণী কুলু কুলু করিয়ে বেড়ায়।' নবম সর্গের 'প্রিয়তমার' আলেখ্যচিত্রণে ব্যক্তিজীবনের প্রসংগ সত্ত্বেও কবি আলংকারিক বর্ণনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন না।

দেশজজীবনের আধারে আসেনি বলে 'বঙ্গসুন্দরীর' কোন নায়িকাই রূপের বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হতে পারে নি, আলংকারিক বর্ণনার চাপে তারা নিষ্প্রাণ, নীরক্ত। বাঙলা দেশের লোকজীবনের অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিতে, ছড়ায় প্রবাদে সঙ্গীতে, কথ্যভাষার বিশিষ্ট ছাঁদে জীবন্ত অজস্র পুরাণ, মীথ—কবিত্বের স্বাভাবিক উৎস সেই প্রাণময় লোকসংস্কৃতির দিকে বিহারীলাল মমতাময় উৎসুক দৃষ্টিতে তাকান নি, অথচ লিরিক মেজাজের সার্থক পরিণতির দিক থেকে সেটাই তাঁর পক্ষে সহায়ক হত। তিনি তাঁর নায়িকাদের পরিকল্পনা ও কাহিনীরসের জন্য নির্ভর করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলীর আলংকারিক রীতি এবং ভারতচন্দ্রীয় শব্দচ্ছটার ওপর। বঙ্গসুন্দরীর কোনও নারীর কণ্ঠেই বাঙালিজীবনে সুর বাজে না, তাদের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্তরংগ দিক, তাদের চিত্রকল্পে, রূপের বিন্যাসে বাঙলার আকাশ মাটি জলের কোন ছায়া প্রতিফলিত হয় না। মধুসূদনের কাহিনী কাব্য মেঘনাদবধে নারী চরিত্রগুলোর কণ্ঠে কথ্যভাষার ছন্দে বাঙালির জীবনাবেগ আশ্চর্যভাবে সুরময় হয়ে উঠেছে। সীতা, সরমা বা প্রমীলা ঘটনাশ্রয়ী বর্ণনার আড়ম্বরে নয়, যে লিরিকের হার্দ্যভঙ্গিতে অন্তরংগতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই প্রাণ পরিগ্রহ করেছে। বিহারীলালের আত্মবিলাসী কবি কল্পনার যে এই গভীরতা ছিল না বঙ্গসুন্দরীতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

# ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

## বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

**হিন্দী গীতাঞ্জলি** ( পূর্বানুবৃত্তি ) :

গীতাঞ্জলির হিন্দী পদ্যানুবাদ চারখানি। প্রকাশকালের ব্যবধান সত্ত্বেও এই চারখানিকে একসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধার জন্য। এগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ হচ্ছে—

| ক্রমসংখ্যা | অনুবাদক | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১ | লালধর ত্রিপাঠী | ১৯৪৬ |
| ২ | ভবানীপ্রসাদ তিবারী | ১৯৪৭ |
| ৩ | মুরলীধর শ্রীবাস্তব ( শেখর ) | ১৯৬০ |
| ৫ | হংসকুমার তিবারী | ১৯৬৫ |

লালধর ত্রিপাঠীর অনুবাদে 'দো শব্দ' লিখে দিয়েছেন হিন্দী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী—যিনি "নিরালা" নামেই অধিকতর পরিচিত। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখিনি, দেখেছি ১৯৫১ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। লালধরের অনুবাদে বাংলা ও ইংরেজী উভয় গীতাঞ্জলির সমস্ত কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। প্রথম ১৫৭টি বাংলা গীতাঞ্জলির, ১৫৮ থেকে ২০৯ পর্যন্ত ইংরেজী গীতাঞ্জলির বাকি কবিতাগুলি। ২১০নং কবিতাটি কবির অন্তিম রচনার ( তোমার সৃষ্টির পথ…… ) অনুবাদ।

ভবানীপ্রসাদ তিবারীর অনুবাদ ইংরেজী থেকে। আর্ট পেপারে ছাপা এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় শোভা পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শুভ্র শ্মশ্রু-বিশিষ্ট মূর্তি। "প্রাক্‌কথা"য় অনুবাদক জানিয়েছেন তাঁর গীতাঞ্জলি-অনুবাদের কাহিনী। ১৯৪২ সালের কারাবাসে আই. সি. এস্. পদত্যাগী রাজনীতিক শ্রীহরিবিষ্ণু কামথের গীতাঞ্জলি-পাঠ শুনে অনুবাদক মুগ্ধ হন—"কামথের তন্ময় বাণী রবীন্দ্রের কাব্যানন্দ বিকীর্ণ করতে থাকে, বর্ষিত হতে থাকে রস।" কিন্তু কিছুদিন পরেই শ্রীকামথকে স্থানান্তরিত করা হয় অন্য জেলে। অনুবাদক বলছেন: "সেদিন মনে হল যেন কারাগারের পাখিগুলির মধ্যে সবচেয়ে চটকদার রঙের বন্দী বিহঙ্গটিকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

মুরলীধর শ্রীবাস্তবের গ্রন্থে আছে ইংরেজী গীতাঞ্জলির ১০৩টি কবিতা, কিন্তু অনুবাদ করা হয়েছে মূল বাংলা থেকে। "নিবেদন"—অংশে অনুবাদক বলেছেন: "ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলির কয়েকটি হিন্দী অনুবাদ দেখার সুযোগ হয়েছে—গদ্যেই নয়, পদ্যেও। কিন্তু কোনো অনুবাদেই সন্তুষ্ট হইনি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি অনুবাদ ইংরেজী অবলম্বনে, কয়েকটি মূল থেকে বেশ কিছু দূরে, আর কয়েকটি তো 'পরম স্বতন্ত্র'। আরও কিছু পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হবে শুনেছি। তবু আমার নিজের অনুবাদে আমার বিশ্বাস আছে, বোধ করি এটা নিজস্ব জিনিসের প্রতি মোহ।" অনুবাদক আরও বলেছেন: "এই অনুবাদের ক্রম ইংরেজী গীতাঞ্জলির হলেও অনুবাদ করা হয়েছে সোজা বাংলা থেকে। মূল ভাষা যখন হিন্দীর কাছাকাছি, তখন অনুবাদের অনুবাদে কী প্রয়োজন?

বাংলা গীতাঞ্জলির বাকি গানগুলিরও পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ। শীঘ্রই প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে।"

হিন্দীতে গীতাঞ্জলির সর্বশেষ অনুবাদ করেছেন হংসকুমার তিবারী। গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—"জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মহাকবির পুণ্য স্মরণে তাঁর রচনা তাঁকেই।"

লালধর ত্রিপাঠী ছাড়া বাকি তিনজনই নিজেদেরকে অনুবাদক না বলে বলেছেন 'অনুগায়ক'। আবার, ভবানীপ্রসাদ তিবারী ছাড়া বাকি তিনজনেরই মূল অবলম্বন ছিল বাংলা কবিতা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। মূলানুগামিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা অনেকবার দেখেছি মূলানুগামিতাই সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করে না, বরং কোনো কোনো সময়ে রসসৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তামিল কবি শ্রীনিবাস রাঘবন্ বাংলা না জেনেও রবীন্দ্রকাব্যের তামিল অনুবাদে যে আশ্চর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তার কথা স্মরণীয়। মলয়ালী কবি জি. শঙ্কর কুরুপ বাংলা জেনেও তাঁর তুলনায় পিছিয়ে আছেন।

হিন্দী অনুবাদকদের মধ্যে মুরলীধর শ্রীবাস্তব বলছেন: "অনুবাদ করা সহজ কথা নয়, বিশেষত কোনো রসসিদ্ধ কবির বাণী-মর্মকে ব্যক্ত করা আর তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে চলা একই কথা।" নিজের অনুবাদ সম্পর্কে ইনি অন্যত্র বলেছেন: "আমি মূলের শব্দ-সঙ্গীত, লয় এবং তুকের প্রয়োগ যথাসম্ভব রেখেছি। বাংলার কিছু শব্দ হিন্দীতে চালাবার মোহও ত্যাগ করতে পারিনি।"

হংসকুমার তিবারী বলছেন: "শিল্পের কোনো একটা সৃষ্টি যখন একটা রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তখন তাকে আরেকটা রূপে ফেলা বড়ই কঠিন।" নিজের অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে: "এটা যে কেবল পদ্যানুবাদ অথবা এতে যে কেবল তুক, অন্তস্তুক, যতি-গতি বজায় রাখার চেষ্টা করে হয়েছে তা-ই নয়, উপরন্তু ছন্দের কাঠামোও মূলানুযায়ী। অনেকগুলিতে গানের মূল ধুন পর্যন্ত রক্ষিত আছে, পতিব্রতা রমণীর মতো ভাব তো অনুগামী বটেই।"

ভবানীপ্রসাদ যেহেতু ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন (এবং বাংলার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই), তাই তিনি মুরলীধর বা হংসকুমারের মতো মূলানুগামী হতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের হিন্দী রূপারোপে ভবানীপ্রসাদের আবেদন কিছু কম নয়। অবাঙালী পাঠকের সামনে বাংলার "তুক, অন্তস্তুক, যতিগতি" কিংবা বাংলাছন্দের "লয়, গীত ও শব্দ" রাখাটাই বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল অনুবাদের ভাষায় তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। কাব্য-রসিক কোন্ রূপকে সমাদর করবে সেইটেই আসল বিষয়। "যাবার দিনে এই কথাটি" কবিতার প্রথম ও শেষ অংশের অনুবাদ আমি পর পর তুলে ধরছি। আমার মনে হয়, ভবানীপ্রসাদকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

**ভবানীপ্রসাদ**

জব্ য়হাঁ সে চলূঁ লংগর খোল্‌কে
হো য়হী মেরে কি অন্তিম বোল্ রে—
জো য়হাঁ দেখা সভী অনমোল রে!......
ক্যা উসীনে ছু দিয়া মুঝ্‌কো কহীঁ?

জো স্বয়ং তো ছুআ জা সকতা নহীঁ ।
য়হীঁ টূটে সাঁস তো টূটে ভলে
ঔর তব্ অন্তিম যহী হো বোল রে !
জো য়হাঁ পায়া সভী অনমোল রে !

**হংসকুমার**

জানে কে দিন কহ জাউঁ মৈঁ জিসমেঁ বারংবার
জো দেখা জো পায়া উসকী তুলনাসে লাচার !
ছুনা জিন্হেঁ নহী থা সম্ভব, মিলে অতনু বে তনমেঁ অভিনব
অব্ জো অন্ত্ যহী করনা হো করেঁ, মুঝে স্বীকার ।
জানেকে দিন কহ জাউ মৈঁ জিসমে বারংবার ।

**লালধর ত্রিপাঠী**

জাতে জাতে মেরে মুখসে নিকলে অন্তিম বাত্ য়হী
দেখ লিয়া জো মৈঁনে উসকী তুলনা জগমে নহী কহী !
জিসকা স্পর্শ ন হো জীবনমেঁ বহ আয়া ভুজকে বন্ধনমেঁ,
মেরা য়হী অন্ত্ কর দেঁ তো করনে দো, কুছ ক্লেশ নহী ।
জাতে সময় বতা মৈঁ জাউঁ, প্রভুবর, কেবল বাত্ য়হী ।

**মুরলীধর শ্রীবাস্তব**

জানেকে দিন য়হাঁসে য়হ য়াত কহকে জাউঁ
দেখা য়হাঁ প' জো কুছ, জো কুছ য়হাঁ পৈ পায়া,
তুলনা নহী কিসীমে য়হ ভাব লেকে জাউঁ ।
জিসকা ন স্পর্শ সম্ভব পরসা শরীর উসকা,
যদি শেষ করনা চাহে, তন্ দেকে হর্ষ পাউঁ,
জানেকে দিন য়হাঁসে য়হ বাত্ কহকে জাউঁ ।

আমরা বলতে চাই যে, হিন্দী অনুবাদকদের মধ্যে ভবানীপ্রসাদের ভাষাই অনেকটা কাব্য-সম্মত রূপ পেয়েছে। কাব্যের ভাষারূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। কবি একজায়গায় বলেছেন: "ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না।...রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়। কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা করে তোলে। অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা।... অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্যমাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু বা বলে, কিছু বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু

আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলোট-পালোট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে।"

উল্লিখিত অংশে কবি যে কাব্যভাষার কথা বলেছেন তা কেবল মৌলিক রচনা সম্পর্কে নয়, অনুবাদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অনুবাদের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য বলেই আমরা মনে করি। কাব্যের অনুবাদক যদি স্রষ্টা না হন অর্থাৎ স্রষ্টা-সুলভ কল্পনার অধিকারী না হন, তবে তাঁর চেষ্টা মানে-বই-এর চেয়ে বেশি গৌরব দাবি করতে পারে না। অনুবাদকের কল্পনা নিরঙ্কুশ গতিতে চলবে এমন কথা বলা হচ্ছে না, কারণ বল্‌গা-বিহীন কবি-কল্পনার যে কী শোচনীয় পরিণতি হতে পারে তা আমরা দেখেছি পাঞ্জাবী কবি নরেন্দ্র সিং-এর গীতাঞ্জলি অনুবাদে। আবার অষ্ট-প্রহর আড়ষ্ট থেকে অনুবাদক যদি মূল কবির পায়ে পা মেলাতে চান তো দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। আসলে একটা মধ্যপথ বেছে নিতে হবে : রবীন্দ্রনাথ তাই করেছিলেন। তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন— ইংরাজী গীতাঞ্জলি অনুবাদ নয়, নতুন সৃষ্টি। কেবল গীতাঞ্জলি নয়, কবির অন্য অনুবাদ সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। একটি চূড়ান্ত উদাহরণ দিচ্ছি।

Poems নামক গ্রন্থখানির ২১নং কবিতাটির মূল অবলম্বন হচ্ছে উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের ১৪নং কবিতাটি—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে………।" বাংলা কবিতাটি দশটি স্তবকে বিভক্ত, প্রতি স্তবকে দশ পংক্তি। সমগ্র কবিতাটিতে বাক্যের সংখ্যা চল্লিশ। ইংরাজী অনুবাদে মাত্র দশটি বাক্য। ইংরেজীর প্রথম বাক্য=বাংলার তৃতীয় স্তবকের শেষ দুই ছত্র। ইংরেজীর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম বাক্য=বাংলার চতুর্থ স্তবক। ইংরেজীর ষষ্ঠ বাক্য=বাংলার অষ্টম স্তবকের প্রথম দুই ছত্র। ইংরেজীর সপ্তম ও অষ্টম বাক্য=বাংলার নবম স্তবকের প্রথম চারি ছত্র। ইংরেজীর নবম ও দশম বাক্য=বাংলার দশম স্তবকের শেষ।

আগেই বলেছি এটি একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। চূড়ান্ত রূপকে সত্য রূপ মনে করার কোনো কারণ নেই বটে, কিন্তু এর থেকে বোঝা যায় ভাবীকালের অনুবাদককে কবি কতটা স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। হিন্দী অনুবাদকদের মধ্যে একমাত্র ভবানীপ্রসাদ সেই স্বাধীনতার কিছুটা সুযোগ নিতে পেরেছেন, বাকি সকলে অনুবাদকের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। "আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব"—এই গানখানির অনুবাদে মুরলীধর মূলানুযায়ী লিখেছেন—

তূনে মুঝে অশেষ বনায়া য়হ তব লীলা মাত্র
নব-নব জীবনসে ভর দেতা খালি করকে পাত্র।

এর চেয়ে ঢের বেশি প্রাণোচ্ছল হয়েছে ভবানীপ্রসাদের অনুবাদ—

লীলাময়, তুমনে খেল কিয়া
মুঝসে অসীম কা মেল কিয়া
ইস্ জর্জর ঝাঁঝর গাগরকো
ফির ফির তুম রীতী করতে হো
ফির ফির নবজীবন ভরতে হো……

অনুবাদকের দুটি প্রধান দায়িত্ব। একটি হল—অনুবাদের ভাষায় মূলকে যথাযথরূপে তুলে ধরা। কিন্তু সে-দায়িত্ব পণ্ডিতের কাছে। তার চেয়েও গুরুতর দায়িত্ব হল মূলের আবেগ ও সৌন্দর্য, লীলা ও মাধুর্য, আনন্দ ও বেদনাকে সঞ্চারিত করা। কাব্যের অনুবাদে এইটেই প্রথম ও শেষ দাবি। এ দাবি যারা মেটাতে পারেন তাঁরাই যথার্থ অনুবাদক। ভবানীপ্রসাদকে সেই শ্রেণীতে ফেলা যায়। অন্য হিন্দী অনুবাদকের তুলনায় তাঁর উৎকর্ষ বোঝাবার জন্য "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী, অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি"—এই অংশটি নিচ্ছি।

**হংসকুমার**

গায়ক কৈসে জো গাতে তুম গান
মৈঁ স্থনতা, বস্ স্থনতা মৌন নিদান।

**মুরলীধর**

গাতে কৈসা গান গুণী তুম, গাতে কৈসা গান?
মৈঁ অবাক হোকর স্থনতা হূঁ, স্থনতা হূঁ বস তান।

**লালধর**

হে কলবান্, তুম্ কিস্ প্রকার করতে হো মাদক গান,
মৈঁ স্থনতা রহতা হো অবাক, অনজান।

সকলেই যখন মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে দুই চরণে অনুবাদ শেষ করতে ব্যস্ত, ভবানীপ্রসাদ তখন পাঁচ-ছয় পংক্তি নিতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি—

মৈঁ তো না জানূঁ মীত
কি তুম কৈসে গাতে হো মধুর গীত!
মৈঁ বিস্মিত সা স্থন চলতা হূঁ,
মৈঁ বিন বোলে গুণ চলতা হূঁ,
হে মীত,
কি তুম্ কৈসে গাতে হো মধুর গীত!

# জওহরলাল নেহরুর সাহিত্যিক দৃষ্টি ও কবি-হৃদয়

**অমিয়কুমার মজুমদার**

বারে বারে একই কথা বলেছেন তিনি "আমি সাহিত্যিক নই, ঐতিহাসিক নই, কবি নই।' তিনি বলেছেন, 'আই অ্যাম নট এ ম্যান অব লেটারস'। কিন্তু ইতিহাস এর প্রতিবাদ জানায়। বিদেশী সমালোচকদের চুলচেরা বিচারও নেহরুকে বিশ্ব সারস্বত সমাজের দ্বিতীয় সারিতে আসন দেন নি—সেখানেও তিনি প্রথম সারির মানুষ। ওয়েলস্ ডুরাণ্ট মাথা নত করেছেন শ্রদ্ধায়, এডওয়ার্ড টমসন তাঁকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রথম পংক্তিতে বসবার মানুষ বলে চিহ্নিত করেছেন। 'অটোবায়োগ্রাফি' প্রকাশিত হবার সংগে সংগে বিদেশের সাহিত্যের দরবারে জাগলো এক আলোড়ন। চারদিক হতে প্রশস্তির মালা। মাদাম চিয়াং বললেন 'যতদিন ইংরেজী ভাষা থাকবে, ততদিন নেহরুও আছেন।' ইংরেজরা তাতে কণ্ঠ মেলালো। সমালোচকেরা বলেন 'ইংরেজী লেখককুলে জীবিত আছেন এমন এক ডজন সাহিত্যিকের মধ্যে নেহরু নিঃসন্দেহে একজন।'

একথা সত্য যে তিনি সাহিত্য সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি, সম্ভবতঃ কোন কবিতার গ্রন্থও তাঁর রচনা তালিকার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবুও তিনি সাহিত্যিক, তিনি কবি। কবির মত দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখেছেন নেহরু, তবে তার রূপ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা লাভ করে বাস্তবগন্ধী হয়ে উঠেছে। 'সহিত' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'সাহিত্য' শব্দের। একারণে ধাতুগত অর্থ ধরলে 'সাহিত্য' শব্দের মধ্যে একটা মিলনের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই মিলন কেবলমাত্র ভাবের সঙ্গে ভাবের অথবা ভাষার সঙ্গে ভাষার বা গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থের অচ্ছেদ্য বন্ধন নয়, এ মিলনের রাগিনী সুদূর প্রসারিত। এ মিলন মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সাথে বর্তমানের, দূরের সঙ্গে নিকটের। এ যোগসাধন অতি অন্তরঙ্গ। আর এই মেল বন্ধনের কাজ সাহিত্যের। জওহরলালের লেখনী স্তব্ধ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই মেল বন্ধনের কাজ করে গেছে। আত্মচরিত পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ৩১শে মে তারিখে পণ্ডিতজীকে এক পত্রে জানান তাঁর অভিমত "Through all its details there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to the person who is greater than his deeds and truer than his surroundings.." নেহরু বাগ্মী, নেহরু রাষ্ট্রনেতা, কিন্তু জনতার কোলাহল থেকে যখন দূরে গিয়ে আপনাতে আত্মস্থ হন, তখন তিনি কবি, তিনি তখন সাহিত্যিক। এক সুসংস্কৃত কবি-সাহিত্যিকের মেজাজ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার সর্বত্র। তাঁর গ্রন্থের সচল প্যারাগ্রাফগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় যেন বার্ক অথবা চার্চিলের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। ভাষায় সেখানে চড়া রং, তন্ত্রীগুলো বাঁধা যেন উচ্চগ্রামে। ছত্রে ছত্রে যেন আগুনের পরশমণি। কিন্তু সেখানেও তিনি স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী। অহমিকার কুজ্‌ঝটি রচনার প্রসাদগুণকে আচ্ছন্ন করে রাখে নি, উত্তাপ কখনো ক্রুরতার জ্বালায় অসহনীয় হয়ে ওঠে নি। সর্বত্র বিরাজ করেছে এক ছন্দোবদ্ধ মন—সংস্কৃতি সম্পন্ন, সুসভ্য,

স্পষ্ট চিন্তার শান্ত ছন্দ। ঘটনার আবিলতায় যেখানে তাঁর মনের বাঁধ ভেঙে গেছে সেখানেও তিনি লাভা উদ্গীরণকারী বিসুবিয়স নন, সেখানে তিনি সতী বিরহে কাতর নটরাজ। অশান্ত অথচ ছন্দোময়। যেন ক্রোধান্বিত জুপিটার। সর্বত্র তিনি কবি, এবং বাস্তববাদী কবি।

স্বীকার করি রাজনীতিবিদ জওহরলাল প্রথাগত অর্থে সাহিত্যিক নন, ডিকেন্সের মত উপন্যাস লেখেন নি, এরেনবুর্গ, চেকভের মত তীক্ষ্মধার ছোট গল্প রচনা করেন নি, ইয়েটস্, পাউণ্ড, পোপের মত কবিতা সৃষ্টি করেন নি, হয়ত বা মার্কস্, এঙ্গেলস্, কীনস্, রাসেলের মত চিন্তাবিদ নন অথবা গিবন বা টয়েনবীর মত ঐতিহাসিকও নন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহ কি তাঁকে সাহিত্যিকের জয়মাল্য এনে দেয় নি—দেয় নি কি অসংখ্য পাঠকের কাছে তাঁর কবি হৃদয়ের পরিচয় ?

শোনা যায় নি কি 'মিউজিং' এর নামে গ্রীক মিউজদের সুরঝঙ্কার তাঁর রচিত গদ্যের ছত্রে ছত্রে ? 'আত্মরচিত'—এতো শুধু নিজের জীবনের কাহিনী মাত্র নয়, এ যেন বীরের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা, কবির চোখে তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর ঝংকার যেন কান পেতে শুনছেন লেখক। শুনতে পায় পাঠকও। এখানেই তাঁর সাহিত্য কর্মের বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য।

প্রজ্ঞাসুন্দর জওহরলালের জ্ঞানগরিষ্ঠ সাধনার বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাঁর 'আত্মচরিত' 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ, (Glimpses of the World History) ও 'ভারত সন্ধানে' ( Discovery of India ) গ্রন্থে। বিশ্ববিদ্যার বিচিত্র, বহুবিধ তীর্থস্থান পরিক্রমা করেছেন তিনি। এ কাজ একদিনে, আকস্মিক ভাবে হয় নি। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর মন তৈরী করেছিলেন। নানাবিধ বিদ্যার বিচিত্র রস গ্রহণ করার আশ্চর্য শোষণ শক্তি তাঁর ছিল, অথচ বিনা বিচারে, নির্দ্বিধায় কোন কিছু তিনি গ্রহণ করেন নি। বিজ্ঞান, দর্শন, তুলনামূলক ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের রসায়নে রচিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থসমূহের পটভূমি।

লক্ষ্ণৌ জেলের ছোট্ট জানলা দিয়ে বর্ষার আকাশকে দেখছেন নেহরু। লিখেছেন, "সেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে শুইয়া আমি উর্দ্ধে আকাশের মেঘের দিকে চাহিতাম। জীবনে কখনও এমন আগ্রহ লইয়া আকাশের বর্ণ বৈচিত্র্যে এত রূপ দেখি নাই।" পরক্ষণেই কবিতার উদ্ধৃতি, পরিবর্তিত মেঘমালায় ষড়ঋতুর আবর্তবিলাস দেখিতে দেখিতে শুইয়া থাকাও মধুময়। সময়ের কি আনন্দময় সম্ভোগ।" আর আবেগ নয়, যুক্তি এসে উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে দিলে। 'But alas ! Time was not a luxury for us, it was more of a burden." কিন্তু তাঁর কবি মন স্বীকার করছে "But the time I spent in watching those ever shifting monsoon clouds was filled with delight and sense of relief."

আগেই বলা হয়েছে নিঃসংগ জওহরলাল কবি, সাহিত্যিক। তাই লক্ষ্ণৌ জেলে আবদ্ধ অবস্থায় বর্ষার রূপ বিচিত্র সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। পর্বতশিখরে এবং সমুদ্রগর্ভে বহুদিন মুগ্ধনেত্রে তিনি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছেন। তার আলোকের ঝরণা ধারায় স্নাত হয়েছেন তিনি। কিন্তু এমন কৌতুহল তো কখনো হয় নি। আলো ও আঁধারের খেলা এবং রঙের লুকোচুরি দেখার জন্য তাঁর ক্ষুধিত দৃষ্টি ব্যাকুলিত হতো। বর্ষার মেঘ ধীর গতিতে আকাশ পরিক্রমা করে, মুহূর্তে মুহূর্তে তার আকার ও আকৃতির কতো পরিবর্তন ঘটে, নানা বর্ণের সে কি

সুন্দর সমারোহ! নেহরুর কবি মন ভাবসমাধিতে মগ্ন হতো। "They ( eyes ) must have hungered for some light and shade and colouring, and when the monsoon clouds sailed gaily by, assuming fantastic shapes, and playing in a riot of colours. I gasped in surprised delight and watched them almost as if I was in a trance. Sometimes the clouds would break, and one saw through an opening in them that wonderful monsoon phenomenon, a dark blue of an amazing depth, which seemed to be a portion of infinity." বাড়ীর কারো কথা নয়, রাজনীতির কথা নয়, নিজের স্ত্রীর কথাও নয়, এক ফালি জায়গায় শুয়ে বর্ষার রূপ দেখছেন তন্ময় হয়ে। তাঁকে কবি বলবো না তো কাকে বলবো!

প্রকৃতিপ্রেমী জওহরলাল পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন, বিমূঢ় হয়েছেন, তার রহস্য উন্মোচনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন তিনি। বলেছেন, "অনেক সময়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমি যেন গভীর রহস্য সমুদ্রে ডুবে যাই। নিজের যতটা শক্তি আছে তার সবটুকু প্রয়োগ করে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীর সঙ্গে সমান সুরে আমার সমস্ত অনুভূতি বেঁধে পৃথিবীর পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করতে আগ্রহ হয়।"

এই প্রসংগে ছিন্নপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। "এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উদিত হতে থাকত……"

নেহরু বলেছেন, "প্রকৃতির সুরের সংগে আমার মনের সুর যেন এক তারে বাঁধা…… ।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে……"

কারাগারে বন্দী জওহরলালের মস্তিষ্কে নানাবিধ চিন্তার 'ভিব্‌জিওর'। কারাপ্রাচীরের ওপরে থেকে কর্মের আহ্বান তিনি শুনতে পান। মনের গভীরে দোলা দেয়। সুবুদ্ধির সংগে বোঝাপড়া ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। চরম দুঃসাহসিকতায় মৃত্যুকেও উপেক্ষা করতে ইচ্ছা জাগে। তিনি মৃত্যুপ্রেমিক নন আবার মৃত্যুকে যে ভয় করেন তাও নয়। তিনি বলছেন, "জীবনকে অবহেলা ক'রে বৈরাগ্য সাধন সে আমার প্রকৃতিগত নয়।" রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' ( নৈবেদ্য ) কবিতা স্মরণযোগ্য। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়"। নেহরু জীবনপিয়াসী। কবির মত, সাহিত্যিকের মত জীবনের সমস্ত দিক লক্ষ্য করতে চান, জীবনের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবির মত দেখতে চান পরপারে কি আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জীবন আমার এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়"। নেহরু বলেছেন, "জীবনকে আমি বরাবর ভালবেসে এসেছি, এখনও নানাবিধ অদৃশ্য বাধা সত্ত্বেও জীবনকে আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই। ভালবাসি বলেই বোধ করি জীবনের সঙ্গে আমার খেলা করতে ইচ্ছা করে। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে ইচ্ছা করে পরপারে কি আছে।''

রাস্কিন এক জায়গায় বলেছেন 'মহৎ আর্ট মাত্রই স্তব'। মানুষ এই পৃথিবীতে যা ভালোবাসে আর্টের সাহায্যে তারই স্তব করে। বিশ্বপ্রকৃতি অথবা মানবপ্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে যা কিছু মহৎ বা সুন্দর তা-ই আমাদের স্তবের যোগ্য, সুতরাং এ সমস্তই আর্টের বিষয়ভুক্ত তা বললে পুরোকথাটা বলা হয় না। 'প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান আছে।' একে সৌন্দর্য বা ঔদার্যের আকর্ষণ না বলে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই ঐক্যবোধ তো সবার জন্মে না। প্রতি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তো সকলের থাকে না। এ দৃষ্টি কবির, সাহিত্যিকের, বিজ্ঞানীর।

জেলে আবদ্ধ অবস্থায় নেহরু শীতার্ত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করছেন। শীতের কঙ্কালসার রূপ তাঁর কাছে যেন নতুন করে দেখা দিল। তিনি লিখেছেন "আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, জেলের দরজায় দণ্ডায়মান চারিটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছও নিষ্পত্র হইয়া গিয়াছে।' এর পরেই বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। "তারপর বসন্ত আসিয়া তাহাদের কঙ্কালসার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় প্রত্যেক শিরা উপশিরা চঞ্চল করিয়া তুলিল। সহসা অশ্বত্থ এবং অন্যান্য বৃক্ষে যেন এক সাড়া পড়িয়া গেল, যেন যবনিকার অন্তরালে এক গোপন আয়োজনের রহস্য ইঙ্গিত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কচি সবুজ পল্লবের ঈষৎ বিকাশ, আমি চমকিত হইয়া আবিষ্কার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত সন্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ নবপত্রের দেহ ভূষিত হইল, সূর্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া বাতাসের সহিত ক্রীড়ারত হইল, পল্লবের অঙ্কুর হইতে সহসা পত্ররূপে এই দ্রুত পরিবর্তন কি মনোহর।"

তাঁর 'আত্মচরিত' বা An Autobiography'-র এক একটা খণ্ড এক একটা নির্ঝরের মত দ্রুত ছুটে চলেছে। আদি পর্বের অংশে জীবনের প্রথম আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল তরঙ্গের তরল কলধ্বনি। ক্রমে সেই কলধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথও গভীর, জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হয়ে উঠছে। আরও অগ্রসর হলে সমুদ্রের তরঙ্গ বা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, শেষে প্রাণ প্রতিমা কমলার সঙ্গে আসন্ন চির বিচ্ছেদের আশঙ্কায় লবণাশ্রু নিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

'লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী' অধ্যায়ে তিনি ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর সমালোচনা করেছেন, তাদের মতের অসারতা এবং অবাস্তবতা প্রমাণ করতে খড়্গোদ্যত হয়েছেন। অকস্মাৎ তাঁর মন চলে গেল প্রসংগান্তরে—তাঁর কবি মন রাজনৈতিক সত্তাকে অবদমিত করে রাখলো। এখানে তাঁর বক্তব্য প্রাচীনকে যেন পরিত্যাগ না করি। আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে আমরা প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারিয়েছি; কিন্তু তাতে সুবিধে তো কিছুই হয়নি। কোন দিব্যদৃষ্টি তো লাভ করিনি। তিনি বললেন, "আমার মনে হয়, আমরা অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারাইয়াছি অথচ কোন নূতন অন্তর্দৃষ্টি পাই নাই। আমরা আর দেখিব না যে উর্বশী সমুদ্র মন্থনে আবির্ভূতা হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টঙ্কারও শুনিব না।" প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। প্রকৃতি যেমন কঠোর, তেমনই স্নেহময়ী। তারই কোমল স্পর্শে আমরা আশাভঙ্গজনিত বেদনার উপশম, করি, জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহত্তর জীবনের উন্মুক্ত রাজপথে অবগাহন করতে পারি। "Not for most of us, unhappily, to sense the life mysterious of Nature, to hear her whisper

close to our ears, to thrill and quiver at her touch. Those days are gone. But though we may not see the sublime in Nature as we used to, we have sought to find it in glory and tragedy of humanity, in its mighty dreams and inner tempests, its pangs and failures, its conflicts and over all this, its faith in a great destiny and a realisation of those dreams. That has been some recompense for us for all the heart-breaks that such a search involves, and often we have raised above the pettiness of life."

আলমোড়া জেল থেকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যেত পর্বতগাত্রের দিকে। একবার মোটরে ক'রে তিনি ফিরে আসছিলেন জেলে। দুপাশে সুউচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ। পর্ব্বতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর এক অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটা বিজ্ঞবার্দ্ধক্যের লক্ষণ আছে। আমাদের কাছে সমগ্র জগৎ যেন জরাগ্রস্থ। সৌন্দর্যের মায়া আবরণ যেন বিস্রস্ত হয়ে গেছে, বিশ্বসংসারের অনাদি অনন্ত প্রাচীনতা যেন আমাদের কাছেই ধরা পড়েছে। একারণেই হয়ত 'অশনবসন ছন্দভাষা আচার ব্যবহার বাসস্থান সর্ব্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা'। জহরলালের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন নতুন সৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নবীন চোখ নিয়ে ভ্রমণ করেছেন। একথা সত্য যে তিনি যে বিশেষ কোন কৌতূহলজনক নতুন কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন তা নয়, কিন্তু সর্ব্বস্থানে ভালবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।' যে রসবোধ থাকলে জগতে সর্ব্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হয়ে যায় সেই দুর্লভ অনুরাগের অধিকারী তিনি ছিলেন। তার ফলে বনসমাকীর্ণ পর্ব্বতভূমির বিভিন্ন সময়কার বর্ণনা তাঁর লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

"দিবাভাগ অত্যন্ত আরামপ্রদ—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে জীবনের স্পন্দন জাগিল; দূরত্বের ব্যবধান যেন রহিল না, তাহাদের সহিত পরিচিত বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে লাগিলাম।" এ যেন সেই 'ক্ষুধিত পাষাণে'র তুলার মাশুল কালেক্টারের বর্ণনা। এরপর পাহাড়ে রাত্রির বর্ণনা। এমন সজীব বর্ণনা আগে কখনও দেখিনি।

"...দিবাবসানে তাহাদের এই প্রসন্ন মূর্তির কি আমূল পরিবর্তন! 'জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে রজনীর যাত্রারম্ভের' সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্ব্বতমালা শীতল গাম্ভীর্যে ভরিয়া উঠে, জীবন গুহার অতলে আত্মগোপন করে, কেবল বন্যপ্রকৃতি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। চন্দ্রালোকে অথবা তারকার মৃদুভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর পরিব্যাপ্ত ভীতি-মিশ্রিত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়, কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন মনে হয় না। উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কাঁদিয়া ফেরে, একক পথিক জনহীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, সে সর্ব্বত্র দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন কি, বায়ুর শব্দ উদ্ধত পরিহাসের মত মনে হয়। কখনও বা বায়ুহীন শব্দহীন নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার হইতে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জ্বল ও নিকটবর্তী বলিয়া মনে হয়। পর্ব্বতমালা নিষ্করুণ গাম্ভীর্যে চাহিয়া থাকে। তাহার রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় হয়।"

এবার যাত্রা শেষ হয়ে আসছে। গন্তব্যস্থান কাছেই। এমন সময় পথের মোড় ঘুরতেই মেঘমুক্ত আকাশের এক অপূর্ব দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিপথে এল। তিনি বিস্মিত আনন্দে বলে উঠলেন, "As we neared the end of our journey, a turn in the road and a sudden lifting of the clouds brought a new sight with a gasp of surprised delight. The snowy peaks of the Himalayas stood glistening in the far distance, high above the wooded mountains that intervened. Calm and inscrutable they seemed, with all the wisdom of past ages, might sentinels over the vast Indian plains. The very sight of them cooled the fever in the brain, and the petty conflicts and intrigues, the lusts and falsehoods of the plains and the ·ities semed trivial and far away before their eternal ways."

ভাষার বলিষ্ঠতা ও ক্লাসিক্যাল সংহতিগুণে প্রকৃতির এই বর্ণনা যেন মহিমময় হয়ে উঠেছে। এখানেই জহরলালের গদ্য রীতির চূড়ান্ত সিদ্ধির পরিচয়। সহজ ও সাবলীল প্রবাহ মহিমান্বিত কল্পনার আলোয় চিত্রিত বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। ভাস্কর্য-সুঠাম শব্দ বিন্যাস এবং মর্মর-মসৃণ বাক্যাংশগুলি এই গদ্যরীতির ঐশ্বর্যকে বর্ধিত করেছে শতগুণ। হৃদয়াবেগ এখানে গতির সঞ্চার করেছে কিন্তু আবেগ কখনও আতিশয্যে পরিণত হবার অবকাশ পায়নি।

আর একটি বর্ণনাও কল্পনা ও সৌন্দর্যের মিশ্রণে উচ্চচূড় সার্থকতা লাভ করেছে। "...প্রাচীরের উপর দিয়া এক মাইল বা অনুরূপ দূরবর্তী এক পর্বত দেখিতাম—উর্দ্ধে নীলাকাশ। বিক্ষিপ্ত মেঘমালা। মেঘগুলি ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ গ্রহণ করিত। সেই বিবর্তনলীলা দেখিয়া আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতাম না। আমি উহাদের মধ্যে নানাবিধ পশু প্রাণী কল্পনা করিতাম। কখনও বা মেঘে মেঘে মিশিয়া মহাসমুদ্রের মত মনে হইত। কখনও উহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি দেখিতাম। অনিলান্দোলিত দেবদারু কুঞ্জের মর্মরে, সমুদ্রের দূরাগত ধ্বনি শুনিতাম। কোন কোন মেঘখণ্ড নির্ভয়ে, আমার নিকট আসিত, দূর হইতে যাহা কঠিন পদার্থ বলিয়া মনে হইত তাহাই তরল বাষ্পের মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

বন্দী জহরলাল কারা প্রাচীরের এক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে একাত্ম হয়ে গেছেন প্রকৃতির সঙ্গে। কারাবাসে নিঃসঙ্গ নেহরুর চিরসঙ্গী ছিল চাঁদ। দিনে দিনে তার সঙ্গে তাঁর সখ্য নিবিড়তর হয়েছে। তাকে দেখে কত চিন্তা জেগেছে—'বহিঃপ্রকৃতির শোভা, প্রাণশক্তির বৃদ্ধি ও ক্ষয়, অন্ধকারের পর আলোক এবং মৃত্যুর পর অমৃতের আবির্ভাব' ইত্যাদি নানা ধরণের কথা তাঁর মনে হয়েছে। চাঁদের বিচিত্র প্রকাশ, তিথিতে তিথিতে তার পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে। "কখনো চাঁদকে দেখেছি সন্ধ্যার ছায়া যখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে, কখনও বা নিশীথ রাত্রের নীরব অন্ধকারে, কখনও বা অরুণোদয়ের স্তব্ধ মুহূর্তে।" শুধু কবিত্ব নয়, বাস্তব দিকটাও তিনি ভোলেননি—"চাঁদ দেখে অনেক সময় সঠিক বলে দেওয়া যায় এটা কোন দিন বা কি মাস। খেতের চাষীর কাছে চাঁদ যেন বেশ একটা সহজ দিনপঞ্জী—দিনে প্রবাহ ও ঋতুচক্রের আবর্তন নির্দেশ করতে চাঁদ অদ্বিতীয়।"

ভারতে এল ১৯৫০ এর মন্বন্তর। কয়েকটি ছত্রে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের বীভৎসতা যেভাবে ফুটে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। "এল দুর্ভিক্ষ। অতি করাল, অতি কুটিল, বর্ণনাতীত বীভৎস, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মালাবারে, বিজাপুরে, উড়িষ্যায়। শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কাতারে কাতারে পুরুষ, নারী ও শিশু অন্নাভাবে প্রতিদিন মারা পড়তে লাগল। কলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির সামনে। বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে পর্ণকুটিরে পথে প্রান্তরে মাঠে-ঘাটে হাজার হাজার মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠল।"

যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে সে স্বতন্ত্র কথা। সে মৃত্যু বীরের মৃত্যু, তার পশ্চাতে রয়েছে মহান আদর্শ, একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য। অথবা কখনও মৃত্যু আসে উন্মত্ত পৃথিবীর যুক্তিহীন ঘটনাবলীর চক্রান্তে, জীবন অসময়ে সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই মৃত্যু এই দুর্ভিক্ষের জ্বালায় যে মৃত্যু এ কেমন মৃত্যু। এ যে জাতীয় অবমাননা। তীব্র হয়ে উঠল তাঁর লেখনী, "But here death had no purpose, no logic, no necessity ; it was the result of man's incompetence and callousness, man-made, a slow creeping thing of honour with nothing to redeem it, life merging and fading into death, with death looking out of the shrunken eyes and withered frame while life still lingered for a while."

কর্তাব্যক্তিরা ভারতে বিলাতে বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ প্রচার করতে লাগলেন। ব্যংগের কশাঘাত করলেন তাদের এই প্রচেষ্টাকে, বিদ্রূপ ঝলসে উঠল তাঁর রচনায়। "But corpses can not easily be overlooked, they come in the way."

যুক্তিশাসিত, উচ্ছ্বাসবর্জিত গদ্যের আরো বহু নিদর্শন আছে। আত্মচরিত যখন আপন পরিধি অতিক্রম করে গেছে, নেহরু যখন ভারত বা বিশ্বইতিহাসের অভিযাত্রী দর্শক তখনও এমনি একটা স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতদর্শন, বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গ ও আত্মচরিত—এই তিনটি গ্রন্থ পৃথক জীবন্ত যেন একই আত্মা। তিনের মধ্যেই একই মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

নেহরু ইতিহাস রচনা করেননি, তাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন,—'টু রিড হিষ্টরী ইজ্ গুড্, বাট ইভেন মোর ইণ্টারেষ্টিং ইজ টু হেল্প ইন মেকিং হিষ্ট্রি !'

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ একমাত্র গ্রন্থ যেখানে বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র যে এশিয়াতেই সংস্থাপিত তা টের পাওয়া যায়।

ফরাসী বিপ্লবের পরেকার দিনগুলির যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তিনি, সে রকম জীবন্ত বর্ণনা কি কার্লাই দিতে পারতেন ? পারতেন কি ভলটেয়ার ? আবার ইতিহাস বলতে গিয়ে কমলার কথা, সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার উদ্ধৃতি দিতে পারেন একমাত্র জওরলাল।

ছন্দ, উত্তাপ, কবিত্ব, দৃঢ়তা, স্পষ্টতা—সমসাময়িক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সফল ইংরেজী গদ্য-লেখকদের গুণাবলী নেহরুতে পূর্ণ বর্তমান, একারণেই তিনি সর্ব্বত্রসমাদৃত সাহিত্যিক হিসেবে কিন্তু কেবলমাত্র এ-ই নয়। ব্যংগ, বিদ্রূপও তাঁর হাতে অব্যর্থ।

জাপানী বোমারু বিদারণের পরমুহূর্তে চুংকিংয়ের বর্ণনা—সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে "but there were some whose work was over and who testified by their deed and

scorched bodies to progress and the future of modern civilization."

অথবা নৈনী জেলের জেল কর্মচারী, ওয়ার্ডারদের উচ্চরবে কথাবার্তা শুনে তাঁর মনে হতো "কখনও কখনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্শ্বে রহিয়াছি এবং কৃষকেরা চীৎকার করিয়া শস্যক্ষেত্র হইতে বন্যপশু তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বন্যজন্তুরা সকলে মিলিয়া তাহাদের নৈশ ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছে।"

আধুনিকতার মোহে পড়ে আমরা বিস্মৃত হই অতীতকে। কিন্তু একথা কি কখনও স্মরণ করি যে অতীত তার নিজের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায় না—তার বাহু প্রসারিত বর্তমানের মধ্যে এমন কি দূর ভবিষ্যতের মধ্যেও। মানুষের বর্তমান তার অতীতের সংগে নানাভাবে যুক্ত রয়েছে। যে অতীতকে শুধু বিগত দিনের রাশিকৃত বোঝা বলে মনে হয় সে কিন্তু নানাভাবে বর্তমানের মধ্যে প্রকাশিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে।'

অথবা। তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।'

কারাগারে আবদ্ধ নেহরু কারাপ্রাচীরকে মৃত্যুলোক বলে অভিহিত করেছেন। এ সময়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। অতীত যে শত পাকে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনকে। তাঁর কথায় "আমরা বেঁচে আছি মৃত্যুলোকে—আমাদের অতীত সত্তার শত পাকে আমাদের আজকের জীবন বিজড়িত। কঁত্ এর এই কথার সত্যতা আরো ভাল করে বুঝতে পারি কারাবাসে—সেখানে আমাদের উপবাসজীর্ণ বন্দী মন অতীতের স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনা থেকে তার যৎসামান্য খোরাক সংগ্রহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতীত যেন পটে আঁকা ছবির মত। ব্রোঞ্জ কিংবা মার্বেলে তৈরী মূর্তির মত স্তব্ধ ও সমাহিত। চির পুরাতন অনাদি অতীত—তার কোন পরিবর্তন নেই। বর্তমানের ঝড় ঝঞ্ঝায় মন যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন শ্রান্ত মন অতীতের অতল গভীরে শান্তি খোঁজে। স্তব্ধ গম্ভীর পুরাতনের মধ্যে এমন একটি প্রশান্তির আশ্বাস আছে যে মন যেন সেখানে তার একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়, আত্মা পায় মুক্তি।......এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে অতীত সারাক্ষণ আমাদের জীবন বিধৃত করে আছে। আজ আমাদের যা কিছু আছে সে-সব কিছু আমরা পেয়েছি অতীতের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে, আমরা নিজেরা এই প্রাচীন অতীতের সন্তানসন্ততি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন: আমরা ভারতবর্ষের আগাছা পরগাছা নহি, বহু শত-শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে।

তাঁর বহুমুখী জ্ঞানসাধনা ও মননশীলতা বিচিত্র বিষয় আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। যৌবনের উপান্তে বা প্রৌঢ়ত্বের সিংহদ্বারে পৌছে জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা তাঁর মনে যে একটি আত্মস্থ ও অচঞ্চল মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে জ্ঞানের কোন একটি বিশেষ শাখাকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়।

রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের লতাতন্তুজাল পরিষ্কার করে প্রতিটি বিষয়কে

সহজভাবে পরিবেশন করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন যা তাঁর গভীরাশ্রয় ভাবুকতার পরিচয় দেয়। দুরূহ জটিল বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য ক'রে তোলা সাধারণের কর্ম নয়। বিষয়বস্তুর উপর অসাধারণ দখল থাকা চাই এবং সরস ও সহজভাবে বোঝাতে গেলে রচনাশক্তির জাদু থাকা দরকার। বলাবাহুল্য জওহরলালের রচনায় এই দ্বিবিধ শক্তির সার্থক পরিণয় ঘটেছে। 'বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে'র একখানা চিঠি থেকে খানিকটে অংশ তুলে ধরছি : এশিয়ার বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন সভ্যতার গতি তখনও একেবারে শেষ হয়নি। সুকুমার-কলার উন্নতি হচ্ছে, বিলাসিতার মধ্যে তখনও সূক্ষ্ম রুচিবোধ বর্ত্তমান, কিন্তু সব সভ্যতারই নাড়ি যেন দুর্বল হয়ে এসেছে, তাদের প্রাণস্পন্দন ধীরে ধীরে আসছে থেমে। তারা বেঁচে থাকবে অনেকদিন। মংগোলদের আগমনের ফলে শুধু আরবে এবং মধ্য এশিয়ায় ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার গতিতে সত্যিকার ছেদ পড়েনি, বা কোথাও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়নি। চীন এবং ভারতবর্ষে এই সভ্যতা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে শেষে প্রাণহীন ছবির মতো শুধু দূর থেকেই চোখকে টানছিল ; কাছে এলে দেখতে পাবে, তাতে উই ধরেছে।

নেহরুর কবি চোখে 'গীতা' হয়ে উঠেছে কাব্য, তা নিছক উপদেশের গ্রন্থ নয়। তাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'সংকটের কাব্য'। সংকটে যখন মানুষের মন দ্বিধাক্ষিন্ন অথবা কর্ত্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হয় তখন গীতার শরণ নিতে হয়, গীতা সংকটের কাব্য। রাজনৈতিক, সামাজিক সংকটে, বিশেষতঃ মানুষের চিত্তক্ষেত্রের সংকটে গীতা-ই পথ দেখাতে পারে এই তাঁর অভিমত।

আলমোড়া জেলে ছোট্ট সেলে অবরুদ্ধ জওহরলাল। ভারতের যৌবনের প্রতীক। ভাওয়ালীতে তাঁর স্ত্রী কমলা অসুস্থ অবস্থায় আছেন। মাঝে মাঝে দেখতে পান তাঁকে। এদিকে জানুয়ারী শেষ হয়ে ফেব্রুয়ারী এল। ভারতের নানাদিকে বসন্তের নবীন জোয়ার। বাতাসে বসন্তের আগমন ধ্বনি টের পাওয়া যাচ্ছে। বুলবুলের দল গান গাইছে। বিরহী প্রণয়ী জওহরলাল মিলনের ক্ষণ গুণতে থাকেন। জওহরলালের মনের এ ভাবটুকু অতি প্রাণবন্ত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁরই আত্মচরিতে……January has given place to February, and there is the whisper of Spring in the air. The bulbul and other birds are again to be seen and heard, and they shoots are mysteriously bursting out of the ground and gazing at this strange world. Rhododendrons make blood-red patches on the hill-sides, and peace and plum blossoms are peeping out. The days pass and I count them as they go, thinking of my next visit to Bhowali.

জওহরলালের এই গভীর হৃদয়াবেগমণ্ডিত উক্তির মধ্য দিয়ে শুধু একটি ভাবরূপই উদ্ঘাটিত হয়নি, চিরন্তন প্রণয়ী হৃদয়ের এ এক অভিনব কাব্যপাঠ। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ অতিক্রম করে তিনি শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগমণ্ডিত প্রীতির মাল্য নিবেদন করেছেন। জওহরলাল এখানে কবি।

তাঁর কবিহৃদয়ের পরিচয় আরও মেলে তাঁর রচিত 'উইল'-এ। শৈশবে, যৌবনে যে গঙ্গাকে দেখে তিনি বিমুগ্ধ হতেন জীবনের অন্তিমে এসেও তারই কথা। আরও একটা কথা। মঠ নয়, মন্দির নয়, কোন কিছু নয় তার মরদেহের অবশিষ্টের পরে।

শাজাহান দুহিতা কবি জাহানারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন :

বগায়ের সবজ্‌ না পোশদ্‌ কসে মজারে মরা
কে করব-পোষে গরিবাঁ হামিন্‌ গিয়া বস্‌ অস্ত।

অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ ভিন্ন আমার সমাধির উপর কোন আস্তরণ কোরো না। এই তৃণগুচ্ছই অবনমিতার সমাধির আস্তরণ হোক।

আর নেহরুর কবি-হৃদয় তার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেছে "……আমার চিতাভস্মের এক মুষ্টি যেন এলাহাবাদের গঙ্গা সলিলে নিক্ষেপ করা হয়……অতঃপর তা ভেসে যাক মহাসমুদ্রের দিকে—যে মহাসমুদ্র ভারতের উপকূলকে প্রতি মুহূর্ত্তে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। এর পরেও অনেকটা চিতাভস্ম অবশিষ্ট থাকবে—সে সম্পর্কে আমার অনুরোধ—তার সমস্তটাই বিমানে করে নিয়ে যাও উর্দ্ধাকাশে, সেখান থেকে ছড়িয়ে দাও ভারতের চাষীরা যেখানে কাজ করছে, খেতে খামারে, সর্ব্বত্র, এক কণাও অবশিষ্ট রেখো না। ভারতের মৃত্তিকায় ও ধূলিতে তারা মিশে থাক, আত্মবিলুপ্তির পথে লীন হয়ে যাক ভারত-দেহে।"

রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসের কথা নয়, বিজ্ঞানের কথা নয়, দর্শনের কথা নয়, এই উক্তির মধ্য দিয়ে যেন এক কবি-হৃদয় মুকুলিত হয়ে উঠেছে। পার্থিব চিন্তাকে অতিক্রম করে তিনি যেন প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে যেতে চাইছেন। যুক্তিবাদী নেহেরু, চিন্তাবিদ নেহরু, রাষ্ট্রনীতিবিদ জওহরলাল সবাইকে ছাপিয়ে উঁকি দিচ্ছে নিঃসঙ্গ জওহরলালের কবি আত্মা।

জওহরলাল বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল যুক্তিবাদের দীক্ষা। আইন শাস্ত্রও তাঁকে ঐ পথে চালনা করতে সহায়তা করেছে। স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা, বিশ্লেষণের বিপুলতা তাঁর সুকর্ষিত মনের ভিত্তিমূল রচনা করেছিল। তাঁর রচনরে প্রধান গুণ ষ্টাইলে আতিশয্য-দোষের স্বল্পতা। ভাষার বড় গুণ তার ভারসাম্যতা। কোথাও অনর্থক চমকসৃষ্টির প্রকাশ নেই, বক্তব্যকে অতিক্রম করে সর্ব্বদাই তাঁর ভাষা বা ভঙ্গী অকারণ প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠেনি।

আঠারোখানা গ্রন্থ এবং অসংখ্য পত্র-পুস্তিকার রচয়িতা জওহরলাল, বিদেশে সাহিত্যের দরবারে খ্যাতিসম্পন্ন জওহরলাল বলেছেন সনম্র বিনয়ে, "বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত একটা যা-তা বই বাজারে ছাড়তে আমার ভাল লাগে না। লেখা জিনিসটা সহজ—কিন্তু এমন কিছু লিখতে পারব কি—যা পুরাতন হয়ে যাবে না, যা সময়ের গতির সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। আজ কিংবা কালকের দিনটা নিয়ে ক্ষণিকের কারবার করতে মন সরে না। আমি লিখতে চাই সুদূর অজানা ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে।" এ আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন কবি-হৃদয়ের। এ কামনা সাহিত্যিকের অন্তরের।

---

তথ্যপঞ্জী : নেহরু লিখিত গ্রন্থাবলী—

(১) আত্মচরিত (২) বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গ (৩) ভারত সন্ধানে (৪) An Autobiography (৫) Glimps of the World Histry (৬) Discovery of India

# লোক-সাহিত্য অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিত

**সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার**

আমাদের দেশে লোকসাহিত্য অধ্যয়নের কাজটি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে বলাটা খুব অসঙ্গত হবে না। বিদ্বৎ সমাজের যে অংশটি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা প্রধানত লোকসাহিত্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সংগ্রহের কাজেই ব্যাপৃত রয়েছেন। সংগৃহীত জিনিষগুলির পর্যালোচনা তথা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা একেবারে হচ্ছে না তা নয়। তবু বলতে হয় যে অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং অধ্যয়নের একটি সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের অভাব দেখা যায়। আর সেটির অভাবে সংগ্রহের কাজও সুষ্ঠু এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত হতে পারে না। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য যেমন দেশের কোন্ অঞ্চলে কি ভাবে কাজ চালাতে হবে তা জানা এবং একটি পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হওয়া দরকার এক্ষেত্রেও তাই। লোকসাহিত্যকে এক হিসাবে মানবমনের প্রত্নতত্ত্ব বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংগ্রহের কাজটি সত্যিই প্রাথমিক। প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় অতীতের বিভিন্ন নিদর্শনগুলিকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণীবিন্যাসের পর সাজিয়ে রাখা দরকার হয়। লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির ক্ষেত্রেও সে নীতি প্রযোজ্য। এ কাজটি হল অধ্যয়নের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মূল্য বিচারের জন্য ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এইরূপ আলোচনার সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত যথা লোকসাহিত্যের ধারা-বাহিকতা, জাতীয় জীবনে তথা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের স্থান এবং ভূমিকা, লোকসাহিত্যে সামাজিক চেতনার এবং যুগমানসের প্রতিফলন ইত্যাদি।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল লোকশিক্ষায় লোকসাহিত্যের ভূমিকা। প্রত্নতত্ত্বের সাথে একদিক দিয়ে যেমন তার মিল রয়েছে অন্য আর একদিকে তেমনি যথেষ্ট প্রভেদ আছে। লোক-সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। লোকমানসে সৃষ্টির প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শিক্ষিতজন সে সম্বন্ধে সচেতন না হতে পারেন কিন্তু সে জন্য তার সৃষ্টির ধারা স্তব্ধ হয়ে নেই। বিদগ্ধ সমাজের অগোচরে শিষ্টসভার প্রাঙ্গণের বাইরে তা নিঃশব্দ চরণে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছে। লোকসাহিত্য অধ্যয়ন যদি সেই প্রবাহে নূতন প্রাণের শক্তিশালী গতিবেগ সঞ্চার করতে পারে তবেই তা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে।

লোকসাহিত্যের অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতকে বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ 'ফোক্-লোর' বা লোক-কথার অঙ্গ হিসাবে বিচার করতে হবে। ফোক-লোর কথাটি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি এবং তার সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য ইংরাজী ফোক্-লোর ( Folk-lore ) কথাটিই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেই হিসাবে এখানে তা ব্যবহার করায় আপত্তি হওয়া উচিত নয়। কথাটির উৎপত্তি হয় ইংলণ্ডে, ১৮৪৬ সালে। তারপর সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে ফোক্-লোর স্বীকৃতি লাভ করে বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে। ইংলণ্ডে ১৭৭৮ সালে 'ফোক-লোর' সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে অনেক দেশেই অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠেছে। ফোক-লোর সংক্রান্ত গবেষণা এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিতেরা ফোক-লোর বা লোককথার বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকেন (১) পৌরাণিক কাহিনী যথা বিশ্বসৃষ্টি, দেবদেবীর ও মনুষ্যজাতির উৎপত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত কাহিনী (২) সংশ্লিষ্ট জাতির অতীত কাহিনী (৩) রূপকথা (৪) উপকথা (৫) বীর-কাহিনী (৬) ভূত প্রেত পরী উপদেবতা ইত্যাদির কাহিনী (৭) পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী (৮) লোকগীত ও গাথা (৯) কিম্বদন্তী (১০) লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা বিশ্বাস, সংস্কার, আচার, আচরণ (১১) প্রবাদ ও বচন ইত্যাদি। ইংরাজী 'লোর' ( Lore ) কথাটির অর্থ হল জ্ঞান। কাজেই বলা যায় যে ফোক-লোরের অর্থ হল লোকসাধারণের জ্ঞানের সমষ্টি বা ভাণ্ডার।

সত্য সত্যই ফোকলোরকে এক বিশাল রত্নভাণ্ডারের সাথে তুলনা করা চলে। তার বৃহত্তম অংশ এখনও পর্যন্ত অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। প্রত্যেক জনসমষ্টির বেলাতেই দেখা যায় যে একেবারে স্মরণাতীত যুগ থেকে অনেকগুলি কাহিনী লোক মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। ঠিক কখন যে সেগুলির উৎপত্তি বা কারা সেইগুলির রচয়িতা তা জানার উপায় নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সেগুলি পুরুষানুক্রমে জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসাবে চলে আসছে। একেবারে গোড়ার দিকের কাহিনী ও জ্ঞানসমষ্টিকে অপৌরুষেয় বিবেচনায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। কেন না তার মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতমযুগের বিস্মৃত পুর্ব্বপুরুষের স্মৃতি। তেমনি যুগে যুগে পুরুষে পুরুষে নূতন নূতন কাহিনী সৃষ্টি হয়, নব নব আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞান সাধারণ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে। সেগুলি ক্রমশ লোকমুখে সঞ্চারিত হয়ে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, নবপল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় যে পুরাতন কাহিনীর কাঠামো ও খোলস বদল না করেই তাতে নূতন বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে এই সব কাহিনীর মধ্যে আদিম যুগ থেকে সুরু করে সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমসাময়িক মানুষের চেতনা ও বিশ্বদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে মানুষের বিভিন্ন যুগের অভিজ্ঞতা ও তাকে বোঝার তথা ব্যাখ্যার চেষ্টার প্রতিফলন। এইসব কাহিনীতে বিশেষত রূপকথাগুলিতে যে অলৌকিকত্ব এবং কল্পনার অতিরঞ্জন দেখতে পাওয়া যায় তাকে নিছক অলীক চিন্তার ফল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওগুলির ভিতরে পাওয়া যায় একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি ও নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে সেদিনের মানুষের ধ্যানধারণার পরিচয় আর অন্য-দিকে আছে ইচ্ছাপূরণের অভিব্যক্তি। বহুকাল ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, আশা আকাঙ্ক্ষা তখনকার চেতনা এবং বোধশক্তির রংয়ে রঙীন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কার, প্রথা ইত্যাদিরও উৎপত্তি হয়েছে অতীতেরই কোন না কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। সেদিনের মানুষ তার সীমিত বোধশক্তি দিয়ে অভিজ্ঞতাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তারই স্বাক্ষর চিরস্থায়ী হয়ে আছে ঐ সব সংস্কার ও প্রথা প্রভৃতির ভিতরে। অনেক ক্ষেত্রেই তার মুল বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীতে বর্ণনার আতিশয্য, পুরুষানুক্রমে চড়ানো রংয়ের প্রলেপ, কল্পনার অতিরঞ্জন ইত্যাদির অস্তিত্ব সত্ত্বেও কাহিনীগুলির যে

একটি বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিতল রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা চলে না। তাই প্রাচীন যুগের, স্মরণাতীত কাল থেকে সুরু করে ঐতিহাসিক যুগেরও মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক গঠন এবং চিন্তাভঙ্গী প্রভৃতির রূপরেখা রচনার ব্যাপারে এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যে যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নেই বা অসম্পূর্ণ ইতিহাস আছে অথবা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধারের কাছে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্যশাখার মত ফোক-লোরেরও একটি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

বিশ্ব ও মনুষ্যসৃষ্টি এবং আদিম যুগের অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর ভিতরে অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সুদূর অতীতে বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন-সমষ্টির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ফলে একের লোককথা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়ত তারা সেই সুদূর অতীতে একই মূলগোষ্ঠির অন্তভুক্ত ছিল। আজ সে যোগসূত্র ও আত্মীয়তার স্মৃতি কালের অতলে হারিয়ে গেছে। সেই বিস্মৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজে ফোকলোরের একটি ভূমিকা নিশ্চয়ই রয়েছে।

যোগাযোগ এবং আত্মীয়তা ছাড়াও অনুরূপ পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ অপরের প্রভাব ব্যতীতই বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে অনুরূপ বিশ্বাস, প্রথা, ধারণা, কাহিনী ইত্যাদির উৎপত্তি হয়ে থাকে। সেই সমস্ত সাদৃশ্যের ভিতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সমস্ত দেশের মানুষের অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা এবং চিন্তাভঙ্গীর মধ্যে মূলগত ঐক্যের সত্যটি। মানব ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে তা শক্তিশালী করে। সেই ঐক্যই বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের দরুণ সেই সেই দেশের জনগণের মননভঙ্গী, চরিত্র ও জীবনযাত্রার ধরণে কতকগুলি স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য মানব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে ভরে তোলে নানা বিচিত্র সম্পদে। লোককথা বা ফোকলোর অধ্যয়নের দ্বারা এই উভয় দিকের মধ্যে সুদৃঢ় সেতু রচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কোন দেশের লোককথা অধ্যয়নের সময় উপরিউক্ত সাধারণ দিকগুলি ছাড়াও একটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতির লোককথায় পুরাতন উত্তরাধিকারের সাথে সাথে যুগে যুগে যে সব নূতন নূতন উপাদানের সংযোগ হয় তা হল সমাজবিকাশের বিভিন্ন অধ্যায়ে জনগণের চেতনা ও অভিজ্ঞতা প্রসারের প্রতিফলন। নূতন কাহিনী সৃষ্টি বা পুরাতনের কাঠামোর ভিতরেই নূতন উপাদান সংস্থাপনের চেষ্টা দুটিই নবযুগচেতনার সঞ্চারের চিহ্ন। তাই চিরায়ত কাহিনীগুলিই মানুষের অগ্রগমনের বিভিন্ন ধাপে নবীন তাৎপর্য লাভ করে। অনেক সময় প্রাচীন কাঠামোর মধ্যেই পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কালক্রমে প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপাদানের সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ আলাদা উপাখ্যানের জন্ম হয়। লোকসাধারণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এগুলির অর্থ বা তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। বরং অনেক সময়ে সেগুলিকে কাঁচা হাতের ও খামখেয়ালী মনের সৃষ্টি বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু লোকমানসের সকল সৃষ্টিরই মূল রয়েছে সামাজিক চেতনার প্রেরণা, রয়েছে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। সেই পটভূমিতে, জনজীবনের আনন্দবেদনা, দ্বন্দ্বসংঘাত ও

সংগ্রামের প্রতিফলনহিসাবে অধ্যয়ন করলে এইসমস্ত উপাদানের প্রকৃত তাৎপর্য সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কোন জাতির লোককথা হল সেই জাতির জনগণের সমবেত ঐতিহাসিক সৃষ্টি এবং জাতীয় মানসের যৌথ অভিব্যক্তি। সেই আবহমানকাল প্রচলিত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সমস্ত দেশেই জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎসরূপে কাজ করে। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মহাকাব্যগুলি এমনি লোকমুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সেই উৎস থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে যুগোপযোগীরূপে পরিবেশন করেছেন। তাঁদের সাহিত্যকৃতির মূল লোকমানসের গভীরে পরিব্যাপ্ত। তাই তাঁদের অমর সৃষ্টি একদিকে জাতীয় চরিত্রের স্বকীয়তাকে প্রতিফলিত করে এবং অন্যদিকে দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে নিখিল মানবমনের অন্তস্থলে সাড়া জাগায়। হোমার, বাল্মিকী, দান্তে, গ্যেটে, শেকসপীয়ার, কালিদাস এবং আধুনিকতমযুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতিতে সে সত্যের স্বাক্ষর অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

শিষ্টসাহিত্যে সব সময় লোককথা বা সাহিত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় না। কিন্তু লোককথার সেই ধারাই নেপথ্য থেকে জনগণের মননভঙ্গী ও মূল্যবোধের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করে।

আমাদের দেশে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য, বিভিন্ন পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, জাতককাহিনী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বহু সন্তকাহিনী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে উপরিউক্ত-ভাবে অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের বিভিন্ন অংশে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেগুলি জনচিত্তকে প্রভাবিত করে এসেছে এবং শিষ্টসাহিত্যে বহু কারুসৃষ্টির উপাদান সরবরাহ করেছে। জনগণের অন্তরের ভাষা বোঝার জন্য ঐগুলির সাথে পরিচিতি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আছে মূল্যায়নের অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহাকাব্য ও কাহিনীর বিবর্তনের ধারাকে ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিতে বিচারের। কথাটাকে হয়ত আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

রাম-সীতা, কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধ, দেবকীপুত্র বাসুদেব, হর-পার্বতী ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কাহিনী সুদীর্ঘকাল ধরে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছিল। গ্রামের গায়কেরা কথকেরা পল্লীর আঙিনায় সেগুলিকে গানের সুরে রূপ দিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করেছে। পরবর্তীকালে কোন মহাকবি সেই সব টুকরা টুকরা গীতিকা বা গীতিকাব্যকে একটা বৃহৎ পটভূমিতে একসূত্রে গ্রথিত করে উপস্থাপিত করেন। এইভাবে শিষ্ট সমাজে বা রাজদরবারে সেগুলি এক মার্জিত শিষ্টরূপ ধারণ করে মহাকাব্যের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীগুলির সবটুকুই সেই সেই বৃহৎ কাঠামোর মধ্যে ধরা পড়ে না। বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলে সেগুলি নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখে শিষ্ট সমাজে দৃষ্টির অন্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে। এক রামায়ণকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিলেই দেখা যায় যে মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না এমন বহু কাহিনী রাম-সীতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থেকে গেছে। এখনও সে সব কাহিনীর অনেক কিছু শিক্ষিত সমাজের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জাভা ভ্রমণের সময়ে সেখানে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর রূপের সাথে

পরিচিত হবার পর উপরিউক্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তিনি 'জাভা-যাত্রীর পত্র' বইটিতে লিখেছেন।

'এখানে রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছে লোকমুখে-প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজপর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষার যে সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো-এক সময় কোন-এক জার্মান-পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তার পরে তার লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।'

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, ৬৫৪-৬৫৫ পৃঃ।)

শেষের মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সাথেই করেছিলেন কেননা ঐ সহিষ্ণু শ্রমসাধ্য গবেষণায় কোন ভারতীয় পণ্ডিত তখন আত্মনিয়োগ করেন নি আজও যে এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হয়েছে তা নয়। অথচ রামায়ণ-মহাভারত রচনার সামগ্রিক পটভূমিকে বোঝার জন্য উক্ত গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

খণ্ড খণ্ড পল্লীকাব্যগুলি একটি মহাকাব্যের কাঠামোর মধ্যে বাঁধা পড়ার পর আবার নানাদিক থেকে তার উপর নানা প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে এসে মিলিত হয় কালক্রমে তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, নানা উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ার কাহিনী। এমনিভাবেই তা সমগ্র দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাসে পরিণত হয়। কালক্রমে মূল কাঠামোর মধ্যেই অনেক নূতন জিনিষ সংযোজিত হয়। নানা অঞ্চলে, নানা প্রদেশে, বিভিন্ন যুগে কত অজ্ঞাত নামা কবির সৃষ্টির ধারা এসে মিলিত হল সেই সাগর সঙ্গমে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার ভিতরে অনেকক্ষেত্রে সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হয়েছে। কিন্তু এই দিকটি এখন পর্যন্ত লোককথা-অধ্যয়নকারীদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে লোকসাহিত্যের এই চরিত্র উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেদিকে শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামায়ণ কাহিনীকে অবলম্বন করেই ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে কিভাবে লোক-মানসে পরিবর্তিত সমাজ-চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে। আর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে তিনি রামায়ণ রচনার পূর্বসূচনা বা তার ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমির নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেরই মূল এবং আদি বিষয়বস্তু ছিল সেই প্রাচীন যুগের সমাজ-বিপ্লব অর্থাৎ পুরাতন এবং নূতনের, রক্ষণশীলতা এবং প্রগতির শক্তির সংঘাত। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তিনি দেখেছেন সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নীচের তলায় মানুষের প্রতিবাদ এবং তাদের সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি। এমন কি অনেক গ্রাম্য ছড়ার মধ্যেও সামাজিক অবিচারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলে তিনি

মনে করেন। আমাদের দেশে এই দিকটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা এযাবৎ হয় নি বলা চলে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যাঁরা প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসাহিত্য তথা লোককথা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা এই সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের সাথে হয়ত অনেকে একমত হবেন না কিন্তু উক্ত প্রচেষ্টা যে লোককথা অধ্যয়নে নূতন দিগন্ত নির্দেশ করে তাকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। অবশ্য এই পথে অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পটভূমি যেমন সুবিশাল তেমনি কঠিন এবং বহুলোকের সমবেত পরিশ্রম সাপেক্ষ। কেন না এই কাজের অঙ্গ হবে যথাক্রমে (১) লোককথার বিভিন্ন উপাদানগুলির উৎপত্তির কাল ও বিবর্তনের ধারা নির্ণয় (২) সমাজবিকাশের বিভিন্ন অধ্যায়ের পট-ভূমিতে উপস্থাপন (৩) সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলনের বিশিষ্ট রূপটিকে অধ্যয়ন। অনৈতিহাসিক এবং বিচ্ছিন্ন ভাসাভাসাভাবে লোককথার উপাদানগুলিকে বোঝার চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। তার দ্বারা লোকসংস্কৃতির প্রাণশক্তির যথার্থ পরিচয় সম্ভব নয় এবং তার পরিবর্তনশীল প্রবাহের সমগ্র রূপটিকে বোঝা যাবে না।

লোকশিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে লোককথার উপাদানগুলির মূল্যায়ন জরুরী হয়ে পড়ে আরো একটি কারণে। তারমধ্যে এমন অনেক জিনিষ রয়ে গেছে যা অতীতকালের মানুষের অপরিণত মন, চিন্তা এবং সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার অবশেষ। বহু প্রথা, লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলির উদ্ভব এবং বিবর্তনের ইতিহাস নৃতত্ত্ববিদের কাছে কৌতূহলের বিষয়। তিনি ওগুলিকে পর্যালোচনা করেন মানবমনের পুরাতত্ত্বের উপাদান হিসাবে। সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব আরো অনেক বেশী। তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে যে ঐগুলির মধ্যে কোন কোনটি মানুষের চিন্তার অগ্রগমনে সাহায্য করে এবং কোন কোনটি বর্তমানে পিছটান হিসাবে সেই অগ্রগমনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ ও চেতনার বিকাশের একস্তরে যা ছিল স্বাভাবিক, পরবর্তী স্তরেও তাকে অন্ধভাবে মেনে চলতে গেলে তা সিন্ধবাদ নাবিকের ঘাড়ের সেই বুড়োর মতই চেপে বসে। আবার অতীতের যে ধারা আজও প্রাণবন্ত রয়েছে তাকে যুগোপযোগীভাবে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে এগিয়ে নিতে হয়। যা মৃত তার স্থান হবে ইতিহাসের সংগ্রহশালায়, যা জীবন্ত তাকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে চলতে হবে। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে লোককথার উপাদানগুলিকে বাছাই করে শ্রেণীবিন্যাস করাই হবে সমাজবিজ্ঞানীর কাজ।

ভারতে লোক-কথা ( ফোক-লোর ) অধ্যয়নে আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল জাতীয় ভাবগত সংহতি সাধনে তার ভূমিকা। স্মরণাতীত কাল থেকেই এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনসমষ্টির সংশ্রব ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। বহু বিচিত্র মানবিক উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় মহাজাতির ভিত্তিভূমি। ভারতের সংস্কৃতি সেই সমস্ত জনসমষ্টির যৌথ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েই রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে সব জনসমষ্টি আজ অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ হয়ে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে তাদেরও অতীত অবদান যে উপেক্ষার বিষয় নয় এই সত্যটি আধুনিকতম গবেষণার ফলে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী জনসমষ্টির এবং বিশেষভাবে উপজাতিগুলির লোক-কথা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দ্বারা যেমন অনেক অনাবিষ্কৃত রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে তেমনি ভারতের ভাবগত ঐক্যের মূলে যে প্রবাহ ফল্গুধারার মত কাজ করে চলেছে তা সংশয়াতীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

## শিল্পে প্রকাশ

ভেতরকার সাচ্চা অনুভূতিকে শিল্পের ধাঁচে বাইরে মেলে ধরার নামই প্রকাশ। নিজের চোখে নিজেকে দেখাবার অঢেল ইচ্ছেটা যখন শিল্পী-হৃদয়ে কুল ছাপিয়ে ওঠে তখন মনের নিঙরে আনা বিষয়কে চালান দেওয়া হয় প্রকাশের পাকা সড়কে। বাইরের জগতের প্রাণ—অফুরান সুন্দর এমনি করেই কারিগরের তুলিতে-ছেনিতে ভাব—অফুরান শিল্প হয়ে ফের বাইরে ধরা দেয়। এই নমুনার ওপর ভর দিলে, বস্তু থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে শিল্পীর আপন মরমে জরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো বস্তুর সালিশিতে নোতুন করে ফুটিয়ে তোলাকেই আমরা প্রকাশ বলতে পারি। মরম হচ্ছে শিল্পীমনের অন্দরমহল, খাঁটি প্রকাশের যা যা কিছু সাজগোজ গড়াপেটা—সব সেখানেই।

প্রকাশের গোড়ায় তিনটি রসদ বড়ো বেশি করে দরকার—যাকে প্রকাশ করা হবে, যার মাঝখানে প্রকাশ করা হবে, আর যিনি প্রকাশ করবেন। তার মানে, সুরুতেই চাই একটি ভাব, তারপর ভাষা-রঙ-সুর-মুদ্রা, সব শেষে ডাক পড়ে শিল্পীর—ওদের মিলনটিকে মধুর করে তুলতে। প্রকাশ ব্যাপারটাকে ধরা-ছোঁয়া-বোঝবার রূপ দেওয়া আর সেই রূপের গড়নকে সত্যিকারের নিশানামুখো করে তোলা নিঃসন্দেহে বেশ উঁচুদরের বাহাদুরি।

একটি জিনিসকে মেলে ধরতে গিয়ে অপর একটি জিনিসের হাজিরাকে আমরা প্রকাশ নাম দিয়েছি। তার মানে এই নয় যে, রামের কথা বলতে গিয়ে রামের কথা বাদ দিয়ে শ্যামের কথা বলে রামকথার প্যালা আদায় করব। আসলে বলব রামের কথাই, তবে কড়া নজর রাখব যাতে এমন ভাষা-রঙ-সুর বেছে নেওয়া হয় যার সাথে ভাবটি পুরোপুরি মানানসই, যার মাঝখানে ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ভাব বেছাঁদ হয়ে পড়ে না, কদমে এগিয়ে চলে—ঘোড়ার চলনের সাথে একই দোলনলাগা সওয়ারের মতো। আর তখুনি বাইরের জগতের জ্ঞানের বিষয় শিল্পের জগতে প্রকাশের বিষয় হয়ে ওঠে।

প্রকাশের পথে চলতে চলতে ভাবের রূপাভিসার জড়িয়ে নেয় ভাষা-রঙ-সুর। যদি বলি 'সাগর', তাহলে নিশ্চয়ই এর মাঝে সত্যিকারের সাগরকে পাওয়া গেল না, পটের ওপর নিখুঁত করে আঁকা পাহাড়ও তেমনি আসাম পাহাড় নয়। আবার এ কথাও তো ঠিক যে, 'সাগর' শব্দটি আমাদের মনে বাঁধনহারা জলতরঙ্গের একটি ধারণাকে জাগিয়ে তোলে, কিংবা পাহাড়ের ছোট্ট ছবিখানা আমাদের সেই আকাশছোঁয়া পাথর-তোরণ দেখার সাধ মেটায়। কিন্তু সাগর শব্দটি আওড়ালে কিংবা পাহাড়ের ছবি দেখলে মনে যে আবেগ-অনুভূতির ঢেউ ওঠে তা যদি ভাব হয় তবে সেটি যে মন থেকে শব্দে কিংবা ছবিতে চলে যায় না তাও মানি। আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে, রঙগুলো ছবিটা তৈরী করে তাকে চালিয়ে দেয় মনের ভাবের দিকে আর সেই ভাবের মধ্যে দিয়ে

খাঁটি পাহাড়ের দিকে, নয়ত সরাসরি পাহাড় দেখা মনের পাতালে জাগিয়ে তোলা গোপন অনুভূতির দিকে। ভাষার মুকুলে ধ্বনিরাও অমনি করেই নিবিড় প্রকাশের পথে মরম-জড়ানো ভাবের দুয়োর দেয় খুলে। ঐ ধ্বনি আর রঙ হোলো ভাষা-ছবির গোড়াকার মানে, যে-মানে ভাষা কিংবা ছবির মাঝে থাকে গড়নের পহেলী মশলা হিসেবে। কাজেই, সাগর-পাহাড়ের ভাবের পুরোটাই দোল খায় ভাষা-রঙের বাইরে, ভাবের সাথে মিলন হবার ইসারা পেলেই ভাবের বাঁধুনিমাফিক এই ভাষা-রঙ আপন গভীরে অতল হয়ে ওঠে।

অবশ্য অনেকে বলেন, মনের আওতা থেকে ভাবটিকে সরিয়ে না নিলে প্রকাশের পক্ষে আগল ভেঙে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনো একটা ভাবনা কিংবা প্রকাশের আগেকার আলোড়ন মনের মাঝে ঘুমিয়ে থাকে না, বরং ভুলে যাবার কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে তার চেতনাকে চাড়িয়ে তোলে। এ ব্যাপারটা সহজে বুঝতে গেলে বুদ্ধির প্রকাশ আর আবেগের প্রকাশের ভেতরে তফাৎটুকু বের করতে হবে।

মনের আলোড়নের অজানা ঝোঁক হিসেবে আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে আবেগ কমজোর হতে পারে, কিংবা একেবারে নষ্টও হয়ে যেতে পারে। গোটা জ্ঞানের কথাকে এমনি করে খারিজ করবার ফলে এই নিছক আবেগের প্রকাশ মন থেকে সরিয়ে আনতে পারে আবেগরাঙানো ভাবকে। বুদ্ধি জিনিসটা কিছু পরিমাণে নিরেট। তবে প্রকাশের বিষয়কে বুদ্ধির আলোয় জমকালো করে আবেগের শিশমহলে ঠাঁই দেওয়া যায়। আবেগের কারুকাজের ভেতর দিয়ে ভাবের প্রকাশ কখনোই সফল হয়ে ওঠে না, বরং বুদ্ধিকে চাঙা রেখে ভাবকে শিল্পের দরবারে আসন দিলে তা সহজেই রসিকজনের মন কেড়ে নেয়।

আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে প্রকাশ করা মানে আবেগের সাথে বুদ্ধির ঘোঁট পাকানো নয়, আবেগের কূল-ছাপানো পাগলামিকে বুদ্ধির পাড়ে বেঁধে নিশানামুখো করে তোলা। কাজেই যাঁরা বলেন, খাঁটি প্রকাশ হচ্ছে ইচ্ছেসফল মনের ধোয়ামোছা পট, আমি তাঁদের সাথে গলা মিলিয়ে ঐক্যতান তুলতে পারলুম না। কারণ যদিও শিল্পী প্রকাশের মাঝে মনের ঐ ধোয়ামোছা পটের আবেগমাখা অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে পান, তবু একথা একশোবার সত্যি যে, অভিজ্ঞতার মাঝে যখন থাকে এই আবেগের নরম ছোঁয়া, মন থেকে ভাবকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে যখন আর কোনো কিছু ওৎ পেতে নেই, তখনই প্রকাশ সত্যিকারের খানদানী ঘরাণার প্রকাশ হয়ে ওঠে।

প্রকাশ ব্যাপারটা যে একচুল হেরফের না হয়ে সবসময় একইভাবে ঘটবে, এমন কোনো বাঁধাধরা ছাঁচ নেই। ভাবকে বাইরে মেলে ধরবার কাজে যারা কোমর কষে এগিয়ে আসে সেই ভাষা-রঙ-সুর-মুদ্রার ইসারা পুরোপুরিভাবে কিংবা কিছু পরিমাণে মনের মাঝে লুকিয়ে আছে। রসিকমনকে প্রকাশের আনন্দে ভরিয়ে তুলতে গেলে শিল্পীমনের খাজাঞ্চিখানায় ঐ ইসারাটুকুই বড়ো দৌলত। আমি আছি, আমি অনুভব করি—এ কথা যখন শিল্পীমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, ঐ ইসারাই তখন ভাবের আদলটি গড়তে থাকে, ফলে মন তার অভিজ্ঞতাকে আগে নিজের মাঝে পরে সবার মাঝে প্রকাশ করে।

দরবারী শিল্পকলায় প্রকাশের আসন শিল্পের গড়নের চেয়ে এক ধাপ নিচে। আবেগের

প্রকাশকে বুঝতে গেলে তাকে বুঝতে হবে দরবারী রীতির গড়নের ভেতর দিয়ে। সেখানে এই গড়নই হচ্ছে ভাবপ্রকাশের বাহন। এখন, গড়ন আর প্রকাশের সম্পর্কটা ঠিক কী ধরণের তা এক কথায় আঁচ করিয়ে দেওয়া কঠিন। শুধু এটুকু বলা যায়, শিল্পে ভাব কিংবা আবেগ থাকবে বৈকি, কিন্তু গড়ন ছাড়া তাদের প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব নয়। কেউ কেউ অবশ্য ললিতকলাকে অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে দেখবার পক্ষপাতী। ফলে তাঁরা জোর দিতে চান প্রকাশের ওপর। এর জের টেনে অনেকেই মনে মনে সায় দিয়েছেন যে, প্রকাশ আর ললিতকলা একেবারে এক; তার মানে, সব ললিতকলাই প্রকাশ আর সব প্রকাশই ললিতকলা।

কথা-ছবি-নাচ-গান হচ্ছে মনের ভেতরমহলকে বাইরে নিয়ে আসবার বাহন। এমনি করে লুকিয়ে রাখা সবকিছুকে বাইরে সাজিয়ে দেবার ইচ্ছেটা আবেগের প্রকাশে আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। কথা-ছবি-গান রসিকমনের জন্যে সেই আবেগের প্রকাশই গড়ে তুলবে যার ওপর ভর দিয়ে শিল্পী নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রকাশের নিজের কোনো রীতি নেই, রূপ-রসাল আনন্দই এ ব্যাপারে এলেমবাজ গড়নদার। কারণ রূপরসাল আনন্দ হলো চমৎকারভাবে আবেগের প্রকাশ থেকে পাওয়া অনুভূতি।

আবেগের প্রকাশের সঙ্গে বস্তুঘেঁষা ধারণা রয়েছে জড়িয়ে, আর ঐ প্রকাশকে ঠিকমতো চালিয়ে নেয় অনুভূতি। শিল্পের গোড়ায় আবেগ আছে, প্রকাশও আছে; কিন্তু যে-আবেগ প্রকাশের পথ পেল না, কিংবা যে-প্রকাশ আবেগের সোনার কাঠি হারালো, সেই কানা আবেগ আর অভাগা প্রকাশের কোন দাম নেই কারুশালায়। চেনা জিনিষকে সহজেই প্রকাশ করা যায় কোনো একটা রূপে—ভাষায় ছবিতে প্রতিমায় গানে—নয়তো অন্যকোন উপায়ে। এ সবের মাঝখানেও যাকে প্রকাশ করা যায় না, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তাকে আমরা জানি নে।

কাগজে না লিখে কিংবা কারও কাছে না বলে আমরা কোনো কবিতাকে যদি মনের মাঝে ধরে রাখি, তাতে লাভ কী আছে! এই দুনিয়ায় আমরা অনেক কিছুই চাই—শুধু নীরব কবিত্ব বাদে। আস্বাদ নেবার মাঝখানেই শিল্পের পুরো সেলামী। ছবির ব্যাপারেও এ কথা খাটে। কারণ পটের ওপর তুলি দিয়ে রঙের রূপ গড়া মানেই ছবি আঁকা: চোখের বাইরে যা রয়েছে তাকে আর ছবি বলে মেনে নিই কেমন করে! কাজেই রসিক মনে শিল্পীমরমের জলছাপটি ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রকাশকে কিছুতেই বাতিল করা যায় না। এদিক থেকে সব শিল্পই এক। সবাইকারই সাধারণ ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ। কোনো রকম ভাষা-রঙ-সুরের ইসারার মাঝে আমরা যাকে প্রকাশ করতে পারি নে, কাউকে তা বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব। আর প্রকাশ করতে না পারলে আমাদের ভাবনাই একদিন ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যাবে। তাই ভাষা-রঙ-সুরের ইশারা হচ্ছে প্রকাশের সেরা কোহিনূর। এখন, এই ইশারা যদি প্রকাশের সাথে বেমানান হয় তবে প্রকাশের মাঝে কখনোই তার জেল্লা ফুটে বেরোবে না।

আবেগের প্রকাশের মূলে আছে শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা। এ চাইছে আবেগকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে। কাজেই এর নজর রয়েছে এলোমেলো অনুভূতিকে সাজিয়ে জড়ো করে বিষয় গড়ে তুলতে। আমাদর প্রাণের ভেতর দিয়ে জগতের যে-স্রোত চলেছে তাকে স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার

জন্যে আমরা কতবার চেষ্টা করি। আবেগের মারফত জগতের সেই একটানা চলার দুরন্ত আবেগের সামান্যই আমরা জানতে পাই, অথচ এই সামান্যকে নিয়েই আমাদের অসামান্য প্রকাশের আসর। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের মন যখন ধাপে ধাপে একমনা হবার চূড়োয় পৌঁছয় তখনই প্রকাশ হয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া দিগন্তছোঁয়া। এমনি করে চিরনোতুন ধারণা গড়ে তোলে চিরকালের নোতুন প্রকাশকে।

প্রকাশের কাজে সফল হতে গেলে শিল্পীকে এমন ভাষা-রঙ-স্বর বেছে নিতে হবে যার মাঝখান দিয়ে তাঁর আপন মনের ভাবটি সহজেই রসিকমনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রসিক যদি শিল্প না বুঝতে পারেন, কিংবা শিল্পের স্বাদ নিতে গিয়ে কোনোখানেই দাঁত বসাতে না পেরে তিনি যদি খালি হাতে ফিরে আসেন তবে তো প্রকাশের আধখানাই মাটি। তাই অনেক সজাগ শিল্পী রসিকের পছন্দসই মালমশলায় আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে বাজি মাত করেন। অবশ্য শুধুই সাধারণ রসিকের মুখ চেয়ে প্রকাশ গড়লে শিল্প কালে মহ্‌ফিল্‌ হয়ে উঠতে বাধ্য। কাজেই, রসিক যেমন প্রকাশের পথ বেঁধে দেবার দায় নিয়েছন, তেমনি প্রকাশেরও আছে রসিকের রুচি-নজর বেঁধে রসিককে ধীরে ধীরে উঁচুতলার বাসিন্দে করে তোলার দায়িত্ব।

**দেবব্রত চক্রবর্তী**

## সমালোচনা

**The Swami Vivekananda** ॥ a study by Manomohan Ganguly Rs 3·30. **বিবেকানন্দ জীবন ও জিজ্ঞাসা** ॥ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ২·০০। **বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর** ॥ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ৪·৫০। তিনটি বই-ই প্রকাশ করেছেন : কন্‌টেমপোরারি পাবলিশার্স। ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

উপরিউক্ত তিনটি গ্রন্থের লেখক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বৃত্তিতে ছিলেন স্থপতি। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত 'Orissa and Her Remains—Ancient and Medieval' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে এ বইটির সহায়তা অপরিহার্য।

কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্থাপত্য-শিল্পে-সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর ঔৎসুক্য নিবদ্ধ ছিল না। উপরের বইগুলি তার প্রমাণ।

স্বামী বিবেকানন্দের উপর লিখিত বই দু'টির বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্য বাংলাটি ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ। লেখক বিবেকানন্দের সমসাময়িক। স্বামীজীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের উপর লিখিত বইয়ের সংখ্যা তখনও নগণ্য; বাংলদেশে তাঁর যথাযোগ্য সমাদর তখনও হয়নি। লেখক স্বামীজির প্রতি বাঙালীর ঔদাসীন্যের জন্য দুঃখ করে বলেছেন : "যীশু যথার্থই বলেছেন, কোন প্রেরিত পুরুষই স্বদেশে সম্মানিত হন না। স্বামীজীর নামে দক্ষিণ ভারতের ভ্রাতৃবৃন্দের উদ্বেলিত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর আমরা তাঁকে সামান্য ধন্যবাদও দিই না, এ দৃশ্য বড় করুণ।

"ইহা অতীব লজ্জার বিষয় যে স্বামীজীর স্মৃতিসভা অনুরূপ অন্যান্য স্মরণ সভার মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, অদ্যাবধি ফলপ্রসূ হয়নি। ভারতের অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হত এবং তিনি সাধু (সেণ্ট) রূপে পূজিত হতেন। অদৃষ্টের পরিহাসে, এদেশে সবই বিপরীত। স্বামী বিবেকানন্দ অজানিতের মতই পৃথিবী থেকে প্রয়াণ করলেন, আমরা তাঁকে চিনতেই পারিনি।"

বাংলাদেশের এই পরিবেশের মধ্যেও মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিবেকানন্দের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই শ্রদ্ধা অন্ধ ভক্তিতে পর্যবসিত হয়নি। বিবেকানন্দের মতামতের যাথার্থ সম্বন্ধে তিনি কোথাও কোথাও প্রশ্ন তুলেছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, "যদি এই জাতি উঠিতে চায় তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি এই (শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে মাতিতে হইবে।" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এই উক্তিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন এটা মানুষের পূজা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

এই পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন লেখক। স্বামীজীর সমালোচনামূলক নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। লেখকের স্বাধীন চিন্তাধারার নিজস্বতাই বইটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

বইটি আকারে ছোট হলেও বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তাধারার মূল পরিচয় পাওয়া যাবে। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মূল ইংরেজী বইটির বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশক সময়োচিত কর্তব্য পালন করেছেন।

'বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর' অন্য জাতের বই। এটি উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। নবজাগরণ সংক্রান্ত কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধের সমষ্টি। 'ইংরেজী শিক্ষার সূচনা' প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে অনেক তথ্যের পরিবেশন করা হয়েছে। শেক্সপীয়রের চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসব সম্প্রতি কলকাতায় উদ্‌যাপিত হয়েছে। অথচ এই কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশানে এক সময়ে শেক্সপীয়র পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। শেক্সপীয়রের রচনায় অশ্লীলতা আছে, এই জন্যই হয়ত মিশনারি শিক্ষায়তনে পড়ানো হত না। 'বীটন সোসাইটি' ও 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রবন্ধ দু'টি নানা তথ্যের আকর স্বরূপ। 'ডাফ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'ইউরোপীয় ভারতীয় বৈষম্য' প্রবন্ধ দু'টিতে ডাফ সাহেবের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে 'গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষা-বিস্তার এবং 'মিশনারী শিক্ষার মূল্যায়ন' রচনা দু'টিতে। 'সেকালের পাঠ্যপুস্তক' প্রবন্ধে অনেকগুলি পুরানো বইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলির নাম: সেকালের ইংরেজী কবিতা; হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত; সেকালের আইন আদালত। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিত। এই বই থেকে এমন অনেক জিনিস জানা যায় যা উনবিংশ শতকের ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে লেখকেরা সাধারণত বাদ দিয়ে থাকেন।

**চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

**অন্তরালে শিশিরকুমার** ॥ তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। ইষ্ট লাইট বুক হাউস, কলিকাতা। চার টাকা। **নেপথ্য দর্শন** ॥ শ্রীনিরপেক্ষ। বাক সাহিত্য, কলিকাতা। সাত টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ। **রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ** ॥ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। পাঁচ টাকা পচাত্তর নঃ পঃ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে যে নামগুলির মূল্যায়ন আজও সঠিকভাবে সম্ভব নয় শিশির ভাদুড়ি সেই নামগুলিরই অন্যতম। তাঁর প্রতিভায় সেই ধরণের উগ্র দীপ্তি ছিল যা চোখ ঝলসে দেয়, যা এক মুহূর্তে মন জয় করে। অভিনেতা শিশিরকুমারের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন সেই প্রখর ব্যক্তিত্ব কেমন করে শুধু নিজের অস্তিত্ব দিয়েই সমস্ত বিরোধী সমালোচনাকে শান্ত ও স্তব্ধ করে

দিয়েছে। তাঁর অহঙ্কার, তাঁর অতিমাত্রার আত্মবিশ্বাস, সময়ে সময়ে দর্শকদের প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার কোন কিছুতেই তাঁর গৌরব ম্লান করতে পারেনি।

অন্তরালের শিশিরকুমার অভিনেতার কথা নয়। অভিনয় প্রসঙ্গ যে নেই তা নয়—শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবনে সেটাই তো প্রধান প্রসঙ্গ—কিন্তু মঞ্চ থেকে প্রায় অবসর নেবার পর এক সহৃদয় ভক্তের কাছে নিজের হৃদয় তিনি খুলে ধরেছেন। সেই মানুষটি কেমন? মঞ্চের শিশির ভাদুড়ি নয় অন্তরালের শিশিরকুমারকে জানতে এবং জানাবার ইচ্ছায় এই বই লেখা। স্বভাবতঃই খুব খেয়ালী লোক যাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের ধারা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন বিশেষতঃ তাঁরা যদি শিল্পী হন। প্রত্যেকদিনের নিয়মবাঁধা ছককটা সামাজিক জীবনের ক্ষীণ পরিসর দিয়ে যারা সংসারী মানুষ চলাফেরা করে, প্রতিভার উদ্দাম খেয়ালে ঝোড়ো হাওয়ার মতো পাগলামী ও বে-আইনী প্রমত্ততা ভরা এই জীবন তাদের কাছে কি দুর্বোধ্য। সাংসারিক তথাকথিত ভদ্রতার বহু রীতি-নীতি তাদের জীবনের উদার বিস্তৃতির মধ্যে ধূলিলুণ্ঠিত। উপরন্তু নিরন্তর মগ্নমান শিশির ভাদুড়িকে কেন্দ্র করে ছুৎমার্গবিলাসীদের কতই না গল্প রচনার সুযোগ দিয়েছিল। সেই সবগুলোর প্রভাব ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী চিত্তে অল্প নয়।

লেখক তারাকুমার মুখোপাধ্যায় শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগে নানা সময়ে অনেক গম্ভীর ব্যক্তিগত কথা শুনেছেন এবং তার বহু অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন, শিশিরকুমারের নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আনন্দ ও খেদ পাশাপাশি আছে। লেখক নিজে বলেছেন যে শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাঁর সমালোচক মনোভাব। কোথাও কোথাও তিনি শিশিরকুমারের ভাষণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহপোষণ করেছেন। ১৯৩৯ সালে নাট্যকার হিসাবে শিশিরকুমারকে পত্র দিয়ে তদুত্তরে দেখা করার নিমন্ত্রণ পেয়ে যে পরিচয় গড়ে ওঠে এই গ্রন্থ তারই ফল। জীবনের শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের বহু মনোভাব, বহু কথা, 'মুড' লেখক ধরে রেখেছেন। বাক্যের উজ্জ্বলতা, আলোচনার সরস দৃপ্তভঙ্গী, কঠিন ও কঠোর মন্তব্যের নির্ভীকতার মধ্য দিয়ে মানুষটি ফুটে ওঠে। দু' একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, উৎসাহী পাঠকেরা এই বই সঞ্চয় করলে আনন্দ পাবেন। "আমি কি বুঝি না কি অসামান্য শক্তি নিয়ে এসেছিলুম আর করে গেলুম কি?" শিশিরবাবু এক হিসেবে অসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথের আশেপাশে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের বলতেন তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ। "Grand passion একটা ছিলো জীবনে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন আমাকে Grand passion ছাড়া art হয় না।" অন্তরালের শিশিরকুমারের রবীন্দ্র-শরৎ-অরবিন্দ প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা দিয়েছে—কৌতূহলোদ্দীপক সেই আলোচনা মনে রাখবার মতো। শেষ জীবনের শ্রীরঙ্গমপর্বের নাটকগুলি ও সেগুলির অভিনয়ের কাহিনীও বিস্তৃতভাবে আছে। এই গ্রন্থ শিশির-অনুরাগীদের ভালো লাগবে। বাংলার রঙ্গমঞ্চের ভিতরকার টুকরো কথা এবং তার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার অন্তরের পূর্ণতার কথা পাঠকদের আনন্দ দেবে।

শ্রীনিরপেক্ষ রচিত নেপথ্য দর্শন যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির সমষ্টি। যখন নেপথ্য-দর্শন নামে লেখাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে তখন সেগুলি অভাবনীয় এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সমাজের নানা ক্ষেত্রে যে গোপন সুড়ঙ্গচারী মানুষের দল বিকৃত জীবনের বিষক্রিয়া

ঘটিয়ে চলেছে তারাই প্রধানতঃ এই আক্রমণের লক্ষ্য। সরকারী ঔদাসীন্য এবং অকর্মণ্যতাও লেখকের তীক্ষ্ণ আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরে স্বাধীনতার সুযোগ নিতে এমন বহু শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো যাদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের লেশমাত্র যোগ নেই। এই সব সুযোগ সন্ধানীরা প্রথম থেকেই জাতীয় জীবনকে যে ভাবে কলুষিত করতে লাগলো তাতে একটি সুস্থ আবহাওয়া দেশে গড়ে ওঠবার সুযোগ পেল না। দেশের সর্বস্তরে চিন্তার দৈন্য পরিস্ফুট হল। সত্যকথনের সাহস রইলো না ; সাধারণ মানুষ মারের চাপে পড়ে পিষ্ট হতে লাগলো, আর বলতে লাগলো—সত্যিকথা বলে এমন একটা লোকও দেশে নেই।

এমনি সময়ে যুগান্তরে নিরপেক্ষর আবির্ভাব। 'পাঠক মহলকে সচকিত করে তীক্ষ্ণ তীব্র ভাষায় সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সাধারণ মানুষ নিজের বিক্ষোভকে প্রতিফলিত হতে দেখে আনন্দিত হলো। সরকার সাবধান হলো, সমাজশত্রুরা ভীত হলো।

লেখাগুলির কোন একটিকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। সংবাদপত্রে সাংবাদিকের লেখা হলেও এগুলির একটি নিত্যমূল্য আছে। ভবিষ্যৎ কালেও এ লেখাগুলির একটি আবেদন থাকবে মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' আমাদের হতাশ করে। এ লেখা বহুকালের লেখা। প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বহুকাল চলে গেছে। লেখক যে ইরাক ও পারস্যের বর্ণনা করেছেন সেই দেশগুলিতেও নানা পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে। এই লেখায় লেখকের সরল ভাষা ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পেলেও প্রশ্ন এই যে এই আকারেই এর পুনর্মুদ্রণের অর্থ কি। নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ থাকলেও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এতই অল্প যে বইয়ের প্রধান আকর্ষণ প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়। শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অনেক জানেন এবং লিখতেও তিনি পারেন। এই গ্রন্থ তাঁর প্রতি সুবিচার করে না।

**সোমেন্দ্রনাথ বসু**

gd. No. C3597 Phone : 23-5155 July. '64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN
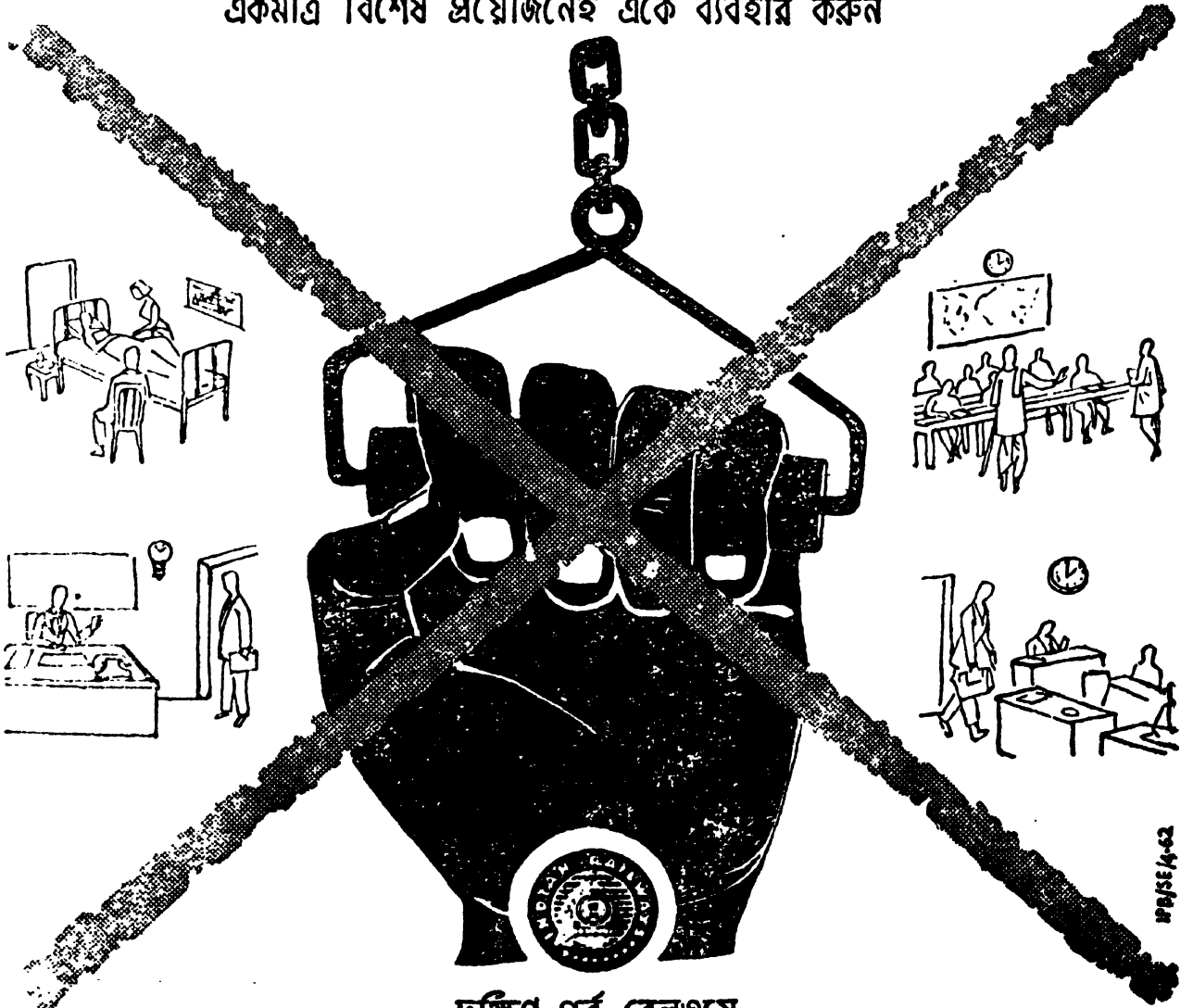
দ্বাদশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭১
সমকালীন

# পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার

**পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন তিনটি পরিকল্পনাতেই একটি প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, কলেজীয়, চিকিৎসামূলক ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।**

**বিদ্যালয়ের সংখ্যা**

| | | |
|---|---|---|
| ( সাধারণ শিক্ষা ) : | ১৯৪৭—৪৮ = | ১৫,৮৫৩ |
| | ১৯৬২—৬৩ = | ৩৬,৯৬০ |

**ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা**

| | | |
|---|---|---|
| ( বিদ্যালয়ে ) : | ১৯৪৭—৪৮ = | ১৫,৬৬,৬১৯ |
| | ১৯৬২—৬৩ = | ৪৩,১৪,০৪৬ |

**১৯৬২—৬৩**

**প্রাথমিক** বিদ্যালয় ( প্রাক্-বুনিয়াদী ও নিম্ন-বুনিয়াদী সহ ) = ৩২,২২৮

**উচ্চ বুনিয়াদী** = ২৮৩

| | | ( বালক ) | ( বালিকা ) |
|---|---|---|---|
| **উচ্চ বিদ্যালয় :** | ১,১২৭ | ৮২৬ | ৩০১ |
| **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :** | ১,১৩৭ | ৯২৪ | ২১৩ |
| **কলেজ ( সাধারণ শিক্ষা ) :** | ১৩৬ | ১০২ | ৩৪ |

॥ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ( শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কলেজ ও স্কুল সহ ) ॥

| | **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** | **ছাত্র সংখ্যা** |
|---|---|---|
| ১৯৪৭—৪৮ | ৮৬ | ৬,১১৯ |
| ১৯৬১—৬২ | ১৯৪ | ২৯,৯৪১ |

**॥ চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ ও স্কুল ॥**

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৪৭—৪৮ | ৯ | ৪,৪১৪ |
| ১৯৬১—৬২ | ২৪ | ৪,৬১৭ |

| | | |
|---|---|---|
| **সাক্ষরতা** ( শতকরা হার ) | ১৯৫১ = ২৪.৫৪ | ১৯৬১ = ২৯.৩ |
| **বিশ্ববিদ্যালয় :** | ১৯৪৭—৪৮ = ১ | ১৯৬৩—৬৪ = ৭ |
| **শিক্ষাখাতে ব্যয় :** | ১৯৪৭—৪৮ = ৫.৫৯ ( কোটি টাকা ) | ১৯৬১—৬২ = ৩৮.০৯ ( কোটি টাকা ) |

W. B. (P) Adv—D 3541 (9)/64

অপরূপ
কেশবতী মহিলাটিকেই
জিজ্ঞেস করুন...
উনিই বলে দেবেন টাটার হেয়ার অয়েল মেখেই ওঁর চুলের
গোছা অমন সুন্দর হয়ে উঠেছে! টাটার হেয়ার অয়েল
• মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে
• চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম
টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল—৪টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর
হেয়ার অয়েল—গোলাপের সুরভিযুক্ত। ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
THOY-47BEN

Ceiling
India's most popular fans
All-purpose
Ambassador
Orient
FANS
YEARS AHEAD IN LOOKS AND PERFORMANCE

দ্বাদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র




সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

# দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জাহাজী কারবার

**অমৃতময় মুখোপাধ্যায়**

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলিকাতা থেকে পশ্চিমে মফঃস্বলে যাবার উপায় ছিল দুটি—স্থলপথে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর বা জলপথে গঙ্গা।

স্থলপথে নানা উপদ্রবের আশঙ্কা ছিল—ঠগ ডাকাত বনজঙ্গল মহামারী। তাই সহজে লোকে পদব্রজে স্থলপথে যেত না। যাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিক সময়ে পৌঁছাবার তাগিদ থাকত তাঁরাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাকপাল্কীতে করে স্থলপথে যেতেন। তাও বিশেষ নিরাপদ ছিল না। রাজমহলের জঙ্গলভরা পাহাড়ী পথে অনেক সময় পাল্কীবাহক ও যাত্রী সকলেই বিপদে পড়তেন। অনেক পথিক তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে পথের অনতিদূরে বাঘ শুয়ে আছে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। বেহারারাও, কঠিন শাস্তির ভয় না থাকলে, কোন বিপদ দেখলে, পাল্কী ফেলে পালাতে ইতস্তত করত না। এছাড়া পথভ্রমের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। পথে ঝড়জলের মধ্যে পড়ে একবার এক সরকারী কর্মচারীর পাল্কি বেহারারা পথ ভুল করে। যখন পথ ভুল বোঝা গেল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বহুদূরে একটা কুঁড়েঘরের আলো দেখে সেইদিকে তারা এগুতে থাকে। তারপর কুঁড়েঘর থেকে কিছুদূরে সেই ভিজে কাদার মধ্যেই পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা দস্যুর মত গিয়ে গৃহস্বামীকে ধরে আনে। সে "জুতো লয়ে আসি" বলে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পাল্কির সঙ্গে গিয়ে গ্রামের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সব সময়ে এরকম সুবিধামত কুঁড়েঘর পাওয়া যেত না বা গৃহস্বামী ধরা দিত না। তখন সেই পাল্কির আরোহী ও বেহারাদের জঙ্গলের মধ্যেই রাত কাটাতে হত। অনেক সময়েই সকলে সকাল পর্যন্ত অক্ষতদেহে থাকতো না।

এইসব কারণে নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে লোকে জলপথেই যাত্রা করত। রাজকর্মচারীরাও জলপথে যাওয়া পছন্দ ক'রতেন। সেটা ছিল কম কষ্টকর। পদমর্যাদা অনুসারে তাঁরা পান্সি,

ভাউলে বা বজরা করে, পাটনা, এলাহাবাদ বা দিল্লী যেতেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার নৌকার ভাড়ারও একটা বাঁধা হার ছিল। পদানুসারে জলপথে গমনাগমনের জন্য কর্মচারীরা বাঁধা হারে টাকা পেতেন। তিরিশ দিনের জন্য কর্ণেল বা তৎপর্যায়ের অফিসাররা পেতেন ২০০৲, কাপ্তানগণ ১৮০৲ ও লেফ্‌টানেন্ট, কর্ণেট ও এন্‌সাইনগণ ১০০ টাকা। একস্থান থেকে আরেক স্থানে পৌছাবার সময়ও সরকার বেঁধে দিয়েছিলেন যথা—কলিকাতা থেকে মুঙ্গের ৩৮ দিন, বক্‌সার ২ মাস, এলাহাবাদ ৮২ দিন। কলিকাতা থেকে ঢাকা যাবার বাঁধা সময় ছিল একমাস।

লর্ড বেন্টিংক বড়লাট হয়ে এসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায় গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড সারিয়ে, বহু আঁকাবাঁকা অংশ সোজা করে কলিকাতা থেকে দিল্লীর পথ প্রায় ৯০ মাইল কম করা হয়। নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থারও তিনি চেষ্টা করেন। ১৮৩০ খৃঃ তিনি এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ (১) করেন যে গঙ্গায় ইষ্টিমার প্রবর্তন করে বাণিজ্যের উন্নতি করা যায় এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যের দূরতম অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার আশু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে। তিনি কাপ্তেন জনষ্টোনকে তিনটি টাগের তৈরী ও ইঞ্জিন বসানোর জন্য বিলাতে পাঠান। জনষ্টোন সাহেব রাইন, রোন, সীন ও সোন নদীতে যেসব ইষ্টিমার চলাচল করত সে সব দেখেন কিন্তু কোনটাই তাঁর পছন্দ হয় নাই। কারণ বাংলাদেশের নদীতে, যে ইষ্টিমার দু' ফুটের বেশী জল ছাড়া চলে না, সেরূপ ইষ্টিমারকে তিনি উপযুক্ত মনে করেন নি।

বাষ্পচালিত নৌকা অবশ্য তার আগেই কলকাতায় দেখা দিয়েছিল। ১৮১৭ খৃঃ বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্স পল্টনের কাপ্তেন ডেভিডসন নৌকা চালানোর উপযোগী ৮ অশ্বশক্তি ইঞ্জিন কলিকাতায় আনেন। কিন্তু আনার পাঁচবৎসর বাদেও সেটা পড়েই ছিল। ১৮১৯ সালে জেসপ সাহেব ঐ রকমই একটি যন্ত্র এনে লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের জন্য একটি নৌকায় লাগান। ঐ নৌকা যন্ত্রচালিত হয়ে ঘণ্টায় আট মাইল পর্যন্ত চলল। এইটিই সারা ভারতের মধ্যে প্রথম বাষ্পচালিত নৌকা কিন্তু নবাবি সখ কিছুদিনেই মিটে যায় এবং যন্ত্রটি অব্যবহারে পড়ে থাকে। ১৮২২ খৃঃ ডেভিডসন সাহেবের যন্ত্রটি একটি ড্রেজিং বা মাটিকাটা নৌকায় লাগানো হয় এবং পরে বর্মায় যুদ্ধের সময় আরাকানে ব্যবহার করা হয়। ১৮২৬ সালে এক মিষ্টার অ্যাণ্ডার্সন কলিকাতা থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত বাষ্পীয় নৌকো প্রমোদবিহারের ব্যবস্থা করেন কিন্তু নৌকাটি ছিল খুব ছোট সেই কারণে কোনরকমে খরচা পোষায় মাত্র। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ আসামে ব্যবহারের জন্য দুটি বিশ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন পাঠান। ঐ ইঞ্জিন লাগিয়ে ১৮২৭ সালে দুটি নৌকা তৈরী হয়—হুগলী ও ব্রহ্মপুত্র। বড়লাট বেন্টিংক 'হুগলী'কে আসামে না পাঠিয়ে কলিকাতা ও এলাহাবাদের মধ্যে চলাচলে নিয়োগ করেন। প্রথমবারে 'হুগলী' ২৪ দিনে এলাহাবাদ পৌছায় এবং ফেরার পথে সময় লাগে ১৪ দিন। অনুরূপ সময়ে আরোও দু তিনবার যাতায়াত করলেও প্রথমদিকে এদেশীয়রা নিজেদের জীবন বা পণ্য কোনটাই এইরূপ যন্ত্রচালিত যানের হাতে ছেড়ে দিতে সাহস পায় নাই।

১৮৩২ সালেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গঙ্গায় ব্যবহারের জন্য লোহার তৈরী টাগ ও মালবাহী নৌকা কলিকাতায় পাঠাতে আরম্ভ করেন। এর প্রথমটি ১৮৩২ সালের জুলাই মাসে মিস্ত্রি সহ কলিকাতায় পৌছায়—এগুলির তলা ছিল সমতল, ১২০ ফুট লম্বা ও ২২ ফুট চওড়া এবং এবং পয়ষট্টি

টন মাল বইতে পারত। এর প্রথমটি চালু হয় ১৮৩৪ সালের বৈশাখ মাসে এবং শেষটি ১৮৩৬ সালের মাঘ মাস নাগাদ। এগুলিতে মালছাড়া মাত্র জাহাজের কর্মচারিদের থাকবার মত জায়গা ছিল। প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একটি করে 'লেজুড়' নৌকা থাকত। সেই নৌকায় থাকত, যাত্রীরা—চারটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ছয়টি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ছিল। প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলি ছিল ১২ ফুট × ৮ ফুট এবং প্রত্যেকটিতে দুটি যাত্রীর স্থান হত। খাইখরচ ছাড়া কলিকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে প্রত্যেক যাত্রী ভাড়া দিতেন তিনশত টাকা। আহারের ব্যবস্থা করতেন কাপ্তেন। ঐ বাবদে যাত্রীরা প্রত্যেকে তাঁকে ভাড়ার উপর দৈনিক চার টাকা হিসাবে দিতেন। আহারের সময় যাত্রীরা নৌকা হইতে একটা সরু কাঠের পাটার সাহায্যে স্টীমারে গিয়ে কাপ্তেনের সঙ্গে আহার করতেন।

লেজুর নৌকা সমেত এই জাহাজগুলির প্রত্যেকটিতে খরচ পড়ে কম বেশী ১১৭,৪৪০ টাকা। ১৮৩৬ সালের ১লা আগষ্ট পর্যন্ত ১৮ বার এলাহাবাদ যাওয়া আসা করতে খরচ পড়ে ২৩১,৫০৫ টাকা ৫ আনা ৬ পাই এবং মোট আয় করে ঐ সময় মধ্যে ৩২৭,৬৬৫ টাকা ১২ আনা দু পাই। এ ছাড়া এই ব্যবস্থায় সরকারী কাজ কর্মের সুবিধা তো হয়ই।

সরকার ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৬ সাল মধ্যে কতকগুলি নতুন ষ্টীমার আনেন। তখন পুরাতন ষ্টীমারগুলিকে বন্দর থেকে সমুদ্র মুখ পর্যন্ত জাহাজটানার কাজে লাগানো হয়। এর জন্য ভাড়ার হার ছিল দৈনিক চারশত টাকা।

দ্বারকানাথ যখন দেখলেন যে এই জাহাজটানার কাজ বেশ লাভজনক তখন ১৮৩৬ সালে স্টীমটাগ এসোসিয়েশান নামে এক কোম্পানী স্থাপন করলেন। এ কোম্পানী প্রায় কার-ঠাকুর কোম্পানীর অংশ ছিল বলেই হয়। কার-ঠাকুর কোম্পানী এর কার্য পরিচালক বা ম্যানেজিং এজেণ্ট ছিলেন। এ কোম্পানী কাজ আরম্ভ করে 'ফোর্বস্' ও 'সীতাকুণ্ড' নামে দুটি ছোট ষ্টীমার দিয়ে। এ দুটির প্রথম পরিদর্শক বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলেন এ, জি ম্যাকেন্জি ( ২ ) তাঁর তত্ত্বাবধানে কোম্পানী খুব দ্রুত উন্নতি করে। সমাচার দর্পণ ১৮১৬ সালের ১১ই জুন 'টগ সমাজের মুনাফা" শিরোনামায় লিখেছেন—

'আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা 'ঠ' উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস্ বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্মে চলিতেছে। ঐ জাহাজ ম্যকিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতাদের হস্তে পতিত হওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখ অবধি ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত গড়ে ১৮,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস যে হরণ হইয়াছে।'

এ কোম্পানী যে বরাবর বিশেষ লাভ জনক ছিল তার প্রমাণ দেখা যায় তিনবৎসর বাদে কার ঠাকুর কোম্পানীর অফিসে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর ষ্টীমটাগ কোম্পানীর মিটিংএ দ্বারকানাথ ও

মিষ্টার ক্রম প্রস্তাব করছেন যে আসল মূলধনের উপর বাৎসরিক শতকরা বিশটাকা হিসাবে মুনাফা ( ডিভিডেণ্ড ) দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ঐ সভায় আরও স্থির হয় সে সরকারী জাহাজ গঙ্গায় টাগ হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে বিলাতে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের কাছে দরখাস্ত করা হবে। ঐ দিন আরও স্থির হয় যে এই টাগ কোম্পনীকে নানাপ্রকারের সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ ক্যাপ্টেন হেণ্ডারসানকে একটি একশত গিনি মূল্যের সোনার থালা উপযুক্ত রূপে লিখিত করে দেওয়া হবে।

ঐ বৎসর এই কোম্পানীর জন্য দুটি নতুন জাহাজ তৈরী হয়—প্রথমটি "এণ্ড্রু হেণ্ডারসান" ও দ্বিতীয়টি "দ্বারকানাথ"। কলিকাতা কুরিয়ারের ৭ই সেপ্টেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়—"আজ খিদিরপুরে ষ্টীম টাগ কোম্পনী আরেকটি ষ্টীমার ভাসিয়েছেন এটি নামকরণ হইয়াছে আমাদের উপযুক্ত ও বিশেষ সম্মানিত নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামানুসারে। এই জাহাজের জন্য দিন দশেক আগে " রয়েল স্যাক্সন" জাহাজে ফসেট ও প্রেষ্টন কোম্পানীর তৈরী ১৫০ অশ্বশক্তি ইঞ্জিন এসে পৌছেচে। বন্ধু পরম্পরায় জানা যায় যে নতুন জাহাজটি অতি উত্তমরূপে জলে ভাসে এবং তৎপূর্ব্বে মিসেস এইচ এম পার্কার মহোদয়া দয়া করে জাহাজটির "দ্বারকানাথ" নামকরণ করেন। এইরূপে ষ্টীম টাগ এসোসিয়েসানের চারিটি জাহাজ হইল। ফোবর্স ও সীতাকুণ্ড পুরানো জাহাজ, যদিও গত ৬ মাসে সীতাকুণ্ড যত টাকা কামিয়েছে এত টাকা ঐ জাহাজ পূর্ব্বে কোনদিন কামায় নি।"

ঐ বৎসরই ফোর্বস্ জাহাজ সারানো হয় এবং সীতাকুণ্ডতে নতুন ইঞ্জিন লাগানো বিষয়ে আলোচনা হয়। নতুন জাহাজ দুটিও বিশেষ সন্তোষজনক হয় এবং কার্য্যকারিতায় আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করে। এই দুটি জাহাজ তৈরী করিতে খরচ পড়ে প্রায় ৩৩০০০০ টাকা তার মধ্যে "দ্বারকানাথ" জাহাজটির জন্য ব্যয় হয় কমবেশী এক লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

জাহাজ ও জলপথে বাণিজ্য সম্বন্ধে দ্বারকানাথের যা জ্ঞান ছিল তাতে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কেবল ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নয়—যতকাল ইংরাজ রাজত্ব করবে ততকাল বিলাতের সঙ্গে যত যোগাযোগ বাড়বে দেশের ততই মঙ্গল—কেবল যে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে তা নয়, বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। তাই তিনি ষ্টীম টাগ এসোসিয়েসান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এবিষয়েও মনোযোগ দিলেন এবং চার্লস বেকেট ; গ্রীন্‌ল ; কাপ্টেন জেমস্ বার্বার ; এম, এ, কার্টিস ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা বিলাতের সরকারী জাহাজ ছাড়া কোন ব্যক্তি বিশেষের জাহাজ আসবার অনুমতি ছিল না। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়ে একচেটিয়া রাখবার জন্যই ইংরেজ যে কোন বিজাতীয় জাহাজ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে এলেই সেটাকে আটক করতে বা পথে নষ্ট করতে বারম্বার চেষ্টা করেছে। অবশ্য পর্তুগীজ, মারাঠা ও আরও অনেকেই নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাহাজকেই বিনা অনুমতিতে চলাফেরার জন্য সমুদ্রপথে সুবিধামত আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যেত। তবে ইংরাজ তার স্বভাব চতুরতায় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, এমন কি আমাদের দেশেরই যথা মারাঠা নৌসেনাপতি

আংরিয়ার বা জান্‌জিরার সুলতানের জাহাজকেও দস্যু জাহাজ বলে অভিহিত করে অধিকার করে কেবল ধন সম্পত্তি আত্মসাতই করে নি, সেই সঙ্গে সুকর্ম্ম করার জন্য ইতিহাসের পাতায় প্রশংসাও দাবী করেছে।

১৮১৪ সালে স্কটল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম বাষ্পীয় পোত চলাচল করে। বিলাত থেকে ভারতে আসতে জলপথে সে সময়ে লাগত ছয় মাস ও খরচ পড়ত দু-হাজার মত টাকা। ১৮২৩ সালে সরকার ঘোষণা করেন যে বিলাত থেকে ভারতে কোন ষ্টীমার ৭০ দিনে পৌছিলে তার অধিকারী ও চালককে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করা হবে। ১৮২৫ সালে কাপ্টেন জনসন তাঁর ১১২ ফুট লম্বা "এণ্টারপ্রাইজ" চালিয়ে এই পুরস্কারের চেষ্টা করেন। কতকটা পাল তুলে ও কতকটা বাষ্পে চালিত হয়ে বিলাত থেকে এখানে পৌছাতে সময় লাগে ১১৩ দিন। তখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ৭০ দিনে ভারতে পৌছানর আশা ত্যাগ করতে হয়। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার পারস্য উপসাগর হয়ে ইউফ্রেটিস নদী পথে ভারতে আসার পথ সম্ভব কি না দেখবার জন্য কর্ণেল চেনিকে পাঠান কিন্তু অলঙ্ঘনীয় কতকগুলি বাধার জন্য এ পথ পরিত্যক্ত হয়। তারপর এবিষয়ে ব্রতী হন বোম্বের লাটসাহেব স্যর জন ম্যাল্‌কম ও তাঁর ভাই ভারতীয় নৌবহরের পরিদর্শক স্যর চার্লস। ১৮২৯ সালে দুটি ৮০ অশ্বশক্তি ইঞ্জিন বোম্বাইয়ে পৌছিলে তাঁরা একটি ৪১১ টনের জাহাজ তৈরী করেন তার নাম দেন "হিউ লিণ্ডসে"। ১৮৩০ সালের ২০ মার্চ ছেড়ে এ জাহাজ সুয়েজ পৌছায় তেত্রিশ দিনে এবং অনুরূপ সময়ে ফিরে আসে। আরও তিনবার যাতায়াতে বুঝা গেল যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকলে বোম্বাই থেকে ইংলণ্ড ৫৫ দিনে পৌছান যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ খরচ বেশী পড়িবে এই আশঙ্কায় বড়লাট বেণ্টিংকের অনুরোধ সত্ত্বেও এই জাহাজে ডাক প্রেরণ করতে অনুমতি দেন নাই।

তখন কলিকাতা থেকে বিলাতে ডাক যাবার ভারী অসুবিধা ছিল। কলিকাতা থেকে চিঠি বোম্বাইতে পৌছাতে লাগত দুই সপ্তাহ কি তারও বেশী। সেখান থেকে জাহাজ ছাড়ত কখনও সুয়েজের দিকে, কখনও পারস্য উপসাগরের পথে। জাহাজগুলিও বিশেষ ভালো অবস্থায় ছিল না, বর্ষাকালে সমুদ্রপাড়ি দিতে না পেরে অনেকসময়েই কয়েকদিন পরে বম্বেতে ফিরে আসত। তখন এই ডাকের গোলমাল ও বিলাতের সঙ্গে চিঠি যাওয়া আসার অসুবিধা বিষয়ে প্রায়ই সভা বসত।

১৮৩৯ এর অক্টোবরের ক্যালকাট কুরিয়ার পত্রিকায় এই সংক্রান্ত একটা ফিরিস্তি বের হয় —মাননীয় কোম্পানীর জাহাজ বেরোনিস ১৮৩৭ সালের ২২ অগষ্ট বম্বে ছেড়ে বের হয়ে দু দুবার ফিরে আসে। শেষপর্যন্ত চিঠিপত্র ঐ জাহাজ থেকে "অ্যাটলাণ্টা" জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। কলিকাতার শেষ ডাকের দিনের ৫৩ দিন বাদে চিঠিগুলি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। তার পরবৎসর ঐ বেরেনিস্‌ জাহাজেই ১২ সেপ্টেম্বার যে ২৬৬৬ টি চিঠি যায় তা বোম্বাই ছাড়ে কলিকাতার শেষ ডাকের দিনের ৮৯ দিন বাদে এবং বিলাতে গন্তব্যস্থলে পৌছাতে চিঠিগুলির লাগে ১৩৫ দিন। এ বৎসরই অ্যাটলাণ্টা জাহাজ ৮ই জুলাই ছাড়বার কথা ছিল কিন্তু ছাড়ে ১লা আগষ্ট। তারপর আবার সুয়েজ এর পথে না গিয়ে (৪) পারস্য উপসাগর পথে যায়। ফলে ৩৬৭৮ চিঠির মধ্যে

একটিও বিলাতে পৌঁছায় নি। পথে মরুভূমিতে আরব দস্যুরা সব আক্রমণ করে ছিনিয়ে নেয়। ১৮৩৯ সালের ১৬ এপ্রিল বম্বাই ছেড়ে জাহাজ আবার ফিরে আসতে বাধ্য হওয়ায় কলিকাতায় ডাকে ফেলার ৩৭ দিন বাদে বেরেনিস জাহাজে শেষপর্য্যন্ত চিঠিগুলি বম্বে ছাড়ে। "জেনোবিয়া" জাহাজ.ত কলিকাতার চিঠির অপেক্ষা না করেই ১লা অগষ্ট বোম্বাই ছেড়ে রওনা দেয়, ফলে কলিকাতার চিঠিগুলো ভারতবর্ষেই পড়ে থাকে ৫৮ দিন।

এই সব কারণে লোকে যদি এমন জাহাজ পেত যেটা সোজা কলিকাতা থেকে সুয়েজের দিকে রওনা দেবে, তাহ'লে বম্বে দিয়ে চিঠি পাঠাত না। কলিকাতা থেকে ছেড়ে এডেনবন্দরে বোম্বাই থেকে বিলাতগামী জাহাজ ধরতে পারবে এই আশায় ১৮৩৯ সালে ৫৪৯৯ টি চিঠি "ওয়াটার উইচ্" মারফৎ পাঠানো হয়। সেই সময়েই বম্বে হয়ে যাবার জন্য পাঠানো চিঠির সংখ্যা হয় ৪৪২৩। দ্বারকানাথ এই "ওয়াটার উইচ্" জাহাজের পুরা বা আংশিক অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ ১৮৩৫ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর তিনি বরিশালের আর ডব্লিউ ম্যাক্সওয়েলকে লিখছেন, "১২০০ সিক্কা টাকার ব্যাঙ্ক নোটের দ্বিতীয় অংশ ও কানাইলালের ২০০০ টাকার হুণ্ডি সহ আপনার ৭ তারিখের চিঠি পেয়েছি…। চীন থেকে আমার জাহাজ "ওয়াটার উইচ্" এসে পৌঁছানর দরুণ আমি কিছু ব্যস্ত আছি। অন্যান্য বিষয়ে পরের চিঠিতে জানাবো"।

বিলাত থেকে পাঠানো চিঠিও কলিকাতায় পৌঁছাতো বড় দেরীতে ও বিশৃঙ্খল ভাবে। বোম্বাই থেকে কলিকাতা আসার সময়ই লাগত অন্তত দু সপ্তাহ, মাঝে মাঝে ১৮, ২১ এমন কি ২৬ দিনও হত।

শুধু তাই নয়, জাহাজ থেকে ডাক নামাবার পর সবটা একসঙ্গে একই দিনে পাঠানো সম্ভব হ'ত না। তাই পুরা ডাকটাকে ভাগ ভাগ করে এক একদিনে টুকরো টুকরোভাবে পাঠানো হত। ফলে বিলাতে একই সঙ্গে ছাড়া হলেও কারুর চিঠি আগে, কারুর পরে পৌঁছাত। এতে ব্যবসায়ীদের বড় অসুবিধা হত। যার চিঠি দৈবক্রমে আগে পৌঁছাত সে বাজারের হালচাল আগেভাগে খবর পেয়ে অনেক সুবিধা করে নিতে পারত। আর এই তফাৎ এক আধ দিনের হ'ত না। কাপ্তেন জেমস্ বার্বার লিখেছেন যে ১৮৩৯ সালে একটা ডাকের প্রথম অংশ কলিকাতায় পৌঁছায় ১২ই মার্চ আর শেষ অংশটা ১৯শে মার্চ—অর্থাৎ পুরা এক সপ্তাহ বাদে। প্রথম দিন ৯৫৫টি খাম আসে তার মধ্যে ৮১৫ খানি চিঠি, দ্বিতীয় দিন আসে ৮৯০টি খাম তার মধ্যে ৭৯৮টি চিঠি। তৃতীয় দিনে পৌঁছায় মাত্র ১৬৪খানা খাম, তার মধ্যেও খবরের কাগজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে মাত্র খান কয়েক চিঠি। পঞ্চম দিনে ৩৩১টা খামের মধ্যে ৭টি চিঠি, বাকী সব অন্য জিনিষ। এরূপ বেহিসেবী ডাক আসায় আপত্তি জানিয়ে সভা ডাকলেই বেশ ভিড় হত—বিশেষত সাহেবদের। এই সব সভায় দ্বারকানাথ বেশ একটা সক্রিয় অংশ নিতেন। ১৮৩৯ সালের ৭ই অক্টোবারের কলিকাতা কুরিয়ারে দেখা যায়—'শনিবার বিকালে ঠিক সাড়ে তিনটায় অধিবাসীদের কষ্ট জানাতে এবং কম্প্রিহেন্সিভ স্কীমের পুনঃপ্রবর্তন দাবী করে একস্চেঞ্জ রুমসে এক সভা হয়। কলিকাতার সেরিফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এত লোকের ভীড় এখানে সভায় বড় একটা হয় না।'

সভায় ঠিক হয় যে সেরিফ ভারতের মাননীয় কাউন্সিলের সভাপতিকে এক আবেদনপত্র

দিবেন। কর্ণেল ম্যাকলিওড ও দ্বারকানাথ প্রস্তাব করেন যে সেরিফের সাথে আরো বিশ ত্রিশ জন লোক যাওয়া উপযুক্ত।

এরকম অনেক সভাসমিতি করে দৈনিক মাসিক কাগজপত্রে লেখালেখি করে, ছোট লাট বড় লাট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর, পার্লামেণ্ট সব জায়গায় আবেদন নিবেদন করেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। তখন কলিকাতার লোকেরা ঠিক করল যে চাঁদা তুলেই তারা জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করবে—যাতে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও সিংহল হয়ে জাহাজ এডেন যাবে এবং সেখান থেকে বম্বের ডাক তুলে নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা প্রস্তাব করা যত সহজ ছিল কাজে পরিণত করা ততটা সহজ ছিল না। খোদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও প্রস্তাবটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পেতেন এবং রাজনীতিক ও অন্যান্য নানা কারণে কোন প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে চিঠি বইবার ভার দিতে রাজি ছিলেন না।

শেষকালে বাংলা বম্বে ও মাদ্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধি নিয়ে লণ্ডনে এক অস্থায়ী কমিটি করা হয় এবং ভারতবর্ষ থেকেও আবেদন জানানো হয়। অবশেষে ১৮৩৭ সালের ৯ই জুন কমন্স সভা লর্ড বেণ্টিংকের সভাপতিত্বে পনের জন সদস্যকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তাঁদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলেন। লণ্ডনস্থ কমিটি তাঁদের কাজে যে ব্যাপক পরিকল্পনা পেশ করেন তাহা মূলতঃ হল এই—ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রিয় পোত দ্বারা যোগাযোগ স্থাপনের সময় মনে রাখতে হবে যে মিশর ও ইউরোপ কোয়ারাণ্টাইন আইনের আওতায় পড়ে। কাজেই মাণ্টা থেকে আলেক্জান্দ্রিয়া যাবার জন্য পৃথক জাহাজ দরকার। তাহলে ফালমথ থেকে মাণ্টার জাহাজগুলি কোন বাধানিষেধের মধ্যে পড়বে না। সেই জন্য দুটো জাহাজ চাই যা কেবল মাণ্টা থেকে আলেজান্দ্রিয়া পর্যন্ত আনাগোনা করবে। আলেক্জান্দ্রিয়া থেকে স্থলপথে সুয়েজ যাবার ব্যবস্থা করা হবে। তিনটি জাহাজ থাকবে বিলাত থেকে মাণ্টা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য এবং সুয়েজ থেকে বম্বের যোগাযোগের জন্য বহাল হবে চারিটি জাহাজ। এতে খরচ পড়বে আনুমাণিক বিশ লক্ষ পাউণ্ড এবং বীমা, সারানো ইত্যাদির টাকা ধরে বাৎসরিক ব্যয় হবে আন্দাজ ১২৩ হাজার পাউণ্ড। অন্ততঃ প্রথম কয়েক বৎসর ব্যয়াধিক্য হবে বলে তারা বিলাতের সরকার ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বাৎসরিক ৬৫ হাজার পাউণ্ড মত সাহায্য দাবী করেন। এর প্রতিদানে তাঁরা ভূমধ্যসাগরের ডাক বহিতে এবং কোম্পানীর ও সরকারের চিঠিপত্র বিনা পয়সায় বহিতে রাজি ছিলেন। এই পরিকল্পনার অনুসারে কাজ চলিলে প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে বম্বে ও বিলাত থেকে একটি করে জাহাজ ছাড়বে এবং চিঠিপত্রে ৫২ দিনে গন্তব্যস্থলে পৌছাবে।

এ প্রস্তাব পরে আরও পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু এত টাকা দিতে বা অন্য কোম্পানীর হাতে ডাকের ভার ছাড়তে যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, তখন তৎকালীন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার টার্টন সাহেব "প্রিকার্সার প্ল্যান" বলে একটা প্রস্তাব পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিলি করেন। তাতে তিনি বলেন যে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা বিলাতের সরকার কলিকাতা থেকে বিলাতে সরাসরি জাহাজ চালানোতে অনিচ্ছুক তখন কেবল একটা জাহাজ কলিকাতা থেকে সুয়েজ পর্যন্ত পথ চালু করা হোক। একটি চৌদ্দশ' টন ওজনের ও ৫৫০ অশ্বশক্তির

জাহাজ হলেই চলবে। ঐ জাহাজের নাম দেওয়া হয় "প্রিকার্সার"। এ জাহাজ তৈরী হবার আগেই লণ্ডনে "পেনিনসুলার ষ্টীম ন্যাভিগেশন্ কোম্পানী" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাঁরা জিব্রাল্টার পর্যন্ত মাসে মাসে নিয়মিত জাহাজ চালু করেন। জিব্রাল্টার থেকে যাত্রীরা নৌবিভাগের (অ্যাড্‌মিরাল্টীর) জাহাজে মাল্টা যেতে পারতেন এবং সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া।

১৮৪০ সালে ঐ কোম্পানীই "পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েন্টাল"৫ নাম দিয়ে ফালমথ থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে জাহাজ পাঠাতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গেই কলিকাতার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে এঁরা প্রস্তাব করেন যে তাঁদের মূলধন ও সম্পত্তির মিলনে সুয়েজ থেকে কলিকাতা পর্যন্ত একটা মাসিক জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কম্প্রিহেন্সিভ কোম্পানী ১৮৪১ সালের গোড়ায় এবং ঐ বৎসরই মে মাসে প্রিকার্সারের অধিকারীও ঐ ব্যবস্থায় সম্মত হন।

প্রিকার্সার জাহাজ তৈরী করতে যে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সেটা কতকটা চাঁদা তুলে ও কতকটা ইউনিয়ন ও আগ্রা ব্যাঙ্কদ্বয় থেকে ঋণ করে। যখন ঐ ব্যাঙ্কদ্বয়ের ধার শোধের কথা ওঠে তখন "পি অ্যাণ্ড ও" কোম্পানী তাঁদের টাকার বদলে শেয়ার দিতে চায়, কারণ প্রতিষ্ঠানটির হাতে নগদ তখন লক্ষ টাকাও ছিল না। অবশেষে ১৮৪২ সালের ২রা জুলাই যারা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁদের সভায় এক কার্যনির্বাহক সমিতির উপর ঐ তিন লক্ষ টাকা শোধ করার উপায় স্থির করা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। ঐ সমিতি আবার তখন বিলাতস্থ চারজন সভ্যের (৬) উপর ঐ ভার অর্পণ করেন। তার মধ্যে একজন দ্বারকানাথ। (৭)

দ্বারকানাথ তাঁর দূরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে বিলাতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবেই, ফলে, এ কোম্পানী টাকা পেলে টিকে যাবে এবং পরে বহু টাকা লাভও করতে পারবে। তাই তিনি দ্বিধা না করে এই সুযোগে "পি অ্যাণ্ড ও" কোম্পানীর শেয়ার কিনে নিয়ে টাকা দেন। এই ভাবে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়ে উঠেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ধার শোধ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে এই সব শেয়ার বিক্রী করে দেন।

যখন "পি অ্যাণ্ড ও" কোম্পানীর সঙ্গে কলিকাতার জাহাজী কোম্পানীগুলিতে আলাপ আলোচনা চলছে সেই সময়েই দ্বারকানাথ বিলাত পর্যন্ত জাহাজ চালাবার আরেকটি ব্যবস্থায় হাত দেন। তিনি ও কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করেন যে "ইণ্ডিয়া" নামে জাহাজটিকে দেখেশুনে কেনা যেতে পারে। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁরা হাজার টাকার দু'শ শেয়ার সাধারণে ছাড়বেন ঠিক করেন। বাকী টাকা ঠিক হয় ডিবেন্‌চিয়োর (debenture) দ্বারা তোলা হবে। প্রিকার্সার কোম্পানীতে যাদের স্বার্থ সেই লোকেরাই এ জাহাজ কেন কিনছে তার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় যে, প্রথমতঃ "ইণ্ডিয়া" জাহাজটি এখন কলিকাতাতেই আছে—সেটা বিশেষ সুবিধা। দ্বিতীয়তঃ এর চেয়ে ভালো জাহাজ ফরমাস দিয়ে তৈরী করানো যায় বটে কিন্তু তাতে বহু সময় লাগবে। উপরন্তু এই জাহাজটিকে আসল দামের চেয়ে কিছু সস্তাতেই পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে "ইণ্ডিয়া স্টীম কোম্পানী"'র পত্তন হয় এবং এর এজেন্ট হন মেসার্স ম্যাকিলপ্ ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী। এই

কোম্পানীর ১৮৪১ সালের ২৬শে নভেম্বরের সভায় দেখি উপস্থিত ক্যাপ্টেন হেণ্ডারসন ; জে, জে, ম্যাকেন্‌জি : কে, আর, ম্যাকেন্‌জি ; জন স্টর্ম ; জি, ইউ, অ্যাডাম ; ডব্লিউ, এন্‌, হেজার ; জে, সি, পামার, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। সভাপতি হন ডব্লিউ, উলিষ্টম। সেখানে অ্যাডাম সাহেব জানান যে বণ্ডেড ওয়ার হাউস ( Bonded Warehouse ) এর কমার্শিয়াল রুম্‌সে গত ১২ তারিখে কোম্পানীর পক্ষ থেকে জাহাজটিকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে।

সেইদিনই ঠিক হয় যে অভয়চরণ বাঁড়ুয্যেকে সমিতিতে লওয়া হবে। হেজার ও স্মলি কোং যথাশীঘ্র সম্ভব একটা অংশীদার নামা তৈরী করে সব গ্রাহকদের সই লইবেন আর জাহাজটাকে তার পুরাতন অধিকারী ও চালকের কাছ থেকে কোম্পানীর ট্রাস্টি হিসাবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামে লিখিত হবে।

ঐ দিন আরও ঠিক হয় যে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে যে পূর্ব্বেকার কথা মতই ১৮৪২ সালের ১০ই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন হেন্ডারসনের অধীনে সুয়েজ যাত্রা করিবে। একথাও সেই সঙ্গে জানানো হয় যে, "পি অ্যাণ্ড ও" কোম্পানী জাহাজটি কিনেছে বলে যে গুজব রটেছে তা ভুল।

এর পরেই আরম্ভ জাহাজটিকে ঠিক সময়ের ভিতর উপযুক্ত ভাবে তৈরীর অকুণ্ঠ চেষ্টা। তখনকার অন্যান্য জাহাজ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরও একটী কামরায় একাধিক লোক রাখা হত। কোন কোন জাহাজ একটী বড় ঘরে আটজন যাত্রী থাকার বন্দোবস্ত থাকত। ঐ আটজনের জন্য থাকত দু'টী মাত্র মুখধোবার জায়গা। তেলের আলো ঘরে একটা করে জ্বলত রাত দশটা পর্য্যন্ত। দশটার সময় জাহাজের ছুতোর এসে আলোটি নিবিয়ে দিয়ে যেত। অবশ্য তারপর মোমবাতি জ্বলায় বারণ ছিল না, তবে সে মোমবাতির দাম কোম্পানী দিত না। কেবলমাত্র কেউ অসুস্থ হলে এবং ডাক্তার বললে তবে তার ঘরে সারারাত আলো জ্বলত। ঐ কামরায় আসবাব পত্রেরও বিশেষ বালাই থাকত না। কাপড়জামা ছাড়াও কোন ভদ্রলোক বা মহিলার জাহাজে থাকাকালীন সাজ সরঞ্জামের দরুণ খরচ পড়ত ত্রিশ থেকে আশি পাউণ্ড! আসবাবপত্র সব সঙ্গে নিতে হত নিজেদের —তার রীতিমত তালিকা ধরে কেনা বেচার কারবারীও ছিল একাধিক।

"ইণ্ডিয়া" জাহাজের এ যাত্রা ছিল পরীক্ষামূলক। দ্বারকানাথ আগেই ঠিক করেছিলেন বিলাত যাবেন। এখন ঠিক করলেন যে এই ইণ্ডিয়া জাহাজের এই যাত্রাতেই তিনি যাত্রী হবেন। তাঁর চারিপাশের লোকদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। তাঁর বন্ধু রামমোহন রায় কিছুদিন আগে কালাপানি পার হয়ে আর ফিসে আসেন নি, সেকথাও মনে করিয়ে দিতে লোকে দ্বিধা করলে না ; এবং এতকাল তাঁকে পাকাপাকি ভাবে একঘরে যদিও করা হয় নি বিলাত থেকে ফিরে এলে যে করা হবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ সমাজপতিরা রাখলেন না। দ্বারকানাথ কিন্তু এসবের দ্বারা ভীত না হয়ে বিলাত যাবার যে ব্যবস্থা করছিলেন, এসবে যেন সেবিষয়ে আরও উৎসাহ পেলেন।

সেই উদ্দেশ্যে ১৮৪০ সালের ২০শে অগষ্ট সম্পত্তির এক ট্রাষ্টডীড্‌ করে তাঁর অবর্ত্তমানে ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা করেন।

---

১ হিষ্টরিকাল এণ্ড ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্‌ অ্যাকাউণ্ট অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, প্রকাশক—ওলিভার ও বয়েড কোং এডিনবরা, ১৮৪৩

( ২ ) ১৮২৫ সালে বিলাত থেকে ভারতে প্রথম যে বাষ্পীয়পোত আসে, সেই 'এণ্টারপ্রাইজ' জাহাজে ইনি ছিলেন দ্বিতীয় অফিসার।

( ৩ ) তিন শত পাউণ্ড সর্ব্বোচ্চ ও একশত পাউণ্ড সর্ব্বনিম্ন ভাড়া বলে ধরা যেতে পারে। ১৪২৬ টন ওজনের ''এডিনবরা'' জাহাজে ডেকের উপর সবচেয়ে ভালো ঘরের জন্য ভাড়া ছিল একজনের জন্য দুইশত পাউণ্ড। ঐ কামরায় আরেকজন থাকলে এই দ্বিতীয় জনকে কেবল খাবার খরচটুকু দিতে হত—অর্থাৎ দুজনের মিলিয়ে খরচ পড়ত ২৫০ পাউণ্ড মত। তাই অনেকই সস্ত্রীক ভারতে আনা সুবিধাজনক মনে করতেন। কেবল একজনের থাকার উপযুক্ত ছোট্ট কামরাগুলির ঐ জাহাজে ভাড়া ছিল ১১০ পাউণ্ড।

(৪) তখনও সুয়েজখাল কাটা হয় নাই। তখন বম্বে থেকে লোহিত সাগর পথে সুয়েজ বন্দর। সেখান থেকে স্থলপথে আলেক জান্দ্রিয়া। তথা হইতে জাহাজে মার্শাই এবং সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে ফ্রান্স পার হয়ে বিলাতে পৌছাত। টিকিট লাগিত সিকি আউন্স বা তৎকম ওজনেয় একটি চিঠির জন্য দু শিলিং আট পেন্স। পার্শেল ৩০ পাউণ্ডের বেশী ওজনের হলে নেওয়া হত না।

(৫) ঐ কোম্পানী ঐ নামে বা তার সংক্ষেপে "পি অ্যাণ্ড ও" কোম্পানী হিসাবে আজও জগৎবিখ্যাত ও প্রাচ্যের সঙ্গে বিলাতের নিয়মিত যোগাযোগের মূলসূত্র।

(৬) অন্য তিনজনের নাম মিঃ ডিকেন্স ; মিঃ নিউকমেন ও মিঃ সি, লায়াল।

(৭) দ্বারকানাথ তখন বিলাতে ছিলেন।

# বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার

**নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

## প্রেমবাহিনী, নিসর্গসন্দর্শন এবং অন্যান্য কবিতা

বিহারীলাল তার ভাবমত্ততার মধ্যেই কখনও কখনও পরাধীন জাতীয় জীবনের দুঃস্থতার গ্লানি স্মরণ করেছেন। সরস্বতীর তিনি একান্ত অনুরাগী, কিন্তু তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়, দেবীর বীণার অমৃতসংগীত—'আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে ?' শৃঙ্খলিত জননীর 'বিষন্ন দশায়' সন্তানের মন কি কখনও প্রফুল্ল থাকে—'যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়, বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন ?' পরাধীনতায় প্রতিভার পঙ্গুতা ঘটে :

অধীনতা-পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক, প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক ?
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে, পাশ না ফিরিতে চারিদিকে খোঁচা ঠ্যাকে। (নিসর্গ সন্দর্শন)

সেইজন্যই—

> এ দেশেতে বুদ্ধিমান যাঁহারা জন্মান্, নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
> তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে ; তিমি কি তিষ্ঠিতে পারে সুরি খাড়ি নদে ? (ঐ)

কবি কখনও সভ্যতাভিমানীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হন, কখনও বা তাঁর ক্রোধের লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে তোলেন :

> কলম্বস্—আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে, তাদের উপরে তত না হত প্রচার ;
> সত্য প্রবঞ্চকদের পৌঁছিবার আগে, পঙ্গপাল পড়ে যথা শস্যময় স্থলে,
> আদিম নিবাসীগণ স্বচ্ছন্দে অক্লেশে, না ঝাঁপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে ;
> ভূমিস্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে। তাহলে তাদের দশা হত না এমন
> যদি এই দস্যুদের নিষ্ঠুর শিকার, ভয়ানক বিপর্যস্ত, সুপ্ত নিদর্শন। (প্রেম প্রবাহিনী)

কিংবা কখনও কবিত্বের পরিপন্থী পরানুকরণকে ধিক্কার দেন :

> এখন ভারতে ভাই, হা ধিক্ ফেরঙ্গ বেশে
> কবিতার জন্ম নাই, এই বাল্মীকির দেশে

গোরে বোসে অট্টহাসে কে রে কার ছায়া ? কে তোরা বেরাস্ সব উল্কি-মুখী আয়া ? (শরৎকাল)

ওপরের অংশগুলোর হেমচন্দ্রীয় বক্তৃতার মেজাজ এবং ভঙ্গিতেই আমরা বুঝি, এই ক্রোধ ক্ষোভ অস্তিত্বের গভীর যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত নয়. তাদের মধ্যে কবির অন্তরের বেদনা অগ্নিবর্ণে দীপ্ত হয় নি ; পরাধীনতার দুর্গতি তাঁর কাছে চৈতন্যের কোনও সমস্যা ছিল না বলে তা কোনও অন্বেষার রূপ নেয় নি। পরাধীনতা সম্পর্কে বিহারীলালের ক্ষোভ তাৎপর্যহীন ভাববিলাস, তাকে তিনি কোনও মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় সংলগ্নতায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন নি। বস্তুত তাঁর সকল আবেগই, কোল্‌রিজীয় পরিভাষানুসারে, সংকল্পনার চারিত্র্যে দানা বাঁধে না। তাই কবির প্রেম ও প্রকৃতির পেছনে অস্তিত্বের কোনও প্রবল তাগিদ আমরা অনুভব করি না, তারাও বিচ্ছিন্নভাবে আসে ; অথচ

আমাদের দুঃস্থতার পটে তাদের দ্বৈতাদ্বৈত সত্তায় জীবনের শুদ্ধতা অন্বেষণের আকৃতি গীতিকবিতার বিন্যাসে কত সার্থক, গভীর হতে পারত! মধুসূদন পরাধীন জীবনের মোহঘটিত পাশ্চাত্য বিলাসের বিভ্রান্তির পর অতীত মোহে নয়, আধুনিক সচেতনতার আবেগেই দেশজ সংস্কৃতিকে খুঁজেছিলেন, চৈতন্যের প্রাণগঙ্গার সেজাতীয় কোনও মর্মান্তিক বেদনাশুদ্ধ সন্ধান বিহারীলালের প্রেম বা প্রকৃতিতে পাই না।

বিহারীলালের 'প্রেমপ্রবাহিনী'র উপজীব্য প্রেম, কিন্তু জীবনের গভীর আবেগে, মধুসূদনের মত বাঙালীর জীবন ও প্রকৃতির চিত্রকল্পে তার কোনও প্রাণময় রূপ তিনি রচনা করতে পারেন নি। এখানেও কাহিনীকাব্যের গতানুগতিক ছক, ঘটনার আড়ম্বরময় স্থুল বিকৃতির বিন্যাস অনুসৃত। 'পতন' শীর্ষক প্রথম সর্গে কবির বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য প্রেম যেভাবে কলুষিত হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে বন্ধুপত্নী সরল স্বাভাবিক সাজে পবিত্র সুন্দর ছিলেন, তিনিই আজ উৎকট বিলাসিনীর সজ্জায় কুৎসিত: 'রূপের ছটার তরে এত যে চটক, রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক।' কবির মনে প্রশ্ন জাগে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগ-শৈথিল্যে কি সেই পূর্ব প্রেম বিলীন হয়েছে—'এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চিরদিন, নবরসে নোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন?' অর্থাৎ এই নারী তাঁর রিপুপরায়ণতার জ্বালায়ই নিজের স্বামীর জীবনকে দগ্ধ করে চলেছেন, এই ইংগিতই প্রদত্ত। আর বন্ধুর অবস্থা তো একেবারেই শোচনীয়:

গাল ভাল লাল, ঘোর বিকৃত বদন,
দুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।
জোলে জোলে উঠিছেন এক একবার,
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎকার।
কখন বা দন্তপাটি কড়মড়্ করিয়ে
আছাড়েন হাত পা উঠে দাঁড়াইয়ে
বসিয়ে পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধ প্রায়,
বিন্ বিন ঘর্ম বয়, অঙ্গভেসে যায়।

এবংবিধ অনুপ্রাসাত্মক শব্দাড়ম্বরনির্ভর কবিত্বের অন্তঃসারশূন্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট। নরনারীর সম্বন্ধের টানাপোড়েনের কোনও গভীর চেতনায় দাম্পত্যজীবনের বিচ্ছেদকে ধরার চেষ্টা কবি করেন নি, সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত অগভীর, জোলো; সেই জন্যই বন্ধুর আক্ষেপোক্তিও এমন হাস্যকরভাবে স্থুল: 'ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন, হাঁপো হাঁপো করে প্রাণ, উড়ু উড়ু মন।' সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে বিস্বাদ—'এমন যে শিরোপরে লম্ববান ব্যোম্, খচিত নক্ষত্র গ্রহ সূর্য তারা সোম,' তাও ভাল লাগে না। আকাশকে ভাল লাগাটা যে তাঁর অভিজ্ঞতায় সত্য ছিল না, 'লম্বমান'' মনে হওয়াটা নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা নয়। একে অসতর্কতা ভাবলে ভুল হবে, 'লম্বমান ব্যোম্'—এখানে শব্দগত আড়ম্বর সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসই লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় সর্গে কবি প্রেমপ্রাপ্তির সৌভাগ্য ও প্রেম হারানোর দুর্ভাগ্য বর্ণনা করেছেন। এখানেও প্রেমের পটভূমিরূপে বাংলার বিশিষ্ট প্রকৃতির রূপ আসে না, কবি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ বর্ণনার শরণাপন্ন হন।

যথায় নধর তরু সরস লতায়,
পরস্পর আলিঙ্গিয়ে সদা শোভা পায়
ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুনু গুনু তান
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধু পান

যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে,
কোকিল কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে
কুরঙ্গিনী নিমীল নয়না রস-ভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডুয়ন করে।

'সাধের স্বপন' ভঙ্গে যে দুর্গতি ঘটে তার বর্ণনাকেও তিনি অসার নাটকীয়তায় জমকালো করে তুলতে চান:

বিষম-বিকট এ যে বিপর্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ!
চারিদিকে কাঁটাবন বাড়ে অনিবার
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার।
পশিছে বিট্‌কেল গন্ধ নাকের ভিতরে
পড়িছে পুঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।
হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

'সরোবরে সঞ্চারিত লহরী-লীলায়, তানে আন্দোলিত পদ্মদলে, মহাযোগীদের 'অন্তরের আনন্দের মাঝে', 'গাছে গাছে ডগায় ডগায়' শোভমান গোলাপ-কুসুম, 'পূর্ণিমায় পূর্ণ শশী'র হাসির সুধায়, কালিদাসের মেঘদূতের অলকার বিচিত্র সৌন্দর্যে, এমন বিচিত্র পুণ্যময় জগৎ যেখানে—'অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি, ফাটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি' এবং 'পাপের বেহায়া চক্ষু ভ্যাল্ ভ্যাল করে, কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে'—ইত্যাদিতে কবি তাঁর প্রেমদেবীকে অন্বেষণ করেন (অন্বেষণ, চতুর্থ সর্গ)। কল্পনার আনুকূল্যে একদিন তাঁর কাছে পৃথিবী প্রেমময় বলে প্রতিভাত হয়েছিল (নির্বাণ পঞ্চম সর্গ)' সর্বত্রই, এমনকি নানা বিকৃতিতে অত্যাচারেও তিনি মঙ্গলের আলোক অনুভব করেছিলেন। সুস্থ পিতামাতার 'চর্মমোড়া কুকঙ্কাল মাত্র অতি ক্ষীণ' বিকলাংগ সন্তান দেখেও, 'কলম্বস আবিস্কৃত নূতন ভূভাগে' আদিম অধিবাসীরা ইয়োরোপীয় ব্যাঘ্রদের নির্মম অত্যাচারে উৎসন্ন হলেও, সভ্যতার গৌরবময় আসন থেকে ভারতবর্ষের বিচ্যুতিতে বুক ফেটে গেলেও—'তবু এতে ধন্যবাদ দিয়েছি দয়ায়।' কল্পনা তাঁকে অমৃত সাগরে নিয়ে যেত, সেখানে তিনি দেখতেন, তার বেলাভূমির প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণীরা প্রবেশ করছে, তাতে 'প্রাণীদের স্বর্ণসম ক্রমে বাড়ে রূপ' এবং 'যত তারা ছট্‌ফট্ ধড়্‌ফড়্ করে, ততই তাদের আর রূপ নাহি ধরে,' 'যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান, তত শীঘ্র পাইতেছে সে সাগরে স্থান।' এই কল্পনার জগতও আকস্মিকভাবেই, দ্বন্দ্ব যন্ত্রণায় আঘাত ছাড়াই ভেঙ্গে যায়: 'দেখাইয়ে হেন কত যাদুকরী খেলা, কল্পনা আমার চক্ষে মেরেছিল ডেলা।' এই কল্পনা নিছক 'যাদুকরী খেলাই', কন্‌সার্ট, তাতে জীবনানুসন্ধানের কোনও অতলস্পর্শী গভীরতা অনুভব করা যায় না, তার জাগরণ বিলয় বিচ্ছিন্ন ভাববিলাস মাত্র। তাই কল্পনাঘটিত প্রেমের জগৎ ব্যক্তিহৃদয়ের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার চিত্রলতা ও সঙ্গীতময়তায় আসে না, আসে বিবৃতির স্থূল বাক্যচ্ছটায়।

কল্পনার ছলনার পর কবি প্রেমকে 'সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘাটিয়ে' খুঁজে বেড়ালেন: 'গলি ঘুঁজি পল্লী নগরী নগর,' 'ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর,' 'অন্তরীপ প্রায়দ্বীপ (!) উপদ্বীপ দ্বীপ, জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ,' 'আরাম-উদ্যান উপবন কুঞ্জবন, প্রান্তর প্রাসাদ দুর্গ কুটির ভবন,' এমন পথ যেখানে—'স্ুঁড়িদের দর্মা ঠেলাঠেলি, তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি, আসেপাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়, গায়ের বিটকেল গন্ধে আঁত উঠে যায়'—তিনি রীতিমত একটা জমকালো তালিকাই পেশ করেছেন, কিন্তু কোথায়ও সন্ধানের আর্তি ফোটেনি। প্রেম অন্বেষণে কবি যে কত কষ্ট

করেছেন, কুৎসিত স্থানেও খুঁজে দেখেছেন, এই প্রগল্‌ভ ঘোষণার পর অসংলগ্নভাবেই ভারতবর্ষের অতীতকালের জ্ঞানীগুণী ও সরল মানুষদের মহত্ত্বের ভাবনা আসে : তাঁরা আজ মহানিদ্রায় নিদ্রিত, কবির নিজেরও তো একদিন সেই অবস্থা হবে—'এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব, একদিন এই আমি, আমি নাহি রব'। এই অংশে রব (চীৎকার) এবং রব (থাকব), দুটি সম্পূর্ণ অসম ধ্বনিকেই তিনি যদৃচ্ছভাবে জুড়ে দিয়েছেন, যে তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণে আত্মগত ভাবনাই বৃহত্তর জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে, তার জীবননিষ্ঠ শিল্পবোধটি কবির ছিল না, নিজস্ব আবেগ অনুভূতির বিবৃতমূলক বা আলংকারিক প্রকাশই তাঁর কবিত্বের লক্ষ্য ছিল বলে এজাতীয় বিচ্যুতি তাঁর কাব্যে অনেক দেখা যায়।

এই ভাবনার সূত্রে কবি নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় ক্ষুব্ধ হন, তাঁকে কি কেউ পরে স্মরণ করবে, 'বিশেষত, 'এই পোড়া বর্তমানে নাই গো ভরসা, তাই আরো দমে যাই ভেবে ভাবী দশা ? বর্তমানকে কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় ধিক্কার দেন :

পরের পাতড়া চাটা, আপনার নাই, জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ
মতামত—কর্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাঁই। অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ !
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে, সাধারণে ইঁহাদের ধামাধরে আছে,
কবিরা চলুক্ তবু তাঁহাদেরি মতে। কাজে কাজে আদর পাবে না কারো কাছে।

ক্ষোভ সত্ত্বেও কবি নিজেকে প্রবোধ দিতে ভোলেন না : 'রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন, নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।' প্রেমের সন্ধানে আত্মদানের আকুলতাই যেখানে স্বাভাবিক, সে ক্ষেত্রে এই ভাবনার আত্মকেন্দ্রিকতা অপ্রাসঙ্গিক ও বেসুরো ঠেকে। অবশেষে কবি একটি প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনার ঘটায় তাঁর প্রেম-অন্বেষণকে নাটকীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন :

তওড়্ তওড়্ বেগে বৃষ্টি পড়ে, ঘোরঘট্ট চণ্ডযুদ্ধে মেতে ভূতদল
ছটাচ্ছট্ গুলিবৎ শিলা চচ্চড়ে। লণ্ডভণ্ড করে যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল
সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ ধাক্কান ঝড়ে সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে
বৃক্ষবাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উথারিয়া পড়ে প্রলয়ের মাঝে আমি খুঁজেছি তোমারে।

এই প্রলয়কে যেমন ধ্বন্যাত্মক শব্দের আয়োজনে ঘোরালো করে তোলা হয়েছে, তেমনি এই ঘটনার ঘনঘটায় কবির সন্ধানও যে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানিয়ে দেবার জন্যে সপ্তম পংক্তিতে পর পর চারিটি শব্দের একার ধ্বনির সংস্থানে একটা ধ্বনিগত তরঙ্গসৃষ্টির চেষ্টাও লক্ষণীয়। কবির এই সন্ধানের স্থূলতার মত প্রেমপ্রাপ্তিও জীবনাবেগের গভীরতায় সংহত হয় না, কবি তাকে সোচ্চার ঘোষণায় প্রকাশ করেন—

অহো, অহো, আহা আহা, একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময় !

শুধু 'শরৎকালের' 'নিশান্ত সঙ্গীত' কবিতাটিতে বিহারীলালের লিরিক মেজাজ শুদ্ধভাবে প্রকাশিত। এখানে অহংবোধ সর্বস্ব অনুভূতিকে বাগাড়ম্বরে জমকালো করে তোলার অসংযমে কবিমানস আবিল হয়নি, দাম্পত্যপ্রেম আবেগের সততায় সুরময় হয়ে উঠেছে :

উঠ প্রেয়সী আমার,
উঠ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার !

এই আবেগ শুদ্ধ বলেই তা কবিকে জগৎ ও জীবনের দিকেই টেনে নিয়ে যায়, কবির কণ্ঠে প্রেমের পূর্ণতার প্রশান্ত সুর বাজে :

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারীনরে
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই

এখানে কবি তাঁর সীমাবদ্ধতাকে শব্দ বা ঘটনাগত কোন কৃত্রিম, অসার নাটুকেপনায় অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি, অহংবোধের সেই প্রগল্‌ভ প্রকাশের লোভে না মজে ঐ আবেগেই আত্মদান করেছেন, তার সরল সজ্জায়ই আত্মস্থ থেকেছেন। তাই 'নিশান্ত সঙ্গীতে' বাঙালি জীবন ও প্রকৃতির পটে দাম্পত্যপ্রেমের আবেশ যে ভাবে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা বিহারীলালের অন্যান্য রচনায় মেলে না :

ওই চাঁদ অস্তে যায়—
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান !
হিমেল হিমেল বায়
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির-মুকুতা-জলে ভিজেছে বয়ান ;
উঠে, প্রেয়সী আমার, মেল নলিন নয়ান !

প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায়ই কবির আবেগের শুদ্ধতা অর্জনের সুযোগ ছিল, কিন্তু রচনাগুলোয়ও প্রকৃতিমগ্নতার কোনও গভীর সুর ধ্বনিত হয়নি। অবিশ্যি কবি তাঁর প্রকৃতিপ্রীতিকে ঘোষণা করতে ভোলেননি :

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে !

কিন্তু এই প্রকৃতিপ্রীতিও বাঙলা কবিতায় বিহারীলালের মৌলিক দান নয়, তাঁর পূর্ব্ববর্তী হেমচন্দ্রের মত বহির্মুখী কবির রচনায়ও প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ মেলে : 'হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন, বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।' অবশ্যি বিহারীলালের রচনায় প্রকৃতি-প্রসংগ অনেক বেশি এবং স্বতন্ত্রভাবে এসেছে এবং 'সঙ্গীতশতক' ও 'শরৎকালে'র দুই একটা কবিতায় এই আবেগ তত্ত্বমূলক বিচার স্তূপে আচ্ছন্ন না হয়ে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবি প্রকৃতিঘটিত আবেগ বা প্রাকৃতিক রূপবর্ণনাকে কোন মৌল চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা অনেকটা পরিমাণেই প্রকৃতিকে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য কাব্যচর্চার ফলশ্রুতি হিসেবে, জীবনের কোনও গভীর তাগিদে নয়। তাই বিহারীলালের প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে এ জাতীয় শহুরে শৌখীনতা প্রকাশ পায় : নির্জন নদীর কূলে মনোহর কুঞ্জবনে—

সুখে বোসে
টুন্‌টুনি টুন্‌টুন্ করে.
কে যেন সপ্তম স্বরে
আর্গিন করে বাদন !

সপ্তম স্বরে অর্গান বাজনার তুলনায় আর যাই হোক টুন্‌টুনির টুন্‌টুন্‌ ডাকের মাধুর্য ঠিক ফোটে না! যে শরৎকাল-এর সঙ্গে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির যোগ এত গভীর, তার বর্ণনায়ও কবি বাঙলার প্রকৃতিকে স্মরণ করতে পারেন না, শরতের মধ্যাহ্নের এই প্রথানুগত চিত্রে কোনও আবেগের অভিজ্ঞতাই সত্য হয়ে ওঠেনি :

শুব্ধ নগর, শুব্ধ ভূধর ধূ ধূ মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী
শুব্ধ হয়ে আছে উদার সাগর চমকি চমকি চায়!

বিহারীলালের স্মৃতিতে অভিজ্ঞতায় বাঙলার প্রকৃতি জীবন্ত ছিল না, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। তিনি 'নিসর্গসন্দর্শনে' সমুদ্র, ঝড, নভোমণ্ডলের আড়ম্বরময় বর্ণনায় প্রকৃতিকে নিছক একটা 'প্রকাণ্ড কাণ্ড' হিসেবেই উপস্থাপিত করেছেন। কবির সমুদ্রদর্শন বহিরঙ্গ রূপ বর্ণনায়ই সীমাবদ্ধ থাকে : এই সমুদ্র শুধু 'প্রকাণ্ড কাণ্ড', অবিরাম 'ভয়ানক তোল্‌পাড় করে', তার 'প্রকাণ্ড পর্বত'তুল্য তরঙ্গ, তাদের ছুটে আসার সময়—'উঃ কি প্রকাণ্ড রব! কানে লাগে তালা', এখানে প্রচণ্ড বাতাস, 'উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে, ঝক্‌ঝোকে বড় বড় আয়নার মতন', এই সমুদ্রে 'ফর-ফর' নিশান চলেছে পোতশ্রেণী', তার মাঝখানে কত দ্বীপ, 'কোনটিতে নারিকেল তরু দলে দলে' এবং 'তাহাদের মাঝখানে ছায়াময় তলে, ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়', কোনওটি 'ভয়ংকর বনপরিবৃত, সেখানে 'করিছে শ্বাপদ-সংঘ মহা কোলাহল'—তিনি সমুদ্র সম্বন্ধে বহু তথ্যই পুঞ্জীভূত করেছেন, কিন্তু কোথাও কবিহৃদয়ের সঙ্গে গূঢ় আত্মীয়তায় তার সত্তা প্রাণময় রূপ পায়নি।

কাহিনীকাব্যের অতি নাটকীয় ঘটনার আতিশয্যপূর্ণ বর্ণনার প্রতি বিহারীলালের ঝোঁক নিসর্গসন্দর্শনেও প্রকাশিত, এখানেও তিনি সেই মূল নাটকীয়তার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। এই কাব্যের তৃতীয় সর্গের বিষয় এক বীরাঙ্গনার বীরত্ব : অযোধ্যায় এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাশী প্রবাসের সময় স্ত্রীকে আনার জন্য তাঁর চাকরকে শ্বশুরালয়ে পাঠালেন। দিনান্তে তারা কাশীর কাছাকাছি পৌঁছুতেই প্রচণ্ড ঝড় ওঠে :

ধক্‌ ধক্‌ দশ দিকে বিদ্যুতের ঝলা, মম্মর ভেঙে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ-রলা,
কক্কড়্‌ অশনির ভীষণ গর্জন ছটছট বৃষ্টি-শিলা বাঁটুল বর্ষণ।

ধক্‌ ধক্‌, কক্কর্‌, মর্মড়্‌, ছটাচ্ছট—এত ধ্বন্যাত্মক শব্দের সমাবেশেও কুলোয়নি, তাদের পথযাত্রার কোথায়ও অরণ্যের উল্লেখ না থাকলেও লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ-রলা ( গাছের গুঁড়ি ) ভেঙ্গে পড়ার মত ঘটনার কৃত্রিম ঘনঘটাও জুড়তে হয়েছে ; প্রকৃতির রূপকে সত্য করে তোলার বদলে নিছক শব্দের খেলায় বৃষ্টি-শিলা-বাটুল-বর্ষণ! একটা ঘোরতর নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলার দিকেই কবির দৃষ্টি ছিল। নিসর্গ এই পর্যন্তই। ঝড়ের মধ্যেই তারা একখানা ঘরে এসে পৌঁছায়, সেখানে চারজন লোককে তক্তার ওপর, আর একজনকে খাটিয়ায় বসে থাকতে দেখা যায়—'কেলে মুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে, চোক কুৎকুৎ, ঘাড়ে গর্দানেতে এক, হাঁসফাঁস করে।' তারা আশ্রয়প্রার্থী দুজনকে থানার বাইরে, একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে থাকতে বলে—'ভিতরে শুলেন কর্ত্রী, নফর দাওয়ায়। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ লাথি খেয়ে নফর জেগে ওঠে : 'চেয়ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার বলেতে পশিতে চায় ঘরের ভিতরে।' দুর্বৃত্তদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তার প্রাণ গেল, এই কোলাহলে

ব্রাহ্মণপত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হল, সে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বীরাঙ্গনার আক্রমণে 'কেলে মুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে' প্রধান দুর্বৃত্তটি নিহত হল :

একচোটে মুণ্ড তার হল দুই চীর　　ধড়্ফড়্ করে ধড়, নিকলে রুধির,
খিচিয়ে উঠিল দাঁত চিতিয়ে পড়িল,　　ভিস্তির মতন পড়ে গড়াতে লাগিল।

বিহারীলালের যে নির্ভেজাল লিরিক মেজাজ তাঁর গুণগ্রাহী সমালোচকদের লেখায় এত প্রশংসিত, এই স্থূল আখ্যান বর্ণনাকে যে কি ভাবে তার সঙ্গে মেলানো যায় সে সম্বন্ধে তাঁরা কোনও প্রশ্ন তোলেননি।

চতুর্থ সর্গের প্রথম স্তবকে কবি নভোমণ্ডলের এই বর্ণনা দিয়েছেন :

'ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগনমণ্ডল,　　ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধখণ্ড অবিকল
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার ;　　গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।'

স্তবকটির অনুপ্রাসাত্মক ধ্বনিনির্ভর বিবৃতিতে আকাশের অসীমতা ব্যঞ্জনাময় কোনও রূপে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয় না। 'গগনমণ্ডল অমেয় অনন্ত কাণ্ড' এই উক্তিটির সঙ্গে তার আকারকে 'প্রকাণ্ড' ব্রহ্মের অণ্ডের অবিকল অর্দ্ধেক খণ্ড রূপে নির্দেশ ঠিক মেলেনি। সমুদ্রের মত এখানেও অজস্র তথ্যময় বর্ণনা, কোথাও কোথাও শুধু তাদের অলংকারের সাজ পরানো হয়েছে : নভোমণ্ডলে স্থানে স্থানে দীপ্ত নক্ষত্র, 'কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে', ধূমকেতু ইত্যাদি। পরস্পরবিরোধী উপমা প্রয়োগের বিচ্ছিন্নতাও আছে, যেমন কবি প্রথমে ছায়াপথকে আকাশের বক্ষে শোভমান 'গোচ্ছা মেলি হার' বলেন, তারপরেই এই স্থির সৌন্দর্যের তুলনা থেকে তিনি গতিময় সৌন্দর্যের তুলনায় চলে যান : 'নিরমল নির্ঝরের ধার, সুবিস্তৃত উপত্যকা বক্ষে প্রবাহিত।' নভোমণ্ডল সম্বন্ধে কবি ঘোষণা করেন :

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে　　কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁ বোঁ করে ধায়,　　মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

নভোমণ্ডলের অনন্ত উদরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহের প্রচণ্ড বেগে বোঁ বোঁ করে ধাবমান হওয়ার বর্ণনায় সমুদ্রে মাছের ডিমের ঘুরে বেড়ানোর তুলনাত্মক চিত্রটি অসঙ্গত ঠেকে ; তাতে আকাশের অমেয়তার মহিমা ধরা পড়ে না। 'নভোমণ্ডলে' বাঙলার দিগন্তে, মাটিতে আকাশের কোনও বিশিষ্ট প্রাণময় রূপ উদ্ভাসিত হয়নি, কবির আকাশ নিছক একটা বর্ণনীয় পদার্থ থেকে গেছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গের ঝড়ের বহিরঙ্গমূলক বর্ণনাময় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একটা 'প্রলয় কাণ্ড' রূপে প্রদর্শনের জন্য কবি শব্দের চটকের ওপর নির্ভর করেছেন :

সোঁ সোঁ দমকের উপর দমক　　সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টির ঘোর ঘটা,
খখ্খড়্ খোলা পড়ে, কোঠা দুদ্দড়,　　তওড়্ কশাঘাত ছাদে, ঘরে, দ্বারে,
মানবের আর্তনাদ ওঠে ভয়ানক,　　উঃ কি বিকটতর শব্দ চটচটা!
লণ্ডভণ্ড চতুর্দিক, বিশ্ব তোলপাড়্!　　হুলস্থুল তুমুল বেঁধেছে একেবারে!

ষষ্ঠ সর্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আয়োজন আরও বেশি :

ঝঝ্ঝড় ঝঝড় ঝড়ের ঝঝ্ঝড়ি, তওড় তওড় বৃষ্টির তওড়ি,
থথ্থড় থথড় থররেল থথ্থড়ে, দুদ্দুড় দুদুড় দেয়াল দুলে পড়ে।

কবি নিসর্গের উগ্র মূর্তি দর্শনকামনায় বাইরে গিয়ে দেখেন, 'উদ্দাম গঙ্গার জল' 'বোঁ বোঁ কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল ঘুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড়।' তিনি এই প্রলয়ের দৃশ্যকে জমকালো করে তোলেন :

মর্মড়্ মাস্তর ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে ; মাল্লা সব কাটা-কই ধড়্ফড়ে রড়ে ;
ডেক্ কামরা চুর্মার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ ; হাল্লা, লা লা হেল্প হেলপ্ হেলপ্।

ঝড়কে শুধু একটা প্রচণ্ড নাটকীয় ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করার লোভে কবি কতকগুলো শব্দ জড়ো করেছেন, চিত্র ও সুরের বর্ণ ও ছন্দহীন, সেই নিষ্প্রাণ শব্দস্তূপে কোনও রূপ ফোটে না তার কোনও সঙ্গীতও ধ্বনিত হয় না।

বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শনে'র প্রকৃতি বর্ণনার কৃত্রিমতাই বোঝা যায়, জীবনের শুদ্ধতা অন্বেষণের গভীরে প্রেরণায় তিনি প্রকৃতিকে খোঁজেননি। তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় বাংলার আকাশ মাটি জলের কোনও চেহারাই ফোটে না, কিংবা মীথের মত প্রাণময় রূপকল্পনায়ও তিনি প্রকৃতির রূপ গড়তে পারেন না, অথচ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যে মীথিকল্ কল্পনার প্রেরণা ফল্গুস্রোতের মত প্রবাহিত। শুধু প্রকৃতিপ্রীতির ঘোষণায় তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এই নদীমাতৃক বাঙলা দেশের কবি হয়েও তাঁর কবিতায় কোনও নদীর রূপপ্রতিমা একবারও আসেনি, মধুসূদনের কপোতাক্ষ বা রবীন্দ্রনাথের পদ্মার মত প্রকৃতির অভিজ্ঞতা বা জীবন্ত স্মৃতির সম্পদ তাঁর ছিল না, ছিল না সেই জাতীয় ঐশ্বর্য খোঁজার আকুলতাও।

# উদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীপাট সপ্তগ্রাম

## নারায়ণ দত্ত

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিকাণ্ডে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ এই উল্লেখটুকু শুধু তাঁর বৈষ্ণবপ্রাণতারই স্বীকৃতি নয়। তার অতিরিক্ত কিছু। শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমবন্যা সেকালের বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সপ্তগ্রামকেও প্লাবিত করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক ছিলেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। দ্বিতীয় নায়ক উদ্ধারণ দত্ত। মিতভাষী কবিরাজ গোস্বামীর চরণ দুটির আসল বক্তব্য বোধ করি তাই।

সমসাময়িক বৈষ্ণবভাবরসাপ্লুত জীবনীগুলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেরী হয় না। চৈতন্যভাগবতের ব্যাস বৃন্দাবনদাস বলছেন—

যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥

এও বড় কম কথা নয়। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ জীবনে এক প্রভাবশালী অংশ ছিল সাতগাঁয়ের বণিকসম্প্রদায়। এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যেও 'সাতগাঁইএ্যা'দের প্রভাবপ্রতিপত্তি কুলশীল বিশেষ ঈর্ষার বস্তু ছিল। সারা বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কাজে নেমে নিত্যানন্দ ঠাকুর স্বাভাবিকভাবেই সাতগাঁয়ে একটা বড় ঘাঁটি করেছিলেন। আর এই প্রচার অভিযানে উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। উদ্ধারণের এই ভূমিকা শুধু তাঁর বৈষ্ণববিশ্বাসের কথাই নয়, তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের মহিমাই প্রকাশ করে। বাঙলাদেশের সুপরিব্যাপ্ত বণিক সমাজে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডে উদ্ধারণ নিঃসন্দেহে একজন উদ্যোগী পুরুষ।

অনেকে মনে করেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে উদ্ধারণের আগেই পরিচয় ছিল। নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্ধারণ নাকি প্রচুর অর্থব্যয় করেন। এই কিম্বদন্তী কতটা সত্য, সঠিক বলা না গেলেও উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে নিত্যানন্দ ঠাকুরের পরিচয় যে তাঁর বৈষ্ণবধর্ম প্রচার অভিযানের আগেই ঘটেছিল চৈতন্যভাগবতে তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী নিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারের জন্য খড়দহ থেকে সদলবলে আসেন ত্রিবেণী। সেখানে স্নান শেষ করে সোজা ওঠেন উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥

কাজেই অনুমান করা অন্যায় হবেনা যে উদ্ধারণের সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আলাপ ও ভাববিনিময়ের কাজ এর আগেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং বোধ করি এই ঘটনার আগেই উদ্ধারণ

দত্তঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই মিলনের পরেই মনে হয় উদ্ধারণ পুরোপুরি নামধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী হন এবং তাঁর অকৃত্রিম সেবা নিত্যানন্দকে ঘিরে রাখে। কেননা, চৈতন্যলীলার কবি বৃন্দাবন দাস তার পরেই বলেছেন—

কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥

আর তাঁর সেবার এই একাগ্রতাই বৈষ্ণবসমাজে তাঁকে সুবাহু গোপালের মর্যাদা দিয়েছে। কৃষ্ণলীলায় সুদাম, বসুদামাদি দ্বাদশ গোপালের পঞ্চম ছিলেন সুবাহু।

নিত্যানন্দ ঠাকুরের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার অভিযানে উদ্ধারণের নিঃস্বার্থ সেবা ও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের কথা নরোত্তমদাস 'ভক্তি রত্নাকরে'র অষ্টম তরঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

উদ্ধারণ দত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর। সপ্তগ্রাম মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে।
করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥ দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে ॥

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী"র মতে উদ্ধারণ দত্তের পূর্ব্বপুরুষরা আসেন অযোধ্যা থেকে। আসেন বাণিজ্য করতে। সেটা লক্ষণসেনের আমল। সেযুগেও ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিরা প্রদেশান্তর থেকে যে বাংলা দেশে আসতেন—ভবেশ দত্ত তার প্রমাণ। তিনি এদেশে এসে বেশ থিতু হয়ে বসলেন এক বিখ্যাত ব্যক্তির ভগ্নীকে বিবাহ করে। মেয়েটির নাম ভাগ্যবতী। পিতা কাঞ্জিলাল ধর। ইতিহাসে কাঞ্জিলালের নাম নেই। তবে এঁর পুত্র উমাপতি ধর প্রখ্যাতকীর্তি পুরুষ। সদুক্তির্ণামৃতের প্রায় আশীটি শ্লোকের কবি। গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেব সরস্বতীর প্রশংসাও জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে— 'বাচঃপল্লবরত্যুমাপতি ধরঃ' শ্লোকে। দীর্ঘজীবন লাভ করে তিনজন সেনরাজার মহামন্ত্রিত্ব করেছিলেন তিনি। আর মহামন্ত্রীর ভগ্নিপতি ভবেশ দত্ত সহজেই সকাজে স্বীকৃতিলাভ করে ব্যবসা বাণিজ্য ফলাও করে গেলেন। ভবেশের ছেলে কৃষ্ণ শুধু পিতার বিত্তেরই অধিকারী হননি, মাতুলের পাণ্ডিত্যও কিছু লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণের পণ্ডিত হিসেবে নাম ছিল। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীকর উদ্ধারণের পিতা। উদ্ধারণের মায়ের নাম ভদ্রাবতী। ঐ একই সূত্রে জানা যায় উদ্ধারণ মহাধনী গৌরী সেনের কন্যাকে নাকি বিবাহ করেছিলেন। উদ্ধারণের পুত্র শ্রীনিবাস। মতান্তরে প্রিয়ঙ্কর।

কেউ কেউ বলেন উদ্ধারণের প্রকৃত নাম দিবাকর। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া। স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর মনে গভীর বিষয়-বৈরাগ্য আনে। তাঁর বয়স যখন ছাব্বিশ। ঐ সময়ে বাঙলাদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। উদ্ধারণ এক প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলে দরিদ্রদের জীবনরক্ষা করেন। শুধু তাই নয় এর ফলে বহু দরিদ্রকে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মের শরণ নিতে প্রকারান্তরে সাহায্য করেন তিনি।

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনের' মতে উদ্ধারণের ভদ্রাসন ছিল কৃষ্ণপুরে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবগ্রন্থ অভিরাম দাসের পাট পর্যটনে দুটি চরণে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে।

উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুরে নয়।
হুগলীর নিকটে কৃষ্ণপুর।

বর্তমান সপ্তগ্রাম রেল স্টেশনের একটু দূরে উদ্ধারণ দত্তের যে শ্রীপাটটি রয়েছে কৃষ্ণপুর গ্রামটি

তারই অনতিদূরে। হুগলী থেকেও তার দূরত্ব বেশী নয়। কাজেই দত্ত ঠাকুরের বসতভিটা বলে কথিত শ্রীপাটটি 'পাট পর্যটনে'র সমকালীন বলে ধরা অন্যায় হবে না। উদ্ধারণের নামাঙ্কিত শ্রীপাটটি তাই অন্তত তিন শতাব্দীর পুরনো বলে মনে হয়। তবে সমস্যা এই যে বৈষ্ণবদের দ্বাদশ গোপালের যে বারটি পাট রয়েছে তাতে উদ্ধারণের শ্রীপাটটির উল্লেখ আছে কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুরে। সপ্তগ্রামের সেখানে স্বীকৃতি নেই। উদ্ধারণপুরে উদ্ধারণ দত্তের সমাধি আছে। আবার শ্রীপাট সপ্তগ্রামেও তাঁর সমাধি রয়েছে। অনেকে এদিকে মনে করেন পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্তঠাকুর বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা করেন। সপ্তগ্রাম ও উদ্ধারণপুর—দুইই দত্তঠাকুরের পুষ্পসমাধি মাত্র!

তবে সপ্তগ্রামের বৈষ্ণবপাটটি একটি মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারী কেন না দত্তঠাকুর যে তাঁর মরজীবনের অধিকাংশই এখানে ব্যয় করেছিলেম এবং বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কাজে এক মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

সরস্বতী নদীর তীরে, শ্রীপাটের অদূরেই 'ভেদোবন' নামে যে জায়গা রয়েছে, অনেকে মনে করেন উদ্ধারণ সেখানে দরিদ্র বৈষ্ণবদের জন্য বাসভবন তৈরী করে দিয়েছিলেন। অন্নছত্রের রসুইশালার জন্য ত্রিশ বিঘা জমি নাকি নির্দিষ্ট করে দেন তিনি—। সপ্তগ্রাম ষ্টেশনটা নাকি সেই ত্রিশ বিঘার ওপর দিয়েই গেছে। কিছুদিন আগে ষ্টেশনটির নাম ছিল তাই 'ত্রিশবিঘা'।

বর্তমানে শ্রীপাটটিতে নিতাই, গৌর, ও অদ্বৈতাচার্যের নিত্য সেবা হয়। পূজার বাঁধানো মঞ্চের সামনে যত্ন করে বাঁধানো চত্বরে মাধবী লতার গাছ আছে। কিম্বদন্তী যে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এটি স্বহস্তে রোপণ করেছেন। এই নিয়ে একটি কাহিনীও আছে। দত্তঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষার প্রমাণ চান। উত্তরে প্রভু তাঁর ডাল রাঁধার কাঠিটি সামনের প্রাঙ্গণে পুঁতে দিতে বলেন। সেই নির্জীব কাঠিটাই কালক্রমে মাধবী লতার রূপ নেয়। প্রশ্ন হতে পারে—হঠাৎ ডাল রাঁধবার কাঠিটার কথাই বললেন কেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু? বৈষ্ণব সমাজের বিশ্বাস যে উদ্ধারণ দত্তঠাকুর নিত্যানন্দের রন্ধনকার্য করে দিতেন। ডালের কাঠির এই মাধবীলতা হয়ত বা উদ্ধারণের সেই সেবারই স্বীকৃতি!

নিত্যানন্দের পাশাপাশি থেকে শুধু সপ্তগ্রাম নয় সারা বাঙলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে পরম ভাগবত উদ্ধারণের কৃতিত্ব কতকটা সে বিষয়ে আলোকপাত করবার মত যথেষ্ট তথ্য নেই। তবে মহাপ্রভুর যুগোদ্ধারের পুণ্যব্রতে উদ্ধারণের প্রয়াস কোনক্রমেই তুচ্ছ করা যায় না। একথা বড়গলায় বলা যায়। সেকালের সকল বৈষ্ণব উৎসবেই তাঁর উপস্থিতি—এই সত্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। শ্রীচৈতন্যের আদেশে পানিহাটিতে রঘুনাথ দাস যে দধি চিড়ার মহোৎসব করেছিলেন—উদ্ধারণ তাঁর পরিকর পরিবৃত হয়ে সেখানে হাজির ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

উদ্ধারণ আদি আর নিজগণ।
উপরে বসিলা সবে কে করে গণন ॥

বৈষ্ণব ঐতিহাসিকদের হিসাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চেয়ে নয় বছর বড় ছিলেন উদ্ধারণ। তাঁর জন্ম হয় ১৪৮১ সাল। ষাট-বছর বয়সে তিনি মারা যান। সেটা শীতকাল। অগ্রহায়ণ মাস। তিথিতে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। সপ্তগ্রাম শ্রীপাটে প্রতি বছর এই উপলক্ষ্যে একটি উৎসব হয়

## শিল্পে অনুকরণ

শিল্পী হচ্ছেন রূপের কারিগর। তিনি যা গড়ে তোলেন তা হুবহু বাইরের জগৎ নয়, তবে বাইরের জগতের একটা অনুভূতি তাঁর গড়ে তোলা শিল্পের মাঝে মিশে রয়েছে। কোনো ফুলের ছবি দেখে আমরা মনে করি, শিল্পী রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন ফুলটিকে। মোটেই তা নয়, আসলে তিনি আমাদের নজরসই করে এঁকে দিয়েছেন ফুলের ভাবটিকে। যা আছে তাকে তিনি কিছুতেই পটে লিখে দিতে পারেন না, শুধু নিজের এলেমদারির জোরে তারই মতন একটা কিছু তিনি আমাদের সামনে হাজির করতে পারেন। কেউ যদি বলেন, গাছের একটি ফুল যেমন বাস্তব, ফুলের ছবিটিও তেমনি, তাহলে তাঁর অমনধারা আজগুবি কথা না শুনে আমরা চোখ বুজে বরং অন্য কোনো দিকে কান ফেরাব। কারণ গাছের ফুলটি সত্যিকারের ফুল, এর পাশে পটের ফুলটি তো মিথ্যে,—কিংবা আরো লাগসই করে বলা যাক, পটের ফুল হচ্ছে সত্যিকারের ফুলের সত্যিকারের আভাস।

এখন, সবুজ ডালে পাতার কোলে ফুলটি যে ফুল হয়ে উঠেছে তার পিছনে আছে পৃথিবীর মাটি, আকাশের আলো-হাওয়া আর গাছের ভেতরকার স্বাভাবিক ইচ্ছে। শিল্পী নিছক তারই আভাসটিকে ফুটিয়েছেন তুলির টানে। কাজেই মাটি-আলো-হাওয়া আর গাছের ইচ্ছে যে অর্থে ফুলটিকে গড়ে তুলেছে, শিল্পী নিশ্চয়ই সে অর্থে ফুলের গড়নদার নন। প্রশ্ন উঠবে, তবে পটে আঁকা ফুলের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক কী। আমি বলব, তাঁর সম্পর্ক অনুকরণকারী হিসেবে। রঙের আঁচড়ে তিনি আমাদের সামনে যা সাজিয়ে দিয়েছেন তা তার নিজের মনগড়া একচেটে সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির ইসারা, তার মানে—নিশ্চিতভাবে অনুকরণ।

এই যুক্তিকে আঁকড়ে ধরলে সব শিল্পকেই অনুকরণ বলে মেনে নিতে হয়। আর, খাসা অনুকরণ যে তোফা শিল্প—এ ব্যাপারে আমি দ্বিধাহীন। যেমন, রোজদিনকার ঘরসংসারকে অনুকরণ করে নাটকের অভিনয় জমে ওঠে, সেই অভিনয়কে অনুকরণ করেই ক্যামেরার আলোছায়া ঘেরা ফিতে ভরে যায়, সেই ফিতের আলোছায়ার বুনুনিকে আবার পর্দায় অনুকরণ করে আমরা হেসে কেঁদে সারা হই। তাছাড়া চলতে ফিরতে ঘরে দোরে কাছে পিঠে হামেশা যাকে দেখি, শিল্পের মারফতে তাকে পাই আরো রমণীয় করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আনন্দ পাব বলে আসল জিনিসের চেয়ে আমরা তার ছায়াকে খাতির করি বেশী। তাই চেখে চেখে পান্‌সে হয়ে যাওয়া জীবনের কলরব কে পেছনে ফেলে নিরিবিলি সিনেমাঘরে আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুমুখের পর্দায় ছায়ার ওপর চোখ রাখি, আর সেই পান্‌সে জীবনের ছায়াকেই বেশ করে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করি। এইখেনেই অনুকরণের বাহাদুরি।

অবশ্য অনুকরণকে নকল করা বলে ধরে নিলে মারাত্মক ভুল করা হবে। নকল কখনো

শিল্প নয়, কারণ ওর ভেতরে গড়বার কোনো ইচ্ছে জড়ানো নেই। কোনো কিছুকে রূপ দিতে গেলে যে-নজর যে-ভাবনা যে-কারিগরি দরকার, নকলে তা একেবারে গরহাজির। নকল যেন শীলমোহরের মতো, অবিকল ছাপটি লাগিয়ে দিলেই হোলো, নিজের বলতে তার মাঝে কিছুই রইলো না। শিল্পের অনুকরণ কিন্তু এমনি ধারা কোনো কিছুকে নকল করবার মতো মেকি ব্যাপার নয়, বরং এটি রসবান জিনিসের গুণগুলিকে নিজের করে নিয়ে হালকা মোচড় আর আল্‌তো গড়াপেটার মধ্যে দিয়ে আরো বেশি রসবান হবার রীতি। কাজেই অনুকরণ হচ্ছে জঁাকালো শিল্পের জন্যে উঁচুদরের ভাবনা অনুভূতি আর প্রকাশের সড়ক। তবে বস্তু আর তার ছায়ার ভেতরকার রূপ আর বাইরের রঙ শিল্পের চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড় করাতে হয়—এ ব্যাপারে শিল্পী ওয়াকিবহাল না হলে বুঝতে হবে অনুকরণের মুন্সীয়ানা তাঁর হাতের বাইরে।

অনুকরণের পৈঠে বেয়ে ওপরমুখো চলতে চলতে বাস্তব কমজোর হয় না, বরং আরো বেশি জোরালো হয়ে ওঠে। কারণ শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণ করে তাকে এগিয়ে দেয় তার শেষ নিশানার দিকে। আবার, সবকটি শিল্পই প্রকৃতির আধখেঁচড়া জিনিসগুলোকে গোটা চেহারা দিয়ে গড়ে তোলে কিংবা প্রকৃতির না-পাওয়া ভাঙাচোরা অংশগুলো অনুকরণ করে তার হাল-ছেড়ে-দেওয়া অফুরাণ কাজ সমাধা করে। এক কথায় বলা যায়, নিশানা আর কাজের দিক থেকে শিল্প আর প্রকৃতি একই পথে চলেছে, তবে সমান তালে নয়। ঝাঁপতালে আর দাদ্‌রাতালে যে তফাৎ, শিল্প প্রকৃতির চলনের তফাৎটুকুও ঠিক সেই রকম। তাছাড়া বাইরের চেহারাটিই অনুকরণের কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, ভেতরকার চরিতরীতির ওপরই এ জোর দেয় বেশি। আর সেই চরিতরীতিকে অনুকরণ করা যায় রঙে নয়, রূপে।

শিল্পী অনুকরণ করবেন শুধু বাস্তব জীবনই নয়, বাস্তবের চেয়ে উঁচুতলার কিংবা নীচুতলার জীবনকেও। তেমনি কোনো জিনিসের আগেরকার রূপ বা আজকের রূপের পাশাপাশি আগামীকালের রূপটিকে হাজির করাও শিল্পের অনুকরণের বিষয়। যা হতে পারে, শিল্পীর হাতে তার অনুকরণ দেখে রসিক যদি তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন, তবে এর জবাবে বলতে পারি—আদর্শ সব সময়েই বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়। শুধু সজাগ থাকতে হবে, অমনিধারা অনুকরণের ভেতরে আমরা যেন নীতির ঝামেলা না জড়িয়ে ফেলি ; শিল্প হিসেবে উৎরে গেলেই আর অবাস্তবের ফিকিরে তাকে একঘরে করে রাখব না

বাইরের জগতের সাথে শিল্পের যোগ দুরকমের—অনুকরণের মধ্যে দিয়ে' আর অনুকরণকে বুঝে নেবার মধ্যে দিয়ে। প্রথম দায়িত্বটি শিল্পীর, পরেরটি রসিকের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতিকে যদি সেরা আয়না বলে ধরে নিই তবে শিল্পের কী আসে যায়। আমার ধারণা, এতে শিল্পের লাভই হবে। কারণ প্রকৃতিকে আয়না করা মানে জগতের সৌন্দর্যের দিকে মুখ ফেরানো। আর, এরই ফলে শিল্প উঠবে জমকালো হয়ে। প্রকৃতিকে অনুসরণ করলেই শিল্পের জাত যায় না, কারণ প্রকৃতি নিজেই একটি অনুকরণ। নিজেকে নানান-রূপে-রঙে-স্বাদে-গন্ধে মেলে ধরবার যে দামাল ইচ্ছে ঢেউ জাগিয়ে চলেছে এই জগতের ভেতরে ভেতরে, তারই অনুকরণ হচ্ছে প্রকৃতি। কাজেই এদিক থেকে আমরা শিল্পকে প্রকৃতির অনুকরণ না বলে জগতের মূল প্রেরণার অনুকরণের ফসল বলতে পারি।

ভাষায় হোক, রঙে হোক, সুরে হোক—শিল্পের বিষয় হচ্ছে প্রতিমা গড়া, কাজেই পরিণতি তার অনুকরণে। এতে শিল্পশালার কারিগরি অবশ্যই চাই, কারণ শিল্পের ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে প্রতিমার মুকুল, আমাদের রুচি আর ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে কল্পনা আর বুদ্ধি থেকে তা সহজেই বেরিয়ে আসে। তাই অনুকরণের ব্যাপারে বাইরের জগতকে দেখার সাথে সাথে শিল্পীর ভেতরকার আপন জগতকে জানারও একটা দরকার আছে।

কোনো পয়লা নম্বরের রচনাকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে নোতুন শিল্প গড়ে তোলা যায়। এটাও এক ধরণের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ আদর্শ হিসেবে খাড়া করা রচনার ভাবটিকে, মূল প্রেরণাটিকে, কারুকাজের ধারণাটিকে নিজের এলেমদারি দিয়ে ঘষে মেজে সাজিয়ে রাঙিয়ে শিল্পী আপন রচনায় আসন দিতে পারেন। সেরা শিল্প অমনি করে অনুকরণের মধ্যে দিয়ে আরেকটি সেরা শিল্পের জন্ম দেয়। এখন, এরকম অনুকরণের আওতায় শিল্পীর প্রতিভা যদি মন্দা হয়, কিংবা শিল্পী যদি অসৎ হন—যদিও সদিচ্ছে যার নেই তাকে শিল্পী বলা যায় না—তবে অপরের রচনাকে নকল করবার, কিংবা বেমালুম চুরি করবার আশঙ্কা রয়েছে। মামুলি অনুকরণের কোনো দাম নেই। ধরা যাক, এসরাজ রয়েছে, আর রয়েছে একটি ছড়। ঐ এসরাজের তারে ছড় টেনে সহজেই আওয়াজ তোলা যায়, কিন্তু সুর জাগানো যায় না সাধনা ছাড়া। ওদের সুরময় করে তুলতে পারার নামই খাঁটি অনুকরণ। শিল্পের চাঁদনিতে এরই আদর বসোরার গোলাপের মতো। কারণ ঐ সুরটুকুই শিল্পীর নিজের, শিল্পীমনের নানা কোণ থেকে উপচে-পড়া ভাবানুভূতি।

নাটক জিনিষটা যে কী—এর জবাব দিতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, নাটক হচ্ছে আমাদের আনন্দের জন্যে আমাদেরই আবেগ-অনুভূতির খাঁটি আর জীবন্ত অনুকরণ। ঐ 'খাঁটি' শব্দটিই শিল্পীর কারিগরির কথা বেশি করে জানিয়ে দিচ্ছে। আর, অনুকরণকে যে জীবন্ত হতে হবে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ অনুকরণ জীবন্ত না হলে—তার মানে, অনুকরণের ভেতরে জীবনের উত্তাপ না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে আবেগ-অনুভূতি তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছে। ফলে তাকে তো অনুকরণই বলা যায় না। হাল্‌কা বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে যখন সুর চটুল হবে, বেদনার কথা বলতে গিয়ে যখন ভাষার চলন অলস হবে, খুনোখুনি ব্যাপার বোঝাতে গিয়ে মঞ্চে আলো যখন হবে খুনরঙা, তখনই অনুকরণ জীবন্ত।

শুধু বাস্তব জগতের কিংবা শিল্পীর হৃদয়জগতের অনুকরণ সত্যিকারের অনুকরণ নয়, বাইরের মহল আর ভেতরের মহলের অনুকরণের মিলনেই আসল শিল্প গড়ে ওঠে। রোজদিনকার দেখা জিনিসকে একেবারে রেখায় রেখায় মিলিয়ে শিল্পে ঠাঁই দিলে তা খবর হয়ে উঠবে, এ ধরণের অনুকরণ বড়ো বেশি নিরেট; আর ইনিয়ে বিনিয়ে নিছক মনের আবেগের অনুকরণ বড়ো বেশি উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা। কাজেই, এদের মাঝামাঝি যে পথ, সে পথ বেয়েই পৌঁছনো যায় সকল শিল্পের দেউলে। এর জোরালো প্রমাণ হচ্ছে, হররোজ ঘরেদোরে যে—কান্নাকে আমরা মনেপ্রাণে ভুলতে চাই, অনুকরণের মধ্যে দিয়ে এসে সেই কান্নাই আমাদের মনপ্রাণ ভোলাতে চায়; বেদনায় আমরা মুষড়ে পড়ি, কিন্তু বেদনার অনুকরণে আনন্দিত হয়ে উঠি।

দেবব্রত চক্রবর্তী

## আধুনিক বাংলা যাত্রানাটক

যাত্রাভিনয় বাংলা দেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে বহুকাল ধরেই। সেকালে জমিদারমশায়ের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শুরু করে আজকের দিনের সার্বজনীন পূজামণ্ডপের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত মুখরিত হয়ে চলেছে যাত্রাগানের সুউচ্চ সুরঝঙ্কারে। বাংলা দেশকে জানতে গেলে যেমন বাংলাদেশের গ্রামকে জানতে হবে, তেমনই গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে অবহিত হতে গেলে যাত্রানাটকের সাথে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে হবে একথা স্বীকার করতে নিশ্চয়ই কোনরূপ দ্বিধাগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে যাত্রাগান আর পল্লীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আজ তা শহরের যান্ত্রিকতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। বনের বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করাটা কতটুকু সমীচীন হয়েছে আমরা অবশ্য এখানে তা আলোচনা করব না। তবে এর ফলে যাত্রানাটকের যে সর্বাত্মক উন্নতি সাধিত হয়নি—এই মন্তব্য প্রকাশ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক নয়। আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, বেশবিন্যাস, বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে যতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ঠিক সমপরিমাণ অবহেলিত হয়েছে অভিনয় এবং নাটকের দিক। অভিনয়ের কথা বাদ দিলাম; মূলকেন্দ্রবিন্দু নাটক যেখানে অবহেলিত এবং পঙ্গু সেখানে যাত্রার সার্থকতা কোথায়?

আজকের যাত্রানাটকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল তা গতানুগতিকতা থেকে আদৌ মুক্ত নয়। যে কোন লেখক হোন না কেন, কিংবা যে কোন বিষয়বস্তু হোক না কেন (কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক) প্রত্যেকক্ষেত্রেই একটি শিশুচরিত্র বা কিশোরচরিত্র থাকবে যে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক এবং সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। একটি বৃদ্ধ ভৃত্য চরিত্র থাকবে যে সবসময়েই সৎব্যক্তি হবে এবং নায়ক কিংবা নায়িকা অথবা অন্য কোন মুখ্যচরিত্রকে শিশুকাল থেকে লালন পালন করে আসবে। একটি কৌতুকচরিত্র থাকবেই। অবস্থাবিশেষে একাধিক। আর থাকবে নায়ক নায়িকা যারা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক এবং অপরদিকে আধুনিক চলচ্চিত্রপ্রভাবিত। নায়ক হবেন চরিত্রবান্, বীর্যবান্, জ্ঞানবান্, বিদ্বান্ এবং আবশ্যিকভাবে সুযোদ্ধা। নায়িকা চরিত্রবতী, ক্ষমাশীলা, ধৈর্য্যশীলা, সাধ্বী, পতিভক্তিপরায়ণা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর, হ্যাঁ, খলচরিত্র তো কমপক্ষে একটি থাকবেই যার চরিত্রে কোনও সদ্‌গুণের স্থান নেই। দু একটি ক্ষেত্রে অবশ্য (যেখানে প্রচুর খলচরিত্রের সমাবেশ) দু'একটি খলচরিত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণ সদ্‌গুণের বিকাশ দেখতে পাই। কিন্তু তাও বোধহয় যৎকিঞ্চিৎ। সবই মোটামুটি একই ছাঁচে ঢালা হবে একথা বলা বিশেষ বাহুল্য মাত্র।

এই তো গেল চরিত্র চিত্রণ এবং বিষয়বস্তু। নাট্যবিন্যাস, অবিস্মরণীয় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আজকের কোনও যাত্রানাট্যকার সেরকম ভাবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের নজীর দেখাতে পারেননি। অধিকাংশ নাট্যকারই চড়াসুরের melodrama র প্রতি এতো অনুরক্ত যে তাঁরা প্রায়

প্রতিদৃশ্যেই ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিজনক melodrama র অবতারণা করেন। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রত্যেক যাত্রানাট্যকারই অপরের মুখ চেয়ে নাটক রচনা করেন। তাঁরা নিজেরাও হয়তো melodramaর বিশিষ্ট ভক্ত কিন্তু এই ভক্তির পেছনে তাঁদের নিজস্ব রুচিবোধ যতটা কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে যাত্রাদলের মালিক ম্যানেজার এবং অভিনেতাদের অদৃশ্য হস্ত। যাঁরা পেশাদার যাত্রাদলে অভিনয় করেন এবং করে সুখ্যাত হয়েছেন তাঁরা নাট্যকারদের নির্দেশ দেন নিজেদের মনোমত সংলাপ রচনা করতে এবং মনোমত দৃশ্যের অবতারণা করতে। এই সমস্ত অভিনেতারা হয়তো বিদগ্ধ, নাট্যরস সম্পর্কে সম্যক্ ওয়াকিবহাল। তবুও এঁরা পল্লীঅঞ্চলে সাধুবাদ কুড়োনর জন্য melodrama পূর্ণ সংলাপ চান ও অনেক সময় খোদার ওপর খোদ্‌কারি করে নিজেরাই সংলাপরচনা করে নেন। আর যাঁরা বড় বড় অপেরার মালিক তাঁরা তো melodramaর অপরিসীম অনুরাগী। তাঁরাও নাট্যকারদের নির্দেশ দেন melodramaর চড়াসুরে বাঁধা নাটক রচনা করতে। এছাড়া তাঁরা নিজেদের দলের অভিনেতার সংখ্যা ও ক্ষমতা অনুসারেও নাটক রচনার পরামর্শ দেন। এই সমস্তব্যক্তির সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান, মননশীল চিন্তাধারা এবং সুস্থ, সুমতি, সুন্দর নাট্যরস সম্পর্কে ধারণা এসবেরই অভাব দেখা যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সাহিত্যানভিজ্ঞ লোকেদের দ্বারাই আজকের যাত্রানাটক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্যপ্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আজও অবশ্য যাত্রানাটকে যৌন অশ্লীলতা দৃষ্টিগোচর নয় তবে যাত্রানাটকে অশ্লীলতা একেবারেই অনুপস্থিত এরকম ধারণা করা অত্যন্ত ভুল। আজকের যাত্রানাটক রচয়িতারা হালআমলে যেরকম অশ্লীলতা যাত্রানাটকে আমদানি করছেন তাতে শঙ্কা হয় বাংলাযাত্রানাটক আর বিলিতি কাবারে নাচ এই দুইয়ের ভেতরে পার্থক্য খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। বর্তমানে অবশ্য অশ্লীলতাকে যাত্রানাটকে উপস্থাপন করা হয় মুখ্যতঃ সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংলাপ থেকে বেশবিন্যাসেও তা সংক্রামিত হবে না তাই বা কে বলতে পারে! যাইহোক ভবিষ্যতের কথা বাদ দিই। বর্তমানের কথাই বলি। বর্তমান নাট্যকাররা অশ্লীলতা পরিবেশন করেন কৌতুকরস সৃষ্টি করতে গিয়ে। সুস্থ সুন্দর এবং নির্মল হাস্যরস আজকের যাত্রানাটকে একেবারে অনুপস্থিত। এর থেকেই প্রমাণিত হয় লেখকরা মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত এবং এদের মধ্যে সুরুচির একান্ত অভাব। স্বীকার করি তাঁরা অপেরা পার্টির ম্যানেজার বা মালিকের ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখে থাকেন। তাঁদের এই ফরমায়েশী লেখা সমর্থন করেও একথা কখনই সুস্থ মনে মেনে নেওয়া যায়না যে তাঁদের রুচিবোধকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে বাধ্য। যদি দিতে হয় তার পূর্বেই তাঁদের সভ্যসমাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। সুরুচিকে বিক্রয় করা বারাঙ্গনাবৃত্তিরই নামান্তর।

তবে? যাত্রানাটক কি ক্রমশঃই অধঃপতনের পথে তলিয়ে যাবে? বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি সবই কি বিসর্জিত হবে যন্ত্রসভ্যতা এবং রজতচক্রের কাছে? একথা তো মোটেই ভাবতে পারা যায় না যে গ্রামের লোকেরা ভালো জিনিষ নিতে চান না। মুড়ি এবং মুড়কি খেতে দিলে কেউ মুড়কি ফেলে মুড়ি খাবে—এ ঘটনা কদাচিৎই চোখে পড়ে। ভালো জিনিষ দিলে নিশ্চয়ই সব লোকই তা নিতে পারে। তবে যারা খারাপ নিয়েই অভ্যস্ত তাদেরকে ভালো জিনিষ গ্রহণ

করাতে বিলম্ব হবে এতো স্বাভাবিক। আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে তা দেখা যাচ্ছে। বাংলা যাত্রানাটকের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে না এমন ধারণা পোষণ করা আদৌ উচিত নয়।

তবে কেন আজ ভালো যাত্রানাটক রচিত হচ্ছে না? যাদের মধ্যে মননের একান্ত অভাব, গতানুগতিকতা এবং রক্ষণশীলতার পূজারী যারা তাঁদের মধ্যেই কেন যাত্রানাটক রচনা সীমায়িত থাকবে? উদারনৈতিক কোন নাট্যকার এর দায়িত্ব কি নিতে পারবেন না? যে উদারনীতি যাত্রানাটককে নিজের ভাবধারা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে মঞ্চাভিনয় কিংবা চলচ্চিত্রের দ্রব্য আত্মসাৎ করতে বলে অথবা অশ্লীলতার সাগরে অবগাহন করতে বলে আমরা তাকে প্রবলভাবে নিন্দা করি। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার একথা তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। মূল ভাবধারাকে মূল ঐতিহ্যকে বজায় রেখে, অবিচ্ছিন্ন, অক্ষুন্ন রেখে যাত্রানাটককে আজ যুগের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। গতিপ্রবণতা যে হারিয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে কুপথে ধাবিত হওয়ার গতি সেও কি মৃত্যু নয়? আজকের যাত্রানাটকের রচয়িতাকে সব সময় এই কথাই মনে রাখতে হবে। তাঁকে নাটক রচনা করতে হবে সাহিত্যের মুখ চেয়ে, সুস্থ নাট্যরসের মুখচেয়ে—যাত্রাপার্টির ম্যানেজার কিংবা মালিকের মুখ চেয়ে নয়।

অথচ আজকের দিনে ঠিক এমনটি লোকেরই অভাব। যাত্রানাটক রচনায় যারা সিদ্ধহস্ত হয়েছেন সাম্প্রতিককালে তাঁদের কাউকেই ঐ গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। অথচ মজা এই যে, তাঁরা ক্রমাগতই বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন, নাটক রজনীর পর রজনী অভিনীত হচ্ছে, বইও ছাপা হচ্ছে; সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু কোন দিক থেকে কোন রকম আপত্তি আসছে না। আজকের দিনে কোন মঞ্চনাট্যকারও আসছেন না এই দায়িত্ব নিতে, কোন মননশীল, বিদগ্ধ এবং সাহিত্যানুরাগী লোকও পারছেন না এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সবাইয়েরই যাত্রার প্রতি কেমন যেন একটু উন্নাসিক মনোভাব—একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। বিদগ্ধ লোক হয়ে যাত্রানাটক রচনা করলে হয়ত তাঁদের মান যেতে পারে। এই আশঙ্কা তাঁদের মনে বিচরণ করছে সম্ভবতঃ। কিন্তু কেন এই আশঙ্কা? যাত্রাগানটা শুধু গ্রামের লোকের জন্য শ্রেণীভুক্ত করে এবং মাঝে মাঝে তা দেখে যাত্রাগানকে ধন্য করব এই তাঁদের মনোভাব? আগের দিনে লোকেরা যেমন মাঝে মাঝে আদিরসাত্মক গান শুনতে ভালোবাসত এটা কি তারই ব্যবস্থা? যদি তাই হয় তাহলে বলব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।

প্রতিষ্ঠিত মঞ্চনাট্যকারেরা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসতে পারেন বাংলা যাত্রানাটকের এই দুর্দশার দিনে তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু তাঁরা এগিয়ে আসছেন না। অবশ্য একথা অনেকেই আশঙ্কা করেন যে বর্তমানে মঞ্চনাট্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন গভীর প্রতিভাসম্পন্ন যোগ্য নাট্যকার নেই যিনি বাংলা যাত্রানাটকের প্রধান ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখে তার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। হয়তো তাঁদের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, কারণ বর্তমানকালে যেমন কোন অশেষ গুণসম্পন্ন নাট্যকার চোখে পড়ে না, তেমন কোন মহৎ নাটকও সাম্প্রতিককালে রচিত হয়নি। কিন্তু তাই

বলে কি আমাদের এই কথা ধরে নিতে হবে যে কি মঞ্চে, কি যাত্রায় সবক্ষেত্রেই বাংলা নাটকের তথা বাংলা সংস্কৃতির দুর্দিন আসন্ন? রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকারেরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করে দেশের সংস্কৃতিকে সযত্নে পোষণ করে গিয়েছেন, স্থান দিয়েছেন বিশ্বের মধ্যে এক বিশিষ্ট আসনে সেই দেশের সংস্কৃতি আজ উপযুক্ত উত্তরসূরীর অভাবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন নৈরাশ্যবাদী হওয়া আমাদের আত্মহত্যারই সামিল হবে। বাংলাদেশের মঞ্চনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রানাটকেরও প্রসার ঘটুক—রসোত্তীর্ণ যাত্রানাটক রচিত ও অভিনীত হোক, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

অলোক সামন্ত

## নাট্যচিন্তা

বাংলাদেশের নাট্যজগত আজ একটা বিচিত্র অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আজ প্রাচুর্যের সংগে অভাব অংগাংগী ভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচুর্য নাট্যসংস্থার, অভিনেতা-অভিনেত্রীর, দর্শকের; অভাব উপযুক্ত মানের নাটকের, নাট্যকারের, অভিনেতার, অভিনয়মঞ্চের। পঞ্চাশের-দশকে বাংলা-নাট্যশালার যে অবক্ষয় সুরু হয়েছিল বর্তমানে তার বিপরীত চিত্রই চোখে পড়ে। সেদিন মনে হয়েছিল পেশাদারী নাট্যশালার দরজা বুঝি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আজ সেখানে পুরনো নাট্যশালাগুলি ছাড়াও নতুন পেশাদারী অভিনয় চলছে, সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলির প্রয়োজন মেটাতে নতুন নতুন নাট্যমঞ্চও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই আকস্মিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে মঞ্চ নির্মাণের নিম্নতম মানও উপেক্ষিত হচ্ছে। ফলে সংখ্যাধিক্য ঘটলেও গুণগত অপকর্ষই প্রবলতর।

আগের দিনে ক'টি পেশাদার নাট্যশালার প্রয়োজন মেটাতে যে ক'জন অভিনেতৃবৃন্দের প্রয়োজন হ'ত তারা ছাড়া অন্যদের নাট্যশালা থেকে অন্ন সংস্থানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ফলে অভিনেতাকে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হ'ত। ইদানীং পেশাদারী, অর্ধসৌখীন, সৌখীন এবং নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অভিনয়ের সাকুল্য সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে বহুজন আজ এইসব অভিনয় মাধ্যমে জীবিকার্জনে সক্ষম। প্রয়োজনাতিরিক্ত সুযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে বললেই হয়। তাছাড়া ভিন্নমাধ্যম চলচ্চিত্রের নামী অভিনেতাদের নামটি ব্যবহারিক প্রয়োজনে নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করছেন কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই এঁদের মঞ্চের উপযুক্ত করে নিচ্ছেন না। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অভিনয়ের মান নিম্নগামী হয়েছে।

নাটকের ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্র। বাংলা সাহিত্যের নাট্যাংশটি এমনিতেই দুর্বল তার ওপর ঝোঁক পড়েছে বেশী। ফলে নাটক প্রায় ভোজবাজির সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করছে। নাট্যকার অমিত শক্তিমান না হলে নাটকে বক্তব্য থাকলেও তার সহনীয় উপস্থাপন যে সম্ভব নয় এই সরল সত্যটাই অধিকাংশ নাট্যকার বিস্মৃত হ'ন আর তাই তাঁদের নাটক হয়ে দাঁড়ায় মেলোড্রামাটিক বাড়াবাড়ি। অবশ্য বাস্তবকে রূপায়িত করতে

গেলে এমন হয় বলেন তাঁরা। এখানে বাস্তবের সংজ্ঞা নিরূপণে তাঁরা ভ্রমে পড়েন। সংবাদপত্রের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব যেমন এক নয়, নাটকের বাস্তব আর জীবনের বাস্তব তেমনি এক হতে পারে না। দৃষ্টান্ত ধরলে কথাটা বোধ হয় স্পষ্ট হবে। জীবনের যে ঘটনা ঘটতে বহুদিন লাগে মঞ্চে তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হামেসাই ঘটছে। অর্থাৎ রামের জন্মপূর্ব ঘটনাবলী থেকে তাঁর স্বর্গারোহণ ৩।৪ ঘণ্টার নাটক দেখানে দর্শকরা আপত্তি করবে না। এই স্বীকার করে নেওয়াটাইত মঞ্চমায়ারূপ মঞ্চের প্রাণ। তাহলে বাস্তব নাটক করার নামে এই মঞ্চমায়াকে ক্ষুণ্ণ করলে নাটককেইত ক্ষুণ্ণ করা হয়।

একমাত্র আনুষংগিকের ক্ষেত্রেই কিছুটা উন্নতি দেখা যায় তবে এ উন্নতি বিশেষ করে আলোকসম্পাত তথা মঞ্চ কল্পনায় পরিলক্ষিত হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে মঞ্চের পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য আজ অন্তর্হিত প্রায়। এক সময়ে নাটকের সংগীত শুনলেই বোঝা যেত এটি নাটকের সংগীত। আজ আরো পাঁচ রকম সংগীতের সংগে এ সংগীত মিলিয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে নাটক বা নাট্যশালার অগ্রগমনের বিশেষ কোন চিহ্ন পরিস্ফুট হচ্ছে না অথচ নাটকের দর্শক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সাধারণ মঞ্চশালায় আর্থিক যে স্বাচ্ছন্দ্য আজ দেখা যাচ্ছে তা ১০।১২ বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। নাটক যদি ভাল না হয় তো দর্শকরা কেন আকৃষ্ট হচ্ছে ?

বাংলা দেশের নাট্যশালার দর্শকদের ইতিহাস অনুধাবন করলে হয় তো এ প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

বাংলা নাট্যশালার প্রথম যুগে নাটক ছিল কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—সেটি উত্তর কলকাতা। (আজকেও কলকাতার পুরোপুরি পেশাদারী নাট্যশালার সবকটিই উত্তর কলকাতায় অবস্থিত।) ফলে স্বাভাবিক কারণেই দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে একটা একাত্মতা ছিল। দর্শক নিজেদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলনই দেখতে পেত মঞ্চে। নাট্যকার ও নটরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক থেকেই চরিত্রচিত্রণ করায় এটাই স্বাভাবিক ছিল। তারপর কলকাতা সহরের প্রসার হ'ল সংগে সংগে পুরনো জমাট পাড়ায় ভাঙন ধরল, পাড়ার বাসিন্দারা ছড়িয়ে পড়ল নানাদিকে ; মঞ্চ ও তার দর্শকের একাত্মতায় চিড় ধরল।

এ অবস্থা একদিনে হয় নি। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে নাট্যশালা ও তার দর্শক এই যে আলাদা হচ্ছে তা সকলেরই চোখ এড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই বিচ্ছেদ প্রকট হয়ে উঠল। নাট্যশালারও নাভিশ্বাস উঠল। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে অবস্থা যেন চরমে পৌছল। তখন একে একে নাট্যশালার দরজায় চাবি পড়বার উপক্রম হয়েছে এবং হয়ত হতও, বাঁচিয়ে দিল দেশ বিভাগের এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববংগ থেকে দলে দলে লোক পশ্চিমবংগ বিশেষ করে কলকাতার আশেপাশে এসে জড় হ'ল। এদের মধ্যে নাটকের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সুযোগ অভাবে নিয়মিত নাটক দেখা আর হয়ে ওঠেনি। কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালায় এদের নিয়মিত গতায়াত সুরু হ'ল এবার। সর্বনাশের অতল থেকে এক মুহূর্তে সৌভাগ্যের চরম শিখরে এসে দাঁড়াল বাংলা নাট্যশালা।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দের সংগে তাল রেখে নাট্যশালার সর্বাংগীণ উন্নতি কিন্তু হ'ল না। বহিরংগের

অবশ্য প্রচুর উন্নতি ঘটল, এঁদোপড়া ভূতুড়ে বাড়ীগুলো হয়ে গেল ইন্দ্রভবন, কোথাও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ চালু হল, কোথাও মঞ্চমায়াকে ভোজবাজিতে রূপান্তরিত করা হ'ল; সংগে সংগেই অভিনেতা ও দর্শকদের আত্মিক যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হয়তো অন্তরের যোগ না থাকায় বাইরের চাকচিক্যে মানুষকে ভোলাবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হল নাট্যশালা—কর্তৃপক্ষকে। তাতে আপাতরম্য ফল লাভ সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু শেষ সর্বনাশকেও নিকটতর করা হয়েচে।

পেশাদারী নাট্যশালার ত্রুটি অর্ধশৌখীন দলের পক্ষে কাটানো সম্ভব এবং অন্যান্য অগ্রবর্তী দেশে তাই করা হয়েছে। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, এদেশে তা সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ এই সব অর্ধ সৌখীন দলের দৃষ্টি বিদেশে নিবদ্ধ, দেশের মাটির সংগে এঁদের যোগাযোগ কম তাই দেশের জনগণকে তৃপ্ত করতে এঁরা পারছেন না, চিন্তাবিদদের মধ্যে কিছুটা আলোড়ন তুলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন। কোন কোন দল তাই আধুনিকতম বিদেশী নাট্যকার বংগীকরণ বা অনুসরণ না করে এদেশের পুরানো নাটক মঞ্চায়ন করছেন। এ প্রচেষ্টার মূল্যকে অস্বীকার করছিল। কিন্তু প্রতিটি যুগও তার নিজের ঠিক পূর্ববর্তী যুগের সমস্যাবলীর রূপায়ণই প্রত্যাশা করে। বর্তমান যুগে সেটির অভাবই চিন্তার কারণ এ সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে এবং চিন্তাবিদদের এ অবস্থা দূরীকরণে ইতিকর্তব্য নিরূপণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যোগ্যতর ব্যক্তিকে সে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।। এবিষয় আরো কিছু কথা বারান্তরে বলার ইচ্ছা রইল। এ ছাড়া কোন কোন এক বিদেশী সমালোচকের স্বদেশী নাটক সম্বন্ধে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলা নাট্যশালার দোলা চলতা ও দূরীকরণের পন্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাবে।

রবি মিত্র

## অন্ধকারের বিরুদ্ধে

বেশ কিছুদিন আগে কোন এক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে জনৈক বক্তা এ যুগকে নৈতিক অবক্ষয়ের যুগ বলে অভিহিত করেছিলেন ; বলেছিলেন, আচারে, আচরণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরীর প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়গুলি একান্তভাবে নিয়োজিত হলেই আজকের এই নৈতিক অবক্ষয় রোধ সম্ভব। উৎসবে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এক খ্যাতিমান মন্ত্রী। সভাপতির ভাষণে পূর্ব্বোক্ত বক্তার বক্তব্যকে নস্যাৎ করার জন্য তিনি দেখালেন যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্কুল-কলেজের সংখ্যা, অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট ও গ্রাজুয়েট-এর সংখ্যা কী পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং দেশ শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নতির যথার্থ পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। সভাপতির ভাষণের কোন উত্তর নেই বলেই হয়ত পূর্ব্বের বক্তা বলতে পারলেন না যে স্কুল-কলেজ বাড়লেই, গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই নৈতিক অবক্ষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

স্কুল-কলেজের সংখ্যা, গ্রাজুয়েটের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে এবং বহুগুণে বেড়েছে। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু বেড়েছে যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না, দিনের আলোর মতই তা স্বচ্ছ। যে কোন বিবেকবান মানুষই আজ স্বীকার করতে বাধ্য যে এক চরম নৈতিক বিশৃঙ্খলার ঢেউ-এ আমাদের সমাজ-জীবন আজ এক সর্ব্বনাশা বিপর্যয়ের দিকে ভেসে চলেছে। এই বিশৃঙ্খলার চিহ্ন আজ সর্ব্বস্তরে পরিস্ফুট। এর প্রকাশ আজ নগ্ন ও বীভৎস। যা কিছু শোভন, যা কিছু সুন্দর, যা যা কিছু মার্জিত, সব কিছুকেই আঘাত করার কলুষিত বিকৃতি আমাদের মধ্যে প্রকট। হাতের কাছের কয়েকটি দৃষ্টান্তেই এই বিকৃতির প্রকাশ কত বীভৎস তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

যে কোন বড় পাঠাগারে কোন বিরল বই আপনি খোঁজ করুন, পাবেন, কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই অক্ষত অবস্থায় নয়, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উধাও। হয়ত এর দ্বিতীয় সংখ্যা কোথাও পাওয়া যাবে না। যে কোন বই খুলুন, অসঙ্গত, অশ্লীল মন্তব্যে কণ্টকিত।

কলকাতাকে সুন্দর করার পরিকল্পনায় কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্ত্তা একবার মেতেছিলেন পার্কগুলিকে ফুলে ফুলে ভরে দেবেন। কিন্তু 'মানুষ-জন্তু'র উৎপাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'ল, ফুল হয়ে ফুটল না।

কঠিন প্রশ্নপত্রের উত্তরে কলেজের ল্যাবরেটরি ভেঙ্গে চুরমার করা তো অত্যন্ত হালের ঘটনা সকলেই জানেন।

বৈদ্যুতিক ট্রেনের ই-এম-ইউ কোচ-এ ভ্রমণ করেননি এমন লোক কলকাতা সহর ও সহরতলীতে খুব কমই আছেন। এর মনোরম কামরাগুলি পৃথিবীর যে কোন রেলপথেরই গর্ব্ব করার মতো। এর ডানপিলো গদী, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, লাইট, ফ্যান কোন কিছুতেই ত্রুটি নেই। ঝকঝকে সুন্দর চেহারা নিয়ে গাড়ী হাওড়া বা শিয়ালদহ ছাড়ল, কিন্তু ফিরে এল সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্কের

ক্ষত নিয়ে। মাঝপথে চলন্ত ট্রেনে এই গাড়ীর রমণীয়তা যাদের পীড়িত করেছিল, তারা ছুরি দিয়ে এর গদিকে টুকরো টুকরো করেছে, এর দেয়ালে মনের অন্ধকার অশ্লীলতাকে খোদাই করেছে, আলো-বাতাস সহ্য করতে না পেরে লাইট ও ফ্যান চুরমার করেছে। একদিন নয়, দুইদিন নয়, দিনের পর দিন এই দৌরাত্ম্য সমানে চলেছে। এই দৌরাত্ম্যের আর্থিক পরিমাপ গত মে মাসে শিয়ালদহ বিভাগে দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার টাকা, হাওড়া বিভাগে ৬৭ হাজার টাকা।

এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, সমাজ-জীবনের সেই নৈতিক অবক্ষয়েরই একটি প্রকাশ মাত্র। সহরের যে কোন আন্দোলন শুধুমাত্র আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশৃঙ্খলার দাবাগ্নিতে পরিণত হয়, ব্যবসায়িক চক্রান্তে মানুষের বেঁচে থাকার রসদ যখন উধাও হয়ে যায়, ছাত্ররাও যখন গুণ্ডামির দায়ে অভিযুক্ত হয় তখন বুঝতে হবে এই বিকৃতি সমাজ-জীবনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এদেশীয় রোমিও বা বিটরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

গণতন্ত্রের সাফল্য যদি একান্তভাবে সুস্থ নাগরিকতার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে ইতিমধ্যেই এদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ, এই বিকৃতিকে আরও প্রসারিত হতে দিলে গণতন্ত্রের বনিয়াদই ধ্বসে পড়বে। এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভিত্তি করে একমাত্র যা গড়ে উঠতে পারে তা হ'ল ফ্যাসিজম। সেই অন্ধকার কোনদিনই যাতে ভারতের পবিত্র গণতন্ত্রের উপর তার অশুভ ছায়া ফেলতে না পারে তার জন্য এই মুহূর্তেই সৎ এবং সুস্থ মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে লড়াই-এ সর্বস্ব পণ করতে হবে।

**নিরঞ্জন রায়**

## বাংলা ছোটগল্প ও অতিপ্রাকৃত

অপ্রাকৃত বা অলৌকিক—কথাটা বিতর্ক সাপেক্ষ। অতি-প্রাকৃত কি? রূপকথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী বা ভূতের গল্প কি ঠিক এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে? রূপকথা বস্তুত রোমান্স-বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা স্বপ্নে, মোহে আবেগে সৃষ্ট অপরূপ জগতের কথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে তরল কল্পনাবিলাস বিবৃত হয়। লোক হতে দূরে, প্রকৃতি থেকে সরে গিয়ে সেই সৃজত জগতের মধ্যে থাকে না supernatural element-এর ভীতি শিহরণ।

মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসারের মধ্যেও একটা আদিমভীতি বর্তমান। জার্মানীতে দীর্ঘকাল ধরে 'ডাইনিতন্ত্র' উপাসনার প্রচলন—এই witchcraft এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ Foust মহাকাব্য। পরবর্তী কালে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের পরেও এই Devil and Witchcraft ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান পেয়ে থাকে। তাই এদেশে যখন ডিটেকটিভ গল্প কিশোর সাহিত্যের যোগানদার তখন বিদেশী সাহিত্যে ভূতের গল্প লেখা সহজ বা অগৌরবের মনে করা হয় না।

সাহিত্য বাস্তবের সুগ্রথিত সম্ভার। জীবনের প্রাত্যহিকতা মহিমা, ব্যর্থতা নিয়ে সাহিত্যের

বিকাশ। ছোটগল্পে জীবনের সেই খণ্ডাংশকে তুলে ধরা হয়। তাই বাস্তবের স্পর্শপ্রাপ্ত ছোটগল্প এত রসোত্তীর্ণ। কিন্তু এই বাস্তবজীবনেই আর একটি রস আমাদের রোমাঞ্চিত করে, শিহরিত করে—যাকে বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা করা যায় না। আলংকারিক না হলেও আভিধানিক অর্থে তাকে 'অতি প্রাকৃতিক রস' বলা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই এই 'অতি প্রাকৃত উপাদানে' সমৃদ্ধ।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় বৈদিক পরবর্তী যুগে—সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে নীতি উপদেশ উদ্দেশ্যে গল্প কাহিনীতে যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত পিশাচ প্রভৃতি অপ্রাকৃত পাত্র-পাত্রীর উপস্থাপন—কিন্তু সে সব চরিত্র আগাগোড়া কোন বীভৎস রস বা শিহরণমূলক অবস্থা সৃষ্টি করে না—একটা বিস্ময়বোধ শুধু জাগিয়ে রাখে। আমাদের দেশে আষাঢ় সন্ধ্যায় বর্ষণমুখর অন্ধকারে অথবা বিলাতে ডিসেম্বর জানুয়ারীর তুষারঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ নিশীথে পারলারে fire place এর উজ্জ্বল আগুনের ধারে নিঃশ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠায় ভূতের গল্প শুনতে শুনতে বাস্তবের ভরসা ছাপিয়ে জেগে উঠে ভীতিকম্পন। এই জমাটবাঁধা রস প্রাচীন গল্পে কোথায়—তাই প্রাচীন কাহিনীগুলো নীতিকথা ছেড়ে ভূতের গল্পে উন্নীত হতে পারেনি।

আমাদের বাঙালীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে অতিপ্রাকৃত ও বাস্তবের সমন্বয় যেমনই সহজ, তেমনি আমাদের বৈচিত্র্যহীন, ঘটনা বাহুল্যলেশশূন্য জীবনযাত্রায় তার সুষ্ঠ সংগতি রক্ষা দুরূহ। ইংরেজ কবি কোলরিজ কাব্যে এ উপাদান সার্থকভাবে এনেছেন, আমেরিকান গল্পকার এডগার এ্যলান পো'র গল্পে তার সূক্ষ্ম সাংকেতিক প্রবেশ, ও' হেনরীর গল্পেও তার স্পর্শ, মোঁপাসার রচনায় তারই

সিম্বলিক আন্দোলনের উদ্গাতা এলানপো'র গল্পে অতীন্দ্রিয়তার রোমাঞ্চ অনুভূত হয়, 'শ্যাডো' 'দি ব্ল্যাক ক্যাট' প্রভৃতি গল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশ অতিক্রম করে একটা অপ্রাকৃত জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়— রোমাঞ্চ, শিহরণ জাগে। আর এই সংকেতধর্মীতা সাহিত্যে, কাব্যে নতুন একটা দিগ্দর্শন করালো। অতীত আসক্তি দেখা গেল কাব্যে, গল্পেও তেমনি অতীতচারী, mystic অভিযান। দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি থেকে যে পরিবেশ মানুষের মনে উপস্থাপিত হয় তাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলা যায় না, দূরঅতীত তার স্বপ্নকাজল নিয়ে আসে রোমান্টিক নয়নে, অতি প্রাকৃতের অকল্পনীয়, অসম্ভব কার্যকলাপ সেখানে কোথায়? রোমান্টিক মনের যে সুদূর অভিসার তা একটা সৌন্দর্য সুষমাকে ঘিরে, তবু সেই মন হয়ত আরো এগিয়ে গিয়ে খুঁজে আনে আর এক ভুবনের ভাবনা—তাকে অতিপ্রাকৃত নামাঙ্কিত করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের দানে ও দাক্ষিণ্যে বাংলা ছোট গল্পের সোনার ফসল আজো অব্যাহত। সাহিত্যের এই শাখাটি আজো স্রোতস্বিনী, স্বতস্ফূর্ত। সেখানে সর্বত্র যে সফলতা আছে তা বলা যায় না, কিন্তু ক্লান্ত নিপীড়িত মনন আজো ছোটগল্পের সমাদরে সংকুচিত নয়। তবে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের প্রখরতায়, যুক্তি ও তর্কের তির্যক আলোচনায়, প্রতি মুহূর্তে নতুনতর সত্যের প্রতিষ্ঠায় 'অতি প্রাকৃত' শব্দটি আজ শুধুমাত্র অভিধানের মধ্যেই আবদ্ধ। তাই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃত উপাদান কেবলমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর পাঠকের উৎসাহদাতা।

বড়দের জন্য লেখা ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বড় ছোটগাল্পিকদের সঙ্গেই শেষ হয়েছে। (পাঠকরা একমত না হলেও একথা সত্য শ্রেষ্ঠ বাংলা ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ত্রৈলোক্যনাথ ও শেষতম পরশুরামের নামই উল্লেখযোগ্য)।

এই ভূমিকার পাদপীঠে বাংলা ছোটগল্পের শীর্ষস্থানীয় ত্রয়ী গল্পরচয়িতার গল্পে 'অতিপ্রাকৃত' উপাদান কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের যে গল্পগুলোকে অতি প্রাকৃত শ্রেণীভুক্ত করা হয়, সেগুলোর কোনোটির মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ক্ষীণ স্পর্শ থাকলেও, সত্যই রবীন্দ্রনাথ কোন অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন কিনা সন্দেহ। গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্বের গল্পের মধ্যে 'সম্পত্তি সমর্পণ' ও 'গুপ্তধন' এবং পরবর্তীকালে 'নিশীথে', 'মণিহারা', ক্ষুধিত পাষাণ', 'মধ্যবর্তিনী', ও 'কঙ্কাল'—সাধারণভাবে এইগুলোকেই অতিপ্রাকৃত লক্ষণাক্রান্ত বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃতের রোমান্টিক নির্যাসটুকুই নিয়েছেন, অতিপ্রাকৃতের রহস্যরসটির সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনা দ্বারা অন্য আর একটি সত্যকে রূপায়িত করেছেন। Fantacy and fancy are akin in origin—কিন্তু fantacy is often close to poetic in fancy. 'ক্ষুধিত পাষাণ' সম্পর্কে এ মন্তব্য সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হলেও রবীন্দ্র-ছোটগল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর যৌক্তিকতা লক্ষণীয়। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র বিষয়বস্তুর মনের মধ্যে বিকাশ আর মনেই তার বিনাশ। এ গল্পে অতিপ্রাকৃত কোন বিষয় নেই, ক্ষুধিত পাষাণ কোন কাহিনী বর্ণনা করে না, কোন প্রত্যক্ষ জগতের জীবনলীলাও ব্যাখ্যা করে না, স্বপ্নে সৌন্দর্যে মিলে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সোপান শ্রেণীতে গানের সুরঝংকার।

'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণারঞ্জনের মনের অবচেতন সত্তা থেকে জেগে উঠেছে অপরাধবোধ-সঞ্জাত একটি ভীতিকম্পন—এই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উঁচু পর্যায়ে এসে একটি সহজ সুরধর্মের পরিচয় দিয়েছে। অতিপ্রাকৃতের ভৌতিক শিহরণ 'মণিহারা'য় আংশিকভাবে এলেও ফণিভূষণের মনস্তাত্ত্বিক আকুলতাই অধিকতর ব্যাখ্যাত। 'মধ্যবর্তিনী' মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নায়ক নিবারণের অবচেতন অন্তরে শৈলবালার প্রভাব 'নিশীথে' গল্পটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের অতি প্রাকৃত চিহ্নিত গল্পগুলো আসলে যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যামূলক তার সপক্ষে রায় দেবে গল্পগুলোর অন্তর্নিহিত বস্তুপরিচয়। 'কঙ্কাল' গল্পের নামে ও উপস্থাপনে ভৌতিক গল্পের সুর পাওয়া গেলেও সর্বাংশে একটি সুন্দরী মেয়ের করুণ মনস্তত্ত্বের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'মাষ্টার মশাই' গল্পেই যথার্থ অতিপ্রাকৃতের রোমাঞ্চিত অনুভূতি পাঠকচিত্তে সঞ্চরিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে অতি প্রাকৃতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ছোট গল্পে ত্রৈলোক্যনাথকে তার পুরোধা মনে করা অযৌক্তিক হবে না। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতপ্রেত একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে—কিন্তু তাই বলে তা ভূতুড়ে গল্প নয়। মানুষের অসংগতিকে তুলনা করতে, অন্য কিছুর দৃষ্টান্ত সহযোগে সংশোধনের পথে নিয়ে যেতে এমন চরিত্রের উপস্থাপন প্রয়োজন যা মানুষের সমতুল্যের হলেও সমমর্যদাসম্পন্ন নয়। সেজন্যই ত্রৈলোক্যনাথ ভূতের আমদানী করেছেন। এই ভূত সম্বন্ধীয় উপাদান উপস্থাপনের মধ্যে কৌতুক ও ব্যঙ্গরসই সমধিক স্পষ্ট। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই

তাঁর উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প নয়। 'লুল্লু' গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করে সংবাদপত্র জগতের কাহিনী পাঠক সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছেন। শ্রীমান ঘ্যাঁঘো ভূতের সঙ্গে শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভ বিবাহ বিশুদ্ধ কৌতুকরসের যোগানদার। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূত মনে ভয় জাগায় না, বরং একটা সখ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তার বিচিত্র উদ্ভাবন, ব্যাপক কার্যকলাপ, বিকট অবয়বসংস্থান কৌতুক, আগ্রহ ও অনুধাবনসন্ধানী করে তোলে। শিহরণ নয়, শ্বাসরোধকারী শঙ্কা নয়···বিমল হাসরসের অফুরন্ত প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত নামাঙ্কিত গল্পগুলোতে কখনো ক্ষণিকের জন্য একটু শিহরণ হয়ত জাগে, ক্ষণকালের জন্য একটি অলৌকিক অনুভূতি জাগ্রত হয়, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূতকে কিছুতেই ভয় করা যায় না।

ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গেই বাংলা গল্পে আর একটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ত্রৈলোক্যনাথের জমানো গল্পের যোগ্য উত্তরসূরী, আর ছোটগল্পের সার্থক সাধক। ভাব ও ভাষা, ব্যঙ্গ ও বক্তব্যে 'পরশুরাম' একটি স্মরণীয় নাম। ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে থাকে একটি উদ্দেশ্য—কিন্তু এমন সার্থক ছদ্মনাম বিরল দৃষ্ট। উত্তর পঞ্চাশের দ্বিধা বিক্ষত রাজনীতিক জীবনে বিজ্ঞানী রাজশেখর বসুর হাতে পৌরাণিক পরশুরামের কুঠার ঝল্‌সে উঠেছে। অস্তপথগামী রাজশেখর বসুর রচনায় এই আক্রোশের ফণা লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু সেই রাজশেখর বসু—'বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন লিখিতে গিয়া কখন গল্প লিখিয়া ফেলিলাম'—তাঁর হাতে পরশুরামের সোনার কুঠার পেয়েছি—আঘাতের জ্বালা নেই, আগুনের উত্তাপ নেই—আলো আছে। পরশুরামের সেই আলো উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন গল্পে মাঝে মাঝেই এসেছে আমাদের চেনা জগতের বাইরের অধিবাসী—তারা চেনা জগতে বাস করে না, কিন্তু এ জগতেরই বিকল্প। ত্রৈলোক্যনাথের অতি প্রাকৃত পাত্রপাত্রীদের মতোই এই চরিত্রগুলো পরশুরামের গল্পেও এসেছে কৌতুকের প্রবাহে। এ প্রসঙ্গে 'ভূশণ্ডীর মাঠ' বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রেতলোকের মধ্যে তিনি বাস্তব জগতের রঙ্গকৌতুক সঞ্চার করে একটি অনন্যসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করেছেন। শিবুর তিনজন্মের স্ত্রী ও নৃত্যকালী তিনজন্মের স্বামীর অদ্ভুত দাম্পত্য জীবনের উৎকট বর্ণনা কোন অবাস্তর অলৌকিকতার পরিচয় দেয় না। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়"·········ভূশণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাতুমল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে very pleased to meet you sir না বলে পারতুম না।' 'অতি প্রাকৃত' অর্থে যদি 'যা প্রাকৃত জগতে অ-দৃষ্ট' ধরা হয় তবে 'গা-মানুষের' কাহিনীকেও নিঃসন্দেহে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এখানে অতীত রোমন্থন নয়, আগামীর রূপক রূপায়ণ, ঠিক এই অর্থে 'তিনবিধাতার মিলন সভা'ও বাস্তবাতিরিক্ত জগতের সন্ধানদাতা। 'ধুস্তরীমায়া'য় একই উৎকট রসের সরস উপস্থাপনা।

বাংলাদের শীর্ষত্রয়ী গল্পরচয়িতার রচনার মধ্যে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক উপাদান খুঁজে পেলেও তা রোমাঞ্চ সাহিত্য নয়, ভূতুড়ে কাহিনীও নয়। একান্তভাবেই বক্তব্যকে ব্যক্ত করার জন্য, মনস্তত্ত্বের মূল্যায়ণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাঙালী গল্পলেখকের সেই রোমহর্ষক, রোমাঞ্চিত, শিহরিত গল্পলেখার মানসিকতা নেই—তাই বড় ছোটগল্প লিখিয়েরাও পারেননি, আধুনিক লেখকরাও সফলতা অর্জনে অক্ষম।

ভারতী সরকার

**ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন রায়** ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২ ॥ ছয় টাকা ॥

'পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন বাংলা দেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নব জাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। এ দেশের মানুষ তখন ভারতের অতীত সাধনার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে বসেছে; পাশ্চাত্য জগতের মহতী চিন্তাধারার সঙ্গেও যোগ স্থাপন করতে পারে নি তারা। শুধু পৌরাণিক সংস্কারের অন্ধ তমসার মধ্যে তারা তখন ঘোরপাক খেয়ে মরছিল। রামমোহন এসে এই সর্বনাশা অন্ধকারের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেন।'

দীর্ঘকালের রাজনৈতিক তৎসহ সমাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে, বৈদেশিক উপদ্রব, নানাবিধ আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ পরন্তু রাজা-জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে ক্ষয়িত সমাজজীবন, গ্রামের দারিদ্রপীড়িত আদমরা জনসাধারণ যখন হালভাঙা তরণীর যাত্রীর মত অজানা উদ্দেশে ভেসে চলেছিলো, বিদেশী বণিকের দল যে সময়ে সুযোগ বুঝে আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির উদগ্রলোভে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে শুধু উৎপীড়নের পথে নিজেদের সংগ্রহভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিতে সর্বদা উৎসাহী সদা তৎপর ছিল—সেই সংকটকালে আবির্ভাব রামমোহনের। 'এক অজন্মার কালে জন্মেছিলেন রামমোহন—তৃণলতাগুল্মের সমাজে বলিষ্ঠ বনস্পতি। দেশের মরামাটিতে তখন সুস্থ জীবনের সঞ্জীবতা নেই, জীবনে নেই প্রাণের বন্যা প্রাণে নাই চৈতন্যের বহ্নিকণা। অচেতচিত্তের অভিশাপ নিয়ে ব্যক্তিমানুষ তখন মরণদশায় ধুকছে। আর গোষ্ঠীমানুষের পরিণতি ছিলো শুধু অপরিমিত সংখ্যার যোগফলে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের যুক্তিসম্মত সম্বন্ধবিন্যাসে নয়। অনৈক্যের রন্ধ্রপথে সামাজিক শক্তির সঞ্চার হয় না, আরোপিত ঐক্যও অস্থিজ দৌর্বল্যের জন্যেই নঙর্থক—একমাত্র শ্রেণীগত সংঘাত-সংযোগে পরিবর্তমান ও প্রাণবান সমাজধারায় শক্তির স্ফুরণ। সেদিনের বাঙলার সমাজে তা ছিলো না আর ছিলো না বলেই অন্ধ তামসিকতা ও অপবিদ্যার আধিপত্য ছিলো ...... এমনি দিনে রামমোহন এসেছিলেন—পায়ের তলায় মানবতার শক্ত মাটি, পশ্চাতে আত্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ড, সামনে সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট, অন্তরে কঠিন সাধনার আস্থা, বাহুতে অফুরন্ত কর্মশক্তি নিয়ে। তাঁর কণ্ঠে ছিলো নৈয়ায়িক তার্কিকতা, দৃষ্টিতে ছিলো অর্বাচীন বিজ্ঞানবুদ্ধি। পরিবর্তনের অনিবার্যতায় তাঁর সন্দেহ ছিলো না, ইতিহাসের রূপরেখা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর পুরুষার্থ যুগধর্মের অনুকূলতায় দ্বিধা করেন নি। এমনি করে জাতির প্রাণ-পিপাসায় নতুন ভাবের জোয়ার বইয়ে ছিলেন রামমোহন—এ যুগের ভগীরথ।' (—সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ। প্রথম পর্ব। জীবেন্দ্র সিংহরায়। পৃঃ ৫৫-৫৬)

যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের রাজনৈতিক মানসিকতা কীরকম ছিল সেটা লক্ষ্য করলে জানা যায় : 'রামমোহনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঔদার্য, বাস্তববোধ ও ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে জীবনের পরিধি বিস্তারের যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি ছিলো, তা তিনি বুঝেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব তাঁর চোখের সামনে সাম্য ও স্বাধীনতার এক অদৃষ্টপূর্ব দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। আমেরিকার স্বাধীনতার আন্দোলন পরাধীনতার অভিশাপ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করেছিলো, সন্দেহ নেই। তুরস্কের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রীসের প্রতি সহানুভূতি ও নেপলস্‌বাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশে তিনি কার্পণ্য করেননি। ইংলণ্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লাভের ঘটনায় তাঁর আনন্দ হয়েছিলো; স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রামমোহন আন্দোলন করতে দ্বিধা করেন নি। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীর জন্য নানা অধিকার অর্জনের বিষয়েও তিনি ছিলেন তৎপর। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে তিনি বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন—কারণ ইংরেজ জাতি নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভক্ত, সামাজিক সুখবিধায়ক, নিরপেক্ষ সাহিত্য ও ধর্মজিজ্ঞাসার অনুরাগী। সবচেয়ে বড়োকথা, ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা, বৈষয়িক সমৃদ্ধির সুযোগ।' ( সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ। প্রথম পর্ব। ) ধর্ম-সংস্কারের পাশাপাশি বাস্তব সামাজিক সমস্যার প্রতি সেজন্যই রামমোহনের অভিব্যক্তি আশ্চর্য রূপ লাভ করে তাঁর চিন্তায় ও কর্মে : 'I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well calculated to promote their political interest......It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantages and social comfort.' ভারতে শিল্প-বিপ্লব সাধনের পটভূমিতে রামমোহন রায়ের উপযুক্ত চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রবাহ সর্বদা সক্রিয় ছিল।

তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক শাসনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-প্রধান দেশে এক মহত্তম ও বৃহত্তম পরিবর্তনের যুগ সূচিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের যুগে আবহমানকালের প্রচলিত স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত লাগে, নতুন যুগের। এবং সেই নতুন যুগের পথপ্রদর্শক—ধারক এবং বাহকরূপে সমস্ত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় রাজা রামমোহনকে।

সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য বেদখল হবার আশঙ্কায় ভারতের মাটিতে অপর কোনো প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে পা রাখতে দিতে রাজী নয়—অন্যপক্ষে, দেশীয় জমিদারকুল শ্রমের বিনিময়ে যে উপার্জন করা সম্ভব সেকথা বেগার দিতে অভ্যস্ত জনসাধারণকে বুঝতে দিতে রাজি না হওয়ায়—গ্রামাঞ্চলে বৈদেশিক তথা কোন বণিককেই প্রবেশাধিকার দানে সম্মত হয়নি—বিশেষত এই উভয়ের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে সংগ্রামে রত—রামমোহন এবং তাঁর সাথী অনুচর উনিশ শতকের আর একজন কীর্তিমান প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বলা বাহুল্য, রামমোহনের পরে সেযুগের বাংলার সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেশভক্ত ছিলেন তিনি।

('উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রতিটি সমস্যার সমাধানে দ্বারকানাথ সে যুগের পুরোগামীদের অন্যতম।…এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে দ্বারকানাথের সাহচর্য না পেলে রামমোহনের বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। রামমোহনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল দ্বারকানাথ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিটি সংস্কার প্রচেষ্টায় রামমোহনকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন' (-সূচনা)।) যদিও জমিদারী দ্বারকানাথ প্রভৃতিরও ছিলো তথাপি নতুন যুগ বিবর্তনের পদধ্বনি তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন—এবং সে যুগকে আবাহন করে আনতে—ক্ষয়িষ্ণু মৃতপ্রায় জনজীবনে নতুন হাওয়া নতুন রক্তের সঞ্চার করতে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে দু'হাতে ঠেকিয়ে রুখে দাঁড়াতে রামমোহন এবং তিনি বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হননি। 'ইংরেজরা দলে দলে এসে পঙ্গপালের মত এ দেশের মাঠ উজার করে ফসল খেয়ে যাক এ সর্বনাশী কল্পনা রামমোহনের মাথায় কখনো আসেনি, আসা সম্ভবও ছিল না। ভারতবর্ষের অবনতি দেখে তিনি দুঃখে ও ব্যথায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বমানব সভায় তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান ও কর্ম। তিনি স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধীনে এসে গেছে। দেশ তখন শতধা বিভক্ত।…এই সময়ে রামমোহনের আবির্ভাব। ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়ানোর শক্তি তখন এ দেশের লোকের বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই রামমোহনেরও ছিল না। এ দেশের লোক তখন এক দিকে ইংরেজের পদলেহন করছে, অন্যদিকে ক্লীবের মত মনে মনে ব্যর্থ বিদ্বেষ পোষণ করছে। শক্তির প্রতীক স্বরূপ ইংরেজ এ দেশে এসেছে, সেই শক্তি ভারতের কল্যাণকর হবে কিনা, ইংরেজকে দিয়ে সেই কাজগুলো কি করে করিয়ে নেওয়া যায় ভারতের উন্নতির জন্যে—এ সবের বিন্দুমাত্র ধারনা ছিল না এদেশবাসীর।……সেই বন্ধ্যা সামাজিক অবস্থার মধ্যে দেখা দিলেন ঐতিহাসিক-চেতনাসম্পন্ন রামমোহন রায় ও তাঁর সহকর্মী ঐতিহাসিকবোধসম্পন্ন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সচেতনভাবে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এই দুই জন, ভারতবর্ষের নৌকা যা বদ্ধ জলে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তাঁদের জ্ঞানের ও কর্মের গুণ দিয়ে টেনে নিয়ে বিশ্বের স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। ইংরেজ বণিক এসেছিল অর্থের জন্যে, পরমার্থের জন্য নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কি করে ইংরেজদের উপস্থিতিকে ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে সেইটে ছিল রামমোহনের ও দ্বারকানাথের সাধনার বিষয়।' তৎকালীন ভারতবর্ষের অনিবার্য সমাজব্যবস্থা তৎসহ আর্থনীতিক দুর্দশার পট-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের অবদান ইতিহাস বিধৃত; দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই দুই পুরোগামী তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে বদ্ধজলে আবদ্ধ নৌকোর মত দাঁড়িয়ে থাকা অক্ষম ভারত-জীবনে জোয়ার আশা আবশ্যক, জোয়ার আনয়ন করা কর্তব্য, পটপরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'তাকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে শক্তি দরকার সেই শক্তি ইংরেজ জাতির কাছ থেকে আহরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না'—সে জন্যই এই দেশে ইংরেজের আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজের উপস্থিতিকে দেশের উন্নতির কাজে কী করে সদ্ব্যবহার করা যায় তা নিয়েই রামমোহন এবং দ্বারকানাথ অক্লান্ত আন্দোলন চালিয়েছেন, গবেষণা

করেছেন, জনমত গঠনে আর্থনীতিক বিপ্লব সাধনের বীজ রোপন করেছেন। এবং যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ভারতবর্ষে থেমে থাকা জীবনে কিঞ্চিৎ, উত্তরণ, শিল্প-বিপ্লব সাধন, জনমানসে চিন্তা ও কর্মপ্রবাহে এক আশ্চর্য্যগতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে উনিশ শতকের ভারতের সেই সমাজনৈতিক ও আর্থনীতিক জাগরণের কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিপুণ ভাবে বিধৃত করেছেন।

সে যুগের ইতিহাসের নির্দেশকে অমান্য করেননি রামমোহন। এবং তারই পাশাপাশি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বারকানাথ। এই দুই অসামান্য পুরুষ সে যুগে ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন। যদিচ আজকের আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি তৎসহ ইংরেজ শাসনের প্রতি বর্তমান মানসিকতার ব্যবধান সেদিনের তুলনায় আকাশ পাতাল, তথাপি রামমোহনের কালের ইতিহাস-নির্দেশিত, রামমোহন-দ্বারকানাথ পরিক্রমিত পথের ঠিকানা যুগ-নির্ভর ইতিহাস নির্দেশ ছিল। শ্রদ্ধেয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যুগ-নির্ভর সেই ইতিহাস-নির্দেশ উপযুক্ত এবং নতুনতর তথ্যাদি সহযোগে বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আলোচনার রীতির পরিচয় নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই ; তাঁর বাগ্মীসুলভ প্রকাশ পদ্ধতি সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে। এবং এ ক্ষেত্রে, আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর ব্যতিক্রম নেই। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা যুক্তি নির্ভর ; এবং যদিচ আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর অসদ্ভাব নেই তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর একান্ত বিশ্লেষণ এবং যুক্তির জাল রচনা একেবারে তর্কাতীত নয়।

'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' পাঠে উৎসাহী পাঠক তৎকালীন সমাজ জীবন সম্পর্কিত বহু নতুনতর তথ্যাদির সন্ধান পাবেন। উল্লেখ্য, বর্তমান গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ঠাকুর তৎকালীন সমাজশাসন, জমিদারকুল, নীলচাষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে অনেকের প্রথাসিদ্ধ প্রচলিত ধারণা ও সংস্কার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন বিশেষত নীলচাষ ও নীলকর প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। নীলচাষ প্রবর্তনে দেশে দুর্দশা বেড়েছিল, বৈদেশিক অত্যাচার প্রকট হয়েছিল সে কথা সুবিদিত ( অন্তত নীল দর্পণ পাঠের পর ) ; কিন্তু নীলচাষে দেশের তৎকালীন আর্থনীতিক পরিবিকাশ যে সাধিত হয়েছিল সেকথাও ইতিহাস-প্রমাণিত। 'মূল্যবান তথ্য যেটা নীলকরদের অত্যাচারে কাহিনী দিয়ে ঢাকা দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে আর যেটা দ্বারকানাথের সত্যনিষ্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে পারলুম সেটি হচ্ছে এই যে নীল-চাষের ফলে গাঁয়ের চাষী আর মধ্যবিত্ত দুই-ই লাভবান হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের 'বঙ্গদূত' পত্রিকার একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : '...নীলের কুঠী হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন হওয়ায় তালুকদারদের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপি-বাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহারা অন্যান্য বিষয়কর্ম করিতে অক্ষম তাঁহারা কুঠীতে চাকরী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন পরন্ত প্রজাগণের পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রা অর্জনে যাহারা অক্ষম ছিল তাহারা নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ ক্ষেত্র করিয়াছে এবং মজুরলোকদিগের এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্বে যাহারা সমস্ত দিবা শ্রম করিয়া তিন পণ কড়ি উপার্জন করিতে পারেন নাই

তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্যন্ত আহরণ করিতেছে।'

এবং সমকালীন আর একটি পত্রিকা সম্বাদপ্রভাকরের উক্তির চিত্রবৈপরীত্য পাশাপাশি অনুধাবন যোগ্য : 'নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ লিখিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নের বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীলপ্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন।...এই উভয়েই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে ; নীলকর তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য করেন।' উৎকলিত মন্তব্যাবলী থেকে নীলচাষ প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগরিত হতে পারে। 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে সে সম্পর্কে যে আলোকপাত করা হয়েছে তা পাঠকের নিজস্ব মতামত গঠন ও বিচারে সহায়তা করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে, গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। গ্রন্থটির সর্বাংগ জুড়ে শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকায় রামমোহন অপেক্ষা দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রভাবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—মনে হতে পারে যে রামমোহন সে ক্ষেত্রে যেন কিঞ্চিৎ গৌণ। গ্রন্থটির নাম 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব' হলেও হয় তো কোনরকম ক্ষতি ছিল না। বাংলা জাগরণের নেতা রাজা রামমোহন ও উনিশ শতকীয় সামাজিক তৎসহ আর্থনীতিক বিবর্তনে আগ্রহী উৎসাহী ও জিজ্ঞাসু পাঠক বর্তমান গ্রন্থ পাঠে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জা মনোরম।

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

N

*more* DURABLE
*more* STYLISH

**SPECIALITIES**

***Sanforized :***

**Poplins**
**Shirtings**
**Check Shirtings**
**SAREES**
**DHOTIES**
**LONG CLOTH**

***Printed :***

**Voils**
**Lawns Etc.**

*in Exquisite Patterns*

**MILLS LTD.**

**AHMEDABAD**

দ্বাদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭১
সমকালীন

# পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহের উন্নয়ন

জাতীয় শক্তি গড়ে তুলতে, সেই সঙ্গে দেশের আর্থনীতিক উন্নতি সাধন করতে চাই সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। এ কথা মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

## ॥ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ॥

| | ( ১৯৪৮ ) | | ( ১৯৬৩ ) | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শয্যা | সংখ্যা | শয্যা |
| **হাসপাতাল** | ৩৩৩ | ১৭,৪৬১ | ২৬৬ | ২৫,৪০৪ |
| **স্বাস্থ্যকেন্দ্র** | ৩ | ১২ | ৫৯৬ | ৪,৮৩২ |
| **চিকিৎসালয়** | ১৪৯ | ৭৬ | ৬০৯ | ১৮১ |
| **ঔষধালয়** | ৭১৬ | — | ৫৬৮ | — |
| মোট— | ১,২০১ | ১৭,৫৪৯ | ২,০৩৯ | ৩০,৪১৭ |
| **শহরে** | ৩০২ | ১১,৪৫২ | ৫৭২ | ১৯,১০৮ |
| **গ্রামাঞ্চলে** | ৮৯৯ | ৬,০৯৭ | ১,৪৬৭ | ১১,৩০৯ |
| মোট— | ১,২০২ | ১৭,৫৪৯ | ২,০৩১ | ৩০,৪১৭ |

## ॥ হাসপাতাল ও ঔষধালয়ে রোগীদের চিকিৎসা ॥

| | ( ১৯৫২ ) | ( ১৯৬৩ ) |
|---|---|---|
| **বহির্বিভাগ—** | ৫২,৩৩,৬৮১ | ১,০৫,৭৩০০০ |
| **অন্তর্বিভাগ—** | ৩,২৭,৩৫২ | ৬,৬২,৮১০ |
| মৃত্যুহার ( প্রতি ১০০ জনে ) | ৪·৬৬ | ২·৬৪ |

### ॥ আয়ু প্রত্যাশা ॥

| | |
|---|---|
| ১৯৩১ ( আদমসুমারি )— | ২৪·৮৬ বৎসর |
| ১৯৪৯ ( পথদেশক সমীক্ষা )— | ৩৫·৬০ বৎসর |
| ১৯৬০ ( পথদেশক সমীক্ষা )— | ৪৮·১৩ বৎসর |

### ॥ মাথা পিছু ব্যয় ॥

| | |
|---|---|
| ১৯৪৬—৪৭— | ৯৫ পয়সা |
| ১৯৪৮—৪৯— | ২ টাকা ২২ পয়সা |
| ১৯৬৩—৬৪— | ৪ টাকা ৩২ পয়সা |

## ॥ চিকিৎসকের সংখ্যা ( ১৯৬১ সালের আদমসুমারি ) ॥

শহরে— ১১,৭২০     পল্লী অঞ্চলে— ৮,৫১১

## ॥ জন্ম ও মৃত্যুহার ॥

| | ১৯৪৮ | ১৯৬৩ |
|---|---|---|
| জন্মহার— | ২১·৩ | ১৮·৮ |
| মৃত্যুহার— | ১৮·১ | ৭·৫ |

**সুন্দর ও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যই দেশের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের কাজে প্রেরণা জোগায়**

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-11

# নিয়মাবলী

**প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা**

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ **ফোন : ২৩-৫১৫৫**

দ্বাদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

স

ভাদ্র তেরশ' একাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন্, এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভাদ্র
তের'শ একাত্তর

দ্বাদশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

# ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দ কুমারস্বামী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সিংহল দেশের কলম্বো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দের পিতা সার মুথু কুমারস্বামী কলম্বোর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যাইয়া ভারতীয় বংশোদ্ভবদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল হইবার গৌরব অর্জন করেন। সার মুথু সিংহলের বিধান সভার একজন সদস্যও ছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম 'নাইট্' উপাধি প্রাপ্ত হন। সার মুথু দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী 'মুদালিয়র' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এই পরিবার দীর্ঘকাল যাবৎ সিংহলেই বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কয়েকটি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতিকালে সার মুথু এলিজাবেথ ক্লে বিবি নাম্নী এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সাতিশয় সংস্কৃতিসম্পন্না ও শিল্পরসজ্ঞা ছিলেন। এই ইংরাজ খৃষ্টান মহিলার গর্ভেই আনন্দ কুমারস্বামীর জন্ম হয়।

আনন্দের জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই তাঁহার গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। হৃত স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত শিশু আনন্দকে লইয়া তাঁহার মাতা ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে কিছুদিন পর সার মুথুও ইংল্যাণ্ডে গিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত মিলিত হইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাতার সহিত আনন্দের ইংল্যাণ্ড যাত্রার কিছুকাল পরই সার মুথু সিংহলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর আনন্দের বিদুষী জননী স্বয়ং আনন্দের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের Glou estershire অঞ্চলের Stonehouse নামক পল্লীর Wycliffe কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া আনন্দ লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব

লাভ করেন। পরে ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টর অফ সায়েন্স" ডিগ্রী অর্জন করেন। যৌবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ কুমারস্বামী নানা বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখা আরম্ভ করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহল গভর্ণমেণ্টের অধীনে ধাতু সমীক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদলাভ করিয়া ( Director, Minerological Survey ) আনন্দ কুমারস্বামী সিংহলে প্রত্যাবর্তন করেন। তিন বৎসর কাল অতি যোগ্যতার সহিত তাঁহার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করের। সরকারী কার্য উপলক্ষ্যে সিংহলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আনন্দ সিংহলের ধ্বংসপ্রায় শিল্প নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া যান। এই শিল্প নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং এই ভাবেই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীই মূলতঃ ভারতের সন্তান, আনন্দ কুমারস্বামী সিংহলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পিতৃপুরুষও ছিলেন ভারতবাসী। সিংহল ও ভারতের সভ্যতার উত্তরাধিকারী বোধে তিনি এই সময় হইতেই গর্বিত বোধ করিতে থাকেন। কুমারস্বামী সিংহলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যে শিক্ষিত সিংলহীগণ তাঁহাদের ঐতিহ্য ভুলিয়া প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণেই তাঁহাদের জীবন ব্যয়িত করিতেছেন। সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ফিরাইয়া আনার জন্য আনন্দ Ceylon Reform Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন এবং নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। জাতীয় ভাবধারার প্রচার, জাতীয়ভাষার উন্নতি ও তদ্দ্বারা শিক্ষাবিস্তার এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই সমিতি ও সমিতির সভাপতি কুমারস্বামীর অক্লান্ত চেষ্টায় সিংহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আনন্দকুমার স্বামী প্রথমে পিতৃভূমি ভারতে আসিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন ( ভারতের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন হন। ইহার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ভারতচর্চার জন্য "ইণ্ডিয়া সোসাইটি" প্রধানতঃ কুমার স্বামীর চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে কুমারস্বামী পুনরায় ভারতে আসেন এবং দীর্ঘকাল এই দেশে অবস্থিতি করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত কুমারস্বামীর বিশেষ পরিচয় স্থাপিত হয় এবং দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুর পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিতও কুমারস্বামীর বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। উভয়ের এই সৌহার্দ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। কবিগুরুর আমন্ত্রণে কুমারস্বামী কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও অবস্থান করেন। কুমারস্বামীর ভারতবাসকালে বাঙ্গালাদেশে শ্রীঅরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র পাল-সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতীয় সভ্যতার একান্ত অনুরাগী কুমারস্বামী স্বভাবতঃই এই আন্দোলমের অন্যতম ধারক ও প্রবক্তারূপে পরিগণিত হন। এই সময়ে তাঁহার বক্তৃতাদি ও রচনাবলীতে ভারতীয় আন্দোলন পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সময়ে তিনি জাতীয়শিক্ষা

ও জাতীয় ঐতিহ্য চেতনা সঞ্চারের জন্য নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, Y. M. C. A., ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ অরিয়েন্টেল আর্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বহু ভাষণ দান করেন।. এই সময়ে তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করেন। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে একটি বিরাট প্রদর্শনী হয়, কুমারস্বামী এই প্রদর্শনীর কলা শাখাটি সংগঠন করেন। কুমারস্বামী জন্মসূত্রে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হইলেও ভারতবাসকালে তিনি হিন্দুধর্মের প্রবল অনুরাগী হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কোন বৈষ্ণব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ প্রদর্শনী পর কুমারস্বামীর অভিপ্রায় ছিল যে তাঁহার সংগৃহীত শিল্পবস্তুগুলি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী সংগ্রহালয় স্থাপিত হউক। এই উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল না হওয়াতে এইগুলি তিনি Denman W. Ross নামে আমেরিকান যুক্ত রাষ্ট্রের Boston Museum of Fine Arts এর একজন ন্যাস-রক্ষককে ( Trustee ) অর্পণ করেন। Denman Ross অমূল্য সম্পদগুলি বোষ্টন মিউজিয়ামকে দান করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুমারস্বামী পর্যায়ক্রমে ভারত ও ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া শিল্প ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন এবং ভারত ও ইউরোপের নানাস্থানে ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা সম্বন্ধে বহু ভাষণ দান করিয়া প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন মিউজিয়ম ডেনম্যান রস এর নিকট হইতে কুমারস্বামী কর্তৃক ভারতে সংগৃহীত ধাতব মূর্তি, জৈনধর্ম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, রাজপুত ও মুঘল যুগের অমূল্য চিত্রাবলী প্রভৃতি উপকরণগুলিসহ মিউজিয়মে একটি ভারতীয় বিভাগ প্রবর্তন করিতে মনস্থ করেন। এই সমস্ত অমূল্য শিল্প সম্পদ বিন্যস্ত করা, তালিকাভুক্ত করা এবং উহাদের যথার্থ মূল্যায়ণ দ্বারা ঐ গুলির পরিচয় বিশ্ববাসীর গোচর করার উপযুক্ত পাত্র বিধায় মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ আনন্দ কুমারস্বামীকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আনন্দ কুমারস্বামী বোষ্টন মিউজিয়মে যোগদান করেন। তাঁহাকে প্রথমে মিউজিয়মের ভারতীয় ও দূরপ্রাচ্য বিভাগের 'রিসার্চ ফেলো' ও পরে অধ্যক্ষ ( Curator ) নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুমারস্বামী এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর আনন্দ কুমারস্বামী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন সন্নিহিত Needhum নামক স্থানে গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিতে থাকেন। কুমারস্বামী আমেরিকায় অবস্থিতিকালে Dona Louisa Runstein নাম্নী একজন আর্জেণ্টাইন রমণীকে বিবাহ করেন। কুমারস্বামীর এক পুত্র এই বিদুষী রমণী কুমারস্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী ছিলেন। রাম কুমারস্বামী ভারতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহার সহিতও বহু ভারতীয়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আনন্দ কুমারস্বামী রচিত মধ্যযুগের সিংহলী শিল্প বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ পুস্তক প্রকাশিত হয় ( ১ ) এই পুস্তকে কুমারস্বামী প্রতিপন্ন করেন যে ভারতীয় সভ্যতাই সিংহলী শিল্পের উৎস। শিল্প সম্বন্ধে কুমারস্বামীর সুপরিচিত একটি মত ছিল যে শিল্পীর শিল্প কর্মের পশ্চাতে একটি ভাব কাজ করিতে থাকে। এই ভাবটির ভিত্তিভূমি সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান, বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যের সূত্রটি শিল্পীর চেতনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

শিল্প সম্বন্ধীয় এই প্রথম গ্রন্থটিতেই কুমারস্বামী এই মতটি ব্যক্ত করেন। কুমারস্বামীর এই পুস্তকটি শিল্প রসিক ব্যক্তিগণ কর্তৃক সাতিশয় সমাদৃত হয়। ভগিনী নিবেদিতা এই পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

এই বৎসরই আনন্দ কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প কলার আদর্শ সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন ( ২ ) পর বৎসর কুমারস্বামী জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে কতকগুলি নিবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তাঁহার বক্তব্য ছিল যে জাতিয় লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মোন্নতি, বৃহৎ কিছু প্রাপ্তির আশায় নহে বড় হইবার জন্যই আত্মোন্নতি আবশ্যক ( ৩ )। এই সময়েই কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্পিদের সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন ( ৪ )। ইহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকটি নিদর্শন ও ব্যাখ্যান সহ কুমারস্বামী একটি পুস্তক প্রকাশ করেন ( ৫ )। অনুরূপ আর একটি পুস্তক দুই খণ্ডে ১৯১০-১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় ( ৬ )। ইহার পর কুমারস্বামী কৃত বিশ্বকর্মা নামে একটি পুস্তক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয় ( ৭ )। এই পুস্তকে ভারতীয় ভাস্কর্য, বাস্তু শিল্প ( Architecture ), চিত্রকলা, হস্তশিল্প প্রভৃতির আলেখ্য ও এতৎ সম্বন্ধীয় মনোজ্ঞ আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়। কুমারস্বামীর ভারতীয় শিল্পকলার ব্যাখ্যান ভারতীয় শিল্প সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া ভারতীয় শিল্প সাধনাকে তাহার যথাযথ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। উত্তর প্রদেশে প্রদর্শনীর জন্য রাজপুতানা ও পাঞ্জাব হইতে কুমারস্বামী প্রচুর চিত্র সংগ্রহ করেন। এই চিত্রগুলি খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু চিত্র শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত হয়। এই চিত্রগুলি ও ইহাদের ব্যাখ্যাসহ কুমারস্বামী রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করেন ( ৮ )। সমগ্র বিশ্বের কলারসিকগণ কুমারস্বামীর এই পুস্তকটিকে অভিনন্দিত করেন। রাজপুত চিত্রকলা বর্তমানে ভারতীয় শিল্পকলা'চর্চার ইতিহাসে একটি গৌরবজনক স্থানের অধিকারী হইয়া আছে। রাজপুত চিত্রকলাকে জগতে পরিচিত করার ব্যাপারে কুমারস্বামীই সর্বপ্রথম অগ্রসর হন।

শুধু রাজপুত চিত্রকলা নহে সমগ্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এক কথায় ভারতীয় শিল্পকলাকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করিয়া ভারতীয় সভ্যতার মহিমা উদ্ঘাটনে কুমারস্বামীর দান অতুলনীয়। কুমারস্বামীর সমসাময়িককালে ই. বি. হ্যাভেল ( E.B. Havell, 1861—1934) ভারতীয় শিল্পের মর্ম অনুধান করিয়া ভারতীয় শিল্পের মহিমা প্রচারে ব্রতী হন। হ্যাভেলের ভারত-শিল্প মহিমা প্রচার প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে আবেগ প্রণোদিত ছিল ; কুমারস্বামী ভারতশিল্পের মহিমা প্রচারে আবেগের আশ্রয় লন নাই। ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়া তিনি ভারতশিল্পের মহিমা বিচার বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা সহকারে ইউরোপ আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বে অজস্র পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করিয়া যান। কুমারস্বামী বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীতশাস্ত্র, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনেও তিনি লব্ধ প্রবেশ ছিলেন। বহুমুখী পাণ্ডিত্য সম্পন্ন কুশাগ্রধী কুমারস্বামী শুধু ভারতীয় শিল্প নহে ভারতীয় সাহিত্য ও সঙ্গীতেরও একজন নিপুণ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ভারত শিল্পের

মর্মোদ্ঘাটনে পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন; পরবর্তীকালে তিনি একান্তভাবে ভারতীয়শিল্প ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণভাবে ভারতীয় সভ্যতার নিগূঢ় মর্ম ব্যাখ্যাতারও ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রতীচ্যদেশে ভারত সভ্যতার মর্মবাণী প্রচার করিয়া তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হন এবং বহুলতাকে। সাফল্য লাভ করেন প্রাচ্যসভ্যতার মর্মবাণী প্রতীচ্য জগতে প্রচার দ্বারা প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে মৈত্রী ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করিতে কুমারস্বামীর এই প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। প্রথম জীবনে কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার ব্যাখ্যাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শেষ জীবনে এই সূত্রেই জগতের একজন প্রমুখ চিন্তানায়ক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ রূপে পরিগণিত হন। প্রাচীন ভারতবাসী জীবন সংগ্রামের মধ্যেও শান্তি ও সম্প্রীতির সহিত বাস করিবার রহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই রহস্যের মর্ম বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করিয়া কুমারস্বামী সমগ্র মানবজাতিকে একই মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যেও ইউরোপ আমেরিকায় বহু বক্তৃতা দান করেন এবং বহু পুস্তক রচনা করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুমারস্বামী বোষ্টন মিউজিয়মে কর্মরত ছিলেন। তিনি সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত স্নানাহারের সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময় বিদ্যাচর্চা করিতেন। কুমারস্বামীর ৬৫তম জন্মদিবসে আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কুমারস্বামী রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাতে পঞ্চশতাধিক রচনার উল্লেখ আছে। ইহার পর কুমারস্বামী আরও পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেও বহু পুস্তক তাঁহার দ্বারা রচিত হয়। সুতরাং কুমারস্বামীর সমস্ত রচনাবলীর পরিচয় প্রদান দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে তাঁহার আর কয়েকটি মাত্র রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিশ্বের অনন্তসৃজনী লীলাই শিবনৃত্যের মাধ্যমে রূপকের আকারে বিধৃত হইয়াছে এই ব্যাখ্যান সহ কুমারস্বামীর একটি প্রবন্ধ পুস্তক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয় (৯)। বোষ্টনের চারুকলা সংগ্রহালয়ের (Museum of fine Arts, Boston) ভারতীয় শিল্প নিদর্শনগুলির সচিত্র ও মনোজ্ঞ বিবরণও কুমারস্বামী চারিটি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করেন (১০)।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ভারতীয় ও ইন্দোনেসীয় শিল্পের ইতিবৃত্ত কুমারস্বামীর আর একটি যুগান্তকারী রচনা (১১)। কুমারস্বামী রচিত আর কয়েকটি পুস্তকের নামও নিম্নে দেওয়া হইল (১২-৩৪)। পুস্তকের নামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কুমারস্বামীর গভীর মনীষা ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিধি সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। কুমারস্বামী জগতের বহু বিদ্বৎসংস্থার সম্মানিত সদস্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। নানা প্রশ্ন সমাধানের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তাঁহার সহিত কিছু ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিত অথবা পত্র লিখিত। কুমারস্বামী দীর্ঘায়বয়ব-সম্পন্ন সৌম্যদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। এই সদালাপী মানবপ্রেমিক মনীষীর সান্নিধ্যে আসিলে যে কোন ব্যক্তিই অন্তরে শান্তিলাভ করিত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলম্বো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও ভারতের নানাস্থানে কুমারস্বামীর জয়ন্তী উৎসব সাতিশয় আড়ম্বরসহ উদ্‌যাপিত হয়। কুমারস্বামীর ইচ্ছা ছিল যে পর বৎসর কর্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি ভারতে আসিবেন

এবং হিমালয়ের একটি নিভৃত অঞ্চলে হিন্দুধর্মসম্মত বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। কুমারস্বামীর এই শেষ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এই বৎসরেই (১৯৪৭) ১০ই সেপ্টেম্বর আকস্মিকভাবে স্বগৃহেই ( Needham, Boston ) কুমারস্বামী পরলোকগমন করেন। কুমারস্বামী তাঁহার প্রিয় পিতৃভূমি ভারতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই বটে তবে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার চিতাভস্ম পবিত্র বারাণসীধামে নীত হয় এবং উহা গঙ্গাসলিলে বিসর্জিত হয়।

ভারত তথা বিশ্বপ্রেমিক মনীষী ও চিন্তানায়ক কুমারস্বামীর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব শোকমগ্ন হয়।

(১) Medieval Sinhalese Art, 1 08. (২) The aims of Indian Art, 1909, (৩) Essays in National Idealism ; 1909, 1911. (৪) The Indian Draftsmen, London, 1909. (৫) Selected Examples of Indian Art, London, 1910. (৬) Indian Drawings, 2 vols, 1910-12. (৭) Visvakarma, Bombay, 1912-14. (৮) Rajput Paintings, London, 1916. (৯) The dance of Siva—New York, 1918. (১০) Catalogue of Indian Collections in the Boston Museum of fine Arts ; 192?, 1924, 1927, 1930. (১১) History of Indian and Indonesian Art ; London, 1927. (১২) Art and Swadeshi, 1912. (১৩) Notes on Jaina Art, London, 1914. (১৪) Budha and the gospels of Buddhism, New York, 1916 ; Calcutta, 1955. (১৫) Indian Music, New York, 1917. (১৬) The influenee of Greek on Indian Art, 1908. (১৭) An Introduction to the Indian Art, Madras, 1923. (১৮) The origin of Buddha Image, New York, 1927. (১৯) The Arts of India and Ceylon, London, 1938 (also in French). (২০) Yakhas—Washington, 1928-31. (২১) Archaie Indian Terracottas ; Leipzig, 1928. (২২) Bibliographies of Indian Art, Boston, 1925. (২৩) Asiatic Art, Chicago, 1938. (২৪) Is Art a superstition or a way of life, 1937. (২৫) A new approach to the Vedas, London, 1933. (২৬) Christian and oriental philosophy of Art, 1939. (২৭) The transformation of nature in Art, 1934, (২৮) Elements of Buddhist Iconography, Cambridge (Mass), 1935. (২৯) Spiritual Authority and temporal power, the early Indian theory of Government, 1942, (৩০) Hinduism and Buddhism, New York, 1943. (৩১) Figures of Speech and thought, London, 1946. (৩২) Religious basis of forms of Indian Society, 1946. (৩৩) Why exhibit Works of Art ? London, 1943. (৩৪) Time and Eternity, 1947. (৩৫) Am I brother's keeper, 1947.

# বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন চিন্তা ও বাঙালী সমাজ-মন

**অলোক রায়**

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন ( ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ), তখনও পর্যন্ত বাঙালী সমাজ-মন মোটের উপর বহির্মুখী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজ-জীবনে যে জাগরণ লক্ষিত হয়, তাতে পাশ্চাত্য ভাবানুকরণ সর্বব্যাপী ছিল। য়োরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন বাঙালীর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধ লিখছেন, তখন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে বটে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'রাহুগ্রাস মুক্ত' হয়নি। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র ধর্ম-দর্শন আলোচনা 'বঙ্গদর্শনে'ই প্রকাশিত হয়।

'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকা একই বৎসর প্রকাশিত হয় ( ১২৯১ বঙ্গাব্দ )। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমাদের সমাজ-মন বিশেষ পরিবর্তন লাভ করে; যার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের উন্মেষ। 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমচন্দ্র ও 'প্রচারে'র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবেঃ 'বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহনবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না; প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে রাহুগ্রাস মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি।' ( 'বঙ্কিমচন্দ্র'—চরিতকথা ১৩৬৫, পৃঃ ৩৬ )। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে ধর্ম এবং দর্শন সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। যথা—সাংখ্য দর্শন, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, মনুষ্যত্ব কি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি। বলাবাহুল্য এর কোনো প্রবন্ধটিকেই বিশুদ্ধভাবে ধর্ম বিষয়ক বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে যা জীবন জিজ্ঞাসা, 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তাহাই ধর্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?'—এই প্রশ্ন যৌবন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দেখা দিয়েছে।

'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধটি এই দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; সেখানে 'মনুষ্যত্ব' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন, 'মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে' তার তত্ত্ব। লক্ষ্য করতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মজিজ্ঞাসু হয়েও, প্রচলিত ধর্মচর্চা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী নন। 'ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ এবং হরিনাম সংকীর্তন' কিংবা 'রবিবারে কার্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন এবং খ্রীস্টধর্ম ভিন্ন ধর্মান্তরে বিদ্বেষ' প্রভৃতি সাধারণতঃ 'পুণ্যকর্ম' বলে বিবেচিত হলেও, 'পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তা সর্ববাদিস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।' অন্যদিকে, আধুনিক সমাজ-জীবনে 'বাহ্যসম্পদ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

অতঃপর জন্ স্টুয়ার্ট মিলের 'হিতবাদে'র অনুসরণে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—১। পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি প্রয়োজন, ২। পরলোকে ফলপ্রাপ্তির জন্য পুণ্যকর্মানুষ্ঠান নয়, ইহলোকে

ফলপ্রাপ্তিই সঙ্গত, ৩। 'যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।'

এইখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'মনুষ্য কি' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিতের আলোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে যে 'অনুশীলন—ধর্ম' বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে।''

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর য়োরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তা কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার পরিচয় আছে 'বিবিধ প্রবন্ধে' ; প্রধানতঃ কোম্‌তের পজিটিভিস্‌ম, বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম, মিলের র‍্যাশনালিজ্‌ম (ক্ষেত্র বিশেষে মিল বেন্থামের অনুগত শিষ্য), এবং স্পেন্সারের অ্যাগ্‌নস্‌টিসিজ্‌ম্‌ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং বিশেষ করে কোম্‌ত ও মিল আজীবন তাঁকে অল্প বিস্তর প্রভাবিত করে। এই জন্যই বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন : 'He interpreted the Dharma from the Hindu philosophy in the light of empirical, utilitarian and positivist philosopny of Bacon, Bentham, Mill and Comte'

কিন্তু 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'ধর্ম' প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। 'ধর্মে'র ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন' গ্রন্থে। 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধেও অনুশীলন তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে ; কিন্তু তা যেন 'বিলাতী Doctrine of Culture'। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র য়োরোপীয় 'অনুশীলন তত্ত্বের' সঙ্গে নিজের আদর্শগত পার্থক্য সূত্রটি নির্দেশ করেছেন : 'বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলন তত্ত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্মেই সমর্পিত।' 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পথ জ্ঞানের পথ, 'ধর্মতত্ত্বে'র পথ ভক্তির পথ।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটিকে আমরা 'মনুষ্যত্ব কি' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের সেতু-স্থল বিবেচনা করতে পারি। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধ 'প্রচারপত্রিকায় ( ফাল্গুন ১২৯২ ) প্রকাশিত। সুতরাং রচনা-কাল বিচারে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ থেকে 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটি দূরে অবস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবন্ধটিকে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের 'সারবস্তু' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনি প্রথমেই বলেছেন—'যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।' 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'ধর্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। 'চিত্তশুদ্ধি' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন 'মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণত ও সামঞ্জস্যের ফল।' 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধেও এই প্রবন্ধের মতই বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু এখানে

'ধর্মতত্ত্বে'র প্রভাবেই 'কার্যকারিণী বৃত্তি'র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'ভক্তি ও প্রীতি কার্যকারিণী বৃত্তি।' বলা বাহুল্য 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে 'ভক্তি'র উল্লেখ মাত্র ছিল না।

এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থটির তুলনা করলে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন: 'আমার জীবনে আমি অনেক মত পরিবর্তন করিয়াছি,—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ের ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীনএবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।'

যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মলোচনায় উৎসাহী ছিলেন না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি বলেছিলেন (আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে): 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি।' (বঙ্কিম প্রসঙ্গ। পৃঃ ১৯৪)। এবং কালীনাথ দত্তও লিখেছেন: বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।' (বঙ্কিম প্রসঙ্গ। পৃঃ ২২০)।

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখলেন: 'যদি বল ঈশ্বর মানিনা, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনচিন্তা আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন: 'শেষ দশ বৎসর (১০৮৪—১৮৯৪) বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি স্বভাবতঃ নবীনতার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার প্রাচীনতার প্রতি পক্ষপাত হয়।' (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,১৩৪৭। পৃঃ ১৬)।

'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী, তিনি প্রত্যক্ষবাদী। সত্য আবিষ্কারে তিনি প্রয়াসী। কিন্তু অধিকাংশস্থলে এ সত্য বহির্জাগতিক। অন্ততঃ বহির্জগৎ নির্ভর। উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয় চিন্তায় যে বিজ্ঞানমুখিতা দেখা যায়, 'বিজ্ঞান রহস্যে'র লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও স্বভাবতঃই সে পথ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'জ্ঞান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দর্শনকে অবলম্বন করে যাত্রা সুরু করলেও, য়োরোপীয় দর্শনকেই সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আত্মশ্লাঘা চালিত হয়ে, সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন: 'আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।'

'জ্ঞান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে লক, হিউম, বেন ও মিলের এম্‌পিরিক্যাল ফিলজফির দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন : 'প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। কিন্তু প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশের সময় পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করলেন—'এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি আরও স্পষ্ট করে বললেন : 'সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভাগবদ গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।'

প্রসঙ্গতঃ 'বিবিধপ্রবন্ধে'র 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করতে পারি। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্রে লিখেছেন —the Sankhya is the only system of which I have made anything like a study' ( Bengal : Past and Present, April-June 1914 )। এবং 'বঙ্গদর্শনে' সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ক্যালকাটা রিভ্যু ( ১৮৭১ ) পত্রিকায় 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কারণ : 'The Sankhya is remarkably sceptical in its tendency; many antiquated or contemporaneous errors were swept away by its merciless logic. Carried to its legitimate consequences, a wise scepticism might have contributed to the lasting benefit of Hindu progress.' বলাবাহুল্য উক্তির মধ্য দিয়ে আধুনিকমনা সংস্কার-ইচ্ছুক বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রকাশ হয়েছে। 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন : "পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা 'নিরীশ্বর সাংখ্য'কেই সাংখ্য বলিতেছি।" প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বিস্তৃতভাবে সাংখ্যের নিরীশ্বরতার ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও এই আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রমাণিত হয় না, তবু একথা বলা যায়, যুক্তিনির্ভর সাংখ্যদর্শনের বিশ্লেষণাদি বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো লেগেছিল।

অন্যদিকে 'সাংখ্যদর্শন' আলোচনার যে সকল কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে সমাজতত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যাই প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' ( মে '১৮৭৩ ) পত্রিকায় 'The Study of Hindu Philosophy' নামে প্রবন্ধেও লিখেছেন : 'The principal value of Hindu Philophy consists in its bearings on history and on sociology' সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে দেখি : 'যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না ; কেন না, হিন্দু সমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক পাইবেন।' দর্শকের বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে যে সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই য়োরোপে তার আলোচনা সুরু হয়। সেদিক দিয়ে দর্শনের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষে নূতন পথ প্রদর্শন করেন।

'ত্রি দেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে, প্রবন্ধের বিষয় হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি। লক্ষ্য করতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র জ্ঞানানুশীলনের উৎসাহেই মিল ও ডারউইনের বিভিন্ন আলোচনা

করেছেন ( প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন নাম ছিল 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' ) প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে মিল ও ডারউইনের লেখা পড়েছিলেন। প্রবন্ধটির মূল প্রেরণা আত্মশ্লাঘা,—'ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞান সম্মত এবং নৈসর্গিক।' এবং মিল ও ডারউইনের জগৎ সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে 'ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।' বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-ধর্মের দ্বিধা এবং প্রত্যয়, আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসার যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-চিন্তা এই দিক দিয়ে বিশেষ সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ।

# বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার

**নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

## সারদামঙ্গল

সারদামঙ্গল বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনারূপে স্বীকৃত বলে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য। সমালোচকেরা বলেছেন, এই রচনারই লিরিক মেজাজের পূর্ণ অবারিত প্রকাশে আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে গীতিকবিতার সূত্রপাত হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের কাছে নিজের ঋণ উচ্ছ্বসিতভাবেই স্বীকার করেছেন।

কাব্যটির প্রথম সর্গের প্রথম চারটি স্তবকের সারদাবন্দনায় উপক্রমণিকা রচিত। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তির রূপ বর্ণনায় অসঙ্গতি লক্ষণীয়: 'কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদি কমলে! নধর নগনা লতা মগনা কমল দলে'—হৃদয়কমলে বিরাজমানা ত্রিদিবদেবীর রূপ মহিমার সঙ্গে কমলদলে মগ্না নধর লতার চিত্রকল্পটি মেলে না। চতুর্থ স্তবকে কবি সারদাকে 'নিশান্তের শুকতারা', চাঁদের সুধায় ধারা', 'মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিনী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তার উদ্দেশে বলেছেন:

> তুমি সাধনের ধন
> জ্ঞান সাধকের মন,
> এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে!

পূর্ববর্তী পংক্তিগুলোর ভাবপারম্পর্যে ভাবালুতার শেষ অগভীর পংক্তিটি আসেনি, সেটিকে বিচ্ছিন্নভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে এসেই আকস্মিকভাবে সমগ্র স্তবকটির তালভঙ্গ হয়। বাল্মীকির প্রসংগেও কল্পনার সংগতিবিহীনতা দ্রষ্টব্য: শোকার্ত ক্রৌঞ্চীদর্শনে কাতরা সারদার করুণ সংগীতে বাল্মীকি করুণায় উদ্বেলিত হন:

> রোমাঞ্চিত কলেবর,
> টলমল থর্‌থর্‌
> প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল!

যোগাসনে বিভোর বিহ্বল মনে ধ্যানরত যোগেন্দ্র বাল্মীকিকে চটুল হাসি হেসে লক্ষ্মীর প্রলুব্ধ করার চিত্রটি প্রাসঙ্গিকতাহীন, বিসদৃশ, তেমনি এই দেবীর সম্পর্কে পৌরাণিক ধারণার বিরোধী: 'কমলে ঠমকে হাসি ছড়ান রতন রাশি, অপাঙ্গে ভ্রূ-ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!'

পরবর্তী দুটি স্তবকে (১৯ ও ২০) পাই করুণারূপিনী সারদার প্রশস্তি। এই করুণাদেবীকে কবি আহ্বান করেন: এস মা করুণা-রাণী; ও বিধু-বদনখানি হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার! পরের অংশে বিচ্ছিন্নভাবেই যে রূপকল্পনায় সারদাকে উপস্থাপিত করা হয় তার সঙ্গে করুণামূর্তির কোনও যোগ থাকে না: ব্রহ্মার মানসসরোবরের নীল জলে স্বর্ণপদ্মের ওপর চরণ স্থাপিত করে 'ষোড়শী রূপসী' সারদা, স্ফটিকনিকেতনে যেমন সুন্দরী যেদিকেই তাকায় সেইদিকেই তার 'কুহকিনী ছায়া' হাসে, তেমনি সেই মানসসরোবরের 'লাবণ্যদর্পণঘরে 'দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী

দেখিছেন মায়া' স্ফটিকনিকেতনের মতই ব্রহ্মার মানসসরোবরের লাবণ্যদর্পণঘর—সেই অসার্থক তুলনায় সৌন্দর্যের কোনও চিত্রও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। এই লাবণ্যময়ীর চারিদিক ঘিরে যেন রূপসী চাঁদের মালা ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাবণ্যময়ী তাদের রূপের ছটায় ভুলে শ্বেত শতদল তুলে তাদের সীমন্তে পরাতে যান, তারাও তাঁর মত পদ্ম তুলে তাঁর সীমন্তে পরাতে যায়—

অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়,
চমকি আপন-পানে চাহেন রূপসী।

২১ সংখ্যক স্তবকে 'সুবর্ণ নলিনী', ২৪ স্তবকে কাঞ্চন-কমলরাজি, আর এই স্তবকে 'শ্বেতশতদল'—ব্রহ্মার মানসসরোবরের পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন এই বর্ণনা অবিশ্যি বিহারীলালের কল্পনার বিশৃংখলার খুচরো উদাহরণ মাত্র। ষোড়শী রূপসীর চারদিকে তাঁর প্রতিরূপ 'রূপসী চাঁদের মালা' শুধু 'কুহকিনী ছায়া,' 'মায়া', 'স্বপন প্রায় বিভ্রম', এই অস্থির কল্পনাবিলাসে লাবণ্যময়ী সারদা 'বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি'তে পরিণত হননি, তাঁর প্রতিরূপ 'অসংখ্য ছায়া' 'রূপসী চাঁদের মালা' শুধু তাঁর অলংকরণ মাত্র। বিশ্ব সৌন্দর্যের ছন্দে এই লাবণ্যময়ীর লাবণ্য প্রাণ পায় না, তাই স্বপ্নের মত বিভ্রম ভেঙ্গে যায়, রূপসীকে চমকে উঠে নিজের দিকেই ফিরে তাকাতে হয়; অর্থাৎ সারদা এখানে অনেকটা পরিমাণেই কবির নিজস্ব ক্ষণজীবী স্বপ্নবিলাসসম্ভোগপ্রবণতার মাধ্যম। বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীকী বিন্যাসের সংহতিতে সারদাকে ধরার মত নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা বিহারীলালের ছিল না। এই সারদা দেবী শেলীর প্লেটোর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত spirit of Beautyর সঙ্গে কোনও ভাবেই তুলনীয় নয়, বিহারীলাল এই কাব্যের কোথায়ও দার্শনিক তত্ত্বঘটিত অনুভূতিতে তাঁর আরাধ্যাদেবীর সত্তাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি, তাঁর মেজাজের সঙ্গে এজাতীয় তাত্ত্বিকতা খাপ খায় না।

সারদার ষোড়শী মূর্তি বর্ণনার পর কবি তাঁর সম্বন্ধে যে আবেগ প্রকাশ করেছেন নিজস্ব সীমায়ই তা অনেক শুদ্ধ, নির্মল :

তোমারে হৃদয়ে রাখি—
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভালো লাগে;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহে নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,—
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।

সারদার উপলব্ধি এই প্রশস্তির পরই আকস্মিকভাবেই তাঁর সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ আসে। প্রথমে পাই সারদার অদর্শনে কবির সম্ভাব্য দুর্গতির কল্পনা : তিনি লোকালয় ত্যাগ করে নিবিড় বনে কেঁদে বেড়াবেন, তাঁকে দেখে তরুলতা বিষাদে কথা বলবে না, কুসুমকুল বিষণ্ণ হবে এবং—'হা দেবী, হা দেবী, বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি; নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে।' নির্ঝরের ঝর্ঝর রবে যখন কাননের সেই ক্রন্দন সুরপুরে ধ্বনিত হবে, তখনই হয়ত দেবীর আসন টলবে, কবির কথা

তাঁর মনে পড়বে : 'হেরিবে কাননে আসি অভাগার ভস্মরাশি ; অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায়···।।' দেবী তখন যে ভাবে শোকার্ত হবেন সেটা ভেবেই তিনি বলেন—'মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে।' কিন্তু এদিকে জীবন দুর্বিসহ :

| | |
|---|---|
| বেঁধে মারে, কত সয় ! | অন্তরাত্মা জর জর, |
| জীবন যন্ত্রণাময়— | জীর্ণারণ্য চরাচর, |
| ছারখার চুরমার বিনি বজ্রাঘাতে | কুসুম-কানন-বিজন শ্মশান। |

প্রথম অংশের সারদার অদর্শনে কবির সম্ভাব্য দুর্গতির চিত্রটি আলংকারিক, অগভীর, তেমনি দ্বিতীয় অংশে জীবন যন্ত্রণার নাটকীয় উক্তিগুলোয় অস্তিত্বের কোনও গভীর যন্ত্রণার সুর বাজেনি। সারদার করুণাকটাক্ষে কবি অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে থাকেন, এই স্বীকৃতির পর অসংলগ্নতাই যন্ত্রণাময় জীবনের উল্লেখ আসে, কোন দ্বন্দ্বময় অসঙ্গতির বেদনায় তাঁকে সারদাকে হারাতে হয়, তার কোনও ইঙ্গিত ছাড়াই এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় : 'কি করিব, কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব, যদি—কমল-কামিনী কোথারে আমার ?' কবি তাঁর সঙ্গে সারদার সম্বন্ধ কোনও বিকাশের সুসংলগ্ন স্তরপরম্পরায় রূপায়িত করেন না, তাই এই জীবনযন্ত্রণা ও বিচ্ছেদবেদনা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন।

দ্বিতীয় সর্গের নবম এবং দশম স্তবকে দেখি, সারদার বিরহে জগৎ বিষন্ন এবং কবির মন নিরানন্দ ( 'কেন সুখ নাই মনে, সব গেছে তার সনে ; খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার।' তারপর সারদার বিষণ্ণ মূর্তি, 'অয়ি, একি, কেন, কেন, বিষণ্ণ হইলে হেন ? আনত আনন-শশী, আনত নয়ন······। কবি তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন :

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু-ময় জীবন-লহরী !

এই মরুভূমিতে মরীচিকার ছলনায় তাঁকে অস্থির হতে হয় :

| | |
|---|---|
| কভু মরীচিকা-মাঝে | এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা |
| বিচিত্র কুসুম রাজে, | অবমান, অবহেলা, |
| উঃ ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল ! | তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি ! |

কবি তাঁর যন্ত্রণাকে আরও নাটকীয়, আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলেন।

| | |
|---|---|
| ভাবিতে পারিনে আর ! | তরংগিয়া রক্তরাশি |
| অন্ধকার—অন্ধকার— | নাকে মুখে চোখে আসি |
| ঝটিকার ঘুর্ণি ঘোরে মাথার ভিতরে | বেগে যেন ভেঙে ফেলে, ধর, ধর, ধর !— |

দেবী বিষণ্ণতা ও বিমুখতা, মরুভূমির মত কবির জীবনের শূন্যময়তা, মরীচিকার বিভ্রান্তির জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান-অবহেলা, অবশেষে তাঁর মূর্চ্ছাতুর অবস্থা—সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ কয়েকটি অসংলগ্ন তরল ভাবোচ্ছাসেই পর্যবসিত, অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার পটে মূল্যবোধের শুদ্ধতায় স্থিত হবার আবেগবিন্যাসে এই সারদাসন্ধান কোনও তাৎপর্যময় সংহতি পায় না। 'মরু—মরু—মরুময়,' 'উঃ ! কি বিষম বাজে, কি করি, কি করি,' 'অন্ধকার—অন্ধকার,' 'ধর, ধর, ধর'—এই সমস্ত অংশের কৃত্রিম

নাটকীয়তায় আড়ম্বরপূর্ণ ভাষণেই বোঝা যায়, সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ এখানে গভীর জীবন সন্ধানের ব্যাপার নয়, অহংবিলাস মাত্র।

পরবর্তী অংশে ভাষণাত্মক ভঙ্গি, declamation-এর স্থূলতা আরও প্রকট :

ধর আত্মা ধৈর্য ধর,  মহান মনেরি তরে,
ছি ছি ! একি কর কর,  জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত !  পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় !
থাকিবা প্রিয়ার বুকে  হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
যাই বা মরণ-মুখে,  সহে বজ্র অকাতরে !
এ আমি আমিই রব, দেখুক জগত।  জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায়।

সারদার করুণার জন্য ব্যাকুলতায় 'এ আমি, আমিই রব, দেখুক জগত' উচ্চ কণ্ঠের এই ঘোষণা অসমঞ্জস। 'একি কর কর'—এই দ্বিত্বে ছন্দের সুর নষ্ট হয়েছে। 'হিমাদ্রিই বক্ষ পরে সহে বজ্র অকাতরে', হিমাদ্রির সহজ ক্ষমতার সহনীয়তার বৈপরীত্যে 'মঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায়' এই চিত্রটি একেবারেই অসার্থক, এই পংক্তিটিতে গোটা স্তবকটারই তালভঙ্গ হয়।

নিজের মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরই কবি আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন :

হা ধিক্ অধীর হেন !  প্রণয় পবিত্র ধনে
দেখেও দেখ না কেন  সন্দেহ করোনা মনে—
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ-প্রতিমায়  নাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায়।

পূর্ববর্তী স্তবকগুলোয় কবি তাঁর যন্ত্রণা জ্বালাকে বেশ গুরুতর রূপেই উল্লেখ করেছেন, এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা, অপমান, অপহেলা,' এই জ্বালার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর নাকে মুখে চোখ রক্তের তরঙ্গ আছড়ে পড়ে, এত মহান্ মনের সহ্য করার মত জ্বালা, নীলকণ্ঠের মত যা ধারণ করার এবং হিমাদ্রির মত যাকে বুকে পেতে নেবার জন্য তিনি নিজের মনকে আহ্বান জানিয়েছেন, দ্বিতীয় স্বর্গের এই শেষ স্তবকটিতে সেটাই এই নিছক সন্দেহে পরিণত, যার তুচ্ছতার জন্য তিনি নিজেকেই ভৎর্সনা করেন : 'নাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায় !'

তৃতীয় স্বর্গের প্রথম থেকে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ প্রেম ও ব্যবধানের বৈপরীত্যমূলক সমাবেশের চিত্রে উপস্থাপিত : নয়নরঞ্জন পূর্ণিমার আলোক, মাঝখানে উদ্বেলিত নদী, সারদা ও কবি, চক্রবাক ও চক্রবাকী, দুজন দুপারে ; দুজনের—'নয়নে নয়নে মেলা, মানসে মানসে খেলা,' সেই সারদা, সেই কবি, সেই সব কল্পতরু, কুঞ্জবন, সেই প্রেম, স্নেহ, প্রাণ, দেহ—সবই এক আছে, তবু 'কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দু জন !' দুটি প্রাণই ব্যাকুল, মিলিত হবার জন্য ধাবমান, কিন্তু 'কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় !' সারদার প্রেমোজ্জ্বল চোখ দেখে কবি সংকল্প গ্রহণ করেন :

এমন পদার্থে হেলি
যাব না, যাব না ঠেলি
উভয়-সংকটে আজ মরি যদি মরি !

এই প্রেমের দ্বন্দ্ব, 'উভয়-সংকট' প্রথাসিদ্ধ আলংকারিক প্রেম বর্ণনার অভিমান মাত্র,

বাস্তবজীবনোৎসারিত চৈতন্যের গভীরতায় তা বিধৃত হয় নি। এর মধ্যেই কবি একবার জীবনের সম্মুখীন হন, তার সার্থকতার প্রশ্ন তোলেন :

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর ?

কিন্তু এই প্রশ্ন তাঁকে জীবনের উৎসে টেনে নিয়ে যায় না, সারদার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কোনও পর্যায়েই চৈতন্য বিস্তারের যন্ত্রণাময় আকুলতায় তার সত্তা মথিত হয় না। কবি নিজের আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার জগতে ফিরে গিয়েই স্বস্তি পেতে চান।

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান !

তাঁর দৃষ্টির ভুবন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, 'বিচিত্র মত্তদশা' স্বপ্নবিহ্বলতার মুহূর্তেই তাঁর 'হৃদয়ের উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে,' আর তার মাঝখানেই তিনি 'বিশ্বমোহিনী' সারদা কল্পমূর্তিকে পান, তার আলোয়ই প্রেমের প্রতিমা আলোকিত হয়। কিন্তু এই ধ্যানেও কবি স্থিত হতে পারেন না, এই কল্পনাবিভোরতা তাঁকে অমৃতের প্রসাদ এনে দিতে পারে না, এ জগৎ আকস্মিকভাবেই চূর্ণ হয় :

আচম্বিতে একি খেলা
নিবিড় নীরদ মালা !
এমন ঘুমের ঘোরে—
জাগালে কি জোর করে ?
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকাল লুকাল ! সাধের স্বপন আহা ! ফুরাল, ফুরাল !

স্বপ্ন এবং বাস্তবের সংঘাতের বেদনায় স্বপ্নও অনেক সময় লিরিক বিন্যাসে জীবনের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বিহারীলালের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অসংলগ্নতায় স্বপ্ন শুধু ভাবের বুদ্বুদবিলাসেই পর্যবসিত হয়।

ঐ স্বপ্নচারনার পর সারদা কাহিনীর শরীরী জগতেই কবিকে দেখা দেন, দেখা দিয়েই আবার আত্মগোপন করেন, বেদনার্ত কবি মন্দাকিনীকে সম্বোধন করে বলেন—

এই না তোমারি তীরে
দেখা আমি পেনু ফিরে,
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে !
হা ধিক্ রে অভিমান,
গেল, গেল, গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে !
হারায়ে নয়ন তারা
হয়েছি জগত-হারা,
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই !

এই সারদা নিশ্চয়ই কবির সেই আগেকার নিদ্রাঘোর, মত্তদশার নন, তাহলে এখানে তিনি 'করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে,' কিংবা সারদারূপ 'নয়নতারা' হারিয়ে 'জগতহারা' হয়েছেন, এসব উক্তি করতে পারতেন না। ইনি স্পষ্টতই তাঁর কাহিনীর নায়িকা, তাই তাঁর অন্তর্ধানে এবার 'সাধের স্বপন আহা !—ফুরাল, ফুরাল, এজাতীয় খেদ নয়, নাটকীয় আড়ম্বরপূর্ণ পাই !

ওহে ভাই, দাও বোলে
কোন দিকে যাব চলে
ওকি ওঠে জ্বোলে জ্বোলে ? কোথায় পালাই !
ওকি ও, দারুণ শব্দ,
আকাশ পাতাল স্তব্ধ
দারুণ আগুন শুধ্ ধ্-ধ্ ধ্-ধ্ ধায়
তুমুল তরঙ্গ ঘোর
কি ঘোর ঝড়ের মোর,
পাঁজর ঝাঁজর মোর দাঁড়াই কোথায় !

কবি আবার তাঁর কল্পনামূর্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসেন একটি প্রশ্নে :

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগণ-ফুল কল্পনা লতার ?

কল্পনার কি প্রেমের মূল নেই, এই জিজ্ঞাসাও জীবনানুসন্ধানের গভীরতায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি পায় না। যে প্রেমের আত্মদানেই আত্মমুক্তি ঘটে, জীবনের সকল বেদনার কণ্টকই পূর্ণতার ঐশ্বর্যে সার্থক হয়, তা কবির অন্বিষ্ট নয়, তাঁর কাছে প্রেম এক ধরণের আত্মকেন্দ্রিক ভাব মত্তা। তাই এই প্রেমের ফুল ফুটলে—'ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্, আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল···'।

স্বভাবতই নন্দন কাননে কামদেব ও রতির বিহারের বর্ণনা প্রেমের আত্মবিস্তারের রূপক হয়ে উঠতে পারে নি। কামদেব ও রতির প্রেমও নিছক ভাবমত্ততা : তারা—'কি এক ভাবেতে ভোর,' তাদের 'কি যেন নেশার ঘোর,' 'আলসে উঠিছে হাই, ঘুম আছে, ঘুম নাই, কি যেন স্বপন মত চলিয়াছে মনে' এবং 'ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজন।' কবি জানেন, 'প্রণয়পবিত্র কাম, সুখ স্বর্গ মোক্ষ-ধাম,' এই মত্ততায় তাঁর মনে একবার বিস্ময় জাগে : 'আমি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ'। কিন্তু এই ব্যতিক্রমে তিনি বিচলিত হন না, এই বিস্ময়ও তাঁর উপভোগের একটি দিক। সুখস্বর্গ মোক্ষধামেই ভাবমত্ততার সমর্থন লাভ করেই কবি তাঁর 'নাই কি প্রেমের মূল ? বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?' প্রশ্নের উত্তর পান :

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল
স্বপনে বিচিত্র রূপা দেবী যোগেশ্বরী।

স্তবকটির প্রথম তিন পংক্তিকে পরবর্তী পংক্তি এবং পুস্তকগুলো থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় : এই প্রেম, প্রাণের ভুলই যে কিভাবে 'জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী' হয়ে ওঠে, সারদার চরিত্রে সেই সত্য উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি। 'প্রাণের ভুল' মুহূর্তের মধ্যেই 'নেশার ভুল'-এ পর্যবসিত হয়, অন্তরাত্মার নিদ্রাচ্ছন্নতায়, যোগ-ধ্যানে দেবী যোগেশ্বরী বিচিত্ররূপা হন : কখনও দেখা যায় তাঁর বরাভয় মূর্তি, কখও গেরুয়া বাসে ভীষণ ত্রিশূলধারিণী, 'তাঁর ঘোরঘট্ট অট্ট হাসি ঝলকে পাবক রাশি,' আবার কভু আলুথালু বেশে, শ্মশানের প্রান্ত দেশে জ্যোৎস্নায় আছেন বসি বিষন্ন বদনে।' এই যোগনিদ্রা স্বপ্নের 'বিচিত্রারূপা' সারদা শূলধারিণী রূপে যেমন, তেমনি শ্মশানের প্রান্তদেশবাসিণীর মূর্তিতেও আর যাই হোক প্রেমময় জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী হয়ে উঠতে পারেন নি। শ্মশানের প্রান্তদেশে অধিষ্ঠিতা সারদায় ত কবির পক্ষে বেদনাদায়ক, অসহনীয় সেই বিষাদমূর্তিই আত্মপ্রকাশ

করে : এই সারদাকে 'পবন আকুল হয়ে চিতা-ভস্ম রজলয়ে শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায়' ; তাঁকে দেখেই কবি আর্তনাদ করে উঠল : 'হায় ফের বিষাদিনী ! কে সাজালে উদাসিনী ? সম্বর, এ মূর্তি দেবী, সম্বর, সম্বর ! এই বিষাদিনী মূর্তি কবি সহ্য করতে পারেন না বলেই সারদাকে উদ্দেশ করে বলেন :

আমার এ বজ্র-বুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও, দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা !
অনন্ত নিদ্রার কোলে,
অনন্ত মোহের ভোলে,
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন ;
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদিব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন !

কবির যোগনিদ্রার সাধের স্বপন'ও তাঁকে আশ্বস্ত করে না, তিনি নবীনচন্দ্রের কার্যস্থূলভ নাটুকে, আড়ম্বরময়উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষণে চমক সৃষ্টি করেন :

হবে না, হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না, ধোরোনা, বৃথা রুধো না আমাকে !
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ-পাখী
দেখুক, দেখুক যদি আর কিছু থাকে !
ছাড় ! আন ! যাও যাও !
বেগে বুকে বিঁধে দাও
ওই যে ত্রিশূল দোলে গগণমণ্ডলে !

চতুর্থ সর্গের মোট আঠাশটি স্তবকের মধ্যে প্রথম সতেরটিতে পাই হিমালয় বর্ণনা, পরবর্তী চারটিতে সারদার জন্য শোক ( ১৮—২১ ), সাতটিতে ( ২২—২৮ ) হিমালয় নিঃসৃতা গঙ্গার রূপ বর্ণনা ও স্তবক। বিহারীলালের অন্যান্য প্রকৃতি বর্ণনায় মত এখানেও কবির দৃষ্টি শুধু হিমালয়ের বাইরের রূপের ওপর নিবদ্ধ। হিমালয় কবির কাছে—'কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার' ! কখনও সংস্কৃতসাহিত্যানুসারী প্রথাসিদ্ধ চিত্র সংযোজনায়—

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
স্বপ্ন-কেলি—কুতূহলে মত্ত কড়িগণ ;

কখনও বা—মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধুমকেতু ওঠে,
ফর ফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ;
জলধারা ঝরঝর
সমীরণ সরসর
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চরিদিকে—

নিছক অনুপ্রাসাত্মক ধ্বনিসমারোহে হিমালয়ের বর্ণনাকে কবি গুরুগম্ভীর করে তোলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোথায়ও হিমালয়-প্রকৃতি কিংবা গঙ্গা জীবন্তসত্তা লাভ করেননি।

পঞ্চম সর্গে কবি ঐ পার্বত্য প্রকৃতিতে দাবানলের এক শব্দাড়ম্বরময় বর্ণনা জুড়ে দেন :

অর্চিপুঞ্জ লক্ লক্
ভক্ ভক্ ধবক্ ধবক্,
দাউ দাউ, ধূধূ, ধায় দশদিকে :
ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝা হুঙ্কা ছোটে,
বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ চর্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে !

অতঃপর আগ্নেয়কাণ্ডের ভীষণতা সম্বন্ধে তাঁর ভাষণ পাই :

দিগঙ্গনাগণ যেন
আতংকে আড়ষ্ট হেন,
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ;
চতুর্দিকে লম্ফে ঝম্পে।
মত্ত যেন রণদক্ষে
তোল্‌পাড় কোরে ধায় দারুণ বাতাস—
উঃ! কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস !

এই বর্ণনা ও ভাষণের আড়ম্বর শুধু কৃত্রিম ও স্থূলই নয়, প্রাসংগিকতাবিহীন ঘটনাগত চমক সৃষ্টির লোভে তুচ্ছও বটে। দাবানল সম্বন্ধে ভাষণের পরই আকস্মিকভাবে গঙ্গাস্তুতির উচ্ছ্বাস আসে :

ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গে,
তরল তরঙ্গ-রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি
চলেছে মা মহোল্লাসে !
তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা নগরী।

'করি করি' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বে ছন্দের যে তালভংগ হয়েছে, সেই খুচরো ত্রুটি ছেড়ে দিয়েই দেখি, এই স্তব কিংবা জন্মভূমির জন্য শোক প্রকাশ—

আহা, স্নেহ-মাখা নাম,
আনন্দ-আনন্দ-ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি, তুমি কোথায় এখন।
এ বিজন গিরি দেশে
প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে
যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে উঠে মন—
কেন মা, আমার এত কেঁদে ওঠে মন !

সম্পূর্ণ অসংলগ্ন এবং তাৎপর্যহীন : 'কলিকাতা আনন্দনগরী'র 'স্নেহমাখা নাম' স্মরণে কবির আকুলতা কিংবা 'উঃ কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস'—দাবানলের তীব্র উত্তাপ সম্পর্কে নাটকীয় উক্তির পরই বিজন গিরিদেশে প্রকৃতির প্রশান্ত বেশে সান্ত্বনা দানের উল্লেখেই বুঝি, প্রাসংগিকতার নিম্নতম প্রয়োজনটুকুও বিহারীলালের কল্পনার স্বেচ্ছাচারী আত্মবিলাসে স্বীকার্য নয়।

প্রকৃতির কোনও প্রাণময় সম্বন্ধপাতে সারদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলেই কবি তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি হিসেব প্রকৃতির রূপবর্ণনায় শুধুবক্তৃতাত্মক ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেন :

অহ অহ, ওহো ওহো
কি মহান্ সমারোহ
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার
বিসর্গ মহান্ মূর্তি
চতুর্দিকে পায় স্ফূর্তি
চতুর্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার

কবি অহ ওহো ইত্যাদি বিস্ময়সূচক শব্দ আড়ম্বরময় বিবরণ ( ঘোরঘটা মহাছটা ) মহান উদার ইত্যাদি বিশেষণ জড়ো করেছেন, কখনও বা নিছক তথ্যমূলক বিবৃতি দিয়েছেন ( উদার পদার্থরাজি সাজি থরে-থর' ) মাত্র, কিন্তু অভিজ্ঞতার আবেগের প্রাণময় বিন্যাসে চিত্রকল্পের উজ্জ্বল প্রত্যক্ষতায় নিসর্গের মহান মূর্তিকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি : এখানেও বিহারীলাল আত্মপরায়ণতা লালনের উপায় হিসেবে না দেখে নৈর্ব্যক্তিক, শুচি মমতায় তথা গভীরতর জীবনাগ্রহে প্রকৃতিকে ধরার চেষ্টা করেননি, এমন কি সারদার আবির্ভাবের নিছক পটভূমি হিসেবেও তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না। পরবর্তী অংশে কবি সারদাকে সম্বোধন করে বলেন :

উদার উদারতর এ নিসর্গ রঙ্গভূমি,
দাঁড়ায়ে শিখর পর মনোরমা নটী তুমি ;……
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিবিধ সুষমা। শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা।

'কি মহান সমারোহ' 'মহানমূর্তি' 'ঘোরঘটা মহাছটা কেমন উদার'—নিসর্গের মহিমা ও গাম্ভীর্য সম্পর্কে এই সমস্ত উক্তি এবং বিরাট হিমালয় শিখরের উপর দণ্ডায়মান, এই উদার প্রকৃতি থেকেও 'উদারতর' ত্রিবিধ সুষমা সারদার মহত্ত্বব্যঞ্জক বর্ণনার পরই প্রকৃতিকে 'রঙ্গভূমি' এবং সারদাকে তার 'মনোরমা নটী' রূপে কল্পনা বিসদৃশ।

এই সমস্ত অসঙ্গতিই প্রমাণ করে যে সারদার মাধ্যমে কবি জগৎ ও জীবনে নিজের হৃদয়কে বাঁধতে পারেননি, দেবীর সন্ধান যেমন অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস, তাঁর প্রাপ্তিও তেমনি নেশাগ্রস্ততা, মত্ত ভাবাবেগ সম্ভোগের ব্যাপার মাত্র—

ও বিধু বদন হাসি সে যেন কি হয়ে যায়
গোলাপ কুসুম রাশি সে যেন কি নিধি পায়
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে ; বিহ্বল পাগল প্রায়
বেড়ায় কি বোকে বোকে আপনার মনে ;

কোনও মূল্যবোধেই সারদার সমগ্রতা পায় না।

'সারদামঙ্গল' আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কাব্যের শ্লোকগুলো কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করে রাখে না। (অবিশ্যি তিনি এটাকে ক্রটি হিসেবে ধরতে চাননি)। কবির ভাবোচ্ছ্বাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গদোলায় সারদার করুণামূর্তি সৌন্দর্যরূপ এসেছে এবং এই সমস্ত রূপও কোনও জীবনবোধের তাৎপর্যে প্রাণময় হয়নি। পরবর্তী অংশে যে প্রেমানুভূতির পটে কবি সারদাকে উপস্থাপিত করেছেন সংশয়দ্বন্দ্ব বেদনার মধ্যেই বৃহত্তর জীবনের চৈতন্য ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি ও চরিতার্থতার ঐশ্বর্য তাতে মেলে না। এই সারদার সঙ্গে সৃষ্টিপ্রেরণার কোনও সম্বন্ধ নেই তার অগ্নিদহনে দগ্ধ হতে হতে পরীক্ষার প্রতিটি কঠিন স্তর পার হয়ে অন্তর ও বাইরের নানা বিড়ম্বনার বেদনায়ই একজন কবি কি ভাবে জীবনকে খোঁজেন শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের সেই ইতিহাসের রূপকমর্যাদাও আমরা তাঁর মধ্যে পাই না। এই সারদা যুগ যুগান্তরে ব্যাপ্ত নানা মীথ পুরাণ কাহিনীর জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বা বাঙলার প্রকৃতিতে প্রাণ পায়নি। বিহারীলালের অন্যান্য রচনার তুলনায় সারদামঙ্গলের ছন্দ ও ভাব কিছুটা মসৃণ কিন্তু এখানেও তিনি জীবনাবেগের নির্মল ও সংহত রূপ রচনা করতে পারেননি ; আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযমে এবং তৎকালীন কাহিনী-কাব্যসুলভ আড়ম্বরে তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছেন।

# রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা

**অমিয়কুমার মজুমদার**

সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুটিকে বিপরীত কোটির মনে করা হতো। এ ধারণার মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে তা আজ অনেকের কণ্ঠেই স্বীকৃত হচ্ছে। শিল্প বা কলার যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বলেন আগে শিল্প পরে বিজ্ঞান। মানুষের জন্মের প্রথম অধ্যায় থেকেই সুরু হয়েছে শিল্পের রথযাত্রা। কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে নানা দিকে, আর বিজ্ঞান তো আধুনিক কালের সৃষ্টি একথা অনেক শিক্ষিতের কণ্ঠে শোনা যায়। নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্তি। বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে যে ইতিহাসের সূচনা হয় তা নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞানের। একথা অনস্বীকার্য যে আদি মানবের শিল্পকলাপ্রীতি যতটা ছিল, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তার চেয়ে কম ছিল বলে মনে হয় না। বরং বিজ্ঞানবুদ্ধি অধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে কাব্যের সুরু হয় প্রকৃতির বন্দনা দিয়ে। শিল্পেরও আরম্ভ সেখানেই। আর ঐ প্রকৃতি-বন্দনার মূলে রয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, কারুশিল্পে বিজ্ঞানের বিপুল প্রভাব দেখে বিস্মিত হই। প্রকৃতপক্ষে এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই, যেহেতু মানুষের আদিমতম যুগ থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে এক বিচিত্র সখ্যতার বন্ধন চলে আসছে। এই গাঁটছড়াকে আমরা অস্বীকার করে এসেছি, তাই সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কারুকার্য দেখলে চমকে উঠি। যে সাহিত্যিক বা কবির কৃতকর্ম কালোত্তর, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে যে তিনি বৈজ্ঞানিকের মত সত্যনিষ্ঠ। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক্। বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো অমর হবার সৌভাগ্য হয়েছে ক'জনার? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই যে কবির অন্তরে বিজ্ঞানীর সত্যনিষ্ঠা যতটা ছিল হয়তো অনেকেরই তা ছিল না। তাই তিনি যুগে যুগে বেঁচে থাকবেন মানুষের মনের মণিকোঠায়। আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও এমন একটা যুগ প্রবাহিত হয়ে গেছে যখন দেশের শিল্প-সাহিত্যের কর্মে নিযুক্ত কর্তারা বিজ্ঞানের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করতে অত্যন্ত অনীহা প্রকাশ করতো। আর আমাদের দেশের তো কথাই নেই। সেই কতযুগ আগে ভারতঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দীপশিখা জ্বেলেছিলেন তাকে তেল-সল্‌তে দিয়ে উজ্জ্বলতর করবার কোন প্রচেষ্টা আমরা করিনি, আর তা করিনি বলেই দীর্ঘদিন অজ্ঞানের প্রচ্ছায়াতে নিশ্চেষ্টচিত্তে অলসতার অনুশীলন করে এসেছি। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন কোন কবির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে তাঁর চক্ষু উন্মীলন করতে পেরেছিলেন। যে সব কবি-সাহিত্যিকের অন্তর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে আলোকিত হয়নি, তাঁদের রচনাবলী কখনই কালজয়ী হতে পারে নি। অনেক সময়েরই তাঁদের বল্গাহীন কল্পনা উদ্দাম হয়ে বিপথগামী হয়েছে। ইংরেজ-কবি পোপ তাঁর রচনাতে বিজ্ঞান-বিমুখ কবি-সাহিত্যিকদের বিদ্রূপাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন।

আর একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে অবৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কাব্য রচনা

করলে কোনকবি মহাকবির আসন পেতে পারেন কিনা! যাঁরা মনে করেন কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দিলেই কাব্য হয়, যুক্তিহীন বক্তব্য পেশ করলেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাঁরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন তা অনুমান করা চলে একথা অনেকে বলছেন। অযৌক্তিক কথা, অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য কবির মুখে কখনও মানায় না, মহাকবির পক্ষে তো নয়ই। আমি তুজন বিদেশী মহাকবির নাম তুলে ধরবো। প্রথমজন সেক্সপীয়র, যাঁর চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসব সম্প্রতি বাংলাদেশেও অনুষ্ঠিত হলো, আর একজন হলেন শেলী। তুজনেই তাঁদের যুগের গণ্ডী অতিক্রম করে মহাকালের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। তার মূলে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন। 'To a Skylark' 'The Cloud' কবিতা যারা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে ঐ অকালজীবী মহাকবির বিজ্ঞান-প্রীতির কথা বিস্তৃতভাবে বলবার প্রয়োজন হবে না। আর, সেক্সপীয়রের কাব্যে ও নাটকে আইন, ডাক্তারী, নৌবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব কিছুরই ছড়াছড়ি।

কেবলমাত্র আজগুবি কথা বা রসাত্মক বাক্য দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না যা সৃষ্টি হয় তা হলো ফ্যান্সি বা ইমাজিনেশন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সংজ্ঞা বলেছেন—"রসাত্মক বাক্য যখন সত্যাত্মক হয় তখনই তা সত্যিকারের কাব্য।"

বিজ্ঞানের মধ্যে তুটি স্তর আছে। একটি রূঢ় আর একটি কোমল। প্রথমটি প্রয়োগ বিজ্ঞান তথা যন্ত্রবিজ্ঞান। এর সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিবাস্তব প্রয়োজনের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। আর একটি কোমল তথা শৌখিন পর্যায়ের। প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় দাবী মেটাবার দায়মুক্ত হয়ে বিশ্বের অসীম রহস্য উদ্ঘাটনে উন্মুখ। তাঁরা নিঃসন্দেহে কল্পনাপ্রবণ। তা না হলে মহামতি গ্যালিলিও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নক্ষত্রলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন না। নিউটন, গ্যালিলিও, ডালটন, রাদারফোর্ড, হার্টন, ম্যাকস্‌য়েল, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করার অধিকারী সেক্সপীয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ। সকলেই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী। বিশ্বরহস্য উন্মোচনে উভয় দলের সত্যনিষ্ঠা সমশ্রেণীর, পার্থক্য কেবলমাত্র প্রয়োগ কর্মে।

বিজ্ঞানের সংগে দর্শনের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান কি না তা নিয়ে প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আসচে। তবে দ্বিনবতিতম বয়স্ক দার্শনিক রাসেলের কাছে পৌছে যেন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 'where science ends, philosopby begins.'—এমনি একটা কথা যে দর্শনের ছাত্র-অধ্যাপকদের কণ্ঠে শ্লাঘা এবং অহমিকার সঙ্গে উচ্চারিত হতো আজ তার রেশ যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেচে। যোজনব্যাপী পার্থক্যটা যেন ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এর কারণস্বরূপ বলেছেন "কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।"

প্রস্তর যুগের শেষাংশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য গেল অনেক বেড়ে। সর্বক্ষেত্রে বিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল। মিশর, ব্যাবিলন, চীনে বিজ্ঞানের প্রভাবজনিত বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে লাগলো। তাতে স্পর্শ লাগলো রূপদীপ্যমানার ঔজ্জ্বল্য। বিজ্ঞান ও শিল্প তার উপচ্ছায়াতে পড়ে গেল। গ্রীসে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণা সুরু হলো। ধর্মের, অনুশাসনের

চাপে এখানে বিজ্ঞানের দীপশিখা নিবু নিবু হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাব্যে সাহিত্যে ঈশ্বরতত্ত্ব, কৌতুক-প্রহসন আর অবাস্তব কল্পনার ছড়াছড়ি ছিল। রবীন্দ্রনাথে পৌছে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে কাব্যে-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের রং ধরলো। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। এবং রোমান্টিকতার সংগে বিজ্ঞানের চিরশত্রুতা বিদ্যমান তা কারো অজানা নেই। হয়তো বা একারণেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতাকে' কোন আধুনিক সমালোচক 'এ এক আশ্চর্য কবি কল্পনা' বলে কবিকে বিজ্ঞান-বিমুখ আখ্যায় প্রকাশ করবার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমালোচকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয় এ ধারণা অভ্রান্ততার পাদদেশ পর্যন্ত পৌছায়নি।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন বা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্যই তাঁকে বিজ্ঞানের অনুপন্থী বলছি না, কবির সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম তার প্রমাণ। তিনি পেশায় বিজ্ঞানী নন কিন্তু মেজাজে পুরোপুরি। মানসী কাব্যের মধ্যে কবি যখন পরিপূর্ণ সচেতনভাবে তাকিয়েছেন বিশ্বের দিকে তখন তাকে মনে হয়েছে ভয়ঙ্করী। তারই পর মুহূর্তে 'অহল্যার প্রতি' কবিতার স্নিগ্ধ প্রলেপে চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। আগের এক রচনাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে এই কবিতাটি বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ এবং বিবর্তনবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছে।

মানবের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বহু বিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন।"১

১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৬ই জুলাই, ১৯৩৪) কবি এক বক্তৃতায় সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে উদ্ভিদতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন "উদ্ভিদের দুই শ্রেণী ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ তার দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হোতে হোতে তা লুপ্ত হয়ে যায় ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হোতে হোতে মিলিয়ে যায় না। সে তাল তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। একেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।"২

প্রায় প্রতি দেশেই মাঝে মাঝে কোন কোন যুগ এমন হঠাৎ এসে পড়ে যখন দেশে উত্তেজনা থাকে প্রচণ্ড হয়ে। দেশের মধ্যে প্রবাহিত সেই উত্তেজনার প্রচণ্ড তরঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও আপ্লুত করে ফেলে তার প্রকৃতিকে করে অভিভূত। যুদ্ধকালীন সময়ে য়ুরোপে যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে,

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। একথা সত্য যে ঐ ভাব চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের দেশেও দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী কালে বিস্তর গল্প, উপন্যাস লেখা হলো সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে আশ্রয় ক'রে। আজ ইংলণ্ডের বা ইউরোপের সাহিত্যের মতই এখানেও সেই উত্তেজনার জোয়ার ক্রমশ ভাঁটার দিকে। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে পেশ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপমার সাহায্যে। তিনি লিখেছেন, "ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখনকার সাহিত্য-সূর্য তারি কলঙ্করেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাক্‌লেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতি সত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।" ৩

সাহিত্য-বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা-এই প্রসংগে কবি বলেছেন যে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে কোন জিনিস সংগ্রহ করবার জন্যে এই বিশ্লেষণী পন্থা গ্রহণ হচ্ছে। যে সাহিত্য আলোচিত হতে চলেছে তার উপাদানগুলিই কি বেছে নেবার জন্যে এই প্রচেষ্টা? তাই যদি হয় তবে তার প্রয়োজন নেই। যেহেতু উপাদানসমূহকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেন যে 'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।' বিষয়টিকে ভালো করে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন—"প্রচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাঁকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরাপড়া সত্ত্বেও জোর করে বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী··· ॥৪

অনেকের মনে একটা ধারণা দানা বেঁধে আছে যে সাহিত্যে কেবলমাত্র একটি সত্য বর্তমান তা হলো প্রকাশের সত্য অর্থাৎ যা বলতে চাই তা প্রকাশ করবার পন্থাগুলো যদি অযথা হয় তাহলেই তাকে বলা হলো মিথ্যে আর যথাযথ হলেই তাকে বলা হ'লো খাঁটি। একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের আদি সত্য হচ্ছে তার প্রকাশ। কিভাবে তাকে প্রকাশ করা হলো সেইটেই মূল কথা। কিন্তু তা-ই কি শেষ কথা? এর মীমাংসা করতে গিয়ে কবি জীববিজ্ঞানের তত্ত্বের দোহাই টেনেছেন। বলেছেন, "জীবরাজ্যের প্রথম সত্য–হচ্ছে প্রটোপ্ল্যাজম, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজমের মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজমকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।" ৫ এটি লোকেন পালিতকে লেখা একটি পত্র থেকে তুলে দেওয়া হলো।

এবার আরো বাস্তবমুদ্রে অবগাহন করা যাক। ভারতের কৃষিসমস্যা চিরন্তন। এই সমস্যার স্বরূপ কবির অজানা ছিল না। চাষের জমির প্রাচুর্য নেই। তাই খাদ্যশস্যের প্রয়োজন মেটাতে হোত জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সত্যটিকে তিনি বেঁধে দিলেন কবিতার ছন্দে।

"যাই ফিরে যাই মাটির বুকে যাই চলে যাই মুক্তি সুখে
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে
আজ ধরণী আপন হাতে অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।" ( মাটির ডাক )

আমরা মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করি কিন্তু যতটা পরিমাণ খাদ্য মাটির দরকার তাকে তা দেই না। তারই ফলশ্রুতিরূপে কয়েকবার ফসল দেবার পরেই মাটি খাদ্যাভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং সেই সংগে মানুষও খেতে পাচ্ছে না। বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটিই কবি তাঁর এই কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। একই কথা তিনি ১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে ঘুরে আসার পর বলেছেন এক বক্তৃতায় ১৯৩২ সালে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারের গতি চক্রপথে মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। মাটিতে ফসল লাগানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখাপূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে।"

কবি এঙ্গেলসের "ডায়ালেকটিস অব নেচার" পড়েন নি। কিন্তু নরবানর থেকে আজকের এই মানুষের রূপান্তর গ্রহণে সামাজিক শ্রমের ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ যা বলেছেন, কবিও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

"দেহের দিক হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানে—যেখানে সে দুই পদের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি আহরণ করিল।...দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।

পায়ের কাছ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তাহলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মত অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাঠির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন এক বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নবস্ত্রের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।"

বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি অনেক সময় সমাজের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যে হাঁ-ধর্মী প্রোটন এবং না-ধর্মী নিউট্রনকে যে অতি প্রবল এক শক্তিঘরের বিবাদ মিটিয়ে একসূত্রে বেঁধে রেখে বিশ্বের ভাঙনকে রক্ষা করেছে তা বোঝানোর জন্যে কবি প্রাক্ বিপ্লব মহাচীনের ইতিহাস থেকে উপমা দিয়ে বলেছিলেন "চীন রিপাব্লিকের শান্তি নষ্ট করে কতকগুলি একাধিপত্য-লোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই করে দেশটা ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধ দলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তাহলে শাসনের কাজে এদের সকলকে

এক করে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ ক'রে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির ওপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বশান্তি রক্ষা হচ্ছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষী শান্তি নয়।···যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।"

'রাশিয়ার চিঠিতে বিপ্লবতত্ত্বের ব্যাখ্যা কবি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভাষায় করেছেন। বলশেভিকবাদের অভ্যুদয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন "বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব (depression) ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেশন করে মারমূর্তি ছুটে আসে এও সেই রকম কাণ্ড। মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙ্গে গিয়েছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব।"

জগতের সমস্ত পদার্থই গতিশীল আর সেই গতির মূলে আছে মহাকর্ষ শক্তি। এ সম্বন্ধে কবি বলছেন "নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।"

বিশ্বপ্রকৃতির চক্রাবর্তন গতি বোঝাবার জন্য কবি যে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সত্যই অপূর্ব।

"ফুল যখন ফুটিয়া ওঠে মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র সেকথা গোপন থাকে।···আবার ফলকে দেখিলে মনে হয় সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, একথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক মেজাজের একথা বহুবার বলা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক মন গড়ে উঠবার পশ্চাতে ছিল নানা ঐতিহ্য। মানুষের পরে ঐতিহ্য ( Herldity ) এবং পরিবেশের ( Circumstance ) প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তা বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভের বস্তুবাদী মতকে সমর্থন করে। কবি বলেছেন "একটি মানুষের মনের পিছনে আছে অসংখ্য সংস্কার বংশগত সমাজগত জাতিগত ভাষাগত বিচিত্র উপাদানে গঠিত তিনি। জৈব ও ঐতিহাসিক সামাজিক ও ভৌগলিক বিভিন্ন কার্যকারণ পরম্পরা গঠিত মানবের এই দেহ ও মন। তাহার ব্যক্তিপুরুষ সৃজিত হইতেছে এই বিচিত্র উপকরণের ঘাত প্রতিঘাতে। এই সবের ভার মানুষ যুগযুগান্ত ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে এবং পারিপার্শ্বিকের নিত্য প্রভাব ও সাহচর্য নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া মানুষকে জটিল জীবরূপে গড়িতেছে।

কবি হয়তো আদর্শবাদী ছিলেন কিন্তু তার আদর্শবাদ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নয় বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করে নয় তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ সেই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ।···স্পষ্টের উপরে অস্পষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক।···ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে আপন বাণী পাঠায় অব্যক্ত।···সংসারের নিয়মকে জেনেছি—মূঢ়ের মত তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে।"

তাহলে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কবির আদর্শবাদ বস্তুবাদকে উপেক্ষা করে নয়, বরং তাকে স্বীকার করেই। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে উপলব্ধি করবার প্রচেষ্টা তাঁর আবাল্য।

কলা ও বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ হলে ( এলিয়টের ভাষায় সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ ) বিজ্ঞানের ক্ষতির দিকটা তত বেশী ভারী হয়ে উঠবে না; কলা শিল্পও বেঁচে থাকবে তবে তা হয়তো শিল্পনামধারী কারুকাজকরা কবরে।

বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ-ই একমাত্র শিল্পী যার মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত এবং যিনি কাল্পনিক সংগতিকে উপেক্ষা করে অসংগতির সৌন্দর্য'কে উপলব্ধি করেছেন যথার্থভাবে। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন "......এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে......তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারেনি আমার মনে কোন পৌরাণিক বিশ্বাস, কোন বিশেষ পার্বণবিধি।.........তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরে স্থান দিতে চেয়েছি।"

তথ্যপঞ্জী :

(১) সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে ( ১৩৪৪ ) পৃঃ ৬২ (২) প্রবন্ধ, ভাদ্র ১৩৪১ (৩) 'সাহিত্য-ধর্ম' বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৪ (৪) সাহিত্যবিচার প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৬ (৫) লোকেন পালিতকে পত্র। সাধনা—১২৯৯।

# ঘেঁটু ঠাকুর ও ঘেঁটু গান

**নারায়ণ দত্ত**

আজ কার দেবকুলে ঘেঁটুঠাকুরের কোন কৌলিন্য নেই। সে নিতান্তই গ্রাম্যদেবতা। চর্মরোগ পীড়িত আর্ত মানবকে ত্রাণ করাই তার দেবধর্ম। তবে মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, ওলাবিবি, শীতলা, বনদুর্গা প্রভৃতি লৌকিক দেবীদের মত দাপট তার নেই। পুরুষ দেবতা বলেই বোধ হয় গ্রামে ঘরে তার বোল বোলা কম। বার মাস পূজা পাবার ভাগ্যও তার নয়। ঘেঁটু মর্তধামে বছরে একদিনের জন্যে আসে। সেদিনই তার পূজা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদায়। তার পূজা বা বিসর্জনের ঘটা দেখলে দেবতার ওপর করুণা হয়।

ফাল্গুনের দিন ফুরিয়ে আসে আর চৈত্রের খরা সুরু হয়, ফাল্গুনের সেই শেষ দিনটিতে বাঙলার গ্রামে ঘরে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা হয়। ফাল্গুন সংক্রান্তির অন্য নাম তাই ঘেঁটু সংক্রান্তি। ঘেঁটুর পোষাকী নাম ঘণ্টাকর্ণ। ঘেঁটুর শাস্ত্রসম্মত কোন ধ্যানমূর্তি নেই। কিন্তু পূজার মন্ত্র আছে। মন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘণ্টাকর্ণকে মহাবীর বলে তার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশক।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥

এই মন্ত্র রঘুনন্দনের তিথ্যাদিতত্ত্ব অনুসারে। মন্ত্রের ব্যবস্থা থাকলেও মন্ত্রানুযায়ী ঘেঁটুপূজা বড় একটা দেখা যায় না। পূজা অবশ্য হয়। কিন্তু সে পূজার কোন ঘটা নেই। পূজা করে বাড়ীর মেয়েরা। দেবতার মূর্তিও ভিন্ন। সাধারণত একদম কাক-ডাকা ভোরে বাড়ীর দরজায় বা রাস্তার তেমাথার মোড়ে মেয়েরা এই পূজা করে থাকে। মুড়ি-ভাজা খোলার ভাঙা কালি-পড়া টুকরোর ওপর এক তাল গোবর রেখে তাতে দুটো কানাকড়ি বসান হয়। তারপর আকাঁড়া চাল আর মুসুর ডালের নৈবেদ্য সাজিয়ে ঘেঁটু ফুল আর অশোক ফুলে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা করা হয়। পূজার শেষ হতে যা দেরী, লাঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘেঁটুকে ভেঙে ফেলা হয় যারা ভাঙে তারা কদাচ ঘেঁটুর দিকে তাকায় না। পাছে দেবতার কোপ পড়ে। গ্রাম্য কবি ঘেঁটু ঠাকুরের রূপ বর্ণনা করেছেন—

রূপটি তোমার কেলে হাঁড়ি চক্ষু দু'টি কাণা কড়ি
মাথাতে গোবরের মুড়ি আহা মরি, কি গঠন!

পাঁচালীকারদের উত্তরসূরী কবি স্বভাবতঃই পূজার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন—

ঘেঁটুফুল আর অশোক ফুলে প্রতি দ্বারে দ্বারে তোমা
আকাঁড়া চাল আর মসুর ডালে পূজে যত নারীগণ।

ঘেঁটু কুলীন দেবতা না হতে পারে কিন্তু, বোধকরি নিতান্ত অর্বাচীন নয়। শীতলার অঙ্গদেবতা হিসেবে ঘেঁটু পূজার বিধি আছে। মহামারীর সময় শীতলা পূজা হলে ঘেঁটুরও একটা নৈবেদ্য মেলে। মুখ্যতঃ চর্মরোগের দেবতা হলেও মনে হয় এককালে ঘেঁটু বসন্ত রোগেরও ত্রাতা হিসাবে পূজা পেত। যে মন্ত্র পড়ে মেয়েরা আজকাল ঘেঁটুর পূজা করে তাতেও সেই ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটি বিচিত্র—		হামবসন্ত নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।
পানবসন্ত নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।
খোসচুলকানি নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।

সংস্কৃত মন্ত্রে যে বিস্ফোটকের উল্লেখ আছে সেটা সম্ভবতঃ বসন্ত। ঘেঁটুগান মুখ্যতঃ ঘেঁটুঠাকুরের গান। দেবতার মত এই গানেরও কোন কৌলিন্য নেই। গানগুলি নিতান্তই লোকসংগীত। এক ধরণের মঙ্গলগান। তবে সেগুলিতে দেববন্দনা বা দেবতার মাহাত্ম্য। কীর্তনের চেয়ে দেবতাকে নিয়ে লঘু পরিহাসের ঝোঁকই বেশী। কোন ধ্রুপদী মহত্ত্ব সেগুলিতে আবিষ্কার করার চেষ্টা বৃথা। গান হিসাবে তাদের মূল্য সামান্য।

অনেকে মনে করেন ঘেঁটুগান আর যাই হোক গান নয়। হয়ত তাই। কিন্তু গ্রামের মানুষদের কাছে তাদের আদর কম নয়। ঘেঁটুগানের কল্যাণে তাদের প্রায়-শুষ্ক প্রাণনদীর বুকে অন্ততঃ এক রাত্রির জন্য আনন্দের জোয়ার আসে। ঘেঁটুগানের সেইটুকুই সান্ত্বনা।

ঘেঁটুপূজার চেয়ে ঘেঁটুগানের জমজমাট বেশী। ঘেঁটুঠাকুরকে স্মরণ করে ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যার বিচিত্র ছড়া ও গানের বেশ সমারোহ হয়। গায়কদের কাঁধে থাকে কলার বাসনা ভাঁজ করে তৈরী একটা লণ্ঠন। ভিতরে টিম টিম করে অনুজ্জ্বল প্রদীপ। কেউ কেউ বা হ্যারিকেন ব্যবহার করে। কিন্তু সদ্যফোটা বর্ণসংকর ঘেঁটুফুলের রাশি দিয়ে আলো সাজাতে কেউ ভোলে না। বাংলাদেশের আঙিনায় নিতান্ত অযত্নে ফোটা প্রকৃতির এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য এই একটি দিনের জন্য জাতে ওঠে। এই কদরের কারণ আছে। ঘেঁটুফুলে আলো না সাজালে গৃহস্থের পূজা মেলা ভার ঘেঁটুফুলের সেদিন তাই ভিন্ন মর্যাদা।

এই ঘেঁটুফুলে সাজান লণ্ঠনটি কাঁধে করে ছেলে-বুড়োর ছোট-বড় দল বাড়ী বাড়ী ছড়া কেটে বা গান গেয়ে ঘেঁটুর পূজা চেয়ে বেড়ায়। এই ছড়াগুলির বাণী যেমন বিচিত্র তেমনি রহস্যজনক। সব ছড়াই সুরু হয়—ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় খোস পালায়। তারপর বলা হয় 'আয়রে ঘেঁটু নড়ে, হস্তী কাঁধে করে'। সংস্কৃত মন্ত্রে ঘেঁটুকে যে মহাবীর বলা হয়েছে, তার একটা নজীর পাওয়া গেল। মহাবীর ঘেঁটু হাতিকে কাঁধে করে আনবে এ আর আশ্চর্য কি? তারপর গাওয়া হয়—

'ফাল্গুন গিয়ে চৈতের কোল।
বছর বছর গেয়ে তোল॥'

ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যায় গান গেয়ে দেবতাকে বিদায় দিতে হয়, কবির বক্তব্য বোধ হয় তাই। তারপর অন্যান্য ছড়ায় থাকে পূজার অনুপাতে দেবতার কৃপাবৃষ্টির দীর্ঘ ফিরিস্তি—

'যে দেবে মুঠো মুটো।		যে দেবে বাটি বাটি।
তার হবে হাত ঠুটো॥		তার হবে চালতাগা'টি॥
(কৃপণতার সাজা আর কি!)		(মসৃণ নিরোগ গাত্র)
যে দেবে কাঠা কাঠা।		যে দেবে মরাই মরাই।
তার হবে সাত ব্যাটা!		তার দুয়ারে ঘেঁটু ছড়াই॥ ইত্যাদি।

গায়কদের সঙ্গে ঘেঁটুফুলে সাজান আলো না থাকলে গৃহস্থের পূজা পাওয়া শক্ত। কিন্তু ঘেঁটুফুল

বাড়ীতে ফেলে গেলে গৃহস্থের বড় অকল্যাণ হয়। গ্রামীণ সংস্কার অন্ততঃ তাই। শেষ ছড়াতে সেই ভয় দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, ঘেঁটুরাজ লোভী নন। মরাই বা গোলা প্রমাণ চালের পূজা তিনি গ্রহণ করেন না। জানি না এ ছড়ার রচয়িতা কোন প্রাচীন কবি, কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট 'প্রাকটিক্যাল' ছিলেন সন্দেহ নেই। মরাই মরাই চালের পূজা কোন গৃহস্থই যখন দেবে না তখন নির্লোভ ঔদার্য একটু দেখালেই বা ক্ষতি কি। দেবতার যত দোষই থাক, দেবতা যে লোভী নন, তার একটা বড় প্রমাণ ত রয়ে গেল।

ঘেঁটু পূজায় ছড়া ছাড়াও অনেক গান বাঁধা হয়ে থাকে। রীতিমত দল বেঁধে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাওয়া হয়। এমনি একটি গান—

'ও সজনি, খোস চুলকানি বিষম দায় খোসের জ্বালা যায় না সওয়া
মরি, হায় গো হায়। পিরীত জ্বালা সওয়া যায়।
মরি, হায় গো হায়॥

খোস চুলকানির জ্বালায় পারিবারিক অবস্থা কি কৌতুককর হয় তার গ্রাম্য বর্ণনা আছে—

ঘেঁটুর পূজা দাওগো জননী। গিন্নী মরে খোসেরজ্বালায়
কোথায় গেলে ও বাড়ীর গিন্নী॥ চুলকে চুলকে কর্তা হাঁপায়
পূজা দেবার লোক যে মেলেনি॥
ঘেঁটুর পূজা…………ইত্যাদি।

সব গানেই ঘেঁটুকে কিছু না কিছু রসিকতা করা হয়েছে এবং সব সময় যে শালীনতা বজায় রাখা হয় এমন নয়। ঘেঁটু যেদিন আসে সেদিনই বিদেয় নেয়। কবির কাছে মনে হয়েছে তার আদর যেন মৃত কন্যা মাতার কাছে জামাই-এর আদর। কবি বলেছেন—

'ওগো আমার কেলে জামাই পিঁড়ে আমার বাপের বাড়ী
তোমায় আমি কোথায় বসাই মানে মানে হও বিদেয়।'

ঘেঁটুর বাসর-ঘর কুৎসিতরূপ ঐ সব নিয়েও কবির ব্যঙ্গ রসিকতার অন্ত নেই।

ঘেঁটু-সংক্রান্তির গানের দেবতা-নিরপেক্ষ অন্য একটা ভূমিকাও থাকতে পারে। ফাল্গুন কুসুমের মাস। আবার আনন্দের সময়। তার সাজি ভরে থাকে নূতন জাগা কিশলয়ে, পলাশ আর আর কিংশুকের অপর্যাপ্ত বর্ণ-সম্ভারে। তা' ছাড়া, এ সময় সদ্য-ওঠা ফসলের পরম পরিতৃপ্তিতে বাঙলার চাষীমন জুড়ে এক অনির্বচনীয় শান্তি আশ্রয় করে। তাই কুসুমের এই মাসকে বিদায় দেবার জন্যে গ্রাম বাঙলা সামান্য জলসার আয়োজন করে। গানের আসর বসায়। ঘেঁটু সংক্রান্তির গানে তার সানন্দ মনখানি।

ঘেঁটু গানের আয়ু আর কতকাল, কে জানে। তবু আজও, ফাল্গুন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে ওঠবার আগেই গ্রামের বাতাস এই বিচিত্র গানের সুরে ভারী হয়ে ওঠে। তারপর রাত গভীর হয়। পুব আকাশের সাত-তারা মাঝ আকাশে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রামের শেষ প্রান্তে শিয়ালগুলো হঠাৎ আনমনে ডেকে ওঠে আর ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যায় ছোট-বড় গলায় ঘেঁটুর গান ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে একেবারে থেমে যায়। ফাল্গুন শেষ হয়। চৈত্র এসে পড়ে।

## শিল্পে আবেগ

বাইরের জগৎ নানান রূপে রসে মশগুল হয়ে আমাদের ভেতরকার রঙমহালে এসে হাজির হয়; তার সেই জামদানী বিলাস আর জাফরানী জলুস দেখে মনের চোখে ভাব লাগে। একেই বলি আবেগ। এমনি করে ছোটো ছোটো ঘটনা টুকরো টুকরো ছবি কিংবা কাটাছেঁড়া জিনিসের অফুরন্ত মিছিল চলেছে সদর থেকে অন্দরের দিকে। চলতে চলতে অনেক দেউড়ি পেরিয়ে একসময় এ মিছিল অনুভূতির উজান হয়ে ওঠে অমনি আবেগ জাগে উজানের এপারে ওপারে। যে-কোনো আবেগই অগুণতি দোলনের যোগফল। তবে সব রকমের দোলন সকল ছাঁদের আবেগ জাগাতে পারে না—এ কথা জীবনের পথ-চলাতে যেমন সত্যি তেমনি শিল্পের কারুশালাতেও। আবেগমাত্রই বাঁধা পরিবেশের সাথে জোড়মেলানো। শিল্পীর ক্ষমতারও একই হাল। ইচ্ছেমত রসিকমনে আবেগের ঢেউ তোলার ব্যাপারটা পুরোপুরি তাঁর হাতের মুঠোয় নেই। কারণ কারুকাজের কোনো বিষয় শিল্পীর একই আবহাওয়ায় পুষ্ট রসিকমনে সমান আবেগের মাতন লাগলেও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অভিজ্ঞতায় গড়েওঠা রসিকমনের আওতায় তা এমনিধারা অঙ্কমাফিক দুয়ে দুয়ে চার না ঘটাতেও পারে, সেখানে শিল্পীর আবেগের সাথে ঐ বেএক্তিয়ার রসিকমনের আবেগের অমিল হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়।

সাবেক আমলে শিল্পের লক্ষ্যই ছিল শিল্পীমনের আবেগকে ছোঁয়াচে করে তোলা যাতে তা সহজে রসিকমনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন শিল্পের নজর থাকত আবেগকে জীবনের ছলছুতো খেয়োখেয়ি থেকে মুক্ত করে ওপর কোঠায় নিয়ে যাবার দিকে, মানে—তাকে একটা দরাজ শরীফানায় পৌঁছে দেবার দিকে। এ ধরণের আবেগ সরাসরি জগতের রূপ-রস থেকে আসে না, আসে বাইরের জগতের রূপ-রসকে ঘিরে শিল্পীমনের বুঁদ হওয়া ভাবনার সড়ক বেয়ে। অবশ্য কালবদলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আর যুক্তির ঝাঁঝালো স্বাদে আবেগের ঐ উঁচুতলায় শরীফানা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এক সময় বেমালুম মুছে গিয়েছে। তাই আজ আমরা আবেগকে নিয়ে একেবারে নীচের মহলে নেমে এসেছি এঁদো জীবনের পাঁচরঙে আরো বেশি করে মাতাল হতে।

যখন আবেগ প্রকাশ করি তখন একটু আমরা তলিয়ে দেখিনে যে, আবেগ প্রকাশ করা মানে হচ্ছে, প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আবেগগুলোকে মাত্রায় বেঁধে দেওয়া, মেজাজের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়ার মিতালি গড়ে তোলা। আবেগ যদি প্রকাশ করা না যায় তবে মনের দশা হবে মাঝদরিয়ায় ঝড়-বাদলে দিশেহারা জাহাজের মতো। তাই পরের দুখে কেঁদেও আমরা সুখ পাই, নিজের দুঃখ পরকে জানিয়েও। কারণ কিছুটা আবেগ বাইরে মেলে দেবার ফলে তোলপাড় ভাবটা যখন কেটে যায় তখনই আমাদের ভেতরমহল হাঁপ ছাড়ে। এমনিধারা পরের ব্যথাকে নিজের করে নিয়ে আর নিজের ব্যথাকে সবাইকার করে তুলে শিল্পের সাঁকো বেয়ে মন একটা খোলা

আঙিনায় খালাস পায়। দেখতে দেখতে আনন্দের আলোয় আমরা ভরে ওঠি। তাহলে এটুকু বোঝা গেল, দুঃখের গভীর থেকে আবেগ বেদনাকরুণ হয়ে এলেও শিল্প তাকে চোলাই করে আনন্দকে খুঁজে নেবেই। আর আবেগের প্রকাশেই যে এই আনন্দের গোড়াপত্তন তার বড়ো নজির হচ্ছে বর্ষারাতের কানাড়া, যক্ষের বিলাপগাথা, যিশুর করুণ মৃত্যুর নিচে মেরির ব্যাকুল ছবি।

এখন, আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে আবেগের চেয়ে প্রকাশের ওপর জোর দিলে শিল্প অনেক সময় অবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই আবেগপ্রবণতা একই সাথে শিল্পের গুণ এবং দোষ। গুণ একারণে যে, শিল্পীমনের ঢেউ-জাগানো আবেগের পুরো চেহারাটিই এ ধরণের শিল্পে রেখায় রেখায় ধরা পড়ে, কোন ফাঁকফোকর দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবার জো নেই। আর দোষ বলছি এজন্যে যে, কোনো একটা আবেগের পুরো চেহারা ফুটিয়ে তোলার দিকে বড়ো বেশি মেতে উঠে আর পাঁচটা আবেগকে, সে সঙ্গে কারুকাজের উপযোগী শিল্পের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে হাতের-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা করে শিল্পীমন গোটা শিল্পটাকে কাঁচিয়ে ফেলে। কাজেই আবেগকেও পুরোপুরি রাখব অথচ শিল্পকেও নষ্টচাঁদের কোপে পড়তে দেব না—এই যদি অবস্থা দাঁড়ায়, তখন একই সময়ে প্রকাশের ওপর জোর রাখা আর আবেগের ওপর নজর রাখাই এলেমদার শিল্পীর কাজ।

পয়লা নম্বরের শিল্পীমনের এমন একটা-সকল ছোঁয়া দরদ থাকে যা আশেপাশের হাজার মানুষের গোপনচারী আবেগগুলোকে সহজেই আঁচ করতে পারে। তারপর সেই কুড়িয়ে পেয়ে ডালি-ভরানো আবেগের ওপরেই চলে তার মুন্সিয়ানা। ফলে, অনেক আবেগের যোগে শিল্প হয় বেগবান। কিন্তু যে-শিল্পী অমনিধারা দরদের পরোয়া না করে শুধু নিজের আবেগেই রূপ গড়েন কারুশালায়, শিল্প তাঁর একচেটে রসদে রঙমশাল হয়ে ওঠে। এ হেন মশালমার্কা শিল্প দিয়ে নওরোজের রোশনাই সাজানো যায়, ঘরে পিদিমের অভাব দূর করা যায় না।

আমরা অনেক সময় জীবনকে আবেগ দিয়ে দেখি, ভাবনা দিয়ে দেখি নে। এ দেখার একটা বড়ো বিপদ হচ্ছে এই যে আবেগের বশে কখনো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে জীবনকে জড়িয়ে ধরি, কখনো বা দুঃখে হতাশায় নুয়ে পরে জীবনের কাছ থেকে পালাতে চাই আত্মঘাতী হব বলে। কিন্তু শিল্পের বনেদটি যদি পাকাপোক্ত না হয় তবে সে তো ভাবের এমনিধারা আচমকা পালা বদলে বেসামাল হয়ে ওঠে। তাই শিল্পের হাতে জীবনের সেই আসল রূপটিকে তুলে দিতে হবে যা নিছক সত্যের দামে কেনা, আবেগের চড়া পালিশে যা বহুরূপী নয়। তখনই ভাবনার দরকার। কারণ হেসে-কেঁদে-ভাসিয়ে দেওয়া আবেগের অগোছালো ধারাগুলো ভাবনার নিপুণ খাত বেয়ে পাড়ি জমালেই শিল্পের স্বপ্নসফল সাগরমেলাকে পাবে। নইলে নিজের উচ্ছ্বাসে দিনকানা রাতকানা হয়ে এলোমেলো ঘুরে একদিন হারিয়ে যাবে আড়ালে।

এখন আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে, শিল্পের সওদাগিরিতে আবেগের কী দাম। ধরা যাক, আমরা যদি ভাবগুলোকে নিয়ে ইচ্ছেমতো আবোল-তাবোল খেলা খেলতে থাকি, কিংবা কারুশালায় খেয়ালমাফিক উছলে-ওঠা রসের মজলিস বসিয়ে দিই, তবে আবেগের কি কিছুই করবার নেই! নিশ্চয়ই আছে। আবেগ তখন হাজার ভাবনার ভেতরে একটা বনিবনা গড়ে তুলতে পারে, কিংবা হাসি-কান্না আশা-বেদনার যে-কোনো একটা ঢেউকে জোরালো করে তুলে আমাদের

ভুলে যাওয়া পথটাকে নোতুন করে বাতলে দিতে পারে। নইলে আবেগ ঝিমিয়ে পড়লেই কল্পনার গোঁজামিল দিয়ে শিল্পে আমরা ফাঁকির পসরা সাজাব। কারণ জগতের মাঠে ঘাটে ঘুরে ফিরে আমরা আবেগকে মুঠোয় পুরি, অথচ সেই আবেগের ভেতর দিয়েই ছুঁয়ে ফেলি জগতের পরম সত্যকে। শিল্পের কারিগরি তাই যতটা ভর দিয়েছে ভাবের ওপর, তার চেয়ে আবেগের ওপর ভরসা করে রয়েছে বেশি।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে-শিল্পী খুনীর চরিত্র আঁকেন, তিনি জীবনে কোনোদিন নিজের হাতে খুন না করেও খুন করবার ঐ তেজী আবেগগুলোকে কোথা থেকে জোগাড় করেন! আমার মনে হয়, শিল্পীর কাজ এখানে শুধু জোড়া দেওয়া। কারণ ঈর্ষায় বিষিয়ে ওঠা, হিংসেয় জ্বলতে থাকা, হতাশায় ভেঙে পড়া, অপমানের লাগসই বদলা নেবার আক্রোশে গুম্‌রে মরা—এমনিধারা আবেগই মনের ভেতরে খুনের ইচ্ছে জাগায়। সংসারে পাঁচজনের সাথে চলাফেরা করতে গিয়ে কোনো-না-কোনো ব্যাপার থেকে আলাদা-আলাদাভাবে ঐ সব আবেগ শিল্পী ভেতরমহলে জমিয়ে রাখেন। এখন, খুন করবার ঠিক আগের মুহূর্তে খুনীর যে-মনোভাব থাকে সেটি সাঁচ্চাভাবে গড়তে গেলে শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে আবেগগুলোকে জোড়া দিতে সুরু করেন; অবশ্য এ জায়গায় কল্পনার রঙ লাগিয়ে তিনি আবেগের মাত্রা কিছু চড়িয়ে দেন। ফলে, ঐ চড়া আবেগের যোগফলে যা পাই তা হচ্ছে একটি খুনীর চরিত্র।

সব আবেগই শিল্পে এসে প্রতিমার রূপ নেয়। তখন তাদের মানে খুঁজে বের করতে মাথা খাটাবার দরকার পড়ে! কাজেই শিল্প শুধু আবেগ নয়, শুধু প্রতিমা নয়, কিংবা দুয়ের জরাসন্ধও একে বলতে পারি নে। শিল্প হচ্ছে আবেগের অতল-ছোঁয়া ভাবনা। আবেগকে যখন শিল্পের বিষয় করা হোলো তখনই তার আর ভালো-মন্দ রইলো না, বিশেষ মন থেকে উঠে এলেও বিশেষ মনের ছাপ সে হারালো, একটা সত্যিকারের ঘটনার গতিকে বয়ে নিয়ে যাবার, যাচনদার হয়ে কোনো কিছুকে পরখ করবার ওপর উঠে গেল। সে তখন পটে-লেখা প্রতিমার রূপ নিয়ে ঠাঁই পেল শিল্পের আসনে।

আবেগ এমন একটা জিনিস যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যাকে বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝিয়ে দিতে পারি নে। শিল্প আমাদের মনে বিশেষ কোনো আবেগ জাগিয়ে তোলে—তার মানে এই নয় যে, ঐ আবেগটি শিল্পের মাঝে সাজানো ছিল। আসলে আমার আবেগ আছে আমারই ভেতরে, শিল্প শুধু সেই আবেগের দেরাজ খুলবার চাবিকাঠিটি নিয়ে এসেছে। এমনিধারা আবেগকে ব্যাখ্যা করে কেউ যদি বুঝিয়ে দেবার কাজে লাগেন তবে বোঝা যে গেল না এইটেই বেশি করে বুঝে নিই। যে মালকোশ চেয়েছিল তাকে তালশাঁস এগিয়ে দিলে তার উদর ভরে, হৃদয় ভরে না। আবেগের ব্যাখ্যা শুনেও তেমনি লাভের আঁক কষে কষে জ্ঞানের কোঠা বোঝাই হতে পারে, কিন্তু আনন্দের রসখোলাতে জিরেন-কাট একেবারে বন্ধ। কারণ আবেগের জোড় লাগিয়েই শিল্পের কারুকাজে একটা মেজাজ ফুটিয়ে তোলা হয়। আবেগকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ঐ জোড়ের জায়গাগুলোয় যা লাগে। ফলে গোটা মেজাজটা এবং সে সঙ্গে পুরো শিল্পটাই বেলোয়ারী ঝাড়ের মতো ছড়িয়ে পরে হাজারখানা হয়ে।

**দেবব্রত চক্রবর্তী**

## ছোট গল্প অধ্যয়নের গোড়ার কথা

আধুনিক সাহিত্যের আসরে ছোটগল্পের স্থান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তার এই দৃঢ় প্রতিষ্ঠার মূলে আছে প্রধানতঃ আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালীর দ্রুতগতি। জীবনযাত্রার দ্রুতি-হেতু এযুগের অনেক মানুষেরই বিরল পরিসরের গল্প উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করবার অবসর বা ধৈর্য নেই। তাঁদের কাছে একটি বড়গল্প বা উপন্যাস অপেক্ষা একখণ্ড সাময়িক পত্রিকার আকর্ষণ অনেক বেশি। এই কারণে বর্তমানে সাময়িক পত্রপত্রিকার এতো চলন; এই কারণেই ছোট গল্প আজকের পাঠকদের কাছে এতো অধিক সমাদৃত!

তবে, একটা কথা। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ছোটগল্প উপন্যাসের আসর দখল করে নেবে। কিন্তু এরকমটি ঘটবার সত্যিই কি কোন সম্ভাবনা আছে? প্রকৃতপক্ষে মনোযোগের সঙ্গে উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে যাঁরা ছোটগল্পে মধ্যে উপন্যাস বিলীন হওয়ার কথা চিন্তা করেন, তাঁরা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলকথাটিইল্প জানেন না।

উপন্যাসে মানুষের সমগ্র জীবনটি তার জটিলতা এবং তার বৈচিত্র্য নিয়ে চিত্রিত হয়; অন্যদিকে ছোটগল্পে জীবনের মাত্র একটি বিশেষ দিক বা ঘটনাকেই রূপায়িত করা হয়। ছোটগল্পে উপন্যাসের মতো ব্যাপকতা নেই। উপন্যাসে চরিত্র এবং কাহিনী বিশ্লেষণের বা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণের যে ক্ষেত্র রয়েছে ছোটগল্পে তার সম্পূর্ণ অভাব। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে উপন্যাস এবং ছোটগল্প হচ্ছে সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি আঙ্গিক; দুইয়ের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব স্বাভাবিক কারণেই এই দুইয়ের একে অন্যের স্থান দখল করতে পারে না। সুতরাং এরা উভয়ে উভয়ের প্রতিযোগী নয়, উভয়ে একই গদ্য সাহিত্যের ভিন্ন রূপ।

অবশ্য এটা ঠিক যে, বর্ত্তমান জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যহেতু পাঠকমহল ছোটগল্পের প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহান্বিত।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এডগার এ্যালেন পো বলেছেন যে, আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা দু'ঘণ্টা পড়তে লাগে এমন বর্ণনাত্মক গদ্যই হচ্ছে ছোটগল্প। অর্থাৎ এডগার পো ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে তার দৈর্ঘের দিকেই সবিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, পরিমাণ ব্যতীত উদ্দেশ্য; আর্থিক, এবং গঠনের দিক থেকেও উপন্যাসের থেকে ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সূত্র হচ্ছে যে একটি ছোটগল্পে মাত্র একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, এবং তা সীমিত থাকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে; আর, সেই বিশেষ পরিসরের কাঠামোর

মধ্যেই লেখকের বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে সরলতল ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, একটি ছোটগল্পের উদ্দিষ্টকাল মাত্র একটি ঘটনা বা একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেই হবে। বিপরীতক্রমে, ক্ষেত্রবিশেষে একটি ছোটগল্পের আয়তন একটি উপাখ্যানের আয়তনের চেয়ে অল্পবিস্তর বড়হয়েও সার্থকছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতিপাওয়া অস্বাভাবিক নয়, অবশ্য যদি লেখকের মুন্সীয়ানা থাকে।

ছোটগল্পের রচনাকৌশল সম্পর্কে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে 'ঐক্য' ;—অভিপ্রায় ( of motive ), লক্ষ্য ( of purpose ), রূপদানের ( of action ) ঐক্য এবং তারও পরে আছে—ফলাফলের দিক থেকে—পাঠকের মনের ওপর ঐ গল্পের প্রভাবের ঐক্য ( unity of impression ) এই কারণেই ছোটগল্পে থাকে একটিমাত্র 'আইডিয়া' এবং সেই আইডিয়াটি রূপায়িত করা হয় বিশেষ একটা ক্রম ( method ) অনুযায়ী বিশেষ একটা লক্ষ্যকে অনুসরণ করে। এইখানে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য লক্ষিতব্য। এতো বেশি কাহিনী বা ঘটনার টানাপোড়েনে উপন্যাস রচিত হয় যে অনেক সময়ে তার মধ্য থেকে কেন্দ্রগত কাহিনী বা ঘটনাকে সন্ধান করা যায় না ; এবং অনেক সময় বিশ্লেষণের ফলে একটি উপন্যাসে দুই বা ততোধিক ভিন্নমুখী লক্ষ্যের অস্তিত্ব দেখা যায়। পক্ষান্তরে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এমনতর ব্যাপার মোটেই বিধিসঙ্গত নয়। ছোটগল্পের মূলগতআইডিয়া, তার লক্ষ্য, এবং তার রূপায়ণপদ্ধতির মধ্যে কোনরকম জটিলতার স্থান নেই।

এই কারণে ছোটগল্প রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন। ছোটগল্পে ব্যবহৃত একটা বাক্যের ওজন যথাযোগ্য হওয়া দরকার ; প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, যে কোন উপায়েই হোক, পূর্বপরিকল্পিত নক্সার রূপদানে ব্যাঘাতকারী কোন একটামাত্র শব্দের ব্যবহারও ছোটগল্পে স্থান পেতে পারে না। ছোটগল্পে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে অনাবশ্যক কোন বক্তব্যের স্থান নেই, যেখানে-সেখানে গুরুত্ব আরোপ করবার অধিকার নেই, এবং এর প্রতিটা পৃথক অংশকে অতি অবশ্যই সমগ্রের অধীনে রাখতে হয়। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনতর কঠিন নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই। উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরের মধ্যে অনেক পরিহার্য এবং অনাবশ্যক জিনিষ অনায়াসেই স্থান পেয়ে যায়। কিন্তু অল্প আয়তন বিশিষ্ট ঘনসংবদ্ধ ছোটগল্প রচনাকালে তার ছোটখাট প্রতিটা অংশের প্রতি সমানভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর ঠিক এই জন্যেই উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের রচনাকৌশলের সামান্যমাত্র ত্রুটীও অনুসন্ধানী-দৃষ্টিতে অত্যন্ত বেশি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের সহজগ্রাহ্যতা পাঠকের মনে একটা পূর্ণ তৃপ্তির ভাব এনে দেবার ক্ষমতা রাখে।

সর্বশেষে ছোটগল্পের রসিক সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি যে, অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-রচনা কৌশলের সার্থকতা বিচারের মতো ছোটগল্পের রচনাকৌশল বিচারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, এর সার্থকতা এবং সফলতার বিচার করতে গেলে সমালোচকের পক্ষে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত, পুঁথিগত নিয়মকানুনের ( abstract rules ) কড়া বাঁধনের স্মরণ নেওয়া অপেক্ষা সমালোচ্য গল্পের সমগ্র নক্সা এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী তার বিচারে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

গীতা পাল

## সমালোচনা

**রূপদর্শিকা** ॥—অসিতকুমার হালদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য ১০৲

আচার্য অসিতকুমার আজ পরলোকে। বোধকরি জীবদ্দশায় 'রূপদর্শিকাই, তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর স্বরচিত ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত. কিন্তু মূল্যবান। শেষছত্রে আছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়—সধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। এ প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে এমন একজনের কণ্ঠে যিনি দেশ-বিদেশের চিত্রকলায় রূপের রসে বারবার অবগাহন করেছেন কিন্তু ধর্মচ্যুত হন নি। পরন্তু বৃহত্তর বিশ্বের বিচিত্র-চিত্রকলাপ তাঁর পুরাতন ধর্মনিষ্ঠাকেই দৃঢ়তর করেছে। এখানেই অবনীন্দ্র-শিষ্যমণ্ডলী শাশ্বত, এখানেই তাঁরা চিরন্তন।

প্রত্যেক নৈষ্ঠিক শিল্পীর মত অসিতকুমারও শিল্প-সমালোচকদের পল্লবগ্রাহিতার কথা ভেবে আশঙ্কিত আতঙ্কিত। ব্যর্থকাম সাহিত্যিক শেষপর্যন্ত সাহিত্য-সমালোচকে পরিণত হন বলে যে লোকশ্রুতি আছে সেটি বোধহয় অকারণ নয়। শিল্প-সমালোচকরা ততোধিক মারাত্মক। সাধারণতঃ সংবাদপত্রের একটি কলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রী, একটি স্তাবকচক্র—শিল্পীদের সন্ত্রস্ত করতে যে কোন সমালোচকের হাতে এই আয়ুধত্রয় যথেষ্ট। এতে আর্টডিলারের ভূমিকাও আছে। তাঁর কমিশনের পরিমাণের উপরেই সমালোচনা সর্বাধিক নির্ভরশীল। অসিতকুমার বলেছেন—"এইসব দেশবিদেশের তথাকথিত কলা-রসিকেরা কেহই শিল্পীগোষ্ঠীভুক্ত নন। সুতরাং এঁরা চারুকলার রসবিচার করতে পারেন নি।"

এই বিভ্রান্তি আমাদের দেশেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবনীন্দ্র শিষ্যমণ্ডলীর প্রায় সকলেই আজ পরলোকে। যাঁরা জীবিত, তাঁরা বয়োভারে ক্লান্ত। ভারতশিল্পের মুখ্য প্রবক্তা সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট আজ জীবন্মৃত প্রতিষ্ঠান। এই নৈরাশ্যের মধ্যে শেষবারের মত স্বনামধন্য শিল্পী নিজ মত ও পথের কথা অসংখ্য যুক্তি ও ততোধিক বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত দেশবিদেশের শিল্প বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়েছে। ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসকেও তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসের আলোকে।

শিল্প হল যেকোন জাতির সজীব প্রাণের লক্ষণ—অতএব তা ইতিহাস নিরপেক্ষ হতে পারে না। এমন কি শিল্পী যদি নিছক নিসর্গ-চিত্রী হন তবুও তাঁর বর্ণ বিলেপনে, তুলির বর্ণিকাভঙ্গে, কল্পনার প্রসারে ধরা পড়ে ইতিহাস। সমকালীন সমাজচেতনা সেখানে আসবেই। অসিতকুমার এই তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। এমন নয় যে সবক্ষেত্রেই তিনি স্বগোষ্ঠী বহির্ভূত শিল্পীদের প্রতি সুবিচার করেছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি হয়ে উঠেছেন সেণ্টিমেণ্টাল।

ফটোগ্রাফির আবিষ্কারকে অনেকেই চিত্রে শিল্পে আধুনিকতার কারণবলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে মডেলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে ছবি আঁকান হয় তাকে যদি কয়েক সেকেণ্ডে ক্যামেরায় ধরা যায় তবে সেই মডেলের ছবি এঁকে সময়ের অপব্যয় করে লাভ কি ? অতএব ফর্ম ভাঙ্গো। এ-হল অতি মামুলী যুক্তি। ফর্ম ভাঙ্গার মূলে ফটোগ্রাফী অন্যতম কারণ, কিন্তু সেটা মুখ্য কারণ নয়। কমার্সিয়াল আর্টিষ্টের কাছে সেটা বিবেচ্য। কারণ আর্টিষ্ট না হয়ে ফটোগ্রাফার হবে কিনা সেটা তাদের ভাবতে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ফাইন আর্টকে মেনে নিয়েছেন, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ রসের সন্ধানে যাঁরা নিরলস সাধনা করে চলেছেন তারা, ফটোগ্রাফীকে কোন চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করেন নি। আসলে শিল্পীর ক্ষমতা-অক্ষমতাই হল ফর্মের পরিবর্ত্তনে প্রধান সহায়ক। সুররিয়ালিজমকে কেউই বলেন নি "প্রকৃতির বাইরের জিনিস"। বরং তারা একে বলেছেন প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ছন্দ—যা সহসা সাদা চোখে দেখা যায় না, হৃদয়গত উপলব্ধির ব্যাপার। আর সকল বাদবিসম্বাদের পরও দেখা যাচ্ছে কিউবিজম ( যার উদ্ভব ১৯০৯ ) আর্ট বলে স্বীকৃত হয়েছে। কোন আর্ট টিকবে আর কোনটি ধোপে টিকবে না সেটা বিচারের অধিকারী ইতিহাস। সমকালীন মানুষ কেবল সমালোচনার অধিকারী।

অসিতকুমার যেখানে সমালোচক সেখানে নিজমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্মম। কিন্তু যেখানে তথ্য ও ইতিহাস সেখানে তিনি উদার পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। সারা বিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসীম দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিবৃত করেছেন। কোথাও আলস্য নেই। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন ইতিহাসের একএকটি পৃষ্ঠা। এর সর্বাধিক মূল্যবান অংশ ভারত ও মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা। যবদ্বীপ, মালয় চম্পা, চীন, ইরাণ ও মিশর নিয়ে তাঁর আলোচনা এ কারণে মূল্যবান যে এর প্রত্যেক আলোচনাকে তিনি বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার নিরিখে বিচার করেছেন।

অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ এ গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। প্রচ্ছদ দুর্বোধ্য, কোন সৌন্দর্যের ইঙ্গিত এতে নেই। শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ-নির্বাচনে প্রকাশক বইটির প্রতি সুবিচার করেন নি।

**চণ্ডী লাহিড়ী**

**এই অন্ধকার-আলো।** প্রফুল্লকুমার দত্ত। আধুনিক কবিতা প্রকাশনী। ১, মিডল রোড, কলিকাতা ৩২ ॥ দাম আড়াই টাকা ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্তের 'এই অন্ধকার আলো' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। অর্থাৎ কাব্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান কবি একেবারে 'তরুণতম' বলতে যা বোঝায় তা নয় ; প্রায় এগারো-বারো বছর ধ'রে শ্রীদত্তের কাব্যচর্চা অব্যাহত ধারায় চলেছে। এই ভূমিকাটুকু সামনে রেখে গ্রন্থটির আলোচনা করা যেতে পারে, সেইসঙ্গে কবি-মানসেরও।

প্রথমেই বলা ভালো, কবির পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থখানি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি ; তবু যিনি দীর্ঘকাল ধ'রে কাব্যচর্চ্চা করেছেন তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থে পূর্বের রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠবেন, এ অনুমান অসংগত নয়। অন্তত সাধারণভাবে এই সত্যকে মেনে নিয়েই কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। আধুনিক কবিতার প্রসংগে যে গুটিকয় কথা বহুবার উচ্চারিত, তার মধ্যে কিছু সত্য আছে বলেই তার পুনরুল্লেখ এই সূত্রে একেবারে অপ্রাসংগিক হবে না। যেমন কবিতার দুর্বোধ্যতা বা দুরূহতার প্রসংগ। কর্ম-সচেতনতা থেকেই এই দুরূহতার প্রয়োগ-বাহুল্য হলেও কর্মসচেতনতা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ। কারণ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, বলা যায়, 'মনের আনন্দে গান গাইতে যেমন সংগীত হয় না, মনের আবেগে লিখে গেলেও তেমনি কবিতা হয় না।' কবিতা শব্দকায়। শব্দের মধ্য দিয়েই কবির আত্মাকে, তাঁর মানসিকতাকে আমরা কাছে পেতে চাই। আর যেদিন থেকেই ফর্মের এই সচেতনতা লক্ষ্য করা গেল, সেইদিন থেকেই আমরা দেখলাম, কবিরা দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন, অর্থাৎ কবিরা 'আধুনিক' হয়ে উঠবার চেষ্টা করছেন। একথা পুরোনো হলেও সত্য যে, আধুনিক কবিতা পাঠ করি আমরা 'আধুনিক' বলে নয়, কবিতা বলেই। অন্যথায় 'আধুনিকতা' কথাটি তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এও বাহ্য। কারণ আমার বক্তব্য, একেবারে সাম্প্রতিককালের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে, একধরণের প্রয়োগ যা দুর্বোধ বা দুরূহ নয়—তাকে বলা যাবে প্রকাশের অস্বচ্ছতা। অর্থাৎ কবিদের মনে কিছু ভাব ঘনিয়ে ওঠে, তা থেকে প্রাক্-সৃষ্টির মুহূর্তের যন্ত্রণা দেখা দেয়, এবং সৃষ্টির পরে দেখা যায় যা হল তা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহও নয়, তা বিকলাংগ। এই জাতীয় কবিতার প্রকাশ হাল আমলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কল্যাণে দৃষ্টিগোচর হবে। বলা বাহুল্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্তের গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা সেইদিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

'এই অন্ধকার আলো' গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা উচ্চমানের সৃষ্টি বলে আমার মনে হয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক পংক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য। 'আত্মকথা' কবিতাটি কবি-মনের যন্ত্রণা 'সম্রাটের সমারোহ নিয়ে বেঁচে থাকার' ইচ্ছের প্রকাশে বিধৃত এবং আলোচ্য গ্রন্থের একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট কবিতা। এই পংক্তি কটি পড়ুন :

> 'আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? অথচ ভুলিনি তো
> অমৃতের পুত্র আমি নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা হাতে ;
> বাউলের মত আজো যে সংগীত আত্মভোলা প্রীত
> তার প্রেমে, সাড়া দেব প্রত্যাসন্ন অন্ধকার রাতে।'

এই রকম ভালো পংক্তি এই বইয়ে অজস্র আছে যা কবিতার শ্রেয়োচিন্তার দিকটি প্রকাশ করবে। 'এই অন্ধকার আলো' 'অমৃত' 'বাঁচার মহৎ পথে' 'ব্রহ্মাণ্ডবিহারী' 'ভাবানুসংগ' 'শিল্পীর বিবেকে' এই গ্রন্থের ভালো কবিতা 'বাঁচার মহৎ পথে প্রতি পদক্ষেপে নাজেহাল' কবির সূর্যমুখী চেতনা আজো জাগরূক,—এমন আশার কথা বিশ্বাসের কথা হাল আমলের 'ছিটগ্রস্ত' ( কিংবা বীট-গ্রস্ত ) কবিদের রচনায় বড় একটা শোনা যায় না। জীবন যে কী এবং এই প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখবার তাৎপর্যই বা কোন্‌খানে এই চিন্তায় আজ সমস্ত কবিই অজস্র কালক্ষেপ করছেন। এবং

সমালোচ্য কবিও আহার নিদ্রা মৈথুন নারী ইত্যাদি প্রসংগও এড়িয়ে যাননি কিংবা এড়িয়ে যেতে চাননি, 'যুগ যন্ত্রণা'র কবলে তিনিও ভারাক্রান্ত, তবু প্রকাশের অনবদ্য ভংগীর জন্য তা কেবল যৌন-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি,—এটুকু বড় কম কথা নয়।

সেদিক থেকে বলতে দ্বিধা নেই, হাল আমলে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি নিজগুণে বিশিষ্ট স্থান করে নেবে। তথাপি, পূর্বে যা বলেছি সেই সূত্র ধ'রে বর্তমানকালের একজন কাব্য-পাঠক হিসেবে কবি শ্রীদত্তকে একটু সতর্ক ক'রে দিতে চাই। যেমন ধরুন, 'প্রসব-লগ্নে' কবিতায় 'প্রজনন ক্ষমতা' শব্দটি প্রজননের অর্থব্যঞ্জনা আনে না; মানুষেরা পুরুষানুক্রমে মানুষের মাংসলালসায় মানুষকে বিপথে চালায় (রেলপথ) তিনটি শিশু ওই দেখ ওদিকে ফুটপাতে ধূলায় কাঁদে' (তিনটি শিশুর মা ও চতুর্থ যুবক) 'আমার সংসারে কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত, স্ত্রীর হাতের যা কিছু সম্বল তুলে দিচ্ছি, প্রতিরক্ষার্থে,( (না, না আমরা যুদ্ধ চাইনি) 'দ্যাখো, কী সুন্দর চাঁদ! 'স্ত্রী বলছে, হঁ্যা বুঝেছি, এ দেহটা এক্ষুণি চাইছো' (জীবন-বৃত্ত) ইত্যাদি পংক্তি আমার কাছে খুব বেশি আবেদন আনে না। এই পংক্তিগুলি দুর্বোধ নয়, দুরূহও নয়, কেবল পড়তে গেলে মনে হয় কবি যেন জোর করে নিজেকে 'আধুনিক' প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, তাঁর একই গ্রন্থের অন্তর্গত পূর্বোক্ত কিছু উচ্চমানের কবিতার পাশে এই জাতীয় পংক্তি ও কবিতা কবি-মনের খানিকটা স্ববিরোধ প্রতিপন্ন করছে।

কাব্যগ্রন্থে বানান ভুল অমার্জনীয় অপরাধ, বলে আমার মনে হয়। অন্যান্য ভুল ছেড়ে দিলেও 'বাল্মীকি' বানানটি একাধিকবার 'বাল্মিকী' আকারে চোখে পড়ল। পরবর্তী সংস্করণে কবি এবিষয়ে সচেতন হবেন, আশা রাখব।

আর একটা কথা। গ্রন্থের আগে যে প্রকাশিকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তার কোনো একজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। কারণ প্রতি কবিতার নিচে যখন তারিখ দেওয়া আছে তখন আর কোনো তথ্য জানবার পাঠকের কৌতূহল নেই।

এই সমস্ত সত্ত্বেও আবার বলব, 'এই অন্ধকায় আলো' সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থের আসরে বিশিষ্ট কাব্যসংযোজন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ সুন্দর।

**রেবন্ত চট্টোপাধ্যায়**

**প্রথম ভালোবাসা** ॥ তির্যক কাব্য সংকলন ॥ সরিৎশেখর মজুমদার (মুদ্গল মুনি) ॥ গ্রন্থজগৎ ॥ কলিকাতা। দাম দু'টাকা ॥

লেখক অঙ্কিত মলাটের কোন থেকে যে বাঁকা তীরটি 'প্রথম ভালোবাসা'র হৃদয় ছুঁই ছুঁই করছে, বইটির প্রতীক হিসেবে তা চমৎকার। তির্যক দৃষ্টিতে যেন দেখা হচ্ছে ভালাবাসাকে, তথা জীবনের

সব কিছুকে। প্রথম কবিতার নামে গ্রন্থের নামকরণ, কিন্তু জীবনের যা-কিছু অসঙ্গতি তারই ওপর কটাক্ষপাত আছে।

সামাজিক গ্লানি আর নৈতিক অন্ধকার দেশের আকাশ কালো করে রেখেছে। ঐ দুর্নীতির আবহাওয়ায় বেশ ভালোভাবে গজিয়ে ওঠে ব্যঙ্গকবিতা, যেমন হয়ে'ছিল অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে। ড্রাইডেন আর পোপের কাব্যে, কন্‌গ্রিভ আর ওয়াইচারলির নাটকে, এডিসন সুইফ্‌ট এর গদ্যরচনায় তাই তখন ব্যঙ্গ আর শ্লেষ, তির্যক কটাক্ষপাত। তেমনি আমাদের বর্তমান যুগে। আজ যেদিকে তাকানো যায়, পাওয়া যায় কিছু তির্যক কাব্যের খোরাক। সরিৎশেখরও তাই পেয়েছেন। সিনেমা, ফুটবল, ষ্টেটবাস, বস্ত্রহরণ থেকে অফিসগামিনী বধূ, আমাদের সমাজের সব দিকের সব কিছু অসঙ্গতি তাঁর বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, সহজ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি প্রত্যেকটি অসঙ্গতির রূপ ও প্রকৃতি প্রকাশ করেছেন। একটার পর একটা উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছে করে এই প্রসঙ্গে, এমনই সার্থক ধারালো তাঁর ব্যঙ্গের ছুরি। শেষ কবিতা 'তথাস্তু'তে কবি বলেছেন ঃ

ব্যঙ্গরসিক, ওগো ভগবান !
কি তীক্ষ্ণ তব তির্যক বাণ !
রক্ত-ঝরানো রসিকতা, তবু
বলি হেসে ঃ তথা অস্তু !

দেহটার সঙ্গে 'মন' নামে এক বস্তু জুড়ে দিয়ে ভগবান যে কি তীব্র রক্ত-ঝরানো রসিকতা করেছেন তা কবি যতীন্দ্রনাথের ঢং-এ প্রকাশ করে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কতকগুলি 'কণিকা'র মতো ছোট কিন্তু ভাবের তীব্রতায় ও অলংকারের রমণীয়তায় ভাস্বর রচনাও স্থান পেয়েছে। যেমন ঃ 'গরীব', 'গান্ধীবাদ', 'মানদণ্ড'। এ-ধরণের কবিতা শোনায় লিমারিকের মতো। এপিগ্রামের সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে এখানে যোগ হয়েছে কারুশিল্প, ঠিক ভাবের অপূর্ব বাহন হিসেবে। সংক্ষেপে বলি, সরিৎশেখরের ব্যঙ্গকবিতাগুলি পড়ে হাসি-কান্না আসে না, এগুলি গভীর ভাবের সৃষ্টি করে। এগুলি কাব্য। এ-হেন প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য। গ্রন্থের আগামী সংস্করণে এই লঘুপাক গুরু দ্রব্য আরো বেশী পরিমাণে পাঠক-সমাজে পরিবেশিত হলে জাতীয় স্বাস্থ্যের অন্ততঃ সামান্য পরিমাণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**Regd. No. C3597** Phone : 23-5155 September '64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALI

# ওদের নিরস্ত্র করুন
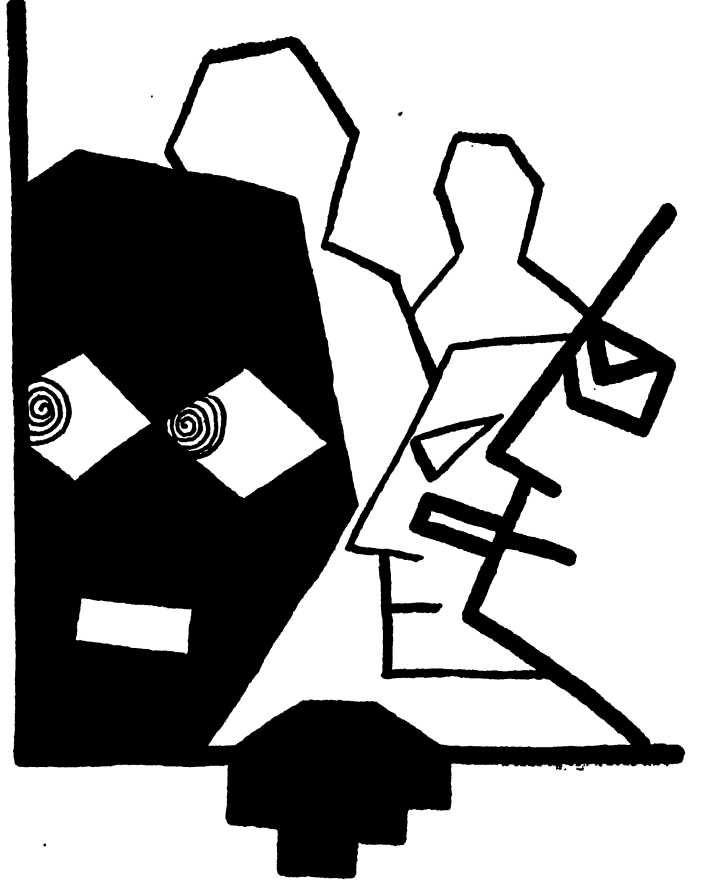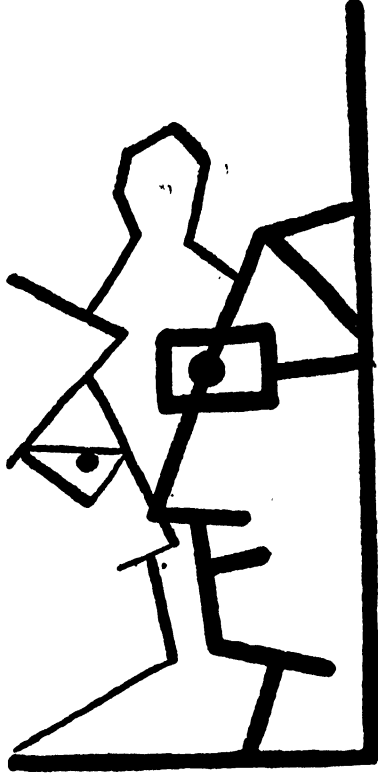
লোকটা নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। বিনা-টিকিটের যাত্রী—বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। টিকিট ফাঁকি দিয়ে লোকটা অন্যের জায়গা দখল করেছে, রেলকে ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করছে, ফলে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এদের পাপচক্র জাতীয় জীবনে দুর্নীতির এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করছে। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER/64

দ্বাদশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭১
সমকালীন

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির
মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

# জাতীয় উৎসব

# আপনার যদি থাকে
# র‌্যালে সাইকেল—
# গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‌্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‌্যালের কদরই আলাদা। যার র‌্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‌্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।
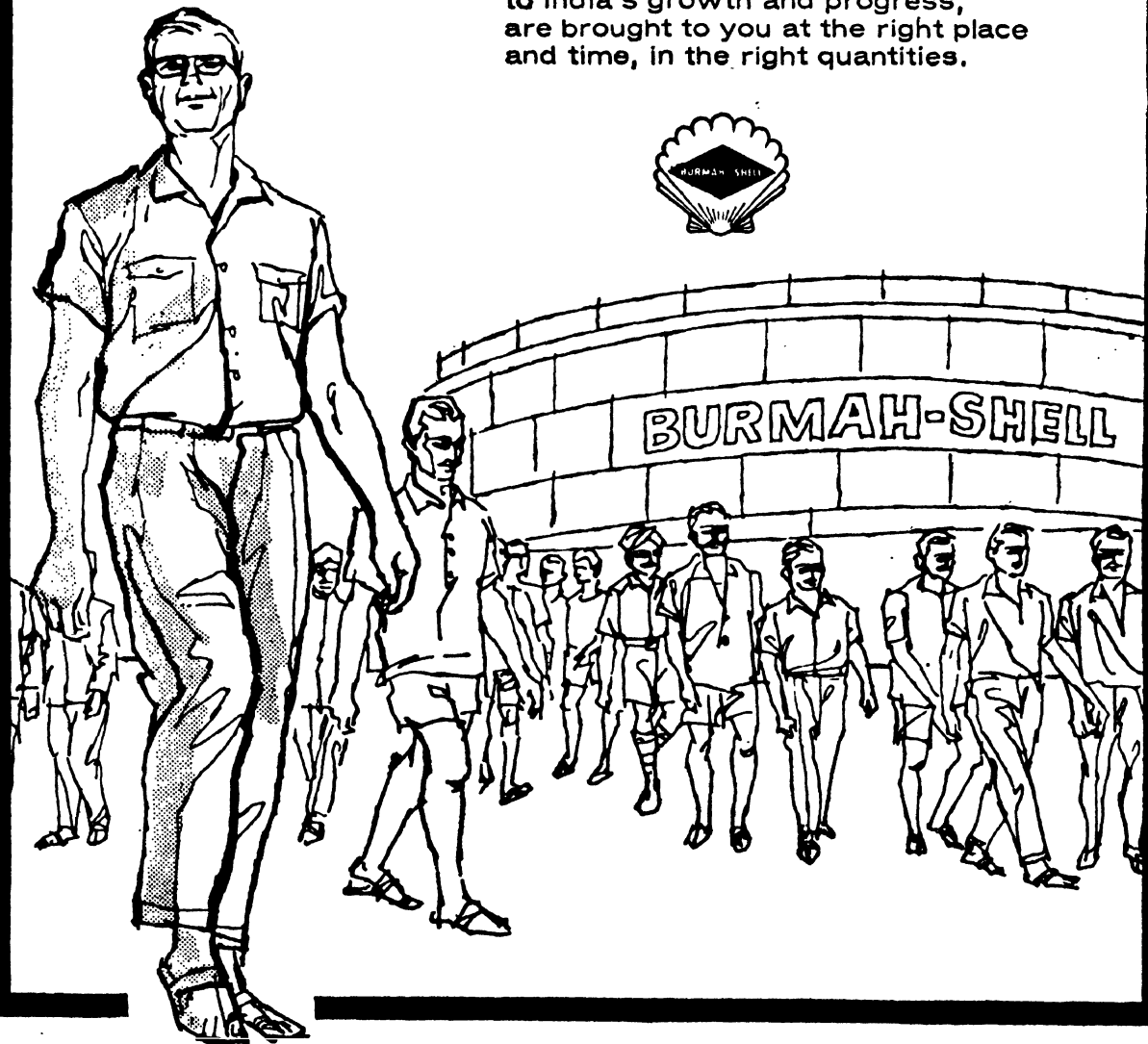
Burmah-Shell are People in the Service of the People

# সর্বজন প্রিয় স্নিগ্ধ সুরভিত মার্গো সোপ

বাড়ির কর্তার পছন্দ মার্গো সোপ। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনায় স্নানের আরাম যেন শতগুণ বেড়ে যায়। শরীর যেমন স্নিগ্ধশুদ্ধ হয়, মনেও তার রেশটুকু লেগে থাকে।

## মার্গো সোপ

গিন্নীরও টান মার্গো সোপের উপরেই। হবেই বা না কেন! দেহলাবণ্যের এমন সহায় আর নেই। মার্গো সোপের স্নেহময় স্পর্শে দেহের স্বাভাবিক দীপ্তি ও লাবণ্য অক্ষুণ্ন থাকে। আর এর মৃদুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ মনকে মাতিয়ে রাখে।

মার্গো সোপের স্নিগ্ধ স্পর্শ শিশুরও প্রিয়। তার কোমল দেহের পক্ষে মার্গো সোপ আদর্শ। মার্গো সোপ দিয়ে স্নান করালে ঘামাচি ইত্যাদি বিরক্তিকর উপসর্গ থেকে শিশু রেহাই পাবে।

প্রস্তুতকারক
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

CMC-19 BEN

পুজোয় চাই নতুন জুতো
Bata

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA DASAN
সাধনা দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন
আপনার চুল
একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।
সতর্কীকরণ ঃ—
কিনিবার সময়
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মুর্ত্তি
পিলফার প্রুফ ক্যাপের
উপর R.C.M. মনোগ্রাম
ও প্রস্তুতকারক
এম, এল, বসু এণ্ড কোং
দেখিয়া লইবেন।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা

দ্বাদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' একাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

---

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

# বিজ্ঞান ও দর্শন

**অমিয়কুমার মজুমদার**

আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা এবং দর্শনের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হলেও একথা আজ অনস্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে একটা সুগভীর সম্পর্ক বর্তমান ছিল। দর্শনশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে একক চর্চার কাল সুপ্রাচীন। কয়েক সহস্র বৎসরের সীমা অতিক্রম করে পরিপুষ্ট হয়েছে আজকের দর্শনশাস্ত্র—তবে বিজ্ঞানের অনুশীলন কাল তার থেকে প্রাচীনতর কিনা বলা শক্ত। এ কথা সত্য, পদার্থবিদ্যা এবং দর্শন জ্ঞানমার্গের এই উভয় অংশ মানব সৃষ্টির উষাকাল থেকে তাদের জয়যাত্রা সুরু করেছে। এই দুটি মার্গের প্রভায় আলোকিত মানবসমাজ প্রথম উপলব্ধি করতে পারলো তাদের আদিম পুরুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে নিজেদের পার্থক্য। বাইবেলে আছে, প্রথম মানব এবং আদিমতমা মানবী নন্দনকাননে নির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল সেবন করেছিল বলেই অখণ্ডনীয় পাপ আমাদের অদৃষ্টের জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে প্রথম ঘটনা স্বর্গ হতে বিদায়। সকলেই জানি তাঁরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করেছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে পৌরাণিক কথা। খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা যাই বলুন না কেন আদম এবং ইভের নিষিদ্ধ ফল গ্রহণের প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন কৌতূহলী বৃত্তির ইংগিত দেয় না কি? এই বিশেষ বৃত্তি—অজানাকে জানবার স্পৃহা, অন্ধকারের গহন প্রদেশে আলোকের প্রতিফল ঘটানো, অজ্ঞানের রাজ্যকে জ্ঞানসূর্যের প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলা মানুষের সর্বকালীন বিশেষত্ব। ক্রমাবর্তনের সংগে সংগে বিকশিত হতে লাগলো মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মস্তিষ্ক, প্রস্ফুটিত হতে থাকলো তার চিত্ত শতদল আর সেই সংগে বেড়ে উঠল তার কৌতূহলস্পৃহা। এই স্পৃহা দ্বিধা বিভক্ত হল—একটি বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আর একটি মনোজগতের তাড়নায়। প্রথমোক্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের আর

দ্বিতীয়টি থেকে উদ্ভূত হয়েছে দর্শন শাস্ত্রের।

আদিম মানুষের কাছে এই পৃথিবী ছিল অপরিচিত। সে ছিল অজ্ঞান। ক্রমে ক্রমে তারা অনুভব করতে লাগলো যে এই অজ্ঞানতার জন্যেই তাদের সুখ শান্তি এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে, বিঘ্নিত হতে চলেছে। একসময় তারা ভালোবেসে ফেললো অচৈতন্য পৃথিবীতে প্রকৃতিকে। কিন্তু তা অতি অল্পদিনের জন্য। জীবনদায়ী, প্রাণ উত্তপ্তকারী সূর্যরশ্মি এবং শীতলকরা বৃষ্টিকণায় উৎফুল্ল মানুষ যখন বজ্র অশনি এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সম্মুখীন হলো তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। একই অনুভূতির শিহরণ বয়ে গেছে তার সর্বদেহে যখন জিঘাংসু বন্য জন্তু ও মানুষ শত্রুর মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। এই ভয় তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। চারপাশের অচেতন বস্তুনিচয়ের মধ্যে আরোপিত করলো তার মানবিক ইচ্ছা প্রবৃত্তি। প্রকৃতির নানা বস্তুকে নিজের পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির রঙে রূপান্বিত করে তুললো। তাদের কল্পনা যেন রূপায়িত হয়ে প্রতিমূর্ত হলো ঐ সব অচেতন পদার্থের মাধ্যমে। তারা সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্পিত যক্ষ, রক্ষ, দেব দানব, গন্ধর্ব, নাগিনী, ডাকিনী যোগিনীতে পরিপূর্ণ করে ফেললো। অ্যাণ্ড্রুল্যাং বলছেন 'সমগ্র প্রকৃতি যেন আরোপিত বা কল্পিত প্রাণসত্তায় ভরে উঠলো। আদিম মানব এদের প্রত্যেকের মধ্যে দোষ গুণ আরোপ করে কাউকে বললো তার মিত্র আর কাউকে বানালো শত্রু।

একাজে মানুষ যে সব সময় ভুল করতো তা মনে হয় না, কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস। একবার সে যা করেছে পরবর্তী বারেও সে তাই করতে চায়। এমনকি জন্তু জানোয়ারেরাও তা করে থাকে। যেখানে একবার অতীতে তারা যন্ত্রণা বা কষ্ট পেয়েছে সেখানে তারা আর যেতে চায় না। তার আশঙ্কা সেখানে গেলেই আবার কষ্ট। যেস্থানে গিয়ে পূর্ব্বে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই তারা আবার যায় আহার্য লাভের প্রত্যাশায়। এমনিভাবে যেসব কাজ পশুরা অভ্যাসের বসে করতো, চিন্তাশীল মানুষেরা তাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে আখ্যা দিলেন এবং এর থেকেই ধীরে ধীরে নানা রহস্যের উদ্ঘাটন হতে থাকলো। একবার যা ঘটলো, অনুরূপ পরিস্থিতিতে পুনর্ব্বার একই ঘটনা সংঘটিত হ'লো। একই ঘটনা পরের পর আবির্ভূত হয় না, বেশ কিছুকাল অতিক্রম করে নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার পুনরাবির্ভাব হয়। এই আবিষ্কারের পর থেকেই পদার্থ বিজ্ঞানের জন্ম হলো। পদার্থ বিজ্ঞানকে এখানে বিস্তৃত অর্থে গণ্য করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গণিত, জ্যোর্তিপদার্থবিদ্যা, পরমাণু বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন শাখাসমূহ। এই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের প্যাটার্ণ আবিষ্কার করা, কি করে এরা অচেতন পৃথিবীকে শাসন করে তার রহস্য সন্ধান করা।

এই গবেষণার কাজে খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন বা রয়েছেন তাঁরা একধারে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। কেবলমাত্র দার্শনিক এবং নিছক বিজ্ঞানীর সংখ্যা বেশী হলেও এই দ্বৈত সত্তার অধিকারী ব্যক্তিরা পৃথিবীর মানুষকে নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন যুগে যুগে।

আদিম মানবের জীবনদর্শনের মূল বক্তব্য ছিল: মৃত্যু—পুনরুজ্জীবন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়েছিল সেকালীন বিশ্ববীক্ষায় এবং উদ্ভিদে-ঋতুতে-সৌরজগতে প্রাণের ও গতির বিচিত্র

লীলা পর্যবেক্ষণের মধ্যে।

প্রস্তর যুগের অবসানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য বেড়ে গেছে অনেক। দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের আদিম ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও আত্মীয়তার বন্ধন এখনো বর্তমান। বিজ্ঞানমনস্ক গ্রীক জাতির বিজ্ঞান, দর্শন সবই তত্ত্বীয় এবং তা ঈশ্বরমুখী। যার সার্থক ফলশ্রুতি সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল। গ্রীসের অবদানে প্রভাবান্বিত রোমীয় বিজ্ঞানে প্রাধান্য পেয়েছে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক। রোমক দর্শনেও এই মেজাজ ফুটে উঠেছে। বেদের পরবর্ত্তি ভারতেও বিজ্ঞান চর্চার অনুগামী ঈশ্বরনিষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মরমীয়া সাধনায়, দর্শনেও এরই ছায়াপাত ঘটেছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য: দর্শন পর্বতশিখরে আরোহণ করে নিজ সিদ্ধির তপস্যায় মগ্ন থেকে মানুষের জীবন ও তার দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং মানুষের বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সংযোগহীন মূল তত্ত্বানুসন্ধানেই সে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। যুক্তি ও বিচার দ্বারাই দর্শন পরিচালিত, নিজ মাধ্যমে যুক্তির ব্যাপকতা ও বিকাশে দর্শন প্রভূত সহায়তা করেছে। কিন্তু সে যুক্তি অনেকাংশে মানসপ্রসূত বাস্তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বিজ্ঞান আবার এই মূল তত্ত্বানুসন্ধানকে উপেক্ষা করে বাস্তবকেই বড় করে দেখেছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে একসঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসে বিচিত্র এক বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা গড়ে তুলল। জ্ঞানার্জনের অসংখ্য নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করে দিল এবং মানুষের শক্তি এতদূর বৃদ্ধি করে দিল যে মানুষ এই প্রথম অনুভব করল যে সে তার পারিপার্শ্বিককে জয় করে তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এখন মানুষ যেন একটা পার্থিব প্রাকৃতিক শক্তিতেই রূপান্তরিত হল—রসায়ন, পদার্থ ও অন্যান্য বিদ্যার সাহায্যে সে যেন পৃথিবীর রূপই বদলে দিতে শুরু করলো। কিন্তু যখন সে অনুভব করলো যে এ পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা তার আয়ত্বাধীন, তার ইচ্ছানুযায়ী নূতন করে তা গড়ে তুলতে সক্ষম, তখনও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল, কি একটা মূল উপাদানের যেন অভাব থেকে গেল। তার কারণ মূল তত্ত্ব অথবা আশু লক্ষ্য কোনটার সন্ধানেই বিজ্ঞান তাকে কোনো নির্দেশই দেয় নি। মানুষ পরে প্রকৃতির দুর্জয় রহস্য ভেদ করে তাকে জয় করে নিজের আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু আজ পর্যন্তও মানুষ নিজেকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারেনি। তাই তার নিজের সৃষ্ট দানবীয় শক্তির উন্মত্ততায় নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে।

একথা সত্য যে পদার্থ বিজ্ঞান যে সমস্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নানা বিষয়কে প্রভাবিত করে তাদের রহস্য উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছে কিন্তু সেই ঘটনাবলী কেমন করে সৃষ্ট হলো তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি এমন কি কোন লোকোত্তর প্রতিভার কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি? এর সংজ্ঞা কি। এর উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া শক্ত। বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্নকালে এর নানা ব্যাখ্যা হয়েছে, বহু অর্থ করা হয়েছে। তা সত্বেও মতান্তরের শেষ নেই। ওয়েবষ্টার প্রথম অর্থ দেন 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান'। মধ্যযুগের দার্শনিকবৃন্দ বিশেষতঃ সেন্ট্ টমাস্ অ্যাকুইনাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ ধর্মতত্ত্বকেও বিজ্ঞানের পর্যায় ভুক্ত বলেছেন।

এ সম্বন্ধে Stewart C. Easton লিখেছেন, "In the great medieval question : 'Is theology a Science ?'......the word Science has this meaning, and is to be specially distinguished from faith. Do we know that God exists, or do we only believe it ? St. Thomas claims that we know this truth, and world know it even if there were no inspired book in which we believe." ১

ওয়েবষ্টার বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বিজ্ঞানের নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনটিকেও যথার্থ বলে মনে হয় না। প্রবন্ধের উপক্রমণিকাতে যা বলা হয়েছে তা-ই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অর্থাৎ বিজ্ঞান এমন এক জাতীয় তৎপরতা যার সাহায্যে মানুষ তার প্রতিবেশ, পরিবেশের উপর আধিপত্য করতে পারে। এ সম্পর্কে ক্লাউথারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Science is the system of behaviour by which man acquires mastery of his environment. His evolution from an animal into a man was accomplished by a new attitude towards nature, in which he began to study the contents of his environment in order to use them in advantage. His initiation of this activity brought Science into existence......"২

আয়োনীয় এবং আণবিক মতবাদে আস্থাশীল এপিকিউরীয় দার্শনিকেরা মনে করতেন মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের এবং এই প্রয়োজন মেটাবার কাজ বিজ্ঞানের। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো বিজ্ঞানকে এভাবে দেখেননি। তিনি বলেছেন যেমন দর্শন তেমনি বিজ্ঞানও মানুষের উদ্ভাবনী মনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকে মানুষের উপকার হতে পারে, তবে প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে একথা মেনে নেওয়া চলে না। এডিংটন, হোয়াইটহেড, ডীন ইন্‌জ, বিশপ অব্ বর্মিহাম প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা মনে করেন ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রভৃতি জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করাই বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য। অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল তাঁর 'The Social Function of Science' গ্রন্থে এর প্রতিবাদ করলেও পূর্বেকার মতবাদ যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে রেনেশাঁ-পূর্ব বিজ্ঞানের বড়ো পার্থক্য যে তখনকার বিজ্ঞানের কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না, যা আজকের দিনে আছে। তখনকার দিনে বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। মধ্যযুগের ইস্লামীয় এবং ল্যাটিন ইউরোপেও এরা একইভাবে স্পন্দিত হতো। গ্রীকদের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান দর্শনেরই নামান্তর রূপে গণ্য হতো।

দর্শন কি তা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। হবস্ ( ১৫৮৮-১৬৭৯ ) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'a knowledge of effects from their causes and of causes from their effects'. দার্শনিকদের সংগে বিজ্ঞানীদের তফাৎ এখানেই। দার্শনিকরা সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর প্যাটার্ণ আবিষ্কার করতে চান আর বিজ্ঞানীর লক্ষ্য অচেতন প্রকৃতির ঘটনাসমূহের রহস্য উদ্ঘাটন।

হেগেলের ( ১৭৭০-১৮৩১ ) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুরূপ। দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি

বলেছেন, "die denkende Betrachtung der Gegenstande"। চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার অনুসন্ধান করে দর্শন। কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে যদিও তা বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান কার্য ও কারণের সম্পর্ক বের করে পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। বিজ্ঞানের কারখানা হলো তার ল্যাবরেটরী অথবা উপযুক্ত প্রান্তর, নচেৎ নক্ষত্র-খচিত আকাশ; আর দার্শনিকের কারখানা তাঁর মস্তিষ্ক। এ প্রসংগে আইনষ্টাইনের কথা মনে পড়ে তাঁকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর গবেষণাগার কোথায়। তিনি হেসে মাথায় টোকা মেরে বলেছিলেন 'এইখানে'। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনিও দার্শনিক।

যেভাবেই আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনের সংজ্ঞা রচনা করি না কেন, তাদের সীমানা বেশ অস্পষ্ট, জটিল। বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয় (বলা বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়) দর্শন সেখান থেকে শুরু করে তার যাত্রা। বিজ্ঞানের যেমন অনেক বিভাগ আছে, দর্শনেরও তেমনি। বিজ্ঞানের রাজত্বে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন সঠিক সীমারেখা নেই, এর রহস্য অতি জটিল, এ যেন বিজ্ঞানের দুনিয়ায় প্রান্তসীমায়। ঠিক তেমনি দর্শনের দিকে 'মেটাফিজিকস'। পদার্থ-বিদ্যার 'পজিটিভিষ্ট' মতবাদ মেনে নিলে দুয়ের সীমারেখার হদিশ পাওয়া যায়। ফিজিকস যেখানে রহস্যের সন্ধানে দিশেহারা মেটাফিজিক্স সেখান থেকেই শুরু করেছে তার যাত্রা একথা অনেকে মনে করেন।

পৃথিবীর বহু দার্শনিক পদার্থবিদ্‌ও ছিলেন। ইতিহাসের গোড়া থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ থেলেস, এপিকিউরাস, হেরাক্লিটাস, অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ করে দেকার্তে, লীবনিৎস পর্যন্ত যাঁদের নাম দার্শনিকদের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁরা বিজ্ঞানী হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সব দার্শনিকদের বিজ্ঞান চিন্তার কথা প্রাধান্য পাবে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মসাধনার অতি চাপেও বিজ্ঞানচর্চার শিখা নিভে যায়নি। ধীরে ধীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে শিখা প্রজ্জলন্ত হয়ে উঠল। রেনেশাঁসের আবহাওয়াতে আলোকিত হয়ে উঠলো ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের দীর্ঘ জটিল পথ। মৌলিক অনুশীলন, গবেষণা, আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ ব্যাপকতর হয়ে উঠলো। রেনেশাঁসের প্রাণশক্তি হলো যন্ত্রশক্তি। তার উন্নতিতে ইউরোপে এল নতুন জীবনের জোয়ার। নতুনতর পথে সে এগিয়ে চলল শতাব্দী সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। কারিগরী আবিষ্কারের সংগে সংগে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী তত্ত্ব-দর্শনের উদ্ভব। জীবনের পুরোনো চেহারা গেল পাল্‌টে। বদল হলো তার অর্থের। এতদিন মানুষ ছিল ঈশ্বরমুখী, এবার হলো বিশ্বমুখী, আত্মসন্ধানী। মানুষ বুঝতে শিখল, এই বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, ঈশ্বর কেউ নন। তারা জানলো সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে, ঘুরছে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের দল। সে অনুভব করতে পারলো তার জন্ম দেবতার অনুগ্রহ নয়, নিম্নতর প্রজাতি থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সে এসেছে এই স্তরে। জীবনে তো নয়ই, মরণের পরেও আত্মার স্থান হবে না বৈকুণ্ঠে, যেহেতু মাধ্যাকর্ষণের এলাকা থেকে চলে যাওয়া কঠিন কাজ। নতুন বুদ্ধি, মননশক্তি দিয়ে মানুষ বিচার করতে শিখল যাবতীয় ঘটনাবলী। বিজ্ঞান নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে যেমন জীবনের বাইরের চেহারা পালটে

দিল, তেমনি মনোজগতেও তার প্রভাব পড়লো। দর্শনে তার ফুল ফুটে উঠলো। বিজ্ঞান জন্ম দিল নতুনতর বস্তুতন্ত্রী জীবনদর্শনের। তার ধারা সজীব হয়ে উঠেছে মার্ক্স এঙ্গেল্‌স থেকে।

এককালে বিজ্ঞান ও দর্শনের জগৎকে পৃথক করে দেখা হ'তো না। প্রাচীন গ্রীসের বহু মনীষীর নাম স্মরণযোগ্য যারা বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয় মার্গেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন তাই নয়, তাঁরা তাঁদের প্রতিভার, মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। খৃষ্টপূর্ব ৬১০ থেকে খৃ: পূ: ৫৪৫ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। অনেকে বলেন তিনিই গ্রীক দর্শনের প্রথম স্রষ্টা। আবার ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতেন, জগতের সমগ্র বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে একটি মূল পদার্থ থেকে। সেই পদার্থ জল নয়, অগ্নি নয় এমনকি আমাদের পরিচিত কোন বস্তুও নয়। তাহলে সেটি কি ? তা হলো অসীম, অনন্ত। সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে সেই বস্তু। তাঁর মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আর জ্যোতিষ্ক সমূহ ধ্রুব নক্ষত্রের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর চেহারা চ্যাপটা নিরেট চোঙের মত। আকাশ থেকে বায়ুর সাহায্যে ঝুলে রয়েছে। আর পৃথিবীকে ঘিরে আছে মহাসমুদ্র। গম্বুজ বা গোলাকার ছাদের মত আকাশ গোলার্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ক্রমবিকাশে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মিলেশীয় বিজ্ঞানের অবনতি ঘটতে থাকে। তাঁর পরে অ্যানাকিস-মেনেসের (খৃ: পূ: ৮৫-৫২৮) সময়ে কিছুদিন বিজ্ঞান চর্চার কাজ চলেছে। ক্রমেই জ্ঞানচর্চার ভারকেন্দ্র বিজ্ঞান থেকে দর্শনে স্থানান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রের যে নিজস্ব কোন দ্যুতি নেই, অ্যানাকিসমেনেস এ কথা জানতেন বলে অনেকে মনে করেন। তিনি জানতেন যে চাঁদের আলো সূর্যালোকের প্রতিফলনের ফলশ্রুতি মাত্র।

অ্যানাকিসমেনেসের মতে মূল বস্তু হচ্ছে বায়ু। আত্মা বায়ু; অগ্নিকে তিনি লঘুতর বায়ু বলেছেন। বায়ু ঘন হয়ে প্রথমে জল এবং আরো ঘনীভূত হয়ে মাটি এবং সর্বশেষে প্রস্তর সৃষ্টি করে।

এঁর পরে পিথাগোরাসের নাম উল্লেখযোগ্য। গণিতে পিথাগোরাসের নাম আমরা অনেক শুনে এসেছি। তিনি কেবল মাত্র গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্বিদ নন, তিনি দার্শনিকও। তাঁর মতে আত্মা অমর। এই আত্মা এক জীবন্ত বস্তু থেকে আর একটা সজীব বস্তুতে আশ্রয় নেয়। কোন কারণে যদি কোন কিছু জন্মগ্রহণ করে তাহলে চক্রাকারে পুনরায় তাকে জন্ম নিতে হবে। এই পৃথিবীতে নতুন বলে কোন কিছু নেই, সবই পুরাতন। পিথাগোরাস বলেছেন, "এই পৃথিবীতে দর্শকের মতো যে শ্রেণীর লোক নিজেদের কর্ম-কোলাহল থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা করে প্রকৃত দার্শনিক হতে পারেন। তাঁরাই নিজেদের জন্মচক্র থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন।"

ইলিয়েটিক দর্শনের প্রধান উদ্গাতা পার্মেনিডিস্ দার্শনিক হিসাবেই বেশি প্রসিদ্ধ অথচ বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অবহেলার নয়। আগেই বলা হয়েছে সেকালে দর্শন ও বিজ্ঞান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়ানো থাকতো যে একটিকে আর একটি থেকে পৃথক ভাবে দেখার কল্পনাও করা যেত না। তখনকার যুগ পর্যালোচনা করলে যেন একটি সত্যই ভেসে ওঠে যে তখন বিজ্ঞানী মাত্রই ছিলেন দার্শনিক, আর দার্শনিক মাত্রই বিজ্ঞানী।

দার্শনিক অ্যানাক্সগোরাস ( খৃঃ পূঃ ৫০০-৫২৮ ) প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধি চন্দ্রগ্রহণের কারণ আবিষ্কারের জন্য। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে জড় পদার্থের কোনরকম প্রকার ভেদ ছিল না। ক্রমান্বয়ে জড়ের মধ্যে আবর্তের সঞ্চার হলো। এই আবর্ত্ত বা ঘূর্ণি ক্রমে স্ফীততর হয়ে এমন প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জড় পদার্থ দুটি বৃহৎ অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমটি উত্তপ্ত এবং হালকা ; শুকনো ও ফোলা তাকে বলা হলো ঈথর আর এর বিপরীত ধর্মী অংশকে বলা হলো বায়ু। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে রইল বায়ু এবং তাকে ঘিরে রইল উত্তপ্ত ঈথর। সৃষ্টির পরবর্তি অধ্যায়ে বায়ু থেকে মাটি ও পাথর জন্ম নিল। এ সময়ে পৃথিবীও ঘুরছে। দ্রুত আবর্তনের জন্যে পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়লো অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। তারা উষ্ণ ঈথরের সংস্পর্শে এসে ভাস্বর নক্ষত্রে পরিণত হলো। আশ্চর্য হতে হয় সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাণ্টওলাপ্লাস যা বলেছেন তার সংগে বহু শতাব্দী আগে অ্যানাকেসগোরাসের বক্তব্যের অদ্ভুত মিল আছে।

তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। এমন কি একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের কথাও বলেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল আমাদের পৃথিবীর মত সেই সব পৃথিবীরও চন্দ্র সূর্য, জ্যোতিষ্কের দল আছে। সেখানেও মানুষ, প্রাণী উদ্ভিদের অবস্থিতি সম্পর্কে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। একাধিক সৌরজগতের মতে বিশ্বাসী অনেক বিজ্ঞানী বর্ত্তমানে আছেন। প্রথমেই সার জেমস্ জীন্সের নাম বলা যেতে পারে।

পিথাগোরীয় বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের অন্যতম এম্পিডক্লেস (খৃঃ পূঃ ৪৯৪-৪৩৪ ) সিসিলীয় দার্শনিক। তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের চেয়ে পদার্থের স্বরূপ ও তার গঠনের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হন। মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এই চারিটি মৌলের সাহায্যে পদার্থ গঠিত একথা তিনি বলেছিলেন। তিনি শরীরবিদ্‌ও ছিলেন। এম্পিডক্লেস্ জড় এবং প্রাণীর মধ্যকার পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন তাঁর বর্ণিত চারটি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আছে। আলোকের বেগ আছে এ সত্য তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন।

এখন দুজন গ্রীক দার্শনিকের নাম বলা হচ্ছে তাঁরা গ্রীক আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁরা হলেন লিউসিপ্পাস্ এবং ডিমোক্রিটাস। তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা জানতে পারা যায় অ্যারিষ্টটল্, এপিকিউরাস এবং রোমক দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের রচনা থেকে।

গ্রীক আণবিক তত্ত্বের মূল কথা : জড় জগৎ অতি ক্ষুদ্র। এর পরিবর্তন হয় না। অসংখ্য বস্তুকণা বা পরমাণু দিয়ে গঠিত হয়েছে এই জগৎ। এই পরমাণুর দল অনন্তকাল থেকে বিরাজ করছে, তাদের উৎপত্তি নেই, ক্ষয় নেই। একটি থেকে অপরটির আকৃতির পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি পরমাণুর ধর্ম এক এবং সারবস্তু সমান।

পরমাণুর দল অসীম মহাশূন্যে ইতস্তত: ঘুরে বেড়ায়। চলার পথে মাঝে মাঝে পরস্পরের সংঘর্ষ বাধে আর তার ফলে সৃষ্টি হয় জটিল আবর্তের। এই ঘূর্ণির মধ্যে সমধর্মি পরমাণুর দল মিলিত হয়ে মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। আর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে কালক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। স্বাভাবিক নিয়মে

ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং বিনাশ হয়। যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে রাখতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। লাপ্লাসের নীহারিকাতত্ত্ব এবং ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural selection এর আভাস এখানে পাওয়া যায়। আধুনিক পারমাণবিক তত্ত্ব এবং বস্তুবাদী দর্শনের সংগে এঁদের বক্তব্যের যথেষ্ট মিল আছে। ডালটন, আভোগাড্রো, ক্যানিজারো—এঁদের পারমাণবিক তত্ত্বের সংগে পূর্বেকার দার্শনিকদের মতবাদের প্রধান পার্থক্য এখানেই যে ডালটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতবাদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত আর নিউসিপ্‌কাস, ডিমোক্রিটাসের বক্তব্য নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। বস্তুর পরমাণুবাদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ দার্শনিক প্রবর প্লেটো এবং তাঁর শিষ্য অ্যারিষ্টটলের তীব্র বিরোধিতা। দীর্ঘদিন পরমাণুবাদ লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। রেনেশাঁর সময়, বিশেষ করে গ্যালিলিওর পর এর পুনরুদ্ধার ঘটে। দার্শনিক হিসাবে রেনে দেকার্তের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি বৈজ্ঞানিক। দেকার্তে বলেছেন শূন্য বা পরমাণু বলে কোন কিছু নেই। যদি কোন বস্তুপিণ্ডকে কোন ক্রমে সচল করে দেওয়া যায় তাহলে তা সরল রেখায় অবিরাম সমান গতিতে চলতে থাকবে। নিউটনের বক্তব্য এস্থানে স্মরণযোগ্য। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ার কথা বলেছেন, দেকার্তের বক্তব্যে মাধ্যাকর্ষণের স্থান নেই। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন 'আবর্তের তত্ত্ব' নামে পরিচিত। তিনি বলেছেন সূর্যের চারদিকে রয়েছে এক প্রবল আবর্ত। তার মধ্যে ঘুরছে গ্রহ, তারা। দেকার্তের তত্ত্ব অনুসারে জগতের সব কিছু সচল অবস্থায় আছে। এইহেতু মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব তাঁর বক্তব্যে স্থান পায়নি। নিউটনের মতো তিনি বলেন নি যে পৃথিবীকে চালু করতে হলে কোন বাহ্য শক্তির প্রয়োজন। দেকার্তে বলেন পৃথিবীতে গতির পরিমাণ সব সময়ে সমান। তিনি গণিতে সর্বপ্রথম পরিবর্তনশীল পরিমাণের প্রবর্তন করেন। তা থেকে তিনিই সর্বাগ্রে অঙ্কশাস্ত্রে 'ডাইলেকটিকস্'-এর প্রবর্তন করেন। জগতের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে দেকার্তের সন্দেহকে দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হলো 'কার্টেজিয়ান সন্দেহ'। বিজ্ঞানী হিসাবে বাহ্য বস্তু নেই একথা বলতে দেকার্তের বিবেকে বাধলো। তাই তিনি ঈশ্বরের অবতারণা করে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ করেছেন। 'বস্তু ও মনের সমন্বয় দর্শনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই সমন্বয় সাধনে দেকার্তে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এইখানেই তাঁর দর্শনের সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি। সেযুগে বলবিদ্যার যে উন্নতি হয় তার প্রভাব দেকার্তের দর্শনে দেখা যায়। এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই তিনি বস্তু ও মনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন।"[৪] দেকার্তের দর্শনে বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয় চিন্তাধারা পাশাপাশি বিচরণ করেছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার যেমন দর্শন চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে তেমনি অনেক সময় দর্শনও বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে নতুন পথে নিয়ে গেছে। দেকার্তের উত্তর সাধকেরা অর্থাৎ উত্তরকালের ইউরোপের দার্শনিকেরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল ভাববাদী দর্শনের উন্নতিসাধন করেছেন, আর-এক গোষ্ঠী যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের পুষ্টি সাধন করেছেন। প্লেখানভ এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করা দর্শনের একটি প্রধান কাজ বলে দেকার্তে ও বেকন মনে

করতেন। সেইজন্য তাঁদের সময়ে দেখতে পাই বিজ্ঞানের সমস্যা ও বিষয়বস্তু নিয়ে দর্শন ব্যস্ত আছে।"

গ্রীক বিজ্ঞানের পক্ষে প্লেটোর প্রভাব খুব শুভ হয়নি। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন দার্শনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অধিকতর হলেও বিজ্ঞানে তাঁর অবদান কম নয়। বিন্দু, তল, রেখা, ঘন ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার নিখুঁত পরিচয় দেন তিনি। তিনি জ্যোতিষ এবং ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা নিয়ে কিছু চিন্তা করেছিলেন। তবে তার মান নিম্নস্তরের। মনোজগৎ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকাতে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে পৃথকভাবে চিন্তা করবার তেমন সুবিধে পান নি। বস্তুবাদী আণবিক তত্ত্বের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।

অ্যারিষ্টটলের ( খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২ ) বিশ্বপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ডকে একক ধরা হয়েছে, এ সম্পূর্ণ এবং সসীম। সমগ্র বস্তুনিচয় এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সীমিত অবস্থায় আছে। অসীম বস্তু বলে কোন কিছু নেই। তাঁর মতে পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলির সংখ্যা চারটি মাত্র De caelo গ্রন্থে গতির আলোচনা থেকে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সসীমত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রকে ঘুরে অবস্থান করছে পৃথিবী। ভারী দ্রব্য মাত্র পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে প্রধাবিত হয়, আবার অগ্নির গতি হচ্ছে উর্ধ্বমুখী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে কয়েকটি এককেন্দ্রীয় স্ফটিক গোলকে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটি পৃথিবীর, দ্বিতীয়টি সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের, তৃতীয়টি বায়ুর ও চতুর্থটি অগ্নির। তারপরেকার গোলক সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহকে পিঠে নিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে।

লীবনিৎস ( ১৬৪৬-১৭১৬ ) দেকার্তের মত অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন। বলা বাহুল্যমাত্র লীবনিৎসও একজন খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে পরিপূর্ণ। তাদের তিনি বলেছেন, তাঁর মতে 'মোনার্ড' হলো বিশ্বের আসল পরমাণু—অর্থাৎ প্রতিটি পদার্থের চরম অংশ। তাদের কোন আকার নেই, আকৃতি নেই, তাদের ভাঙা যায় না।

এদের পরে পৃথিবীতে এসেছেন কত দার্শনিক। তাঁদের বিজ্ঞান চিন্তায় তত্ত্বের ভাণ্ডার ভরে উঠেছে। একালে আইনষ্টাইন নিঃসন্দেহে দার্শনিক আবার বাট্রাণ্ড রাসেল বিজ্ঞানী। পৃথিবীর নানা শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একসময় দর্শন বিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে গেছে। একথা বলবার অর্থ এইযে দার্শনিকেরা আর বিজ্ঞান চিন্তা করেন নি। এখন তো বিরোধ যেন স্পষ্টতর। তার ইতিহাস পৃথক অধ্যায়ের। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে সংকুচিত।

ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংকটে মানুষ হয়ে পড়লো নিঃসঙ্গ। সে হলো অসহায়, বিচ্ছিন্ন। তার চিত্তে বাসা বাঁধলো শূন্যতা বিষণ্নতা অবসাদ। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'নিউরসিস সুইসাইড'। কেঁপে উঠল দর্শনের তুরীয়লোক। পুনরুজ্জীবিত হলো কিয়ের্কগার্ডের রহস্যবাদ। দেখা দিল অহংমুখর 'অস্তিত্ববাদ' অ্যাবসারডিটির তত্ত্ব। দার্শনিক-বিজ্ঞানীও অনেকে বিরোধিতা করলেন আধুনিক বিজ্ঞানের। অনেকে আবার গাণিতিক সিড়ি বেয়ে ফিরিয়ে আনতে সংকল্প করলেন পুরোনো 'ঈশ্বরতত্ত্ব'কে। এমনিভাবেই জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়ে চলেছে

আধুনিক চিন্তাশীলদের জগতে। বিশ্বের যে অনন্ত রহস্য আমাদের সামনে রয়েছে তার সমাধানের মন্ত্র কার জানা আছে বিজ্ঞানের না দর্শনের। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যুগে যুগে বহু দার্শনিক-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী অনেক মত প্রচার করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন মতবাদের মধ্যে নেই সেই রহস্যের সিন্ধুক খোলার চাবিকাঠি।

জওহরলাল নেহেরু বলেছেন: বাধাবন্ধনমুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ বা অগ্রগতির সীমা অন্তহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো এটাই ঠিক যে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং যে অসীম রহস্য সাগর আমাদের ঘিরে রয়েছে তার সম্পূর্ণ মর্মভেদ করতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অপারগ। দর্শনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিজ্ঞান হয়তো আরও একটু অগ্রসর হতে পারবে, হয়তো বিজ্ঞান সেই রহস্য সাগরেও পাড়ি দিতে সাহস করবে।৫

বিজ্ঞানাচার্য রামেন্দ্রসুন্দরও বিজ্ঞানের চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও দর্শনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ভেবে দেখার লগ্ন আজ সমুপস্থিত।

**তথ্যপঞ্জী** :— (১) Roger bacon and his search for a Universal science, oxford, 1953. (2) J. G. Crowther : The social Relations of science. (৩) দর্শনের ইতিবৃত্ত : মনোরঞ্জন রায় (৪) ঐ (৫) ভারত সন্ধানে : জওহরলাল নেহরু।

# আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অতিশয় নীতি-নিষ্ঠার জন্য অর্থোপার্জনে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। সুপণ্ডিত পিতার পুত্ররূপে ব্রজেন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতেই সুশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই ব্রজেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। অতঃপর তিনি মাতার অভিভাবকত্বে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ মেধা ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে পাঠকালে গণিতশাস্ত্রে তিনি এতদূর পারদর্শী হইয়া পড়েন যে বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর গণিত শিক্ষকেরা যখন কোন দুরূহ অঙ্কের সমাধান করিতে পারিতেন না তখন তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে যে বিদ্যালয়ের একজন 'গ্রাজুয়েট্' গণিতশিক্ষক স্বাধীনভাবে গণিতে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ইনিও বালক ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বৃত্তিসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্সটিটিউশনে ( বর্তমানের স্কটিশচার্চ কলেজ ) প্রবিষ্ট হন। এই কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত ) ব্রজেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় যখন নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছিলেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে শেলীর কাব্য, হেগেলের দর্শন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করিতে উপদেশ দেন ( দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রবন্ধ, প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯০৭ )। বলাবাহুল্য নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর এই পরামর্শে উপকৃত হইয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যখন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁহাকে কলেজের পাঠাগার হইতে একটি দুরূহ দর্শন শাস্ত্রের বই লইতে দেখিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হেষ্টি (William Hastie) তাঁহাকে ঐ পুস্তক লইতে নিষেধ করেন ও ওই বিষয়ে একটি সহজ পাঠ্য পুস্তক পড়িতে উপদেশ দেন। ব্রজেন্দ্র অধ্যক্ষের নিকট প্রমাণ করেন যে ঐ পুস্তকটি পাঠ করিয়া বুঝিবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে। হেষ্টি ব্রজেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যান ও অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে থাকেন। ইহার পর অধ্যক্ষ হেষ্টির প্রভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হন। কলেজে পাঠকালে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, আইন এবং ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্রজেন্দ্রনাথ পঠিত বিষয়গুলি আবৃত্তি দ্বারা অধ্যাপক ও অনুরাগী বন্ধুদের চমৎকৃত করিয়া দিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জেনারেল এসেমব্লীজ্ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবৎসর দর্শনশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার

করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এম-এ পাশ করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে সংস্কৃত, হিন্দুদর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করেন। নিজের চেষ্টায় তিনি ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, পার্শী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই সব ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এম-এ পাশ করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিটি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৮৪)। কিছুকাল পর তিনি নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া নাগপুর যান। অল্পকাল নাগপুরে বাস করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন (১৮৮৭-৯৬)। দীর্ঘ নয়বৎসর কাল বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষতা করার পর তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। সপ্তদশ বর্ষকাল ব্রজেন্দ্রনাথ কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন (১৮৯৬-১৯১৩)।

ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় যে পারদর্শিতা লাভ করেন পৃথিবীর যে কোন সময়ে যে কোন দেশে এইরূপ বিপুল জ্ঞানার্জনের দৃষ্টান্ত বিরল। শুধু দর্শন, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতির মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না—জ্ঞান রাজ্যের এমন কোন শাখা ছিল না যে বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবেশ লাভ করেন নাই। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, রাষ্ট্রনীতি, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শন ছিল সম্ভাব্য সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ ও চিন্তার মধ্যে তাহার সমন্বয় সাধন। প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের ন্যায় বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে আহৃত খণ্ড খণ্ড জ্ঞানেরদ্বারা অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শন সাধনার লক্ষ্য ছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা মহাসম্মেলনের (International Congress of orientalists) যে অধিবেশন হয় তাহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। 'সত্যের পরীক্ষা' (Test of Truth) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি সম্মেলনের ভারতীয় শাখার উদ্বোধন করেন। সাধারণ অধিবেশনে তিনি খৃষ্ট ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন উহাও সম্মেলনে বিশেষ সমাদৃত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দেখান যে হিন্দু ধর্ম পৌরাণিক উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। হিন্দু ধর্ম যুক্তিনিষ্ঠ। প্রাচীন হিন্দুর জীবনচর্যা ইহকাল ও পরকাল উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিধিবদ্ধ ছিল। হিন্দুধর্মে দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনসম্বন্ধীয় চিন্তাও স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রচার করিয়া থাকেন যে ভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের পরে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার স্বপক্ষে মহাভারতে লিখিত নারদ কর্তৃক শ্বেতদ্বীপ গমনের কথা উল্লেখ করা হয়। এই মতাবলম্বীগণ ইহাই চান যে হিন্দু-বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক বা প্রবর্তকগণ খৃষ্ট জন্মের পর সিরীয়া-মিশর অঞ্চলে (শ্বেতদ্বীপ) খৃষ্ট সাধুদের নিকট ভক্তিধর্ম শিক্ষা করেন এবং স্বদেশে আসিয়া উহাই বৈষ্ণবধর্মরূপে ভারতে প্রচার করেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনার ধারা (Historico- Comparativo Method) অনুসরণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ দেখান যে নারদ কর্তৃক খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের পর সিরীয়া মিশর অঞ্চলে ভক্তিধর্ম শিক্ষালাভ যদি সত্য হয় তবু ইহা বলা যায় না যে বৈষ্ণবধর্ম বা ভক্তিধর্মের প্রেরণা খৃষ্টধর্ম হইতে পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টজন্মের বহুপূর্বে রচিত বেদ ও উপনিষদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেন যে ভক্তিবাদ সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে। সমসাময়িককালে জগতের কোন জাতিই এই সুমহান্ ভক্তিবাদ তাহাদের ধারণায় আনিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্মের উৎস ও ভক্তিবাদ, খৃষ্টিয় ভক্তি-বাদ ও ভারতীয় ভক্তি-বাদ খৃষ্টজন্মের পরবর্তী কালে পরস্পরের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে একই ধারাতেই চিন্তা করিয়াছে ইহাতে মানব সমাজের অখণ্ড ভ্রাতৃত্বই সূচিত করে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই ভাষণটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (১)। ব্রজেন্দ্রনাথের অপূর্ব মণীষার পরিচয় এই স্বল্পায়তন পুস্তকটিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট আছে। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের 'সংস্কৃতির ইতিহাস' শাখার অধিবেশনেও ব্রজেন্দ্রনাথ আইনের উৎপত্তি নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে হিন্দুজাতিই জগতে প্রথম সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং তাহারাই সমাজ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রবর্তক। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে প্রাচীন ভারতের উন্নত চিন্তাধারার পরিচয় উপস্থাপন করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ জগতের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সমধিক শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও বহির্ভারতে ভারত-সভ্যতার একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয় (Simla Commission for drawing up Calcutta University Regulations) ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যরূপে কার্য করেন। এই কমিশনের সভাপতি সার মাইকেল স্যাডলার শিক্ষা সংক্রান্তব্যাপরে ব্রজেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। সমসাময়িক জগতের প্রমুখ শিক্ষাবিদ সার মাইকেল স্যাডলার শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ব্রজেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্টের ৭ম, ৯ম, ১০ম ও ১২ খণ্ডে শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের মূল্যবান অভিমতগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন কর্ণধার সার আশুতোষ শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শ প্রয়োজন হইলেই গ্রহণ করিতেন।

বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন ও তাহার পূর্ববর্তী যুগে ব্রজেন্দ্রনাথ জাতীয় ভাবধারা প্রচার প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক ছিলেন। এই সময়ে বিশিষ্ট জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমাতা নিবেদিতা প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বদেশী যুগে বাংলা দেশে যে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় উহার শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ-ক্রম নির্দ্ধারণে ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই কালে বাংলা দেশে একটি 'ব্রজেন্দ্রমণ্ডল' ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ এই মণ্ডলীর মধ্যমণিরূপে তাঁহার অনুগামীদের পরিচালিত করিতেন। অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাষায়—"১৯০৫—২৪ সনের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক যুবক বাঙ্গলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্রজেন শীলে মূর্তিমন্ত ছিল। ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য পাণ্ডিত্যের অন্যতম খুঁটা ব্রজেন শীল।......ব্রজেন শীল জ্যান্ত বিশ্বকোষ, এই বিশ্বকোষ হাঁটকাতো যে যুগের ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ অনেকেই...' (দ্রঃ বিনয় সরকারের বৈঠক—হরিদাস মুখোপাধ্যায়)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে সর্বপ্রথম যে বিশ্বজাতি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (universal Races congress ) ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দিতে আহুত হন। নৃতত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্যই বিশ্বজাতি সম্মেলনের উদ্বোধনের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সভায় তিনি মন্তব্য করেন যে জাতিতে জাতিতে বিরোধ ব্যক্তিগত বিরোধের মতই মীমাংসা করিয়া ফেলাই সঙ্গত। বর্তমানে U. N. O. এই বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ ( Post Graduate Deptts ) প্রবর্তিত হইলে অন্যান্য কয়েকটি মুখ্য বিষয়ের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রের জন্যও একটি প্রধান অধ্যাপক পদ প্রবর্তিত হয়, সম্রাট পঞ্চমজর্জের নামে এই পদটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথই এই প্রধানাধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯১৪ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত অর্ধযুগকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ এই পদের গৌরব বর্দ্ধন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া ব্যাঙ্গালোর গমন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের পর বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, হীরালাল হালদার, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি প্রমুখ দার্শনিকগণ এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পদটি ব্রজেন্দ্রনাথের নামেই চিহ্নিত হইয়াছে।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ অতিশয় যোগ্যতার সহিত মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পালন করেন। মহীশূর রাজ্যের সর্বস্তরে শিক্ষা সংস্কারের কার্যেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতেন সেইখানেই তিনি অধ্যাপক ও ছাত্রদের এমন কি স্থানীয় জনসাধারণেরও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি ও আনুগত্য লাভ করিতেন। সমগ্র মহীশূর রাজ্যে দশ বৎসর ধরিয়া তিনি দেবতার মত সম্মান লাভ করেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া প্রগতিপন্থী সুশাসক মহীশূর-মহারাজ মহীশূরের শাসন সংস্কারের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করেন ব্রজেন্দ্রনাথকে উহার সভাপতি নিযুক্ত করা হয় ( ১৯২২-১৯২৩ )। দুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শাসন-সংস্কার বিষয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাহারই ভিত্তিতে মহীশূর রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সংস্কৃত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মহীশূরের জনসাধারণ প্রভূতরূপে উপকৃত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শ মত নবপ্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার উপর লক্ষ্য রাখা হয়। মহীশূরে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে কমিশন নিযুক্ত হয়·ব্রজেন্দ্রনাথকে তাহারও সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। মহীশূরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প-ব্যবসায় প্রসারের পথ সুগম করিয়া দেন। মহারাজার নির্বন্ধাতিশয্যে শিক্ষাবিদ ব্রজেন্দ্রনাথ দুইবৎসর কাল মহীশূর রাজ্যের শাসন পরিষদের ( Executive Council ) সদস্যের পদেও সমাসীন ছিলেন। মহীশূর সরকার, জনসাধারণ ও মহীশূর রাজ্যের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনাথকে 'রাজরত্নপ্রবীণ'—এই উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্, ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক D. Sc. উপাধি দান

করেন। একজন প্রমুখ শিক্ষাবিদ্ ও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক বিধায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ব্রজেন্দ্রনাথকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ মৌলিক গবেষণা সমন্বিত একটি গণিত সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করেন (২)। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যে "নিও রোমান্টিক" আন্দোলন সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই রচনার শেষাংশে বাঙ্গলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষিত হয়। এই প্রবন্ধে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবি-কৃতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়। এই সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা একরূপ বিরল ছিল। এই দীর্ঘ নিবন্ধ কীটসের কাব্য আলোচনা সমন্বিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত অপর একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধ সহ New Essays in criti ism নামে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (৩)। মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের নিবিড় অনুরাগ ছিল। সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা তিনি সযত্নে পাঠ করিতেন।

এই ব্রজেন্দ্রনাথ Quest Eternal নামে একটি উচ্চ দার্শনিকতা পূর্ণ কাব্য রচনা করেন। এই পুস্তকটি ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (৪)। অধ্যাপক বিনয়কুমার ব্রজেন্দ্রনাথের এই কাব্যটিকে নবযুগের "ফাউষ্ট" রূপে অভিনন্দিত করেন।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথের সুগভীর জ্ঞান ছিল। এই সুগভীর পাণ্ডিত্য লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুর ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল অতি অমূল্য গবেষণা পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে প্রাচীন হিন্দুজাতি শুধু দর্শনচর্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় জাতি যন্ত্র-বিজ্ঞান, রসায়ণ, পদার্থ-বিদ্যা, আণবিক ও পরমাণু বিজ্ঞান, গতি-বিদ্যা ( Kinetics ), স্বন বিদ্যা ( Acoustics ), প্রাণতত্ত্ব ( Biology ), শারীর বিদ্যা ( Physiology ), উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রচুর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। যোগ, বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি হিন্দু দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ভিত্তি প্রাচীন হিন্দুর বৈজ্ঞানিক সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই অপূর্ব্ব পুস্তকের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে এই পুস্তকে এমন একটি পংক্তিও নাই যাহার সমর্থনে কোন প্রাচীন পুস্তকের সাক্ষ্য নাই [ "I have not written one line which is not supported by clearest texts' ] ব্রজেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই পুস্তকটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে বিশ্ববাসী ভারত সভ্যতার একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিভাগের পরিচয় জানিতে সক্ষম হয়। এই অমূল্য পুস্তকটি সম্প্রতি প্রথম সংস্করণের অবিকল প্রতিরূপ সহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (৫)।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রজেন্দ্রনাথ আজীবন গভীর সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথমাবধিই আকৃষ্ট করিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ব্রজেন্দ্রনাথের News Essays in Criti ism গ্রন্থে উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির সপ্রশংস বিস্তৃত সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে বাস করিতেছিলেন এই সময় তিনি কাব্যমোদী ইংরাজ সুধিবৃন্দকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং

রবীন্দ্রনাথকে ইংল্যাণ্ডে আসিতে উৎসাহ দান করেন। যাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া এই সময় রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। / দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী (২) পৃঃ ২৯৫, ২য় সং ]

১৩২৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে রবীন্দ্রনাথকে একটি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ এই উৎসব সভার সভাপতিরূপে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। ভাষণটি "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত ( ১৩২৩ )।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ( ৮ই পৌষ, ১৩২৮ ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত শান্তি-নিকেতন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে "বিশ্বভারতীরূপে" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনই বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর পরিচালন বিধি ( coustitution ) গৃহীত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন। কবিগুরুর আজীবনের সাধনা বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য ঋষিকল্প ব্রজেন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কিরূপ উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ মহীশূর রাজ্যে ব্যাঙ্গালোর সহরে কয়েক দিনের জন্য পুরাতন সুহৃৎ ব্রজেন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" উপন্যাস লিখতে ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের গৃহেই কবিগুরু তাঁহার শেষের কবিতা রচনা সম্পন্ন করিয়া উহা ব্রজেন্দ্রনাথকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কবির এই অভিনব উপন্যাসটির বিশেষ প্রশংসা করেন [ দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী, ৩য় ভাগ প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও কবির সহিত দাক্ষিণাত্যে—নির্মলকুমারী মহলানবীশ ]

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সেনেট হলে ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় ( Indian Philosophical Congress )। এই সম্মেলনের উদ্যোগে ১৯শে ডিসেম্বর ভারতের অদ্বিতীয় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বিসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের একান্ত গুণমুগ্ধ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথের এই সভায় পৌরহিত্য করার কথা ছিল। অসুস্থতার জন্য কবি স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি উহা সভার উদ্যোক্তাদের নিকট প্রেরণ করেন। কবিগুরুর পরিবর্তে কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রমুখ নাগরিক ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় এই সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। রোগজীর্ণ ব্রজেন্দ্রনাথ এই সভায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাবে তিনি বিশেষ বিক্ষুব্ধ বোধ করিতেছেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়কেই তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবনার উর্দ্ধে থাকিয়া এক জাতীয়ত্বের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ জানান। এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর লিখিত অনবদ্য কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হইল। এই কবিতাটি প্রথমে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় ( মাঘ, ১৩৪২ )।

**আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুহৃদ্বরেষু,**

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছে সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা—শিখর শ্রেণী, যেথায় গহন গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি, যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা ; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্তধরণীর দিগঞ্চলে
অপাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্য রাজ্যের জাগরণ
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময় যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান্
দিক্‌সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
　　　　　মোরে তুমি জান বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

( রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৭৩-৪

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা সহরে ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে থাকেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান সাধনার বিরাম ছিল না। বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন ও সমাগত জিজ্ঞাসুদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দানেই ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হইত। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে তাঁহার দৃষ্টি শক্তিও লোপ হয়। এই সময় একটি তরুণ ছাত্র তাহাকে পুস্তক পাঠ করিয়া

শুনাইত এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিয়া রাখিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের এমন কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না যেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবেশ লাভ করেন নাই, তাঁহার ছাত্রত্ব লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইত। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ। দর্শন বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের আধুনিকতম মত ও তথ্যাবলী সর্বদা তাঁহার অধিগত থাকিত। কথিত আছে যে ব্রজেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ডক্টরেট উপাধি লাভের সহজতম উপায় ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অভিলষিত বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কোন সুযোগে আলাপ চারণ। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেই ব্রজেন্দ্রনাথ সেই বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যয়ন ও চিন্তালব্ধ ভাবগুলি আলাপকারীকে বলিয়া যাইতেন, আলাপকারী এই কথাগুলি মনে রাখিয়াই নিবন্ধ রচনা করিতেন ও 'ডক্টর' উপাধিলাভ করিতেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে এই মহামনীষীর লিখিত রচনার পরিমাণ তাঁহার বিপুল বিদ্যা-বৈভবের তুলনায় অতি নগণ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতনতম তথ্যগুলিও অধিগত করিতে যত্নবান থাকিতেন এবং কোন একটি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বোধ করিয়া সহসা কিছু লিখিতে কুণ্ঠিত হইতেন ইহাই তাঁহার রচনার অল্পতার কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে অতি উদাসীন ছিলেন, গ্রন্থরচনা না করিয়া কৃতী ছাত্র গড়িয়া তুলিতেই তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই দুইটি বিষয়ই তাঁহার পরম হৃদ্য ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের এই লেখনী সঞ্চালনে কুণ্ঠা ও শৈথিল্য, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় একরূপ লোকলোচনের অন্তরালে প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদের মতই নিভৃত জীবনযাপন করিতেন। ছাত্র ও জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই তাঁহার দ্বার অবারিত থাকিত।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় যে জনসভা হয় তাহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের এই ভাষণটি রামমোহন সম্বন্ধীয় তাঁহার অপর একটি ভাষণ সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৬)।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ (বঙ্গাব্দ ১৩৪৪) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে বৃত হন। তাঁহার ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ একের মধ্যে বহুর এবং বহুর মধ্যে একের উপাসনা করেন…এইরূপে তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া যান…সুতরাং রামকৃষ্ণ কোন ধর্ম বিশেষের উপাসক ছিলেন না, তাঁহার ধর্ম ছিল বিশ্বমানবতার ধর্ম।…শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ঈশ্বরে মানুষকে এবং মানুষে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম সর্বাঙ্গীণ ভাবে গ্রহণ করিয়া ঐসকল ধর্মমতে সাধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমরা সর্ব ধর্ম সমন্বয় এবং সমগ্র মানব জাতিকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারি।

ব্যক্তিগত জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ অতিশয় নিষ্পাপ, সরল, উদার, নিরহঙ্কার, নির্লোভ ও সৌজন্য

সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ব্রজেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও মুনি ঋষিদের ন্যায় ছিল। তাহার শিশু সুলভ সারল্য ও সাংসারিক জ্ঞানের অভাববিষয়ে নানা কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত আছে। সকল মানুষের প্রতিই তাঁহার গভীর মমতা বোধ ছিল। তাঁহার ধর্মবোধ খুব গভীর ছিল। সমাজের উচ্চাচূড়ায় অধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহভৃত্যদেরও পুত্রতুল্য স্নেহ দান করিতেন। ছাত্র বৎসলতায়ও ব্রজেন্দ্রনাথ তুলনা রহিত ছিলেন, প্রিয় ছাত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে তিনি অতুলনীয় ক্লেশ স্বীকার করিতেন, এইজন্য বহু কৃতী পণ্ডিতের পথ প্রদর্শক গুরু হিসাবেই তিনি অধিকতর স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি ছিলেন যথার্থই আচার্য।

যৌবনকালেই ব্রজেন্দ্রনাথ বিপত্নীক হন। তাঁহার তিনটি পুত্রের মধ্যে একটি অল্পবয়সেই পরলোক•গমন করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা সহরেই ব্রজেন্দ্রনাথ ৭৫ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই কৃতী পুত্র ( বিনয়েন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ ) এবং একটি কন্যা ( সরযুবালা ) জীবিতা ছিলেন। যৌবনকালে সরযুবালা 'বসন্ত-প্রয়াণ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি আত্ম-জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন উহা এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মহামনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও যথোচিত সমাদৃত হন নাই। যে সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন অথবা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন শুধু তাঁহারাই অবগত আছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ কি অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের আধার ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনাগুলির মর্মগ্রহণ করিতে হইলে যে পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন সাধারণ পাঠকের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব থাকায় ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার স্বদেশেই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহাকে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

---

(১) Comparative Studies in Vaisnavism and Christianity, Calcutta, 1899.

(২) A memoir on the Co-efficients of numbers, Calcutta, 1891.

(৩) New Essays in Criticism Calcutta, 1903.

(৪) Quest Eternal, Oxford University Press. 1936.

(৫) Positive Sciences of the Ancient Hindus. London 1915. Reprinted Delhi 1958.

(৬) Rammohan Roy—The Universal Man, S. B. Samaj, Calcutta. 1956.

অন্যান্য রচনা—Race origins ( opening address at the International Congress of Races ); Syllabus of Indian Philosophy, Introductory note to IndianShiping by Radhakumud Mukherjee.

# ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ

## অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথের প্রধান প্রধান ব্যবসায় প্রচেষ্টার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কার ঠাকুর কোম্পানী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জাহাজী ব্যবসায় ছাড়াও সেযুগের বিভিন্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর কমবেশী যোগ ছিল। সেযুগের সংবাদপত্রাদিতে তার যে প্রমাণ পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেই এবার আলোচনা করি।

দ্বারকানাথের জীবনী-লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন যে দ্বিতীয়বার বিলাত যাওয়ার পূর্বে দ্বারকানাথ "বেঙ্গল কোল কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করেন। "ইহা সে সময়ের সমস্ত কয়লার ব্যবসায়ের মধ্যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। বার্ষিক ছয় কোটি মণের উপর কয়লা তোলা হইত। সে সময়কার "বীরভূম" "শিয়াড়শোল" ও "ইকুইটেবিল" এই তিনটি কোম্পানীর মোট কয়লা একত্র করিলেও ইহার সমান হইত না।'' কিন্তু তাহার পূর্বেই (১) তিনি কয়লার খনির মালিক ছিলেন। সমাচার দর্পণে ২৬ পৌষ ১২৪২ খবর বার হয় যে, "আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর ষ্টেট সম্পর্কীয় রাণীগঞ্জের কয়লার আকর গত শনিবারে নীলাম হওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ আকর পূর্বে অত্যুৎসাহী জোন্স সাহেবের ছিল। ঐ সাহেব প্রথমেই এতদ্দেশে কয়লা বাহির করাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন।''

দ্বারকানাথ যখন ডীনস্ ক্যাম্বেল সাহেবের সঙ্গে বেঙ্গল কোল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন তখন তার ডিরেক্টর হন কার ঠাকুর কোম্পানী। যখন কার ঠাকুর কোম্পানী উঠে যায় তখন ঐ কোম্পানীর ডি, এম, গর্ডন ও যাস্ ষ্টুয়ার্ট সাহেব একটা নতুন কোম্পানী খুলে কার ঠাকুর কোম্পানীর দেখার জন্য দায়িত্ব মেনে নিয়ে অন্যান্য ব্যবসায়গুলি চালু রাখেন এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর নিয়মাবলীর ৬নং ধারা অনুসারে ঐ কোম্পানীর জন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন। (২) ঐ সময় হইতে ঐ কোম্পানী সম্পূর্ণ সাহেবের হাতে চলিয়া যায়।

ভারতীয় বীমা কারবারের প্রথম দিকে রুস্তমজী কাওয়াসজীর প্রচেষ্টার কথা সুবিদিত। তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথও যে এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন তা নয়। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী এক্সচেঞ্জ রুমসে কলিকাতা হিতকারী সভার (ক্যালকাটা লডেবল্ সোসাইটীর) অংশীদার ও বীমা গ্রহণকারীদের এক সভা হয়। (৩) তাহাতে পুরাতন ছয় জন ডিরেক্টরদের বদলি নতুন ছয় জনকে নিযুক্ত করা হয় এবং কোম্পানীর কাগজপত্র টাকাকড়ি যাহা কিছু তা নতুন ডিরেক্টরদের নামে করে দিতে বলা হয়। পুরানো ডিরেক্টরদের মধ্যে একমাত্র যিনি এই নব গঠিত বোর্ডে রইলেন তিনি হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরে যখন ১৮৩৫ সালের পয়লা জুলাই ৭ম কলিকাতা হিতকরী সভা (এই পংক্তির প্রথমটীর প্রতিষ্ঠা ১৭৯৫ সালের প্রথম দিনে) থেকে পরিবর্তিত আকারে এবং ত্রয়োদশ 'সাপ্লিমেণ্টারী লডেবল্ সোসাইটী''র সঙ্গে মিলে নূতন কলিকাতা হিতকারী সভায় পরিণত হল, তখনও তাহার একমাত্র ভারতীয় ডিরেক্টর দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১৮৩৫ সালের ৩রা নভেম্বর ইংলিশম্যানে একটী বিজ্ঞপ্তি দেখি যে "এই সভার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব কম দরে কতগুলি ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত বীমা অফিসে প্রেমিয়াম দিলে যা আয় হত, এখানেও ছ হাজার টাকার প্রত্যেকটী অংশে গড়পড়তায় প্রায় তাই হবে। কিন্তু এই নূতন হিতকরী সভার পরিচালনার নগণ্য খরচের ( বার্ষিক আদায়ের শতকরা ১ অংশেরও কম ) ফলে পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকবে আশা করেন। সাধারণের ব্যবসায়ের বেশ একটা অংশ পেলে এই নতুন হিতকরী সভার বীমার হার অংশ পিছু গড়পড়তা তাই হাজার টাকারও বেশী হবে। যাহাই হউক, আপাততঃ প্রস্তাব করা হয়েছে যে উদ্বৃত্তটা জীবিতদের মধ্যে, তাঁদের দেওয়া চাঁদার অনুপাতে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। অংশগুলি যদি ছ' হাজার টাকা করেই থাকে এবং তদনুপাতে আয় আট হাজার টাকা হয় ত' সভার জীবিত সভ্যদের মধ্যে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সম্পূর্ণ উদ্বৃত্তটা ভাগ করে দেওয়া হবে ( মোট চাঁদার সিকি অংশের সমান )। এরূপ পর পর জমার ফলে বীমাগ্রহণকারীরা সেই অনুপাতে কম অংশ চালু রাখতে পারবেন এবং ফলে বীমা প্রতিষ্ঠান ও সঞ্চয়ী ব্যাংক উভয়ের কাজই ফলাও ভাবে চলিবে। বিবাহ সংক্রান্ত টাকা বা ঐ রকম কোন বীমার বেলাতেও এর উপকারিতা পরিষ্কার। বিভিন্ন তরফের উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ায় এটীকে পারস্পরিক সাহায্য সমিতি বলে গণ্য করা যায়। কাজেই যাঁদের জীবন বীমা করা হল তাহারাই একাদিক্রমে সত্ত্বাধিকারী, বীমাগ্রহণকারী ও বীমার জন্য দায়ী সুতরাং এই সভা উহার বীমা গ্রহণ করে নাই কিন্তু বীমা থেকে লভ্যাংশদাবীকারী সত্ত্বাধিকারীদের নির্বাচিত পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি, ডিরেক্টর প্রভৃতির অধীন নহে।"

যাঁরা বীমা করেছেন রাণীমুদির গলিতে ১লা আগষ্ট তাদের ষাণ্মাসিক সভায় সম্পাদক জে কালোন হিসাব পেশ করেন।

এই কলিকাতা হিতকারী সভার চেয়ে আরেকটী বীমা কোম্পানীর সঙ্গে দ্বারকানাথ বেশী জড়িত ছিলেন—সেটির নাম ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমা কোম্পানী। এটী আজকালকার মত যৌথ কারবার ছিল না—ছিল অংশীদারী ভিত্তিতে গঠিত। অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথ প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ সওদাগর। ১৮২৯ সালে যখন এটা পুনর্গঠিত হয় তখনও দ্বারকানাথ অংশীদার রইলেন। তারপর ১৮৩৩ সালে যখন অনেকগুলি বড় বড় সওদাগরি ব্যবসা বিপর্যয়ে ফেল করে তখনও দ্বারকানাথ বিত্তশালী অংশীদার হিসাবে এ কারবারের তত্ত্বাবধান করতেন। (৪) ১৮৩৫ সালের ১৩ই নভেম্বরের ইংলিশমান কাগজে দেখা যায় যে ওরিয়েণ্টল কোম্পানীর সাহেব ও এদেশীয় সত্ত্বাধিকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ও তাঁর চারজন (৫) আত্মীয়দের নাম রয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে সাধারণের জন্য একটা সরকারী বীমা কারবার খোলার প্রস্তাব করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটিও বসান হয়। বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সকল উপায়ে এর বাধা দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এক আবেদন পাঠালেন যাতে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয় যে এরূপ সরকারী কারবার প্রতিষ্ঠা নিরর্থক এবং পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আর কোন কোম্পানী খুলতে পারেন না। তা' ছাড়া সরকার যে আশঙ্কার ছুতা করে এ কার্যে নাম দিলেন তা' ভিত্তিহীন প্রমাণ করার জন্য প্রত্যেক বীমা কোম্পানী

নিজ নিজ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করে প্রকাশ করবার জন্য কমিটি নিয়োগ করলেন। দ্বারকানাথ তাঁর ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্‌সিউরান্স কোম্পানীর জন্য যে কমিটি বসালেন তার উদ্দেশ্যর মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিলেন যে এই পুরাতন বীমা কারবারটী নতুন ছাঁচে ঢেলে চালানো যায় কিনা সে বিষয়েও মন্তব্য করবে। এ কমিটির সদস্য ছিলেন হার্ডিং ; ক্রস্ ; কার ; ডব্লিউ, এস্, স্মিথ ; জন্ লো ; টার্টন ও গর্ডন সাহেবেরা। এ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৮৩৪ সালের মার্চ মাসে নিউ ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্‌সিওরান্স সোসাইটী গঠন করা হয় এবং পুরানো কোম্পানীর সব দেনা-পাওনা ( outstanding risks ) মেনে নেওয়ার জন্য ৪০ হাজার টাকা পুরানো কোম্পানী ( অর্থাৎ প্রকারান্তরে দ্বারকানাথ ) দেন। ঐ টাকা ও হাজার টাকা করে প্রতি শেয়ার বিক্রী করে যে মূলধন তাই নিয়ে কোম্পানী চালু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞাপন দেবার আগেই পঞ্চাশটির উপর অংশের খরিদ্দার তৈরী ছিল। এ কোম্পানী বেশ ভালোভাবেই চলে এবং ১৮৩৬ সালের ডিসেম্বরের এসিয়াটিক জার্ণালে (৬) দেখা যায় যে গত ১৮ই জুলাই কোম্পানীর সভায় মূলধনের চার লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ কেনা সাব্যস্ত হয়েছে।

এর প্রায় বার বৎসর বাদে ইষ্টার্ণ ষ্টার জানাচ্ছেন যে, (৭) "আমাদের পরমানন্দের বিষয় যে কলিকাতায় দেশীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে কারণ এদেশীয়দের জন্য এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই। আমরা শুনিলাম যে এ বিষয়ে উদ্যোগী জি জে গর্ডন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়রা ও বাবু মতিলাল শীল এবং ইতিমধ্যেই বিধিব্যবস্থার একটা খসরাও প্রস্তুত করা হইয়াছে ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা ইতিমধ্যেই তিনশত অংশ খরিদ করিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ আরেকটা ব্যবসায়ে হাত দেন। সেইটি লবণের ব্যবসা। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী নাম দিয়ে যে কারবার খোলা হয় তার প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রাণ ছিলেন দ্বারকানাথের বন্ধু উইলিয়ামের দাদা প্রিন্সেপ। ঐ জন্য তাঁর মৃত্যুর পর ক্রস সাহেবের প্রস্তাব মত ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবারবর্গকে ১০০ শেয়ার উপহার দেওয়া হয়। (৮) খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৮৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক্সচেঞ্জ রুমস্-এ কোম্পানীর যে সভা হয় তাতে দেখা যায় যে প্রথমে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায়গুলি দুরীভূত হওয়ায় সমিতি পূর্ণভাবে কাজ চালু হওয়ার সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। যে প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তন্মধ্যে একটি দেখি টি জে টেলার প্রস্তাবিত ও এডোয়ার্ড বারোয়েল সমর্থিত। ইহাতে বলা হয় যে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হওয়ায় অংশীদারদের তরফ থেকে সাময়িক সমিতির সভ্যদের ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং এখন হইতে কোম্পানীর কাজকর্ম চালাইবার জন্য একজন সভাপতি ও আটজন ডিরেক্টর (৯) নির্বাচিত করা হউক এবং নির্বাচিত ভদ্রলোকদের কোম্পানীর দলিল তৈয়ারী করিতে ও সরকারী অনুমোদন দাবী করিতে অধিকার দেওয়া হউক।

প্রায় ওই সময়েই গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর গুদাম তৈরীর ব্যাপারে দ্বারকানাথ উদ্যোগী হন। এখন যেখানে কমার্শিয়াল বিল্‌ডিংস্ নেতাজী সুভাষ রোড থেকে ষ্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঐ জায়গাটায় বাড়ী করে গুদাম ও অফিস তৈরীর এক পরিকল্পনা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে

"বণ্ডেড ওয়েয়ার হাউস এসোসিয়েসন" গঠিত হয়। চাঁদা তুলে ১৮৩৯ সালের শেষ নাগাদ গুদামের সারি ও দ্বিতলের ঘরগুলি শেষ করেন। কলিকাতা কুরিয়ারের (১০) খবরে দেখি যে ৩১এ অক্টোবার বণ্ডেড ওয়েয়ার হাউস সমিতির ষাণ্মাসিক সভা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডিরেক্টরদের রিপোর্ট পড়া ও পাশ হলে মার্টিন সাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ডিরেক্টরদের দরকার মত সত্বাধিকারীদের কাছ থেকে চাঁদার শতকরা আরও দশভাগ দাবী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বকেয়া চাঁদা আদায় করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বত্বাধিকারীদের সাধারণ সভায় বিগত বৎসরের হিসাব দাখিল করা হয়। তাতে দেখি—চাঁদা বাবদ আয় কোম্পানীর ৯৩,৭৫০ টাকা

| | | |
|---|---|---|
| গুদাম থেকে আয় ( „ ) | ১১,১৬৫৲ | তের আনা তিন পাই |
| সুদ | ১৮৫৲ | দশ আনা চার পাই |
| ইউনিয়ন ব্যাংকে জমা দেওয়া টাকার উপরি যাহা ব্যাংক হইতে পাওয়া গিয়াছে | ১২,৯৩৬ | দশ আনা চার পাই |
| মোট | ১,১৮,০৩৮ | এক আনা ১১ পাই |

এ ছাড়া আরও যে তিনটি বিষয়ে তাঁকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখি সেগুলির কতটা ব্যবসায় হিসাবে আর কতটা সমাজপতি হিসাবে সাধারণের উপকারার্থে তা বলা শক্ত। অন্ততঃ সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জনহিতার্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৩৩ সালের ১২ই অক্টোবর সরকার একটী সেভিংস ব্যাংক স্থাপন করে পরিচালনার জন্য স্থায়ী কমিটি গঠন করেন। (১১) এতে চৌদ্দজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বারকানাথ অন্যতম। ঐ বৎসর ১লা নভেম্বর যখন ব্যাংক খোলা হয়—তখন প্রথম দিনের প্রথম টাকা জমা দেন দ্বারকানাথ ও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্র নাথ। (১২)

দ্বিতীয় বিষয় যাতে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেখি তা হল কলিকাতায় বরফের কারখানা খোলা। কলিকাতায় ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে বরফ আসিত জাহাজে চালানি মাল হিসাবে। সাধারণতঃ আমেরিকা থেকে। উত্তর আমেরিকার হ্রদ ও নদীর "স্বাভাবিক বরফ" পাল তোলা জাহাজের খোলের মধ্যে কাঠের গুড়া চারপাশে খুব মোটা করে দিয়ে আনা হত। (১৩) জাহাজের ইঞ্জিনের গরম না থাকায় এবং প্রধান অংশটা সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে ডুবে থাকায় সবটা গলে যেত না। যেটুকু কলিকাতা পৌঁছাত সেটা মোটা পাথরের দেওয়াল ও ছাদওয়ালা বাড়ীতে অতি সন্তর্পণে রাখা হত। ১৮৩৫ সালের ৩রা নভেম্বর 'ইংলিশম্যান কাগজে' দেখি যে "বরফ আড়তের গ্রাহকদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত কমিটি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে বাংলার লাটবাহাদুর এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের উপকারের উদ্দেশ্যও কতকটা আছে বলে, ব্যাংকশাল বাগানের থেকে এক খণ্ড জমি এই বাড়ী তৈরীর জন্য দান করেছেন। বাড়ী তৈরীর কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হবে এবং চাঁদা ইউনিয়ন ব্যাংকে লওয়া হবে। ইতিমধ্যেই যাঁরা একশত টাকার একটী করে অংশ কিনেছেন তাঁদের মধ্যে দেখি প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। এ ছাড়া গোড়াতেই দান হিসাবে দ্বারকানাথ আরও একশত টাকা দেন।

আরেকটি প্রচেষ্টা যে বিষয়ে দ্বারকানাথের আজীবন উৎসাহ ছিল সেটি হল "থিয়েটার"। তখনকার কালে থিয়েটার বলিতে বিলাতী থিয়েটারই বুঝায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন তাঁর খুড়োর বাগানবাড়ীতে 'উত্তররামচরিত' অভিনয় করিয়েছিলেন (১৪) সেটাও হয়েছিল ইংরাজীতে—উইলসান (১৫) সাহেবের অনূদিত ও তার তত্ত্বাবধানেই অভিনীত। সেদিনও দ্বারকানাথ সেখানে সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় বিলাতী থিয়েটার অবশ্য তার বহু আগে থেকেই। লায়ন্‌স্ রেঞ্জের থিয়েটারের পর .৮১৩ সালের নভেম্বরে থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ে "চৌরঙ্গী থিয়েটার" খোলা হয়। এই বাড়ীটা "পুরাণো ও সৌন্দর্য-বিহীন" বলেই বর্ণিত হয়েছে—তবে এর জাঁকের মধ্যে ছিল একটা কাঠের গম্বুজ বা "ডোম" ১৮২৮ সাল পর্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি বেশ ভালই চলেছিল কিন্তু তারপর ক্রমশঃই অবনতির দিকে যায়। এক ইটালীয় কোম্পানী এখানে অপেরা চালাতে চেষ্টা করে বিফল হয়। তারপর এক ফরাসী কোম্পানীকে রাত পিছু পঞ্চাশ টাকা দরে ভাড়া দেওয়া হয়। তাও যখন চলিল না তখন সত্ত্বাধিকারীরা নিজেরাই এটা পরিচালনের চেষ্টা করলেন। টিকিটের হার কমানো হল। তবু ধার ক্রমশঃ বেড়েই চলিল এবং ১৮৩৫ সালে যখন ধার বিশ হাজার টাকার উপর গিয়ে দাঁড়ালো তখন তাঁরা থিয়েটারটাকে নিলামে বিক্রয় করিতে সাব্যস্ত করলেন। ঐ সালের ১৫ই আগষ্ট চৌরঙ্গী থিয়েটার ত্রিশ হাজার একশত টাকায় বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনলেন। খবরটা দিয়ে কলিকাতা মাসিক জার্ণাল (১৭) জানাচ্ছেন "মালিক বদলের সুফল ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ হচ্ছে। পরিচালনা বিভাগ খুব উঠেপড়ে কাজ করছেন এবং সেরা নাটকগুলি অভূতপূর্ব ভালভাবে নিবেদন করবার চেষ্টা করছেন। জানা গেল যে "কেপ" এর আর্তত্রাণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ১৪ই আগস্টের অভিনয়ে ২১০০ টাকার মত উঠেছে। এর চার মাস বাদে (১৮) দেখি দ্বারকানাথ চাটগাঁয়ে ডব্লিউ জম্পিয়েরকে লিখছেন যে "আপনি কলিকাতায় থেকে আমাদের থিয়েটার দেখতে পেলে বড় ভালো হত। এখন আর প্রত্যেক নাটকে বিনামূল্যে দু'শ টিকিট দাবী করতে একশত অংশীদারের ঝামেলা নেই। এখন এটা প্রায় আমার একার সম্পত্তি। পার্কার, পামার ও আরো কয়েকজন বলেছে মাসে দুবার করে নিয়মিত আসবে এবং আগামী মার্চ মাসে ঘটা করে সমস্তটা সারানো আরম্ভ হবে। এটিকে আমরা এদেশের আবহাওয়ায় যতটা সম্ভব আরামদায়ক জায়গা করবার চেষ্টা করিব। আপনি এবার কলিকাতায় এলে দেখে নিশ্চয়ই খুসী হবেন। হ্যা, জানেন কি যে আমাদের ছোট্ট ফ্লোরা ব্যাটাভিয়াতে গিয়ে বিয়ে করেছে?"

দ্বারকানাথের অন্যান্য প্রচেষ্টার মত এটা সফল হলেও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৯ সালের মে মাসের শেষ দিনে ভোরবেলা চৌরঙ্গী থিয়েটারে আগুন লাগে। গ্রীষ্মের দিন, তায় কাঠের বহু আসবাবপত্র থাকায় আগুন হু হু করে জ্বলে উঠে কাঠের "ডোম"টা যখন পুড়তে আরম্ভ করে তখন আগুনের আলো সারা কলকাতা থেকে দেখা গিয়েছিল। এক ঘণ্টার ভিতর প্রায় সমস্তটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর পর দ্বারকানাথ আর প্রত্যক্ষভাবে থিয়েটার চালানোর কাজে হাত দেননি।

মিসেস লীচ যখন ইংলিশম্যান সম্পাদক স্টকলর সাহেবকে ধরে নতুন একটা থিয়েটারের চাঁদা তোলেন তখন দ্বারকানাথ প্রায় হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন মাত্র।

এ ছাড়া দ্বারকানাথের অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে শিলাইদহে নীলকুঠি, কুমারখালিতে রেশনের কুঠি ও রামনগরের চিনির কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) জানুয়ারী ১৮৩৬। (২) বেঙ্গল হরকরু এপ্রিল ১৮৮৩। (৩) ইন্‌সিয়োরেন্স ওয়ার্ল্ড আগষ্ট ১৯৩২ (৪) ১৮৩৪ সালের মার্চের কলিকাতার কুরিয়ার লেখেন যে যদিও এ কোম্পানীর নিয়মানুসারে ১৫০টি অংশের ভিতর কোনও এক ব্যক্তির পাঁচটীর বেশী অংশ থাকা উচিত নয়, তবু অংশীদারদের মধ্যে কেবলমাত্র বিত্তশালী অংশীদার হওয়ায় সমস্ত কারবারের দায়িত্ব দ্বারকানাথের উপর পড়েছে। একজনের উপর এতটা নির্ভর দ্বারকানাথ ও জনসাধারণ উভয় তরফের প্রতি অনুচিত। দ্বারকানাথ নিজেও তাই এর সঙ্গে নুতন মূলধন যোগ করে নুতন করে কারবারটিকে চালাতে চান। (৫) রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। (৬) পৃ ২৬৪। (৭) কলিকাতা কুরিয়ার ১লা জুন ১৮৪০। (৮) কলিকাতা কুরিয়ার ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৯। (৯) এঁদের নাম হল—সভাপতি টি, ডিকেন্স। অন্যান্য ডিরেক্টরগণ জে, কুলেন; ডব্লিউ, ক্রস; এন্, এলেকজাণ্ডার; এল্, ক্লার্ক; এইচ, হলরয়েড; দ্বারকানাথ ঠাকুর; ডব্লিউ, প্রিন্সেপ; ও, জে, কথন্। (১০) ১৩ই নভেম্বর, ১৮৩৯। (১১) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রবাসী পৌষ ১৩৬১। (১২) প্রত্যেকে জমা দেন চারশ' টাকা করে। (১৩) পিল্যাণ্ড ও কোম্পানীর শতবর্ষের ইতিহাস লণ্ডন ১৯৩৭। (১৪) ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১। (১৫) হোরেস হেমান উইলসন্। (১৬) কলিকাতা মাসিক জার্ণাল জুন, ১৮৩২। (১৭) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০। (১৮) ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৩৫। (১৯) দ্বারকানাথ বাড়ীটা কিনে, আগেকার সত্বাধিকারীদের কয়েকজনকে নতুন করে এক কমিটি করে, তার হাতে পরিচালনার ভার ছেড়ে দেন। (২০) যখন চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে যায় তখন মিসেস্ লীচ বিলাতে গিয়াছিলেন। ইনি ১৭ বৎসর বয়সে ২৭ জুলাই ১৮২৬ প্রথম চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনয় করেন। সেদিন থেকে আজীবন তিনি কলিকাতার থিয়েটার দর্শকদের চোখের-মণি ছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে যাবার পর তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে দশ নম্বর পার্ক স্টীটে (এখন সেটি জেভিয়াস কলেজ) সাঁসুলি থিয়েটার খোলেন। এর জন্য চাঁদা উঠে ষোল হাজার টাকা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাঁদা (হাজার টাকা) দেন দ্বারকানাথ ও তখনকার বড়লাট বাহাদুর। তাঁদের উপস্থিতিতেই ১৮৪১ সালের ৮ই মার্চ এখানে প্রথম থিয়েটার হয়। সেদিনকার অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে অপেশাদার ছিলেন। যথা—টরেন্স সাহেব (সিভিলিয়ান) ও, জে, হিউম সাহেব (ম্যাজিষ্ট্রেট)।

# ষ্টুয়ার্ট মিল ও ইণ্ডিয়া হাউস

## নারায়ণ দত্ত

ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিবাদ এককালে বাঙালী মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণের উজ্জ্বল অধ্যায়ে বেন্দ্যাম, মিলের প্রেরণা অস্বীকার করার মত নয়। কিন্তু স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ অন্য আর একসূত্রেও গড়ে উঠেছিল। মিলের প্রত্যক্ষবাদী দর্শন ভারতবর্ষের উর্ব্বর মৃত্তিকায় অঙ্কুরোদ্গম করার ঢের আগে।

ভারতবর্ষের বুকে তখনও জন কোম্পানীর কড়া শাসন। আর সেই শাসন চলে সুদূর ইংলণ্ডের জনবহুল লীডেনহল স্ট্রীটের একটা বাড়ী থেকে। সে এক অন্ধকার কারাগৃহ। বছরের ছয়টা মাস আলোর জন্য মোমবাতির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। আর তার দিকে নির্দেশের জন্যে, আলোর জন্যে চেয়ে বসে থাকে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ইন কৌন্সিল—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা।

কথাটা বোধহয় ঠিক বলা হলনা। কেননা লীডেনহল স্ট্রীটের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদরদপ্তর ইণ্ডিয়া হাউস থেকে হুকুমনামা এলেও ভারতবর্ষের ডেস্পাচ ও তার উত্তর প্রত্যুত্তরের জন্যে বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল ইণ্ডিয়া হাউসের একস্‌জামিনরস্ ডিপার্টমেণ্ট। এই বিভাগেই একদিন কাজ করবার জন্যে এসেছিলেন পণ্ডিত স্টুয়ার্ট মিল। এই ডিপার্টমেণ্টের কর্মাধ্যক্ষের পরিচয়ে এক ঐতিহাসিক বলেছেন—'But almost equal to the Secretary in influence and greater perhaps in responsibiliiy, stood another official, whose duties were somewhat faintly indicated by his title of "Examiner of Indian correspondence." In his department were prepared the bulk of the Company's despatches to the various governments in India, and he was practically the Director's Chief adviser on all matters affectting the administration of that country."

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ারদিক পর্য্যন্ত এই বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল স্যামুয়েল জনসনের ওপর। কোম্পানীর সর্বোচ্চ পরিষদ অর্থাৎ কমিটি নব ডিরেক্টর'সদের রাজনৈতিক, রাজস্ব, বিচার বিভাগীয় ও সামরিক সকল বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য তাঁর ডাক পড়ত। আর শাসন ব্যবস্থার এই অতি কেন্দ্রিকরণের ফলে যা হয়ে থাকে তাই ঘটে গেল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পনীর সদরদপ্তরে। একসময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষ থেকে আসা জরুরী চিঠির জবাব যেতে যেতে তিন চার বছর কেটে যায়। কারও কোন জবাবই যায় না। এবং জবাব যখন গিয়ে পৌছায়, দেখা গেল, জবাবের আর কোন প্রয়োজনই নাই তখন। প্রকৃতির স্থুল হস্তাবলেপে সকল সমস্যারই মীমাংসা হয়ে গেছে। এ কথা নয় যে স্যামুয়েল জনসনকে একাই সব করতে হত। কোম্পানী তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বেশ কয়েকজন সহকারী দিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও শেষ সিদ্ধান্তের জন্য জনসন সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

আঠারশ' চার সাল নাগাত কোম্পানীর টনক নড়ল। ব্যাপারটা যে সত্যিই একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে সেটা কর্তাব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন এবং 'একটা কিছু করতে হয়,' 'একটা কিছু করতে হয়' ভাবতে ভাবতে একসময়ে যা করে বসলেন সেটা বুঝি না করলেই ভালো হ'ত। ভারতীয় হিসাব পত্রের অডিটার সায়েবের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল সামরিক বিভাগ সংক্রান্ত বিভাগটি। বলাবাহুল্য, এ' গোঁজামিলের ফল মোটেই ভালো হয়নি এবং কয়েকদিনের মধ্যেই একজন মিলিটারী সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি করে তার উপর এই ব্যাপারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হ'ল। আর সাধারণভাবে ইণ্ডিয়া হাউসের এক্সজামিনার্স ডিপার্টমেণ্টের একটা প্রাথমিক রদ বদল করা হ'ল আঠারশ' ন' সালে। দু'জন সহকারী সেক্রেটারীকে নিয়োগ করা হ'ল। তাঁরা যথাক্রমে বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জন্যে দায়ী হলেন। একজন সহকারী এক্সজামিনারের পদ হ'ল। তিনি দেখতে থাকলেন বিবিধ দপ্তর। এঁর বিভাগের নাম হ'ল 'পাবলিক'। এই নতুন কর্মচারীরা অবশ্যই জনসনের অধীনে কাজ করতে লাগলেন। জনসন নিজে রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। আঠারশ' সতের সাল পর্যন্ত এমনি চলল। মাঝে কেবল স্যামুয়েল জনসন অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন উইলিএম ম্যাকলক। ইনি জনসনের প্রধান সহকারী হিসাবে এতদিন কাজ করছিলেন।

বছর দুই পরে কয়েকজন অবসর গ্রহণের ফলে এই বিভাগে তিনটি এসিট্যাণ্টের পদ খালি হ'ল এবং এই সময় কোম্পানী ভেবেচিন্তে, তিনজন নতুন লোককে এই বিভাগে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই বিভাগের পুরানো কোন কর্মচারীকে এই পদে উন্নীত করতে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা রাজী হলেন না। তবে চতুর্থ একটি পদ সৃষ্টি করে ঐ পদে একজন অভিজ্ঞ কেরানীকে তাঁরা প্রমোশন দিলেন। আর ঐ তিনটি এ্যাসিট্যাণ্টের পদে যাঁরা নিযুক্ত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্টুয়ার্ট মিলের বাবা জেমস মিল। অপর দুইজন হচ্ছেন—এডওয়ার্ড স্ট্রাচী ও টমস লর্ড পিকক ( ১ )। স্ট্রাচী বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের লোক। সতের শ' তিরানব্বই সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ক্লাইভের এককালের সেক্রেটারী স্যার হেনরী, স্ট্রাচীর দ্বিতীয় পুত্র। কার্লাইল তাঁর স্মৃতিকথায় এঁর কথা বলেছেন। আঠার শ' এগার সালে ইনি ইংলণ্ডে ফেরৎ যান। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁর কর্মস্থান ছিল।

জেমস মিল সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' বাজারে সুনাম কিনেছিল এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা জেমস মিল সম্বন্ধে তাঁদের মনোনয়ন লিপিবদ্ধ করার সময়ে মিলের এই ঐতিহাসিক গবেষণার কথাও উল্লেখ করেন। 'লাইফ অব জেমস মিলে' বলা হয়েছে যে জর্জ ক্যানিং, সেকেলের কোম্পানীর বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট মিলের এই নিয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

যাই হোক আঠার উনিশ সালের আঠারই মে, বছরে আট শ' পাউণ্ডের চাকরীতে ইণ্ডিয়া হাউসে ঢুকলেন জেমস মিল । চাকরী অবশ্য প্রথমেই কিছু পাকা হয়নি। দু'বছরের জন্য। পরে আবার বিচার বিবেচনা হবার কথা রইল। জেমস মিলের ভাগ্যে পড়ল রাজস্ব বিভাগ। স্ট্রাচী ভারতবর্ষে জজিয়তি করেছিলেন। কাজেই তাঁকে দেওয়া হ'ল বিচার দপ্তর। আর ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার দরুণই বোধ হয় তাঁর মাহিনা হল সকলের চেয়ে বেশী—বাৎসরিক হাজার পাউণ্ড।

কিন্তু সুরুতে বেশী মাইনে পেলেও একসময়ে দেখা গেল জেমস মিল বেশ নাম করে ফেলেছেন ইণ্ডিয়া হাউসে এবং একসময়ে স্ট্র্যাচীকেও ডিঙ্গিয়ে গেছেন। কেন না আঠার শ' তেইশ সাল নাগাৎ দেখা যাচ্ছে জেমস মিল হচ্ছেন এ্যাসিট্যাণ্ট একসজামিনার আর তিনজন হচ্ছেন একসজামিনারের এ্যাসিট্যাণ্ট মাত্র। পদাধিকার বলে মিল হয়ে গেলেন স্ট্র্যাচীর উপরে। স্ট্র্যাচী অবশ্য রাগ করে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। শেষবেশ মাথা নীচু করে যথানিয়মে অফিস করতে লাগলেন।

আর কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরা যে মিটিং এ জেমস মিলের মাইনে বাড়িয়ে তাঁকে এ্যাসিট্যাণ্ট একসজামিনর করে দিলেন সেই মিটিং এই আর একজন কেরাণী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং চেয়ারম্যান জেনস প্যাটিসন এই নুতন কেরাণী হিসেবে নিয়োপত্র দিলেন আমাদের এই কাহিনীর নায়ক জন স্টুয়ার্ট মিলকে। সেকালের কাগজপত্র থেকে জানা যায় তরুণ মিল ইণ্ডিয়া হাউসের কাজে যোগদান করেন সতের বছর বয়সে। একুশে মে আঠার শ' তেইশ। সেকালের ইণ্ডিয়া অফিসের আইন অনুযায়ী তাঁকেও তিনবছর শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল। হাত খরচ থাকবে ত্রিশ পাউণ্ড। কিন্তু তারপরেই চড় চড় করে প্রমোশন। এই তিন বছর যেন স্টুয়ার্ট মিলের ইণ্ডিয়া হাউসে গুটিপোকার কাল। পরে বেরোলেন একেবারে রঙ-চঙে প্রজাপতি হয়ে। কেননা আঠার শ' সাতাশ সালের মার্চ মাসে তাকে বছরে দুশ পাউণ্ডের একটা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়। আরও এক বছর পরে কোর্ট অব ডিরেক্টররা সিদ্ধান্ত নিলেন যে "that Mr. John Mills, the eleventh clerk in office of the Examiner of India correspondence, who had been employed in the corresponding department since the first appointment and who has been reported well qualified for that duty, and to whose application, industry, and general good conduct the Examiner has bome the strongest testimony, be removed from his present situation, and appointed as Assistant to the Examiner...with an addition of 220 to his present salary, making his total allowance 310 per annum."

কোম্পানীর এই সিদ্ধান্তের ধাক্কায় জনষ্টুয়ার্ট মিল দশজন কেরাণীকে ডিঙিয়ে একেবারে কনিষ্ঠতম করণিক থেকে কেরাণী মুকুটমণি হয়ে বসলেন। মাহিনাও অবশ্য বাড়ল, কিন্তু সে অনুপাতে নয়। এবং অচিরে কোম্পানীর নেকনজর সেই অভাবটুকুও পূরণ করে দিল। আঠার'শ উনত্রিশ থেকে চৌত্রিশ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর তাঁকে বছরে দুশো পাউণ্ড করে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। এবং এই ভাতা আঠার'শ চৌত্রিশ থেকে একেবারে পাকাপাকিভাবে বন্দোবস্ত হয়ে যায়। এই সময় তার মাইনে দাঁড়িয়েছিল সব নিয়ে দু'শো কুড়ি পাউণ্ড। জনষ্টুয়ার্ট মিলের বয়স তখন আটাশ। ইতোমধ্যে বলা দরকার, ম্যাকুলক সায়েব এক্সজামিনার পদ-থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং সেই বহুবাঞ্ছিত পদে উন্নীত হয়েছেন আর কেউ নয় জেমস মিল। সাল আঠার'শ

ত্রিশ! ক্রিসমাস। এই সঙ্গে সিনিয়র মিলের তন্‌খা বেড়ে হয়েছে বছরে উনি'শ পাউণ্ড অবশ্য জেমস মিলের এ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সজামিনারের পদে আর কাউকে নিয়োগ করেনি কোম্পানী। দুটো কাজই একই সঙ্গে দেখতে থাকেন জেমস মিল।

আঠার'শ ছত্রিশ সালে আরও একটা পরিবর্তন হয় কোম্পানীর সদর দপ্তরে। এসিস্ট্যান্ট একজামিনারের পদে প্রমোশন দেওয়া হয় টমাস লভ পীককে। তাঁর মাইনে হয় দেড় হাজার পাউণ্ড। জেমস মিলের মাইনে বেড়ে হয় পাক্কা দু'হাজার। আর ছিটেফোঁটা জোটে ষ্টুয়ার্ট মিলের। বার্ষিক আট'শ। কিন্তু জেমস মিলের এই মাহিনা ভোগে হয় না। কেননা আঠার'শ ছত্রিশ সালের তেইশে জুন ব্রঙ্কাটাইসের রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স তখন তাঁর চৌষট্টি। অবশ্য আঠার'শ পঁয়ত্রিশ সালের আগষ্ট মাসে তার ফুসফুস্ থেকে রক্তক্ষরণ হয়। তারপর থেকেই কোনদিনই আর তিনি সেরে ওঠেন নি।

জেমস মিলের মৃত্যুর মাসখানেক পরেই কোর্ট অব ডিরেক্টররা পীককে একজামিনার করে দিলেন। ষ্টুয়ার্ট মিলেরও প্রমোশন মিলল। মাহিনা হল বার্ষিক বার'শ পাউণ্ড। এই সময়ে কিন্তু স্টুয়ার্ট মিল মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তিনমাস ছুটি নিয়ে সপরিবারে কন্টিনেন্টালে বেড়াতে যান। এবং ফিরে এসে যথানিয়মে লীডেনহল স্ট্রীটের চাকরী সুরু করেন। মিল মুখ্যত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম্ম চালাতেন। মিলের নিজের হাতে লেখা আঠার শ' চব্বিশ সাল থেকে আঠার শ' আঠান্ন পর্যন্ত ডেসপ্যাচগুলি বর্তমান ইণ্ডিয়া অফিসের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। তার মুখ্য অংশ হচ্ছে রাজনৈতিক। সামান্য কয়েকটি বৈদেশিক অর্থাৎ অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও নৌবহন পাবলিক ও অর্কস এবং ধর্ম ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধীয় কয়েকটি ডেসপ্যাচের উল্লেখ আছে তালিকায়।

জেমস মিলের আমল থেকেই কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা নাকচ করবার জন্য অনেকে উঠে পড়ে লেগেছিল। এবং সে সময়ে অনেক কষ্টে সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থায় নানা রকমের পরিবর্তনের সূত্রপাত করা হয়। জুনিঅর মিলের আমলেও সেই প্রচেষ্টা চরমে ওঠে। আঠার'শ সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ জটিল ও সঙ্গীন হয়ে ওঠে এবং জন মিল এই ঝড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েন। কেননা ইতিমধ্যে আঠার শ' আঠান্ন সালের আঠাশে মার্চ কোম্পানীর একসজামিনার পীকক সায়েব অবসর গ্রহণ করেন এবং এই দায়িত্ব পুর্ণ পদে বহাল হলেন মিল। এই পদোন্নতির ফলে তাঁর মাইনে হয় বছরে দু হাজার পাউণ্ড। অবশ্য এর আগেই আঠারশ চুয়ান্ন সালে মিলের মাইনে বছরে দুশো পাউণ্ড করে বাড়ানো হয়েছিল।

সে যাই হোক কোম্পানীর হাত থেকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে স্টুয়ার্ট মিলের সংগ্রাম তাঁর মুন্সীয়ানা বাস্তবিকই প্রশংসাযোগ্য। এই অমূল্য দলিল পড়ে আর্ল গ্রে নাকি বলেছিলেন যে এমন মুসাবিদা নাকি আর হয় না 'a master piece of its kind' কোম্পানীর পক্ষে ওকালতি করে এই স্মারকলিপিতে স্টুয়ার্ট মিল প্রবীণ সেনাপতির মত তাঁর আক্রমণ জাল রচনা করেছিলেন। ব্রিটিশ মহাসভার সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে তিনি বলেছিলেন যে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা খরচে ব্রিটিশ সরকারের হাতে একটা সুবিপুল সাম্রাজ্য তুলে দিয়েছেন যখন অতলান্তিকের আর পাড়ে আর একটি বিরাট সাম্রাজ্য পার্লামেণ্টের নিজস্ব পরিচালনা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের হাতছাড়া হতে বসেছে। মিল স্পষ্টতঃই আমেরিকার অপর সব ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের কথা উল্লেখ করেছেন।

মিল বললেন, সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে মানি। কিন্তু তার জন্যে না ভারতের শাসন ব্যবস্থা দায়ী না যারা সেই শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দায়ী। এবং এই বিদ্রোহ দমনে কোম্পানী কোনরকম শিথিলতা দেখিয়েছে তা ত প্রমাণ হয় না। আর তাই যদি হয়ে থাকে তবে তার জন্যে ব্রিটিশ সরকারই কম দায়ী কিসে? কেন না, বর্তমানে যে ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ শাসন করা হচ্ছে তার, শেষ কথা হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের "the failure could constitute no reason for divesting the East India Company of its function and transferring then to Her Majesty's Government, for under the existing system, Her Majesty's Government here the deciding voice [ and ]......are thus in the fullest sense, accountable for all that has been done, and for all that has been foreborne or omitted to be done ....."তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করে মিল আরও লিখেছেন—So believe that the Administration of India would have been more free from error had it been conducted by a Minister of the Crown without the aid of the Court of Directors, would be to believe that the Minister, with full power to govern India as he pleased, has governed ill, because he has had the assistance of experienced and responsible advisers'

অর্থাৎ যদি মনে করা যায় যে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা আরও ত্রুটিহীন হ'ত যদি নাকি কোর্ট অব ডিরেক্টারদের সাহায্য ছাড়াই কোন মন্ত্রী স্বয়ং এই শাসনকার্য চালাতেন—তার অর্থ কি এই নয় যে ভারত শাসনের সকল দায়িত্ব সমর্পিত মন্ত্রী অপশাসন করলেন এই কারণে যে তাঁর বরাতে কয়েকজন অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরামর্শদাতার সাহায্য জুটেছিল?'

সবশেষে অবশ্য মিল বলেছিলেন যে যদি সত্যসত্যই কোম্পানীর শাসনের অবসান ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাম্য হয় তাহলে সেটা অন্ততঃ বর্তমানের জন্য রহিত করা হয় এবং আগে বর্তমান ব্যবস্থার পরিচালনা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান চালানোর পর করা হয়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে কোম্পানীর হয়ে মিলের এই ওকালতি হয়ত বা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নয়। কেননা, তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় মিল বার বার জানিয়েছেন যে তাঁর চাকুরী জীবনে তাঁকে কোম্পানীর মতের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামতের সন্ধি করতে হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে মিলকে তাঁর নিজস্ব মতামতকে খর্ব করে কোন আপোষ নিষ্পত্তি করতে হয়নি। কেননা, তাঁর আত্মজীবনীতেই মিল ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এবং অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিগত ভাবে এই সিদ্ধান্ত অপছন্দ করার জন্যেই নতুন শাসন আয়োজনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে তাঁকে গ্রহণ করার যে কথা উঠেছিল সেটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।

কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তাঁর এই অপূর্ব স্মারকপত্র রচনায় খুবই খুসী হয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি সত্যি, কিন্তু তাঁরা যে তাঁদের মন্তব্য বলবার জন্যে মনোমত ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন তার জন্যে তাঁরা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। আর তার জন্য মিলকে উপহার দিয়েছিলেন পাঁচ শ গিনি। এটা আঠার শ আটান্ন সালের আগষ্ট মাসের কথা। এর কয়দিন পরেই ভারতবর্ষ সরাসরি মহারাণী ভিক্টরিয়ার শাসনাধীনে চলে গেল। আর বার্ষিক পনরশ' পাউণ্ড পেন্সন নিয়ে দার্শনিক ও আর্থনীতিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল চিরকালের জন্য লীডেন হল ষ্ট্রীটের সেই ঘিঞ্জি অন্ধকুঠুরীতলা বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলেন। তাঁর বয়স তখন বাহান্ন। এরপর আরও পনর বছর বেঁচেছিলেন মিল।

মিলের সময় কেমন ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস ? সতের বছর বয়সে যখন প্রথমে বাবার সঙ্গে তাঁদের ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের বাড়ী থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর অফিস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে করতে এই লম্বা লম্বা থামওয়ালা বাড়ীটার ভেতরে ঢুকতেন ষ্টুয়ার্ট মিল, সেকালের অনবদ্য বর্ণনা রয়েছে এসেজ অব ইলিয়ার, গ্রন্থকার চার্লস ল্যাম্বের কল্যাণে।

তারপর এই আলোক বর্জিত অন্ধকারাগৃহে তাঁর জীবনের সোনার পদ্ম থেকে একটির পর একটি সোনার বছরের পাপড়ি খসে খসে পড়েছে কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের ভেতরের কাঠামোর বিশেষ নড়চড় হয়নি। তাঁর যখন বয়স ছত্রিশ, সে সময়ে প্রফেসর বেন এসেছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে। তাঁর লেখা মিলের জীবনী থেকে জানা যায় যে বাড়ীটা তখনও dingy-। তবে বাড়ীটা তখন অনেক প্রশস্ত এবং তার সুবিপুল সিংহদ্বার অধ্যাপক বেনের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছিল। বেন বলেছেন সেকালের ইণ্ডিয়া হাউসে কর্মচারীদের জন্যে চায়ের আয়োজন ছিল এবং বেয়ারারাই সে কাজ করত। দশটার সময়ে যে প্রাতরাশ দেওয়া হত তাতে ষ্টুয়ার্ট মিলের সারাদিন চলে যেত। সন্ধ্যা নটায় বাড়ী ফিরে তিনি হালকা ডিনার খেতেন। প্রাতরাশ হিসেবে মিল পেতেন চা, মাখন পাউরুটি আর একটা সিদ্ধ ডিম। ইণ্ডিয়া হাউসে বেনের দেখা মিলের ছবিও মনে রাখবার মত। বেন বলছেন 'তাঁর লম্বা রোগা চেহারা, তাঁর যৌবনদীপ্ত মুখমণ্ডল, কেশবিরল মাথা, কালো লম্বা চুল টকটকে রাঙা বরণ, কথা বলবার সময় ভ্রুকুঁচকে কথা বলা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত তারপর তাঁর ব্যবহারের সজীবতা তাঁর সরু গলার অকর্কশ অথচ তেজোদৃপ্ত কথাবার্তা স্মৃতির মণিকোঠায় অমর হয়ে আছে।' মিলের অফিসের পোষাক ছিল কালো স্যুট আর সিল্কের নেকটাই। পরে অবশ্য কোটের জায়গায় লম্বা আটো সাটো ওভার কোট পড়তেন মিল। তবে কাপড়ের রঙ বদলান নি সারা জীবনে। পথে চিরসাথী ছিল তাঁর ছাতাটি। ছাতাটি হাতল ছেড়ে একটু নীচুতে ধরে দ্রুত পায়চারি করার অভ্যাস ছিল মিলের।

মিলের দৌলতে ইণ্ডিয়া হাউসে অনেক মনীষীরই পায়ের ধূলো পড়েছে বলে জানা যায়। কার্লাইল অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেখানে। জন ষ্টার্কিং-এর সঙ্গে কার্লাইলের সাক্ষাৎ হয় এই ইণ্ডিয়া হাউসেই।

কিন্তু শুধু ইণ্ডিয়া অফিসের ডেসপ্যাচ তৈরী করেই মিল তাঁর অফিস-জীবন কাটিয়েছিলেন

এটা বোধহয় ঠিক কথা নয়। চার্লস ল্যাম্বের বহু রচনার পটভূমি যেমন তাঁর অফিস তাদের রচনাস্থান যেমন তাঁর অফিসের ডেস্কটি, ষ্টুয়ার্টমিলের ব্যবসায়েও সেই সেই ঘটনার ব্যত্যয় হয়নি। তাঁর বিখ্যাত লজিক গ্রন্থটির বহু অধ্যায়, বহু চিঠি বিখ্যাত 'লণ্ডন রিভিউ'র অনেক রচনা তাঁর এখানে বসেই লেখা।

'বস' হিসেবেই বা কেমন ছিলেন মিল? তাঁর সঙ্গেই বা তাঁর 'বসের' কেমন সম্পর্ক ছিল? জেমস মিল মারা যাওয়ার পর পীকক যখন একস্‌জামিনার হ'ন তখন কিন্তু তাঁর সঙ্গে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না জুনিয়র মিলের। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এর কারণ ছিল উভয়ের চরিত্রগত বৈপরীত্য। পীকক ছিলেন লঘু প্রাণখোলা সদা হাস্যময় পুরুষ। আর মিল স্বভাবগম্ভীর। সে অবশ্য যে কারণেই হোক উভয়ের মধ্যে খুব একটা সম্প্রীতি ছিল না।

তবে 'বস' হিসেবে ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর নিম্নতন কর্মচারীদের সঙ্গে খুব গভীরভাবে মিশতেন। তাঁদের জানতেন বা জানবার চেষ্টা করতেন। এবং কাহিনীসূত্রে জানা যায় যে তাঁকে যখন কোম্পানী একজামিনারের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন তখন তিনি তাঁর সহকারীর প্রমোশন দাবী করে বলেন যে অন্যথায় তাঁর পক্ষে এই পদ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আরও একটা কাহিনী থেকে জানা যায় যে নিম্নতন কর্মচারীদের সামান্যতম প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। তাঁর সেই কোম্পানীর হয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্মারকপত্রখানি সম্বন্ধে কোর্ট অব প্রোপাইটারসদের শেষ সভায় একজন ডিরেক্টর বলে ওঠেন যে সেটি অন্য একজন সহকারীর রচনা যদিও ষ্টুয়ার্ট মিল সেটি দেখে দিয়েছেন। সে সভায় উপস্থিত মিলের একবন্ধু তৎক্ষণাৎ এই ভ্রান্ত উক্তির প্রতিবাদ করতে বলেন। মিল সব শুনে বলেন, 'না, না, কথাটা ঠিকই। স্মারকলিপির দ্বিতীয় পাতায় প্রথম লাইনটা পুরোপুরি ওঁরই রচনা!'

(১) টমাস লভ পীকক সেকালের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কয়েকটি পুস্তকের মধ্যে Headlong Hall, Melin court এবং Nightmare Abbey. তাঁর এই সাহিত্যগুণ কিন্তু তাঁর চাকরীর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায়। তবে তাঁর বন্ধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেক্রেটারী, পিটার অবারের সাহায্যেই তিনি সেসব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন।

## বাংলার দেশী সঙ্গীতে হিন্দু ও মুসলমান

মানবিক মূল্যের মানদণ্ডে লোক সঙ্গীতের দাবী মার্গ সঙ্গীতের তুলনায় অগ্রগণ্য। মার্গ সঙ্গীতের রূপ স্পষ্টতই সংস্কৃত। তার আকার অর্বাচীন প্রাকৃতে নয়, বিশুদ্ধ দেবনাগরীতে। তার অভিপ্রেয় ধুলার ধরণী নয়, ইন্দ্রের অলকাপুরী। প্রসাধনেই তার প্রসাদ, ঐশ্বর্যেই তার গরিমা। পক্ষান্তরে, লোক-সঙ্গীতের অভীষ্ট মর্তের মানুষ। তার আশক্তি অলঙ্কারের ঘন ঘটায় নয়, নিরাভরণ সরলতায়। এক কথায়, মার্গসঙ্গীতে মানুষের অভিলাষ দেবতা হওয়ায়, লোকসঙ্গীতে মানুষ মানুষই থাকে বরং দেবতাই হন মানুষ। মনুষ্যত্বে লোকসঙ্গীতের লজ্জা নেই পরন্তু এখানেই তার কৈবল্যসিদ্ধি। ঠিক এই ভাষায় না হলেও অনুরূপ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে শুক্রনীতিসার গ্রন্থটিতে। প্রসঙ্গত আর একটি ধ্রুপদী সংজ্ঞাও এখানে উল্লেখযোগ্য : 'সঙ্গীত দ্বিবিধ—মার্গ এবং লোকসঙ্গীত। মার্গসঙ্গীত শিব কর্তৃক অনুসৃত এবং ভরত কর্তৃক প্রযুক্ত। এই সুরসুধা মানুষের মুক্তিদান করে। কিন্তু লোকসঙ্গীতের লক্ষ্য দেশীয় রীতি অনুসরণে লোকরঞ্জন।' উল্লিখিত অভিধাটি সঙ্গীতদর্পণ (১।৪-৬) থেকে গৃহীত। বলাই বাহুল্য যে, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটিতে পূর্বমত সমর্থিত।

লোকসঙ্গীতকে কোথাও কোথাও দেশী সঙ্গীত বলা হয়েছে। সঙ্গীতদর্পণ এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন, দশরূপও এই নামটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। মূলত অবশ্য লোক এবং দেশী শব্দদুটির অর্থ অভিন্ন। এই অবসরে মার্গ, লোক এবং দেশী—এই শব্দ তিনটির কিছু আলোচনা প্রয়োজন। মৃগ্ ধাতুজ মার্গ শব্দটি ঋগ্বেদ থেকে আহৃত। বুৎপত্তিগত অর্থে, মৃগয়া বা মৃগ শিকার করা। মৃগ অর্থে যেমন হরিণকে বোঝায় তেমনি প্রসারিত অর্থে যেকোন প্রাণীকেও বোঝাতে পারে। কালক্রমে মার্গ কথাটি মৃগকুলের মুক্তিপথ রূপে এবং পরে বিশিষ্ট অর্থে মানুষের মুক্তিপথরপে অর্থান্তরিত হল। এই অর্থটি সংগীতদর্পণের সংজ্ঞায় স্বীকৃতি পেয়েছে। দিশ শব্দজ দেশী কথাটির অর্থ বিশিষ্টরূপে স্থানীয় বা আঞ্চলিক। লোক শব্দটির নিহিত অর্থও তা-ই। সুতরাং শব্দার্থেও মার্গ এবং দেশী সঙ্গীতের ব্যবধান মেরুপ্রমাণ; এবং প্রতিশব্দ না হলেও দেশী এবং লোক শব্দ দুটি সমার্থক। উভয়েরই সীমানা আঞ্চলিকতার অঙ্গনে, প্রকৃতির পক্ষপুটে।

শুধু দেশী সঙ্গীতেই নয়, দেশী শিল্পের সর্বাঙ্গেই প্রকৃতির প্রভাব প্রবল। সঙ্গীতে-সাহিত্যে-চিত্রে সর্বত্রই প্রকৃতির লীলামাহাত্ম্য সপ্রকাশ। এখানে বর্ণের ব্যবধান এবং ধর্মের ফারাক গুহ্য; স্পষ্ট শুধু মানুষের মানবিকতা, তার ক্রিয়া তার কলাপ। পূর্ব বাংলার জারীসারী কিম্বা উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়াচটকা অথবা পশ্চিম বাংলার টুসুগান অতএব নিছক হিন্দুর কিম্বা কেবল মুসলমানের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়—হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতির, বাংলাদেশের। রাঢ় বাংলার রাঙামাটির পথে যে বাউল মনের মানুষ খুঁজে ফেরে তার কাঙ্ক্ষিত জনটি তো কেবল হিন্দুর

নামাবলীতে কিম্বা মুসলমানের আলখাল্লায় আবৃত নয়, সে নিরাবরণ নিরাভরণ মানুষ। মানুষের মাঙ্গল্যে মানুষের বেদনায় তার ভাললাগা ভালবাসায়, তার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ প্রকাশে লোক তথা দেশী শিল্পের অসীম উৎসাহ। বাংলার দেশী সঙ্গীতের পালা পরিক্রমণেও উপর্যুক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আঞ্চলিকতাই যদি দেশী সঙ্গীতের ধর্ম হয় তবে সাগরপারের কোন নিভৃতগ্রামের বাঁশিওয়ালার কণ্ঠে পদ্মাপারের ভাটিয়ালীর সুর কী করে কেঁদে বেড়ায়? উত্তরে বলা যায়, সমধর্মী পরিবেশে স্থানদূরত্ব সত্ত্বেও সমস্তরের অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। অথবা, অসম্ভব নয় একদা আমরা হয় তো একই মূল গোষ্ঠির অঙ্গীভূত ছিলাম। এ সম্ভাবনা নৃতত্ত্বসম্মতই।

সনাতন সংস্কার যাই বলুক, একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে বঙ্গসংস্কৃতির বর্তমান রূপ মূলত হিন্দুমুসলমানের দ্বৈতসৃষ্টি। বাংলার মুসলমানরা কেবল পারস্যের বুলবুল, বসরার গোলাপকুঞ্জ কিম্বা আরবের খর্জুরছায়ার স্বপ্নেই মগ্ন নন, ষড়ঋতুবিলাসিনী এই বাংলার রূপবন্দনায়, তার তাল-তমালের ছায়াঘেরা শ্যামল মাঠের বর্ণনায়ও ব্যাকুল। এবং ব্যাকুলতাও অকারণ নয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে এ দেশের সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক বন্ধন। দ্বাদশ শতকের শেষ থেকে রাজনৈতিক সংযোগ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানদের ঐস্লামিক উৎসও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রাখে। এতদ্দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পেটের তাগিদে এবং সমাজনিপীড়নে ধর্মান্তরিত। বল্লালী কৌলিন্যে একদল রাতারাতি তকতে তাউস বনে গেলেন আর একদল ক্রোধাগ্নিতে জ্বলতে লাগলেন। উচ্চ তিন শ্রেণীর নীচে যারা তারা ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হল। দেশের মানুষের এক বিরাট অংশ তখনো বৌদ্ধ অথচ বৌদ্ধনেতারা বাংলাদেশ থেকে সীমান্তের দিকে পলাতক। নেতৃহীন বৌদ্ধদের অবস্থা সুতরাং কর্ণধারহীন তরণীর মতো বেসামাল। ওদিকে, ব্রাহ্মণদের বাহ্য আচারের প্রবল বন্ধনে হিন্দুসমাজের নাভিশ্বাসদশা। সাধারণ মানুষের অনেকেই 'অনাচরণীয়' এই অজুহাতে সমাজনির্বাসিত। পাঠানরা তখন দুয়ারপ্রান্তে। উপায়ান্তরহীন নির্যাতিত মানুষ তখন নির্বিচারে পাঠানদেরই স্বাগত জানাল। লক্ষণীয়, ধর্মান্তরের দৃষ্টান্ত তাই গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের মধ্যেই বেশি। এদেশীয় মুসলমানদের মস্তকমুণ্ডনের মধ্যে অতএব বৌদ্ধ 'নুড়িয়া-র' প্রভাব আশ্চর্যের নয়। তৎকালীন বঙ্গসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে দোষতন্ত্রের এই শ্লেষগাঢ় ছত্রটির মধ্যে: "ঘৃতে জরজর শূকর ভাজা ভোজন করে বামন রাজো। ওরে বাবু নীলকণ্ঠ কেমনে খাইলা শুকরের ঘণ্ট॥" দোষকারিকা থেকে অনুরূপ আর একটি চিত্রও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য: "ভট্টাচার্গের বাড়িতে পাঁচপীরের মোকাম। তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম॥ শুকদেব নমাজ পড়েন নম্র করি শির। বেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির। ধর্মান্তরিতের অন্তর্জ্বালা উপর্যুক্ত চিত্রদুটিতে করুণভাবেই উপস্থিত।

মৈমনসিংহগীতিকার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। অকপট অভিব্যক্তিতেই যদি লোক সঙ্গীতের সার্থকতা হয় তবে মৈমনসিংহগীতিকা অবশ্যই সফল। এখানে একদিকে যেমন আছে দেওয়ান ভাবনার সোনাইকে বলপূর্বক হরণের সচিত্র বিবরণ, পাশাপাশি তেমনি আছে সোনাই-এর মাতুল ভাটুক ঠাকুরের উল্লিখিত কাজে সক্রিয় সহযোগিতার স্বাক্ষর। একদিকে যেমন অত্যাচারী

কাজী, দেওয়ান ভাবনা কিম্বা দেওয়ান জাহাঙ্গীর অন্যদিকে তেমনি পরস্ত্রীলিপ্সু হিন্দু চূড়ামণি হীরণ সাধু। আসলে বিপুল মানবসংঘে সকলেই শুদ্ধাচারী সজ্জন নন, হওয়া সম্ভবও নয়। সদাসদের সম্মেলনেই মানুষ। এই ভালোমন্দ মিশ্রিত মানুষের চিত্রণে মৈমনসিংহগীতিকা উজ্জ্বল। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যে এই গীতিকাগুলিতে দয়া করে ভর করেন নি তা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা, এরই ফলে আমরা এই গীতিকাগুলিতে নকলদেবতাকে নয়, নির্ভেজাল মানুষকে পেয়েছি। সুতরাং গীতিকার অংশবিশেষকে মুসলমানী অত্যাচার বা হিন্দুব্যাভিচারের চিত্ররূপে গণ্য না করে মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির মঙ্গলাচরণ বিশেষ অভিনিবেশের দাবী রাখে। মহুয়ার প্রারম্ভে গায়ক প্রণতি জানাচ্ছেন এইভাবে: "সভা কইর‍্যা বইহ ভাইরে ইন্দুমুসলমান। সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।" হুমরা বেদের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে: "বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা নাম। তাহার কথা শুন কইরে ইন্দুমুসলমান।" এই গীতিকাগুলির বাক্‌ভঙ্গী এবং উপমা প্রয়োগের স্বাতন্ত্র্যও অভিনিবেশ যোগ্য। স্বাভাবিকভাবেই এই গীতিকাগুলিতে তৎসমের তুলনায় তৎভব এবং দেশী শব্দের প্রাধান্য। কখনো বা শোভনভাবেই উর্দু ভাষার সহ অবস্থান ঘটেছে এর অঙ্গে। এ কথা ভুললে চলবে না, এই গানগুলির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মুসলমানরাও। এবং যতই উদার হক না কেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ ও সামাজিক আদর্শের কেতাবগুলি আরবি পারশিতে লেখা। সুতরাং তাদের নিত্যকর্মে কথায়বার্তায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আরবি এবং পারশির আগমন অবশ্যম্ভাবী। গীতিকাগুলিতেও এর প্রভাব পরিষ্কার। ফলত আকাশ হয়েছে এখানে আসমান, মৃত্তিকা হয়েছে জমিন কিম্বা রাজস্ব রূপ নিয়েছে খাজনায়। কিন্তু কোথাও কোন অস্বাভাবিক প্রয়োগ চোখে পড়ে না। এখানেই গীতিকাগুলির সার্থকতা। বাংলার হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক নির্ধারণে এই গীতিকাগুলির পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

মৈমনসিংহ গীতিকার আলোকেই কি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ অথবা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল দেখা সম্ভব? হয় তো নয়। পদ্মপুরাণের একটি চিত্রে দেখি অত্যাচারী মুসলমান ব্রাহ্মণের কণ্ঠ থেকে পৈতা কেড়ে নিয়ে তার মুখে থুথু দিচ্ছে। অন্যদিকে, হিন্দু গোপেরা মুসলমান কাজির দাড়ি উপড়িয়ে তার মুখে ছাগলের রক্ত লিপ্ত করছে। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের চিত্রও অনুরূপ: নবদ্বীপের রাজা ব্রাহ্মণ দেখলেই তার জাতিপ্রাণ নষ্ট করেন। কারু ঘরে সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি শোনা যায় না। কেননা রাজা "নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥"

এই নষ্টজাতি হিন্দুদের সমাজে পুনর্গ্রহণের বিধি পরবর্তীকালে শিথিল করা হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, হিন্দুধর্ম রক্ষা। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে প্রায়শ্চিত্ত বিধি এইরূপ: "বল করি জাতি যদি লয় যবনে ছয়গ্রাস অন্ন যদি করা-এ ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।" এবং আর একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধান যোগ্য: "ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে গোমাংস ভক্ষণে।" রিয়াজউস সালাতিনের বিবরণ অনুযায়ী রাজা গণেশ তাঁর মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত পুত্র যদুকে স্বর্ণধেনু যজ্ঞ করিয়ে হিন্দুরূপে গ্রহণ করান।

তুলনায় রংপুরী সংগীতগুলি কিন্তু অনেক অপাপবিদ্ধ। কৃষ্ণ হরিদাসের সত্যপীরের

পাঁচালীতে হিন্দু-মুসলমান একতা অতি স্পষ্ট। কখনো সত্যপীর বলেন, "যবনের পীর আমি হিন্দুর দেবতা।" কখনও আবার এই উক্তিটির সবিশদ ব্যাখ্যা করেন: "এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই। সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই ॥ সেই নিরঞ্জনের নাম বিসমোল্লা কয়। বিষ্ণু আর বিসমোল্লা কিছু ভিন্ন নয় ॥ হিন্দুর দেবতা আমি মুছলমানের পীর। দুই কুলে লই সেবা করিয়া জাহির ॥" রংপুরের পল্লী অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায় রহিম সাধুর গান গায়। এই ধরণের গানেও মিলনভাব স্পষ্টগোচর: "রূপধন্য কন্যা রহিম সাধু মিলন হইল মুকুন্দমুরারী। মুছলমানে বল আল্লা ভক্ত বল হরি।" বৈষ্ণব বাউদিয়ার গান নামে এক ধরণের ধর্মসমস্যামূলক গান রংপুরে প্রচলিত। রঙ্গরসিকতার মধ্যেও এইসব গানে গুরুতত্ত্ব এসে পড়েছে। এখানেও হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী সুন্দরভাবে মূর্ত: "হেন্দুলোকে বৈলে থাকে রাজা দশরথ। মুছলমানে বৈলে থাকে আল্লি হজরত ॥ হিন্দুলোকে বৈলে থাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মুছলমানে বৈলে থাকে হাসেন-হুসেন ॥ হিন্দুলোকে বৈলে থাকে চণ্ডী আর দেবী। মুছলমানে বৈলে থাকে ফতেমা আর বিবি ॥ অবশেষে এখানেও সেই 'এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই।' জলই বল আর পানিই বল তার স্বরূপ একই। মুসলমানদের ধর্মীয় সংগীত জারি গানেও রংপুরে হিন্দুপ্রভাব লক্ষণীয়: রাম-লক্ষ্মণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে। ঐ রকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে ॥"

পশ্চিম বাংলায় চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে বহু ফকির কিচ্ছা শোনা যায়। এগুলির মধ্যে বনবিবির জহুরনামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনীকথনে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্পষ্টই পরিস্ফুট: বনবিবি আর তার ভাই সা জঙ্গুলী আল্লার দরবার থেকে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁহাদের ওপর হুকুম, তাঁরা সুন্দরবন দখল করবেন। সুন্দরবনে তখন দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব। পরাক্রান্ত দক্ষিণ রায় জলে কুমীরে চড়েন আর ডাঙ্গায় চড়েন বাঘের পিঠে। বাঘ আর কুমীর তাঁর বাহনও বটে, সেনাও বটে। ফকিরেরা তাঁর সঙ্গে লড়াই করেন কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠেন না। তাই বনবিবি আর সা জঙ্গুলীর ডাক পড়ে। তাঁরা মদিনা থেকে ভাঙ্গরে উপস্থিত হলে ভাঙ্গরের বড় গাজী দক্ষিণরায়ের পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বনবিবি দক্ষিণরায়ের নিকট যুদ্ধ দাবী করলেন। দক্ষিণরায় যুদ্ধে প্রস্তুত হলে মা নারায়ণী বললেন, "বাবা স্ত্রীলোকের সংগে লড়াই করতে যাবে, হারলে বড়ই লজ্জা জিৎলেও নাম নাই। বরং তুমি রোস, আমি লড়াই-এ যাই। নারায়ণী যুদ্ধে গেলেন। সাতদিন ধরে বনবিবি আর নারায়ণীতে যুদ্ধ চলল। কিন্তু কোন মীমাংসা হল না। সহসা একদিক থেকে আল্লা আর একদিক থেকে বিষ্ণু এসে উপস্থিত হলেন। দুজনে সন্ধি হয়ে গেল। সন্ধির সর্ত অনুসারে বনবিবি সমগ্র সুন্দরবনের মালিক হলেন। আর দক্ষিণরায় আঠারো ভাটির অধিকার পেলেন।

কিংবদন্তীর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যাঁর নাম জড়িত সেই পীর গোরাচাঁদের পাঁচালী প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য: গোরাচাঁদ ওরফে গোড়াই গাজী চেয়েছিলেন দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান বানাতে। কিন্তু রাজা রাজী হলেন না। ফলত উভয়ের তুমুল যুদ্ধ এবং পরিণামে গোড়াই বা গোরাচাঁদের পরাজয় হল। পীর গোঁরাচাঁদ পরাজিত হয়ে হাতিরাগড়ে গমন করলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য। সেখানে রাজা মহীদানন্দের পুত্র অকানন্দ এবং বকানন্দের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ

হল। বকানন্দ গোড়াই-এর হাতে মারা গেলেন। গোড়াই গুরুতর আহত হলেন। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। নিরাময়ের জন্য তিনি সঙ্গীদলের নিকট পান প্রার্থনা করলেন। পান না পেয়ে আহত অবস্থায় কুলটিবিহারী গ্রামে গমন করলেন এবং নির্জন নদীতীরে বিশ্রাম করতে লাগলেন। প্রত্যহ কালুঘোষের গরু তাঁর কাছে আসে এবং সকলের অলক্ষ্যে তাঁর মুখে দুধ ঢেলে দেয়, অলক্ষ্যে গরুটা যদি সাতদিন এইভাবে দুধ দিত তবে গোড়াই আরোগ্যলাভ করতেন। কিন্তু সাতদিনের দিন কালুঘোষ ব্যাপার বুঝে গরুটার সঙ্গে গোড়াইএর নিকট হাজির। গোড়াই বুঝলেন তাঁর দিন আগত। তিনি কালুঘোষকে বললেন: "আমার তো মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এল। আমায় তুমি হাড়োয়ার মাটিতে কবর দিও।" সেই কথামত কালুঘোষ গোড়াইএর মৃত্যুর পর তাঁকে হাড়োয়ার মাটিতে কবর দেয়। কালুঘোষের এই মুসলমানপ্রীতিতে তার জনৈক প্রতিবাসী তাকে ঠাট্টা করায় কালুঘোষ রোষবসে তাকে হত্যা করে। শাসনকর্তা আলাউদ্দীনের বিচারে কালুর প্রাণদণ্ড হয়। কালু তখন বিদেহী গোড়াইএর স্মরণ নেয়। গোড়াই গাজী কবর থেকে উঠে কালুঘোষের প্রাণভিক্ষা চান বিচারপতি আলাউদ্দিনের কাছে। আলাউদ্দিন তখন প্রাণদণ্ড মুকুব করেন।

'পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান' আজও বারাসাত অঞ্চলের ফকিরদের কণ্ঠে শোনা যায়। ফাল্গুন মাসের বারো তারিখে এখনো হাড়োয়াতে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে এক বিরাট মেলা বসে গোরাচাঁদের কবরের পাশে। পীর গোরাচাঁদ আজ হিন্দুমুসলমান উভয়েরই আরাধ্য।

বাংলার মেয়েলি বিবাহ সঙ্গীতেও উভয় সম্প্রদায়ের সমধর্মিতা অতি স্পষ্ট। হিন্দুসমাজের মতো মুসলমান সমাজেও স্ত্রী আচার অবশ্যপালনীয়। তফাৎ এই, হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গীতে যেখানে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ উল্লিখিত, মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গীতে তা নেই। ফলে স্বাধীন মানবিকতাবোধে মুসলমান সমাজের বিবাহগীতগুলি অধিক প্রাণবন্ত। কিন্তু উভয় সমাজের সঙ্গীতেই অন্তঃশীল ফল্গুর মতো একই সুরধারা সঞ্চারিত। কন্যার পতিগৃহগমনে হিন্দুজননী কাঁদেন: "আধেক গাঙ্গে ঝড়বৃষ্টি আধেক গাঙ্গে বিয়ারে সুন্দর ময়নামতিরে। ময়নারে নিয়া গেল চিলের ছোঁও দিয়ারে সুন্দর ময়নামতিরে॥ আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিবে পারে রে সুন্দর ময়নামতিরে। পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া তোরে লইতাম কোলে সুন্দর ময়নামতিরে॥" মুসলমান বিবাহসঙ্গীতেও অনুরূপ করুণসুর মূর্তিমান। নববধূর সজলচোখের দিকে তাকিয়ে স্বামী বলছেন: "তুমি কিয়ে দুক্কে কান্দ আলো বিবি তাই বল আমি শুনি। উত্তরে নয়া বিবি ভেঙ্গে পড়ছে: বাবাজানের বাঙ্গেলায় খেলতাম হারে সাধু ছোট ভাইবোন লইয়া। মিঞা ভাইর আঙিনায় খেলছি হারে পাশা ভাইবৌকে লইয়া। মামজানের বাঙ্গেলায় রইছে হারে সাধু আমার দুপুইরা ফুলের সাজি। আমি তারি লাগিয়া কান্দি হারে সাধু আমার ঝরে আঁখির পানী।" শুধু বিদায়ব্যথায়ই নয়, হাসিমস্করার প্রকাশেও উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহগীতিতে সমধর্মিতা সুপ্রকট। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই সামাজিক সঙ্গীতগুলির পুনর্বিচার আজ অতীব প্রয়োজনীয়।

এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমান পর্যবেক্ষণ পূর্ণাঙ্গ নয়, সতর্ক চোখে হয়তো অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও বেশি হাজির করা সম্ভব। এবং হয়তো একথাও ঠিক, সাহিত্যের ভাবকেলিতে

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার। দেশী সঙ্গীতের প্রকারভেদ সম্পর্কেও আমি সচেতন—মৈমনসিংহগীতিকা যে অর্থে দেশী সাহিত্য মঙ্গলকাব্য বা পুরাণ কাব্যগুলি সে অর্থে নয়। তবু বলব এই জন্যেই দেশী শিল্পের—সাহিত্য, চিত্র এবং সঙ্গীতের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। শ্রুতিনির্ভর দেশীগানে কূটকলার ছলনা, মিথ্যাবেসাতির অবকাশ তুলনায় অনেক কম। অকপট অভিব্যক্তিই এর চরিত্র। নীলগগনের চন্দ্রাতপতলে আসীন সমজদাররা দেশী সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের অভিমত অভিরুচি প্রত্যক্ষভাবে যেমন দেশীগানে ধরা দেয় এমন আর কোথাও নয়। বাধা তো বহুই আছে—যেমন দেশীগানের কালবিচার রচয়িতা নির্ণয় সঠিক পাঠগ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু এ বাধা দুরূহ হলেও দুস্তর নয়। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িকতায় বরং এই বাধা অতিক্রমণের প্রয়োজন বিশেষ জরুরী। মিলনের জন্য যত না আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ততোধিক।

আজ আর সেই বিগতদিনের মন্থরজীবনের সরলতায় পুনর্গমন সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। সাহিত্য সৃষ্টি করে যে মন তা অনেকাংশে পরিবেশনির্ভর। নিরাপত্তাবোধ যেখানে বিপন্ন সেই অসহায়তার গুপ্তপথেই জিঘাংসা প্রবৃত্তির প্রবেশ। আত্মবিলোপের ভয় মানুষকে নিষ্ঠুর করে, অমানুষ করে তোলে। এ নিষ্ঠুরতা পরিবেশ তথা সমাজনির্ভর। সুতরাং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত সাম্প্রদায়িক সমাধান সম্ভব নয়। দেশী সঙ্গীতের পর্যালোচনাও এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

## শিল্পের দুর্বোধ্যতা

শিল্পের দরদালান পেরিয়ে রসের ভিয়েনঘরে ঢুকবার চাবিকাঠি খুঁজে না পেলেই অনেক রসিককে শুকনো গলায় আমরা বলতে শুনি—বোঝা গেল না। শিল্পকে যখুনি বুঝতে পারলেন না তখুনি রসিকের সবটুকু রাগ গিয়ে পড়লো শিল্পের ওপর, শিল্পের কারিগরের ওপর। ফলে এই দুয়ের নামে তিনি শিল্পলোকের পাড়ায় পাড়ায় নিন্দের খৈ ছড়াতে লাগলেন। রত্নাকরের গল্প নিছক গল্পই। কিন্তু তার যদি অন্যরকম মানে করি, তবে শিল্পরসে বুঁদ হতে-না-পারা রসিক হচ্ছে রত্নাকর। রসের আস্বাদ জিভে এসে ঠেকলেই তিনি আরেক মানুষ। তাই যে-রত্নাকর শোকের ভেতর শিল্পরসের ছিটেফোঁটারও হদিশ না পেয়ে নিজেই হাজার শোকের কারণ হয়েছিলেন, সেই শোকই তাঁকে শিল্পীর ঋষিসভায় উৎরে দিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পকে উপভোগ করবার পুরো ইচ্ছে নিয়েও রসিক কেন শিল্পকে বুঝে উঠতে পারলেন না ; ভাবে-রূপে ডাগর-হয়ে-ওঠা শিল্প আর রসিকের সমঝদারির মাঝখানে কেন বাধা হয়ে দাঁড়ালো ঐ চাবিকাঠির কায়দাটি। আমার ধারণা, শিল্পীমনের ভঙ্গির সাথে রসিকমনের ভঙ্গির বেশ চওড়া ফারাকই এর গোড়াকার কথা। যেমন, ধরা যাক, শিল্পী তাঁর রচনায় বিশেষ ছাঁদে একটি শব্দ ব্যবহার করলেন, কিংবা বিশেষ ঢঙে তুলি দিয়ে একটি আঁচড় টানলেন। 'বিশেষ' বলছি এজন্যে যে, শব্দটি-আঁচড়টি সাদামাটাভাবে হালফিলের হলেও শিল্পী হয়তো ওদেরই ভেতর দিয়ে একরাশ চমকদার ইঙ্গিতকে মেলে ধরতে চেয়েছেন। এখন, শিল্পীমনের ঐ ছাঁদটুকু ঐ ঢঙটুকু যদি রসিকমনের কাছে অজানা থেকে যায়, তবে তো রসিকের পক্ষে শিল্পরসের মৌতাত জমানোর কোনো উপায় দেখি নে। কারণ ভাবের ঘরে চুরি চললেও রসের ঘরে তা অচল।

কোন কিছুর সহজ মানেকে আড়াল করে অ-সহজ মানের দিকে ভাবকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভেতরেই শিল্পের আসল শিল্পয়ানা। এমনি করে একই জিনিসের দুটো মানে যখন চাড়িয়ে ওঠে তখনই সাধারণ রসিকের কাছে শিল্পের ব্যাপারটি জট পাকায়। অ-সহজ মানেটি হচ্ছে শিল্পীর সবটুকু ইসারার বাহন, শিল্পীমন নিজের গোপন অথচ গভীর কথামালার গোটা ইচ্ছেকে সঁপে দিয়েছে ওরই মাঝে। সহজকে পেরিয়ে গিয়ে অ-সহজকে হাতে পাবার জন্যে একটানা একমুখো চর্চা বেশির ভাগ সাধারণ রসিকেরই অভ্যেসের বাইরে থাকায় তাঁরা আসল শিল্পয়ানাকে ছুঁতেই পারেন না। আর পারেন না বলেই হালকা নজরে শিল্পকে এলোমেলো আবোল-তাবোলের আসর মনে করে গলা-ভরা তেষ্টা নিয়ে রাগ করে বলে ওঠেন—বোঝা গেল না। সোজা কথায়, শিল্প তখন তাঁদের কাছে স্ফিংক্সের ধাঁধা, নয়তো আলাদিনের চেরাগের ভেল্‌কিবাজি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের গোটা তালুকটাই আবেগের নামে দেবোত্তর করা নয় ; সেখানে

আবেগ যেমন মনসবদার, তেমনি বুদ্ধিরও একটা জায়গীর আছে। ঐ বুদ্ধির জোরেই তো শিল্পী সহজ মানেকে পেছনে ফেলে অ-সহজ মানেটিকে দখল করেছেন। এখন, রসিক যদি তাকেই নিজের উপভোগের মহফিলে রসদ করতে চান তবে সেখানে পৌঁছবার পাকা সড়কটি তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে মাথা খাটিয়ে। খুঁজে বের করে বুঝে নেবার ভেতরে একটা আবিষ্কারের আনন্দ আছে। একবার বুঝে নিতে পারলে রসের লোভে রসিক যদি ঘুরে-ফিরে বারেবারেও আসেন শিল্পের কাছে তবু আবিষ্কারের খাটুনি নিশ্চয়ই কমে যাবে, কিন্তু মনমৌজী আনন্দের কম্‌তি হবে না। অনেকে হয়তো বলবেন, শিল্পের পেছনে মাথাখাটিয়ে লাভ কী ; সেই মাথাটাকে বরং ফাটকা বাজারে তেজী-মন্দায় কিংবা ঘোড়াবাজীর মাঠে স্ফূর্তিখেলায় খাটালে আখেরে কিস্তি নৌকো ডাঙা দিয়ে চলবে গড়গড় করে। তাঁদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন, দয়া করে কুমড়ো ফুলে ফুলদানি সাজাবেন না!

কেউ কেউ অবশ্য শিল্পের হাটে রসিককে বড়ো করে দেখতে চান। শিল্পী যতো পেল্লায় বাহাদুরই হোন না কেন, রসিকের জ্ঞানগম্যির মাপে শিল্প গড়ে উঠুক—এটাই তাঁদের মত। রসিকের কী এমন মাথা-ব্যথা পড়েছে যে, মাথা খাটিয়ে শিল্প বুঝতে হবে! রসিক যদি জোট বেঁধে শিল্পকে বেমালুম বরবাদ করে দেন, শিল্পীর তবে তো নষ্টচন্দ্রের হাল। তাই তাঁরা বলেছেন, শিল্পকলার জটপাকানো মারপ্যাঁচের ধাঁধায় রসিককে দিশেহারা না করে রসিকের উপভোগের চালে চলাটাই শিল্পের একমাত্র উপায়। সাদা কথায়, এ হচ্ছে সেই চিরকেলে টাগ অব ওয়র—শিল্পের জন্যেই রসিক, না, রসিকের জন্যেই শিল্প! আমার বিশ্বাস, যেহেতু ভাবনা-কল্পনা-নজরের দিক থেকে শিল্পী সবার বড়ো মহলের বাসিন্দে, কাজেই শিল্প যদি রসিকের দিকে মুখ করে চলতে থাকে, তবে খুব শীগ্‌গিরই তা পোস্টার-শিল্প হয়ে উঠবে, যাকে উঁচুদরের তো দূরের কথা, নিচুদরের শিল্পও বলতে পারি নে। তার মানে, বোঝা যায় না—এই অজুহাতে শিল্পের শিল্পয়ানাকেই কোতল করবার ব্যবস্থা।

তার ওপর যে-রসিক মাথা খাটিয়ে শিল্প বোঝার ব্যাপারটিকে মাথা-ব্যথার শামিল বলে মনে করেন, শিল্প স্রেফ তাঁর জন্যে নয়, পর্নোগ্রাফিই তাঁর আমেজী ছুটির আয়েশী অবসরের ভালো মশলা। আর, রসিকের মুখ চেয়ে শিল্প গড়ে উঠলে যে কারো কাছেই তা প্যাঁচোয়া বলে মনে হবে না, একটিও হুঁ হাঁ না করে সবাই সমানভাবে তাকে উপভোগ করবেন, এমন কথা হলপ করে বলা যায় কি! কারণ রসিকপাড়ায় জাতের বালাই আছে, রুচির মাপকাঠিতে সেখানে জাতের হেরফের। তাহলে প্রশ্ন করি, কোন্ জাতের রসিকের রস-উপভোগের মাত্রাকে দাঁড়ি হিসেবে ধরা হবে। একে খুশি করবার জন্যে শিল্প গড়তে গেলে ও বলবে—বোঝা গেল না, আবার ওকে খুশি করাই শিল্পের নিশানা হলে এ তরফের সেই বুলি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্পীর খেয়ালখুশীমতো শিল্প গড়া হোক, কিংবা রসিকের জ্ঞানগম্যির মাপেই শিল্প গড়ে উঠুক কোনোটাতেই কিছু আসে যায় না, শিল্পের নামে 'বোঝা গেল না'র বদনাম সবসময়েই থাকবে। কারণ একই জিনিস সবাইকে খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি কেউ মনে করেন, রসিকের জন্যে শিল্প গড়লেই সব রসিক সেই শিল্পকে একেবারে জলের মতো বুঝে ফেলে তুড়ি ও আনন্দে ফেটে পড়বেন, তবে ঈশপের সেই বাপ-ছেলে আর গাধার গল্পটি তাঁর দ্বিতীয়বার পাঠের জন্যে সুপারিশ করলুম।

শিল্পকে জটপাকানো ধাঁধা বলে যিনি যতই গালমন্দ করুন না কেন, আমি বলব, জটার ঐ বিনুনিটুকুই শিল্পের পক্ষে সেরা শিল্প হয়ে উঠবার পহেলী দৌলত। মোটেই তা বুদ্ধি-ঘোলা-করা বেতালা ছরকুটেপনা নয়। বরং ওরই ভেতর দিয়ে অল্প জায়গায় অনেকটা গাঢ় ভাবনাকে গভীর অথচ বাহারে করে তাড়াতাড়ি রসিকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন শিল্পী। অবশ্য শিল্পীর তেমন এলেম যদি না থাকে কিংবা সস্তা খেলাতের লোভে ফাঁকি আর চালাকির মূলধন নিয়ে নিছক মারপ্যাঁচে তিনি যদি বাজিমাৎ করতে আসেন, তবে ভাষা-রঙ-সুরের আনাড়ী কারসাজিতে শিল্প সত্যিকারের দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। কারণ ভাব সেখানে পতকা, ভাবনা সেখানে কমজোর, কোমর বেঁধে শিল্প রচনা করবার জোরটাই সেখানে বড়ো বেশি করে রসিককে ঘা মারে।

শব্দগুলো রঙগুলো পাশাপাশি বসে একে অন্যকে ডগমগ করে তোলে। আর এমনি করে তারা মেলে ধরে নানান বিষয়কে। কিন্তু কোনো একটি বিষয়কে মেলে ধরতে গিয়ে অনেক সময় সেই বিষয়ের পালিশটি এমন করে তাদের ওপর মিনে হয়ে যায় যে, তখন শিল্পী তাদের বাজার-চল্‌তি ভাবটিকে চাপা দিয়ে মিনে-করা ভাবটিকে কাজে লাগান। এখন আগের সেই বিষয়টি যদি রসিকের অজানা থাকে তবেই শব্দের বা রঙের বাজার-চল্‌তি ভাবটিকে মেনে নিয়ে শিল্প বুঝতে গেলে শিল্প তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে। ধরা যাক, যদি বলি, বৈঠকখানার মজলিশ ভেঙে দিয়ে আমরা বেশ কেতামাফিক রামগরুড়ের ছানা হয়ে উঠছি, তখুনি এ কথার মানে বুঝতে গেলে সেই নামজাদা ছড়াটির প্রসঙ্গ মনে আনা চাই। নইলে, 'রামগরুড়ের ছানা' বলতে যিনি বুঝলেন বড়োজাতীয় কোনো গরুড়ের কচি খোকা, তাঁর আর শিল্প বোঝা হোলো না। তার ওপর, এক দেশের শিল্পের সঙ্গে আরেক দেশের শিল্পের ভাব আর ভাবনার দেয়ানেয়ার ফলে আঞ্চলিকতার লক্ষ্মণগণ্ডী যতই মুছে যাচ্ছে, ততই দূরদূরান্তের নানা প্রসঙ্গ শব্দের মাঝে, রঙের মাঝে, সুর আর অভিনয়ের ছলাকলার মাঝে জড়িয়ে মিশিয়ে তাদের মানগুলোকে দিচ্ছে বাঁক ফিরিয়ে। ফলে শিল্পের মুলুকে ঘরে-বাইরের এমনি ধারা বে-পরোয়া মিতালির সাথে তাল রাখতে না পেরে রসিকমহল শিল্পকে গাল পাড়ছেন দুর্বোধ্য বলে।

এ ছাড়া কালের প্রশ্নও আছে। আর-পাঁচটা জিনিসের মতো শিল্প-সাজের ধরণ-ধারণও কিছুদিন চলবার পর সেকেলে হয়ে পড়ে। শিল্পীরা তখন তাদের খারিজ করে দিয়ে আনকোরা কিছুর আমদানি করেন। ঐ আনকোরা কিছুর ওপর চল্‌তি কালের ভাবনা আর সমাজমানের আদলটি থাকে পাঞ্জা-আঁকা। এমন এক সময় ছিল যখন আকাশকে দেখে শিল্পীর মনে পোড়ে যেত প্রিয়ার চোখের চাউনিটি, সেই আকাশই আজ শিল্পীর কাছে ইস্পাতের ছাউনি ছাড়া আর কিছুই নয়; একটি শববাহক-দলের ছবি এঁকে শিল্পী আজ তার নাম রাখেন—যৌবনের আকাঙ্ক্ষা; এমন কি অভিনয়ের বেলাতেও তিনি তাঁর কাহিনীর চরিত্রকে একটা ভাঙা দেয়ালঘড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে দেন, আর সেখানে দাঁড়িয়ে সেই চরিত্রটি ছেঁড়া তারের বেহালায় ওপর প্রাণপণে ছড়া টানতে থাকে। এরা সবই আসলে যন্ত্রযুগের অসুখ আর অনাস্থার ফসল। এখন, যে-রসিক মনের দিক থেকে শিল্পের সাবেকী আদর্শে অভ্যস্ত, 'কলিতললিতবনমালে'র দেয়াশী, তিনি তো একালের অমনিধারা কালভৈরবী শিল্পকে দুর্বোধ্য বলবেনই।

তবে হ্যাঁ, বাহাদুরি দেখাবার জন্যে কিংবা বিদ্যে জাহির করবার জন্যে শিল্পী যদি খামোকা কামস্কাটকা-কিলিমাঞ্জারো—নয়তো অমনি কোনো দেশের অচেনা শিল্পের প্রসঙ্গকে আচমকা এদেশী শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে দিতে স্বরু করেন, অথবা যন্ত্রযুগের দোহাই পেড়ে ইচ্ছে করে কিম্ভুত বেতালপনা আর নগ্ন অশালীনতাকে শিল্পের নামে চালাবার চেষ্টা করেন তাহলে সে শিল্পের জনকয়েক ভাট আর ধুয়ো-ধরা শাগরেদ জুটলেও জুটতে পারে, কিন্তু খাঁটি রসিকমহল তাকে একশো হাতের তফাতে রেখে চলবে। কারণ আমরা ফাঁকা আওয়াজ আর নোংরামিতে ভুলি নে; শিল্পের ভেতরে বড়লোকি নয়, বড়-মানুষি পেলেই খুশি হই। আমরা কেউ চাই না, শিল্পের আসরটা কারিগরের পাঁয়তারার আখড়া হয়ে উঠুক।

দেবব্রত চক্রবর্তী

**উপনিষদের দর্শন** ॥ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ ॥ ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ॥ মূল্য ৭৲ পৃঃ ১৮৩।

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই দার্শনিক গ্রন্থখানা লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের একটি মূল্যবান উপহার। উপনিষদ্ সমূহ ভারতীয় বহুমুখী সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদের বাণী সমূহও কখনো পুরানো হয় না, তৎসম্বন্ধে আলোচনাও পুরানো হয় না। ভারতের তথা জগতের আদিগ্রন্থ বেদের কোলে উপনিষদের আবির্ভাব, এবং সকল বেদের চরম তাৎপর্য উপনিষদে আত্ম-প্রকাশ করেছে বলে একে বেদান্ত বলে অভিহিত করা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল দার্শনিক মনীষীগণ উপনিষদের বা বেদান্তের দিব্যবাণী সমূহকে মানুষের চরম ও অন্যসন্ধেয় পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। উপনিষদ্ সমূহের এই সব মহাবাণীর সম্যক্ অর্থ যুক্তি বিচার সহকারে সর্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য করার প্রয়োজনেই বেদান্ত দর্শনের অভ্যুদয়। বেদান্ত দর্শন সারা ভারতের মন, বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপর অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জনতাকে এক প্রাণসূত্রে গ্রথিত করেছে। আলোচ্য গ্রন্থের চিন্তাশীল লেখক এই উপনিষদের বা বেদান্তের দর্শনকেই রসাল ভাষায় নূতনভাবে সুনিপুণ যুক্তি বিচারের সহিত আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন।

গ্রন্থকার পুস্তকের 'প্রাথমিক কথা'তে লিখেছেন,—"উপনিষদ্গুলিকে অবলম্বন ক'রে সত্যই এমন কয়েকটি ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল, যা সত্য প্রেম ও মঙ্গলকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করেছে। সেই কারণেই তার মধ্যে আনন্দ এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তার একটি পাবনী শক্তি আছে। তার সংস্পর্শ মানুষের মনকে একটি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা, হিংসা প্রভৃতি কলুষ স্পর্শ হতে মুক্ত করতে পারে। উপনিষদের দর্শনের প্রচারের সেই কারণে প্রয়োজনীয়তা আছে। এই যুক্তিকেই যথেষ্ট মনে করে আমরা উপনিষদের সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তোলবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করব।

উপনিষদ্ বাণী সমূহকে ভিত্তি করেই দার্শনিক তত্ত্বালোচনা ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর যাবৎ চলেছে। উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েও ভারতে বুদ্ধি বৈচিত্র্য হেতু বহু প্রকার দার্শনিক মতবাদ ও আধ্যাত্মিক সাধনধারা প্রচলিত হয়েছে। সকলেই উপনিষদে আস্থাবান হ'লেও তাদের মধ্যে বিরোধও কম হয় নাই। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" প্রত্যেক দার্শনিক ও ধার্মিক সম্প্রদায়ই ঘোষণা করেছেন যে তাদের সিদ্ধান্ত ও সাধন পদ্ধতিই উপনিষদের অভিপ্রেত। বর্তমান চিন্তাশীল গ্রন্থকার ঐ সব বিবাদমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্য টীকা টিপ্পনী ও খণ্ডন-মণ্ডনের উপর নির্ভর না ক'রে শুধু উপনিষৎ সমূহের রচনাবলীর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান দ্বারাই

একটি সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মত প্রতিপাদনের প্রয়াসী হয়েছেন।

ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সব গ্রন্থ উপনিষদ নামে পরিচিত, সে সকলকে তিনি ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন,—(১) প্রথম, ব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী, (২) দ্বিতীয়, যোগ ও সন্ন্যাসবাদী, (৩) তৃতীয়, পৌরাণিক দেবতাপন্থী বা ভক্তিবাদী। তাঁর মতে এদের মধ্যে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সহিত প্রথম শ্রেণীর যোগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ ষড়দর্শনের যুগের জ্ঞানমার্গের সহিত, এবং তৃতীয় শ্রেণী পুরাণের যুগের ভক্তি মার্গের সহিত যুক্ত। প্রথম শ্রেণীতে তিনি বেছে নিয়েছেন ১২খানা উপনিষৎ,—ঈশ, ঐতরেয়, কৌষিতকী, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ও মাণ্ডুক্য। এই কয়েকটিকেই তিনি মুখ্য উপনিষদ্ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও, এই কয়েকখানি যে মুখ্য উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্যগণ প্রায় সকলেই একমত।

এই কয়েকখানা উপনিষদ্ দার্শনিক দৃষ্টিতে সমলোচনা করে গ্রন্থকার উপনিষদের ঋষিদের তিনটি মূল ভাবধারার পরিচয় পেয়েছেন,—পরাবিদ্যায় প্রীতি, সর্বব্রহ্মবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ, এবং বিশ্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে সব বিদ্যা কোন প্রয়োজন সিদ্ধি করে,—তা ঐহিক হোক বা পারলৌকিক হোক,—যাতে অনিত্য সসীম ও আপেক্ষিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং যদ্দ্বারা অনিত্য সুখ সম্পদ প্রভুত্ব প্রভৃতি লাভ ও ভোগবাসনার চরিতার্থতার সম্ভাবনা থাকে,—সেই সব বিদ্যাকে উপনিষদের ঋষিগণ অপরা বিদ্যা ( অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যা ) বা অবিদ্যা মনে করিতেন। আর, ব্যবহারিক জীবনে যে বিদ্যার হয়ত বিশেষ সার্থকতা নাই, যার সার্থকতা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ও মানব-জীবন সম্পর্কে যে সব মৌলিক ও চরম প্রশ্ন মানব বুদ্ধিতে উদিত হয় তাহাদের সম্যক্ সমাধান, এবং বিশ্বের মূলীভূত পরম তত্ত্বের সহিত মানব জীবনের নিবিড় যোগসাধন, তাই পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই পরাবিদ্যার প্রতি উপনিষদের যুগের সদ্‌বিচারশীল নরনারীগণের এমন প্রবল অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল, যে, জগতের সব ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা পরাবিদ্যাকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা যাঁদের অধিগত হত, তাঁদের আসন ছিল সকলের উপরে ; রাজা মহারাজাদের ও প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অনেক নীচে। তা ছাড়া, এই পরাবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা তাঁদের ঐহিক বা পারত্রিক বিশেষ কিছু লাভ হবে, এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সব ছেড়ে এ বিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতেন না। বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা, জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞান,—পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই তাঁদের জ্ঞান-তাপস করত, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যেই তাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সন্ধান করে গুরুচরণাশ্রিত হয়ে অন্য সব সম্প্রদায়ের বিনিময়েও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রতী হতেন। গ্রন্থকারের মতে সংসার ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভের ধারণা এবং মুক্তিকে লক্ষ্য করে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করার আবশ্যকতাবোধও প্রাচীন উপনিষদের ঋষিদের ছিল না। মুক্তিলাভ ও সন্ন্যাসবাদ তাঁদের মতে ভারতীয় দর্শনে পরে এসেছে। তাঁদের ছিল ঐকান্তিক অনুরাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসা। তাঁরা মনে করতেন পরম জ্ঞান লাভ হলেই জীবনে পরম আনন্দ লাভ হয় এবং এতেই আছে মানব-জীবনের কৃতার্থতা।

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি থেকে পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বচন সমূহ ও তদনুকূল যুক্তিসমূহ সংগ্রহ করে ও বিচার করে গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উপনিষদের দ্বিতীয় মূল ভাবধারা হল সর্বব্রহ্মবাদ এক ব্রহ্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য প্রকার অসংখ্য চেতনাচেতন পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং সকলের অন্তরাত্মারূপে বিদ্যমান থেকে সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন ও অনন্তকাল অনন্তরূপে আপনাকে আপনি আস্বাদন কচ্ছেন। গ্রন্থকারের ভাষায় উপনিষদের ঋষিদের সিদ্ধান্ত হল এই যে, "আমরা যে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের বিচিত্র জগৎ দেখি, তা একই সত্তার প্রকাশ। সেই সত্তা এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে অপ্রকাশ থেকে ক্রিয়াশীল, তাকে বিশেষরূপে কোথাও পাওয়া যায় না। সকল বস্তু, সকল জীব, সকল জগৎ, সব কিছু জড়িয়ে তার প্রকাশ। তাই তার নাম ব্রহ্ম দেওয়া হয়েছে, বা ভূমা দেওয়া হয়েছে, কারণ তার বিস্তার ত সবকিছু ব্যেপে। মূলতঃ যদিও তিনি এক, তিনি বহুরূপে প্রকাশ নেন, কারণ, তা না হলে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না। এই বিশ্ব জুড়ে তাই তিনি বহু ও বিচিত্রের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, এখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, এখানে ভাঙ্গা আছে, গড়া আছে। এদের সকলকে জড়িয়ে নিয়েই তাঁর প্রকাশ। তা না হলে তাঁর আনন্দ রূপটি ধরা পড়ে না যে। ব্রহ্মের তাই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত ও বিচিত্রিত বিশ্বরূপে যে প্রকাশ, তাকে উপনিষদে "আনন্দরূপমমৃতম্" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে এই অশেষ বৈচিত্র্যময় চিরপরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চই ব্রহ্মের 'মূর্ত'রূপে এবং এর অন্তরালে তিনি যে নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত মনোবুদ্ধির অগোচর সর্বান্তর্যামী রূপে বিরাজিত থেকে অলক্ষ্যে সকলকে একীভূত করে রেখেছেন, তাই তাঁর 'অমূর্ত'রূপ। উপনিষদের ঋষিগণ সব মূর্তের ভিতর সেই অমূর্তকে উপলব্ধি করেই বলেছেন, "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।"

উপনিষদে তৃতীয় যে মূল ভাবধারাটি গ্রন্থকার আবিষ্কার করেছেন, তা হচ্ছে পরাবিদ্যার ভিত্তিতে বিশ্বজনীন কল্যাণে সব মনুষ্যের আত্মনিয়োগের প্রেরণা। বাস্তব জীবনের কর্তব্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে উপনিষদ্ ভোগ ও ত্যাগের গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয় সাধনের অপূর্ব পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। পরাবিদ্যা অধিগত হলে জীবনে এদের কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। উপনিষদের জীবনাদর্শ—বিশ্বসংসারে যা কিছু আছে, সব ঐশ্বরিক বলে জানবে; সবের মধ্যে প্রেমময় কল্যাণময় এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখবে; কারো প্রতি অন্তরে বা ব্যবহারে ভেদবুদ্ধির ও বৈরী-ভাবের প্রশ্রয় দিবে না; সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে এবং নিজের সহিত সকলের ভোগকে সমান মর্যাদা দিবে; নিজের স্বার্থকে বা ভোগসুখকে অপরের স্বার্থ বা ভোগসুখ অপেক্ষা বড় করে দেখবে না; চরম কল্যাণ বা পরমার্থ যে সকলেরই এক ও অভিন্ন, এ মহাসত্য কখনো বিস্মৃত হবে না; তোমার ও সকলের অন্তরাত্মা-স্বরূপ একই ঈশ্বরের সেবাবুদ্ধিতে তোমার নিজের ও বিশ্ব সংসারের সকলের প্রতি প্রেমের সহিত যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করবে; কারো ধনে লোভ করবে না; কারো সুখসম্পদে ঈর্ষা করবে না; কারো ধন বা সুখ সম্পদ্ কেড়ে নিয়ে তুমি নিজে ধনী ও সুখী হতে পারবে না, একথা সর্বদা স্মরণ রাখবে; সকলের কল্যাণ-সাধনে তোমার ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ও ভোগোপকরণ প্রয়োগ করে ও তার জন্যে প্রয়োজনানুরূপ বাহ্যিক ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ

বরণ করেই নিজের জীবনকে সম্যক সাফল্যমণ্ডিত ও সম্ভোগময় করতে সক্ষম হবে; সব পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক কর্ত্তব্য সম্পাদনকেই বিশ্বের সর্বত্র আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট পন্থারূপে ব্যবহার করবে। ইহাই উপনিষদের জীবন-দর্শন। এই আদর্শে ত্যাগের দ্বারাই যথার্থ ভোগ সম্ভব হয়, সন্ন্যাসের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই গার্হস্থ্য জীবনের সব কর্ম ও ভোগ সম্পাদন করতে হয়, বিশ্ব-মানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগের মধ্যেই নিজের কল্যাণের সন্ধান পেতে যায়।

গ্রন্থকার উপনিষদদুক্ত যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনের সুকঠিন সমস্যাগুলির স্পষ্ট সমাধানের সম্ভাবনাও অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উপনিষদের দার্শনিক মতবাদ ও নৈতিক আদর্শের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মতবাদ ও আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা তিনি সব ক্ষেত্রে নিপুণভাবে করেছেন। তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোন মতবাদ ও ভাবধারার উপরই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, বা কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করে নাই, প্রত্যেকটিকেই যথোচিত মূল্য দিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার সহিত তিনি উপনিষদের ভাবধারার সব চেয়ে বেশী মিল পেয়েছেন এবং তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

উপসংহারে গ্রন্থকার যে মন্তব্য করেছেন. তা ও সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। "উপনিষদে নীতির যে আদর্শ স্থাপন হয়েছে, তার বর্ত্তমান কালে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। এই আদর্শ সমগ্র বিশ্বের একত্বের ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির জন্য মনে ঐকান্তিক ভালবাসা নিয়ে বিশ্ব জননীর কার্যে প্রবৃত্তি দেয়। তার মূল শিক্ষা হল, আত্মদমন কর, দয়া কর, বিদ্বেষ ভাব পরিহার কর, মনে বিশ্ব-বাসীর জন্য প্রীতি পোষণ কর। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে সমগ্র মানব জাতি তার ইতিহাসের এক মহাসংকটময় মুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে মানুষের প্রযুক্তি বিদ্যা এত অগ্রসর হয়েছে যে মানব সমাজে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভোগ্য পণ্যের যে বিপুল সম্ভার উৎপাদিত হয়েছে, তার বণ্টন নিয়ে দারুণ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছে। অপর পক্ষে এই প্রযুক্তি বিদ্যারই প্রয়োগে মানুষের অধিগত হয়েছে এমন শক্তি, যা মহা প্রলয় ঘটাতে পারে। বিদ্বেষের মাত্রা যদি আরো বর্দ্ধিত হয়, যাঁদের হাতে এই ধ্বংসাত্মক শক্তি রক্ষিত, তাঁরা যদি আত্মসংযমের ক্ষমতা হারান, তা হলে এমন বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যা সমগ্র মানব জাতির বিলোপ সাধন করার ক্ষমতা রাখে।

"এই সমস্যার সমাধান কোন্ পথে? মনে হয় উপনিষদের নৈতিক আদর্শের প্রচার এখানে হয় ত এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। অনুভূতি শক্তির যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেই হৃদয়বৃত্তির প্রসারই বোধ হয় একমাত্র নিষ্কৃতির পথ। সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে পরস্পরের একান্ত আপন জেনে এবং কোন বিশেষ জাতির কোন মানুষকে শত্রু বিবেচনা না ক'রে যদি বিশ্বজনীন প্রীতি ও মৈত্রীর পথ মুক্ত করা যায়, তবেই বোধ হয় সেই বিদ্বেষ বিষকে নির্ব্বাসনে পাঠান যায়, যা মানুষের মনকে অধিকার ক'রে ব'সে ধ্বংসাত্মক কাজে প্রেরণা দিচ্ছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মের বাহির হ'তে ভার সাম্য রক্ষা করবার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ শক্তি ছিল, তা আজ কাজ করে না। পরলোকে পাপের শাস্তির ভয় মানুষের সংস্কারমুক্ত মনকে ভয় দেখানর ক্ষমতা হারিয়েছে। এক্ষেত্রে সংসারের ব্যবস্থা আনতে হবে

মানুষের অন্তর থেকে। সর্ব্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজনীন প্রীতিই বোধ হয় সেই প্রেরণা দিতে পারে। তাই ত হল প্রাচীন উপনিষদের মর্ম্মবাণী পরম সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের কৌতূহল হল উপনিষদের যুগের মানুষের চিত্ত বিনোদন। তাঁকে সর্ব্বব্যাপী সত্তারূপে উপলব্ধি ক'রে, খণ্ডদৃষ্টি ভঙ্গীর যে দুঃখ তা হ'তে মুক্ত ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হব, এই হ'ল উপনিষদের পুরুষার্থ। এবং সর্ব্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতে বিশ্বমানবের জন্য হৃদয়ে প্রীতি বহন ক'রে, সকল মানুষের সাথে ভাল ক'রে জীবন ভোগ করব, এই হল উপনিষদের নৈতিক আদর্শ।

"উপনিষদের ঋষি যে পথে শ্রেয় ও কল্যাণের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই পথই বোধ হয় বর্ত্তমান বিশ্বের পরিত্রাণের পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়না য়।"

উপনিষদের দর্শন আধুনিক পাঠক সমাজে সমাদৃত হোক, ইহাই আকাঙ্ক্ষনীয়।

**অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

**মুক্তধারা॥** (সংস্কৃত অনুবাদ) অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক অনূদিত এবং শ্রীমতী উষা দেবী চক্রবর্ত্তী কর্তৃক ১৩২।৫, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড থেকে প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা॥ প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধানসরণি। কলিকাতা-৬

ভারতীয় জনগণকে একটি অখণ্ড ঐক্যবোধে আবদ্ধ করবার জন্য রাজনৈতিক দিক দিয়ে নানা চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু সে-সব চেষ্টা সফল হয়নি, তার কারণ আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। সমাধানের পথ খোলা রয়েছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে নয়। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার একটি প্রধান উপায় হল ভাষাগত ঐক্যবিধান করা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কাজকর্ম ও মানসিক ভাবের আদান প্রদান হ'তে পারে ইংরেজী অথবা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজী বিজাতীয় ভাষা ব'লে যদি গৃহীত না হয় তা' হ'লে বাকী থাকে সংস্কৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সরকার সর্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা স্বীকার করছেন না। ভারতের প্রশাসন প্রণালী ও সাংস্কৃতিক ধারার বিশুদ্ধ ভারতীয় রূপ প্রকাশ হ'তে পারে শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে, অন্য ভাষার মাধ্যমে নয়। হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ভারতের আঞ্চলিক রূপমাত্র প্রকাশিত হতে পারে, সামগ্রিক রূপের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা এই ভাষার নেই। হিন্দীভাষার সরকারী পরিপোষণের ফলে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের লোকেদের মধ্যে বিরোধ বাড়বে মাত্র। এই দুই অংশের লোকেরা প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুধু কেবল সংস্কৃত ভাষার প্রচলনই নির্বিবাদে মেনে নিতে প্রস্তুত, এই সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই।

সংস্কৃত ভাষার বিরোধী যাঁরা তাঁরা ব'লে থাকেন, সংস্কৃত 'মৃত' ভাষা আধুনিক, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এ-ভাষা অচল। কিন্তু এঁদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা' দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব অনেকেই

গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত যে শুধু দেব-ভাষা নয়, মানবভাষাও বটে তার নিদর্শন সংস্কৃতপ্রেমী বহু পণ্ডিত বর্তমানে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে, সংস্কৃত ভাষায় নাটকাদি রচিত হচ্ছে, এবং সর্বভারতীয় দর্শকদের সম্মুখে সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ-বিষয়ে স্বর্গত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যবাণীর প্রসংশনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত কর্মধারার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংস্কৃত শিক্ষা বিতরণ ও ভাবপ্রচারণে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রভাবও অপরিসীম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ সাংকেতিক নাটক 'মুক্তধারা' সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের ভাব ও রস যে সংস্কৃত ভাষায় কত সার্থক ভাবে প্রকাশ করা যায় অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্তীর অনুবাদ তার সার্থক নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বাংলার বাইরে প্রসারিত হয়েছে। মূল বাংলা-ভাষায় রচিত কয়েকটি নাটক প্রয়োগনৈপুণ্য ও অভিনয়-উৎকর্ষের জন্য বাংলার বাইরে অবাঙালী দর্শকের মনোরঞ্জন করলেও ভাষার ভিন্নতার জন্য সেগুলি সাধারণ দর্শকের কাছে সুবোধ্য হয় নি। সেজন্য অন্যান্য ভাষায় তাঁর নাটকের অনুবাদ হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের নাটক অনুবাদ হ'লে সেই নাটক সর্বভারতীয় দর্শকদের চিত্ত অধিকার করতে পারে। বিশেষ করে ভারতের বাইরে সংস্কৃত অনুবাদের উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা বেশি, কারণ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভারতীয় ভাব ও সংস্কৃতির বাহনরূপে সংস্কৃত ভাষা অধীত ও আলোচিত হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায় মূল বাংলাভাষার রূপও অনেকখানি বজায় রাখা সম্ভব, কারণ বাংলা ভাষায় বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শতকরা পঞ্চাশটি শব্দের বেশিই সংস্কৃত। তদ্ভব শব্দগুলিও তৎসম শব্দের সঙ্গে রূপ ও ধ্বনিনৈকট্যের জন্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির কাছে অনায়াসবোধ্য। আলোচ্য নাটক 'মুক্তধারা'র কথাই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাক। মুক্তধারার কয়েকটি গান, যথা ভৈরবপন্থীদের গান ও যন্ত্রের প্রশস্তিসূচক গান সংস্কৃত শব্দবহুল। এই সব গানের দুই একটি সর্বনাম কিংবা ক্রিয়াপদ ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের কোনো পার্থক্য নেই, যথা—

> নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
> তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
> তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত
> তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংস-বিকট দন্ত।

সংস্কৃত অনুবাদ—

> যন্ত্রায় নমো নমঃ, যন্ত্রায় নমো নমঃ নমামো যন্ত্র।
> চক্রমুখর-মন্দ্রিতস্ত্বং হে বজ্রবহ্নিবন্দিত।
> ত্বং বস্তু-বিশ্ববক্ষোদংশ, তে ধ্বংস-বিকট-দন্তঃ।

নাটকের ভাষা যেখানে সংস্কৃতশব্দপ্রধান নয় সেখানেও রূপ ও ধ্বনির দিক দিয়ে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের নৈকট্য লক্ষণীয়, যথা—

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

সংস্কৃত অনুবাদ—

জাগর্তি প্রহরী, জাগ্রতঃ প্রহরঃ
স্পন্দতে কম্পতে নক্ষত্র-নিকরঃ

সুতরাং সংস্কৃত অনুবাদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাটকের ভাব ও ভাষারূপ সার্থকভাবে বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে বাহিত হতে পারে। আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনায় যা বলা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য—'অতো নিখিলে ভারতে তথাখিলে জগতীতলে রবীন্দ্রভাবধারাপ্রচারণেঽপি সংস্কৃতমেব যোগ্যতমা ভাষা'।

'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক। যুগোপযোগী সমস্যার সার্থক রূপায়ণের জন্যই শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, নাটকীয় দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা ও গতিবেগের দিক দিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। মুক্তধারা অঙ্কদৃশ্যহীন নাটক। সংস্কৃত দশরূপকের অঙ্ক নামক রূপকের সঙ্গে এই নাটকের সাদৃশ্য উল্লেখ করা যায়। অঙ্কদৃশ্য না থাকার ফলে এই বিচিত্র ঘটনাবহুল নাটকের ঘটনার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিশীল রূপ দেখা যায়। সংস্কৃত অনুবাদের মধ্যেও নাটকের এই গতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, অনুবাদকের নাট্যরসবোধ ও ভাষাজ্ঞানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ধ্যানেশনারায়ণ শুধুমাত্র অনুবাদক নন, তিনি স্বয়ং নিপুণ ভাষাশিল্পী ও রসস্রষ্টা। গদ্যভাষার অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ সেখানে বাংলা পদের স্থলে সংস্কৃত পদ বসিয়ে গেলেই চলে, কিন্তু কবিতা ও গানের অনুবাদ কঠিন, কারণ সেখানে ছন্দবোধ, কাব্যিক শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন। মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে গানগুলি রয়েছে সেগুলি বাংলা ভাষারূপের সঙ্গে এমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে সেগুলির ভাষান্তর সাধন করা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু অনুবাদকের রসবাহী শব্দপ্রয়োগগুণে সংস্কৃত ভাষায় গানগুলি নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন খ্যাপা সে ?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন বাতাসে ?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা ?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কাননগিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে।

সংস্কৃত অনুবাদ—

আকুলীকৃত্য দিশি দিশি মাং বিহরতি যো
ন জানে তমুন্মাদম্।

অভিব্যাপ্য গগনমহো বাদয়তি সমীরে
কিমসৌ মোহনবেণুং মধুরম্।
অস্তং যাতি যাতি বেলা
ভবতি কীদৃশী খলু প্রমত্তসা খেলা
আকুলী করোতি চাহ্‌য় মামসৌ ন চায়াতি বশম্
অনুসন্দধামি তং গিরিকাননে, বিলপামি হতাশম্॥

মূল ভাষায় শব্দগুলির সুপ্রয়োগের ফলে অনুবাদ শ্রুতিমধুর ও রসাশ্রিত হয়েছে। আলোচ্য অনুবাদ মূলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত, শুধু কেবল সংস্কৃত নাটকের রীতি বজায় রাখবার জন্য একটী প্রস্তাবনা অংশে নান্দীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি রচিত হয়েছে এবং সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্রনাটক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবনা অংশে অনুবাদকের মৌলিক রচনাশক্তিও প্রশংসনীয়।

অজিতকুমার ঘোষ

# নিয়মাবলী

## প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 October '64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALI

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র    সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গর্ব করবার মতন
চুল এঁর, এঁকেই
জিজ্ঞেস করুন
উনিই বলে দেবেন যে টাটার হেয়ার অয়েল
মেখেই ওঁর অমন সুন্দর চুল হয়েছে!
টাটার হেয়ার অয়েল • মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে • চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম। • টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল — ৪টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল — গোলাপের সুরভিযুক্ত।
• ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
HAIR OIL
THOY-48-BEN

ঝক্‌ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা
দশন
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

## নিয়মাবলী

### প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

দ্বাদশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' একাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কার্তিক
তের'শ একাত্তর

দ্বাদশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

# বাংলা কাব্যের ছন্দ-মুক্তি ঃ মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল

**নীলরতন সেন**

ঊনবিংশ শতকের সূচনায় ছাপাখানার প্রভাবে বাংলা কাব্যে ছন্দোমুক্তির প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ ঘটল বলা যেতে পারে। সুরাশ্রয়ী শ্রাব্য-গীতি এতদিনে সুর-নিরপেক্ষ পাঠ্য-কবিতায় রূপান্তরিত হল। প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রধানতম তিনটি ছন্দরীতি লক্ষ্য করা যায়। সরল কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত রীতি চর্যাপদ এবং বৈষ্ণবপদাবলী গানে প্রাধান্য পেয়েছিল। সুরের আংশিক প্রভাবে সংস্কৃত গুরুস্বরধ্বনির উচ্চারণ তখনো কিছুটা রয়ে গিয়েছিল। পিঙ্গলাচার্য যে প্রাকৃত ছন্দবিশেষের সূত্র দিতে গিয়ে বলেছেন—

> লহ গুরু এক্ক ণিঅম নহি জেহা
> পঅপঅ লেক্‌খহি উত্তম রেহা। [ ২৯ শ্লোক, প্রা, পৈ ]

প্রাচীন বাংলা সরল কলামাত্রিক ছন্দেও এই রীতি চলছিল। মুক্তদল ( open syllable ) কোথায় সংস্কৃত উচ্চারণ রীতিতে দুই কলার গুরুত্ব পাবে, আর কোথায় স্বরনিরপেক্ষ আধুনিক বাংলা উচ্চারণের আদর্শে লঘু এক কলার মর্যাদা পাবে তার সুনির্দিষ্ট কোনও নিয়ম ছিল না। পাঠক শ্রোতাদের কাছে পড়ে শোনাবার সময় ছন্দ সৌন্দর্য ঠিক রেখে প্রয়োজনমতো সংস্কৃত গুরুমুক্তদলের গুরু বা লঘু উচ্চারণ করতেন। বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতিতেও উচ্চারণ শৈথিল্য ছিল। কবি-পাঠক ছন্দরক্ষা করে সুরসংযোগে শ্রোতার কাছে পড়ে শোনাতেন। তবে সরল কলামাত্রিকের তুলনায় এখানে শিথিলতা কম ছিল এবং আট দশ ও ছয় মাত্রায় যতিভাগ অনেকটা সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রাচীন পাঁচালী কাব্য অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীকাব্য এবং রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি অনুবাদ কাব্যে এই ছন্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। দলমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত রীতির

ব্যবহার প্রধানতঃ ছড়াগানে, শাক্তপদাবলীতে এবং কবিওয়ালাদের লৌকিক গানে বেশী পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী গানে সরল কলামাত্রিক, বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে; —কোনও কোনও কবি পরবর্তীকালে দলমাত্রিক রীতিও ব্যবহার করেছেন। চতুর্দল লঘুযতিভাগ এবং পূর্বসূচনায় শ্বাসাঘাত ( stress ) ছড়ায় ব্যবহৃত দলমাত্রিক ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেযুগে দলমাত্রিক ছন্দে পর্ব-দলসংখ্যারও যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করা যেত। কবি-পাঠক পড়বার সময় সুরাশ্রয়ী উচ্চারণে সেই দলসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিকে সামঞ্জস্য করে নিতেন। কিন্তু ছাপাখানা প্রবর্তনের সময় থেকে ধীরে ধীরে সুরাশ্রয়ী কথকতার দিন ফুরিয়ে এলো। কবি ছন্দবদ্ধ কাব্য লিখবেন, সেকাব্য ছাপা হয়ে সহজেই পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। পাঠক নিজেই অবসর সময়ে ঘরে বসে সেই ছাপা কাব্যগ্রন্থ থেকে সাহিত্যরসগ্রহণে সচেষ্ট হবেন। যদি কবির কাব্যে ছন্দ উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট standard বা আদর্শ না থাকে পাঠক পড়তে বসে পদে পদে অসুবিধা বোধ করবেন। কাব্যের রস গ্রহণে বাধা জন্মাবে। কিন্তু কবির পক্ষে প্রত্যেক পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ছন্দ-শৈথিল্য ঢেকে দেওয়া তো আর সম্ভব নয়। যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে কবিকেও শ্রোতার পরিবর্তে এবারে পাঠকের কথা ভাবতে হল। ছন্দ-রীতিগুলির উচ্চারণ শৈথিল্য যথাসম্ভব পরিহার করে কাব্য লেখার নতুন অভ্যাস তাদের করতে হল। ছন্দে standard form বা সুনির্দিষ্ট রীতি উদ্ভাবনে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কবিরা স্বাভাবিক উচ্চারণের ভাবাধ্বনির আদর্শরূপে বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতির উচ্চারণ রীতির প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হলেন। জনসাধারণের কথ্যভাষাশ্রয়ী ছড়ার ছন্দ বা দলমাত্রিক রীতির প্রয়োগ সম্ভাবনার প্রতি প্রথম দিকে কবিদের দৃষ্টি পড়েনি। তাই ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ( মজুমদার ), অক্ষয় চৌধুরী পর্যন্ত সমগ্র উনবিংশ শতকের অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিকেই পাঠ্য কবিতার ( ছাপাখানা আশ্রয়ী ) মুখ্য ছন্দ-বাহন করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র, গোবিন্দ দাস ( স্বভাব কবি ) প্রভৃতি লেখকগণ মাঝে মাঝে লঘু মেজাজের কবিতায় কথ্যভাষাভঙ্গীতে ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিদগ্ধ সাহিত্য সমাজে এ ছন্দের কৌলীন্য স্বীকৃত হয়নি।

বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দে সেযুগের সাহিত্যিক গদ্যভাষার উচ্চারণ অনেকটা রক্ষিত হবার ফলে, ইংরেজি কাব্যের সংস্পর্শে আসার সময় থেকে সে ছন্দের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের কাব্যে এই ছন্দের মাধ্যমে আনবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। ছাপাখানার প্রবর্তন, গদ্যভাষা রীতির প্রবর্তন এবং ইংরেজি দীর্ঘযতিভাগের স্বাভাবিক উচ্চারণের ছন্দ-সংস্পর্শ প্রভাব—এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের যৌথ-সংযোগে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিদের কাব্যে ছন্দের কৃত্রিম উচ্চারণ, এবং যতিভাগের শৃঙ্খলিত বন্ধন মুক্তির সচেতন প্রচেষ্টা দেখা দিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সে প্রচেষ্টা স্বভাবতই বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিকে আশ্রয় করেই সুরু হয়েছিল। রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে যেমন ভারত ইতিহাসের মানুষকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন, তেমনি জাতীয় গৌরব আখ্যায়িকার উপযোগী কাব্যের ভাবাবেগ সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছেন। বোধ হয় ভাবের প্রবাহকে পয়ার বন্ধের চৌদ্দমাত্রার লঘু দ্বিপদী ( আট-ছয় ) পদক্ষেপে চালনা করবার অসুবিধার কথা ভেবেই ভাবপ্রবাহকে

পংক্তি-ডিঙিয়ে স্বচ্ছন্দ ধারায় চালনার সঠিক পথ উদ্ভাবন করতে পারেননি। সেকাজ অভাবিতভাবেই তাঁরই বাল্য সুহৃদ মধুসূদনের হাতে সম্ভবপর হল। বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির পয়ারবন্ধেই তিনি ছন্দ-মুক্তির পথ উদ্ভাবনে সফল হলেন।

কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মিত্রাক্ষর পয়ারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে লিখেছিলেন—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়;
আটে-ছয়ে ছাপ ফেলে ঘুরে এসো মোড়। [ ছন্দ সরস্বতী ]

এই সুনির্দিষ্ট আট ও ছয় মাত্রায় ছাপ ফেলবার চিরাচরিত নিয়মটির কিছু পরিবর্তন করে মধুসূদন প্রবহমান পয়ার রচনা করলেন। মিত্রাক্ষর সম্পর্কে মধুসূদনের মনোভাব একটি চতুর্দশপদী কবিতায় সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে।—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
... ... ...
প্রকৃত কবিতারূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন নারী সমপদ কেন লৌহ-ফাঁসে? [ ৯৭ সংখ্যক কবিতা : চ, ক, ]

কবিতার ভাবধারা ভাষার মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবার সুযোগ না পেলে কবির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদন সেই চেষ্টাই করেছেন। তিনি এবিষয়ে মিলটনের Blank verse এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন। মিলটন আয়াম্বিক পঞ্চপর্বিক পংক্তিবন্ধে ভাবের প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ ধারায় পংক্তি অতিক্রম করে চলবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; পংক্তি শেষের মিল তুলে দিয়েছিলেন। বাংলা ছন্দে ইংরেজি রীতির প্রাস্বরিক-অপ্রাস্বরিক (accented unaccented) উচ্চারণ সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার স্বকীয় উচ্চারণভঙ্গি আছে। সেখানে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে সামান্য ঝোঁক পড়ে; তাছাড়া রুদ্ধ দলেও কিছুটা প্রস্বর অনুভূত হয়। সেকালের পাঠকসমাজ এই নতুন ছন্দ পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে মধুসূদনকে প্রশ্ন করেছিলেন; কবি তার জবাবে লিখেছিলেন—

If your friends know English,let them read the 'Paradise Lost, and ;
They will find how verse, in which the Bengali poetaster writes, in constructed.

[ গৌরদাস বসাককে লেখা পত্রাংশ : দ্রঃ মধুসূদন-স্মৃতি ৬০১, ২পৃ ]

কোথায় কোথায় যতি দিতে হবে তার ধরাবাঁধা পদ্ধতি ছিল কি এ ছন্দে?—এ প্রশ্নের জবাবে কবি উত্তর দিয়েছিলেন—

So many fellows, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined tothe 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th.

[ ঐ : পৃঃ ৬১০-১১ ]

এই উক্তি থেকে বেশ সহজেই ধরা যায়, কবি কোথায় যতি দিতে হবে সে সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোনও রীতি মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন না ; তিনি ভাবপ্রবাহকে পূর্ণতা দেবার কথাই সর্বাগ্রে মনে রেখেছেন। তাহলে তিনি কি বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য মেনে চলেননি? বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির ছন্দযতি যুগ্মসংখ্যক ( আট। দশ। ছয় মাত্রা বা এদের যুগ্ম ভগ্নাংশ ) মাত্রাশ্রয়ী। বিজোড় মাত্রায় ছন্দযতি দিলে এ ছন্দের ধ্বনিসৌন্দর্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। মধুসূদন তো স্বচ্ছন্দে তিন, সাত, এগার মাত্রায় যতি দিয়েছেন। তাহলে, ছন্দ-মুক্তির অত্যধিক আগ্রহের ফলে তিনি কি এ ছন্দরীতির মূল উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করেছেন? এই সংশয়ের মীমাংসাকল্পে প্রথমেই কবির অনুরূপ বিজোড়মাত্রিক যতিভাগের 'অমিত্রাক্ষর' রীতির একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।

সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে
কহিলা,—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এসব বারতা
বাসন্তি! মায়েরে মোর—"হায়রে বহিল
সহসা নয়নজল!

ভাবযতি অনুসারে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নভাবে সাজানো যেতে পারে—

সম্ভাষি মধুর ভাষে **দৈত্যবালা দলে কহিলা—**
**"লো সহচরি,**
এতদিনে আজি ফুরাইল জীবলীলা
**জীবলীলাস্থলে আমার**
**ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!**
কহিও পিতার পদে **এসব বারতা বাসন্তি!**
**মায়েরে মোর—"**
**হায়রে,**
**বহিল সহসা নয়নজল!**

এখানে বড় হরফের অংশগুলি সবই বিজোড়মাত্রিক। এই বিজোড়মাত্রিক ভাবযতি বিভাগের পাশে পাশে প্রত্যেক পূর্ণ ছত্রের চতুর্দশ মাত্রামাপ এবং আট-ছয় মাত্রার ছন্দযতি ভাগও রক্ষিত হয়েছে। ছন্দের পদযতিভাগ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যেখানে কবি বিজোড়মাত্রায় ভাবযতি দিয়েছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবর্তী শব্দটি বিজোড়মাত্রিক রেখেছেন।

সুতরাং কাব্যে ছন্দমুক্তির অতি আগ্রহে মধুসূদন বিশিষ্ট কলমাত্রিক উচ্চারণের মূলনীতি লঙ্ঘন করেছিলেন মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। সেই যুগে অধিকাংশ সমালোচক, এমন কি মধুসূদনের গুণগ্রাহী অনুসারক স্বয়ং হেমচন্দ্রও কবির অমিত্রাক্ষর রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তবে 'বিবিধার্থ পত্রিকা'র বিদগ্ধ সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র কবির অভিপ্রায় ধরতে পেরেছিলেন। অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক—সংখ্যার 'বিবিধার্থ পত্রিকা'য় তিনি এই ছন্দের পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন—

যাহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাহারা যে প্রকারে মিলটন কবিকৃত 'পারাডাইস লষ্ট নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহা পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে তাহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ যে প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্যপাঠ করা যায়

সেই প্রকারে অমিত্রাক্ষর পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার বিরামচিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। [ মধুস্মৃতি ২য় সং ঃ পৃঃ ১২২ দ্রঃ ]

সমালোচক অতি অল্পকথায় এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। মধুসূদন প্রয়োজনানুসারে ছন্দযতি এবং ভাবযতির পৃথক অস্তিত্ব রেখে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা এনেছেন, —সেই সঙ্গে উভয় যতির নিপুণ বুনুনির সাহায্যে ছন্দে স্পন্দমানতা সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের এই পৃথক দুই যতির অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরে রক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরে ছন্দযতি এবং ভাবযতি জোড়মাত্রিক পদক্ষেপে একই যতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি—

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব, হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষ শত।
যাপন করছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল।
[ স্বর্গ হতে বিদায় ঃ চিত্রা ]

এই অংশটিকে ভাবযতি অনুসারে সাজিয়ে দেখা যেতে পারে—

ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে মন্দার মালিকা
হে মহেন্দ্র,
নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা মলিন ললাটে
পূণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব, হে দেবীগণ।
বর্ষ লক্ষশত যাপন করেছি হর্ষে
দেবতার মতো দেবলোকে।
আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে দেবে যাব
এই আশা ছিল।

কবি এখানে জোড়সংখ্যক মাত্রাতেই একসঙ্গে ভাবের এবং ছন্দের যতি দিয়েছেন। মিত্রাক্ষর পয়ার থেকে এখানে পার্থক্য এই যে সেখানে চৌদ্দমাত্রার পংক্তিতে সুনির্দিষ্ট আটমাত্রার পর অর্ধযতি এবং চৌদ্দমাত্রার পর পূর্ণযতি থাকে—এখানে তেমন ধরাবাঁধা নির্দিষ্টতা নেই। ভাবের প্রবাহ চৌদ্দ-মাত্রার ছত্রডিঙিয়ে পরবর্তী ছত্রে প্রবাহিত হতে বাধা নেই। মধুসূদন বাঙালী পাঠকের শ্রুতিবোধ নতুন অমিত্রাক্ষর রীতিতে অভ্যস্ত করে তুলবার উদ্দেশ্যেই লাইন শেষে মিল তুলে দিয়ে বিনিময়ে শব্দের মাঝে মাঝে ধ্বনি অনুপ্রাস দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার কিছুটা প্রত্যাবর্তন করে লাইন শেষে মিল দেবার পরীক্ষা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মধুসূদন যেমন চতুর্দশপদী সনেট লিখতে গিয়ে অমিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে সনেটাদর্শের মিল দিয়েছেন, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ তেমনি আবার নাট্যসংলাপে এবং অল্প কিছু সংখ্যক কবিতায় অমিত্রাক্ষর পয়ার ব্যবহারে পংক্তিমিল রাখেননি। তবু একথা স্বীকার করতে হয়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-স্পন্দ-রহস্য মধুসূদন পরবর্তী কোনও কবিই, এমন কি রবীন্দ্রনাথও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এতটা বিপ্লবী ছন্দের প্রবর্তনা ভালোভাবে গ্রহণও করতে

পারেননি। সেকারণেই তাঁর অমিত্রাক্ষর মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের তুলনায় অনেকটা আবার মিত্রাক্ষরের উচ্চারণ রীতির কাছে ফিরে এসেছে। মধুসূদনের নবছন্দের বিপুল তরঙ্গোচ্ছাস সেখানে যেন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

মধুসূদনের প্রবহমান অমিত্রাক্ষরের যতিস্পন্দন, বিশেষ করে ভাবযতি এবং ছন্দযতির পৃথক অস্তিত্বজনিত স্পন্দনমাধুর্য যে রবীন্দ্রনাথ ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেননি অমিত্রাক্ষর পয়ার এবং মুক্তকের পার্থক্য নির্দেশসূচক তাঁর একটি মন্তব্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। 'গদ্যছন্দ' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—

পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরোনো বাড়ীর অন্দর-মহল; দেয়ালগুলো সারানো হয়নি, কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরী ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে।

[ গদ্যছন্দ : ছন্দ ( ১৯৬২ সং ) : পৃঃ ১৫৭ ]

মধুসূদন শুধু যে পুরোনো বাড়ীর সদর আর অন্দরের মাঝের দেয়াল অর্থাৎ পয়ারের চৌদ্দমাত্রার সীমা রক্ষা করেছেন তাই নয়, তাকে ডিঙিয়ে ভাবের অনায়াস চলাচলের সময় চৌদ্দমাত্রার ছত্রশেষে ছন্দের যতিও রক্ষা করে চলেছেন। যেখানে ছত্র শেষে ছন্দযতি এবং ভাবযতি একসঙ্গে এসেছে সেখানে পূর্ণ বা অর্ধযতির গুরুত্ব পেয়েছে, যেখানে ভাবের প্রবাহ ছত্র পেরিয়ে গেছে সেখানে ছত্রশেষে লঘু যতি এসেছে।' ১

রবীন্দ্রনাথ হাল আমলে যেখানে পুরোনো বাড়ীর সদর অন্দরের মাঝের দেয়াল ভাঙবার পরিকল্পনা করেছেন সেখানেই ছন্দমুক্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপ মুক্তক রচনা সম্ভবপর হয়েছে। মুক্তকের সম্ভবনা মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকে (১৮৫৯) প্রথম সূচিত হয়েছে। ১৮৬২ তে কালীপ্রসন্ন সিংহ তার হুতোম প্যাচার নক্সায় মাত্র ছয়টি পংক্তিতে মুক্তকের সুন্দর নিদর্শন দিয়েছেন। একই সময়ে রঙ্গলালের কর্মদেবী কাব্যেও মুক্তকের আভাস মেলে। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর নাম দিয়ে সচেতনভাবে কাব্যে এবং নাটকে মুক্তক ব্যবহারের প্রথম প্রচেষ্টা রাজকৃষ্ণ রায়ের হাতে হয়েছে (যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নিভৃত নিবাস কাব্যে এবং ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হরধনু ভঙ্গ নাটকে) প্রায়ই একই সময়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'রাবণবধ' নাটকে এবং কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত সন্ধ্যা এবং তারকার আত্মহত্যা কবিতায় মুক্তক ব্যবহার করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত এসব কবিতা নাটকে অক্ষরবৃত্ত বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিই অবলম্বন করা হয়েছে। কবি নাট্যকারেরা ভাবের প্রবাহ অনুসারে লাইন সাজালেন তাতে পংক্তিমাপ ছোট বড়ো আকারে দেখা দিল। তবে বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির পদগঠন (জোড়মাত্রিক) এবং শব্দবিন্যাস পদ্ধতি (বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ,

---

১। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মধুসূদন কেবল মাত্র বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে অমিত্রাক্ষর লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথও মুখ্যত বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিই ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিক কালে কোনও কোনও কবি সরল কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক রীতিতেও অমিত্রাক্ষর পদ্যবন্ধ রচনার পরীক্ষা করছেন। সে প্রচেষ্টা ঠিক সফল হয়েছে বলা চলে না।

জোড়ে গাঁথ জোড় ) তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পংক্তিমিলও দিয়েছেন। এই যুগে তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সূক্ষ্ম মিলবিন্যাসে মুক্তক (দ্রঃ উৎসর্গ : আর্যগাথা ১৮৯৩) লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে মন্দ্র কাব্যে পুনরমুদ্রিত এ কবিতার প্রশংসা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে মুক্তকের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে বলাকা (১৯১৬) এবং পলাতকার (১৯১৮) অপূর্ব কবিতাগুলি রচনাকালে। এবারে কবি বিশিষ্টকলামাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত) এবং দলমাত্রিক (স্বরবৃত্ত) উভয় রীতির মুক্তক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন বলা যেতে পারে। উদাহরণ তুলছি,—

(ক) বিশিষ্টকলামাত্রিক :

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতট তলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ।।　　[ বলাকা : বলাকা ]

(খ) দলমাত্রিক :

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী আমি মহিয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণার নিদ্রাবিহীন শশী !
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা ।।　　[ মুক্তি : পলাতকা ]

এখানেও দেখতে পাই পংক্তি শেষে মিল দেবার প্রলোভনে কবি অনেক সময় ভাবযতি অনুসারে লাইন সাজাতে পারেননি। যেমন উপরিউক্ত মুক্তি কবিতারই অন্যত্র লিখেছেন,—

হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়ত ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত ; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা ; কারণ ভোলা দুঃখে সুখে

হয়তো পরাণ রইত চেয়ে যেনরে কার পায়ের শব্দ শুনে

বিহ্বল ফালগুনে।

মিলের দিকে অহেতুক নজর না দিয়ে ভাব প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখলে বোধ হয় কবি লিখতেন,— হয়তো মনের মাঝে সংগোপনে দিত নাড়া

হয়তো ঘরের কাজে আচম্বিতে ভুল ঘটাত ;

হয়তো বাজত বুকে জন্মান্তরের ব্যথা :

কারণ ভোলা দুঃখে সুখে

হয়তো পরাণ রইত চেয়ে

যেনরে কার পায়ের শব্দ শুনে

বিহ্বল ফাল্‌গুনে।

বস্তুত মিলবিহীন মুক্তকেই কবির ছন্দমুক্তি পরীক্ষা বেশী সফল হয়েছিল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবির পুনশ্চ কাব্যের বাঁশি কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিলের প্রতি কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল, অমিল মুক্তক তিনি খুব কমই লিখেছেন।

পূর্বেই বলেছি দলমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত রীতির উৎস হল বাংলা ছড়া গান এবং গ্রাম্য কবিতাগান চারদলে ( সিলেব্‌স্‌-এ ) যতি দিয়ে বিশেষ পর্ব স্পন্দন সৃষ্টি এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য। প্রতি পর্বে যেমন চারটি দল বিন্যস্ত হয় তেমনি ছয় কলামাত্রার উচ্চারণে অবকাশ রাখা হয়। প্রয়োজনমতো মুক্তদলের কলা প্রসারণ ঘটে এই ছন্দে। যেমন—

বাদলা হাওয়ায় | মনে॰পড়ে॰ | ছেলে বেলার | গান—

বৃষ্টি পড়ে॰ | টাপুর টুপুর | নদেয় এলো॰ | বান।

এই ছড়ার ছন্দের মুক্তদলের ( Open syllable ) উচ্চারণ-প্রসারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ —সে সব জায়গায় ছন্দের রেশ কিছুটা কাজ করবার অবকাশ পায়।

[ ছন্দের হসন্ত হলন্ত ঃ ছন্দ ( ১৯৬২ সং ) পৃ ৬৩ ]

মুক্তদলের কলাপ্রসারণ এবং চতুর্দল লঘুযতিস্পন্দ লৌকিক দলমাত্রিক ছন্দের মূল প্রকৃতি গড়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে যথাসম্ভব উচ্চারণের সংহতি এনে তাকে মুক্তক রূপে ব্যবহার করেছেন। সেখানে কবি লঘুযতি ভাগকে যথাসম্ভব গৌণ রেখে দীর্ঘ পদযতিভাগের গুরুত্ব আনবার চেষ্টা করেছেন। এই লৌকিক ছড়াগানের ছন্দই যে আমাদের বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিক কথ্য বাচন ভঙ্গীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পারে কবি সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। সম্ভবতঃ সে কারণেই মেঘনাদবধ-কাব্য এ ছন্দে লিখিত হলে আরও স্বাভাবিক হত বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু মন্তব্যের সমর্থনে মেঘনাদবধ কাব্যের অংশ বিশেষ রবীন্দ্রনাথ লঘুযতিস্পন্দনযুক্ত যে দলমাত্রিক ছন্দে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং এ কাব্যমহিমার পক্ষে অনুপযুক্ত এমন দুএকটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন

যার ফলে কাব্যের উপযুক্ত গাম্ভীর্য পরিস্ফুটনে অন্তরায় ঘটেছিল অস্বীকার করে লাভ নেই।১ আর সে কারণেই তখন তিনি সমালোচকদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দলমাত্রিক উচ্চারণে কাব্যে যে কতটা ভাবগাম্ভীর্য এবং ধ্বনিগৌরব পরিস্ফুট করা সম্ভব তার সার্থক নিদর্শন দিয়েছেন রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রতিভাবান কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাকৃত বাংলার লঘু পর্বযতিস্পন্দিত দলমাত্রিক ছন্দের কথা মনে রেখে ইংরেজি সিলেবিক ছন্দের সংহত উচ্চারণভঙ্গির আদর্শে দীর্ঘ আট, দশ, ছয় মাত্রার পদযতি ভাগে দলমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ছন্দোমুক্তির তাগিদ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম থেকেই অনুভব করেছেন। তাঁর আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ ( ১৮৯৩ ), আষাঢ়ে (১৮৯৯ ), হাসির গান ( ১৯০০ ) এবং মন্দ্র ( ১৯০২ ) কাব্যে এর প্রাথমিক নিদর্শন রয়েছে। তখন থেকেই সরল কলামাত্রিক এবং বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে কথ্য বাকধর্মী ভাষা প্রয়োগের নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। মন্দ্র কাব্যে তাঁর এই নব প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারও পরিচয় মেলে।২ কাব্যভাষায় পৌরুষ ফোটাবার চেষ্টাই দ্বিজেন্দ্রলালকে নতুন সংকোচক উচ্চারণ রীতির দীর্ঘপদযতিভাগের দলমাত্রিক ছন্দ উদ্ভাবনে সহায়তা করেছিল। আর্যগাথার 'পিউ' অংশে ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে দলমাত্রিক রীতিতেই লিখেছেন।

তোমার ভক্ত অনুরাগী ॥ চলে যাবে যখন শুধু—॥
অখ্যাতিও দুঃখের স্মৃতি রাখি ?
যখন তারা তুষবে জীবন ॥ অর্পিত যা তোমার পদে ॥
ঝরবে কিগো তোমার দুটি আখি—I

[when he who adores thee : আর্যগাথা ২য় ভাগ ]

এই ছন্দই আরও সংহত উচ্চারণ-ভঙ্গিতে 'আলেখ্য' কাব্যে ( ১৯০৭ ) ব্যবহার করেছেন। তার কয়েকটি উদাহরণ তুলছি।—

(ক) ক্রমাগত সন্দেশ কিম্বা ॥ ইলিশ মৎস্য খেলে পরে, I
উদরাময় হোক বা না হোক শরীর নিশ্চয় খারাপ করে ;
'সর্বমত্যন্তগর্হিতম' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ যদি একটু আধটু ভ্রান্তি টানি ? [ মগুপ :আলেখ্য ]

মাত্রাভাগ : ৮॥ ৮I, ষোল মাত্রিক দ্বিপদী পংক্তি।

(খ) একখানি তার তরী ছিল ॥ বিজন শূন্য ঘাটে বাধা ; ॥
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ; I
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ;—পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে। [ হতভাগ্য : আলেখ্য ]

মাত্রাভাগ : ৮॥ ৮॥ ১০I, ছাব্বিশ মাত্রিক দীর্ঘ ত্রিপদী পংক্তি।

(গ) গভীরা তামসী রাত্রি ; ॥ বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ; ॥
আকাশ ঘিরে চতুর্দিকে ॥ ঘিরে আছে মেঘে ; I

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে ; শূন্য প্রান্তরেতে কেবল;
হু হু করে বহে যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে ; [ সিরাজদ্দৌলা : আলেখ্য ]

মাত্রাভাগ : ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬I, ত্রিশ মাত্রিক চৌপদী পংক্তি।

(ঘ) কি আশ্চর্য ! কি সম্পূর্ণ ? ॥ কি সুন্দর এ বিশ্ববিকাশ ॥ হচ্ছে অহরহ ? I
ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা ; নীহারিকা হতে সূর্য, সূর্য হতে গ্রহ ;
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহা বিনাশ, সৃষ্টি হতে লয় ;
কি তালে কি মহাছন্দে চলেছে এ মহা নিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।
[ সত্যযুগ : আলেখ্য ]

মাত্রাভাগ ৮॥ ৮॥ ৬I, বাইশমাত্রিক ত্রিপদী পংক্তি।

দলমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দ যে কত স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গিতে এবং গম্ভীর, সংযত উচ্চারণে ব্যবহার সম্ভব এ কাব্যের কবিতাগুলিতে কবি তার সর্বোত্তম নজীর উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পলাতকার কবিতায় এত সংহত ধ্বনিগাম্ভীর্য পরিস্ফুট করতে পারেননি। নিঃসংশয়ে বলা যায়, এ ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য লিখলে ভাব এবং ধ্বনির মহিমা আরও সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ পেত। মধুসূদনের দৃষ্টি পড়েছিল তৎকালীন বাংলা কাব্যে সর্বাধিক প্রচলিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের প্রতি, দলমাত্রিকে দীর্ঘপদভাগের ছন্দ নির্মাণ কৌশল উদ্ভাবনের কথা তিনি একেবারেই ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের এদিকে দৃষ্টি পড়লেও তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ইংরেজি (calsuri বা medial pause) পদযতি ধর্মী দলমাত্রিক রীতির আদর্শে এই ছন্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেন নি। তিনি বাংলা ছড়ার ছন্দকেই যথাসম্ভব সংহত উচ্চারণে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন—সে চেষ্টাও মুখ্যত

১। কবি মন্তব্য করছিলেন, "এই প্রকৃত বাংলাতেই মেঘনাথ বধ কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হটাৎ গেলেন মৃত্যু পুরে
যৌবন কাল পার না হোতেই। কওমা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে

রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি। [ ছন্দের প্রকৃতি : ছন্দ ( ১৯৬২ ) পৃ ১৩১ ]

২। মন্দ্র কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ;—

'দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু' বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিস্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্য ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি কেবলমাত্র মৃদু মন্থর আবেশ ভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়া দিলেন। [ মন্দ্র : আধুনিক সাহিত্য ]

দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য কাব্য রচনার পরবর্তী কালে করেছেন। সুতরাং বাংলা ছন্দমুক্তি আন্দোলনে দ্বিজেন্দ্রলালের পদযতিভাগের দলমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার প্রচেষ্টা একক ধারাতেই চলেছে বলা যেতে পারে। এ প্রচেষ্টায় তিনি বিস্ময়কররূপে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এ পথে পরবর্তী প্রায় কোনও কবিই আর পদচারণা করেননি। বিজয়চন্দ্র মজুমদার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। আধুনিক কবিরা বাকধর্মী কাব্য রচনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত এই সংকোচক দলমাত্রিক ছন্দ ব্যবহারে যদি মনোযোগী হন বাংলা কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে নব প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হতে পারে।

ছন্দোমুক্তি প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে গদ্য কবিতার ছন্দ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গদ্য কবিতায় মাত্রা গণনারীতির সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটেছে। ছন্দবোধের পক্ষে দুটি অপরিহার্য গুণ হল, উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের আবর্তন এবং শ্রোতার কানে অনুরূপ আবর্তিত ধ্বনিতরঙ্গের প্রত্যাশা। গদ্যকবিতা লিখতে গিয়েও কবিকে শব্দবিন্যাসে ধ্বনিগুচ্ছের প্রত্যাশিত গতি-আবর্তন রাখতে হয়েছে ভাবের তৃপ্তিদায়ক স্পন্দমানতা সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং স্বাভাবিক বাক্‌ধর্মী ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। সমুদ্রে যেমন একের পর এক তরঙ্গধারা এসে একটি ছন্দ আবর্তন সৃষ্টি করে কিন্তু তার প্রতিটি তরঙ্গের আয়তন সমান থাকে না, গদ্য কবিতার ভাব তরঙ্গের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বাক্‌পর্ব পর পর সজ্জিত হয়ে ওঠে। মাত্রা পরিমাপে তারা সম্পূর্ণ সমান নয়,—কোনও নির্দিষ্ট ছন্দ প্রকৃতির মাত্রা গণনায় তাদের হিসাব মেলে না। তবু ছোট ছোট বাক্ পার্বিক তরঙ্গধারায় ছন্দবোধ জাগ্রত হয়। গদ্য কবিতা রচনায় কবির যেমন স্বাধীনতা বেশী তেমনি সূক্ষ্ম নিপুণ ছন্দবোধও অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের প্রায় চল্লিশবছর পূর্বে (১৮৮৪) কবি নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'পদ্য পৌঙক্তিক পদ্য গদ্য' নাম দিয়ে গদ্য কবিতা রচনার চেষ্টা করেছিলেন। বর্ষার মেঘ নামক সেই গদ্যকবিতা পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ লিখেছিলেন,—

যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ পৌঙক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অর্ঘ্য। লেখা তো হইল। এখন পাঠক মণ্ডলী কি বলেন।

সে যুগে পাঠকমণ্ডলী লেখাটি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানিনা। তবে রচনাটি যে কাব্যের আবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছে এ যুগের পাঠকমণ্ডলী মেনে নেবেন ভরসা রাখি। অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

আকাশ নীল—অনন্ত নীল
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক শোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি হতে
ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল
সূক্ষ্ম বলিলাম কেন?

অনন্ত নীলকাশ পট্টের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ
সে কি বৃহৎ?—না ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর

যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে
আমি তাই।
আমি আকাশ কোণে
ঐ ক্ষুদ্র মেঘের তুলনায় কালের কোলে
নাই বলিলেই হয়।

অহো তবে মহানকালের চেয়ে অনন্ত কে
মহান কে ?
তাকি জাননা ;—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল।

[ রাজকৃষ্ণ রায় সাহিত্যসাধক চরিত মালা ( ৫০ ) পৃঃ ৪৭-৪৮ ]

বোধ হয় পদ্যের মতো ছোট বড়ো পংক্তিতে গদ্য কবিতা লেখার এটিই প্রথম প্রয়াস। এর কয়েক বছর আগেই ( ১৮৭৮ ) বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য পদ্য নাম দিয়ে মেঘ বৃষ্টি খদ্যোত নামে যে তিনটি গদ্য রচনা লিখেছিলেন সেগুলিও গদ্য কবিতার পর্যায় ভুক্ত করা চলে। তবে সে রচনা তিনটি গদ্যের ঢঙে সাজান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার ভুমিকায় লিখেছিলেন,—

এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে তাহা সঙ্গত কিনা আমার সন্দেহ আছে! ভরসা করি অনেকেই জানেন যে কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যেস্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নাহলে কেবল কবি নাম কিনবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকারে সং সাজিতে বসা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুপরিচিত গদ্যকবিতার নিদর্শন বাহুল্যবোধে আর উদ্ধৃত করলাম না।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম গদ্যকবিতার আভাস এনেছেন কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত পুষ্পাঞ্জলি নামক রচনা গুচ্ছের কয়েকটি রচনায়। এই রচনাগুলিও রাজকৃষ্ণ রায় যে বছর তার গদ্য কবিতা প্রকাশ করেন সেই বছরে (১৮৮৪) লিখিত। প্রায় চল্লিশ বছর পর লিপিকা গ্রন্থে (১৯২১) তিনি পুনর্বার গদ্য কবিতার পরীক্ষা করেন। লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'সতের বছর' এবং 'প্রথম শোক' রচনা তিনটির প্রাথমিক রূপ পুষ্পাঞ্জলিতে রয়েছে। লিপিকায় গদ্য কবিতাকে পদ্যের মতো ছোট বড় বাক্‌পর্বির পংক্তি ভাগে তিনি সংকোচ বশতঃ সাজাননি বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রাজকৃষ্ণ রায়ের গদ্য কবিতা তার চোখে পড়েনি মনে হয়। আরও দশবছর পর পুনশ্চের (১৯৩২) গদ্য কবিতা লেখার সময়ে কবি তার সংকোচ কাটিয়ে ছোট বড়ো পংক্তি সাজে গদ্য কবিতাকে সাজিয়েছেন। এখানে সেই পরিণত গদ্য কবিতার একটি নিদর্শন তুলছি।

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।

কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠল আকাশে ;
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ় ;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে : জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।　　[ শিশুতীর্থ : পুনশ্চ ]

গদ্যকবিতা রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যে লিখেছেন।১ ১৯৩৬এর পর থেকে তিনি আর বিশেষ গদ্যকবিতা না লিখে আবার সুনির্দিষ্ট মাত্রগণনারীতির পদ্য-রচনার জগতে ফিরে এসেছেন। কাব্যে এতটা ছন্দোমুক্তি কবির কি পছন্দ ছিল না ? আর একটি লক্ষ করবার বিষয়, এযুগের রবীন্দ্রপরবর্তী অধিকাংশ কবিই পদ্য কবিতা লিখেছেন। গদ্য কবিতার নিদর্শন সে তুলনায় প্রায় বিরল বলা চলে। ছন্দে ভাবমুক্তির সূচনা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারে দেখা দিয়েছিল, মুক্তক এবং গদ্যকবিতার দুই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তার পূর্ণাঙ্গতাও লক্ষিত হয় ;—তবে বাংলা কাব্যে পূর্ণছন্দ-মুক্তি কবিদের কাম্য ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে।

১। এ প্রসঙ্গে 'পুনশ্চে'র অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গ্রন্থের আরও কয়েকটি কবিতার মতো এ কবিতাটিও কবি বিশিষ্টকলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতির মুক্তক-বন্ধে রচনা করেছেন। একাধিক রসিক বিদগ্ধ পাঠক এবং ছন্দ-জিজ্ঞাসু লেখককে কবিতাটি গদ্যকবিতারূপে গণ্য করতে দেখেছি। এই ভ্রান্তি থেকেই ধরা যায় কবি মুক্তকে ভাবমুক্তি সাধনে এখানে কতখানি সফল হয়েছেন। বস্তুত ছন্দমুক্তির ক্ষেত্রে এই কবিতাটিকে মুক্তকের সার্থকতম দৃষ্টান্তরূপ গণ্য করা যেতে পারে।

# বিহারীলাল ও বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্য

**নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কবিদের মধ্যে মধুসূদনের কবিত্বপ্রেরণাই ছিল সব থেকে সৎ, বিশুদ্ধ। সেই যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ইয়োরোপ মোহে নিজের প্রাথমিক লক্ষ্যভ্রষ্টতার বিড়ম্বনার পর তিনি কবিত্বের দুর্জয় আবেগেই দেশজ জীবন ও সাংস্কৃতির মৃত্তিকার গভীরে তার প্রাণরস সংগ্রহের উৎসটি খুঁজেছিলেন। অবশ্যি তাঁর সংক্ষিপ্ত শিল্পীজীবনে ঐ বিড়ম্বনার জের টেনে তখনকার চালু সাহিত্যরুচির ঝোঁকে মধুসূদন মিল্টনীয় মহাকাব্যের ছদ্ম ধ্রুপদী আড়ম্বরে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, মেঘনাদবধ কাব্যে যার ছাপ মেলে। কিন্তু এ কাব্যের সেই ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের আয়োজন সত্ত্বেও তার বাস্তব সত্তা আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ঐ আড়ম্বর সচেষ্টতায় সেকাল এবং একালেরও কোনও কোনও জ্ঞানীগুণীদের মত বিভ্রান্ত না হলে আমরা বুঝি যে মেঘনাদবধ কাব্যের নতুন ভাষাভঙ্গি বাংলাভাষার নিজস্ব বাক্‌ছন্দের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, যার মূল দেশজ জীবনের শেকড়ে, তার রক্ত মজ্জায় স্নায়ুতে।

কবিত্বের দুর্নিবার গরজেই মধুসূদন বুঝেছিলেন, তাঁর রক্তে, স্মৃতিতে জীবন্ত দেশজ সংস্কৃতির উৎসে প্রাণ পরিগ্রহণেই নিজের কবিত্বের সার্থকতা নিহিত। মেঘনাদবধ কাব্যে নরক বর্ণনার মত মহাকাব্যিক উপাদান এবং আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হলেও চিত্র ও সঙ্গীতময় এক আশ্চর্য উদ্বেল লিরিক স্মৃতিস্বপ্ন, বাঙালির নিজস্ব জীবনের, যার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের দুস্তর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। কবিহৃদয়ের বেদনাময় উল্লাসেই এই স্বপ্নের কূলে কূলে আরতির মঙ্গলশংখঘণ্টা মুখরিত, পূজাপার্বণ, নানা পুরাণ কাহিনীতে বর্ণাঢ্য জীবনের এক একটি উজ্জ্বল দৃশ্য আসে, মাতলিচালিত ইন্দ্র ও শচীর রথের সুদূর আকাশে চলার বর্ণনাটি দেবার সময়ও কবি সেই রূপময় জগতেই ফিরে যান :

> বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
> দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
> ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
> উদিলা ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
> পুরিল নিকুঞ্জ-কুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
> বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
> কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে !

ইন্দ্রের সভায় নৃত্যরতা উর্বশীদের উজ্জ্বল রূপের তুলনাও তিনি প্রথাসিদ্ধ আলংকারিক উপমার বদলে এই জগতেই খোঁজেন :

> ……কিম্বা দীপাবলী
> অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে,

হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা !

অবশ্যই অতীতমোহের অবচেতন বিহ্বলতায় মধুসূদন তাঁর স্বপ্নকে খোঁজেননি, নিজের অস্তিত্বের যন্ত্রনায়, আধুনিক সচেতনতার সূত্রেই তিনি তাকে পেয়েছিলেন। তাই এ স্বপ্ন পৌরাণিক ভক্তিবাদ ও শাস্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতিবাদী, তার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, বিতৃষ্ণ; প্রায় বিদ্রোহী; কবির স্বপ্নোদ্বেল কল্পনার প্রচণ্ড দুর্বার প্রাণশক্তি স্বভাবতই দেবতা ও বানর সৈন্য নির্ভর ভিখারী রামচন্দ্রের প্রতি বিমুখ। এই ঐশ্বর্যময় স্মৃতির জীবনাবেগে রাম বা বিভীষণের নীরক্ত, জীবনী-শক্তিহীন, ভীরুর পুণ্যবোধের কোনও স্থান নেই; স্বর্ণময় লংকাপুরী, রাবণের পৌরুষের স্বাস্থ্য, প্রমীলার প্রেম ও সৌন্দর্য, ইন্দ্রজিতের বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম, সীতার মমতাই তার অবলম্বন। কবির 'ভারতভূমি' ও 'আমরা' সনেট দুটিও এই জীবনানুসন্ধানের বেদনাময় স্বপ্নের তাৎপর্যের সন্ধান দেয়।

সনেটেই স্বকীয় আবেগের প্রত্যক্ষতায় মধুসূদনের দেশজ-জীবনের প্রাণৈশ্বর্য সন্ধানের ব্যাকুলতা সংহতরূপে দানা বেঁধেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ কবির মত তত্ত্বকথার উচ্ছ্বাসময় বাগাড়ম্বরে তিনি পাঠকের মন মজাতে চেষ্টা করেননি, বা নিজের নিছক ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির বুদ্বুদবিলাসে নিজেই মাতোয়ারা হন নি: তিনি তাঁর কবিত্বের অন্বেষণায় সত্যি প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। লোকজীবনের রূপরস ছন্দ সঙ্গীতে কবি যে কিভাবে তন্ময় হয়েছিলেন, 'বঙ্গভাষা' 'কমলে কামিনী' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' 'দেবদোল' 'শ্রীপঞ্চমী' 'আশ্বিনমাস' 'কপোতাক্ষ নদ' 'ঈশ্বরী পাটনী' 'কোজাগর-লক্ষ্মী' প্রভৃতি সনেট তার কাব্যগত সার্থক উদাহরণ মেলে। ব্লেক প্রসঙ্গে এলিঅট একটি মূল্যবান কথা বলেছেন যা মধুসূদন সম্পর্কে প্রযোজ্য: শক্তিশালী কবিদের রচনায় যে সততার ছাপ থাকে তার সঙ্গে আঙ্গিকগত দক্ষতার সাফল্য অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত। দেশজীবনের সঙ্গে মধুসূদনের এই সাজুজ্য সন্ধানের আবেগ যে কত সৎ, গভীর ছিল শিল্পকর্ম বিষয়ে তাঁর একাগ্র অভিনিবেশ, প্রযত্নই তার প্রমাণ। একদিকে তিনি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের দুর্দম প্রেরণায় উন্মাদ, স্বপ্নোদ্বেলিত, অন্যদিকে তেমনি রচনার পরিমার্জনে নতুন নতুন আঙ্গিকগত পরীক্ষায় পরিশ্রমী, সচেষ্ট; পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর শিল্পপ্রয়াসের মহত্ত্ব সত্যি দুর্লভ।

দ্বন্দ্বময় বিকাশে গভীর জীবনাভিজ্ঞায় মধুসূদনের আশ্চর্য প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ কবিত্ব পরিণতির ঐশ্বর্য অর্জন করতে পারেনি তাঁর জীবনের অকাল পরিসমাপ্তিতে, হয়ত বা আমাদের খণ্ডিত নব-জাগরণের দায়ভাগেও, কিন্তু তিনিই যে বিশেষ করে তাঁর সনেটগুলোয় বাংলাকাব্যের বিকাশের দিকটি নির্দেশ করে গেলেন তা অবশ্য স্বীকার্য। মধুসূদনের পরববর্তী কবিরা তাঁর রচনার মহাকাব্যিক আড়ম্বরের বহিরঙ্গ দিকটিতেই প্রলুব্ধ হলেন, তাঁর কাছে প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করতে পারলেন না, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র চূড়ান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টতার উদাহরণ রেখে গেলেন। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতায় তবু কিছু সজীব কবিত্বের স্পর্শ মেলে, কিন্তু নবীনচন্দ্রের শূন্যগর্ভ কবিত্বের ভাবগত আড়ম্বর সত্যি অসহনীয়। হেমচন্দ্রদের মহাকাব্য জাতীয় রচনার অন্তঃসার শূন্যতায় রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন অন্যান্য কবিরা সঙ্গত কারণেই বিতৃষ্ণা বোধ করেছেন, কিন্তু মধুসূদন সম্বন্ধেও তাঁদের অনীহা বা স্পষ্ট বিরূপতার জন্য

অংশত ঐ কবিরাও কি দায়ী ছিলেন, তাঁদের স্থূলতা কি তাঁকেও আচ্ছন্ন করে তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

মধুসূদন যে-আর মেঘনাদবধ কাব্যের মত দ্বিতীয় একটি মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি, সনেটের পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন, তাতেই বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ পথপরিবর্তনের ঐতিহাসিক ইংগিতটি নিহিত ছিল। বিহারীলাল হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রীয় আখ্যান কাব্যের ধারাটি আপতিকভাবে বর্জন করলেন, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্বের অন্বেষার কোনও শিক্ষাই তিনি নিলেন না, আর এক চোরাবালিতে পা দিলেন। তাঁর কবিত্ব জীবনের কোনও শেকড় পেল না, মেরুদণ্ডহীন আত্মবিলাসে পর্যবসিত হল। মাইকেলের জীবনসন্ধানী স্বপ্নপ্রাণতা রোমান্টিক অভীপ্সা তাঁর কবিত্বের স্বভাবে ছিল না। জীবনের গভীরতম উৎস ব্যক্তি স্বরূপের যন্ত্রণাময় আত্মসম্মান তাঁর রচনায় একবারও দেখা গেল না, কবিতাকে তিনি নিছক আত্মপ্রকাশের বাহন করে তুললেন মাত্র। তাঁর কাব্যে আমরা প্রগল্‌ভ আত্মভাবসর্বস্বতাই পেলাম, জীবনের শুদ্ধতা সন্ধানী আবেগের কঠিন শুচিতা নয়।

নিজের অসংলগ্ন ভাবমত্ততা সম্ভোগের অহংবোধে বিহারীলালের আসক্তি বার বার প্রকাশিত হয়েছে। কখনও কখনও জীবনের সহজ সরল আবেগ আকৃষ্ট হলেও (যেমন নিশান্ত সঙ্গীতে) তাতে স্থিত হবার মত নির্লোভ সংযত মন তাঁর ছিল না। শেলী ও বায়রনের কাব্যের ভাবালুতার উচ্ছ্বাসময় ভাষণের আড়ম্বরে অনুপ্রাণিত বিহারীলাল তাঁর ভাবমত্ততার মহার্ঘতায় প্রদর্শনের নাটু-কেপনাই মশগুল হয়েছেন। তাই তিনি কখনও কখনও হেমচন্দ্রের নবীনচন্দ্রের কাহিনী কাব্যের আড়ম্বরময় বিন্যাসটি অনুসরণ করেন, এমনকি কখনও তাঁকে ঘটনার ঘনঘটার প্রতিও প্রলুব্ধ হতে দেখি। প্রবল জীবনাবেগ থেকেই মধুসূদন তাঁর সজাগ, পরিশ্রমনিষ্ঠ, শিল্পবোধকে পান, তাঁর মত তিনি দুঃসাহসিক শিল্পপরীক্ষার নতুন চৈতন্যকে দেশজ সংস্কৃতির প্রাণময় উৎসেই সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন নি, এ বিষয়ে তাঁর কোনও বোধই ছিল না। বিহারীলাল কোন সময়েই বাংলা কবিতার নিস্প্রাণ সনাতন রীতির গণ্ডীকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন নি। ছন্দ, ভাষা, চিত্রকল্প কোথাও ত তাঁর আঙ্গিকগত পরীক্ষার কোনও উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে না। কবির গতানুগতিকতার সবথেকে বড়ো প্রমাণ পাই তাঁর প্রাকৃতিক বিষয়ক কবিতায়, তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা স্থূল রকমের কন্‌ভেনশনাল।

ঝড়্ ঝড়্ ঝড়ের ঝঝঝড়ি,
থথ্‌থড়্ থথড়্ থাব্‌রেল থথ্‌থড়ে,
তওড়্ ততড় বৃষ্টির তওড়ি,
দুদ্দুড় দুদ্দুড় দেয়াল দুলে পড়ে।

বিহারীলালের এই ঝড়ের বর্ণনার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ঝড়ের বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড় মড় কড় মড় বাজে ॥
ঝড় ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।

চারিদিকে তরঙ্গ জলের তর তরী ॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুটঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী ॥

'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিনি তাঁর 'কাব্যগুরুর' কাছ থেকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করেছেন যে 'সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।' কিন্তু কবির কাব্যপরীক্ষা বহুবার ছন্দ এবং ভাষা বিষয়ে তাঁর শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতা চোখে পড়তে বাধ্য। ক্রিয়াপদের যে ক্লান্তিকর অন্ত্যমিল সে যুগের বাঙলা কাব্যের ত্রুটি বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তা থেকে বিহারীলালও সম্পূর্ণ মুক্ত নন : তাঁর রচনায় 'করি করি' 'ভাসিয়ে' 'ঘেরিয়ে' 'খুজিয়ে' 'ঘুঁটিয়ে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গীতসুষমা বর্জিত মিল দেখি। শিল্পকর্ম বিষয়ে বিন্দুমাত্র সজাগবুদ্ধির পরিচয় তিনি দেন না, নিজের আত্মপ্রসাদঘটিত শৈথিল্যে অভ্যাসিকতায়ই তৃপ্ত থাকেন। অন্য আর এক ধরণের প্রশস্তিতে কবির সম্বন্ধে বলা হয়, তাঁর কাছে কাব্যকলা অপেক্ষা কবিহৃদয় বা কবিচরিত্র বড়ো, কাব্য অপেক্ষা কবিহৃদয়কেই তিনি বড়ো করেছিলেন। এ জাতীয় উক্তি কবির রচনায় সাহিত্যিক মূল্যায়নে অর্থহীন, কবিহৃদয় বা কবিচরিত্রে শিল্পমাধ্যমগত মূল্যই সাহিত্য সমালোচকের একমাত্র বিচায বিষয় ; যে কবি তাঁর কাব্যকলা ছেড়ে বা তাকে ছাড়িয়ে তাঁর হৃদয়কেই বড়ো করতে চান, তাঁর হৃদয়বত্তা তাঁর কাছে আগ্রহের বিষয় নয়।

বিহারীলালের প্রসঙ্গে আমাদের পোয়েট্রি এবং ভর্স্-এর পার্থক্য স্মরণ করতেই হয়, তাঁর ছন্দে রচনা ক্বচিৎ কখনও কবিতার সীমানা স্পর্শ করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই জাতীয় গৌণ কবিত্বই বাঙলা কাব্যের নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে, এ ধারণা পরবর্তীকালে বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত সমর্থনে কীভাবে প্রতিষ্ঠা পায় ?

রচনাগত প্রভাবের বিষয়টি ধরলে একথা কি বলা যায়, শুধু বিহারীলালের প্রভাবই আখ্যান কবিতার চাপে আড়ষ্ট বাঙলা কাব্যে মুক্তিবহ হয়েছিল, খাত কেটে দিয়েছিল লিরিকের নির্ঝর স্রোতের ? এবং তারপর, সেই সূত্রেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে লিরিক কবিতার ঐতিহ্য তৈরি হল, তা এতই মূল্যবান যে তার পাশে মধুসূদনের কৃতিত্বকেও মনে হয় নিষ্প্রভ, অনুল্লেখ্য ?

এই ঐতিহ্য প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং অক্ষয়কুমার বড়াল স্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যের আড়ম্বরময় স্থূল ভাষণ ভঙ্গিতে কবিত্বের কোনও দীপ্তি মেলে না। অক্ষয়কুমার বড়াল নিঃসন্দেহে সুকবি কিন্তু তিনিও বক্তৃতাত্মক তরল উচ্ছ্বাসময় ভঙ্গি কিংবা বাগাড়ম্বরের মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি এবং তাঁরও কোন গভীর অন্বেষা ছিল না। তাঁদের মধ্যে সবথেকে শুদ্ধ কবিত্ব ছিল দেবেন্দ্রনাথ সেনের। শেলী ও বায়রনীয় ভাবোচ্ছ্বাসে, অগভীর নাটুকে দার্শনিকতায় রেটরিকে নিজের মধ্যে অতিক্রম করার প্রগল্ভ চেষ্টায় তিনি কখনও বিড়ম্বিত হন নি, বাঙালি জীবনের সহজ রূপরসছন্দে আত্মদান করেই তৃপ্ত হয়েছিলেন, সেই জীবনোৎসারিত সরল সহজ আবেগেই তাঁর কবিতা দানা বেঁধেছিল। তাঁর রচনায় অবশ্যই জিজ্ঞাসার আত্মানুসন্ধানের ব্যাপ্তির ঐশ্বর্য নেই, তাঁর কাছে তা প্রত্যাশিতও নয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সীমাবদ্ধ

কিন্তু বিশিষ্ট উজ্জ্বল কবিত্বকর্মের জন্যই স্মরণীয় এবং এই বিষয়ে তিনি যে বিহারীলালের কাছেই ঋণী একথা বলা যায় না। বরং তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও সনেটের সঙ্গে মধুসূদনের চতুর্দশ পদাবলীর ও ব্রজাঙ্গনাকাব্যের আত্মীয়তাই চোখে পড়ে, কবিত্বের মেজাজে এবং বিন্যাসে। নিজের সীমিত ক্ষমতায় দেবেন্দ্রনাথের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বিকাশের বিস্ময়কর সমগ্রতায় বিহারীলালের প্রভাবের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। স্বকীয় কবিত্বের আশ্চর্য প্রাণশক্তিতে ও আত্মসন্ধানের ব্যাপ্তিতে তিনি তাঁর কাব্যের পর্ব থেকে পর্বান্তরে নিজের সীমাকেই ত বার বার অতিক্রম করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের যে সমস্ত রচনায় তাঁর 'কাব্যগুরুর' 'প্রভাব' পড়েছিল তাঁর কবিত্বের পরিণতির ইতিহাসে তারা নিতান্তই তুচ্ছ। তিনিও নিজেই প্রভাতসঙ্গীতের পরিণত বয়সের লেখা ভূমিকায় বলেছেন, 'কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি।' আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ আরও পরে সোনার তরীর যুগে পদ্মাপ্রকৃতির প্রাণময় অভিজ্ঞতার সূত্রে, নিজের কবিত্বের বিকাশের অনিবার্য তাগিদেই তাঁর যথার্থ কাব্যভাষাকে পেয়েছিলেন।

বাঙলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ নবজাগরণের দায়ভাগেই তখন সাহিত্য জগতে যে এলোমেলো বাতাস বইছিল, তাতে বিভ্রান্ত হয়ে মধুসূদনের মহৎ শিক্ষাকে গ্রহণ করবার মত চরিত্র অর্জনে কেউ উৎসুক হননি। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আখ্যান কাব্যের নিছক প্রতিক্রিয়ায় নয়, লিরিক প্রবণতা বাঙলা কাব্যে অনিবার্যই ছিল। কিন্তু মধুসূদনের জীবনের উৎসসন্ধানী লিরিক মেজাজের সম্ভাবনার দিকে কারুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পড়ল না, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাঁকে গুলিয়ে ফেলা হল। হেমচন্দ্রদের স্থূলতার পর যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের ঝোঁকটা দেখা দিল, বিহারীলাল প্রথম তাকে ফলাওভাবে প্রকাশ করে অনুজদের মুগ্ধ করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি কাব্য সাহিত্য মারফৎ যে সমস্ত আবেগ অনুভূতি স্বপ্নাবেশের উচ্ছ্বাসকে তাঁর Poetical, বেশ কাব্যময় বলে জেনেছিলেন, যা তাঁদের কাছে অত্যন্ত উপাদেয় ছিল, বিহারীলালের মধ্যে তাদের কিছু স্বাদ পেয়েই তাঁরা বিগলিত হলেন। প্রগল্‌ভ আবেগ অনুভূতি নিয়ে উচ্ছ্বাসময় 'কাব্যি' করার আত্মরতির এই দৃষ্টান্ত মোহবিহ্বলতায় তাঁরা তাঁদের অগভীর পল্লবগ্রাহী সাহিত্যরুচিরই প্রমাণ দিলেন। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যখন তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বে মধুসূদন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ ও বিহারীলাল প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হন, তখন আমরা বুঝি, এই অস্থির, অনিশ্চিত সাহিত্যরুচি কেবল সাময়িক ব্যাপার মাত্র ছিল না, তা ছিল আমাদের সীমাবদ্ধ দ্বিধাগ্রস্ত নবজাগরণের বিড়ম্বনারই একটি দিক।

# নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র

**রণজিৎকুমার সেন**

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যিনি যুগান্তর সৃষ্টি করলেন, তিনিই নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র। কোন কোন সৌখীন নাট্যসংস্থায় প্রথম প্রথম তিনি দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের দু'একটি ভূমিকায় অভিনয় করে নিজের জীবনে মঞ্চাভিনয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ক্রমে নিজেই নাট্যরচনায় অগ্রসর হন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নাট্যকার হিসেবে তিনি নিছক রচয়িতার ভূমিকার মধ্যেই নিজেকে নিঃশেষ করেননি। সেই সঙ্গে নাট্যবিদ্যার কলাকৌশল সংযোজনায়ও অধিকমাত্রায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা হবার গুণে নাটকের ঘটনাপারম্পর্য, দৃশ্যের অবতারণা এবং পাত্রপাত্রীর মুখে কথার সংযোজন—কোনটা কীভাবে সাজালে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও লোকরঞ্জনের সহায়ক হবে, তা অন্যের অপেক্ষা তাঁর পক্ষে আয়ত্ব করা সহজ ছিল।

থিয়েটারের নানা কাজে এভাবে ব্যাপৃত না থাকলে হয়তো বাংলাভাষায় তাঁর কাছ থেকে আমরা অন্তত একখানা অভিনয়-দর্পণ পেতাম এবং তা আমাদের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতো। তা না পেলেও তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে অভিনয়-আঙ্গিক সম্পর্কে যেটুকু আলোকপাত তিনি করে গেছেন, তার মূল্যও আমাদের কাছে কম নয়। অভিনেতার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তা কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমন হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তথাপিও নটের চিন্তা ফুরায় না। নাট্যকার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নাটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে।'

নাট্য-চরিত্রকে রূপ দেবার সময় সেই চরিত্রের পেশাগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা নটের অবশ্য কর্তব্য। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে কোনো বিশেষ অঞ্চলের জীবনকে মঞ্চে রূপ দিতে হলে কেবল সেই অঞ্চলবাসীদের ভাষাসম্পর্কে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়; আঞ্চলিকজীবনের হাবভাব, বৈচিত্র্য, প্রবণতা, রীতিনীতি এবং পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও নটনটির বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। তারই পরিপূরক হিসেবে বলা যায়, কোন চরিত্রকে রূপায়িত করার সময় সেই চরিত্রের বৃত্তিগত লক্ষণের প্রতি অভিনেতার সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। এসম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: 'কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিকপুরুষ কথা কহিতেছেন, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি-মুখে ব্যূহ রচনা করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গীতে মালা গাঁথে—এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেন অভিনয়কালে এই সকল ভাবভঙ্গী স্বভার প্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন।'

কোন চরিত্রমানসকে মঞ্চে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিনেতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করলে কোন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও বা স্থূলভাবে। কিরূপ ঘটনায়, কিরূপ পরিবেশে কোন চরিত্রের কি ধরণের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তৎপ্রতিও নট-নটির প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রসঙ্গতঃ অভিনয়ে মনোবিকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—'নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে।…অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথাও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ করিয়া প্রদর্শন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হয় না।'

মঞ্চে অভিনেতার দ্বৈত সত্ত্বা একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ বলেন, অভিনয়ের সময় অভিনেতাকে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে নাটকীয় চরিত্রে, তদ্‌গত হবে। এর বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, অতি তন্ময়তা অভিনয়কলাকে ক্ষুন্ন করে; অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রের আবেগ অনুভূতির দ্বারা অভিনেতা এতটা সংক্রামিত হয়ে পড়েন যে, মঞ্চ-আঙ্গিকের প্রতি তখন তার আর দৃষ্টি থাকেনা। গিরিশচন্দ্র এই শেষোক্ত মতেরই পরিপোষক ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে, যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইয়াছে কিনা,—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা,—প্রতিযোগী অভিনেতা ঠিক চলিতেছে কিনা,—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে, তাহা গৌণ। তন্ময় অংশই মুখ্য। কিন্তু হাস্য-রসের অভিনয়ে কখনো কখনো সাক্ষী অংশ মুখ্য হইয়া উঠে।'

অন্যদিকে রূপসজ্জা ও বেশভূষা অভিনয়ের একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রাহ্য। কোন্ চরিত্রের কিরূপ রূপসজ্জা ও বসন ভূষণ হওয়া উচিত, এসম্বন্ধে নটের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এসম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেনঃ 'অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকায় উপযোগী হইবে।…অভিনয়কে বলা হয় বহুরূপী বিদ্যা। নাট্যকারের ধারণার উপর রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে। ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না। কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা অভিনেতার কার্য।'

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীতে দৃষ্টিপাত করলে এরকম চিন্তার রসদ অজস্র মেলে।

অভিনয়ের এই টেকনিকাল দিকগুলি ছাড়াও নাটক পর্যায়ে সাহিত্য রচনার পরিবর্তে নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষা ও আনন্দ দেবার প্রবণতাই ছিল তাঁর প্রধান। এই কারণে সাধারণ পাঠ হিসেবে তাঁর নাটক যত না রসোত্তীর্ণ মনে হতো, তার চাইতে অধিক রসোগ্রাহী

হতো নাটকাভিনয়। এদিক থেকে যদি তিনি কোনো আদর্শ নাট্যকারকে অনুসরণ করে থাকেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে উইলিয়াম সেক্সপীয়র।

লোকশিক্ষার দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের অবদান অবিস্মরণীয়। রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানতঃ যে দুটি আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে একদিকে সমাজসংস্কার, অপরদিকে ধর্মনীতি। সমাজের যেখানে অনাচার, অবিচার ও ব্যাভিচার মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে সেখানে 'প্রফুল্ল', 'মায়াবসান' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে তিনি যেমন সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি জনচিত্তে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব বোধ জাগিয়ে তুলতে 'বুদ্ধদেব', 'শঙ্করাচার্য', 'শ্রীচৈতন্য', 'বিল্বমঙ্গল', প্রভৃতি ধর্মবেত্তাদের জীবনী পরিবেশন করারও প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি যদি কারুর কাছথেকে প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তবে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

কিন্তু তাই বলে ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি গিরিশচন্দ্র। ভারতীয় ইতিহাসের যুগন্ধর পুরুষ অশোক, চণ্ড, সৎনাম, সিরাজ, মিরকাশেম, ছত্রপতি প্রভৃতির জীবনী সম্বলিত নাটক রচনা করে তিনি একদিকে যেমন দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে মঞ্চে সংস্থাপিত করে জনগণকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তেমনি পৌরাণিক নাটক রচনাতেও বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন গিরিশচন্দ্র। অথচ পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে তিনি যথাযথ গ্রহণ না করে নিজের আদর্শগত ছাঁচে তাদের তৈরী করে নিয়েছেন। তার মধ্য দিয়ে তাঁর যা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, তা হচ্ছে প্রধানতঃ সত্যনিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ, পাতিব্রত্য, নৈতিক সাহস প্রভৃতি। এসব নাটক রচনার প্রধান উৎস ছিল জাতীয় যাত্রাসঙ্গীত। এসব নাটক রচনায় এদেশীয় যাত্রার প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাননি অথবা এড়িয়ে যেতে পারেননি।

লোককল্যাণের দিকছাড়াও অবিমিশ্র আনন্দ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনাও অজস্র করেছেন। প্রচলিত সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন থেকে সুরু করে বাংলার জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্য কোনো বিষয়ই তাঁর নাটক থেকে বাদ পড়েনি। স্বদেশের যে অতীতকে না জানলে বর্তমান কালটাই নিরর্থক হয়ে যায়, সেই অতীতটাকে আমরা নাটকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম গিরিশচন্দ্রে। এ যেন এক মহৎ ব্রতসাধনা। তাঁর সমসাময়িক কালের যেসব বিষয় তাঁর লেখনীতে বেদনার স্পর্শে মহৎ হয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্খলন-পতন প্রভৃতি। অত্যন্ত দরদের সঙ্গে এদের জীবনচিত্র এঁকেছেন গিরিশচন্দ্র।

নাট্যরচনায় তাঁর ভাষাকে আমরা মুলতঃ দু'ভাগ করতে পারি। :যেখানে সামাজিক নাটক গড়ে উঠেছে। তাতে যেমন তিনি চলতি গদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ভাষাকে পদ্যাত্মক করেছেন। তাতে অসমমাত্রিক মিলহীন পয়ার ছন্দের সঙ্গে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও কিছু অনুরণন আমাদের কানে বাজে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের বক্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়—গিরিশচন্দ্র যে ছন্দে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকগুলির

অনেকাংশ লিখেছেন তা গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কেবল মিলই নেই, কিন্তু ছন্দ হিল্লোল আছে, মাত্রা যতির সুনির্দিষ্ট রীতি আছে। প্রত্যেক পংক্তির অক্ষরসংখ্যার নির্দিষ্ট হিসেব আছে। গিরিশচন্দ্রের এ ছন্দে মাত্রা-যতির বালাই নেই অক্ষরসংখ্যার কোন নিয়ম নেই ছন্দ-হিল্লোলেরও পুরোপুরিই অভাব। গদ্যবাক্যের শব্দগুলির স্থান পরিবর্তন করে এমনভাবে সাজানো হয়েছে—যাতে কবিতা বলে ভ্রম হয়। অবশ্য স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিতার পংক্তিও এসে গেছে। কোন্ ভাষায় কোন ভঙ্গীতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচনা করলে নটনটিদের রসনায় বেশ সুশ্রাব্য হবে এবং শ্রোতার চিত্তবিনোদন হবে, তা তিনি বিশেষ ভাবেই জানতেন। কাজেই এই ছন্দের উক্তিগুলি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতো। গিরিশচন্দ্র এই ছন্দ মাত্র পরীক্ষিতভাবে ব্যবহার করেননি এই ছন্দকেই তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চালিয়ে গেছেন। অন্যান্য অনেক নাট্যকার এই ছন্দরই অনুবর্তন করেছেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের বিষয়বস্তু ভারতের যে অতীত যুগের ইতিহাস থেকে গৃহীত, সেই অতীত যুগের স্মৃতি আমাদের স্বপ্নময়। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন সাধারণ গদ্যে এই স্বপ্নযুগের কথা তেমন জমে না। তাঁর এই ছন্দে অন্ততঃ সেযুগের একটা আবেষ্টনী রচনা হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। এই ছন্দই গৈরিশি ছন্দ। তাঁর এই সহজাত ছন্দের আশ্রয়ে তিনি শুধু মৌলিক নাটকই রচনা করেননি, সেই সঙ্গে বঙ্কিম প্রভৃতির উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দান করেছেন এবং সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভৃতির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। নাট্যরচনায় তাঁর প্রথম হাতে খড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দান থেকেই, ক্রমে গীতিনাট্য ও রূপকনাট্যে লেখনী সঞ্চালন করেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

কিন্তু নট-নটি পরিকীর্ণ যে নাট্যপরিবেশের মধ্যে তাঁকে দিবারাত্র যাপন করতে হয়। তা পারিপার্শ্বিক বহু বিদগ্ধ সমাজ-ব্যক্তির মতো তিনি নিজেও সহ্য করতে পারতেন না ; কিন্তু জীবিকার সঙ্গে জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ায় তা থেকে মুক্তি পাবার পথ ছিল না তাঁর। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমে দিব্য জীবনের আস্বাদ পান এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নাটকের ক্ষেত্রেও তারই পরিচয় স্পষ্ট করে তোলেন। এই অংশের সব চাইতে বড় উদাহরণ তাঁর শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, নিমাই সন্ন্যাস, তপোবন প্রভৃতি।

তাঁর নাটকাবলীর সাহিত্যমূল্য অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নি। যদি সে মূল্য অধিকও না হয় তবু রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তিনি যে মহাসামগ্রী বিচিত্রভাবে ও তথ্যে মিলিয়ে দেশবাসীকে দান করে গেছেন, তার কাছে বাঙালী চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে তিনি যে দেবমঞ্চে উন্নীত করে গেছেন, সে কথাও চিরকাল স্মর্তব্য।

বাগবাজারের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নীলকমল ঘোষের মধ্যম পুত্র গিরিশচন্দ্র। এইবংশের আদি নিবাস গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। তাঁর ভূমিষ্টকালে জননীর কঠিন পীড়া হেতু গিরিশের লালন-পালনের ভার পড়ে মণি নাম্নী এক বাগ্দিনীর উপর ; এই পরিবারে সে বাসন মাজার কাজ করতো তার স্তন্য পান করেই গিরিশচন্দ্র বড় হন। বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন তিনি। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র বলেন 'আমি আজীবন এই প্রকৃতি চালিত হইয়া আসিয়াছি! অন্যায় বা কঠিন বলিয়া যে কার্যে আমাকে

নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন করিতে আমি আগে ছুটিয়াছি।'—হেয়ার স্কুলে তাঁর সহপাঠির মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব দে প্রভৃতি। গিরিশের খুল্লপিতামহী রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করে বলতে পারতেন। শুনতে শুনতে গিরিশচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়তেন। উত্তরকালে তিনি যে পুরাণোক্ত বিষয় নিয়ে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তার প্রথম অনুপ্রেরণা পান এই ছোটবেলা থেকেই। তিনি যতটা পিতৃ-আদর পেতেন, তার কিয়দংশও মাতৃস্নেহ পেতেন না। চিরজীবন তিনি পিতৃস্মৃতির পূজো করেছেন। যখন ঘোর নাস্তিকতায় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তখনও তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়ে পিতৃ উদ্দেশ্যে অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল প্রদান করতেন।

এ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানীর বুককিপার শ্যামপুকুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র দেব সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের শুভ পরিণয় হয়। যদিও বিদ্যালয়-জীবনেই তাঁর অধ্যয়ন শেষ হয়, তবু সারাজীবন তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও তৎকালীন প্রকাশিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাঙলা বই পাঠ করে এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিয়মিত গ্রাহক হয়ে বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। মনে মনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে গুরুরূপে গ্রহণ করে প্রথম প্রথম গিরিশচন্দ্র কবিতা রচনা করতেন এবং ক্রমে ভাষার আধিপত্য লাভের জন্য ইংরেজী কবিতা অনুবাদ সুরু করেন। ইংরেজী সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এ সময়ে তাঁর ঐকান্তিক যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকল রচনার মধ্যে গীত রচনা তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি বিশেষ দিক ছিল। তাঁর প্রথম রচিত গীতটি এই—

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে।
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী।
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥

যৌবনে গিরিশচন্দ্র মদ্যপায়ী স্বেচ্ছাচারী ও যথেষ্ট পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরোপকার তাঁর চরিত্রে একটি বড় গুণ ছিল। শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে কিছুকাল তিনি অফিসে কাজ করে পরে রঙ্গালয়ের সঙ্গেই নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে গিরিশচন্দ্র ক্রমে নাস্তিক্য পর্যায়ে এসে জড়বাদে অত্যধিক বিশ্বাসী হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই একই সময়ে তাঁর অজান্তে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে।

১৮৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনেই সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মহড়ায় প্রথম শিক্ষাদান করেন এবং নাটকান্তর্গত ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৮৭৪ সালটি ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ শোকাবহ। এই বৎসরই ২৪শে ডিসেম্বর তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। এ্যাটকিন্সন কোম্পানীর অফিস উঠে যাওয়ায় বাধা মাইনের চাকরীটিও তাঁকে হারাতে হয়। পরবর্তীকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র

ইণ্ডিয়ান লীগে ও পরে পার্কার কোম্পানীর চাকরীতে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহে উদ্যোগীহয়ে সিমলার বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা সুরতকুমারীকে বিয়ে করেন। কিন্তু নাট্যশালাই ছিল গিরিশচন্দ্রের প্রাণ। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ( ১৬ শ্রাবণ, ১৩৩২ ) তাঁর সম্পর্কে লিখিতে গিয়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকৃতই বলেছেন: '…নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই ( বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ) মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবল অভিনয় প্রতিভা লইয়া জন্মাইলে নাট্যশালার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন; আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Indian stage…বাংলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।'

তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব ছিল অসামান্য। রামকৃষ্ণদেবকে তিনি নিজেই শুধু গুরুরূপে পেয়েছিলেন, তা নয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চও রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে নবজীবন লাভ করে ধন্য হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গেও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁর নাট্যরচনায় অসাধারণ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র। এই সূত্রে তাঁকে লিখিত নবীনচন্দ্রের একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। ১৯০৬ সালের ২'শে আগষ্ট রেঙ্গুন থেকে নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে লিখছেন—

…'আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া কিছু বেশীদিন সময় লইয়া আমাদের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরীবিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারবিভ্রাট, বিচারবিভ্রাট, উপাধি ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি Comico Tragic নাটক লিখিয়া দেশকে রক্ষা কর। …নীলদর্পণের মতো একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। তুমি বঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশ প্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করো। তুমি বইখানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গদ্যের সহিত চালাইবে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর পারি, তোমাকে উক্ত রচনায় আমি সাহায্য করিব। আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পেড়াপেড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠ লিখেছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এতবৎসর পরে ইহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।'

নবীনচন্দ্রের এই অনুরোধ স্মরণে ছিল গিরিশচন্দ্রের। তিনি যে শুধু নাট্যরচনা ও রঙ্গালয় পরিচালনার মধ্যেই নিজের সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, তা নয়; গল্প, উপন্যাস, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সামগ্রিক ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনী সমভাবে চলতো। সেযুগে এমন সব্যসাচী লেখক খুব বেশী ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র নিজেই একটি যুগ রচনা করে গেছেন। উত্তরকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গিরিশ-লেকচারশিপ' প্রবর্তন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, বঙ্গদেশ প্রগতির পথে অনেকদূর এগিয়ে এলেও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গ-জন-মনে গিরিশচন্দ্র আজও অমর ॥

## শিল্পে ভাব

ভাব হচ্ছে আবেগ আর প্রতিমার একটা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। বাইরের জগৎ চোখে-দেখার কানে-শোনার সড়কটুকু উজিয়ে এসে আপন রূপ-রসের ঝাঁপি থেকে মনকে দেয় অনুভূতির রোমাঞ্চ। এই রোমাঞ্চ থেকে জাগে আবেগ, আর আবেগ ঘিরে চাক বাঁধে ভাবনা। তখুনি শিল্পী ভেতর-মহলের কারুশালায় সুরু করেন প্রতিমা গড়ার কাজ। এখন আবেগ যদি সাঁচ্চা না হয়, প্রতিমা তবে ঠুন্‌কো; আবার প্রতিমা যদি বেঢপ হয়, তবে তো আবেক একেবারে মাটী। কাজেই পয়লা নম্বরের শিল্প গড়তে গেলে আবেগের সাথে প্রতিমার মিলন ঘটে। ভাব সেই মিলনেরই হরগৌরী।

আমাদের মনের মাঝে ক্ষণে ক্ষণেই ভাবের মরশুমী ফুল ফুটছে। এটা ভারী মজার ব্যাপার যে, কোনো একটা বিশেষ মরশুমে এরা ফোটে, কিন্তু মরশুম ফুরিয়ে গেলেও ঝরে যায় না। বরং তখন মানানসই আর-পাঁচটা ভাবের সাথে সই পাতিয়ে স্মৃতির বাগানে হাত ধরাধরি করে নহর-গাঁথা মালার মতো দুলতে থাকে। ফলে, একটি ভাব যদি প্রকাশের পথ পায়, তবে তার সাথে মিতালি-গড়া সকল ভাবই সার বেঁধে প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক, কোনো খুশি-ভরা বিকেলে নিরালা পাহাড়তলিতে শালবনের মাথায় পড়ন্ত আলোর সোনা-রঙ দেখছি। এ দেখার শেষ এখানেই নয়, মনের ভেতরে ভেতরে প্রতি মুহূর্তে এ দেখা নোতুন হয়ে উঠতে থাকে; তারপর একসময় তা স্মৃতির বিষয় হয়ে যায়। তখন তারা আর নিছক টুক্‌রো টুক্‌রো দৃশ্য নয়, পুরো চেহারা নিয়ে সবাই এক একটি ভাব। মন তখন ভাবের মাথা তুলিয়ে পাটরাণী। কাজেই, ছ-সাত দিন, দু-দশ মাস, কিংবা বিশ-পঁচিশ বছর পরেও জীবনে যদি সেইরকম খুশি-ভরা বিকেল আসে, তখুনি পর পর মনে পড়ে যাবে নিরালা পাহাড়তলির কথা, শালবনের কথা, শালবনের মাথায় সোনা-রঙ পড়ন্ত আলোর কথা। ঠিক তেমনি আবার কোনোদিন শালবন দেখলে খুশি-খুশি বিকেলের সোনাঝুরি আলো নিয়ে নিভৃত পাহাড়তলি ভেসে উঠবে মনের কোণে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, মনের মুলুককে এই যে ক এলেই খ আসে, আর সেই ধারা বেয়ে হাজির হয় গ ঘ ঙ—এর কারণ কী! আমার ধারণা, এ ব্যাপারটার পেছনে তেমন কোন জোরালো যুক্তি দাঁড় করানো কঠিন। এটি তো ভাবের অবাধ মেলামেশা থেকে অফুরন্ত হয়ে ওঠে। চেতনার স্রোতের গভীর চলাটাই যেখানে বড়ো কথা, জ্ঞানের লগি দিয়ে খোঁচা মেরে সেখানে নৌকা চলে না, অনুভূতির বৈঠে টানা জরুরী দরকার। তাই ক-ভাবের সঙ্গে খ-ভাবের গাঁটছাড়া যুক্তি দিয়ে না বেঁধে রসালো উপভোগের আনন্দ দিয়ে বেঁধে শিল্পের কারুশালায় আমরা প্রতীক গড়ে তুলি—যেহেতু প্রতীক হচ্ছে ভাবের বনেদিয়ানার একমাত্র নজির।

ভাবের এমনিধারা সহজ মেলামেশা তখনই স্বাভাবিক, যখন তা বেশি করে ভর রাখে

আমাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতার ওপর। জ্ঞানের জগৎটাকে ছেয়ে ফেলা পর্যন্ত এই মেলামেশা চলতে থাকে। তাই তাকে আমরা কোন এক সকালের হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া কিছু বলতে পারি নে; বরং এটি হচ্ছে বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে এমন এক মিতালি যার ফলে আমাদের আবেগগুলো দানাবেঁধে মনের গভীরে একটা সৃষ্টির প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। কারণ ভাবের ঐ মণিমেলার ঘটকালি করে শিল্পীর ভেতর মহলের কাঁপন-লাগা অনুভূতি; বাইরের জগতের ছোঁয়া নিয়ে ঐ মেলা গড়ে উঠলেও ওর ওপরে বাইরের জগতের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধের কোনো হাত নেই।

আমাদের ইচ্ছাগুলো অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের মনের ভেতরে নানান ভাবের সহজ মেলামেশার ঢঙটুকু দেয় ঠিক করে যাতে ঐ মেলামেশা নিছক মামুলি না হয়ে ওঠে। কারণ মেলামেশাটা ভাবের হতে পারে, তবু তা বেশি করে মুখ চেয়ে রয়েছে ভাবের নয়, মনের হরেক রকম খাপ-খাওয়ানো অবস্থার। লাটাই ঘোরালে সুতো আসে, সুতো টানলে ঘুড়ি—ভাবের বেলাতেও যে এ কথা সত্যি তা মানি। কিন্তু লাটাই তো আর নিজের থেকে ঘোরে না, ঘোরে ঘুড়ির উড়ানেওয়ালার হাতে। ভাবও তেমনি শিল্পের বাসরে যাবার জন্যে নিজেই নিজের পথ বেঁধে নেয় না, শিল্পীর ভেতরমহলের ঐ হাজার খাপ-খাওয়ানো অবস্থা থেকে উঠে আসা ইচ্ছেগুলো সে পথের গড়নদার।

জানলার ওপারে নীল টলটলে আকাশকে রেখে শিল্পী যখন পটের উপর মেঘলা দিনের ছবি আঁকতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মনের গহনলোকে কোনো এক মেঘলা দিনেকে উপলক্ষ করে যে-সব ভাব মিতালি গড়েছিল তাদের আভাসগুলোকে তিনি একটির পর একটি সাজিয়ে দিতে থাকেন তুলিতে কলমে। এই আভাস আবার রসিকমনে অমনি এক ভাবের মিছিলকে জাগিয়ে তুলে রসের ঝরণাধারার নিদমহলে আগল দেয় কেটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুটো ভাবের মাঝে মিল থাকলে মিতালি গড়ে ওঠে, অমিল থাকলেও। তাই দারুণ গরমে আদুর গায়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা যেমন আরেকটি দহনবেলার স্মৃতিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তেমনি তারই পাশাপাশি কড়া শীতের বালাপোশে-মোড়া দিনগুলোকেও মনে এনে ফেলি।

অবশ্য অনেক সময় একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একই কালে শিল্পীমনে দুটি ভিন্ন ভাব জন্ম নেয়। এর কারণ, ঐ বিশেষ মুহূর্তটিতে শিল্পীমনের ওপর জ্ঞান আর অনুভূতির দুমুখো চাপ এসে পড়ে। জ্ঞানের জোরে যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে আচ্ছা করে রাঙিয়ে পিটিয়ে যে-ভাব পাই, ত নেহাৎই কাটখোট্টা, গায়ে তার হিসেবী জগতের লাভ-লোকসানের নামাবলী, যে-নামাবলী রঙে গেরুয়া হলেও ঢঙে চাঁদি আর ছাঁদার পোস্টা। অন্যদিকে, অনুভূতির দরদ মেখে আবেগের চৌর আলোয় যে-ভাব জাগে সে তো রসের আখড়ায় বাউলরাজ, তার হাতে রয়েছে আপনভোল একতারা, যে-একতারা চেনাপাড়ার পথে পথে ঘুরেও সুর তোলে অচিনপুরের। এখন, এই দু পালটা ভাব শিল্পীমনকে নিজের দখলে নেবার জন্যে চাড়িয়ে উঠলেই শিল্পীকে একই সময়ে নজ রাখতে হয় শিল্প-গড়ার দিকে আর রসিকমনে সেই গড়ে-তোলা শিল্পের কদরের দিকে। ফলে, দু ডানার ঘা মেরে শিল্পীমন চলে স্বচ্ছন্দে।

দেবব্রত চক্রবর্

## সংস্কৃত নাটক ও বাংলা মঞ্চ

পৃথিবীর সব দেশেই একটা নাট্য ঐতিহ্য আছে। ইংরাজী ভাষার মঞ্চে এ ঐতিহ্য সেক্সপীয়ার, শেরিডান, শ প্রমুখ ইংরাজী নাট্যকার ও প্রাচীন গ্রীক নাটক, কিছু ফরাসী নাটক, চেকভ, ইবসেন ও ষ্ট্রিণ্ডবার্গের কিছু নাটককে ঘিরে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটক অবশ্য ইউরোপের প্রায় সব দেশে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সব দেশেই অভিনয় হয়। আর কয়টি সার্বজনীন নাট্যকার হলেন সেক্সপীয়ার, চেখভ, মলেয়ার, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, ইবসেন ইত্যাদি। মোটকথা ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে এ নাট্য ঐতিহ্য সজীব ও জঙ্গম। এছাড়াও আছে আঞ্চলিক ঐতিহ্য—ফরাসীদের মধ্যে কর্ণেই ও রাসিন, জার্মানদের গ্যয়টে, শীলের, হাউন্টম্যান এমনি ধরণের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের অংশীদার। পূর্বভূখণ্ডে অবশ্য এধরণের ঐতিহ্য এতটা সক্রিয় নয়। ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে দূর প্রাচ্যাঞ্চল। চীন ও জাপানের নাট্যরীতি—নো, কাবুকি এক সক্রিয় ঐতিহ্যেরই অংশ।

এই সজীব তথা জঙ্গম ঐতিহ্য যেমন সর্বদাই সমকালের বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করে তেমনি এর কালাতীত অংশ সমকালীন চিন্তাকে প্রভাবিত করে। প্রতি যুগ এই সব ঐতিহ্যের দ্বারা যেমন পরিপুষ্ট হয় তেমনি এদের পরিপোষণও করে। নাট্যজগতেও তার ব্যতিক্রম নেই। আজো তাই পশ্চিমী মঞ্চে সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস, অ্যারিস্তোফেনিসের নাটক মঞ্চস্থ হয় সংগে সংগে জঁা আনুইল বা জঁা গিরাদোর মত আধুনিকতম নাট্যকারদের কৃত এ্যান্টিগোর, ইলেক্ট্রো প্রমুখ প্রাচীন কাহিনীর নব রূপায়ণও উপস্থিত করা হয়।

বাংলা মঞ্চে নাটক এসেছে বিদেশজ ঐতিহ্যের অংশস্বরূপ। সেই জন্যই স্বদেশজ ঐতিহ্য এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরকম একটা ধারণা আমাদের নাট্যবিদ তথা নট-নাট্যকারদের মনে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ অবস্থা বাংলা নাট্যশালার প্রথম যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল না গিরিশ-যুগে দেশজ ঐতিহ্য বিদেশী ঐতিহ্যজাত ফ্রেমে আটা থিয়েটারও নাটককে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। গিরিশচন্দ্র থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশী ঐতিহ্য প্রভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষীয়মান হলেও সম্পূর্ণ অদৃশ্য নয়। অবশ্য তাঁর রচনার বিষয়বস্তু স্বদেশজ ঐতিহাসিক কাহিনী হওয়াতেই দেশজ ঐতিহ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী নাট্যকারদের রচনাতেও একই ধারার আভাস পাওয়া যায়।

নাট্যচার্য শিশিরকুমার নাটকের বহিরঙ্গকে যতদূর সম্ভব স্বদেশজ করলেও অভিনয়কলাদির অন্তরঙ্গের বিচারে তাকে বিদেশী ঐতিহ্যের অধিকতর অনুবর্তী করলেন। (শেষ জীবনে সম্ভবতঃ তাঁর প্রচেষ্টার কুফল অনুধাবন করেই তিনি খাঁটি দেশজ রীতি 'যাত্রা'র দিকে ঝুঁকে ছিলেন।) শিশির পরবর্তীদের মধ্যে বিদেশী ঐতিহ্যের অনুসরণ অতি প্রকট হয়ে পড়েছে।

বাংলা নাট্যশালার প্রথম যুগ থেকেই বিদেশী নাটকের অনুসরণ বা অনুকরণ করার প্রবণতা বর্তমান ছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ প্রবণতার সহায়তা করেছেন ম্যাকবেথের বংগানুবাদ করে। (অবশ্য যাঁরা গিরিশচন্দ্রের 'জনা'য় লেডি ম্যাকবেথের প্রভাব দেখেন তাঁদের সংগে একমত হওয়া শক্ত। কারণ ম্যাকবেথকে রাজহত্যায় উত্তেজিত করায় লেডী ম্যাকবেথের প্রচেষ্টা আর পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নীলধ্বজকে জনার উত্তেজনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাচের। বরং পূর্বস্থরী মধুস্থদনের বীরাঙ্গনা কাব্যোক্ত নীলধ্বজের প্রতি জনা পত্রিকার প্রভাব জনায় অপরিসীম, ক্ষেত্র বিশেষে দুই জনার কথায় বিস্ময়কর মিল দেখা যায়।) শিশিরকুমারও বিভিন্ন বিদেশী নাটকের ভাবানুসরণ করে ( যেমন, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত শঙ্খধ্বনি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কৃত দেশবন্ধু এধরণের নাটকের দু'টি দৃষ্টান্ত ) এই প্রবণতাকে শক্তিশালী করেন। বর্তমানে এই প্রবণতাই একমাত্র রীতিতে পর্যবসিত হতে চলেছে।

এধরণের পুনরাবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফল নাট্যস্থষ্টি তথা অভিনয়ের দুর্বলতাও আজ তাই স্থস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিরন্তন কালজয়ী নাটক স্থষ্টির মালমশলা আমাদের চারদিকে অসংখ্য রয়েছে অথচ আমাদের নাট্যকাররা তাকে ঠিকমত উপস্থাপিত করতে পারছেন না। অভিনেতারাও অবিস্মরণীয় কোন চরিত্র স্থষ্টি করতে পারছেন না, যে চরিত্রের আড়ালে তাঁদের স্বকীয় পরিচয় চাপা পড়ে যেতে পারে।

এর কারণ অনুসন্ধানে বেশী দূর যেতে হবে না। আমাদের নাট্যকার তথা নটরা নিজেদের ঐতিহ্যের সংগে স্থষ্টিকে একাত্ম করতে পারছেন না। আর পারছেন না বলেই তাঁদের গড়া বস্তুকে জীবন্ত বলে ভ্রম হচ্ছে না বরং তা যে খড়মাটির পুতুল সামান্য চেষ্টাতেই এ তথ্য স্থস্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

এছাড়াও জগৎ-নাট্য-সভায় ভারতীয় বাংলা নাটকের কোন স্থান নেই। চীনা ও জাপানী নাট্যপরম্পরা যে পশ্চিমী নাট্য ভাবনাকে প্রভাবিত করছে এ তথ্য পশ্চিমী পণ্ডিতদের রচনা থেকে জানা যায়। ভারতীয় নাট্যরীতি সেখানে মূল আসরে জায়গা পায় না। অবশ্য বলা উচিত আধুনিক নাট্যরীতি কারণ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতি ( সংস্কৃত নাটকাবলীতে যা বিধৃত ) সম্বন্ধে পশ্চিমী নাট্যশালার কিছুটা কৌতূহল দেখা যায়। গত ৪।৫ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অন্ততঃ তিনটি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নব রূপায়ণ দেখা গেছে—৪।৫ বছর আগে পূর্ববার্লিনের এক নাট্যশালায় শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের জার্মান ভাষানুবাদ 'বসন্তসেনা মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং গত বছরে নিউইয়র্কে ভাসের স্বপ্ন বাসবদত্তার ইংরাজী অনুবাদ এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলনে'র নৃত্যনাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছে।

অথচ আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটক আজ সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। সংস্কৃত নাটক রচনার নামে কিছু আধুনিক ছেলেখেলার খবর অবশ্য পাওয়া যায় এবং সেগুলি সখের অভিনয় ( সৌখীন না বলার কারণ অপেশাদারী নাট্যশালাও যে কিছুটা চিন্তার খোরাক জোগায় কিন্তু এই সব সংস্কৃত নাট্যাভিনয় থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। ) দর্শকরা অকিঞ্চিতকরতা অনুধাবন করেও প্রশংসা করেন কারণ বিরূপ সমালোচনা করলে তাঁদের সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে কটাক্ষ হতে পারে এই ধরণের নাটক তাই জনসম্বর্ধিত হয়। কেন হয় সে সম্বন্ধে অন্য দেশের এক্ কাহিনী উল্লেখ কা

—এক সময়ে নিউইয়র্কের ইণ্ডিশ থিয়েটারের এক অভিনেতা অন্য একটি নাটকে অভিনয় করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে এবং নাটকটিও প্রচুর ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। অন্য এক প্রযোজক মনে ভাবলেন ইণ্ডিশ থিয়েটারের একজন অভিনেতাকে বাছাই করলে যদি এত লাভ হয় তাহলে পুরো ইণ্ডিশ থিয়েটারকে দিয়ে অভিনয় করালে নিশ্চয় আরো বেশী লাভ হবে। যথা চিন্তা তথা কর্ম, পুরো ইণ্ডিশ থিয়েটারকে চুক্তিবদ্ধ করে তিনি বিশ্রামের জন্য সমুদ্র উপকূলের দিকে রওনা হলেন। ফিরে যখন এলেন অভিনয়ের আর দেরী নেই। কিন্তু মহলা দেখতে গিয়ে মাথায় বাজ পড়ল, নাটকের কিছুই যে বোঝে না ; এ নাটক মঞ্চস্থ হলে সমূহ লোকসান আবার না হলেও তাই। উভয় সঙ্কটের থেকে মুক্তি পাবার জন্য পন্থা নির্ণয়ের জন্য এক বন্ধুকে সমস্যাটা জানালেন। বন্ধু বিবেচক লোক, ভেবেচিন্তে বললেন, তুমি যেমন বোঝনি, অন্যরাও তেমনি বুঝবে না অথচ কথাটা স্বীকার করতে পারবে না ; সুতরাং নাটকটির প্রশংসা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। বন্ধুর কথা অনুযায়ী কাজ করলেন প্রযোজক এবং তাঁর মতানুযায়ী ফলও পেলেন।

এই ধরণের নাটক দেখতে যদি দর্শক সমাগম হয় তো চিরায়ত ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক বা তার বাংলা অনুবাদ দেখতে কেন জনসমাগম হবে না তা বোধগম্য হয় না। আমাদের সংগে যাদের আত্মিক যোগ তারা আমাদের কাছ থেকে সম্মান পায় না বটে কিন্তু পৃথিবীর বহু অগ্রসর দেশে তা মঞ্চস্থ হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। এই নাটকগুলির মধ্যে মৃচ্ছকটিক ছাড়া অন্য কোন সংস্কৃত নাটক স্বল্পকালের মধ্যে কলকাতার মঞ্চে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না।

নিজেদের ঐতিহ্য থেকে নাটককে জারিত করতে হলে সংস্কৃত নাটকের বাংলা রূপ এবং আধুনিক নাট্যকারদের ঐ সব বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটক মঞ্চায়ন অবশ্য কর্তব্য। তবে তা করা হবে এমন প্রত্যাশা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা বরং সোফোক্লিস, সেক্সপীয়ার, মলেয়ার প্রমুখ সুপরিচিত অপরিচিত নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ করে আমাদের আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ উপস্থিত করব, সেকেলে ন্যাষ্টি সংস্কৃতের চর্চা করে নিজের প্রগতিশীলতার বিপরীত সাক্ষ্য কি হাজির করতে পারি ? তবে খাঁটি সাহেবদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র যখন পাওয়া গেছে তখন হয়ত সংস্কৃত নাটকের দুঃখমোচন হতে পারে। তবে বাংলা নাটকের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হলে সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যকে বিদেশজ ঐতিহ্যের সংগে সংশ্লেষিত করতে হবে। তবেই বাঙালীর নাট্যচিন্তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে ও দেশ-বিদেশের নাট্যচিন্তায় তার উপযুক্ত প্রভাব দেখা যাবে। না হলে নাটক চিরদিনই মরশুমী ফুল হয়ে থাকবে, তার ফল আর গৌড়জনকে আনন্দে নিরবধি সুধাপান করাবে না।

রবি মিত্র

## রাজারাওঃ ঃ সর্প ও রজ্জু

এমন একদিন ছিল যখন ভারতীয় সাহিত্যিকেরা ইংরাজীতে লিখে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু সে যুগ বহুকাল কেটে গেছে। এর পরের যুগটা আমাদের স্বজাত্যাভিমানের যুগ—যার প্রভাব কিছু পরিমাণে এখনো বিদ্যমান। এই স্বাজাত্যাভিমানের যুগে, যে সব ভারতীয় লেখকেরা ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষায় অত্মপ্রকাশ করতেন, তাঁদের বেশ একটু সন্দেহের চোখে দেখা হোত। সে ভাবটা আজও আমরা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ফলে প্রায়ই লেখক হিসেবে তাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই।

লেখকের আত্মপ্রকাশের ভাষা কী হবে এ নিয়ে তর্কবিতর্কের অবধি নেই। সবচেয়ে স্বাভাবিক যা তা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। অবশ্য সব নিয়মের মত এর ব্যতিক্রমও প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেও লেখকের সৃষ্টিকে তাঁর সাহিত্যরসের মানদণ্ডেই বিচার করা উচিত—ভাষার মানদণ্ডে নয়। দুঃখের বিষয় এদেশীয় সমালোচক বা পাঠকেরা ঠিক এই পথের অনুবর্তী ন'ন। ফলে এ দেশে আর, কে, নারায়ণ, কমলা মার্কণ্ডেয়, ভবানী ভট্টাচার্য প্রভৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন আজো হয়নি—এবং পাঠকমহলেও তাঁরা সুপরিচিত নন—অন্তত! এঁদের ক্ষমতার অনুপাতে।

এই শ্রেণীর আর একটি লেখকের কথাই আজ বলতে বসেছি। ইনি হচ্ছেন মহীশূরের রাজা রাও। রাজা রাওয়ের রচনা বিদেশে প্রশংসা পেয়েছে প্রচুর। কিন্তু এদেশে এই সেদিন পর্যন্তও তিনি প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর রচনার দিকে আমাদের কিছুটা দৃষ্টি পড়েছে। সেটা মুখ্যতঃ তাঁর সাহিত্য—আকাদমীর পুরস্কার পাবার পর—যদিও রাজা রাওকে এদেশে পরিচিত করায় "ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলির" অবদান স্মরণীয়।

রাজা রাও লেখেন কম—এ পর্য্যন্ত দু'খানা মাত্র উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে "সারপেণ্ট এণ্ড দি রোপ"ই উল্লেখযোগ্য। অধুনা 'ইলাস্‌ট্রেড উইকলির' পাতায় তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক হিসেবে রাজা রাওয়ের বৈশিষ্ট্য হোল তাঁর রচনা বস্তুনির্ভর নয়—তত্ত্ব নির্ভর। 'সারপেণ্ট এণ্ড দি রোপ' বইটির কাহিনীর সূত্রপাত ও পরিণতি গড়ে উঠেছে নায়কের দার্শনিক উপলব্ধির ভিত্তিতে। এ জীবন মায়া না সত্য? সর্প না রজ্জু? এ ধরণের দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নায়কের মন পরিব্যপ্ত। এই আত্ম-জিজ্ঞাসার ক্রমবিকাশ ও পরিণতিই হচ্ছে উপন্যাসটির মূল বক্তব্য। আগেই বলেছি যে উপন্যাসটি ঘটনা নির্ভর নয়। নায়ক রামস্বামীর প্রবাস জীবনের খানিকটা ও দুবার ভারত ভ্রমণ—সাবিত্রীর প্রতি প্রেম ও স্ত্রী ম্যাদেলীনের সংগে বিচ্ছেদ—এই হচ্ছে

কাহিনীর কাঠামো, এই কাঠামোর মধ্যে ছোট মা, সরোজা, জর্জ্জ, ক্যাথারীণা প্রভৃতি আরো নানা চরিত্রের আনাগোনা—ম্যাদেলীন ও সাবিত্রীই এদের মধ্যে প্রাধান্য পাবে যদিও নায়কের আত্মোপলব্ধির পক্ষে এদের কারুর অবদানই কম নয়। তবু বইটি শেষ করে মনে হয় নায়ক যেন এক নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। এতগুলি চরিত্রের অনুভূতি, ভালোবাসা, চিন্তা যেন তাকে স্পর্শ করেও স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়েও যেন নিঃসঙ্গ নয়—কাহিনীর পরিণতিতে সে আত্মোপলব্ধির দিব্যজ্ঞানে ভাস্বর।

"সারপেণ্ট এণ্ড দি রোপ" অনায়াসপাঠ্য উপন্যাস নয়—ভাষার সাবলীলতা, কাব্যিক সুষমা, তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী সত্ত্বেও। এর কারণ এই যে বইটির বহুস্থানেই দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের আত্মবিশ্লেষণ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পাঠকের পক্ষে ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্রগুলি জানা দরকার। বলা বাহুল্য এ কারণেই হয়তো ভবিষ্যতেও রাজা রাওয়ের পাঠক সংখ্যা সীমিত থাকবে। কিন্তু আমার তো মনে হয় এই সব দার্শনিক তর্ক-বিতর্কগুলি ছেঁটে ফেললে উপন্যাসটির মূল বক্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করা যেতো না। আগেই বলেছি যে উপন্যাসটির মূল বক্তব্য নায়কের জীবনের কয়েকটি পরিচ্ছেদের বর্ণনা মাত্র নয়। নায়কের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনোপলব্ধিই উপন্যাসটির মূল বক্তব্য। আর জীবন-জিজ্ঞাসাই কী দর্শনের মূলসূত্র নয়? তাছাড়া বর্তমান শতাব্দীতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছি যেখানে সহজবোধ্যতা বা অনায়াস-পাঠ্যতাকে আর বিশেষ একটি গুণ বলে ধরা হচ্ছে না। অতএব রাজা রাওয়ের পাঠক সংখ্যা সীমিত হতে পারে—এদেশে এবং বিদেশেও তাঁর মর্য্যাদা কিছু মাত্র ম্লান হয়নি।

কিন্তু সুধুমাত্র ভাষার দিক হতে বিচার করতে গেলে এ কথা মানতেই হবে যে লেখকের কাব্যিক প্রকাশভঙ্গীও স্বচ্ছন্দ আলাপন পাঠক চিত্তকে মুগ্ধ করে। বিদেশীর পক্ষে এমন স্বচ্ছন্দ ইংরেজী লেখা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু রাজা রাওয়ের বৈশিষ্ট্য হলো যে বিদেশী ভাষাতেও তিনি আপন ব্যাক্তিত্বের ছাপ ফেলতে পেরেছেন। কী আশ্চর্য ভাবেই না লেখক ভারতীয় চিন্তাধারা, ভারতীয় সমাজ জীবনের খুঁটিনাটিগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করেছেন—অথচ কী কাব্যিক ভাবে। ভারতীয় পরিবেশ ও চিন্তাধারা বর্ণনায় তিনি ইংরেজের মতো ইংরেজী লেখার বৃথা চেষ্টা করেননি পরন্তু পরম দুঃসাহসের সঙ্গে—ইংরাজীর 'ভারতীয় করণে' প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতীয় ইডিয়ামগুলি ইংরাজী কম্পাউণ্ড-ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরণের বাক্য-বন্ধগুলি আশ্চর্য্য পরিমিতভাবে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকু পাঠকের চোখে তুলে ধরেছে। নায়কের বিমাতাকে 'ষ্টেপ মাদার' বলে অভিহিত না করে 'লিটল্ মাদার' (ছোটমা) বলা, দক্ষিণী বাদ্য-যন্ত্র নাগস্বরমের আক্ষরিক অনুবাদ 'সারপেণ্ট-ক্ল্যারিওনেট,' প্রভৃতি এই পরিমিত বোধেরই নিদর্শন।

একটি বিদেশী ভাষাকে এমন দুঃসাহসিক ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন রাজা রাও—তার কারণ হয়তো যে তাঁর দৃষ্টি মুখ্যতঃ বিদেশী পাঠকদের ওপর নিবদ্ধ নয়। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যখন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে—ভারতীয় পটভূমিকার ও ভারতীয় চরিত্র নিয়ে কোন কথাসাহিত্য রচিত হয় তখন লেখকের দৃষ্টি বেশ কিছুটা নিবদ্ধ থাকে বিদেশী পাঠকদের ওপর।

বিদেশী পাঠকদের ভারতের সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা প্রায়ই প্রকট হয়ে পড়ে। কেউবা ভারতীয় দেহকে (সমাজতাত্ত্বিক অর্থে) কেউবা ভারতীয় মানসকে পশ্চিমী পাঠকদের চোখে প্রকট করতে চান। ফলে অনেক সময়েই এ সব রচনা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার, ধর্মীয় বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিবরণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব বর্ণনা কাহিনী বা চরিত্রের রূপায়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। সৃষ্ট চরিত্রগুলিও হয়ে উঠে "টাইপ" চরিত্র—যেন ভারতীয় জীবনের এক একটা দিক রূপায়িত করাই তাদের উদ্দেশ্য। রাজা রাওয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। একথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে তাঁর রচনায় এ ধরণের আনুষ্ঠানিক বিবরণ অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর রচনায় আত্ম-জিজ্ঞাসা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এ দেশীয় পাঠকদের কাছেও ঐ বর্ণনাগুলি নূতন অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে ইলাস্‌ট্রেড্ উইকলিতে প্রকাশিত তাঁর একটি ছোট গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পটির বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি দক্ষিণী পরিবারের দেয়ালীর উৎসবের দিনটি। কাহিনীর নায়ক রামু বালক মাত্র। একটি বালকের সদ্যোভিন্ন স্পর্শকাতর মনে দেয়ালী উৎসবের প্রতিটি খুঁটিনাটি কী তরঙ্গ তোলে তাই এই গল্পটির বিষয়বস্তু। গল্পটি কিছুটা প্রতীকিও বটে—কিন্তু আমার মনে হয় প্রতীক সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত হলেও গল্পটির সৌন্দর্য এতটুকু ব্যাহত হত না।

লেখক হিসাবে রাজা রাও প্রতীকাশ্রয়ী। ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলিতে প্রকাশিত "পুলিশ ম্যান" রচনাটিতে প্রতীকধর্মিতা যথেষ্ট প্রকট। "সারপেণ্ট এণ্ড দি রোপ" এর কাহিনীটিকেও প্রতীকাশ্রয়ী বলা যেতে পারে। রামস্বামীর আত্মজিজ্ঞাসা কী চিরন্তন মানব মনের আত্ম-জিজ্ঞাসারই প্রতীক নয়? কিন্তু কাহিনীটি মূলতঃ প্রতীকাশ্রয়ী হয়েও প্রতীক-সর্ব্বস্ব নয়। এখানেই রাজা রাওয়ের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ প্রতীকধর্মিতা প্রাচ্য মনেরই বৈশিষ্ট্য। আর রাজা রাওয়ের লেখায়ও এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর ব্যবহৃত প্রতীকগুলি মূলতঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী—তাই রচনার অর্থবোধ বা রসগ্রহণে বাধা জন্মায় না—বরঞ্চ বহুক্ষেত্রেই রচনায় আশ্চর্য পরিমিতি দান করে।

বস্তুতঃ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অপরিসীম। অবশ্য এখানে ঐতিহ্য অর্থে গত যুগের সমাজ ব্যবস্থা বা তদাশ্রয়ী চিন্তাধারাকে বোঝাচ্ছি না। এই ঐতিহ্য প্রাচীন ভারতের দর্শন ধর্ম ও সংস্কৃতির যোগফল। "সারপেণ্ট এণ্ড দি রোপ"এর নায়ক রামস্বামীর কাছে তাই "ভারতবর্ষ" একটি বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালে আবদ্ধ নেই—সেই ভারতবর্ষ একটি চিরন্তন আইডিয়া। পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুকনা কেন রামস্বামী তাই কখনো প্রবাসী নয়—তার নিজের মনেই গয়া গঙ্গা কাশী বিধৃত। প্রেমের চরিতার্থতা একাত্ম বোধে নায়কেয় এই অনুভূতি ও একান্তভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাশ্রয়ী। সাবিত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদে রামস্বামী তাই কাতর নয়—কারণ সাবিত্রী তো তার নিজের সত্তার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে লীন হয়ে আছে। উপন্যাসটির পরিণতিতে রাজা রাওয়ের ঐতিহ্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। রামস্বামীর আত্মজিজ্ঞাসার পরিণতি সহসালব্ধ—দিব্যজ্ঞানে (যদিও, কোন গুরুর কায়িক উপস্থিতির কথা উল্লেখ নেই কাহিনীতে)। সেই জ্ঞানের আলোয় সকল তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়, সকল অন্ধকার ভাস্বর হয়ে ওঠে। অনেকে

উপন্যাসটির এই পরিণতিকে 'আকস্মিক' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ধরণের আত্মোপলব্ধি মূলতঃই আকস্মিক, কারণ ভারতীয় অর্থে দিব্যজ্ঞান ঘটে হঠাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তে। এই দিব্যজ্ঞান একটি ক্রমিক অবস্থা নয় এবং এর পূর্বমুহূর্তটিও অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত। রামস্বামীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই পরিণতি অনেক সংশয়ী পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে—কিন্তু সে হচ্ছে মতবাদের কথা।

কিন্তু লেখক হিসাবে রাজা রাওয়ের 'ক্রীড' বা তাঁর দার্শনিক মতবাদ যাই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর মত শক্তিশালী লেখক এদেশে বর্তমানে খুব কমই দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রকাশিত কথাসাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করছি। তদুপরি তিনি শুধু শক্তিমান লেখকই নন—চিন্তাধারার দিক দিয়েও বিশিষ্ট। যখন দৈনন্দিন জীবন সমস্যা নিয়ে সেন্টিমেণ্ট-ভারাক্রান্ত কাহিনী অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অসুস্থ মানবমনের ব্যবচ্ছেদই কথাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রাজা রাওয়ের বুদ্ধিরাশ্রয়ী রচনা নতুন পথের দিগ্‌দর্শক। রাজা রাওয়ের আবির্ভাবে ও তাঁর সাম্প্রতিক সমাদরকে তাই স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি প্রচলিত অর্থে জনাপ্রিয় হোন আর নাই হোন সাহিত্যের চিরকালীন দরবারে তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে রইলো।

**মীরা বালসুব্রমনিয়ন**

**কয়েকটি কবিতা ও একটি গল্প।** কুমার রায়। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা। দাম তিন টাকা।।

পঞ্চাশ দশকের কবি কুমার রায় কবিমহলে পরিচিত হলেও পাঠক মহলে বিশেষ পরিচিত নন। অথচ তিনি যে একজন সত্যিকারের কবি এ সত্যও উৎসাহী পাঠকের অজানা নয়। তাঁর কবিতার ভাষায় চমৎকারিত্ব বা যাদু রয়েছে, সেজন্য তিনি প্রথম থেকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; কিন্তু বারংবার পাঠান্তে তাঁর চিন্তাশীল মনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটা সম্ভব। তাঁর অধুনা প্রকাশিত "কয়েকটি কবিতা ও একটি গল্প" অপূর্ব ভাষার ব্যবহার ও ছন্দের প্রয়োগের জন্য সমালোচকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। তিনি এমন এক পৃথিবীর অধিবাসী যে পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণভাবে কবির নিজস্ব। এখানেই হয়তো চল্লিশ দশকের বাঙ্গালী কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। চল্লিশ দশকের কবির সমাজচেতন মনে বৃহত্তর পৃথিবীর সমস্যা, আশা-নিরাশাই গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাঁরা আত্মবিস্মৃত ছিলেন না, সমাজ সম্বন্ধে অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন। কুমার রায় আত্মকেন্দ্রিক। প্রেম তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। প্রেম তাঁকে সমাজচ্যুত করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রেমের ব্যথা-আনন্দকে কেন্দ্র করে সে সমস্যা তিনি ভুলতে পারেননি। পথ ভুলে কবিতায় তিনি বলেছেন—

"এসেছিলাম পথ ভুলে যে,<br>
কোনো কথাই বললে না।<br>
ঘরের কোনে ব্যস্ত ছিলে কাজে।"

কবি ব্যথিত, প্রেমে মানুষ মাত্রেই কিঞ্চিত আশাবাদী। ব্রাউনিং-এর ব্যর্থ প্রেমিকের মতো তাই তিনিও আশা করেন—

"স্বপ্নে যদি আসি, তখন<br>
আমার উপস্থিতি<br>
ঘুম ভাঙ্গাবে দুঃখে সুখে কি ?"

প্রেমিকার কাছে প্রেমিকা কখনও একইভাবে উপস্থিত নন। তাই কখনও কবি বলেন—

"যখন আমি অবাক হ'য়ে চলার ঠাট দেখি<br>
( গজগমন একেই বলে নাকি ? )<br>
রূপের ধাঁধাঁ চোখে লাগে<br>
অন্ধকার দেখি।" ( পূর্বরাগ )

আবার কখনও বা—

"ভুলি নি !
ধূলোয় ধোঁয়ায় আলোয় ছায়ায়
রেলিঙে হেলানো তুমি—
ভুলি নি ॥" ( ভুলি নি )

কিন্তু প্রেমে রয়েছে জ্বালা—সন্দেহের জ্বালা। তাই কবি প্রেয়সীকে যাচাই করে নিতেও ভোলেন না—

"ঘোমটাখানি তোলো
দেখবো কালো চোখের জলে
আমার ছায়া কাঁপছে নাকি কোনো।" ( সন্দেহ )

সন্দেহ তাঁকে নিষ্ঠুর করেছে। ওথেলোর মতো তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডী সন্দেহ থেকে উদ্ভূত। নারীর প্রেমের মূল্য দিতে তিনি যে কার্পণ্য দেখান তার জন্য অনুতাপের অভাব নেই। ওথেলোর শেষ কান্নার মতো হাহাকারে ভেঙে প'ড়ে তিনিও বললেন—

জলের মতো চিকন তার হাসি।
সাদা থানের অথৈ রূপে ভেসে
নিরালা দিনে আমাকে বলেছিলো :
কোথায় যাও ? সঙ্গে নিয়ে চলো।
চোখের জল মুছিয়ে বললাম :
বকুল, তুমি কতোকালের বাসি।
আর্তনাদে ধরণী দ্বিধা হ'লো ॥" ( উপযাচিকা )

কুমার রায় রোমান্টিক কবি। শেলীর মতো প্রেমকে তিনি চিনেছেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো চিনেছেন প্রকৃতিকে। সংকলনের প্রথম কবিতাতেই তিনি বাতাসের গান শোনাবার জন্য ব্যকুলতা প্রকাশ করেছেন—

"নির্জন নিশ্চুপ পোড়োবাড়ি।
বাতাস বইছে ঘুরে-ঘুরে, নিরালা, সুরেলা মনে।
কোথাও জানালা লুটিয়ে পড়লো,
দরজা খুলে দিলো অন্ধকার কুটুরি।
বাতাস ঘুরে বেড়ায় ঘরে-ঘরে।
কতো কথা সে বলতে চায়—
আমি তার ভাষা কিছুটা বুঝেছিলাম।" ( যদি )

ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের মতো তিনিও বাতাসের কথা কান পেতে শুনতে চেয়েছেন।

ইংল্যাণ্ডের যেমন প্রি-র‍্যাফেয়ালাইট কবিরা চিত্রসৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি দক্ষতা এই কবিরও রয়েছে। পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, মানুষকে তিনি যেভাবে দেখেছেন ঠিক সেইভাবেই ভাষার মাধ্যমে তাঁদের ছবিও তিনি এঁকেছেন। "জেরবার" কবিতায় ছবি আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন—

"আসরের ঘুঙুর পায়ে নামিয়েছিলো। পরণে ছিলো
জাফরাণ শাড়ি। চেয়ে ছিল দামাস্কাসের ছোরা,
ডুবছে গোলাপজলে কালো পাথরের বাটিতে।
বুকে দুলছে চুমকিকাজের কারিগরি। কণ্ঠে নিরাভরণ বিদ্যুৎ।
কোমরে হাত দিয়ে যখন হাসলো,
দেখলাম হাসির লুকোচুরি কণ্ঠনালিতে।
দীপমালার মতো জ্বলে উঠলো শরীরে প্রথম ঝাঁকুনি।
শুরু হ'লো নৃত্যের তাল।"

এই চিত্রকল্পের সার্থক রূপ প্রকাশিত হয়েছে "ইন্দ্রজাল" কবিতায়, সেখানে তিনি প্রতীকের সাহায্যে বাংলামায়ের ছবি এঁকেছেন—

"কাকবধূ ডাকলো। অজস্র কাক সাড়া দিলো।
মানুষ তখন ঘুমিয়ে
ওরা তৈরী করলো নতুন ভোর, মোমের মতো রঙ,
ছেলে-ভুলনো জ্যোৎস্নার রূপোর ছড়ায়।
বিকিয়ে দিলো দুটো কথা বলবার, ভালোবাসবার
চেনাশোনা অন্ধকার।"

প্রেম নয়, চিত্রকল্প নয়, প্রতীকের সার্থক ব্যবহারই কবিকে মহত্তের পর্য্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

সংকলনে কবি কয়েকটি সনেট ও দুটি নাট্যকবিতার স্থান দিয়েছেন। প্রাচীন ইতালীয় ও আধুনিক সেকস্‌পীয়রীয় ঢংয়ে লেখা সনেটগুলির মধ্যে "পুনশ্চ," "প্রত্যাবর্তন," "দম্ভ" ইত্যাদি সুলিখিত, কিন্তু "প্রেম" নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

যে দুটি কাব্যনাটিকা সংকলনে স্থান পেয়েছে তাও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। উভয়ই সুলিখিত ও আধুনিক কাব্যের পাঠকের মন আকর্ষণ করে। ভাবের গাম্ভীর্য অডেনের কাব্যনাটিকার বিশেষ করে On the Frontier এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

"শেষ দৃশ্য"-এর নায়ক রজত ও নায়িকা অমিতার কথোপকথন কাব্যমাধুর্যে সত্যিই অপূর্ব।

রজত ॥　　　আমি নই তোমার শিকার।
　　　　　　তর্ক থাক! আজ তবে আসি—

অমিতা ॥　　ফেলে রেখে নিঃসঙ্গ একাকী—
　　　　　　খেলাচ্ছলে ভেঙ্গেছো যা? নষ্ট করে কুমারীর অহংকার আর—
　　　　　　রাতের বিশ্রাম?—সুখ পেলে?

রজত ॥　　　জন্মেছি যখন বাঁচা প্রয়োজন হেসে-খেলে।
　　　　　　তাই হাসি তাই খেলা তাই সুখ।
　　　　　　রঙীন পুতুল নিয়ে হাসি ও মস্করা, ঠাট্টার বিভ্রাট
　　　　　　স্বাভাবিক, অতি স্বাভাবিক। আমি নই পৃথিবী কামুক:
　　　　　　আমি তুচ্ছ বিদূষক, পৃথিবী সম্রাট।

অমিতা ॥　　আর আমি রঙীন পুতুল,

রজত ॥　　　যা নষ্ট শুধুই, এবং ভঙ্গুর॥"

পরিশেষে কবির বিরুদ্ধে এক অভিযোগ পেশ করছি। কবি শক্তিশালী নিঃসন্দেহে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ ক'রে এ কথাই বারবার মনে হয়েছে যে কবির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমিত। দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি কাব্যচর্চা করছেন, কিন্তু সমাজচেতন পাঠকের তৃপ্তির কোনও চেষ্টা কবির মধ্যে আমরা খুঁজে পাইনি। আমরা আশা করবো, কবি এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করবেন ও সমস্যাসংকুল পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ মানুষকে সৌন্দর্যের আর নির্মলতার পথ দেখাবেন॥

**রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**

**কথাসাহিত্য:** শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। কন্‌টেমপোরারী পাব্লিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২৬। দাম পাঁচ টাকা।

কথাসাহিত্যপ্রসঙ্গে বাংলাদেশে যে পরিমাণ আগ্রহ, কথাসাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে সে পরিমাণ মননপ্রচেষ্টা আজও দেখা দেয় নি। তার কারণ সামগ্রিকভাবে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের অপূর্ণতা হলেও বাংলা কথাসাহিত্যের শিল্পীরাও অনেক পরিমাণে দায়ী। আজ অবধি বাংলা কথাসাহিত্য পাঠকগোষ্ঠীর কাহিনীক্ষুধা নিবারণের দিকেই বেশী মন দিয়েছে, জীবনের শাশ্বত

মূল্যের অনুসন্ধানী হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রে। শিক্ষিতের শতকরা হার বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক 'সহৃদয়তা' লাভ করেছেন, এমন শিক্ষিত ( যে শিক্ষা আপন মননের বিদ্যালয়েই হওয়া সম্ভব ) আমাদের সমাজে বিশেষ বাড়েনি। সুতরাং অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন রঙ্গমঞ্চবিলাস, কাহিনীর ক্ষেত্রেও তেমনি পৃষ্ঠাসংখ্যা, প্রচ্ছদপট ও মূল্যবিলাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের পক্ষে যতটা সহায়ক হয়েছে, পরিশীলিত রসজ্ঞানের পক্ষে সে পরিমাণ হতাশার সৃষ্টি করেছে। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'কথাসাহিত্য' গ্রন্থে কথাসাহিত্যের মননভূমি সম্বন্ধে পাঠকচিত্তকে সজাগ করতে চেয়েছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আঠারো শতকের ইংরেজীসাহিত্যের মননভূমিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের যে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল, তার ফলেই উপকথা থেকে উপন্যাসের জন্মান্তর। উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যথার্থ উপন্যাসের জন্ম—তার আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের দীর্ঘপ্রস্তুতি। গল্পভূক মানবজাতির সাবালকত্বের নিদর্শন হলো, হাল আমলের উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুটিই নবযুগের সচেতন শিল্প। এসব দিক থেকে বিচার ক'রে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে অনন্য এবং অনতিক্রান্ত স্থানের অধিকারী এ বিষয়ে শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। বঙ্কিমের প্রচারকসত্তা তাঁর শিল্পসত্তাকে আচ্ছন্ন করেনি, শ্রীচৌধুরীর এ অভিমতও সাধুবাদের যোগ্য।

তবু মনে হয় বঙ্কিমের জাতীয় নেতৃত্বশক্তি ও সাহিত্যসাধনা—এ দুটিকে তিনি একাকার করে ফেলে বাংলা উপন্যাসের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কিছু অসংলগ্ন মন্তব্যও করেছেন, যা প্রতিবাদযোগ্য। অবশ্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই ধরণের ঘোষণা করেছেন—'বাঙ্গালী জাতি এইভাবে জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত কেবল কামকবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্বল, কর্মহীন কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী ; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্খা বাঙ্গালী সাহিত্যে স্থান পায় নাই'। এ মতবাদেরই অনুসরণে শ্রীচৌধুরী বঙ্কিমপরবর্তী রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যের ভাবালুতার আতিশয্যকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির সংজ্ঞা কি? বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে দেশ ও জাতির বলিষ্ঠতাসাধনে কিছু কম আগ্রহী ছিলেন তেমন কোন প্রমাণ আছে কি? নবীনচন্দ্র তো বঙ্কিমের উপন্যাস পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্র বসে পড়া যায় না ব'লে হতাশ হয়েছিলেন। বঙ্কিম আমাদের পূর্বতন জাতীয় ঐতিহ্যকে ভেঙেছেন, মহাকাব্যের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী না হয়ে বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবল স্খলনপতনের প্রতীক হয়ে উঠেছে এজন্য নবীনচন্দ্রসমেত অনেক আদর্শবাদীই বঙ্কিমচন্দ্রেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। আদর্শ জীবন যাপন এবং আদর্শ সাহিত্যসৃষ্টি এক কথা নয়। সে কথা মনে রেখেই উপন্যাস এবং যাবতীয় সাহিত্যের বিচার করতে হবে। জয়দেবের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল অবধি বাংলা সাহিত্যে যে হৃদয়ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে তাকে নিছক কামসাহিত্য হিসাবে দেখলে বঙ্কিমের উপন্যাসও তার থেকে বাদ পড়ে না। অপরপক্ষে বাংলা মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীসাহিত্য বা শক্তিপদাবলীর মূল সুর

শৃঙ্গার নয়, একথাও স্মরণীয়।

'উপন্যাসের প্রকৃতিবিচার' প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি আজও প্রযোজ্য হ'লেও গোড়ার 'কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত—"রসবুদ্ধির সঙ্গে মনীষার সমন্বয় না ঘটলে যে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস তৈরী হয় না, আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ।" এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর, দিলীপকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর লেখকদের উপন্যাস ও গল্প সম্বন্ধে শ্রী চৌধুরীর বিস্তৃত আলোচনা খুবই প্রত্যাশিত ছিল। মনীষা ও রসবোধের সংমিশ্রণ হিসাবে এঁদের কথাসাহিত্য প্রয়াস নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র 'কথাসাহিত্য' বইটি জুড়েই বিশ্লেষণাত্মক রীতির বদলে স্বয়ংসিদ্ধ মন্তব্যের প্রাধান্য। কিন্তু এ ধরণের মন্তব্যপ্রাধান্যের দ্বারা সব সময় বক্তব্যের গভীরতা প্রমাণিত হয় না। 'গোড়া' উপন্যাসের মহিমা সম্বন্ধে লেখকের শ্রদ্ধা যতখানি, সে শ্রদ্ধার কারণ ব্যাখ্যায় উপন্যাসটির সামগ্রিক বিশ্লেষণ ততোখানি নয়। আবার কেন যে তিনি ফ্লবেয়ার, জোলা, প্রুস্ত, সার্তর, কামুকে—থ্যাকারে, ডিকেন্স, হার্ডি, ডস্টয়ভস্কির তুলনায় 'চোখ-ধাঁধানো আর জৌলুসময়' মাত্র মনে করেন, সেকথাও স্পষ্ট নয়। ('বিমর্ষ সাহিত্য'-দ্রষ্টব্য।) মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যদি কমে যায়, তাহলে ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের উপকথাস্থূলরূপেই কি আমাদের পক্ষে খুশী হওয়া সম্ভব হবে? বিভূতিভূষণের 'সারল্য' তাঁর উপন্যাসের পক্ষে অন্তরায়ই হয়েছে, তারাশঙ্কর [ বছর দশেক আগে অবধি ] আর যাই হোক জীবনের সরলরূপ এঁকেছেন বলে মনে হয় না?

ছোটগল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'ছোটগল্প' প্রবন্ধে লেখকের মন্তব্য—"পুরাতন কালের মহাকাব্য ভেঙে যেমন আধুনিক গীতিকবিতা হয়েছে তেমনি আকারও আয়তনে ভারী পুরাতন কাহিনীর আদর্শ ভেঙে আধুনিক ছোট গল্প হয়েছে।" বলাবাহুল্য গীতিকাব্য ও ছোটগল্পের সূচনা সম্বন্ধে এমন অনৈতিহাসিক সংজ্ঞা হতেই পারে না। এই জাতীয় আরো দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে মনে হয় লেখক চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু দ্রুত পদচারণা করে গেছেন। তুলনামূলক সাহিত্যশিক্ষা এবং বিশ্লেষণমূলক রসাস্বাদনে আরো স্থিতপ্রজ্ঞ মন নিয়ে অগ্রসর হলে 'কথাসাহিত্য' সাহিত্যিক পূর্ণতা লাভ করত।

এদিক থেকে 'মৌলিকতার বিচার' প্রবন্ধটিতে সৃজনশীল ও মননশীল দু'ধরণের সাহিত্যেরই মৌলিকতা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শ্রী চৌধুরী তাঁর সাহিত্যব্রত অনেক সার্থকভাবে উদ্‌যাপন করেছেন। একথা সত্য যে, "আমাদের অধিকাংশেরই মনোযোগ তথাকথিত সৃজনধর্মী রচনার উপর অনুপাত-অতিরিক্তভাবে ন্যস্ত রয়েছে। প্রবন্ধ নিবন্ধ সন্দর্ভ সমালোচনা অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য রচনায় যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা তাঁরা পাচ্ছেন না।"

বস্তিসাহিত্য, সাহিত্যে বাস্তবাবাদ, কথাসাহিত্য ও দেহবাদ—প্রবন্ধগুলিতে শ্রীচৌধুরীর সাহিত্যিক সুচিতা রক্ষার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশিত হলেও সাম্প্রতিক লেখকদের দেহবাদের গভীরেও যে জীবনানুভবের পরম সত্য প্রকাশ পায় এবং প্রচলিত শুচিবাতিক লঙ্ঘন করেও সাহিত্যের প্রাণবস্তু আরো সজীব হয়ে উঠতে পারে—সেকথা একটু জোর করেই অস্বীকৃত।

কল্লোল-গোষ্ঠীর আপাতবিদ্রোহের বিপক্ষে 'শনিবারের চিঠি' যে তীব্র ব্যঙ্গ ও কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিল, অতি আধুনিকদের যথেচ্ছাচার সম্বন্ধে সে ধরণের প্রতিবাদ আজ আর নানা কারণে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্য সমালোচকদের গভীরতর রসবোধই এক্ষেত্রে যথার্থ পথনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। 'কথাসাহিত্য' সে দাবী পূরণ করতে না পারলেও শ্রী চৌধুরীর আদর্শবাদ অবশ্য শ্রদ্ধার্হ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 November'64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

অপরূপ
কেশবতী মহিলাটিকেই
জিজ্ঞেস করুন...
উনিই বলে দেবেন টাটার হেয়ার অয়েল মেখেই ওঁর চুলের
গোছা অমন সুন্দর হয়ে উঠেছে! টাটার হেয়ার অয়েল
• মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে
• চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম
টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল—৪টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর
হেয়ার অয়েল—গোলাপের সুরভিযুক্ত। ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
THOY-47BEN

# ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুন
# ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন

"কোন বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে কোন অংশের মনোভাব যত কঠোরই হোক না কেন, দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের কোন সময়েই এই কথাটা ভোলা উচিত নয় যে, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তাঁরা ভারতীয় এবং এক জাতি এক দেশ এই অপরিবর্ত্তনীয় কাঠামোর মধ্যেই সমস্ত বিরোধ ও বিভেদের মীমাংসা করতে হবে। এই একতার মনোভাব ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য, আসুন আমরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি।"

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
প্রধান মন্ত্রী

---

**আমাদের লক্ষ্য সোজা ও পরিস্কার—সকলের জন্য স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত ক'রে শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলাই হ'ল আমাদের লক্ষ্য।**
**চলুন আমরা একসঙ্গে এগিয়ে চলি, সহিষ্ণুতা, সাহস, সংকল্প ও শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি জাতি হিসেবে কাজ করি।**

---

ঐক্যবদ্ধ থাকুন, স্বাধীনতা অটুট রাখুন

DA 64 F7 (বাংলা)

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিক্যুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

# সুলেখা

স্পেশাল

ফাউণ্টেন পেনের

## কালি

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এবং ৩০, ৬০, ১২০ ৩৫০ ও ৭০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

PRO/S

# কিরণ

## যেমন উজ্জ্বল তেমনি দীর্ঘায়ু

KIRON

কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : **ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ**

১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

এজেণ্ট : **দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ**

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর
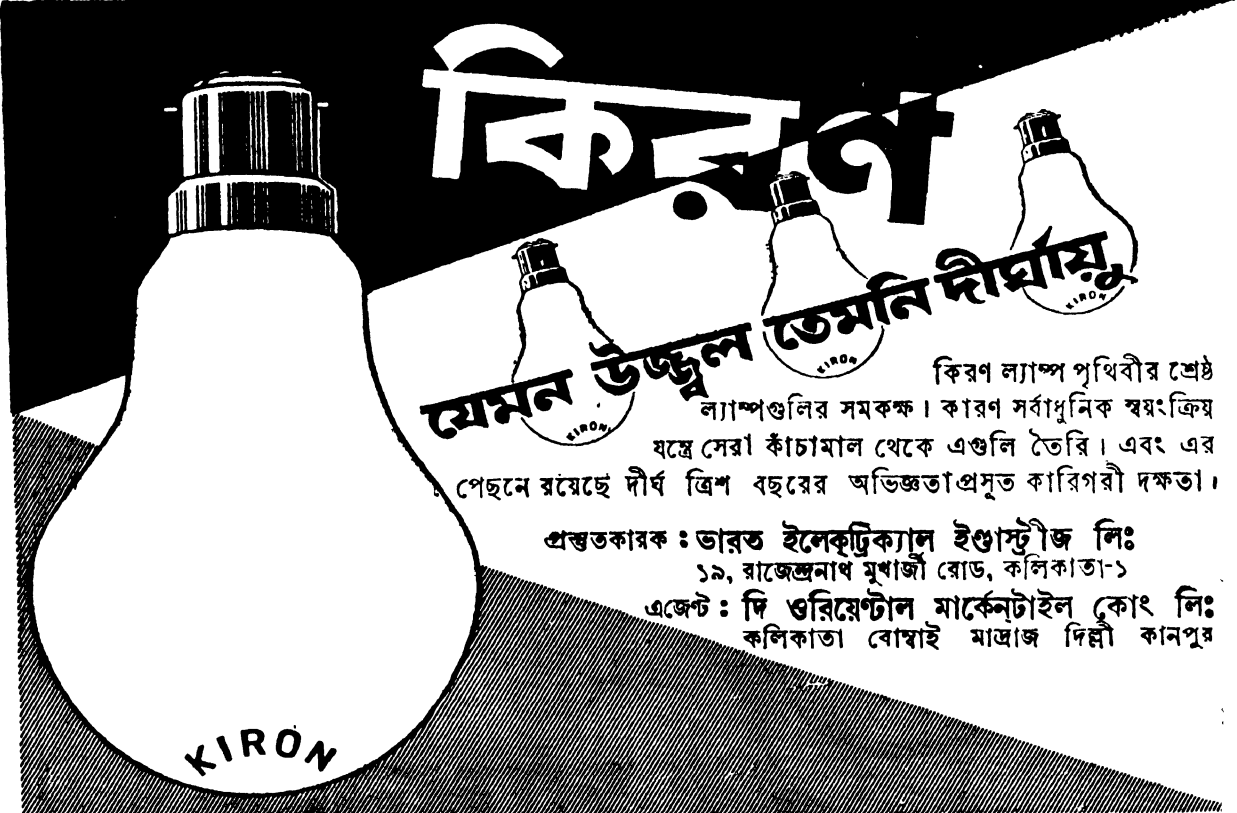
## সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

দ্বাদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' একাত্তর

# সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

# প্রবোধচন্দ্র বাগচী

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলার শ্রীকোল গ্রামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল হরিনাথ বাগচী। প্রবোধচন্দ্র শৈশবেই মাতৃহীন হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরই প্রবোধচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ হইতেই সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবোধচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই গণিতের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সংস্কৃত অনার্স পড়া আরম্ভ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এম. এ. পড়িবার জন্য প্রবিষ্ট হন। এই বিভাগের ছাত্ররূপে তিনি বিভাগীয় অধ্যক্ষ (কারমাইকেল অধ্যাপক) ডাঃ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর বিশেষ স্নেহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষা-নায়ক সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদিগকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহাদিগকে অধিকতর জ্ঞান সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করিতে তিনি সর্বদাই উন্মুখ থাকিতেন। প্রবোধচন্দ্র ছাত্ররূপেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ তরুণ প্রবোধচন্দ্রকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

প্রাচীন ভারতের সহিত চীন দেশের নিবিড় সম্পর্কের কথা আশুতোষের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় জ্ঞান অপরিহার্য, এই জন্য তিনি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুদিন পর ছাত্রের অভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা শিক্ষাদান ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ সিল্‌ভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে আসিলে তথায় চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। সার আশুতোষের ইচ্ছাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবোধচন্দ্রকে ডাঃ লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী শিক্ষা করিতে পাঠানো হয়। মেধাবী প্রবোধচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই লেভির অতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়া পড়েন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র লেভির সহিত নেপাল গমন করেন এবং নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায় বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ ও গবেষণার সুযোগ লাভ করেন। এই বৎসরই গবেষণার জন্য উপাদান আহরণার্থে প্রবোধচন্দ্র গুরু লেভির সহিত কম্বোডিয়া ( কম্বোজ ), ভিয়েট্‌নাম ( আনাম ), কোচিন চীন ( চম্পা ) ও জাপান ভ্রমণ করেন। দূর প্রাচ্য ভ্রমণের পর প্রবোধচন্দ্র ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেভি ও পল পেলিওর নিকট অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত হন। এইজন্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় (Rash Bihari Ghose Travelling Fellowship)

ভারতবিদ্যা চর্চার জন্য প্রবোধচন্দ্রের প্যারিস গমন ও অধ্যয়নের সবিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুপ্রাচীন কালে মধ্যএশিয়া, চীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস রচনায় ঐ সব দেশের সাহিত্য এবং পুরাকীর্তির অধ্যয়ন ও পর্যালোচনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম ইউরোপীয় বিশেষতঃ ফরাসী পণ্ডিতদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনা ভাষার সূত্র হইতে প্রাচীন কালে মধ্য এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে Deguignes নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত গবেষণা আরম্ভ করেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দানের জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চীনা ভাষা শিক্ষাদানের জন্যও একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্ট হয়, Abec Rmusat নামে চীন-বিদ্ ফরাসী পণ্ডিত এই পদ লাভ করেন। চীনা ভাষা হইতে ফা-হিয়ানের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তটি ইনি ফরাসী ভাষায় অনুদিত করেন। Ramusat এর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত Stanilus Julionও চীন সূত্র হইতে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা উপাদান আহরণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রসিদ্ধ ভারত-বিদ্ বুর্নুফও উপলব্ধি করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা করিতে হইলে চীনা ও তিব্বতী ভাষার সূত্র হইতেও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস রচনা কালে বুর্নুফ চীন-বিদ্ পূর্বসূরী Deguignes ও Abel Ramusat এর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির সদ্ব্যবহার করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বর্নুফের অকাল মৃত্যুর পর College de France-এ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত Foucause তাঁহার অধীনে তিব্বতী ভাষা শিক্ষাদান ও তিব্বতী

ভাষার চর্চারও সুব্যবস্থা করেন। ইনি নিজে তিব্বতী ভাষায় লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ইঁহার সহযোগী পণ্ডিত Leon Feer পালি, চৈনিক, তিব্বতী ও মঙ্গোলি ভাষায় লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্যারিসের Ecole des Hautes Etu des নামক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক Abel Bargaigne নামে এক ফরাসী পণ্ডিত বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিতেন। ইন্দোচীন হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করিতে তিনি ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময়েই মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ফরাসী পণ্ডিত এমিল সেনারও (Emile Senart) সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি কলেজ-দ্য-ফ্রঁতে সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি অধ্যাপক Bergaigne এর শিষ্য। গুরুর প্রদর্শিত পথে ইনিও বহির্ভারতে ভারত সভ্যতার দিগ্বিজয় সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হন। বৃহত্তর ভারতে ভারত সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধীয় গবেষণায় লেভির সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে Alfred Foncher, Louis Finot, Antoine Millet, Paul Pelliot প্রভৃতি পণ্ডিতদের নামও উল্লেখযোগ্য। মধ্য এশিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের সাক্ষ্য স্বরূপ বহু পুঁথি, শিলালেখ প্রভৃতি উপকরণও প্যারিসে রক্ষিত ছিল। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়াই প্রবোধচন্দ্রের প্যারিসে অধ্যয়নের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্যারিসে প্রধানতঃ লেভির ও অন্যান্য ভারতবিদ্ পণ্ডিতদের নিকট প্রবোধচন্দ্র তিব্বতী-চীনাভাষা এবং এই দুই ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল গবেষণা ও অধ্যয়নান্তর তিনি দুইখানি চৈনিক-সংস্কৃত অভিধান•সম্পাদন করেন (১) ও চৈনিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন (২) এই অভিধানদ্বয় এবং নিবন্ধটি গবেষণা (Thesis) রূপে প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা হইলে প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবোধচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিষয়ের সর্বোচ্চ 'সাহিত্যচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন (Docteur es letters)। এই দুইখানি অভিধান ও নিবন্ধটি পুস্তকরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবোধচন্দ্র সমগ্র বিশ্বের ভারতবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীতে একটি বিশেষ সম্মানিত স্থান লাভ করেন। খৃষ্ট জন্মের পূর্বকাল হইতেই মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রথম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে চীন দেশের হান বংশীয় সম্রাটদের রাজধানী সি-নান-ফু (Si ngan fue)-তে উপনীত হন এবং সেখানে প্রথম বৌদ্ধমঠ স্থাপন করেন। এই দুই বৌদ্ধ পরিব্রাজক ত্রিপিটক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্নের পরও খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে গমন করেন এবং ফা-হিয়ান্, হিউয়েন চ্যাঙ্, ই-সিং প্রভৃতি বহু চীন দেশীয় পণ্ডিত এদেশে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য আগমন করেন। এই যাতায়াতের ফলে সংস্কৃত পালি বা প্রাকৃত হইতে বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়া যায়। কালক্রমে অনূদিত বহু পুস্তকের মূল সংস্কৃত বা পালিরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে চীনা অনুবাদের সূত্র হইতেই মূল পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু বা মর্মার্থ অবগত হওয়া যাইতে পারে। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার Le Canon Boudhique en-China

নামক গবেষণা নিবন্ধগ্রন্থে সংস্কৃত বা পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির চীনা অনুবাদে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেন, এই গ্রন্থে সহস্রাধিক চৈনিক অনুবাদগ্রন্থের অনুবাদ কাল নির্ণয় করা হয় এবং ইহাতে অনুবাদগ্রন্থের বিশদ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়। প্রাচীনকালে চীনা পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য সযত্নে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ কার্যের সুবিধার্থ চীনা পণ্ডিতরা অভিধান রচনায়ও মনোনিবেশ করেন। এইরূপ দুইটি সংস্কৃত-চীনা অভিধান ফরাসী ভাষায় টিকা টিপ্পনী সহ প্রবোধচন্দ্র সম্পাদন করিয়া প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্ অর্জন করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্বপদে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপনা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের সহিতও যুক্ত ছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র পণ্ডিত Jean Przylnski, Jules Bloch ও Sylvain Levi কর্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের সহিত প্রবোধচন্দ্রের একটি ভূমিকা ও আর্যগোষ্ঠীর ভাষায় 'অস্ট্রীক্' শব্দ সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয় (৩)।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র দ্বিতীয় বারের জন্য নেপাল গমন করেন এবং নেপাল হইতে বহু মূল্যবান পুঁথি উদ্ধার করিয়া আনেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নাথ সম্প্রদায়ের কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থের একটি পুঁথি ইহাদের অন্যতম। এই সংস্কৃত গ্রন্থটি তিনি টিকা, টিপ্পনী ও ভূমিকাসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৪)। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে অপভ্রংশে লিখিত ধর্মমূলক কতকগুলি পদ সমন্বিত একটি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উহা "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামে প্রকাশিত হয়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে এই 'চর্যাপদ'গুলি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। এইবার প্রবোধচন্দ্র নেপাল হইতে এই চর্যাপদগুলির তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে এই 'চর্যাপদ'গুলির শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করেন ও ইহাদের মূল পাঠ, ব্যাখ্যা ও ভূমিকা সহ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন (৫-৭)। বাংলা ভাষারপ্রাচীনতম রূপ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের এই গবেষণা ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের বিচারে অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র লিখিত একটি গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হয় (৮)। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে চীন ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন (৯)। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রই প্রথম চীন-ভারত সম্পর্কের অতীত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান হন। তাঁহার রচনা হইতেই জানা যায় যে চীন প্রাচীন ভারত হইতে শুধু বৌদ্ধধর্মই লাভ করে নাই, বৌদ্ধদর্শন ব্যতীতও অন্য ভারতীয় দর্শন, ভাস্কর্য, চিত্র শিল্প, নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যকলা প্রভৃতিও প্রাচীন চীনের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবোধচন্দ্র 'Sino Idica' নামীয় সিরিজে চীন-ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতীর চীনা-ভবনের

গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। যৌবনকালে শান্তিনিকেতনে লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী ভাষা অধ্যয়নের সময় প্রবোধচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভ করেন। কবিগুরুর বাসনা ছিল প্রবোধচন্দ্র কৃতবিদ্য হইয়া বিশ্বভারতীর সেবা করিবেন। কবিগুরুর জীবদ্দশায় প্রবোধচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভারতীতে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহার দেহান্তের পরে হইলেও সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কবিগুরুর বাসনা পূর্ণ করিতে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই বিশ্বভারতীর সেবা করিয়া যান।

বিশ্বভারতীতে কার্য করিবার সময় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমন্ত্রিত হইয়া প্রবোধচন্দ্র চীন গমন করেন এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতীর ভারতবিদ্যা বিভাগের এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর গবেষণা বিভাগের ( বিদ্যাভবন ) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ( বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ) আহ্বানে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপকরূপে মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতকগুলি বক্তৃতা দান করেন, এই বক্তৃতামালায় সুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য পরিবেশিত হয়। এই ভাষণমালা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১০)।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে চীনে যে সাংস্কৃতিক 'মিশন' প্রেরণ করেন, প্রবোধচন্দ্র তাহার একজন বিশিষ্ট সদস্যরূপে পুনরায় চীন গমন করেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতী ভারত সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়; ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হন। উপাচার্য রূপেও প্রবোধচন্দ্র গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ হইতে তাঁহার সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী য়্যানালস,' সিনো ইণ্ডিয়ান্ ষ্টাডিজ্' ও 'সাহিত্য প্রকাশ' নামে তিনখানি গবেষণা-ভূয়িষ্ঠ সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে প্রবোধচন্দ্র ২৫০৲ টাকা বেতন কম লইতেন, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এই টাকা বিশ্বভারতীয় কর্তৃক দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর গবেষণা বিভাগ পরিচালনার গুরু পরিশ্রম হেতু প্রবোধচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তাঁহার একমাত্র কিশোর পুত্রের পরলোক গমনেও তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা প্রাপ্ত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বিশ্বভারতীর সেবায় কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য ও শোকগ্রস্ত প্রবোধচন্দ্র ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী কর্মরত অবস্থায় গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইহার দুইদিন পর পরলোক গমন করেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া প্রবোধচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্মিদের অনুরোধ করেন যেন তাঁহারা বিশ্বভারতীর সেবায় নিরুদ্যম না হইয়া পড়েন, তাঁহার অবর্তমানে যেন বিশ্বভারতীর উন্নতি ব্যহত না হয়। মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বভারতীর কল্যাণ চিন্তা প্রবোধচন্দ্রের মন-প্রাণ অধিকার করিয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা ও বিশ্বভারতীতে কর্ম করার সময় তাঁহার সহকর্মি ও ছাত্রবৃন্দের অতিশয় প্রিয়জন ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ছাত্রদের তিনি পুত্রতুল্য স্নেহ দান করিতেন। মেধাবী ছাত্রদের গবেষণায় ও উৎসাহিত করিতে এবং তাহাদের জ্ঞান সাধনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে তিনি সর্বদাই উৎসুক থাকিতেন। বহু দরিদ্র ছাত্রদের তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন।

কর্মজীবনের বাহিরে সামাজিক জীবনেও প্রবোধচন্দ্র মনোরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে প্রবোধচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে শুধু তাঁহার ছাত্র ও সহকর্মিরাই ব্যথিত হন নাই, সমগ্র দেশবাসী বিশেষতঃ শিক্ষিতসমাজ তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোকানুভব করিয়াছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি, চীনা ও ফরাসী ভাষায় প্রবোধচন্দ্র সমান দক্ষতা অর্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। চীন ও ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তিনি অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এতগুলি ভাষা ও বিভিন্ন বিদ্যায় লব্ধ প্রবেশ হইয়া প্রবোধচন্দ্র যে সকল পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা জ্ঞান ভাণ্ডারের চিরস্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকিবে। প্রবোধচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষা বাংলার একান্ত অনুরাগী সেবক ছিলেন। বাংলার বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের সুবিধার্থে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত বিষয়ে কয়েকখানি সহজবোধ্য অথচ সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেন ( ১১-১৪ )। প্রবোধচন্দ্র ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ( বর্তমানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ) বৃহত্তর বঙ্গ শাখার এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত প্রবোধচন্দ্র ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আলিগড় অধিবেশনে "প্রাচীন ভারত" শাখায় ও ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টল কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে "পালি ও বৌদ্ধধর্ম" শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা এশিয়েটিক সোসাইটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি তাঁহাকে সাধারণ 'ফেলো' রূপে সম্মানিত করেন। বর্তমান শতাব্দীর বিংশ দশকে ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি সুধিবৃন্দের উদ্যোগে এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মনীষিদের পৃষ্ঠপোষকতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষদ্" নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, প্রবোধচন্দ্র তাহারও একজন উৎসাহী কর্ণধার ছিলেন, এই পরিষদের মুখপত্রে (Journal of the Greater India Society ) প্রবোধচন্দ্রের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ও কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের সম্পাদনায় প্রকাশিত "A Comprehensive History of India vol 1" রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত "The Cultural Heritage of India, (vol 1)," ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত "The History & Culture of the Indian people (vol 1)" গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অধ্যায় প্রবোধচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত।

প্রবোধচন্দ্র ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু পত্রিকায় ভারত বিদ্যাসংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত বিষয়বৈচিত্র্যবহুল, নানা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলির সবিশেষ উল্লেখ সম্ভব

নহে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রবোধচন্দ্র রচিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির তালিকা সন্নিবিষ্ট আছে।

নিম্নে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক রচিত আরও কয়েকটি পুস্তকের উল্লেখ করা হইল। প্রবোধচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই, তথাপি তাঁহার রচনার পরিমাণ অল্প নহে, আজীবন জ্ঞান সাধনা প্রসূত এই রচনাগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতাও পরিস্ফুট রহিয়াছে (১৫-১৮)।

(১) Le Canon Bouddhique en Chine (The Buddhist literature of China) Paris, vol. I, 1927 ; vol. II, 1938.

(২) Deux Lexiques Sanskrit Chinois vol.I & II Paris. 1929-1937

(৩) Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Calcutta University, 1 29.

(৪) কৌল জ্ঞান নির্ণয়ঃ—কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ নং ৩, কলিকাতা, ১৯৩৪

(৫) Dohakosa with notes and translation (critical edn. of Dohakosa discovered in Nepal), Cal. University, 1935

(৬) Dohakosa (Texts of the Sanjoy School) Cal. Sansk. Series, 1938-39

(৭) Materials for a critical Edition of old Bengali Charyapads-1938.

(৮) Studies in the Tantras, Calcutta, 1939.

(৯) India and China, Calcutta 1944, 2nd Edn. 1954.

(১০) India and Central Asia, Calcutta, 1955 (Hemchandra Basu Mullik lectures—National Council of Education, Jadabpur 1949-51)

(১১) ভারত ও ইন্দোচীন　—বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ,　১৩৫৭

(১২) ভারত ও মধ্য এশিয়া　"　"

(১৩) ভারত ও চীন　"　"

(১৪) বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য　"　১৩৫৯

(১৫) A Comparative study of the Original Texts and Tibetan Translations (J. of the Dept of letters, Cal. Univ. vol. 30)

(১৬) Introduction to Adhyatma Ramayan (Cal. Sanskrit Series no : XI, 1935)

(১৭) Discourses on Buddhism, Viswavarati, 1949

(১৮) She-kia-fang che (Eng. Trans of Chinese Text) Viswavarati 1959

# স্মৃতি উচ্চারিত

## শক্তিব্রত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ডায়রি লেখেননি, এই বহুঘোষিত কথাটার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। কেননা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তাঁর রচনার অনেকগুলি ফর্মই বৈপ্লবিক, তাঁর চিঠিপত্র দিনলিপির নামান্তর মাত্র, অথবা প্রবন্ধেরই নবপদ্ধতি; নতুবা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-র জন্য ভূমিকা রচনার কোন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষতঃ যখন এই অংশটি বক্তৃতার বিষয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রচনাগুলি, প্রধানতঃ মিশ্রতার ফসল, এবং তা নিয়ে গবেষণার প্রচুর সুযোগগুলি এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি।

কিন্তু বিভূতিভূষণ আক্ষরিক অর্থে ডায়রি লিখেছেন। ডায়রির নাম: স্মৃতি রেখা। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনার নাম: জীবনস্মৃতি। তিনি আত্ম-জীবন-বৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটাকে বাদ দিয়েছেন, কেননা, 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' এই স্মৃতির মধ্যে যে বহুবর্ণের রক্ত, তা বাইরের প্রতিবিম্ব নয়, 'সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের।' ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শে জীবনের কোন কোন ঘটনা বা কোন কোন মুহূর্ত মহার্ঘ হয়ে ওঠে, সেই মহার্ঘ সম্পদের আলেখ্যদর্শন এই জীবনস্মৃতি। অথচ এই স্মৃতিচারনার সঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর স্মৃতিচিন্তার ব্যবধান কত তীব্র। চল্লিশের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিগত বৎসরগুলিকে স্মৃতিসূত্রে সংকলিত করেছেন; এবং অতীতমাত্রই যেহেতু স্মৃতির জগৎ, জীবনস্মৃতিতে স্মৃতিপ্রসঙ্গ প্রধানতঃ এই কারণে খুবই সিদ্ধ ও সঙ্গত। কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীর পত্রাবলীর বিষয় অভ্রান্ত অর্থে অতীতাশ্রয়ী নয়, দৈনন্দিন ঘটনা বা মুহূর্তে আত্ম-অনুভূতিস্পৃষ্ট হয়ে প্রায় প্রতিদিন রচিত হচ্ছে, যেহেতু এই অনুভূতির সত্যগুলি কবি অত্যন্ত মহার্ঘ বলে বিবেচনা করেন। তার মধ্যে কবির জীবনের ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত অংশ যেটা আছে, তা কবির কাছে কখনোই বহুমূল্য নয়, কিন্তু তার মধ্যে তাঁর জীবনের 'অসামান্য উপার্জন'-এর যে অংশটুকু, আত্মচারণার প্রয়োজনে বা নিজের সৎ অনুভূতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, 'যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে একসময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণেরও সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে।' এই দিনগুলির এই ভূমিকা কবি রচনা করেছেন, যেহেতু এই সব রচনাগুলির মধ্যে তাৎকালীক 'টাট্‌কা-ভাব' পাওয়া সম্ভব। এখানে স্মৃতিকে কবি প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবেই দেখেছেন, এবং স্মৃতিচারণার এক অভিনব তাৎপর্যে ছিন্নপত্রাবলীকে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যে দৃষ্টি ও মনোভাব জীবনেতিহাসকে জীবনস্মৃতি করে গড়ে তোলে, সে পরিমণ্ডলের মধ্যেই ছিন্নপত্রাবলীর পরিণাম আকাঙ্খিত। তবু এই দুই গ্রন্থের মধ্যে বড় রকমের বিচ্ছিন্নতা আছে; জীবনস্মৃতির মধ্যে এক ধরণের ধারাবাহিকতা আছে, খণ্ড অংশ, খণ্ড মুহূর্ত প্রবাহিত হতে হতে এক সমগ্রকে গড়ে তোলে যা পরিণাম ধারাকেই স্পষ্টতঃই অনুসরণ করে; ছিন্নপত্রাবলী ছিন্ন মুহূর্ত ও কূলপ্লাবী ছিন্ন অনুভূতিকে ছিন্নাকারে ধারণ করে থাকে। ফলে ছিন্নপত্রাবলীতে কতগুলি রেখা, কোন সম্পূর্ণ

অবয়ব নয়; কবির বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে স্মৃতির রেখা বলে উল্লেখ করলে বোধহয় অগ্রাহ্য হবে না।

জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রাবলী যেমন স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে উপাদেয়, অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুধ্যানে বা তাঁর মানসিকতার পট উন্মোচনেও তাদের সহায়তা প্রায় অপ্রতিরোধ্য; তেমনি 'স্মৃতির রেখা' বা বিভূতিভূষণের অন্যান্য ডায়রি জাতীয় রচনা একাধারে স্বয়ম্ভর গ্রন্থ ও তাঁর সাহিত্যের প্রধান ভাষ্যসূত্র। এইসব গ্রন্থের ফলিত দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ডায়রি' শব্দটার উদ্ভবগত ইতিহাস ও অর্থের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে উপেক্ষণীয়, শুধু একটি প্রতিশব্দ গ্রহণ আমাদের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট, সেই শব্দটি 'দিনলিপি'। কিন্তু মনে রাখা দরকার দিনলিপি একটি ফর্ম মাত্র। বিভূতিভূষণ ফর্ম সম্পর্কে প্রায় নিশ্চেতন ছিলেন, এই কথাটা একটু বাড়াবাড়ির মত শোনালেও ফর্ম সম্পর্কে তাঁর অমনোযোগের অভিযোগ খণ্ডিত হয় না। কিন্তু যখন তিনি দিনলিপি রচনা করেছেন তখন কি আমাদের বিস্মিত হবার মত যথেষ্ট কারণ এসে উপস্থিত হয় না? এই ক্ষেত্রে ফর্মকে মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি অনুসরণ করছেন, এবং যদি দৈনন্দিনতার অর্থে এক্ষেত্রে বৈষয়িকতার ঘনসন্নিবেশ না হয়ে থাকে, তবে উদ্বিগ্ন হবার কোন সঙ্গত হেতু থাকে না যেহেতু ইতিমধ্যে এই ফর্মের ধর্ম-বিপর্যয় সাধিত হয়ে গিয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে সচেতনতার বিগ্রহ বললে অত্যুক্তি হয় না, তিনি ফর্ম সম্পর্কে কখনো উদাসীন নন, এবং ছিন্ন পত্রাবলীকে পত্রচারিত্র্যের লক্ষণে ভূষিত করেও যদি বিশিষ্ট না করে থাকেন, তার কারণও পত্রেতিহাসের ধর্মান্তরের সাক্ষ্য ও কবির নবীন পরীক্ষার প্রতি উদ্যমশীলতা।

এ-জাতীয় গ্রন্থের ফলিত দিকটা নানা কারণেই আকর্ষণীয়। এই সব রচনা যেহেতু ধর্মতঃ ব্যক্তিগত স্তরের, সেজন্য ব্যক্তিত্বের নিরাভরণ রূপ এখানে প্রকাশ্য। এবং কোন শিল্পই, প্রসঙ্গত আমরা জানি যে, ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়; ফলে শিল্পীর সৃষ্টিবিচারে এইসব অংশগুলি, যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রায় নিরূপিত, অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। এই অবশ্যম্ভাবী কারণেই রবীন্দ্রসৃষ্টির ভিতরলোক উন্মোচনে জীবনস্মৃতি জাতীয় রচনা বা চিঠিপত্র ও ডায়রি ইত্যাদি অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হতে দেখি; বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আলোচনায় বা সাম্প্রতিক গবেষণা-প্রধান মনোবৃত্তিও কখনই স্মৃতির রেখা, তৃণাংকুর ইত্যাদিকে গুরুতর সম্মান না দেখিয়ে পারেনি। যেকোনো বিচারই অবশ্য নানা প্রাসঙ্গিক উপকরণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যক্তিভাষ্যই বোধহয় বেশি আস্থাভাজন। এর ফলিত অংশের গুরুত্ব বিষয়ের উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রমাণিত হয়। কোন একটি কবিতার জন্মলগ্ন, কোন একটি ভাবের প্রথম উৎক্ষেপ, কোন একটি চরিত্রের বীজসূত্র ইত্যাদি অনুসন্ধানে, অর্থাৎ তাদের ঠিকুজি-কুলজি নির্মাণে এই সব রচনার সহায়তা অনুপেক্ষণীয়। ঠিকুজি-কুলজি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা আনন্দ আছে অবশ্য, কিন্তু একথা খুব জোর করে কি অস্বীকার করা যায় যে সত্তাকে সমগ্র করে পেতে হলে তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

ডায়রি জাতীয় রচনার এক সামান্য লক্ষণ তার আংশিকতা। এবং এরকম রচনার যে উপযোগিতা, তা-ও অনেকখানি নির্ভর করে তার অন্যতম লক্ষণ, সারল্য ও অকপটতার ওপর।

রবীন্দ্রনাথ যখন ডায়রির জীবনকে কৃত্রিম জীবন বা দ্বিতীয় জীবন বলে উল্লেখ করেন,তখন অনেকেরই মনে হতে পারে যে ডায়রির মধ্যে তবে সারল্যের স্বভাব কথাটা আরোপিত। বলাবাহুল্য, এ সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং ডায়রির ধর্মচিন্তায় একে প্রতিরোধের মত লাগাও সম্ভব। তবু পঞ্চভূতের 'পরিচয়' অংশে, কৃত্রিম কেন বা দ্বিতীয় জীবন কেন প্রশ্ন যে দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তার মধ্য থেকে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট হচ্ছে, সেটা হলো, রবীন্দ্রনাথ অনাবৃত আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে কখনই নিশ্চিত ছিলেন না। এবং তাঁর এই অবগুণ্ঠন-রতি ছিল প্রবল, যা রবীন্দ্র গবেষকদের বার বার নিরাশ করেছে। বিদেশী শিল্পিদের মধ্যে অনেকের ব্যক্তিগত রচনাগুলি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে তার গৌরব কন্‌ফেশ্যন-এ, কিন্তু এই গঠনগত স্বাভাবিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যরকম শীতল ছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেকরকম অনুসন্ধান চালিত হয়েছে, তথাপি যে কথাটা প্রধানতঃ বিশ্বাসযোগ্য, তা হলো, কোন রচনাকেই তিনি শিল্প-উপযোগিতার বাইরে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্যই তাঁর পত্রাবলী অনেকাংশে সম্পাদিত, অথবা জীবনস্মৃতিও নির্বাচিত বিষয়ের উচ্চারণমাত্র, যেখানে এমনকি সমকালের প্রবেশপত্র গ্রাহ্য হয়নি। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী যেসব বই প্রকাশ করেছেন, তা থেকে বিশেষ করে এই প্রবণতার পক্ষ পুষ্ট হয়েছে। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' থেকে যেকোন উৎসাহী এই দিকটিকে পরিষ্কার করে নিতে পারবেন বলে মনে করি। এই গ্রন্থের 'খসড়া'-অংশের সঙ্গে ডায়রি অংশ মিলিয়ে পড়লে কবির মানসিকতার বিবরণ পাওয়া যাবে। এই প্রবণতার উপস্থিতিতে সারল্যের দিকটা সংকুচিত হতে বাধ্য, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রচনাগুলি সবসময় আত্মধর্মে স্থিত নয়, এবং শিল্পলক্ষণে ভূষিত।

সারল্য ও অকপটতা অবশ্য এমন একটা গুণ যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। সারল্যের অভাব বা অকপটতার অপ্রকাশ মানে অসরল ও কপট না-ও হতে পারে। এই বিবেচনা প্রধানতঃ শিল্পীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। বিভূতিভূষণের ডায়রিতে সারল্য অকপটতা সহজেই চিনে নেওয়া যায় এই অর্থে যে তার মধ্যে নিরাবরণ উন্মোচন অতি স্পষ্ট ; এই চরিত্র অনেকাংশে আদিম-প্রকৃতির লক্ষণাক্রান্ত, এবং বলতে বাধা নেই যে, প্রথম দর্শনেই তাঁর ডায়রির মধ্যে ধর্ম-বিশিষ্টতা অনুমোদিত হবে। কিন্তু পাশাপাশি এরকম সন্দেহের অবকাশও থাকে যে নিরাবরণ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ডায়রিতে তিনি সম্ভবতঃ পুরোপুরি 'কন্‌ফেস্‌ড নন॥ 'কনফেশ্যন' কথাটার মধ্যে একটা ব্যাপকতা আছে, ব্যক্তিত্বের বহুচারী সত্যের উন্মোচন হলেই তার প্রত্যাশা মেটে। বিভূতিভূষণের এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে শিল্পীমানসের একধরণের একচারিতা আছে, যার উপলব্ধিগুলি অত্যন্ত সৎ ও মহান হওয়া সত্ত্বেও খুব সমান্তরাল। তাঁর ব্যক্তিত্বেরই চেহারা মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষের বহুধা, শিল্পীর তো বটেই ; অন্তত ব্যক্তিগত রচনার মধ্যে তা ধরা পড়তে বাধ্য, এবং এইদিক থেকে বিভূতিভূষণ বোধহয় অনেককেই নিরাশ করবেন। স্মৃতির রেখার প্রসঙ্গ অনেক কিন্তু অপৃথক, মানসিকতা অখণ্ড ও অবিচিত্র, ব্যক্তিত্বের মাপে যাকে আংশিক বলে উল্লেখ করলে ভুল হবে না।

ভাবনার একচারিতা ছিন্নপত্রাবলীতেও এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। পিতৃস্নেহ, করুণাবোধ,

স্বদেশচিন্তা, পরিহাসপ্রবণতা ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপকরণসমূহ সম্ভবক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হবে বটে, কিন্তু তা প্রধান রোমান্টিক কৌতূহলের ব্যাপকতার কাছে উপকরণগত চিহ্নমাত্রতাকে কতখানি অতিক্রম করতে পেরেছে তা অবশ্য প্রমাণিত নয়। পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্বের বহুধা উন্মেষ যেকোন উক্তির মধ্যে নিহিত থাকে, সামান্য পরীক্ষায় তার উন্মোচন সম্ভব, কিন্তু কখনই তা ব্যক্তিত্বের বহুবিক্ষেপের স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণ সত্যে ধারণ করে না। তথাপি ব্যক্তিত্বের নানা প্রসঙ্গ যে কখনো কখনো বিশ্বস্ততা লাভ করে, তার কারণ অন্যত্র।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছিন্নপত্রকে বীজকোষ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গল্পের যে সম্ভাবনাগুলি ছিন্নপত্রের মধ্যে নিহিত আছে, তার অনুসন্ধানে তিনি বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করতে গেলে যে কোন সমালোচককেই সম্ভবতঃ এই পথ অবলম্বন করতে হতো, কেননা উৎসসন্ধান শিল্পবিচারের প্রথম কৃত্য। শিল্প যদি অভিজ্ঞতার বিম্ব হয়, তাহলে সেই অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সমাগ্রহীর কাছে গুরুতর বলে বিবেচিত হবে। ছিন্নপত্রাবলী ( বা 'স্মৃতির রেখা' ইত্যাদি ) অভিজ্ঞতার বিবরণী হিসাবে সাহিত্যবিচারে তার ফলিতরূপের উপযোগিতায় অসামান্য বলে স্বীকার করে নিলেও, অনেকেই নিশ্চয় এই সব গ্রন্থে যে অভিজ্ঞতা উন্মোচিত হয়েছে তার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কৌতূহলী হবেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্পবিচারে শিল্পীর অভিজ্ঞতার রূপান্তর যদি অনুসন্ধানের বিষয় হয়, তবে ছিন্নপত্রাবলীতে শিল্পীর অভিজ্ঞতা কিভাবে উন্মোচিত হলো কোন সূত্রকে অবলম্বন করে, তা-ও পাশাপাশি জিজ্ঞাস্য। কিন্তু আমরা জানি যে অভিজ্ঞতা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, বিশেষভাবে একান্ত ও অন্তরীণ, যিনি অনুভব করছেন তিনি ছাড়া অপরের পক্ষে তা অনুভব করা বা অর্জন করা অসম্ভব। এবং এই অভিজ্ঞতা কখনোই তার আদি সত্যে প্রকাশিত হতে পারে না, কেননা তার কোন উচ্চারণ নেই। ফলে এই অভিজ্ঞতাই যখন উচ্চারিত হয় তখন তা তার মৌলিকতাকে অনেকখানি হারায়। অথচ উচ্চারিত রূপ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের কাছে তার কোন অবয়ব ধরা পড়ে না। উচ্চারিত হবার সময়, অর্থাৎ কোন অভিজ্ঞতার প্রকাশ স্বভাবতই অনেকাংশে নির্বাচিত, যেহেতু যেকোন প্রকাশই কোন না কোন রকমের স্মৃতিমন্থন বা সংকলন। এবং উজ্জ্বল স্মৃতি প্রধানতঃ স্থানু, তার অববাহিকতা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য গভীরভাবে অনুভূত কোন ঘটনা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার স্বভাবে কদাচিৎ বিবৃত হতে পারে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খতা কখনো কখনো বিস্ময়কর বলেও বোধ হতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ-মুহূর্তটি শিল্পীর দ্বিতীয় অনুভবের মুহূর্ত। স্মরণচিহ্ন ধরে প্রথম মুহূর্তটিকে অনুসরণ করা। ফলে এই সব উচ্চারণ যে কখনো কখনো ধারাবাহিকতা পায়, তার কারণ : তা ইতিমধ্যে সচেতনতা দ্বারা স্পৃষ্ট। এই সচেতনতা আবার অনেক সময়েই শিল্প-বিবৃতি (litery projection)। অর্থাৎ সচেতনতা ও শিল্পসৃষ্টির বন্ধন প্রায় অবিচ্ছেদ্য ; দ্বিতীয় অনুভব মৌলিক অনুভবের অনুরূপ সৃজন বলে সৃষ্টিশক্তি সেখানে সক্রিয়, যার ফলে সচেতনতা ও সৃজনের বিচ্ছিন্নতা সাধ্য নয়। কাজেই উচ্চারণ মৌলিকের অনুরূপ মাত্র। এই অনুরূপত্বের মধ্যে তবু অনুভবের মুক্তি আছে, কেননা তা এই সূত্রে অন্তরীণ ও ঐকান্তিক অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তার পক্ষে বহুজনের অনুভব হয়ে উঠতে আর বাধা

থাকে না। এই আলোকেই লক্ষ্য করা যায় কেমন করে অভিজ্ঞতা নিছক ব্যক্তিগত স্তরকে অতিক্রম করে। কিন্তু উচ্চারিত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি ; এবং সচেতনতা যা বিশিষ্টরূপে ব্যক্তিগত, যেহেতু অবিচ্ছিন্ন, সেই কারণেই কোন রচনার পক্ষে নিরঙ্কুশ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই জন্য রচনা মাত্রই ব্যক্তিগত, ছিন্নপত্রাবলী যেমন, তেমনি গল্পগুচ্ছ। প্রভেদ যেটা থাকে সেটা প্রধানতঃ আঙ্গিকের, বা ইতিহাসরচনার পদ্ধতির। এখন, গল্পগুচ্ছের আলোচনায় ছিন্নপত্রের ব্যবহার যদি জরুরী হয় উৎস সন্ধানের প্রয়োজন, তাহলে অবশ্য তারও হেতুসন্ধান অবশ্যম্ভাবী। পোস্টমাস্টার শীর্ষক গল্পটির মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ধৃত হয়েছে, ছিন্নপত্রে তার বীজসূত্র রচিত বলে আমরা জানি ; এক্ষেত্রে সৃষ্টিক্রিয়ার ইতিহাস : প্রথমত অনুভূতি ( অনুচ্চারিত ) দ্বিতীয় অনুভূতি ( উচ্চারিত-ছিন্নপত্রে ) তৃতীয় অনুভূতি ( গল্পে )। অর্থাৎ অনুভূতির তৃতীয় জগৎ-এর ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রের স্মৃতি-সংকলন পদ্ধতির তারতম্যই প্রধানতঃ কৌতূহলোদ্দীপক। সাজাদপুরে রচিত ১৮৯২-র ২৯শে জুনের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে কুঠিবাড়ির একতলার পোস্টমাস্টারকে নিয়ে তিনি একদিন দুপুরবেলা পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখেছিলেন ; কিন্তু ১৮৯১-র ১০ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে একটি পোস্টমাস্টারের উল্লেখ ছাড়া আর কি আছে ? গাল্পিক ও রসিক এই বিশেষণে তাকে চিহ্নিত করা যায় অবশ্য। পোস্টমাস্টার গল্পটি যদিও এই লোকটিকে নিয়ে লেখা, তবু ১০ই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে উক্ত পোস্টমাস্টারের গাল্পিক অনুষঙ্গ গল্পে ব্যবহৃত হয়নি। বস্তুতঃ চিঠির পোস্টমাস্টার আর গল্পের পোস্টমাস্টারে শুধু 'পোস্টমাস্টার' শব্দটির ব্যবহার ছাড়া মিলই বা কোথায় ? মিলের প্রয়োজনও হয়তো নেই ; কিন্তু ও থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে স্মরণও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পরিমাণে নির্বাচিত হয়। চিঠিতে বিশেষ পোস্টমাস্টার সম্পর্কে কবির সদ্য অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু গল্পের দুপুরবেলায় পল্লীগ্রামে নির্বাসিত পোস্টমাস্টার ছাড়া অভিজ্ঞতার অন্যতর অভিব্যক্তি বিষয়ক অনুসন্ধানই প্রধান কৃত্য বলে মেনে নেবার গুরুতর কারণ আছে। কিন্তু, এই সূত্রে বিভূতিভূষণের স্মৃতির রেখার কতদূর ব্যাখ্যা হতে পারে ? বলা যেতে পারে যে স্মৃতির রেখা মূলতঃ ভাষ্য, স্মৃতিচারণের অনন্য মগ্নতায় এর পরিচয় অত্যন্ত প্রকাশ্য, কিন্তু বিভূতিভূষণের শিল্পবিচারে এর ব্যবহার শিল্পীর নিজস্ব অনুমোদনের ভূমিকায়। ভাষ্যরচনা যেহেতু একটি সচেতন প্রক্রিয়া, সেই জন্য তার মধ্যে ধারাবাহিকতা গড়ে ওঠা খুবই সম্ভব ; এবং এই সূত্রেই ভাবনার একচারিতা দেখা দিতে পারে। ছিন্নপত্রেও এই কারণেই সমান্তরাল ভাবচারণ দুর্লক্ষ্য নয়। এই অংশটি নির্মাণে যার প্রাধান্য বেশি, তাকে বলা যায় সচেতনতা, যা সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, এবং এই শক্তিই অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করে। বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়ে এক সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে ; এই গ্রন্থনশিল্পের অধিনায়কও সেই সচেতনতা যা ব্যক্তিগত অর্থে ব্যক্তিত্ব। নির্বাচন প্রবণতা এবং দ্বিতীয় অনুভূতির জগতের যোগ্যতার উপরেই শিল্পের ভারসাম্য নির্ভর করে।

স্মৃতির রেখা বা জীবনস্মৃতি 'স্মৃতি'-যুক্ত বলে, অথবা ছিন্নপত্রেও স্মৃতি সংকলনের বাসনা পরিস্ফুট বলে স্মৃতির প্রসঙ্গ এই সব ক্ষেত্রে গুরুতরভাবে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেকোন রচনাই সম্ভবতঃ এই বিধানের হাত থেকে মুক্ত নয়, শুধু মাত্রা ও চারিত্র্যের বিপর্যয়ে কখনো কোনো কোন রচনার অন্যতর বিকাশ দেখা যায়। ডায়রি বা চিঠি বা এই গোত্রের অন্যবিধ রচনা, যাকে

আমরা সচরাচর ব্যক্তিগত রচনা বলে উল্লেখ করে থাকি, তাতে স্মৃতি অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের বলে, এবং সংগ্রহ-বাসনার দ্বারা লেখক চালিত বলে তার মধ্যে 'টাটকা-ভাব'-এর অংশ হয়তো কিছু বেশি থাকে, নির্বাচন নির্বিচার হতে এখানে কোন বাধা নেই। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে অবাধ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত খুবই কম। এর কারণ নানারকম হতে পারে; নিতান্ত ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন (যাতে উচ্চারিত অর্থ প্রকাশিত বলা যায়)-এর ভিন্নতাবোধ হয়তো তার মধ্যে প্রধান, কিন্তু আজ আর কেউ এই অবিমিশ্রতার অভাবকে সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। উচ্চারিত যেকোন জীবনই এক অর্থে কৃত্রিম জীবন বটে, কেননা তা দ্বিতীয় অনুভূতির ফসল, এবং সেই অর্থে তার যে অপূর্ণতা, তার সঙ্গে এই জাতীয় অপূর্ণতার প্রভেদ কোথায়, তা আর কখনো অস্পষ্ট থাকে না।

# বিজ্ঞান ও ধর্ম

## মেঘনাদ সাহা

মহামারী, মহাযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের দরুণ মাঝে মধ্যে সভ্যতার পথটিতে বিঘ্ন ঘটিলেও দুনিয়া দিন-কে দিন অগ্রসর হইতেছে—এবম্বিধ বিশ্বাসই কর্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যজাতির বিস্ময়কর তৎপরতার উৎসভূমি। প্রাচ্যবাসী কিন্তু উপর্যুক্ত উক্তি গ্রহণে সবিশেষ সতর্ক। প্রাচ্যবাসীর এই সতর্কতার পিছনে আছে তাঁহাদের হাজার হাজার বছরের সভ্যজীবনের পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতা। সভ্যতা সম্পর্কে প্রাচ্যপ্রত্যয় এই : সভ্যতা একান্তই কালসম্পৃক্ত। কালসমন্বয়ে যুগের সৃষ্টি। সভ্যতার প্রসারণ, অবনমন এবং বিলোপনের মধ্য দিয়াই যুগের পরিণতি। যুগমাত্রেরই এই ধর্ম, এই আচরণ। সভ্যতা সম্পর্কিত এই প্রাচ্যদৃষ্টিভংগির প্রশংসায় অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিত অবধি পঞ্চমুখ [ ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন। মনোবিজ্ঞান 'নুভো রিচে'-র প্রচারক ধনিকমন্য মার্কিন মনোবিদরা মনে করেন সভ্যতার পুনরবনতি আদৌ অসম্ভব। ] ওটো স্পেংগলার সভ্যতার সাবেক ও সাম্প্রতিক ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত, সভ্যতার গতি চক্রবৎ। সভ্যতার অংগনেও প্রকৃতির মতো ঋতুবদল হয়। ঋতুবদলের পালায় নববসন্তে সভ্যতার জন্ম। প্রকাশের পূর্ণতা এবং মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ গ্রীষ্মের দারুণদহে। সভ্যতার পটপ্রেক্ষায় পরবর্তী ঋতু, শরৎ। বাহিরে তাহার চাকচিক্যের ঘনঘটা, অন্তরে বন্ধ্যার বিষণ্নতা। সর্বশেষে, শীত। কণ্ঠে তাহার শেষ গানের রেশ, বুকে বিলুপ্তির নিশ্চিহ্নতা। স্পেংগলার নৈপুণ্যসহকারে সেমিটিক-মিশরীয়, চৈনিক-ভারতী এবং উত্তরভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ধরণা, বর্বর ডোরীয়দের যে অভিযান প্রাচীন গ্রীসের ক্রেটান ও মিসেনিয়ান সভ্যতাকে উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহার মধ্যেই উপ্ত ছিল গ্রীকো-রোমান এবং উত্তরভূমধ্যসাগরীর সভ্যতার বীজ। তৎকালে হোমারের কাব্যাবলী ও উহার যুদ্ধচিত্র অতিক্রান্ত হেলেনিক ধর্মে বহু লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিল। সভ্যতার অংগনে তখন আর এক গ্রীষ্ম। কণ্ঠে তাহার সাজসাজ রব—গ্রীসে নগররাষ্ট্রের সূত্রপাত হইলে, নাগরিক জীবন সুরু হইল, সাহিত্য ও শিল্পে সমৃদ্ধি ঘটিল, সাম্রাজ্যবাদী পারশীয়দের বিরুদ্ধে গ্রীকবাসী আত্মরক্ষা করিল। ওদিকে, ম্যাকেডেনিয়ান ও রোমান সাম্রাজ্য সৃষ্টি সংগে সংগে যুক্তিবাদী কর্মধারা ও বিজ্ঞানভিত্তিক সন্ধিৎসা আরম্ভ হইয়া গেল। সভ্যতার অংগনে আবার শরতের বাঁশি বাজিল, সেই শরৎ বাহিরে যাহার ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্যতা অথচ ভিতরে লবডংকা। অতঃপর বর্বরদের অভিযান—দীর্ঘ শীতের শীতলতা। সাম্রাজ্য খানখান হইল, মধ্যযুগের ঘন অন্ধকার ব্যাপ্ত হইল সভ্যতার সর্বস্তরে। আবার অন্ধকার অপসৃত হইল। বর্বররা তখন ধর্মঅভিযানের উন্মাদনায় মাতোয়ারা প্রাচ্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে প্রয়োজনীয় উপাদান অন্বেষণে তৎপর। কিন্তু সভ্যতার এই মধুমাস—ধর্মঅভিযান এবং পেনিট্রেসানের মধ্য দিয়া য়ুরোপে এবং পরে পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যন্তে যাহার আবির্ভাব—তাহার সমাপ্তি ঘটিল মোটামুটি ষোল শো পঞ্চাশ গ্রীষ্টাব্দে। সদ্যঃগত সময়পর্বে য়ুরোপীয় জাতিবর্গ তামাম দুনিয়াকে পদানত

করিল। স্পেংগলারের বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই শরৎ তুয়ার প্রান্তে, ধর্মের অবনতি স্পষ্টগোচর এবং যুক্তিবাদ চরম বিকশিত। কিন্তু এই নবোদ্ভূত অবস্থার সংগে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি খাপখাওয়াইতে অপারগ। স্পেংগলারের চোখে অতএব ভবিষ্যৎ নিতান্তই নৈরাশ্যজনক।

গত অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি বস্তুত অতিবিতর্কিত। সমালোচকরা এই প্রসংগে প্রায়শই বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার স্মরণ করেন। একথা অনস্বীকার্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের চিন্তা ও কর্মরাজ্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়াছে, যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহা তুলনারহিত। আর, প্রাচীন সভ্যতায় কখনও ঠিক এ অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এই তুনিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিলে অর্থকষ্ট, যাহা মানুষের সকল দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের মূল, তাহাও যে লাঘব করা সম্ভব এমন ধারণা বোধকরি প্রাচীন সভ্যতায় অকল্পিত। সমালোচকদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, জীববিদ্যার নিত্যনব আবিষ্কার এবং সুষ্ঠু জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আগামীদিনে যখন উন্নততর সন্তানসৃষ্টি সম্ভব হইবে তখন নিশ্চয় সেই নূতন জাতি সুস্থ-সবল এবং উচ্চচিন্তায় সমৃদ্ধ হইবে।

কিন্তু বিগত যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে স্পেংগলারের নৈরাশ্য অতিসংগত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বিজ্ঞানকে সর্বমূলাধার মনে করিলেও একথা স্মরণীয়, বিজ্ঞানের সংগে আমাদের যে সর্বপ্রধান সর্ত আমরা তাহা লংঘন করিতেছি—নিজেকে কিভাবে চালাইতে হইবে তাহা না বুঝিয়াই আমরা হাত দিয়াছি প্রকৃতি পরিচালনার গুরু দায়িত্বে। অধুনা পাশ্চাত্যদেশে কয়েকটি শক্তিশালী জাতি স্বার্থান্ধ হইয়া ভয়ংকর জাতীয়তার মৌতাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। জীববিদ্যার দৌলতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বলে তাহারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে যে, ধর্মের আর প্রয়োজন নাই। বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে বহুবিধ শ্রেষ্ঠ অবদান থাকিলেও পাশ্চাত্যজাতির দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের হোমকুণ্ডে আহুতিপ্রাপ্তি তাহা অবসম্ভাবী। যাহাই ঘটুক না কেন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, মানুষ ভাগ্যকে বশে রাখিতে পারে না। সে শুধু অপেক্ষমাণ ঘটনার অনিবার্য শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য। ইহা স্পষ্ট যে, রাজনীতিকদের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কেননা, তাহারাই জাতিগত এবং গোষ্ঠিগত স্বার্থের ব্যাপারী। আর জনসাধারণ তো নিজেরাই এ ব্যাপারে বিব্রত সুতরাং তাঁহাদের নিকট উচ্চাঙ্গের চিন্তা কিরূপে সম্ভব? বৈজ্ঞানিকেরা যে এ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিবেন সে সম্ভাবনাও দূরপরাহত। সংশ্লিষ্ট জীবনসমস্যা হইতে পলাতক হইয়া তাঁহারা আত্মসমস্যায় মশগুল। ধর্মের পুনরুজ্জীবন যে আলোকপাত করিবে তাহারও আশা ক্ষীণ। মানবইতিহাসে প্রায়শই দেখি যুগন্ধর মহাত্মারা জীবনের নূতন আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন। এই সব ধর্মস্রষ্টা ও আচার্যগণ মানবজীবনের মূল ধরিয়া প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছেন। মানুষের মনে তাহাদের বহুবিস্তৃত প্রভাব উপলব্ধি করা যায় জোরোস্ত্র-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-হজরতের জন্মউদ্‌যাপনের বহর দেখিয়া। তথাপি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে, বৃহত্তর ধর্মআন্দোলনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব কি? বিপুলা এ পৃথিবীর কোন প্রত্যন্তে হয়তো বৃহত্তর ধর্মআন্দোলন দেখা দিতে পারে কিন্তু তাহা কি শুভবার্তার বাহক হইয়া দেখা দিবে? ধর্মচেতনার জন্মরহস্য জানা থাকিলে একথা সহজেই বোঝা যাইবে জীবন সকলেরই প্রিয়। এই জীবনের সমস্যায় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর আগ্রহী। মানবইতিহাসে সূত্রে প্রকাশ, এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা অনেককাল বিজ্ঞানের

দুয়ারে ধর্না দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সকল আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইল। আমরা অতঃপর অনুমান-নির্ভর হইয়া সহজসমাধানের পথে প্রলুব্ধ হইলাম। অজানাকে জানার ইচ্ছা তখন লোপাট। প্রাকবিজ্ঞান যুগে আমাদের এই অসহায়তা বেশী প্রকট। প্রাচীন ধর্মচেতনার প্রারম্ভেও এ অসহায়তা অক্ষুণ্ণ। আসলে প্রাচীন ধর্মে ছিল প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্ববীক্ষা এবং বাস্তব কর্মতৎপরতা ন্যূন, শরীর বিজ্ঞান সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল নামমাত্র। তথাকথিত ধর্মবোধেই ইহা তন্নিষ্ট ছিল। সুতরাং প্রাচীন ধর্মচেতনা হালফিল দুনিয়ার চাহিদা পূরণে অপারগ।

যদি ধরিয়াই লওয়া হয় ধর্মের পুনরুজ্জীবন অবসম্ভাবী তবে অতঃপর ধর্মকে বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চা করা উচিত। পরবর্তী প্রয়োজন, আমাদের জীবনসমস্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি এবং মানবমনের নিপুণ বিশ্লেষণ। স্পিনোজা তিনশতক পূর্বেই একথা বলিয়াছেন:

"মানুষের আচরণে হাস্য বা রোদন না করিয়া তাহা সহজভাবে উপলব্ধির চেষ্টা কর। তাহার অনুরাগ-অভিলাষ, প্রেম-ঘৃণা, দয়া-দম্ভ ইত্যাকার মানস অশান্তিকে মানবচরিত্রের অপরাধ মনে না করিয়া শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়ঝঞ্ঝায় যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ তাহারই লীলামাহাত্ম্যরূপে গণ্য কর। এই প্রবৃত্তিনিচয়ের স্বরূপসন্ধান কষ্টকর হইলেও অতীব প্রয়োজনীয়। কয়েকটি বিশেষ উপায়ে আমরা ইহাদের সত্যস্বরূপ অবগত হই। এই সত্য অনুধ্যান করিয়া আমরা মানসিক আনন্দ পাই। এ আনন্দের সুখ ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা বড় কম নহে।"

পূর্ব উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত ধর্মব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন স্বীকার্য। বিবর্তিত ধর্মের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক মানবসমাজের রক্ষকরূপে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে মানুষের মধ্যে সক্রিয় থাকিবে। এ সত্য লুকাইয়া লাভ নাই, অধুনা সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠানই স্বকীয় উপলব্ধিকে যথার্থ নীতিজ্ঞানের দ্বারা যাচাই না করিয়াই ঐশীচিন্তায় আশ্রয়প্রার্থী। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে অদ্যাপি তাহারা হরিহর আত্মা।

তিনশতক পূর্বে শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে, ব্যাধি ও তাহার নিদান সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল স্বল্প, রোগভোগে যন্ত্রণা ছিল দুঃসহ এবং মৃত্যুর হার ছিল ভয়াবহ। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষের জ্ঞানস্পৃহা ইদানীং এতই স্পষ্ট যে নেহাৎ সাধারণ মানুষও আজ শরীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অতি সাধারণ চিকিৎসকও এখন রোগনিরোধে যে নিদান দেন অতীতের আচ্ছা আচ্ছা হাকিম-বদ্যির তুলনায় তাহা ঢের ঢের গুণ ভাল। কিন্তু একথা কি ধর্মব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা চলে? মনে হয়, না। ধর্মব্যবস্থা ও ধর্মবোধ অদ্যাপি মোটামুটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আচার্যবিশেষের উপলব্ধি একান্তই তাঁহার। তাঁহার প্রয়াণের সংগে সংগে, বলিতে গেলে, তাঁহার উপলব্ধিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। যৎকিঞ্চিৎ যদিও বা বিশ্বস্তভাবে শিষ্যের উপর বর্তায় তাহাও প্রায়শই ব্যক্তিগত মালিকানায় পর্যবসিত হয়। অথচ ধর্মকে যদি বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চা করা যায় তবে নিঃসন্দেহে উহা এক নবযুগের উদ্বোধন করিবে। তখন আমরা এক মহৎ জ্ঞানলোকে উপনীত হইব। প্রবুদ্ধ হইব এক মহান ব্রতে চিকিৎসাবিজ্ঞান অপেক্ষা যাহা কোন অংশে কম নহে। তখন প্রতি ব্যক্তিমনের আহ্বানে ঝংকৃত হইবে বিপুল মানবসমাজ, মন্দ্রিত হইবে নিখিল প্রকৃতি।

অনুবাদ: **বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**

# দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রা

**অমৃতময় মুখোপাধ্যায়**

১৮৪০ সালের গোড়ার দিকেই দ্বারকানাথ স্থির করেন তিনি বিলাতে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৪০ সালের ২০শে অগষ্ট তিনি তাঁর সম্পত্তির এক ট্রাষ্টডীড করে ছেলেমেয়েদের ও অন্যান্য সাংসারিক ব্যবস্থা করেন। তখনও তিনি কবে যাবেন এবং কে কে সঙ্গে যাবেন তা ঠিক করেন নাই কারণ ঐ ট্রাষ্টডীডের পালনকারী বা একজিকিউটর ছিলেন তিনজন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১)। কিন্তু শেষপর্যন্ত যাত্রার সময় চন্দ্রমোহনকে দ্বারকানাথ বিলাতে নিয়ে যান।

এই "ডীড অফ্ সেটেল্‌মেণ্ট" দ্বারা নিজের অধিকাংশ বিষয়ের উপর উপরিউক্ত তিনজনকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করে তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "আমার পিতা ১৭৬৩ সালের পৌষ মাসে (২) য়ুরোপ প্রথমবার যান। তখন তাঁহার হুগলী পাবনা রাজসাহী কটক মেদিনীপুর রঙ্গপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী, এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এইসকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্যব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈত্রিক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁর মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পুর্বে ১৭৬২ শকে, আমাদের পৈত্রিক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম এক করিয়া এই চারিটি (৩) সম্পত্তির উপরে একটি ট্রাষ্ট্ ডীড্ লিখিয়া, তিনজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন। আমরা কেবল তাহার উপস্বত্বভোগী রহিলাম, তাঁহার এই কার্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎদৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।" (৪)

এইরকম ডীড্ অফ সেটেল্‌মেণ্ট তখনকার কালে লোকে দীর্ঘ দিনের জন্য প্রবাসী হলে বা তীর্থভ্রমণে গেলে করতেন। একাধিক ব্যক্তি দ্বারকানাথকে সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য বিশেষ উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়ে তাঁর নামে পাকা ইন্‌ডেন্‌চিওর (indenture) করে দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার (৫) এইরূপ ডীড্ দ্বারা ম্যাকিন্‌টশ কোম্পানীর তৎকালান অংশীদার দ্বারকানাথ ও গর্ডন সাহেবকে একজিকিউটর নিযুক্ত করে যে দলিল সম্পাদন করেন তাহা প্রায় শতপৃষ্ঠাব্যাপী। (৬)

এ ছাড়াও কমার্শিয়াল ব্যাংক ফেল করার সময়ের অত্যন্ত অপ্রীতিকর স্মৃতি দ্বারকনাথের ছিল।

ব্যাংকের সমস্তই দেনা তাঁকে শোধ দিতে হয়েছিল। "তখনও যৌথ কারবারের জন্য 'লিমিটেড কোম্পানী'র আইন হয় নাই। কোনও কারবার ফেল হইলে, লিকুইডেটরগণ আপন আপন খেয়ালমত যে অংশীদারকে যত অধিক ধনী বলিয়া মনে করিতেন, তাহার উপরে তত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণের ভার নিক্ষেপ করতেন।" (৭) এই সময়ে যখন দেখলেন যে ইউনিয়ন ব্যাংক ঠিক তাঁর ইচ্ছা মত চলছে না—যে পথে গিয়ে কমার্শিয়াল ব্যাংক মজেছিল সেই পথেই যাচ্ছে এবং হয়ত তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাংকের মত কার ঠাকুর কোম্পানীর চালনাও অন্য অংশীদারদের হাতে চলে যেতে পারে তখন ঐ ট্রাষ্ট ডীড সম্পাদন করেন। এর প্রায় বছরখানেক আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। (৮) অন্ততঃ অধস্তন দু'পুরুষের গ্রাসাচ্ছাদনটা যাতে ভালো ভাবে চলে যায় এটা তারই ব্যবস্থা। এই দলিলে তিনি তাঁর নাতনীদের বিয়ের জন্য পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এই দলিলে লেখা হল যে

* * * In consideration of the natural affection which the said Dwarkanath Tagore bore to his children, he granted, bargained sold assigned alienad released and confirmed unto tho said Prosonnocoomar Tagore, Ramanath Tagore and Chundermohan Chatterjee there heirs executors administrators representatives and assignees, all those four several and respective Zemindaries following viz, Pergunnah Berhampur in the District of Jessore and Pabna, the Talook called Dhee Salydah In Districts of Pabna and Rajshye, the Talook Caligram in the district of Rajshye and the Talook Pandua in the District of Cuttack,······for ever upon trust that they······should from time to time from and after the decease of Dwarkanath······pay and apply the rents, profits and proceeds of the said lands, tenements and premises······between and amongest Debendranath, Gereendranath and Nagendernath Tagores, the sons of Dwarkanath in equal shares respectivsly during their lives and after the decease of······any of them······then pay the share of such son of Dwarkanath to their respective children.

এইরূপে বিষয়সম্পত্তির সব ব্যবস্থা করে দ্বারকনাথ বিলাতে যাবার সব স্থির করিতে লাগিলেন। ১৮৪১ সালে যখন কয়েকজনের সঙ্গে তিনি ইণ্ডিয়া জাহাজ কিনে তাহাকে কলিকাতা ও সুয়েজের মধ্যে চালু করার উদ্যোগ করলেন তখন ঠিক করলেন ঐ জাহাজেই তিনি বিলাতে যাবেন। "ইণ্ডিয়া" জাহাজের এ যাত্রা ছিল পরীক্ষামূলক। তাতেই দ্বারকনাথ বিলাতে যাবেন শুনে তাঁর চারপাশের লোকের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। তখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সবচেয়ে বড় ধনী, দানী ও কর্মী—তিনি সহর ছেড়ে চলে যাবেন, তাও যাবেন কোথায়? না বিলাতে যেখানে কলিকাতা থেকে তাঁর আগে আরেকজনমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন—এবং তিনিও আঁর দেশে ফিরতে পারেন নাই। তাই এই বিদেশ যাওয়ার উপলক্ষে কলিকাতার তাঁর বন্ধু গুণগ্রাহী প্রভৃতি

সকলে ঠিক করলেন যে তাঁকে স্মরণীয় ভাবে বিদায় দিতে হবে। অতএব সেকালের লাট-বেলাটকে যেমন যাবার আগে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে অভিনন্দন পাঠ করে ধন্যবাদ দিয়ে দেওয়া হত দ্বারকানাথের বেলাতেও সেই ব্যবস্থা হল।

এই উদ্দেশ্যে ১৮৪১ সালের শেষ দিনে ৫২ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক কলিকাতার শেরিফের কাছে টাউন হলে এক সভা ডাকার প্রস্তাব করে দরখাস্ত করলেন। (৯)

সে সময়ে সরকারী চাকুরে, ব্যবসাদার বা অন্য কোনরকমের অধিবাসীদেরই কোন সভা ডাকতে হলে শেরিফের হুকুম নিতে হত এবং শেরিফ সাহেব মাঝে মাঝে নামঞ্জুর করতেও দ্বিধা করতেন না। ১৮২৭ সালে মহাধনী বনিক জন পামার দ্বারা আহূত এক সভা সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেখি যে—

এতদ্বারা জানান যায় যে শ্রীযুক্ত জন পামার ও আরো কয়েকজন কলিকাতাবাসীর সাক্ষরিত পত্রে যে সভা এমাসের ১৭ তারিখে টাউন হলে হবার কথা ছিল সে সভা অনুষ্ঠিত হবে না।

(স্বাক্ষর) জে, প্রাউডেন

কলিকাতা, ১২ই মে ১৮২৭ শেরিফ

এ সভা সম্বন্ধে অবশ্য কোন আপত্তি হয় নাই এবং শেরিফ হুকুম দিলেন যে "উপরোক্ত দাবী অনুসারে বৃহস্পতিবার ৬ই জানুয়ারী বিকাল তিনটায় টাউন হলে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিতেছি।"

সভার দিন সকালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" কাগজে দ্বারকনাথ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে লেখেন যে—

"জনকল্যাণের জন্য দ্বারকানাথ যা করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ না দিয়ে তাঁকে এদেশ থেকে যেতে দিতে আমরা পারি না। শাসন সম্বন্ধে কয়েকটী গুরুতর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের ঘোরতর অমিল। যদি সত্য হয় যে ঐ বিষয়ে বিলাতে ওকালতি করতে তাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে, তাহলে ভবিষ্যতেও হয়ত তাঁর মতের বিপক্ষে অভিমত প্রচার করিব। তথাপি সমাজ নেতা হিসাবে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ না করা নিজেদের চিন্তাশক্তির অবমাননা। রাজধানী থেকে দূরে থাকার ফলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রধানতঃ গড়া তাঁর জনহিতকর কাজ সকল থেকে। তাঁর আচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের নেই, তবে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে সাহেবের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশার ফলে তাঁর স্বদেশবাসীদের গণ্ডীবদ্ধ মনোভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে এবং হয়ত সাহেবদের মধ্যেও কিছুটা উদারভাব প্রবেশ করেছে। অবশ্য এটা আমাদের আক্ষেপের বিষয় যে প্রগতিশীল মতবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর জাতির সাধারণ কুসংস্কারগুলি আরও ব্যাপকভাবে ত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রকাশ্যে এবং আমাদের বিশ্বাস মন থেকেই যা অবজ্ঞা করেন সেই মূর্ত্তিপূজার দুর্নীতি বিশেষ করে সমর্থন করে তিনি অস্থিরচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন বলে লোকে কলঙ্ক দিতে পারে। এই বেদনাদায়ক ব্যাপারটী আমরা অবশ্য মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রসূত বলে মেনে নিতে পারি। (১০) রামমোহন রায় যখন তাঁর দেশবাসীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে

দ্বারকনাথ প্রথম সাধারণ সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। সে সময়ে তাঁর সাহস ও উদারহৃদয়তা দেখে যা আশা হয়েছিল গত বিশবৎসর সমাজ সম্মুখে সর্বদা থেকে তিনি তা পূর্ণ করেছেন। যে সব কাজের জন্য তাঁর নাম ভারতবর্ষে চিরস্মণীয় হয়ে থাকবে তার মধ্যে সতীদাহ নিবারণে তাঁর সাহস ও নিষ্ঠা আমাদের মতে সর্বাগ্রগণ্য। গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিত্ত, বুদ্ধি ও শক্তি ঐ নিবারণের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দলে যারা যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের নির্মমভাবে উৎপীড়ন করেছিল তখন দ্বারকানাথ তাঁর সমগ্র সমর্থ নিয়ে মনুষ্যত্বের পক্ষে দাঁড়ান ও সমস্ত বাধা ও নিন্দা অবিচলিত ভাবে সহ্য করেন।

দ্বারকনাথের দাক্ষিণ্য বর্ণনা করিতে গেলে কলিকাতার প্রত্যেকটী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করতে হয় কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানই তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় নাই। একমাত্র দ্বারকনাথের পক্ষেই দান ও মুক্তহস্তে দান লোকের কাছে এত স্বাভাবিক যে যখন তিনি কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটীতে লক্ষ টাকা দান করেন তখনও জনসাধারণ ঐ বিরাট দানের অনুপাতে বিস্মিত হন নাই। একথাও ভোলা উচিত নয় যে একমাত্র খ্রীষ্টান মিশনগুলি ছাড়া বোধহয় দেশের উন্নতির জন্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানেই তিনি ছিলেন অগ্রণী। শিক্ষার উন্নতিসাধনে —বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কৃত করে ও ঐ কলেজ বিকাশে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। তাঁর দানের বৈশিষ্ট যে সেগুলি কেবল বিরাট নয়, সুবিবেচিতও বটে।

দ্বারকনাথের বিলাত ভ্রমণের ফল সম্বন্ধে আমরা বহু আশা রাখি। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সেদেশে এরূপ সসম্মানে অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হবেন যে সাহেব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভালোই হবে এবং তিনি ফিরে এলে তাঁর বর্ণনা শুনে এদেশীয় ধনীরা তাঁর অনুসরণও করিতে পারেন। বিলাতে ক্ষমতায় আসীন বহু লোকের সঙ্গেও তাঁর মিলামেশার সুযোগ হবে এবং আমরা নিশ্চিত যে ঐ সুযোগে তিনি এদেশের মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা দেশের উন্নতির জন্য সদাতৎপর থাকিবেন। তিনি এক মহাদেশ ও যে সৎপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা সেই মহাদেশ সম্ভব হয়েছে সে সব দেখে আমরা আশা করি যে তিনি, ইংলণ্ড এ দেশের রক্ষক হয়েছে বলে, কৃতজ্ঞচিত্তে দেশে ফিরবেন।"

নির্দিষ্ট দিনে সভায় বেশ ভিড় হয়েছিল। সংখ্যায় সাহেবরা বেশী হলেও কোম্পানী চাকুরে "সিভিলিয়ান"রা অনেকেই আসেন নি। (১১) এদেশী লোকও বেশ অনেক গিয়েছিলেন এবং বক্তাদের জোর জোর হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। এই মিটিংএর বর্ণনা তৎকালীন পত্রিকায় বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল। "ইংলিশম্যান" কাগজে লিখছেন (১২)—

"বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গতকাল টাউন হলে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য একটী সভা হয়। শেরিফ-সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর টার্টনসাহেব প্রস্তাবিত অভিনন্দন সম্বন্ধে বলিতে উঠেন। অভিনন্দনটী পাঠ করার পর তিনি কেবল স্থানীয় বাসিন্দা নয়, সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তির উপর দ্বারকনাথের দাবীর বিষয়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন। এই মহাপুরুষ লোকটীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজকীয় বদান্যতা সম্পর্কিত অসংখ্য দৃষ্টান্তর মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির দানের কথা ও তাছাড়া সোসাইটি যে তাঁরই উপদেশের ফলে বর্তমানের সমৃদ্ধ অবস্থায়

পৌঁছেছে তাও জানান। এই তথ্যের জন্য টার্টন সাহেব এডওয়ার্ড রায়ান সাহেবের মত উল্লেখ করেন এবং একথাও জানান যে সরকারী কাজের চাপে আটকা না পড়লে, স্যার রায়ান নিজেই এই বিশেষ সভায় উপস্থিত হতেন। তিনি প্রস্তাবিত অভিনন্দনের সঙ্গে একমত এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের বহুগুণের প্রতি অর্পিত যে কোন প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি যোগ দিতে প্রস্তুত। টার্টন সাহেব আরও বলেন যে প্রথম না হলেও দ্বারকনাথ একমাত্র ভারতবাসী যিনি ব্যক্তিগত বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধার জন্য বিলাতে না গিয়ে, যাচ্ছেন প্রশস্ততর সমাজ ব্যবস্থা দেখে নিজের জ্ঞানপ্রসার ও শিক্ষিত মনের উপযুক্ত কৌতূহলবশে। টার্টন সাহেব যথার্থই বলেন যে এ দেশবাসীরা যদি বিশেষ বিবেচনান্তে তাদের প্রতিনিধি কাহাকেও মনোনীত করে বিলাতে ভারতবাসী সম্পর্কে ধারণাকে উচ্চতর করিতে চায় তো দ্বারকনাথের চাইতে উপযুক্ত লোক তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

টার্টন সাহেবের বাগ্মিতার উপযুক্ত রূপ দিতে পারছি বলে দাবী করি না। তিনি যে উচ্ছ্বাসে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলো বলেন তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি বা অন্য কয়েকজন বক্তার ভাষণের যথাযথ বর্ণনা কোন সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তার প্রশংসাপত্র প্রকাশ হলে দেখা যাবে টার্টন সাহেবের বক্তৃতার সারাংশ ও অন্য বক্তাদের মর্মার্থ তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। অবশ্য, শক্তিশালী লেখকের লিখিত এই অভিনন্দনের বিবৃতিও ঐ সমস্ত বক্তৃতার দুর্বল প্রতিধ্বনি মাত্র।

এই টাউন হলে আমরা বহু মনোরম বক্তৃতা শুনে থাকি কিন্তু বর্তমান ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল পূর্বে আগ্রাপ্রবাসী ম্যানসেল সাহেবের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের সমর্থনে বক্তৃতা অতুলনীয়। দ্বারকানাথকে তিনি কেবল কলিকাতা বা বাংলা দেশের সম্পত্তি নয়—সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের সম্পত্তি বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেন যে এঁর ব্যক্তিত্বের কথা সারা ভারত বিদিত ও সম্মানিত। এরূপ আন্তরিক বক্তৃতা আমরা বড় একটা শুনতে পাই না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দীর্ঘকাল থাকাকালীন তিনি এই মহানগর নিবাসী একজন দেশীয় ভদ্রলোকের জ্ঞানাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়ে এঁকে ন্যায্যমূল্যে সম্মানিত করেছেন কারণ ইনি নৈতিক সাহসের মহৎ দৃষ্টান্ত আর এদেশবাসীর মধ্যে বিরল দাক্ষিণ্যে আদর্শ ও শিক্ষিত সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা। টার্টন সাহেবের কথা সত্য যে সৌভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথের ইচ্ছানুসারে কাজ করার মত স্বচ্ছলতা আছে এবং সে ইচ্ছাকে উপযুক্ত পথে চালনার জন্য আছে তাঁর অদ্ভুত শক্তি। কিন্তু তাঁর মত বিত্তশালী ও সেই কারণে সমাজে সমান উপকার করার ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও তাঁর মহৎ দৃষ্টান্ত কয়জন অনুসরণ করেছে? ক্রোধে নয় দুঃখের সঙ্গেই আমরা এ উপদেশ দিতে বাধ্য যে তাঁরাও যেন ইনি যে উজ্জ্বল পথ দেখিয়ে গেলেন সে পথ অনুসরণ করে স্বজন পোষণের যে সম্মান ও আনন্দ তা লাভ করেন। মেজর ফোর্বস্ একটী প্রস্তাব করলে রুস্তমজী কাওয়াসজী তা সমর্থন করেন।

তখন মেরেডিথ পার্কার একটী প্রস্তাব করেন কিন্তু প্রথমে তিনি এত বিহ্বল হয়ে পড়েন যে তিনি আদৌ কিছু বলতে পারবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। সাধারণতঃ তিনি যেরকম বলেন বস্তুত তার থেকে অনেক কম বললেন। তবে তিনি যেটুকু বললেন তার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কিছু ছিল না। তার বক্তৃতার সাধারণত যে চমৎকারিতা থাকে এতে তা ছিল না

বটে তবে তার বদলে ছিল গভীর হৃদয়াবেগ যা নিঃসন্দেহে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। পার্কার সাহেব দ্বারকানাথকে উনিশ বৎসর ধরে চেনেন। দ্বারকানাথ যখন সরকারী চাকুরে তখনই সাহেব তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে এ কাজ তাঁর উপযুক্ত নয় কারণ সংস্কারক হিসাবে অগ্রণী হওয়ায় দেশবাসীর কাছে তিনি হবেন ঈর্ষা ও দ্বেষের পাত্র। ফলাফল দেখে পার্কার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী সত্যই হয়েছিল মনে হয়। একই সমাজের মধ্যে অসাধারণ প্রগতিশীল হতে সাহস করলে লোকের যে দশা হয় দ্বারকনাথের তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবুও চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের সুযোগ পেয়েও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অন্যায় অভিযোগ প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত স্বভাবতই অবসর নিতে রাজী হন নাই। পরে যখন প্রত্যেকটী অভিযোগ প্রত্যাহৃত হয় তখনই তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অথবা পার্কার সাহেবের ভাষায় তিনি ঠিক অবসর গ্রহণ করেন নি বরং সমাজ হিতৈষীর সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে সেই স্থানে তদবধি কাজ করেছেন। পার্কার সাহেবের সহকর্মী "সিভিলিয়ান"দের প্রতি ভর্ৎসনাপূর্ণ একটি মন্তব্যকে আমরা কোনমতেই বাদ দিতে পারি না। তিনি বলেন যে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে বিদেশ যাওয়ার উত্তম উদ্দেশ্য ও তদ্দ্বারা দেশের উন্নতি সম্ভবনা সত্ত্বেও দ্বারকানাথকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজ যতজন সমবেত হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি লোক সামাজিকতার আহ্বানে তার চারিপাশে সমবেত হতেন। পার্কার সাহেব বলেননি এমন কথাও আমরা বলতে পারি। আমাদের বিশ্বাসের যথেষ্ট হেতু আছে যে চাকুরীজীবি অনেকেই দ্বারকানাথের ঔদার্যের কাছেই আসন্ন বিপন্মুক্তির জন্য ঋণী, অথচ এ উপলক্ষে তারা এঁকে উপেক্ষাই করলেন। অবশ্য আমরা দয়া করে ভাবতে পারি যে তাদের এ সভায় অনুপস্থিতি ইচ্ছাক্রমে নয়, অপরিহার্য কারণে।

পার্কার সাহেবের পর হেনরি পিভিংটন সাহেব সভার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সমর্থন করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" থেকে নিম্নের অংশটী উদ্ধৃত করেন—

"আমাদের প্রিয় দেশে যাবার পূর্বে রামমোহন রায়ের অন্যতম প্রিয়বন্ধু ও আদিভক্তের নিকট বিদায়প্রসঙ্গে আমাদের আশা করা অনুচিত হবে না যে বিলাতে দ্বারকানাথের প্রথম প্রয়াস হবে বর্তমান উপেক্ষিত অবস্থা থেকে ঐ মহাপুরুষের সমাধিকে রক্ষা করা এবং সে সমাধির উপর এমন এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে দেওয়া যে ভবিষ্যৎকালে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের পথনির্দেশ দেবে কোথায় তাঁর দেহাবশেষ রক্ষিত। এই পত্রিকার একজন পরিচালক ব্রিষ্টলের নিকটবর্তী ষ্টেপল্‌টনে গিয়ে দেখে মর্মাহত হন যে যে দুর্বৃত্তেরা রামমোহনের সমাধিস্থলের মালিক, তারা তাঁর ভস্মাবশেষ ঐখানে সমাহিত বলে অতি লজ্জিত এবং তাদের চেষ্টা তাঁর স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলা। এটা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা নয় যে রামমোহন রায়ের মত লোক ইংলণ্ডে এক সমাধিতে বিস্মৃত থাকবেন। দ্বারকানাথকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে সভা আজ আহূত হচ্ছে, আমরা আশা করি সেখানে এবিষয় জনমতের কিছুটা প্রকাশ হবে এবং হয়ত এই বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য চাঁদাও কিছু তোলা হবে। সে সংগৃহীত অর্থকে যথোপযুক্তভাবে ব্যয়ের ভার তার বন্ধু দ্বারকানাথকে দিলে তিনি সানন্দেই রাজী হবেন। ডাক্তার জন গ্রাণ্ট এ বিষয়ে প্রশ্ন করে বলেন যে ঘটনাটি যদি সত্য হয় তো তা তাঁদের জাতীয় জীবনের কলঙ্ক। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত রামমোহন রায়ের

পুত্র ও কয়েকজনকে—বিশেষকরে ইংলণ্ড থেকে সদ্য-প্রত্যাগত ফুলটন সাহেবকে এ বিষেয়ে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করাতে ঐ ভদ্রলোক বলেন যে যাঁর বাড়ীতে রামমোহন রায় মারা যান তাঁর কন্যার সঙ্গে আগষ্টমাসে ফুলটন সাহেবের দেখা হয়। তখন মহিলাটি তাঁকে জানান যে দেহাবশেষের উপর একটি নামমাত্র স্মৃতিস্তম্ভ এখনও আছে। তবে বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে তাহা এরকম বিখ্যাত লোকের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য। (১২ ক) অবশ্য আমরা নিশ্চিত যে দ্বারকানাথ তাঁর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে আমাদের এ কলঙ্ককে দূর করবেন।

আমরা বলতে ভুলে গেছি যে একটি প্রস্তাব করা হয় যে শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে দ্বারকানাথের একটি প্রতিকৃতি টাউনহলে রাখা হউক। দিগম্বর মিত্র নামে দেশীয় ভদ্রলোক এক সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে তার চেয়ে আবক্ষ মূর্তিই শ্রেয়। বৈকুণ্ঠ রায় এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এবিষয়ে আলোচনায় টার্টন, লংভিল ক্লার্ক ও অন্যান্য কয়েকজন যোগ দেন।

লংভিল ক্লার্ক সাহেব ছবির পরিবর্তে একটী মূর্তির সমর্থন করেন এবং যদি যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হয় তো তুটোই বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন যে তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে এই খরচের সবটা দিলেও বার্ষিক আয়ের তারতম্য টের পাবেন না। এটা অবশ্যই সত্য। তবু আমাদের আশা যে এ চাঁদা বহুলোকের সহযোগিতা পাবে। দ্বারকানাথের দাক্ষিণ্যে সমাজের কৃতজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিলেও যাঁরা নিজেরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের এক অংশও চাঁদা দিলে ছবি ও মূর্তি তুয়ের জন্যই অর্থের কোন অভাব হবে না। যদি তা অসম্ভব হয় তো আমরা টার্টন সাহেবের সঙ্গে একমত যে কেবল একটা আবক্ষ মূর্তি কি পুরা মূর্তির চেয়েও ছবিই ভাল। মূর্তি বোধহয় মৃত মানুষের পক্ষেই বেশী উপযুক্ত; কারণ যে চোখ দিয়ে জীবন্ত মানুষের অন্তরের প্রকাশ মূর্তির মধ্যে সেটার অভাব। তবে আশা করি তুটোরই ব্যবস্থা সম্ভব হবে। কারণ এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এপর্যন্ত যাঁরা ভারত ত্যাগ করেছেন তাঁদের কেহই জাতির কৃতজ্ঞতার উপর দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত দাবি করতে পারেন না। অর্জিত ঐশ্বর্য্য যাঁরা দেশে ফিরে ভোগ করতে যাচ্ছেন, এযাত্রা তাঁদের কেবল আনন্দের ও ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নের সোপান তাঁদেরও আমরা এরূপ সম্মান দেখাই। কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করে সুদূরের পথে যাত্রা করতে দ্বারকানাথ যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তা ভাবলে তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা উদ্যম ও জ্ঞানান্বেষণের উৎসাহ; যারফলে তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাচ্ছেন তা প্রতীয়মান হয় এবং যাঁদের এ ধরণের সম্মান জনসাধারণ এতাবত দেখিয়ে এসেছেন তাঁদের অন্যদের দাবী সমতুল্য হলেও আমরা মানতে বাধ্য যে দ্বারকানাথের অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

উল্লেখ করতে ভুলেই যাচ্ছিলাম যে রামমোহন রায়ের স্মৃতি স্তম্ভ সম্পর্কীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ ছাড়া সর্বশেষ বক্তা লংভিল ক্লার্ক সাহেব একটি ছোট কিন্তু উচ্ছুসিত ভাষণে ছবির প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

এই খুব তাড়াতাড়ি লেখা সভার অসম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আমরা পাঠকদের কাছে মাপ চাইছি—এমনকি বিবরণের পারম্পর্যও রাখা যায় নি। তার কারণ আমরা কিছু টুকে আনি নাই—কোন প্রস্তাব, বক্তৃতা বা কিছুই যাদের কাছে নাই যা থেকে গুছিয়ে নির্ভুলভাবে এই বিশেষ সভা সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দিতে পারি।

আমরা কেবল একমাত্র বলতে পারি যে সভায় বেশ ভিড় হয়েছিল এবং তার মধ্যে এদেশীয় লোকের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। যে নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদল টাউন হলে দ্বারকানাথকে মানপত্রটি দিবেন অন্যরা ইচ্ছা করলে সে দলে যোগ দিতে পারেন। ঐ সভাতেই পিভিংটন সাহেবকে সম্পাদক করে দ্বারকানাথ টেষ্টিমোনিয়াল কমিটী গঠিত হয়। তাতে যে চাঁদার তহবিল খোলা হয় তাতে ঐদিনেই কয়েকটাকা কম আট হাজার টাকা ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী টাকা—১০০০৲ দেন রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী। যাঁরা ৫০০৲ করে দেন তাদের মধ্যে ছিলেন বড়লাট বাহাদুর, ক্লার্ক, ম্যানসেল ও ডিকেন্স সাহেবরা ও দেশীয়দের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদাকান্ত রায়, রাণী কাত্যায়নী ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। জ্যোতিলাল শীল দেন ২৫০৲ আর ১০০৲ করে দেন মাধব ঘোষ, দেবীপ্রসাদ রায়, নীলরতন হালদার, ডি সি মুখার্জি, উদয়চাঁদ বসাক, দাদাভাই রুস্তমজী, ও মলেকজীরুস্তমজী। বঙ্কুলাল রায় ও ভোলানাথ রায় দেন ৫০৲ করে ও গৌরমোহন আঢ্য দেন ২৫৲ টাকা। বাকীটা বিভিন্ন সাহেবরা চাঁদা দিয়েছিলেন।"

এই সভায় যেমন স্থির হয়েছিল সেইমত তার পরদিন সকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে টাউনহলে মানপত্রটি দেওয়া হয়। ঐদিনই বাংলার প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ডস রায়ানকেও ( ১৩ ) একটী বিদায়ী অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও দ্বারকানাথের সঙ্গেই "ইণ্ডিয়া" জাহাজে বিলাত যাচ্ছিলেন। প্রতিনিধিদল টাউন হলে মিলিত হয়ে সেখান থেকে দল বেঁধে আদালতে গিয়ে জজসাহেব রায়ানকে মানপত্র দিয়েই টাউন হলে ফিরে আসেন। তখন ঐদলে আরও অনেক এদেশীয় ভদ্রলোকেরা এসে যোগ দেন। দ্বারকানাথকে এগারটার সময় মানপত্র দেবার কথা ছিল কিন্তু কার্যতঃ ওটা দেওয়া হয় এগারটা বাজবার কিছু আগেই—ফলে কয়েকজন সভায় যোগ দেবার উপযুক্ত সময়ে এসে পৌছতে পারেন নি। হাই সেরিফ মানপত্রটী দ্বারকানাথের হাতে দেন এবং টার্টন সাহেবকে সেটা পাঠ করতে বলেন। তাতে লেখা ছিল ( ১৪ )

কলিকাতাবাসী শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার ইংলণ্ড গমনের প্রাক্কালে কলিকাতার দেশীয় ও ইউরোপীয় অধিবাসীরা টাউনহলে মিলিত হইয়া আপনার আগামী শাসকগণের দেশ পরিদর্শন সময়ে স্বদেশে উন্নতির জন্য আপনার উদার, বিদগ্ধ ও বিশেষ চেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া শুভেচ্ছা জানাইতেছে।

ভারতীয়দের মধ্যে আপনিই প্রথম ( অন্ততঃ দেশের এই অংশ থেকে ) যিনি আর্থিক বা নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য বেতিরেকে কেবল আনন্দ, জ্ঞান ও শিক্ষার সন্ধানে ইয়োরোপ ভ্রমণে ব্রতী হয়েছেন। এই ঘটনাকে ভারতবাসীর ইতিহাসে নবযুগের সূচনা বলে মনে না করে আমরা পারি না। এদেশীয় ও বিদেশীয় নির্বিশেষে আপনার দেশবাসীদের বিশ্বাস যে এই উদাহরণ বহুদ্বারা অনুকৃত হবে এবং এদেশে ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ভাববিনিময় বর্দ্ধিত করে দুই দেশের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে সাহায্য করিবে এবং ফলে ইংরাজাধিকৃত ভারতের সকল স্তরের ও শ্রেণীর অধিবাসীদের রাজনীতিক ও সামাজিক মঙ্গলপ্রসূ হবে।

আমাদের আনন্দের বিষয় যে বিলাতের প্রজাবর্গ এমন একজনকে দেখিবেন যিনি, ভারতবর্ষীয়

ভদ্রলোক সম্বন্ধে যে ধারণা এতাবৎ সেদেশে অনেকে পোষণ করতেন তার মান উচ্চতর করবেন।

আপনার অক্লান্ত দাক্ষিণ্য, জীবনের সর্বপথে ঋজু ব্যবহার যাহা কলিকাতাবাসীদের ভক্তি-অর্ঘ উপযুক্তভাবে অর্জন করেছে তাহা বিলাতেও আশা করি প্রতিধ্বনিত হবে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকটি সৎকাজে আপনি দেশবাসীর সম্মুখে অভূতপূর্ব উদারতার উদাহরণ স্থাপন করেছেন, বিশেষতঃ সাহেবদের মনোমত কোন উদার প্রতিষ্ঠানই আপনার বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হয় নাই।

যে বহু কারণে আপনি আমাদের ধন্যবাদার্হ তৎমধ্যে আমরা বিশেষ উল্লেখ করতে পারি, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটী ও মেডিকেল কলেজে আপনার প্রভূত বদান্যতা এবং প্রথমোক্তটির বর্তমান সচ্ছলতার জন্য আপনার দানের চেয়েও বেশী কার্যকরী আপনার উপদেশ ও সাহায্য, গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোত চালনা বিষয়ে আপনার অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা বিশেষ সাহায্য, ভারতের কৃষি কর্মের উন্নতির জন্য আপনার অক্লান্ত চেষ্টা, শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনার উদার ও বিজ্ঞ প্রচেষ্টা, আপনার স্বার্থ ভারতের বাণিজ্যের সহিত যদিও অধিক জড়িত এবং সে হিসাবে আপনার কর্মজীবন সততা ও মহৎ সাহসিকতাপূর্ণ তথাপি আপনার ভূম্যাধিকারীদের দাবীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, সকল বিশেষ ঘটনায় আপনার সমাজসেবায় তৎপরতা।

সামাজিক জীবনে আপনার বিপুল ও বিশেষ আতিথেয়তা, সদা মিষ্ট ব্যবহার ও হৃদয়বানতা যেকেহ কখনও আপনার উপদেশপ্রার্থী হয়েছে আগ্রহের সঙ্গে তাদের সাহায্যদান আপনাকে পরিচিত মহলে প্রিয় করেছে এবং এদেশ ত্যাগের পূর্বে আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি না জানাতে পারিলে আমরা ক্ষুণ্ণ হতাম। এটা আনন্দের বিষয় যে আপনার বিলাত যাওয়ায়, যিনি এ যুগের অন্যতম প্রধান কি প্রধানতম ভারত হিতৈষী তাঁর প্রতিকৃতি ভবিষ্যৎ বংশীয়দের দেবার সুযোগ পাচ্ছি। আমাদের অনুরোধ যে আপনার জন্মনগরীর টাউনহলে রাখিবার জন্য বিলেতে থাকাকালীন আপনার প্রতিকৃতি আঁকিয়া কলিকাতার দেশী ও বিদেশী অধিবাসীদের বাধিত করুন। আশা করি যে সাধারণের এই গুণগ্রাহিতার প্রমাণে, আপনি পরোপকার ও দানশীলতার যে পথে বরাবর চলেছেন তার অনুকরণে আপনার দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হবেন।

সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও হৃদয়াবেগপূর্ণ আমাদের এই ধন্যবাদের শেষে আমরা আপনার যাত্রা সফল ও শুভ হউক এই ইচ্ছা জানাই। বিলাতে প্রবাস আপনার শারীরিক উন্নতি ও মনের সাচ্ছন্দবিধান করুক যাহাতে কয়েকবৎসর পরে আমাদের মধ্যে ফিরে এসে যে কর্মজীবন ভারতবাসীর কাছে প্রশংসা ও সাধুবাদ অর্জন করেছে, নবোদ্যমে আরও বহুকাল অব্যাহত থাকুক।

( স্বাক্ষর ) ডব্লিউ, এইচ, স্মোল
৭ই জানুয়ারীর দাবী অনুসারে টাউন হলে
দেশী ও ইউরোপীয় অধিবাসীদের তরফ থেকে
ও তাদের ইচ্ছানুসারে কলিকাতার মহাশেরিফ

উত্তর দিতে উঠে দ্বারকানাথ ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন। হেরল্ডের মতে (১৫) এরকম মর্মস্পর্শী ব্যাপারটা এত শেষ মুহূর্তে করা উচিৎ হয় নাই। দ্বারকানাথ খুব আস্তে ও ধীরে

অভিনন্দনের উত্তর দেন। তিনি বলেন—

মহোদয়গণ,

আমার দেশ ও আমার পক্ষে এ মুহূর্তটী গৌরবময় কারণ এই রাজধানীর নাগরিকদের কাছ থেকে কোন ভারতীয় এরকম সশ্রদ্ধ সম্মান এই প্রথম পেলেন। স্বদেশের উন্নতি আমার জীবনের ভাবং লক্ষ্য ছিল। বিলাতের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি ও সামাজিক গুণাবলীকেই এই বিশেষ উদ্দেশ্যে আমার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। অন্যেরা ইতিপূর্বেই এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন—বিশেষত আমার বন্ধু স্বর্গত রামমোহন রায়। আমার চেষ্টা সম্বন্ধে সচেতন বলেই আমি জানি আপনাদের প্রশংসা আমার নিজস্ব সফলতার চেয়ে এই প্রচেষ্টার প্রতি অধিক প্রযোজ্য। এসব কাজের জন্য প্রশংসা যিনিই পান না কেন, এটা যে দেশের প্রগতিশীল সংকর্মের শুভারম্ভ হয়েছে তার সুফল সম্বন্ধে আমি বহু আশা করি। আমার দেশীর ও বিদেশীয় নাগরিক বন্ধুরা আমার প্রচেষ্টার ও কার্যের অনুমোদন ও প্রশংসা করেছেন বলে আমি গর্বিত। আপনাদের সহৃদয়তায় আমি দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ কারণ এ অভিনন্দন কেবল আমার প্রতি নয় আমার দেশবাসীর প্রতিও। তাঁদের কাছে ও জগতের কাছে বিলাত ও ভারতের ভূম্যধিকারীর উদ্দেশ্য ও সহানুভূতিতে কত নিকট তা প্রমাণ করেছে। তাই একজন সামান্য হিন্দুর প্রচেষ্টা আর স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের ও বিলাতী সমাজের সমবেত প্রশংসা পেয়েছে।

মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন এবং যে ভাষায় আপনারা আমায় সম্মানিত করেছেন সেজন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার স্পর্শ বিনা আমি যেটুকু সামান্য কাজ করেছি তারজন্য আপনাদের টাউনহলে আমার প্রতিকৃতি রাখার মত সৌভাগ্যের অধিকারী হতাম না। আমি এই দুর্লভ সম্মান সানন্দে গ্রহণ করেছি এই আশায় যে যেসব কাজের জন্য আপনারা আজ আমায় অভিনন্দিত করেছেন আমার দেশবাসী হয়ত সেরূপ কাজ করিতে উৎসাহিত হবেন।

এর পরে রবিবার ৯ই জানুয়ারী ( বাংলা ২৬শে পৌষ : ১৭৬৩ শক ) জমিদারী ও ব্যবসা সম্বন্ধে শেষ উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়ে পরিবারের যাঁরা কলিকাতায় রইলেন তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়বার জন্য চাঁদপাল ঘাটের দিকে চললেন। তাঁকে বিদায় দিতে আত্মীয়স্বজন ও অনেক প্রবাসী জোড়াসাঁকো বাড়ির 'সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে' জড় হয়েছিলেন। যাঁরা হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানালেন তাঁরা ছাড়া আরও লোক এসেছিল। কালাপানি পার হওয়ার পর তো তাঁকে সমাজে গ্রহণ করা হবে না সেটা নিশ্চিত, তবু কোন সাহসে দ্বারকনাথ যাচ্ছেন বোধহয় সেইটুকু তাঁদের জানবার ইচ্ছা ছিল। ইতিপূর্বের পাথুরিয়াঘাটার জাতি গোষ্ঠীর নেতা লাড্‌লীমোহন ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবাজী, আর চলিবে না। এইবার আমরা বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিব।" দ্বারকনাথ যে পথ দিয়ে গেলেন সেই পথ দিয়েই প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে দ্বারকনাথের কাছে বিদায় নিয়ে আরেকজন বাঙ্গালী বিলাতের পথে জাহাজে চড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি রামমোহন রায়। আজ তাঁর ছেলে চললেন দ্বারকানাথের সঙ্গে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতে। আর চললেন দ্বারকানাথের ভাই রমানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধু। এঁরা

দু'রাত্রি জাহাজে কাটিয়ে (১৬) মঙ্গলবারদিন স্যাণ্ডহেস্‌ থেকে কলিকাতায় ফিরে এলেন স্টীমটগ কোম্পানীর "দ্বারকানাথ" নামক জাহাজে। দ্বারকনাথের সঙ্গে চললেন ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, একান্ত সচিব (এ-ডি-কং) পরমানন্দ মৈত্র। তিনজন হিন্দু চাকর ও একজন মুসলমান খানসামা (১৭) ও চিকিৎসক হিসাবে ডাক্তার ম্যাক্‌স্‌ওয়ান্‌। দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রকে আনলে যে বিভিন্ন বিষয়ে বিলেত থেকে তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরবে। বিশেষত তাঁর ইচ্ছা ছিল ডাক্তারির ছাত্র নিয়ে যাওয়া কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হয় নাই।

দ্বারকানাথ টেষ্টিমোনিয়াল ফাণ্ডে যথেষ্ট টাকা উঠেছিল এবং যে উদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা তার সবকটাই করা হয়েছিল। ১৮৪৬ সালের ১২ জানুয়ারীর কলিকাতা হরকরার সম্পাদকীয় অংশে দেখি যে "আমাদের জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে যে দ্বারকানাথ তহবিলের" এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ উপযুক্ত পাদদেশ (পেডেষ্টাল) সহ একটি আবক্ষমূর্তি, একটী প্রতিকৃতি, রামমোহন রায়ের কবরের উপর স্মৃতিচিহ্ন ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছবির এক এনগ্রেভিং, যেটি আগামী জাহাজে এসে পৌছিলে যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন তাঁদের দেওয়া হবে। দু একটী ছোটখাট খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে প্রায় ছয়শত টাকার মত। উহা ব্যয়ের জন্য যে প্রস্তাব ছিল "দ্বারকানাথ ঠাকুর" যেমন ভাল বুঝিবেন তদনুসারে আইরিশ রিলিফ কমিটিকে দেওয়া হবে। তাঁর ছেলেরা যাঁরা উপস্থিত তাঁদের এ বিষয়ে সম্মতি আছে।"

দ্বারকানাথের এই ছবি এদেশে আসবার আগে ১৮৪৩ সালের রয়েল একাডেমির প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। ঐ বৎসর জুন মাসের "আর্ট ইউনিয়ন"-এ তার বর্ণনা দেখি—২৮৮ নং "হিন্দু ভদ্রলোক দ্বারকানাথ ঠাকুর এফ আর সে কর্তৃক, কলিকাতা টাউনহলের জন্য চাঁদা তুলে আঁকা। প্রতিকৃতি আঁকার পক্ষে অতি উত্তম বিষয়। এই খ্যাতনামা ব্যক্তিকে ঐ অবস্থার হিন্দুর উপযুক্ত সাজসজ্জায় আঁকা হয়েছে। শাল ও পাগড়ী পরে। চিত্রকর তাঁর বিষয়টী এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে ছবিটী কেবল সুন্দর নয়, মূল্যবান চিত্র হয়েছে। রংগুলি খুব উজ্জ্বল অন্ততঃ এবিষয়ে প্রদর্শনীতে এ ছবিটী নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে বলা উচিৎ যে ৫৬ নং একর, লণ্ডনে মিলার সাহেবের তৈরী রং এই ছবিতে ব্যবহার হয়েছে। আর্ট ইউনিয়নের বিজ্ঞাপন অংশে একাধিকবার তিনি এই রং ব্যবহার করিয়া তুলনা করিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আহ্বান জানিয়েছেন। এই ছবিটি দেখিলে সকলেই নিঃসন্দেহ হবেন যে এর অদ্ভুত উজ্জ্বলতা কোন বিশেষ উপায়ে সৃষ্ট।

ক্যানভাসের পিছনেও একটী ১৮৪৩ সালের বিজ্ঞাপন ছিল—

To Artists. The notice of those painters and amateurs who have not yet had not opportunity of inspecting a picture painted exclusively with silica colours and glass medium is respectfully directed to No. 288 in the present exhibition of the Royal Academy.

কিন্তু ১৯০১ সালে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান যখন টাউনহলের ছবিগুলি পরিষ্কার করিবার

জন্য এলেকজাণ্ডার স্কটকে দেন, তখন দেখা যায় যে সে গুলির মধ্যে এটার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। অতি সাবধানে অনেক চেষ্টার পর স্কট সাহেব কাশ্মিরী শালের রং ফিরিয়ে আনেন ও পিছনে চাপা পড়া হুঁকা ইত্যাদি আগেকার মত স্পষ্ট করেন। পৌরপ্রতিষ্ঠানকে রিপোর্ট দেবার দেবার সময় স্কট সাহেব জানান—বারান্দায় রাখা উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ডের তৈলচিত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেই অন্যান্য কায়দার চেয়ে তৈলদ্বারা অংকনের উৎকৃষ্টতার উত্তম প্রমাণ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এই দেখে চিত্রকরদেরও সাবধান হওয়া উচিত যাহাতে মূল্যবান ছবিতে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন নতুন দাওয়াই ব্যবহার না হয়। বর্তমানে এই ছবি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে।

(১) "রামমণির তৃতীয় সন্তান রাসবিলাসী দেবীর বিবাহ হয় তখনকার ফরাসী সরকারের দেওয়ান চন্দননগর বিবির হাট নিবাসী রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভোলানাথের সঙ্গে। ভোলানাথ শ্বশুরালয়েই থাকতেন। চন্দ্রমোহন তাঁর ছোট ছেলে। তিনি বিবাহ করেন নাই। ইনিই বাংলার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার প্রথম ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্টার অফ অ্যাসিওরান্স। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি নীলকরদের ও জমিদারদের অত্যাচার দৃঢ়হস্তে দমন করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি "তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত এক বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য বাহির মহলের বৈঠকখানার উপরে স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত হইল, তাঁহার আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল।"

(২) ২৬শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী ১৮৪২

৩। দ্বারকানাথ নিজের ৮টি পরগণা (অর্থাৎ অধিকাংশ সম্পত্তি) এই ট্রাষ্টডিড ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে এই সম্পত্তির সংখ্যা 'চারিটি' বলিয়া লিখিয়াছেন কারণ দলিলে একজায়গায় ঐরূপ উল্লেখ আছে।

৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

৫। দ্বারকানাথের ভায়রাভাইয়ের বাবা

৬। এই দলিল এখন রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়ামে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেক্সানে আছে।

৭। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট

৮। মৃত্যুতারিখ ২১শে জানুয়ারী ১৮৩৯, ৯ই মাঘ

৯। বাহান্নজনের মধ্যে এদেশীয় ছিলেন রুস্তমজী কাওয়াসজী, রসময় দত্ত, গৌরমোহন আড্ডি, রাধামোহন বাড়ুয্যে, রাধামাধব রায় ও মতিলাল শীল

১০। "দ্বারকানাথ রামমোহন রায় কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পরিবারে প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলিয়া দেন নাই, এবং বহুকাল পর্যন্ত সে-সকল পূজা নিজেও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাটীর জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী প্রতিমা কলিকাতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। শেষ জীবনে তিনি নিষ্ঠার সহিত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়।" কিন্তু এই সময়ে তিনি নিজে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন

না, পূজা-পার্বণে ঠাকুরদালানে উঠিতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া দেব-দেবী দর্শন করিতেন।

১১। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার ১৩ জানুয়ারী ১৮৪২-এর সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য

১২। ৮ই জানুয়ারী ১৮৪২

১২ (ক)। এর পরদিনেই জন্‌ম্যাক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে পত্র লিখে জানান যে প্রসিদ্ধ লেখক জন ফষ্টার যখন ষ্টেপল্‌টন্‌গ্রোভে বাস করিতেন তখন ম্যাকসাহেব সেখানে প্রায়ই আনাগোনা করিতেন। তাঁহার বাটীর ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্তন করিতেন। তিনি বলিতেন সেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য একজন আসিয়া কিনিয়া লইয়াছে। কবরের চিহ্নমাত্র নাই—মাসিক বসুমতী ফাল্গুন ১৩৩৬

১৩। এঁর বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার উপর দ্বারকানাথের বিশেষ আস্থা ছিল কারণ মৃত্যুর সময় তিনি এঁকেই তাঁর ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথের অভিভাবক করে যান। সরকারী কাজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তিনি ৬ তারিখের সভায় আসতে পারেন নি সে কথা টর্টন সাহেব জানিয়েছেন।

১৪। এই অভিনন্দন পত্রটী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ের কাছে ছিল। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কতকগুলি জিনিষ আমায় দেন। তন্মধ্যে দ্বারকানাথ সংক্রান্ত কাগজ আমার মাতুল শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের দ্বারকানাথ সংক্রান্ত সংগ্রহের মধ্যে রাখিতে দিই। বর্তমানে ইহা রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহালয়ে আছে।

১৫। বেঙ্গল হেরাল্ড ৮ জানুয়ারী ১৮৪২

১৬। প্রথম রাত্রি কাটে কুলিবাজারে। তারপরদিন সন্ধ্যার জাহাজ নঙ্গর করে কুলপীতে। তৃতীয় দিনে সাগরদ্বীপ ও স্যাণ্ডহেডস্ পৌছায়।

১৭। এই লোকটা ছিল পাকা বাবুর্চি এবং বিলাতের ভোজনবিলাসীদের পোলাও ও অন্যান্য দেশী খাবার খাইয়ে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। কয়েকটি বড়লোকের বাড়ির প্রধান পাচকরা নাকি এর কাছে এসে নানা মোগলাই রান্না শিখেছিল। এ সমস্ত খাবারের নামকরণই হয়েছিল "ডর্কানাট ডিসেজ"।

## যুগপ্রবাহ ও নাটকের ঋতু বদল

দেশের মঞ্চে পর্দায় দেখা যায় যে এক একটি সময়ে এক এক বিশেষ ধরণের নাটকের প্রচলন হয়। তখন বুঝতে হবে যে দেশের লোকের সেই বিশেষ ধরণের নাটকের প্রতি সমর্থন আছে অর্থাৎ দেশের লোকের উপর একটা বিশেষ বক্তব্যের প্রভাব পড়েছে।

তরজা, নাটক, গান ইত্যাদির দেশ—আমাদেরই বাংলা দেশ। নাটক বলতে অবশ্য যাত্রা, মঞ্চ, ছায়াছবি ইত্যাদির সবগুলোকেই নাটক বলে বোঝাতে চাইছি। এদেশে নাটক অভিনীত হবার পর থেকে তার নানা বিবর্ত্তন ঘটেছে। নৃত্য, গীত, মঞ্চ ও ছায়াছবি নানাকালে, নানা ভাবধারায় সিঞ্চিত হয়ে নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। মাঝে মাঝে হয়ত চলার পথে নাটক-জগৎ থমকে দাঁড়িয়েছে; পুরানো বস্তাপচা জিনিসের একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আবার নানা চাহিদার মধ্য দিয়ে নূতনত্ব এনে আবার মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে।

ধর্ম্মমূলক নাটক ছেড়ে ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নাটক পরিবেশিত হয়েছে। তদানীন্তন শাসকবর্গ, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সম্বলিত দেশাত্মবোধ নাটককে একেবারে সহ্য করেনি। তাই অনেক নাটক হয় অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে বা কোন কোনটির চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। সমসাময়িক জন-জীবনের উপর তার প্রভাব কম পড়েনি। "কুলিন-কুল-সর্বস্ব", "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", "নীলদর্পণ", "সিরাজদ্দৌলা" ইত্যাদি নাটকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবেশিত হয়ে বিশেষ বিশেষ যুগে, বিশেষ বিশেষ আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। কালের নিয়মে এক একটি আন্দোলনে ভাঁটা পড়লেও তার রেশ কিন্তু মিলিয়ে যায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হোল, কারণ তখন বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবন একটা বিশেষ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল, দেশের হীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সুযোগ দিয়ে, দেশের সমস্ত খাদ্য গুদামজাত করে পচান হতে লাগলো, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক মহাবিপর্যয় দেখা দিল। বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ নারী, শিশু ও পুরুষ রাস্তায় রাস্তায় মরলো, তবুও লোকের মুখের গ্রাস পচিয়ে গোপনে নষ্ট করা হোল। প্রকৃত অবস্থা জানবার মতো কোন উপায় বা উপকরণই ছিল না। কেননা তখনকার সংবাদপত্রাদির প্রকৃত অবস্থা পরিবেশন করবার মতো সাহস ছিল না বা পুঁজিপতিদের রক্ষিতা হয়ে তারা বিকৃত খবর পরিবেশন করছিল। কিন্তু তা সত্বেও সামগ্রিক জীবনের প্রকৃত অবস্থাকে ঢেকে রাখতে পারা যায়নি।

বাংলা দেশের নানা জায়গায়, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গ ও শ্রীহট্ট জেলাতে লোক সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য ও গাঁথা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে দেশের ও জনজীবনের প্রকৃত চেহারা ফুটে উঠেছিল।

পাঞ্জাব, আসাম, কেরেলা, অন্ধ্র ইত্যাদি রাজ্যে প্রায় একই সময়ে লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, গাঁথা ও গান দিয়ে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হতে লাগলো। আর ইতিমধ্যে জন্ম নিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।' তাঁরা ছায়া-নৃত্যনাট্য "The Call of the Drum" পরিবেশন করল, কোলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে সঙ্গে সঙ্গেই "নবান্ন" নাটক অভিনয় করে দেশের নগ্নরূপ তুলে ধরলো ও ভারতের নবনাট্য অন্দোলনের এক মহা সূচনা নিয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে রইল। "মেরা বাংলা ভুঁখা হ্যায়" গান গেয়ে বাঙালী চারণ দল দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো ও রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য, গীত ও পোষ্টার নাটকের সাহায্যে দেশের রূপকে তুলে ধরলো। "ধরিত্রী কি লাল" ছায়াছবিটিও তারই পরিণতি হিসাবে দেখা দিল।

শাসন বদল ও ক্ষমতা দখলের সন্ধিক্ষণে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আবার নবনাট্য আন্দোলনের গতি আপন পথ বেয়ে চললো। উত্তরোত্তর নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সৃষ্টিধর্মী বক্তব্য তারা পেশ করলো। জহরলাল, আজাদ প্যাটেল এবং দেশের নিরপেক্ষ প্রকৃত জ্ঞানী গুণী সাধারণ লোক মুগ্ধ হয়ে দেখলো এবং স্বীকার করতে বাধ্য হল যে এর দ্বারা দেশের লোক প্রভাবিত হতে পারে। সত্যি, হোলও তাই। পুরানো নাটকের ধারা, গণনাট্য সংঘের বলিষ্ঠ ভাবধারার ও নূতন দিনের হাতছানির কাছে দাঁড়াতে পারলো না। মানবজীবন স্বভাবতই বিবর্তনশীল, যখন মানুষের ভিতর চেতনাবোধ আসে, তখন তারা নৃত্য, গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিছক সময় কাটানোর আনন্দই চায় না, চায় প্রকৃত জীবনকে জানতে ও বলিষ্ঠ বিষয়মুখী বক্তব্য শুনতে, তাই তারা ভাগ্যের দোহাই "ভাববাদী" নাটককে একেবারে নাকচ করে দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের "বাস্তববাদী" ও প্রগতিশীল নাটকের দিকেই ঝুঁকে পড়লো ও জীবনধর্মকে প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। রাজনীতি ও সমাজনীতি, শিক্ষা ও অর্থনীতি এর প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে, তাই প্রত্যেকটি মানুষের জীবন এদের একটিকেও বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

নবনাট্য আন্দোলন জনসাধারণের উপয় নিয়ে এলো এমন একটি প্রভাব যার ছাপ পড়লো মানুষের ব্যক্তিজীবনে, তার জীবনের প্রত্যেকটি নীতিতে। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সঙ্গে একই ভাবধারাতে প্রভাবিত হয়ে আরও অনেক নাট্যসমাজ গড়ে উঠলো এবং দেশের নাটকের ধারা একেবারে পাল্টে দিল, ফলে পেশাদারী মঞ্চগুলোও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, সামগ্রিকভাবে না হলেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হোল।

নৃত্য নাট্য হিসাবে "The Call of the Drum" যে নবযুগের সূচনা নিয়ে এসেছিল তার পরিস্ফুরণ অবশ্য পরবর্তী যুগে ততটা হয়নি; যদিও বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে নানা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে। উদয়শংকরকে বাদ দিলে অবশ্য ইদানিংকালেয় "কাজ নহে" নৃত্যনাট্যটি একটি সার্থক সৃষ্টি। গানের দিকটাতে কিন্তু একটা নূতন ধারা বয়ে এলো "নবজীবনের গান" "গণনাট্য সঙ্গীত" ইত্যাদি নামে নামকরণ হয়ে এক শ্রেণীর গান জীবনের দিশারী হিসাবে প্রতিভাত হয়ে রইল। এই সব সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি জীবনকে তুলে ধরলো। জনগণের জয়গান করল এবং গতিশীল জীবনের ইঙ্গিত এনে দিল।

যদিও শোধনবাদীরা মুখোশ পরে এসে নিরন্তর বাধার সৃষ্টি করতে লাগলো তবুও ইদানিং-কালে এই নবনাট্য আন্দোলন দেশে সৃষ্টিধর্মী নাটক দিয়ে জোয়ার বইয়ে দিল। বাংলাদেশে নাট্যশিল্প পরিচালনার ব্যাপারেও এক নবযুগের সৃষ্টি হোল। "লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ" সমবায় প্রথায় নাট্যশিল্প পরিবেশন করতে লাগলো মিনার্ভা মঞ্চটি নিয়ে। আবার শৌভনিক সম্প্রদায় মুক্ত অঙ্গনে প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করে আর এক নূতন দিনের সূচনা এনে দিল। যাত্রার ক্ষেত্রেও যুগান্তর এলো। তিনদিক খোলা রেখে,নূতন আঙ্গিকে নবধারায় যাত্রা পরিবেশিত হতে লাগলো। ছায়াছবির জগতও কিন্তু পেছনে পড়ে রইল না। সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন, তপন সিংহ ইত্যাদিরা ছায়াছবির ক্ষেত্রেও ভারতে এক নবযুগের সৃষ্টি করলো এবং ভারতের বাইরেও পেল অভূতপূর্ব সমাদর।

জনসাধারণের দৃষ্টিও স্বভাবতই এদিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো, যুক্তিহীন জীবনকে এড়িয়ে জীবনাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়লো দেশের জনসাধারণ। নূতন আঙ্গিক, প্রয়োগনৈপুণ্য ও বাস্তবমুখী বক্তব্যের সাহসিকতা দেখে অভিভূত হয়ে গেল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষানৈতিক জীবনকে চুল চিরে বিচার করে দেখতে শিখল—আরও শিখল "Art for arts sake" নয় "Art for peoples sake"।

আমরা সাধারণ মানুষ আশাকরে বসে আছি কবে নাটক-জগৎ "প্রকৃতিবাদ", "বাস্তববাদ", 'নববাস্তববাদ'কেও ছাড়িয়ে আরও শাশ্বত সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাবে এবং জীবন দর্শনের নূতন দিনের অরুণালোকে নব নব ভাবধারায় সিঞ্চিত করে, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখাবে।

অনিলবরণ রায়

## কবিতায় নেপথ্য প্রকৃতি

পৃথিবীর অন্তিম অন্ত কোথায়? ঋকবেদের ঋষি তার উত্তরে বলেছেন--এই সৃষ্টির বেদীই পৃথিবীর অন্তিম অন্ত। উর্ধ্বের অবতরণের সকল সার্থকতা, ব্যক্তরূপ, স্থায়ী-আকার লাভ করেছে এই জগৎ প্রকৃতির মধ্যে। তাই মানুষ ও প্রকৃতি, সীমায় ও অসীমে, আকাশের ব্যাপ্ত মংগলালোকে ও ধরিত্রীর সংকোচিত অজ্ঞানময় তমসায় চলেছে এক জ্যোতিঃ স্রোতের উজান ভাঁটা। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ।

আমাদের জীবন ঐ তীব্র আলোক প্রপাতের মধ্যে নিমজ্জিত। দিনে রাতে, প্রহরে প্রহরে আলোর বর্ণ পরিবর্তন রচনা করে চলেছে—এক অলিখিত মহাকাব্যের উজ্জ্বল প্রেক্ষা। পাতা ঝরছে' ফুল ফুটছে, মুহূর্তগুলি নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, আর মেলে ধরেছে এক একটি বিস্ময়ের রাজত্ব। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় উদ্ঘাটিত করছে এক একটি সম্ভাবনার দুয়ার। প্রতিটি মানুষের জীবন তাই মহাকাব্যের এক একটি পৃষ্ঠার মত।

অন্তরীক্ষ জুড়ে চলছে এক অনাহত বাণীর নেপথ্য সংগীত। কিন্তু আমাদের প্রগল্ভ বৈখরী চিৎকারের মধ্যে তা অশ্রুত থেকে যায়।—যদি কখনও একটি শব্দের মধ্যে সমগ্র মহাকাব্যের ধ্বনিরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠতে পারতো;—অথবা যদি একটি ঝরা পাতার মধ্যে সমগ্র জগৎ প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাস শোনা যেতো; অথবা একটি তারের কম্পনে ক্রন্দসী আকাশের কান্না উন্মোথিত হয়ে উঠতে পারতো,—তখনই হোত সংগীতের এবং কবিতার মুক্তি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কেবল 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'।

জীবন ও প্রকৃতি পরস্পর অভিন্ন হয়েও তাই এখনও স্বতন্ত্র। তাই আমাদের দীর্ঘশ্বাসে যদিও পৃথিবীরই বায়ু, তবু সেই সন্তপ্ত বায়ু আমার বুকেরই হাহাকার, পৃথিবীর নয়, প্রকৃতিরও নয়। প্রহর শেষে আলোয় রাঙা চৈত্রমাসের গোধূলিতে আমার মন উঠলো রাঙিয়ে তার সেই বর্ণ একমাত্র আমারই। কেননা Meredith-এর ভাষায় বলা যায়,—"Colour, the soul's bridegroom"।

তবু কিন্তু প্রকৃতির পৌষফাগুনের পালাতেই আমাদের কান্না হাসির দোল। সৃষ্টির প্রাক্-উষায় দেবগণের মন্ত্রধ্বনি থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের সকল ভার ও শ্রান্তি নীরবে বহন করে চলেছে প্রকৃতিই। সকল অস্ফুট উচ্চারের মধ্যে যে সৌন্দর্য জাগছে, তা ঐ প্রকৃতিরই মোহন রূপের সংগে মিশে যাচ্ছে।

আমরা চোখ মেলে যা দেখি তা প্রকৃতিরই মোহন রূপ। একটু নীরব হলে যে গান শুনি তা প্রকৃতিরই সংগীত। আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ঐ নৈর্ব্যক্তিক রূপকে ছুঁতে পারে না। বড়জোর আমাদের মানবীয় ঐশ্বর্য প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পারি অতি দুর্লভ ক্ষেত্রেই। কারণ

প্রকৃতির নেপথ্য সংগীত কীট্স্ বলেছেন—

The song seraphically free
From taint of personality.

প্রাচীন মহাকাব্যের যুগ থেকে প্রাক্-আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শক্তিকে দেখা হয়েছে একটা দিব্য রূপের ব্যক্তিত্ব দিয়ে। আমাদের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি কিংবা গ্রীকদের জুনো, জুপিটর, এপোলো, এত্তি—সবই প্রাকৃত শক্তির, দেববিগ্রহ। ঐসব কবিরা ছিলেন 'রূপকৃৎ'—'স্বরূপকৃত্'। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের দিকে তাঁরা সময়ে সময়ে তাকিয়েছেন কেবল তাঁদের শিল্পরূপকে সুঠাম করবার জন্য, একটু রঙীন একটু অলঙ্কৃত করে নেবার জন্য। কখনও বা পটভূমি অথবা সীমানা টানবার জন্য। জীবনের সংগে প্রকৃতির যোগ ছিল তখন কেবল একটা myth অথবা দৈবপ্রতিরূপ বা কোনো divine image-এর মধ্য দিয়ে। মানুষের বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস তখনও প্রকৃতির গায়ে লাগেনি।

ক্রমশঃ ঐ ব্যবধান সরে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হতে লাগল—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা

ঐরকম শান্ত শ্রীময়ী কল্যাণী গৃহবধূর রূপ নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতি আমাদের ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন একান্ত আপনজনের মত। কিন্তু এ হল কেবল অচেনা যে তাকে কোনো পরিচিত নামে ডাকা। তার বেশি নয়। কেননা এখানেও দৃষ্টিভংগীতে সেই রূপ-সৃষ্টির মোহ। সেই ব্যক্তিত্ববোধের মায়া।

আধুনিককালে এসে এই দৃষ্টিভংগী গেল পাল্টে। আধুনিকশিল্পীর তুলিতে রেখা হয়, কিন্তু রূপ ফোটেনা, জাগে ভাব। কবির অনুভূতি দৃষ্টিও তেমনি কোন রূপ দেখে না। রূপকে ভেঙে বিদীর্ণ করে তার ভাবচ্ছন্দকে বুক দিয়ে অনুভব করতে চায়। কেননা যা ছিল নিতান্ত দৃশ্য, তাই এখন প্রতীক হয়ে উঠেছে। এতকাল প্রকৃতি ছিল রূপময়ী—এখন আধুনিক কবির কাছে প্রকৃতি হয়েছে কুহকিনী। কেননা রূপটাই একটা কুহক। রূপের আবরণে সত্য রয়েছে আড়াল হয়ে। তাই একটি ফুলের কেবল রূপ সৌন্দর্য দেখার অবসর আজকের কবিদের কারও নেই। বরং রঙের বন্ধনে সৌন্দর্যের যে মূর্চ্ছা তাকে তাকে বিদীর্ণ করে মুক্তি দেওয়াই তাদের সাধনা। রূপ আমাদের সত্যকে চেনায় না। সত্যের ভান করে। রূপের এই ভানকে কবি ইয়েট্স্ বলেছেন—শয়তানের হস্তাবলেপ। রূপের মুখোস পরেই কেবল আমরা পরস্পরের কাছে চিরকাল অচেনা হয়ে রয়েছি। রূপের পূজারী রবীন্দ্রনাথের তাই শেষ জীবনের আপেক্ষ—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ ক'রি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।

চোখ মেলে আমরা যা দেখি তা হল রূপ। আর চোখ বুজে যখন দেখি তখন পাই ভাবচ্ছবি। এ এক মধুর বৈপরীত্য। প্রাক-আধুনিক যুগটি ছিল প্রধানত ভাববাদী, তাই যেন তাদের দৃষ্টিভংগী হয়েছিল objective। কিন্তু আধুনিক যুগটি প্রধানত বস্তুবাদী, তাই যেন তার দৃষ্টিভংগী হয়েছে মূলত subjective। এখন প্রকৃতিকে দেখছি নিজের মধ্য দিয়ে ভাবের ঘোরে। Meredith-এর কথায়—Our inmost in the sweetest way.

তাই আমাদের বুকের প্রতি নিঃশ্বাসে প্রকৃতির রাসমঞ্চ কেঁপে কেঁপে উঠছে। সন্ধ্যার আকাশে যখন ইমনের তান লাগে, তখন মনে হয় যেন সে আমারই সারাদিনের প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর আকাশ স্পর্শ করেছে। বনস্পতির শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় হাওয়ার যে আনন্দ করতালি তা যেন আমারই হৃদয়ের আহ্লাদ, খুসীর তরঙ্গ। বিশ্বশক্তির সাথে আজকের জীবনের যে যোগ সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্রকৃতিরই মাধ্যমে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ঘটে থাকে তা হচ্ছে মিলনের নামে প্রকৃতির উপর আত্মক্ষেপণ একটা অধ্যারোপ। বাইরে যে আলো তা আমারই অন্তরের বিচ্ছুরিত স্বপ্ন। স্বচ্ছ জলে পড়ছে কেবল নিজেরই ছায়া। এমনি করে রূপের দুয়ার ভেঙে শেষে পৌঁছে গেলাম আমারই মনের মণি-কোঠায়। এই ভাবে প্রকৃতিকে আপন করে পেতে গিয়ে আরও যেন বেশী পর করে দিলাম। এও এক দুঃখ। এই বর্তমানের দুঃখের মধ্যেই জেগে উঠছে ভবিষ্যতের জন্য এক তীব্র আবেগ। 'Pain for the present' থেকেই জাগছে 'passion for the future'।

অথচ দৃষ্টি যাদের আরও ধ্যানস্থ তাঁরা প্রকৃতিকে দেখতে গিয়ে চলে যান জগৎ প্রকৃতির গভীরে প্রসুপ্ত আত্মার গহনে। যার মধ্যে জীবন ও প্রকৃতি উভয়ই নিমজ্জিত। যেমন—

Trees motionless in an ecstasy of rain.

অঝোর বৃষ্টিধারার মধ্যে একটি নিঃসাড় বৃক্ষের রূপ ঐ 'ecstasy' শব্দটির ধ্যানের মধ্য দিয়ে সকল দৃশ্য ( তার সাথে দ্রষ্টাও ) উত্তীর্ণ হয়েছে উর্ধ্বের পরা প্রকৃতির নেপথ্যে। যা কিনা জগৎ ও জীবনের নেপথ্য সংগীত।

কবিতা আজ তাই সম্পূর্ণ impersonal। রঙীন দৃশ্যের ছবি থেকে সব রঙ সব রূপ ধুয়ে ফেলছেন কবি ; যতক্ষণ না নিরপেক্ষ ধূসর পশ্চাদপটখানি ফুটে ওঠে। আকাশ নয়, এমনকি তার গভীর নীল রঙটুকুও নয়, শুধু তার অসীম ব্যাপ্ত ধ্যান মৌন সমাহিতিই কাব্যের বিষয়। প্রকৃতির ঐ আত্মার গহনে অবগাহন করার জন্য প্রথমে জড় দৃশ্যকে জীবন্ত ও সফল করে তোলা হয়। যেন সে এক সজ্ঞান সত্তা। তার একটুখানি আলো, একটুখানি অন্ধকার, যেন আধুনিক কাব্যে সহাস বন্ধু অথবা হিংস্র গুপ্ত ঘাতক হয়ে দেখা দেয়। পরিবেশ, দৃশ্যাবলী যেন কৌতূহলী দর্শক। বিদ্রূপে কৌতুকে তারা যেন মানুষেরই মত আমাদের উৎসাহ দেয়, লজ্জা দেয়, ভালবাসে, ঘৃণা করে। তাদের অবস্থান যেন এক একটি সাংকেতিক মুদ্রা বা প্রতীক। এ হল আত্মভাব নিয়ে বাইরের দিকে তাকানো। অন্যভাবে আবার কেবল কল্পনা ও বুদ্ধি দিয়ে নিজের ধ্যান, চিন্তা, বাসনা, কামনাকে জগতের সাথে মিলিয়ে নেবার প্রয়াশ করা হয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের মূলে যে অধ্যাত্ম সত্তা, এ হল, তারই সংগে মিলিত হবার জন্য সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান এক চেষ্টা। তার দৃষ্টান্ত আজ

যেকোন কবিতার ছত্রে ছত্রে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা, অবশ্যই বিবেচনার বাহিরে। কেননা চেতনা যাদের নাভিমূল থেকে উপরে ওঠেনি, প্রাণ ও প্রবৃত্তির নিম্নতর স্তরে যাদের নিত্য বাস, তাদের সংগে প্রকৃতির যোগ স্বভাবতই soler plexus-এ।

কিন্তু যাদের চেতনা অন্তত: মানস ভূমিতে অধিষ্ঠিত, তাদের কাছে মূঢ় মূক প্রকৃতি প্রথমে হয়ে ওঠে বাঙময় গূঢ়ার্থবাহী প্রতীক, তার পরে ক্রমশঃ সমস্ত Formগুলি পরস্পরের মধ্যে ভাঙাগড়া হয়ে মিলে মিশে একসময় হারিয়ে যায়, তখন থাকে কেবল চিন্তার স্মৃতি, অথবা নির্বেদ ভাবের প্রশান্তি, অথবা আত্মার ধ্যান।

অমলেশ ভট্টাচার্য

**কান্তা ও কাব্য।** ডক্টর হরিহর মিশ্র ॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬ ॥ পাঁচ টাকা ॥

ভারতীয় আলংকারিকেরা শৃঙ্গাররসের চেয়ে খাতির করেছেন বেশি করুণরসকে। বাল্মীকি মুনির শোক থেকে শ্লোকরচনার গোড়াপত্তনের কাহিনী তো সবাইকারই জানা। তাছাড়া অভিনব গুপ্ত সোজা কথায় বলেই ফেলেছেন—সম্ভোগ-শৃঙ্গারের চেয়ে মধুরতর হচ্ছে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, করুণরস তার চেয়েও মধুরতম। ভবভূতির উত্তররামচরিতের টীকায় বীররাঘবও শৃঙ্গাররসকে শেষ পর্যন্ত নাকচ করে গেছেন, বড় আসন দিয়েছেন করুণকে। কিন্তু জগৎটা তো আর আলংকারিকের বিধান মেনে চলে না, চলে আপন রসের ধারায়। সেখানে মিলনের মন্ত্র বাজছে অহরহ, সেখানে সঙ্গমের ইচ্ছে বইছে প্রাণে প্রাণে, পুরুষে প্রকৃতিতে। সৃষ্টি তো এমনি করেই জেগে রয়েছে জীবনের গতিতে। তাই শৃঙ্গারকে এড়িয়ে গেলে মোহ ভেঙে মোহান্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু রসের কোঠায় আমরা বোধ হয় দেউলে হয়ে যাব। 'কান্তা ও কাব্যে'র লেখক ডক্টর হরিহর মিশ্র তাঁর বইয়ের ভূমিকায় এ ব্যাপারে ভারী সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন—"······এই বিশাল পৃথিবীর বক্ষে যে বিপুল জনতা তাহাদের বিচিত্র দৈনন্দিন জীবন লইয়া ব্যাপৃত আছে তাহারা সকলেই কিছু তত্ত্বজ্ঞ নহে অথবা যোগীর মত সকল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া যোগসাধনায়ও তাহারা নিরত নহে। জগৎ ও জীবনকে তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করে এবং হৃদয়বৃত্তির সমস্ত তাড়না ও প্রেরণাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আপন কক্ষপথে ঘুরিতে থাকে।"

সেজন্য ভোজরাজ থেকে কর্ণপুর গোস্বামী এবং আরো অনেকেই শৃঙ্গাররসকে সব রসের মূল বলতে চান। ভোজরাজের মত হচ্ছে—এই শৃঙ্গার থেকেই রতি প্রভৃতির জন্ম। কর্ণপূর গোস্বামী অবশ্য ঠিক শৃঙ্গাররসের কথা বলেন নি। তিনি নতুন একটি নাম ব্যবহার করেছেন—প্রেমরস। বৈষ্ণবেরা আবার এই শৃঙ্গাররসকেই উজ্জ্বলরস মধুররস বলে একে অলৌকিকতার ধাপে নিয়ে গিয়েছেন। জীব গোস্বামী তাঁর 'প্রীতিসন্দর্ভে' রতি বলতে সেই ধরণের প্রীতিকেই বুঝিয়েছেন যেখানে উল্লাস মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, আর চড়া-সুরে-বাঁধা মমতায় ঝলমলে যে প্রীতি তারই নাম দিয়েছেন প্রেম। দণ্ডীর ধারণা কিন্তু, উপচে-পড়া রূপের সঙ্গে মিশে প্রীতি পরিণত হয় শৃঙ্গাররতিতে। তবে বৈষ্ণবেরা যেমন কান্তারসের প্রীতিকে কাম-সামান্য-চেষ্টা ও শুদ্ধপ্রীতি-চেষ্টা এই দুই অর্থে দুটি ভাগ করেছেন—স্বীয়ানুকুল্য তাৎপর্য ও প্রিয়ানুকুল্যতাৎপর্যা, অভিনব গুপ্তও তেমনি স্থুল শৃঙ্গাররসের পাশাপাশি শৃঙ্গাররতির একটা শুদ্ধ মহিমার কথা বুঝতে পেরেছেন; তাই তিনি বলেছেন—মিলনে ও বিরহে একই রতি।

সে যাই হোক, কান্তাবিষয়ক রতিভাব যে স্থায়ীভাব—এ ব্যাপারে রসশাস্ত্রের রচয়িতাদের সঙ্গে ডক্টর মিশ্রের মত আমরাও একমত। কারণ এই কান্তারতি সৃষ্টিনিয়মে আমাদের মনের গভীরেই লুকোনো রয়েছে, সেখানেই বয়ে চলেছে এর ধারা, সেখান থেকেই তা বেরিয়ে আসে উছলে-ওঠা ঝরণা হয়ে।

ধু ধু—অতীত থেকে সুরু করে হাল আমল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে এই কান্তারতিকে নিয়ে অজস্র কাব্য নাটক লেখা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে কবিরা অর্ধেক মানবীর সঙ্গে অর্ধেক কল্পনা মিশিয়ে তাঁদের নায়িকার রূপ গড়েছেন, রূপসজ্জা গড়েছেন নিপুণ রূপকারের মত। কবিই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই তিলোত্তমা-কান্তার প্রতিটি চালচলনকে ঠমক-ইশারাকে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা কোণ থেকে আলো ফেলে। এমন কি দেবদেবীর জীবনলীলা যেখানে কাব্যের বিষয়বস্তু সেখানেও দেবীর রূপ ও শৃঙ্গাররতি বর্ণনায় কবিভক্ত সাজেন নি, অসংকোচে তার কবিদৃষ্টিকেই বড়ো করেছেন। বৈষ্ণবেরাও বলেছেন ভগবান ও তাঁর পরাশক্তির ভেতরে শৃঙ্গারাভিলাষের কথা।

এ ছাড়াও কবিরা মানবেতর প্রাণীর প্রণয়-বর্ণনায় এবং নিসর্গের আলম্বনে শৃঙ্গাররস সঞ্চার করেছেন। আলংকারিকেরা একে শৃঙ্গারাভাস বললেও এরা যে আমাদের মনকে মাতাতে পারে বিশুদ্ধ রসের মতই, তা আমাদের মানতেই হবে। প্রকৃতিতে কান্তাভাব আরোপ সম্পর্কে ডক্টর মিশ্রের সিদ্ধান্তটি চমৎকার—"সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গবিধি এ বিষয়ে কবিদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। প্রসঙ্গানুকূল সুযোগ পাইলেই তাহারা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক অচেতনার্থক শব্দগুলিকে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা অর্থে প্রয়োগ করিয়া তাহাদের উপর চেতনোচিত প্রণয়-ব্যবহার আরোপ করিয়াছেন। এই আরোপের ফলে কাব্য-শিল্পে শৃঙ্গাররসের রূপায়ণ নিরতিশয় ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।"

'কান্তা ও কাব্যে' লেখক তাঁর আলোচনাকে তিনটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন—পূর্বভাষণ, কান্তারূপ ও কাব্য, কান্তাভাব ও কাব্য। পূর্বভাষণ অধ্যায়ে তিনি সেকালীন সমাজে নারীর স্থান কামশাস্ত্রের ইতিহাস ও কামকলা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ কথাও জানিয়েছেন যে, বেদ-পুরাণের যুগের রচনায় কান্তাপ্রসঙ্গ থাকলেও বড় বেশি আদর্শনিষ্ঠার ফলে তা খাঁটি কান্তারতি হয়ে উঠতে পারে নি। বরং সে তুলনায় পুরাণ-যুগের পরেকার কাব্য-নাটকেই কান্তারতির উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এজন্যে ডক্টর মিশ্র পরের দুটি অধ্যায়ে কান্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপ-লাবণ্য-প্রসাধন এবং তার হৃদয়বৃত্তির চালচলন আর ছলাকলার ঢালাও আলোচনায় পুরাণ-পেরোনো যুগে লেখা সংস্কৃত কাব্য-নাটক, অলংকারশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, বৈষ্ণব পদাবলী এবং ভারতচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আশ্রয় করছেন। নানান রচনা থেকে এরকম অজস্র নমুনা তুলে দেবার ফলে আলোচনাটি একদিকে যেমন সরস হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সেকাল থেকে সুরু করে একাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে শৃঙ্গাররতির একটি স্পষ্ট ধারা পাঠকের সামনে ফুটে উঠেছে।

মোদ্দা, লেখক তাঁর 'কান্তা ও কাব্যে' রসশাস্ত্রের ভয়াবহ প্রবন্ধ লেখেন নি, সুখবহ আলোচনা

করেছেন। পাঠককে সামনে রেখে তিনি যেন গোটা ব্যাপারটা সহজ করে বুঝিয়ে বলেছেন। এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা। লেখক নিজে সুরসিক—বৈরাগী নন—অনুরাগী। রসের ছোঁয়ায় তাঁর ভাষাও তাই মিঠে হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কোনরকম গোঁড়ামীর মধ্যে তিনি বাঁধা পড়েন নি; দল-মতের ওপরে উঠে তাঁর সবকিছুকে যাচাই করবার মনোভাবটি ভালো লাগলো।

চলনসই সাজগোজে এমন একখানি সত্যিকারের স্বাদু রচনা আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে লেখকের, আর সে সঙ্গে প্রকাশকেরও, সাধুবাদ বরাদ্দ হোক। আশা রাখি, বইটি রসিকসভায় আদর পাবে।

দেবব্রত চক্রবর্ত্তী

## নিয়মাবলী

**প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা**

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

No. C3597 Phone : 23-5155 December'64 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

# সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭১

Sulekha
BLUE-BLACK
Sulekha
SULEKHA WORKS LTD.
CALCUTTA

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA

দ্বাদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

## নিয়মাবলী

**প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

# ধর্ম ও প্রাগ্-আধুনিক বাংলা সাহিত্য

**দিলীপ চট্টোপাধ্যায়**

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দুটি প্রধান লক্ষণ—পল্লীকেন্দ্রীকতা ও ধর্মানুভূতিমূলকতা। শুধু বাংলার প্রাচীন সাহিত্য কেন, পৃথিবীর যে কোনো প্রাচীন সাহিত্য ধর্মানুভূতিমূলক। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মানুষের সভ্যতা যখন আধুনিক কালের দিকে এগোলো তখন কতক শিল্পকলা রইল রাজসভার সঙ্গে জড়িয়ে, কতক রইল ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে। প্রধানতঃ এই দুই রাস্তা ধরে শিল্পকাণ্ড চলল সব দেশেই।" (১) বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের কাব্যরূপও ছিল দুটি—গীতিকবিতার রূপ আর আখ্যায়িকাকাব্যের রূপ। প্রথমটি এই প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে অপ্রত্যক্ষ জগতের দিকে অভিসার যাত্রা করেছে, দ্বিতীয়টি স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যলোকের জীবনস্পন্দনে মুখর হয়েছে। গীতিকবিতার রূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রিত বাংলা সাহিত্য হোল —চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের ধারা। আর আখ্যায়িকা কাব্যের রূপে দেখতে পাই—রামায়ণ, মহাভারত ভাগবত ইত্যাদি ধর্মীয় মহাকাব্য পুরাণ ইত্যাদির বাংলায় রচনার প্রয়াস; চৈতন্য ও বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনী; আর কতকগুলি বাংলায় জনজীবনের আশাআকাংক্ষা দৈবী প্রার্থনার লৌকিক পুরাণবৎ মঙ্গলকাব্যগুলি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ধর্মাশ্রয়ের বাইরে থাকল কেবল মৈমনসিংহগীতিকা ও আরাকানের ইসলামী সাহিত্য। তাহলে দেখা গেল প্রাগ্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত রচনাই ধর্মের পক্ষপুটে লালিত হয়েছে; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একতম নিদর্শন চর্যাপদ,—ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত বিপুল প্রচারিত মধ্যযুগীয় কালবিস্তারে সৃষ্ট সাহিত্যধারার সঙ্গে তার অন্তর্লীন যোগ আছে, তারা যেন একই নীড়ে একই পক্ষীমাতার পক্ষছায়ায় লালিত দ্বিজবিশেষ—তারা একাধারে ধর্ম ও সাহিত্য।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধর্মীয় পটভূমিকা আলোচনা কালে তাই প্রাচীন যুগের স্বল্পকালকে বাদ দেওয়া যায় না, বরং ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতপ্রবাহের মত,—"অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি"—তাদের পূর্বাপর যোগ অব্যাহত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য জনসমাজের গণতান্ত্রিক সাহিত্য। বাংলার অদীক্ষিত জনগণের মধ্যে ধর্মীয় প্রচারে প্রথমে ও পরে তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য এই সাহিত্য বস্তুতঃ রচিত হয়েছে। চর্যাপদের রচনা মহাযোগী বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রচারের প্রেরণা থেকে। আর জনগণের মধ্যে যখনই ধর্মপ্রচার করতে হয়েছে তখনই জনগণের ধর্মমত, জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অঙ্গীকার করে নিতে হয়েছে। সাধারণ লোকায়ত সমাজ পরম "একঃ"-র উপলব্ধি ও ধারণা করতে অক্ষম, তারা সে সমস্ত দেবদেবীকেই মানে যারা তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, পরিচালিত করতে পারে। (২) আর উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধারণা জীবনসত্যকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর রূপকল্পনা অনুষ্ঠান-পরিকল্পনা ইত্যাদিতে নিয়োজিত নয়, তা জীবনের মধ্যে থেকে জীবনকে ছাড়িয়ে জীবনসত্যর পরম ধ্যানের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত।(৩) ধর্ম থেকে সাহিত্য সৃষ্টির তাই অফুরন্ত সম্ভাবনা, (৪) যদিও সাহিত্য অনেক সময়ই ধর্ম নয়। তবে যথার্থ মহৎ সাহিত্য ও ধর্ম এক মানসিক শৃঙ্গের একই গঙ্গোত্রী থেকে উৎসারিত, সেখানে ধর্মে যে লৌকিক বিরোধ তার কোন অস্তিত্বই নেই। সাহিত্য একাধারে জীবনের শিল্পরূপ, জীবনদর্শন ও জীবনসত্যের প্রকাশ। ধর্মের অভিযাত্রা জীবনসত্যের আবিষ্কার ও তার দ্বারা জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ। ধর্ম জীবনকে যথার্থ পথে পরিচালিত করতে চায়, সাহিত্যের সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই, তবে তার কোনো "উদ্দেশ্য না থাকিয়াও অনেক উদ্দেশ্য সাধন করে।" তাছাড়া, ধর্ম ও সাহিত্য উভয়ই হৃদয়োপলব্ধির ব্যাপার, (৫) এবং মানস-রূপসাক্ষাৎকার। সাহিত্যে কিন্তু আছে প্রকাশের গুরুত্ব—সুন্দর প্রকাশ হওয়া চাই।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য যেহেতু জনসমাজের সাহিত্য, এবং ধর্মটা ছিল উর্ধ্বতন আগন্তুক আর্যসমাজের,—তাই আর্যধর্মকে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে অনেক সন্ধি করতে হয়েছিল। লৌকিক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে, বাংলার আরেকটি সুপ্রাচীন ধর্মপ্রক্রিয়া আছে—তা হোল তন্ত্র। লৌকিক ধর্মমত ও ধারণা এবং তন্ত্র-প্রক্রিয়া আগন্তুক আর্যধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাংলার ধর্মীয় ভাবধারার বিচিত্র রূপ প্রকাশ লাভ করেছে। প্রাগ্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এটা একটা প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। একটি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রচুর আলোচনা আছে, কিন্তু তার গ্রন্থবদ্ধ ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করেছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় (৬)। প্রাগ্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশের আলোচনায় যে সূত্রটি এভাবে পেলাম তা হলো—

আর্যধর্ম (মননশীল আধ্যাত্মিক দর্শন পর্যায়ে)+লৌকিক ধর্মমত ও তন্ত্রক্রিয়া=হৃদয়গত উপলব্ধি+জগৎ ও জীবনের রূপরূপক সংকেত : ধর্ম=সাহিত্য।

চর্যাপদের মধ্যে এই সূত্র প্রয়োগ করে যাথার্থ দেখানো যেতে পারে। চর্যাপদের মধ্যে বস্তুতঃ মহাযোগী বৌদ্ধধর্মদর্শনের তত্ত্ব তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে জগৎ ও জীবনের রূপ ও রূপকে

আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে তত্ত্ব অনুযায়ী সাধনার হৃদয়গত উপলব্ধি অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র পাল কথিত "মানবের প্রকৃতি নিহিত সহজ ধর্মের" অনুভব থেকে জগৎ ও জীবনের রূপ-রূপককে বরণ করায় রসানুশীলন ও ধর্মাচরণ মিলিত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে।

মধ্যযুগীয় ধর্মসাধনা ও সাহিত্য রচনার দিকটি এবার আমরা উদ্ঘাটন করব উপরিউল্লিখিত সূত্রানুযায়ী। তার আগে বাংলার মধ্যযুগীয় ধর্মসাধনার গতি-প্রকৃতিটি লক্ষণীয়। বাংলার জনসমাজে প্রথমত মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মমত প্রসার লাভ করেছিল, সেই আমলে ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক ধর্মমত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। মধ্যযুগে তাই দেখা যায় বাংলার সুপ্রাচীন লৌকিক ধর্মমত ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মমতের অবশিষ্টাংশ কিছু এবং প্রভাব ও প্রসার বিস্তারকামী ঐ ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মমত মিলেমিশে বাংলাদেশের এক বিমিশ্র হিন্দু ধর্মমত গড়ে তুলেছে। লৌকিক ধর্মমত বলতে আধিভৌতিক কামনা-বাসনা-প্রার্থনা এবং জগৎ ও জীবনের রূপ রূপকপ্রতীক ব্যবহার; তান্ত্রিক প্রক্রিয়া হোল ধর্মীয় উপলব্ধিকে দেহযন্ত্রের মধ্যে এক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ত্ত করার সাধনা; বৌদ্ধ-ধর্মমতের অবশিষ্টাংশের মধ্যে-শূন্যভাব, জনকল্যাণের করুণার মনোভাব, আগ্য দেবদেবীর পরিকল্পনা ইত্যাদি চলে এসেছে।

—ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মমত সেন আমলে বৌদ্ধধর্মের সংহারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে এগিয়ে এসেছিল রাজশক্তির জয়ধ্বজা উড়িয়ে কিন্তু তার রক্তচক্ষু রক্তনিশানের দৃপ্ত বিজয়াভিযান তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিঘাতে ক্ষান্ত হোল, শান্ত সুবোধ গোপালের মত জনগণের দুয়ারে ধর্না দিল, পূর্ববর্তী প্রচলিত ধর্মীয় ধারাগুলিকে আয়ত্ত করে নিজের মধ্যে ঠাঁই দিয়ে তার omnibus যাত্রা শুরু হোলো। এই বিমিশ্র সম্মিলনগত হিন্দুধর্মমতের অভিযাত্রা সম্ভব হোল ঐ তুর্কী আক্রমণের আঘাতের ফলে। তারপর ঐ সম্মিলিত হিন্দুধর্মমত ও ইসলামধর্মমতেয় পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আরেক পর্যায়।

তুর্কী আক্রমণের আগে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মের অবস্থাটি আগে বুঝে নেওয়া ভালো। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ভাগবত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধর্মের ত্রিধা গতি—প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়,—তবে প্রথমে জ্ঞানমার্গের উপর জোর প্রকাশ পেয়েছিল, তারপর কর্মকাণ্ডের উপর ঝোঁক। কর্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হোল, তাকে আত্মসাৎ করে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বিপুলপ্রকার হোল, গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা বলা হলেও সেই সমন্বয় চেতনা রইল না। ভাগবতে ভক্তির উল্লেখ থাকলেও তা তেমন ব্যপকতা লাভ করল না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম জনসমাজে মন্দির মূর্তি, দেবদেবী পূজার্চনা ইত্যাদি নানান্ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করে প্রসারিত করল। রামায়ণ কাহিনী জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল; রাম সীতা ইত্যাদি সমাজ জীবনের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠালাভ্ করল। বিষ্ণু থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত কালক্রমে ঐশ্বর্যমহিমা নিয়ে এক বিশেষ দেবতা রূপে পরিগণিত হোল, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার যোগ হতে আরও সময় লেগেছে, ইতিহাসের অন্ধকার কালগর্ভে কখন কিভাবে এটা হয়েছে তা আর আর বুঝার উপায় নেই, তবে এর কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়, পরে উল্লেখ করা যাবে। অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে দেবাদিদেব

মহাদেবের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠআসন দখল করে, দেবীদের মধ্যে এক মাতৃদেবী—একদিকে তিনি উমা-পার্বতী-গৌরী-সতী, অন্যদিকে চণ্ডী দুর্গা কালী, যজ্ঞফলভাক বৈদিক রুদ্র ও যজ্ঞফলাধিকারে বঞ্চিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মে অস্বীকৃত ভূতপ্রেত সহচর শিবের মিলন ঘটাতে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর সৃষ্টি। (৭) উমা-পার্বতী-গৌরী-সতী—কন্যা ; শিবপ্রিয়া—গণেশকুমার জননী—প্রেমময়ী পত্নীত্ব ও অনন্ত স্নেহময়ী মাতৃত্ব। তাই মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী, তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী ও কালী। এদের মধ্যে কালক্রমে প্রথমে চণ্ডী বেশ প্রধান্য লাভ করে ; তারপর দুর্গা চণ্ডীকে আত্মসাৎ করে ফেলে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক থেকে দুর্গা পূজা চলেও ; দুর্গাপূজার বর্তমান উৎসরূপ ষোড়শ শতকে রাজা কংসনারায়ণের আমল থেকে। দুর্গাপূজার প্রাধান্যের জন্যে সাধনারক্ষেত্রে দুর্গা বা চণ্ডী প্রাধান্য লাভ করলো না, করল কালী। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তিনটি দেবদেবীর যুগলরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামসীতা যুগল সুপ্রাচীন ও জনপ্রিয় হলেও তার সমধিক প্রতিষ্ঠা উত্তর ভারতে, তাও ষোড়শ শতক থেকে রামচরিত মানসকে অবলম্বন করে। রামকৃষ্ণযুগলের উৎপত্তি অনেক পরে হয়েছে। দ্বাদশ শতক হতে তার ধারা চলেছে ও পূর্বভারতে প্রাধান্যলাভ করেছে। কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, মানসোল্লাস, প্রাকৃতপৈঙ্গল ইত্যাদিতে খণ্ড খণ্ড সামান্য লীলাবর্ণনা নাই। গীতগোবিন্দে প্রথম বিস্তৃত প্রকাশ। হরগৌরীর ধারা ব্যাপক সুপ্রাচীন ধারা, সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে এই দেবদেবীকে এমন সাঙ্গীকরণ করা হয়েছে যে, ধানভানতেও শিবের গীত।

তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরেই আমাদের ধর্মসমাজে বেতসবৃত্তি ও শম্বুকবৃত্তি দেখা গেল, বাধাদানের কোনো ক্ষমতা না থাকায়—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাবার নান্যোপায় হয়ে একদিকে আমাদের ধর্মসমাজকে বিভিন্ন নিয়মকানুন স্মৃতিঅনুশাসনে বাঁধার চেষ্টা হোল অন্যদিকে ভীতিবিহ্বল দুর্বল জাতি কয়েকটি উগ্র শক্তিদেবীর কাছে বরাভয় কামনা করল, নিজেদের আধিভৌতিক ঋদ্ধিচরিতার্থ করবার প্রয়াস পেল। প্রথম প্রয়াস থেকে এল বিশ্বেশ্বর, কুল্লুক, রঘুনন্দন প্রমুখ অতিপ্রাকৃত পণ্ডিতদের স্মৃতিগ্রন্থ ধর্মীয় অনুশাসন রচনা ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রয়াস থেকে দেখা দিল বাংলার লোকজীবনের ধর্মীয় পুরাণবৎ মঙ্গলকাব্যগুলি। তারপর 'লোকনিস্তারিতে', 'লোক বুঝাইতে' রামায়ণ-মহাভারত ভাগবত ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ রচনার প্রয়াস এল। মঙ্গলকাব্যগুলির একটি রূপগঠনতন্ত্র আছে, তাতে একটি অপরিহার্য অঙ্গযোগ দেবখণ্ড যাতে হরগৌরীর কথা থাকবেই এবং সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের সামাজিক নিষ্ক্রিয় নরনারীর জীবন চিত্রই উদ্ঘাটিত। সেখানে চণ্ডী মনসা ইত্যাদি উগ্রাদেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ধর্মমঙ্গল তো আঞ্চলিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লৌকিক একটি দেবতার প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াস। চণ্ডী তো গৌরী পার্বতী উমা সতীর সঙ্গে একরকম অভিন্না, দুর্গার প্রথম খ্যাতিসম্পন্ন রূপ। হরগৌরীর কাহিনীর মধ্যে আমাদের তৎকালীন বাস্তব সমাজ জীবনের প্রতিফলন বিস্ময়করভাবে ঘটেছে। অন্যদিকে গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রতিফলন, কলা কৌতুহল থেকে দৈহিক বিলাস। বিদ্যাপতির মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়টি দেখা যায়। এখানে রাধাকৃষ্ণের লীলার বিদগ্ধ মৌলিক বর্ণনা থেকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রার্থনার সুর উচ্চারিত,—"মাধব, বহুত মিনতি করি

তোয়"। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে লৌকিক রাধাকৃষ্ণ লীলার কামাঙ্কময় কাহিনী থেকে ভক্তি প্রেমের স্তরে উত্তরণের স্বাক্ষর, মালাধর বাহুর ভাগবত অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। "নন্দের নন্দনকৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—এই চরণটি পাঠ করে বলেছিলেন—"এই বাক্যে বিকাইনু তান বংশের হাত"। এখানে ধর্মীয় সাধনার এক নব দিগন্তের আভাস প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনের ধর্মীয় দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্য্য বৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয় বৃত্তির চর্চা হইয়াছে। ......তাহাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই......রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের তুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয় বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদেপদে সংযত করিবার কঠোর নিয়ম প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের তুর্ভাগ্য"। তুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য সে বিচার এখানে সম্ভব নয় বা তা নিরর্থক—ঐতিহাসিক বিধান সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্য করা চলে না। তবে দেখা যাচ্ছে, কুলত্যাগিনী রাধা ও গৃহচারণী উমা বাস্তবিক মনোজগতের দুই অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই—"তুই ধারা তুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে, কিন্তু এই তুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী। এবং তুইটি স্রোত ভাবের স্রোত"। এই ভাবের স্রোতের অবগাহন করেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য উঠে এসেছে। কি ভাবে উঠে এসে ও তার রূপ প্রকৃতি কি রকম হোল এবং কেন তা হোল ইত্যাদি এবার বিবেচ্য।

তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী একটি পর্য্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা হোল সম্মিলিত হিন্দুধর্মমত ও মুসলমানধর্মমতের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর্য্যায়। হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সম্পর্কে তিনটি ঐতিহাসিক মত আছে। কেউ কেউ, যেমন পাকিস্তানের ডক্টর জে. এইচ, কোরোসি ইসলামের প্রাধান্য ঘোষণা করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ হিন্দুধর্মের মহিমা ও গরিমা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এলাহাবাদ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এর সমালোচনা করে অনেকে বলেন, এঁরা ইতিহাসের অনেক অপ্রিয় বিরোধ ইত্যাদি এড়িয়ে গেছেন। তবে ডক্টর কে, এন, আশরফ প্রমুখ একটা সমন্বয়ী ধর্মমতের দিকে প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। ইসলামের ক্রমবিবর্তনের তিনটি স্তর আছে—প্রথমে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা। তারপর রাজনৈতিক ক্ষমতায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। শেষে সংহতি ইত্যাদির আবির্ভাব। তুর্ক-আফগান পর্বে ধর্ম থেকে রাজ্য ক্ষমতাধিকারে বিবর্তন ঘটেছে, পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত এটা চলেছে। আর এদিক দিয়ে কোনো আপোষ-মীমাংসা হয় নি। হিন্দুধর্মের একটা বিরাট আত্মসাৎ করবার সমন্বয়ী প্রবণতা আছে। হিন্দু-ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতির সমন্বয় পাঁচটি দিকে দ্রষ্টব্য—রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীত। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামের মধ্যে তুটি প্রবণতা প্রকাশ পেলো—একদিকে একটা জোরালো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা—গোঁড়ামি, নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা,

প্রচার, প্রতিপত্তির চেষ্টা ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের কড়া ভাব। অন্যদিকে একেশ্বরবাদীতার মহিমা খ্যাপন, ভগবানকে প্রেমময় বলে একটা মরমীয়া সাধনা। ধর্মীয় উপলব্ধির প্রগাঢ় অনুভবের সমধিক চেতনা, ইত্যাদি ইসলাম ধর্মের নূতন বিকাশ। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক ভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও নবীন বিকাশ দেখা গেল। স্মৃতি অনুশাসনে সমাজকে বাঁধবার চেষ্টার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের 'গণতান্ত্রিক একেশ্বরবাদী আদর্শ, মরমীয়া সাধনা, সুফী মতবাদ, হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত ও হিন্দুধর্ম সমাজ চিন্তার নূতন বিকাশ ঘটালো, নূতন দৃষ্টি আনলো। তাকে বলা হলো ভক্তিধর্ম। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের মধ্যযুগীয় ভক্তি ধর্মের আবির্ভাবকে ইসলামধর্মের প্রভাব প্রসূত বলে নির্দেশ করেছেন তা যে ভুল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুধর্মমতে মুক্তি হলো একমাত্র কাম্য এবং তা পাবার উপায় ঐকান্তিক সাধনা, যা ভক্তির নামান্তর। ওয়েবার, গ্রিয়ার্সন প্রমুখ মধ্যধুগীয় ভক্তিধর্মকে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব প্রসূত বলে নির্দেশ করেছিলেন তাও গ্রাহ্য নয়। অবশ্য ইসলাম ধর্মসাধক ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্মে এই বিশেষ সাধন মার্গটিকে প্রাধান্য দান করলো। এর দ্বারা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে মুসলমান শাসনের প্রতিকারহীন নিশ্চেষ্টতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার একটা মনোভাব যে না প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। এক আদর্শমুক্ত মানব-সমাজের কাল্পনিক জগতে বিচরণ আর তার চিত্র কল্পনার চেষ্টা হয়েছে এই মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্মে। শঙ্করাচার্য বোদ্ধধর্মের প্রভাব দূর করে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠা হোল জ্ঞানমার্গে—মুক্তির সাহায্যে অদ্বৈত একেশ্বরবাদীতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু-জ্ঞানের পথে যুক্তি দ্বারা তিনি যা করেছিলেন তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ইসলামের আত্মনিবেদন, প্রেম, সমাজাধিকার সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকেরা যখন সহজ ভাষায় প্রকাশ করলেন রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের জ্ঞানমার্গের উচ্চশৃঙ্গ থেকে ভক্তির সমতলভূমিতে নেমে এলেন। যে ভক্তিবাদের জন্ম দ্রাবিড়ে, রামানন্দ—তাকে উত্তর ভারতে নিয়ে এলেন—

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড॥

ভারতের ধর্মসাধনা জ্ঞানমার্গের দুরূহ শৃঙ্গ থেকে শতকোটি দেবদেবীর বাসভূমি স্বর্গলোক থেকে অদ্বৈতবাদের একতারা বাজিয়ে ভক্তি, প্রেম, সাম্য ঐক্যের সুরে জনগণের মধ্যে মিশে গেল। হিন্দু ও ইসলাম—উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ—ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সাধক সম্প্রদায় এই ভক্তি ধর্মের মানব মিলন-মূলক বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন। বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, নামদেব, কবীর, নানক আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য পূর্বভারতে একটা নবীন ভাবের জোয়ার নিয়ে এলেন, নিয়ে এলেন ম্রিয়মাণ সমাজে নতুন প্রাণের চাঞ্চল্য।

ইসলামবিজয়ের ফলে বহির্বিশ্বের সংগে ভারতের সংযোগ আবার স্থাপিত হল। এর ফলে ভারতের আত্মনির্ভর অহমিকা ও সংকীর্ণতা ( ১০ ) দূর হল, ও দেশবিদেশের বিচিত্র মানুষের সমন্বয়ে ( ১১ ) ভারতের নতুন মানবতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরী হল। অন্যদিকে মুসলমানভক্ত ও সাধুদের জীবনাচরণের অনাড়ম্বর ঔদার্য ও মাধুর্য, তাঁদের সাধুতা, ভক্তিনিষ্ঠা, নিরাসক্ত জীবন ভারতের জনগণের মনে রেখাপাত করে—হৃদয় জয় করে ও ভ্রাতৃত্বের প্রীতির রাখীডোরে আবদ্ধ

করে নতুন সমাজসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়।

মুসলমান আক্রমণের অভিঘাতে তৎপূর্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন ধর্মধারা যে এক বিমিশ্র সমন্বয় লাভ করে তা আগেই বলা হয়েছে। সেই সম্মিলিত ধর্মের উপর বর্ষিত হল ইসলামের প্রভাব। তার থেকে আবির্ভূত হয় নতুন বাঙালী জাতিচরিত্র—শ্রীচৈতন্য এই নবাভির্ভূত বাঙালী জাতির প্রতীক। সংকীর্ণ ভারতীয় সমাজের উপর বহিরাগত বিভিন্ন ভাবধারার আঘাতে এবং বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মানুষের সংযোগে, পুরানো ভারতীয় সমাজের মৃত্যু হয়ে যে নতুন ব্যক্তিসত্বার জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, চৈতন্য তারই সার্থক সৃষ্টির পথ দেখালেন। ( ১২ ) সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উর্দ্ধে মানুষকে সংস্থাপন করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মিলনভূমি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকেরা, তাঁদের ধর্মসাধনার মূল কথাগুলি হলো—

( ১ ) সমস্ত ধর্ম মূলে এক এবং ভগবানও এক।

( ২ ) কোন মানুষের মহিমা তাঁর জন্মের উপর নির্ভর করে না, কর্মের উপর নির্ভরশীল।

( ৩ ) গতানুগতিক প্রথা, সংস্কার, অনুষ্ঠান, এবং পুরোহিতদের পাণ্ডাগিরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

( ৪ ) ভক্তি ও বিশ্বাস হলো মুক্তি ও সাধনার একমাত্র উপায়।

ইলিয়াসসাহী রাজবংশ থেকে বাংলায় শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা স্থিতি ও শান্তি শৃংখলা আসে—তারপর আবার হাবসী অরাজকতা, তা দূর করে হুশেন শাহ শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে চৈতন্যের আবির্ভাব কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের কালে আবার রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। এহেন অরাজকতা, বিশৃংখলা বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন বাঙালী চরিত্রের প্রতীক হিসেবে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়ে সমস্ত পূর্ব ভারতে একটা প্রাণ চাঞ্চল্য এনেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে তিনি এক প্রেম ভক্তিধর্ম সাধনার ব্যাপক বিপুল প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, তার নাম বৈষ্ণবধর্ম সাধনা। এই সাধনায় 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।' এই প্রেম-সাধনায় তিনি সমস্ত সামাজিক, আত্মিক, মানবীয় ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥ সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ'—ধর্মের মধ্য দিয়ে এই মানবতাবাদের তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে'—। বৈষ্ণবদের এই তত্ত্ব ও উক্তির অন্তরালে আছে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ও জীবনের স্বীকৃতি ও উপস্থিতি। এমনকি মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রাধান্যের মধ্যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানবজীবন চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তদের জীবনীসাহিত্যের মধ্যে লেখা হয়েছে। আর বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপ্রচুর ফসলের কথা উল্লেখ না করলেও চলে। এমনকি, মঙ্গলকাব্যেও ঐ ভক্তি ধর্মের প্রভাব পড়েছে। তার পরিণামে মঙ্গলকাব্যের অখণ্ড আখ্যানকাব্যের আধারকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে, উগ্রা ঘোরা দেবী মাধুর্যময়ী স্নেহবৎসল হয়ে উঠেছেন। শাক্তপদাবলী হলো তার নিদর্শন। এর দুটি শাখা—একটিতে উগ্রা ঘোরা করাল বদনা। ভয়ঙ্করী কালীদেবী জগজ্জননীর স্নেহমাধুর্যে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছেন, আর একটিতে আমাদের সংসার-জীবনের রূপকে হর-গৌরী উমা-মেনকার সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট অনুভূতিকে গীতল রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে

ভক্ত-ভগবানের মাতা-সন্তানের স্নেহবাৎসল্যের মধুর সম্পর্কের নানা আব্দার অভিযোগ প্রকাশিত, দ্বিতীয়টিতেও উমা-মেনকার স্নেহবাৎসল্যরস উৎসারিত। বৈষ্ণব পদাবলী ভক্তিধর্মপোলব্ধি নিবিড় অনুভূতিঘন গীতিময় সাহিত্য প্রকাশ।

ভগবান নির্বিশেষ, অবাঙমানসগোচর তিনি। ভক্তিধর্মে তাঁকে মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে অনুভব করবার ও পাবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।...মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়।" বৈষ্ণবমতে ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ হলো হৃদয়ের প্রেম।—

"প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাহা দিই দেবতারে, আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

জ্ঞানমার্গে তার সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব নয়, কিন্তু এ পথ দুরূহ—সকলের অধিগম্য নয়। এই মর্তভূমি হলো আমাদের কর্মক্ষেত্র, এখানে এলেই চোখ বাঁধা বলদের মত স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে মানুষ, মায়ার মোহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, শুধু দিনযাপনের গ্লানি, কলুষ, মালিন্যযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই যথার্থ কর্মমার্গ অনুসরণ করা হয়ে ওঠে নিরুপায়। তাই জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গে ভগবানকে পাওয়া আর হয়ে ওঠে না সকলের এবং সহজে। তাই "ওঁ ত্রিসত্যসৎ ভক্তিরেব গরীয়সী।" কর্মই সর্বদেশের সর্বস্থলের সর্বস্তরের মানুষের সাধারণ জীবনধর্ম। সেই কাজই প্রেমের মধ্যে মালিন্যহীন শুচিশুভ অপার আনন্দময় মুক্তি লাভ করে ও অপ্রয়োজনের অহেতুক লীলায় লাভ করে আত্মাভিব্যক্তি। ভক্তিমার্গের সাধকেরা ভগবানকে এজন্য প্রেমময় ও লীলাময় বলে কল্পনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন প্রেমের বিবিধ লীলার মধ্য দিয়েই তাঁর সাযুজ্য লাভ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই, 'আমরা যাহাকে ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করারই অন্য নাম ভালোবাসা।......সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই মূল সূত্রটি বিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায়না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবঅন্তরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে,—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।" বৈষ্ণবধর্ম সাধনায় ভগবানকে প্রেমময় কল্পনা করে প্রেম নিবেদনের দ্বারা মিলনস্থাপন লক্ষ্য—(১০)

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ"॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক রূপক। এর হৃদয়গত প্রগাঢ় অনুভূতি

থেকে গীতিকবিতা যে স্বতোৎসারিত হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আর রূপকের আলংকারিক বিস্তৃত ছক পদ্ধতির অনুসৃতির মধ্যে যেমন সচেতন একটা কলারীতি আসে তেমনি প্রথানুবদ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর কালক্রমে ভাবের জোয়ারে ভাঁটা দেখা দেয়। বাংলা-সাহিত্যে নতুন ভাবের উৎস আর থাকে না, তাই গতানুগতিক রোমন্থন, কৃত্রিমতা ও প্রথানুগামিতা দেখা দেয় এবং শেষপর্যন্ত কবিগানের চোরাবালিতে পথ হারায়।

আকবরের আমলে বাংলা দেশ মোগল শাসনাধিকারে গেলেও আবার ধীরে ধীরে অরাজকতা বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখা দেয়। বর্গীর হাঙ্গামা, শোভাসিংহের বিদ্রোহ, বিদেশী বণিকদের লুব্ধ পদ-সঞ্চার ও অত্যাচার ইত্যাদির ফলে প্রাণবাংলা উপদ্রুত অত্যাচারিত নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে পড়ে। কোনরকমে টিকে থাকার চেষ্টায় মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভক্তি বিশ্বাস ইত্যাদি ধর্মভাব বিদায় নিতে বসে। ঠিক এই সময় বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা, নিশ্চিত জীবনযাত্রার বিপর্যয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্মম নিষ্পেষণ ও ক্রূর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে এক ভীতিবিহ্বল সংশয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল ও সে সময় সাধক ভয়ঙ্করী কালীর সাধনায় নিরত হয়েছিল শক্তি ও আশ্বাস পাবার আশায়। (১৪) বৈষ্ণব সাধনায় ব্যক্তিগত প্রয়াসের সঙ্গে গোষ্ঠীগত ঐক্য ছিল। কিন্তু এই শক্তিসাধনায় ব্যক্তিগত প্রয়াসই প্রধান। শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় চর্চা করতে করতে তান্ত্রিক সাধনার গুহ্য চর্যা করতে করতে ভক্তসাধক ভক্তিরসের প্লাবনে ও ঐকান্তিকতায় দেবীকে মানবী করে তুলেছেন ও নিজেদের গৃহজীবনের মাঝে স্থাপন করে এক সহজ প্রীতিপূর্ণ মধুর ভক্তিতে মন ভরে তুলেছেন।

“যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিকাতারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥”

(১) বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

(২) “The lower peoples generally worshipped those spirits or deities, who are supposed to influence human affairs. The real reason why the Supreme Beings are not, as a rule, worshipped, is their indifference to the course of nature and the life of man.”—R. Karstan (The Origins of Religion).

(৩) Religion is human experience interpreted by human imagination··· The idea that religion contains literal, not a symbolic representation of truth and life, is simply an impossible idea.”—Santayana.

(৪) যে পরিমাণে মানবসমাজে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শাস্ত্রপুরোহিত শাসিত ধর্মনীতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানবের প্রকৃতি নিহিত যে সহজ ধর্ম তাহাকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে, সেই পরিমাণে রসসৃষ্টি এবং রসানুশীলনের সঙ্গে ধর্মনীতির এবং সমাজনীতির পূর্বাকার বিরোধ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া রসানুশীলন এবং ধর্মাচরণকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইতেছে।—বিপিনচন্দ্র পাল।

(৫) “The whole emphasis of the Upanishads is on the subjective side of

religion……Again, the Yogo school of Indian thought has a religious perspective of its own, and its emphasis is exclusively on the subjective side of religion……In the critical spirits of the old and medeaval vernacular poets, we shall find this (subjective) spirit of yogo acting strongly in uniron with the spirit of the other heterodox systems."—শশীভূষণ দাশগুপ্ত।

(৬) Abscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature. ভারতীয় সাধনার ঐক্য। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাপদ। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।

(৭) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য।

(৮) "Seldom in the history of mankind has the spectacle feent witnessed of two civilizatins so vast and so strongly develoved yet so radically dissimilar as the Muhamadan and the Hindu, meeting and mingliug together."…স্যার জন মার্শাল। তু রবীন্দ্রনাথ—কালান্তর।

( ৯ ) বাংলার নবজাগৃতি বিনয় ঘোষ।

( ১০ ) আলবেরুণীর নির্দেশ।

( ১১ ) ষোড়শ শতকের পর্তুগীজ পর্যটক বার্বোগা নির্দেশিত।

( ১২ ) মানবধর্ম ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য—ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার।

(১৩) "Adorable companionship"—"the mystic marrige of the soul with God.

"Give and Take that is set up between the Finite anb the Infinite life."—"Divine Osmosis."

(১৪) প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য—ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সর্বতোভত্র Handbook হিসাবে ব্যবহৃত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমিকা পর্যালোচনার সঙ্গে যঙ্গে সাহিত্যিকের কৃতিত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার ও মূল্যায়নের পরিমিত তৌল বিচার প্রাপ্তব্য।

# বিলাতের পথে দ্বারকানাথ

**অমৃতময় মুখোপাধ্যায়**

রবিবার ২৭শে পৌষ ১২৪৮ বঙ্গাব্দে (১) দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতা থেকে প্রথমবার বিলাত যাত্রা করে ২৯শে পৌষ (১১ জানুয়ারী) সাগরদ্বীপ পার হয়ে বঙ্গোপসাগরে পৌছান। ঐদিন থেকে তিনি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের একটা রোজনামচা রেখেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে সেটার কোন হদিশই আজ পাওয়া যায় না। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে দ্বারকানাথের জীবনী লেখেন তাতে ঐ রোজনামচার যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন সেইটুকু থেকেই আমরা এ বিষয়ের কিছুটা জানতে পারি। সেই সময়ে দ্বারকানাথের লেখা কয়েকটি চিঠি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদর্শন (২) নামে এক মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। সেইগুলিই এই প্রবন্ধের প্রধান নির্ভর।

১৫ই জানুয়ারী জাহাজ মাদ্রাজ পৌছায়। সেখানে একরাত্রি থেকে কয়লা বোঝাই করে ১৬ই সন্ধ্যাবেলা ইণ্ডিয়া জাহাজ সিংহলের দিকে রওনা হয়। তখনকার কালে অনেক জায়গাতেই খনিজ কয়লা সুপ্রাপ্য ছিল না। সে সব জায়গায় আগে থেকে পালতোলা জাহাজে করে কয়লা পাঠিয়ে আড়ং করে রাখা হত। ১৮ই সিংহলের উপকূল দেখা যায়। সমুদ্র থেকে সে দৃশ্য দেখে দ্বারকানাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

দিগেল (৩) অন্তরীপ ১৮৪২ সাল ১৯শে জানুয়ারী

"আমরা অদ্য প্রাতঃকালে এইস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং যথাসাধ্য এতৎ সুন্দর উপদ্বীপের কিয়দংশ দৃষ্টিকরণের জন্য পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছি। সুতরাং এস্থল হইতে শীঘ্র গমনাবশ্যক হওয়াতে আমার এই পত্র সংক্ষেপে লিখিত হইল। মাদ্রাজ পরিত্যাগাবধি বায়ুর অবস্থা একরূপই আছে, এবং সামুদ্রিক পীড়া এপর্যন্ত আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, ইহাতে বোধ করি, যে আমি ঐ রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। গত দিবস বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে আমরা লঙ্কা দর্শনপূর্বক তীরের সন্নিহিত হইয়া গমন করিতে দেখিলাম যে জলের ধার অত্যন্ত নিবিড় নারিকেল বনে আবৃত রহিয়াছে এবং নানাপ্রকার পর্বতকন্দরাদি বৃক্ষসমূহেতে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—এরূপ মনোহর দৃশ্য আমি এপর্যন্ত সম্ভোগ করি নাই—কে না কহিবেন যে পুস্তক পাঠ দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক দেশের জ্ঞানোপার্জন করা কদাপি সম্পূর্ণ ফলদায়ক হবে না। যেহেতু মনোরম্য উপদ্বীপ দর্শন করিয়া আমি যেরূপ আনন্দানুভব করিয়াছি, তাহা পঞ্চশত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পঠনদ্বারাও কদাপি লব্ধ হইত না। সৃষ্টিরূপ পুস্তকের ন্যায় অন্য কোন প্রকার বর্ণনা বস্তুর যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। আমি এইক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম যে রামায়ণে স্বর্ণময় লঙ্কার উল্লেখ তাহা অপ্রকৃত নহে, যদিও তত্রস্থ মৃত্তিকা বস্তুতঃ স্বর্ণ নয়। কিন্তু পৃথিবী এস্থানে এ প্রকার প্রচুররূপে ফলবতী হইয়াছেন যে ইহার প্রত্যেক বিঘা ভূমির সহিত এক এক ক্ষুদ্র স্বর্ণ খনির তুলনা হয়।"

এখানে দেড়দিন থেকে জল, কয়লা ও রসদ নিয়ে দ্বারকানাথের "ইণ্ডিয়া" জাহাজ সুয়েজ অভিমুখে রওয়না হল। রসদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম কারণ সেকালের সমুদ্রযাত্রার

এটি ছিল এক উৎকট অথচ নিত্য অংশ। কাটা মাংস দু' একদিনের বেশি ভালো থাকে না বলে "জ্যান্ত খাবার সঙ্গে লওয়া হত—পাঁঠা, শুয়োর, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি। তাছাড়া দুধের জন্য দু' একটি গরুও লওয়া হত। ইণ্ডিয়া জাহাজ বিশেষভাবে তৈরী (৪) হওয়া সত্ত্বেও খামার ও কসাইখানার শব্দ ও গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ রেহাই ছিল না।

এর পরের চিঠি দ্বারকানাথ লিখেছেন আরব সাগর থেকে ২৭শে জানুয়ারী—

"আমি পূর্বপত্রে আমার ক্রমশঃ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে যে স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা আরম্ভ করিলাম, এবং এডেন নগরে উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাহা সমাপ্ত করিব। যেহেতু এ বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই রাজধানী আগমন করিতেছে, উক্ত নগরে তাহার উদ্দেশ হইতে পারিবে। পূর্ব লেখনে আমি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, যে বর্তমান মাসের অষ্টাদশ দিবসে বেলা ১০ ঘণ্টার সময়ে লঙ্কার তট আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং বহুবিধ পর্বতকন্দরাদি এবং তৎ আবরণ স্বরূপ নারিকেল বন এবং অপরাপর বৃক্ষ—যাহা জলের ধার পর্যন্ত জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছিল। পরদিন বেলা দুইপ্রহরে একঘণ্টার সময়ে দিগেল অন্তরীপে নঙ্গর হইল। আদিমস্ পিক (৫) নামে এক পর্বত আমরা অবলোকন করিলাম। খাড়া ( সকলে কহেন ) সমুদ্রের উপর প্রায় ৬৬৬৬ হস্ত উচ্চ। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে এই পর্বতের শৃঙ্গোপরি ২০ ফিট অর্থাৎ ১৩ হস্ত দীর্ঘ আদমের এক পদচিহ্ন আছে (৬) কিন্তু হিন্দু ইতিহাস অনুসারে আমি অনুমান করি, যে মহাবীর হনুমান লঙ্কায় আগমনকালীন প্রথমে এই পর্বতের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।" দ্বারকানাথ এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন যে "অ্যাডাম এইখানে প্রথম দেখা দিয়েছেন বলে লোকেরা বিশ্বাস করে কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা বলে যে হনুমান এইখানে এক পা রেখে অন্য পাটি রাখেন মাদ্রাজে। এ কথা রামায়ণের সঙ্গে মিলে। এই দ্বীপের কয়েকটী জায়গার নামও রামায়ণিক, যথা 'রাবণপুরীর'। এখানকার পর্বতসমূহের একাধিকটী হাজার ফিটের বেশি উঁচু। সমুদ্রে আমরা শত শত কচ্ছপ দেখিলাম যেগুলি ছোটখাট হাতীর মত" (৭)।

দ্বারকানাথ তখনকার "গল"এর বর্ণনা দিয়েছেন—

সমুদ্র সম্মুখবর্তী এক পর্বতোপরে অত্রস্থ দুর্গের অগ্রভাগ নির্মিত আছে। এবং নগরের মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি সকল অধিকদূর পর্যন্ত মগ্ন থাকাতে সুন্দর কোল (৮) হইয়াছে। এ সকল পর্বতের উপরে যে সকল দুর্জয় তরঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা অতি আশঙ্কার সহিত অবলোকন করিতে হয়। বৃহৎ বৃহৎ প্রবল জাহাজ ঐ সমস্ত সংঘটিত তরঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু কোলে প্রবেশের জন্য এক উত্তম পরিস্কৃত পথ রহিয়াছে। লঙ্গর করণান্তর দেখিলাম যে নানা ফল এবং উপদ্বীপের উৎপন্ন অন্য দ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকাসকল আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিলেক। নৌকার আকৃতি একপ্রকার অসাধারণ, অতএব তাহার বর্ণনা লিখিতে অশক্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ আমি এক মনোহর ঘাট সন্দর্শন করিলাম, যাহা কলিকাতার ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। পথসকলও অতি পরিচ্ছন্ন। বাস্তগৃহ একতালা এবং যদ্যপি উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত নহে, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কৃত ও সুন্দর। দুর্গের দ্বারোপরে "১৬৬৮ সাল" এই তারিখটি লিখিত আছে, কিন্তু দুর্গ একপ্রকার উত্তম দেখিলাম, বোধহয় সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। সমস্ত নগর দুর্গ-

প্রাচীরে বেষ্টিত আছে। শকটাদি গমনাগমনের এক পথ গল্ হইতে কোলম্বো অবধি প্রায় সাড়ে পয়ত্রিশ ক্রোশ (৯) ব্যপ্ত রহিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী অতি নিবিড়রূপে উন্নত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে সমস্ত ফল জন্মে, এস্থানেও তাহাই উৎপন্ন হয়, বিশেষত আম্র অতি বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পক্ক হইবার একমাস বিলম্ব প্রযুক্ত আমরা কেবল অপক্ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কদলী, আনারস এবং কণ্টকি ফল অতি উৎকৃষ্ট স্বভাবে জন্মে। আমি এ স্থানে প্রথমবার "ব্রেড্ফ্রুট-ট্রি" অর্থাৎ পিষ্টক ফলের বৃক্ষ সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু অকাল প্রযুক্ত তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম না। বঙ্গদেশস্থ এবং অত্রস্থ পুষ্প একরূপই। কিন্তু এস্থলে তাহাদিগের বর্ণের চাকচিক্য এরূপ উৎকৃষ্টতর যে তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না, বিশেষতঃ জবাপুষ্প অতিশয় উজ্জ্বল। কেল্লের (৮) অন্তর্ভাগে বাজার অতি সুনিয়মে স্থাপিত রহিয়াছে।"

দ্বারকানাথ তাঁর রোজনামচায় "লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসী বা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই" বলে ক্ষেদোক্তি করে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেছেন "বোধহয় এ সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করার তাঁর সময় ছিল না। তা ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদদের মানসতার চাইতে বাস্তবের প্রতিই তার মনের অভিমুখিতা ছিল বেশি।" (১০) কিন্তু এই চিঠিতে দেখি যে দ্বারকানাথ সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। লিখেছেন—

"কতিপয় মুসলমান এবং কাথালিক-ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যতিরেকে লঙ্কাবাসী সাধারণ লোক বৌদ্ধধর্ম পালন করে। এ স্থানে কিয়ৎসংখ্যক ওলন্দাজেরও বসতি আছে। বালক ও বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দুই পাঠশালা স্থাপিত আছে এবং তাহাদিগের সাহায্যার্থে আমাদিগের মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাক্ষর করিয়াছেন। এদেশস্থ লোক সামান্যতঃ সুশ্রী, কর্মঠ, পরিষ্কৃত এবং মলয়দেশীয় মানুষের তুল্য মুখশ্রীবিশিষ্ট; গার্হস্থ্য (পুরুষ) ভৃত্যগণ ইংরাজ রমণীদের ন্যায় পশ্চাৎ কেশে কচ্ছপের অস্থি নির্মিত চিরুণী ধারণ করে। এই দৃষ্টি আমাকে যেরূপ পরিতোষ প্রদান করিয়াছে তাহা লেখনে বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম।"

জাহাজ এডেন পৌঁছায় ৩রা ফেব্রুয়ারী এবং এডেন ছাড়ারও সাতদিন ষোলঘণ্টা বাদে, ১১ই ফেব্রুয়ারী সকাল আটটায় ইণ্ডিয়া জাহাজ সুয়েজ বন্দরে নঙ্গর করে। হিসাবে দেখা যায় স্যাণ্ড হেড্স্ থেকে সুয়েজ পৌঁছাতে ঠিক ত্রিশ দিন লেগেছে—তার মধ্যে চলন্ত সময় ২৫ দিন। গড়পরতা জাহাজ চলেছিল দৈনিক দুইশত মাইলের কিছু কম।

তখনও সুয়েজ খাল কাটা হয় নি। ঐখানে মালপত্র লোকজন সকলে নেমে গাড়ি করে কায়রোর পথে রওয়ানা হতেন। তখন সুয়েজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে দুটী লোকের দুটী প্রতিষ্ঠান ছিল—লেফ্টেনান্ট ওয়াগহর্ণের ও অন্যটা হিল সাহেবের। দুজন কারুরই যে বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল তা নয়। মালপত্র নামিয়ে ঘোড়া বা গাধা ঠিক করে সব ঠিকমত তার পিঠে চড়িয়ে সেদিন আর রওনা হবার সময় থাকিত না, তাই হিল সাহেব ওখানে একটি হোটেলও খুলেছিলেন। সেই হোটেলেই দ্বারকানাথ রাত কাটান। হোটেলটীকে তিনি ডাইরীতে "অত্যন্ত খারাপ" বলে লিখেছেন। সেটা অতিরঞ্জন নয়। যদিও ইণ্ডিয়া জাহাজের কাপ্তেন হেন্ডারসন চিঠিতে লিখছেন দেখি যে "আজ যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে দেখলেন যে

১১টি গাড়ি তাঁদের ১৬ থেকে ২৪ ঘণ্টায় মরুভূমি পার করতে প্রস্তুত রয়েছে এবং পথে বিশ্রামের সবরকম সুব্যবস্থা হয়েছে।" তার কয়েকমাস আগে ঐ পথের এক যাত্রী লিখেছেন—সুয়েজের কষ্টের কথা অনেকেই জানিয়েছেন কিন্তু তাদের কাউকেই অতিরঞ্জন দোষ দেওয়া যায় না। হিল সাহেবের হোটেলের লোকজনের থাকবার চরম অব্যবস্থা। শোবার ঘর নামমাত্র। সকলেরই শেষ আশ্রয় হয় শোবার ঘরের গদি দেওয়া কৌচ। সেখানে জানালার অনেকগুলি ভাঙ্গা কাঁচের কৃপায় মরুভূমির ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যাত্রীদের ঘুম পাড়ায়। (১২)

পথে জল পাওয়া যায় না বলে প্রত্যেক যাত্রীই সঙ্গে কয়েক ডজন বোতল জল নিতেন। সাধারণত কায়রো পৌঁছাতে এক রাত ও দুদিন লাগিত। দ্বারকানাথ এ পথটা তিনদিনে যান। এ সম্বন্ধে কায়রো থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি লিখছেন—

"আমরা বর্তমান মাসের একাদশ দিবস প্রাতঃকালে সুয়েজ উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎস্থলে সামগ্রীপত্র বন্ধন-প্রেরণাদি কার্যে ব্যস্ত প্রযুক্ত লেখন পাঠাইতে পারি নাই। আমরা পরদিবসে সুয়েজ পরিত্যাগানন্তর আরব অশ্বযুক্ত শকটারোহণপূর্বক প্রায় বিংশতি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্লান্তি বোধ হওয়াতে অনন্তর প্রত্যেক দুইদিন দশ দশ ক্রোশ ক্রমে গমন করিয়াছিলাম,।" এই 'শকট'গুলি যে কতখানি অস্বস্তিকর ছিল তাহা ১৮৪৪ সালের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। একটি গাড়ীতে সাধারণতঃ ছ'জন যাত্রী লওয়া হত। তাঁরা পরস্পরের দিকে মুখ করে গাড়ীর বরাবর তিনজন করে বসতেন একটা কাঠের পাটার উপর। মধ্যে জায়গা এত কম ছিল যে সামনের লোকের সঙ্গে হাঁটু না ঠেকে উপায় নেই। আর পিঠের উপর দিয়ে গাড়ীর কাপড়ের ছাউনি যাওয়ায় কুঁজো হয়ে থাকতে হত সর্বক্ষণ। ( ১২ ) যাত্রীদের রাত কাটাবার জন্য পথে ঘর বানাতে বম্বে ষ্টিমকোম্পানী হিল সাহেবকে খরচ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলির অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না। বয়েড কেব্‌ল বলেছেন "আজকালকার ভাষায় ওগুলিকে সত্যকারের এবং বিশেষভাবে পোকাধরা বলে বর্ণনা দেওয়া চলে।" তবে পথটি ভালোই ছিল। ডাইরীতে দ্বারকানাথ লিখেছেন যে গয়া যাওয়ার পথ ( অর্থাৎ তখনকার কালের গ্রাণ্ট ট্রাংক রোড ) বা দমদম রোড বরাবর বেলগাছিয়া ভিলায় যাবার পথের চেয়েও এটি ভালো। পথে তিনি মরীচিকা দেখে লিখেছেন এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

দ্বারকানাথ সদলবলে চারিটি গাড়ী করে কায়রো সহরে পৌঁছান ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ১৯ তারিখে তিনি চিঠিতে লিখছেন—

আমরা প্রতিদিন খাদ্য ভোজনের পরে পদব্রজে গমন ও অশ্বারোহণ করি, তাহাতে যে সকল আশ্চর্য বিষয় সন্দর্শন করিয়াছি তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বাজার, নগর, দেবালয়, প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি শত শত দ্রব্যের চিন্তায় অন্তঃকরণ বিস্ময়াপন্ন আছে। যখন আমি সুব্রাতে পাশার উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকা, পথ, কমলা বন, পুষ্প, উৎস অর্থাৎ উবুই এবং সমুদয়ের সমগ্র শোভা ও গৌরব দেখিলাম তখন আমি আরবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থে যেরূপ কেরো নগরের সৌন্দর্য পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক জ্ঞান হইল। কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতে অবসর প্রাপ্ত হইলাম না।"

কায়রোতে দ্বারকানাথ নয়দিন ছিলেন। তার মধ্যে তিনি সদলবলে গিয়ে পিরামিড দেখে

আসেন। সেখানকার বাজার ও বাড়ীঘর তাঁকে কলিকাতার বড়বাজার বা কাশীর কথা মনে করিয়ে দেয় সেকথা ডাইরীতে লিখেছেন। ঘোমটা-দেওয়া মেয়েদের দলবেঁধে জল আনতে যাওয়া, গাধার পিঠে আখ চিবাতে চিবাতে আরব ও তুর্কীদের ঘোরাঘুরি যে প্রাচ্যের ছবি তাও লিখেছেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। সেটি হল কায়রোর ক্রীতদাসীদের হাট ( ১৩ )। যিনি যুবা বয়সে সতীদাহের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং রোমে কলিসিয়ামে পূর্ব নির্যাতন স্মরণ করে অসুস্থ বোধ করেছিলেন, তিনি ঐ দুঃসহ দৃশ্য দেখে কি অনুভব করেছিলেন তা জানতে কৌতূহল হয় বৈকি।

২৪শে তারিখে দ্বারকানাথ কায়রো ত্যাগ করে নীলনদ বরাবর আলেকজান্দ্রিয়ার পথে রওনা হন। দ্বারকানাথের জীবনীলেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন যে, যে ষ্টীমারে তিনি রওনা হন তার নাম "ইংকলর্থন"। কিন্তু ঐ নামের কোন ষ্টীমারের উল্লেখ অন্য কোথাও পাই না। পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানী ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ড ও বিলেতের ডাকবিভাগের ইতিহাসের মতে ঐ সময়ে একটিমাত্র বাষ্পীয় পোত নীলনদে চলিত—তাহার নাম ছিল "জ্যাক ও ল্যান্টার্ণ"। হয় ডায়রীর হাতের লেখা ঠিক মত পড়িতে না পারায় এ ভুল হয়েছে, নয়ত সেখানকার লোকের মুখে "জ্যাকোল্যান্টার্ণ" অপভ্রংশ হয়ে" ইংকলর্থনে পরিণত হয়েছিল এবং লেখার সময় দ্বারকানাথ ঐ নামই ব্যবহার করেছেন। যাহাই হউক আমরা এ বর্ণনায় উহাকে জ্যাকোল্যান্টার্ণই বলিব। এই ক্ষুদ্র ষ্টীমারটিতে দশজন লোক চড়িতে পারিত এবং সে সময়ে এটীকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পোত বলে দাবী করা হয়েছে। চড়ায় না আটকালে এবং আটকানোটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। ইহা পালতোলা নৌকার চেয়ে কিছু নিয়মিত ভাবে চলিত। উহাতে একজন লোক এদিক ওদিক করিলে জাহাজ সেই দিকে হেলিয়া যাইত। উহার ইঞ্জিন ছিল ছয় অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ( অবশ্য দুষ্টলোকে বলিত উহার ক্ষমতা তিন রাসভ শক্তি সমান ) এবং যাত্রীরা অনেকবারই উল্লেখ করেছেন যে জগতের যাবতীয় রকমের পোকা-মাকড়ের আধার ছিল এই জাহাজটি। নীলনদের বাম তীরে "আফ্‌তে" পৌছাতে প্রায় একদিন ও একরাত লাগিত। আফ্‌তেতে মালপত্র নামিয়ে মামুদিয়া খালের ( ১৪ ) নৌকায় বোঝাই করা হত।

এই মামুদিয়া খাল দিয়ে যাত্রীরা যেতেন ঘোড়া টানা নৌকায়। নৌকার সামনেতে একজন ট্রাম্পেট বা শিঙ্গা বাজিয়ে বাজিয়ে অন্যান্য পালতোলা নৌকাকে সরে যেতে সাবধান করে দিত। ওগুলি না সরিলে তখন পারের ঘোড়া থামিয়ে টানা রসি পালের উপরদিয়ে পার করে নিতে হত। ততক্ষণ যাত্রীবাহী নৌকাকেও দাঁড়িয়ে থাকিতে হইত। ফলে এই আটচল্লিশ মাইল খাল পার হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পৌছাতে ১২ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় লাগিত।

এই পথের বর্ণনার যেটুকু দ্বারকানাথের ডাইরী থেকে জীবনী লেখক উদ্ধৃত করেছেন তা নীলনদ সম্বন্ধে—লিখেছেন "নদীটি সুন্দর চওড়ায় গঙ্গার অর্ধেক হবে। এ নদীর জল খুব পরিষ্কার।"

২৮শে ফেব্রুয়ারী দ্বারকানাথ আলেকজান্দ্রিয়ার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখেন যে "এস্থলের হোটেল অতি সন্তোষজনক, এবং ইউরোপের রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত

থাকে না। নগরের যে অংশে ইউরোপীয় লোকের বসতি, সে স্থানে অতি সুন্দর তেতালা অট্টালিকার সহিত শোভিত, এবং কেরো নগরে অপ্রশস্ত পথের তুল্য পরিষ্কৃত আছে, তদ্দেশীয় লোকের বাসস্থানও প্রায় তদ্রূপ।

"আমি সম্প্রতি পাশার প্রাসাদ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই ভবন কেবল নদীর ধারে স্থাপিত আছে, এবং উভয় পার্শ্বে সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। ফরাশীর লোক ইহার এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছে, যে আমি কেরো নগরে যাহা দর্শন করিয়াছি, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাকে উৎকৃষ্টতর বোধ হইল। আমার ইচ্ছা হয় যে এই গৃহ তাহার অধিকার হইতে আমার উদ্যানে সঞ্চালিত হয়।"

"ইহার নিকটস্থ এক মনোরম্য স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে। যে গৃহ ঐ স্নানাগারকে ধারণ করে, তাহা সাগর মধ্যে ৬০ ফিট পর্যন্ত প্রবিষ্ট আছে, এবং তিন দিক হইতে জল আসিয়া তত্রস্থ এক পাত্রে পতিত হয়। ঐ পাত্রের দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণে ৪০ ফিট এবং তাহার গভীরতা ৪ ফিট। আমি যত গমন করি, ততই আশ্চর্য এবং মনোহর দ্রব্য নয়নদ্বারে উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক নূতন বস্তু সমুদয় পূর্বদৃষ্ট বস্তুকে আচ্ছন্ন করে।

দ্বারকানাথ যে হোটেলে ছিলেন সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে "হোটেলটি বেশ ভালো এবং সামনে ভূমধ্য সাগরের সুন্দর দৃশ্য। এক্ষণে বিলাতী কায়দায় হোটেল ছাড়া সরাইখানাও আছে; পছন্দমত বাড়িও ভাড়া পাওয়া যায় চাইলে আসবাবপত্র সমেতও। এখানে ইংরেজ ডাক্তারও আছে এবং যাবতীয় সরকারী জিনিষ—বিছানা, বই, খাবার দাবার সবই কিনিতে পাওয়া যায়।"

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দ্বারকানাথ যান মাল্টায়। মিশর ও প্রাচ্য থেকে আগত যাত্রীদের এখানে 'কোয়ারাণ্টাইন' থাকিতে হইত প্রায় একমাস—কাজেই কিশোরীচাঁদ মিত্র মাল্টা পৌঁছাবার তারিখ দিয়াছেন (১লা এপ্রিল) তাহা ঠিক নহে কারণ ১১ই এপ্রিল দ্বারকানাথ মাল্টা ত্যাগ করেন। তাছাড়া মাল্টা হইতে ১৯শে মার্চ তারিখে লেখা দ্বারকানাথের একটি পত্রও আমরা পাই। যতদূর মনে হয় মার্চ মাসের প্রথমেই আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে চারদিন পরে মাল্টায় পৌঁছান।

মাল্টায় দ্বারকানাথ ওঠেন জন্সফোর্ডের রয়েল হোটেলে। এ হোটেলের ব্যবস্থায় দ্বারকানাথ খুশীই হয়েছিলেন কারণ ১৯শে মার্চ তারিখে লিখছেন—

"কেরো এবং আলেকজান্দ্রিয়া যথাসাধ্য সন্দর্শন করিয়া অনন্তর মাল্তায় উপস্থিত হইয়াছি। আমরা অতি সুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিতেছি; আমাদিগের সম্মুখস্থ নগর সমুদয়, এবং ভ্রমণের উপযুক্ত একস্থান অতি সৌন্দর্যের সহিত দৃশ্য হয়। আমাদিগের ভবন অতি সুসজ্জিত, ও দিবারাত্রি অগ্নিবিশিষ্ট থাকে এবং স্বগৃহের তুল্য পরিতোষজনক হয়। গত দুইমাস জলে স্থলে ভ্রমণান্তর কিয়ৎকাল বিরাম করিতেছি, তাহাতে চিন্তা করি না, যেহেতু এইক্ষণে আমি পূর্ব লেখ্য পত্র সকল লিখিতে পারিব, এবং ভবিষ্যতে দৃশ্য দেশসমুদয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিব।

"এস্থানের যে পর্যন্ত দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাকে প্রায় অগম্য বোধ হয়, নগর অতি পরিষ্কৃত পর্বতোপরি স্থাপিত এবং চতুর্দিকে সুদীর্ঘ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত আছে। অত্রস্থ কোল শিল্পকৃত জ্ঞান হয়,

এবং খালের ন্যায় এই উপদ্বীপের নানাদিকে প্রবিষ্ট আছে। আমরা এইক্ষণে ইউরোপের বাতস্বভাব অনুভব করিতেছি, দিবারাত্রি সমান হইলেও বায়ুর পরিবর্তন হইতেছে। দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা প্রায় সমান থাকে না। সকলে কহে যে এতৎ অপেক্ষা অধিকতর শীতল দেশে গমন করিতে হইবেক না, ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে কলিকাতার লোক আমাকে শীতের ভয় প্রদান করিত, তাহা দূরীভূত হইল। আমরা ৯ ঘণ্টার সময়ে খাদ্য ভোজন করি, পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র সেবন করি। ১২ ঘণ্টার সময়ে কিঞ্চিৎ আরাম করি, পুনর্বার ইতস্ততঃ গমন করি, দুই প্রহর চার ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় ভোজন করি, এবং দুর্গোপরি অধিকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া গৃহে গমনপূর্বক চা-পান করি। দিবসের অবশিষ্ট সময় লেখন-পঠনে ব্যয় হয় আমরা সন্ধ্যাকালে প্রায় ১২ জন একত্র হইয়া গান-বাদ্যের আলোচনাপূর্বক অতি আহ্লাদে কাল ক্ষেপন করি। এইরূপে মারীভয়ের কাল যাহা শঙ্কার সহিত চিন্তা করিতাম, অতি সুরম্যরূপে যাপন হইতেছে। আমরা আগামী মাসের প্রথম দিবসে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নেপল্‌স নগরে গমন করিব।"

কিন্তু নেপল্‌সের পথে রওনা হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল ১১ তারিখ। মাল্টা ছাড়বার আগে তিনি তথাকার লাটসাহেব স্যার হেন্‌রি বোভারির সঙ্গে দেখা করেন। লাটসাহেবের বাড়ীর প্রশংসা দ্বারকানাথ ডাইরীতে লিখেছেন—সুন্দর বড় বাড়ি আর দেওয়ালে সব বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। আরেকটি বাড়ি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল সেটি সেণ্ট জর্জ গির্জা—সেখানে দেওয়ালে আঁকা করিয়েজিও ছবিগুলো মনে হয় যেন জীবন্ত।

(১) ৯ই জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে।

(২) "বিদ্যাদর্শন নামক একখানি দুস্প্রাপ্য বাঙ্গালা মাসিক পত্র সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহার কভারিং ও টাইটেল পেজ না থাকায় সম্পাদকের নাম জানিতে পারা যায় না। ১৭৬৪ শকাব্দে আষাঢ় মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ৬ সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মাসিক মূল্য ১৲ ও বাৎসরিক মূল্য ৮৲ টাকা। * * * দ্বারকানাথ দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার * * যাইবার সময়ে এক এক স্থান হইতে তিনি ইংরাজীতে ৯ খানি পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, উক্ত মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয় তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বীয় পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন * * * রেভারেণ্ড লং সাহেবের "বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা" দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যাদর্শন নামক দুইখানি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল। একখানির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং অন্যখানির সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঘোষ। প্রথমখানি কয়েক বৎসর ও দ্বিতীয়খানি ৬ মাস মাত্র চলিয়াছিল। আমি যে "বিদ্যাদর্শন"খানি পাইয়াছি তাহা ৬ মাস মাত্র চলিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদক। আমার মনে হয়, অক্ষয়কুমার দত্তের "বিদ্যাদর্শনেই" প্রিন্স দ্বারকানাথের পত্রগুলি স্থানলাভ করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর।—কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর।

(৩) কলম্বতে ব্রেক ওয়াটার তৈরী হবার আগ পর্যন্ত এডেন থেকে দূরপ্রাচ্যগামী জাহাজগুলির আসিবার জায়গা ছিল সিংহলের এই দেগাল। গাল কথাটির উৎপত্তি সিংহলী

'গালা' বা পাথর হইতে কিন্তু পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা মনে করে যে নামটি ল্যাটিন 'গ্যালাল্' বা মোরগের থেকে। সেইজন্যই পুরানো (১৮৮৭) গবর্মেণ্ট হাউসের সামনে একটি মোরগের প্রতিকৃতি আছে। এখানকার আলোক স্তম্ভটি ৬০ ফিট উঁচু। ইহাদের পূর্বদিকে একটি ২১৭৪ ফিট উঁচু পাহাড় আছে। তাহা সিংহলীতে "হিন্দুম্‌কাণ্ডা" ও ইংরাজীতে "হেকক্" নামে পরিচিত। প্রতিকুল আবাহাওয়ায় এই পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করা কঠিন কারণ প্রবেশদ্বারের খুব নিকটে না আসিলে তাহা নজরে পড়ে না। ইহাই নাকি পুরাকালে "টার্শিষ" বন্দর নামে বিখ্যাত ছিল। ইবন্‌বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাকে একটি ছোট সহর বলে উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজগণ ১৫০৭ সালে অধিকার করার পর এই স্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি কষ্টেন এস্থান জয় করিতে বিশেষ বাধা পান। জয়ের পর তিনি দুর্গটিকে তৎকালীন সহরটিকে ঘিরে আরো সুদৃঢ় করেন এবং এখনও উহা প্রায় কিছুই নষ্ট হয় নাই। ঐ দুর্গপ্রাচীর এখন সমুদ্রধার বরাবর বেড়াবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৪) Although only 871 tons, she was a remarkable vessel in many ways; the fact that she had an iron bullahead at either end of the engine room, carefully screwed to her wooden hull, was a great factor for safely and at that date a novelty in Europe. Greater economy was secured by Hall's surface condensers, the predecessors of the modern type, although as a precaution the old type jet condensers were there as well. She was given ventilation suited to the station, and her headroom of eight feet two inches in the saloon was unprecedented and appreciated."—The development of the P & O Fleet by Mr. Frank C. Bowen.

(৫) অ্যাডামস্ পীক (৭৩৬০ ফুট উচ্চ) সিংহলের সর্বোচ্চ না হলেও সবচেয়ে প্রখ্যাত পর্বত। ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ কবি ক্যামেয়েল লুসিয়াডের উল্লেখ—গাড়িতে গিয়ে শেষ আট মাইল পদব্রজে যেতে হয়। চুড়ার কাছে যেখানে সিঁড়িগুলি অসমান সেখানে ধরিয়া উঠিবার জন্য বহুদিন হইতেই শিকল লাগানো আছে। চুড়াটি একটি ১৪০ ফুট বাহুর সমচতুষ্কোণ। এখানে একটি কাঠের চালাঘরে স্বাভাবিক পাথরের একটি পদচিহ্ন আছে। তাহাকে ঢাকিয়া একটি বড় পাথর রাখা আছে। তাহার উপর প্রায় সাড়েপাঁচ ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া ও তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি গভীর একটি পদচিহ্ন খোদাই করা রয়েছে।

(৬) বৌদ্ধদের মতে ইহা বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন এবং সেইজন্য ইহা বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। এই পর্বতোপরি এখনও কয়েকটি বৌদ্ধসন্ন্যাসী বাস করেন।

(৭) এ দৃশ্য অসাধারণ হইলেও অবিশ্বাস্য নয়। ৬ বা ৩ টন ওজনের কচ্ছপ ভারতে প্রায়ই দেখা যায়।

(৮) হার্বার বা পোতাশ্রয়।

(৯) বর্তমানে ৭২ মাইল।

(১০) দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের অনুবাদ পৃ ৯১

(১১) সুয়েজ খাল খোলা হয় ১৮ই নবেম্বর ১৮৬৯

(১২) এ হান্ড্রেড ইয়ারস্ হিস্টরি অফ দি পি অ্যাণ্ড ও।

(১৩) "In the middle of Cairo (through which every traveller by the Overland Route must pass) there was a female slave market where the slaves were exposed for sale in pens or dens ranged round an open space in the centre of the public square and describe in "the Hand-book for Egypt and India" of as late as 1842 as "more fitted for wild heast than human beings." Actually the exhibition and market of slaves, almost nude Negro girls with ugly faces but beautiful forms, white Circassian or Georgian beauties bought by Constantinople merchants for sale to the harmes of Egypt, were an advertised "attraction" to travellers, and for many years P & O passengers visited the "show" and wrote at length in our journals about it."—Boyd Cable.

(১৪) "This Mahmondich Canal was remarkable achivement of the autocratic ruler of Egypt, Mehemet Ali. It has been said that a previous canal had run there in ancient times, but if so no trace of it remaind when Mehemet Ali began his work. On it he put 200,000 impressed or forced labourers or, less politely, slaves. He gave them no pay, scantiest of rations, nor even tools of any sort. Their taskmaster drove them so vigorously, however, that with no more than their bare hands and little peasant hoes and hand baskets to carry the soil out of the trench, they dug a canal 48 miles long, 18 ft. deep in parts and 9 feet wide in 4 to 5 months from the start of the work to the day when the last wall of earth was cut down and the waters of the tideless mediterrance allowed to flow in. At last 20,000 labourers died of starvation, overwork and sickness combind.

# বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

**অমিয়কুমার মজুমদার**

ঊনবিংশ শতকের যে প্রান্তে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম তখন বাংলাদেশে প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রবন্ধের ফসল ফলতে আরম্ভ করেছে—তাতে সোনালী রঙ্ ধরতে শুরু করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর পরিশীলিত মন নিয়ে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হয়েছেন। তার আগে প্রবন্ধসাহিত্যের বনেদ করে দিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কীর্তিমান ব্যক্তিরা। প্রবন্ধ যে রসাত্মক হতে পারে তার কিঞ্চিৎ আভাস বঙ্কিমচন্দ্রে পেলেও রবীন্দ্রনাথেই যেন প্রবন্ধ তার যথার্থ মর্যাদা পেল। বিজ্ঞানকে যে একঘরে করে রাখা উচিত নয়, এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার প্রকাশ অতি প্রয়োজনীয় তা প্রথম উপলব্ধি করা যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে—রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, কাজেই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচনা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই অভাব মেটাতে অবতীর্ণ হলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

এর পরে দেখা গেল সবুজপত্রের যুগ। প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। এতদিন সাধুভাষায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল। এবার নতুন হাওয়া বইল। বীরবল ( প্রথম চৌধুরী ) চলতি ভাষাকে মনের ভাব প্রকাশের বাহন করলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবকে স্বাগত জানালেন রবীন্দ্রনাথ এবং সবুজপত্রের চারপাশে জড়ো হলেন তৎকালীন বিদগ্ধ তরুণের এক দল। শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র সিংহ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষে প্রমথ চৌধুরী তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। সাহিত্যের প্রতি আবাল্য অনুরাগ তাঁকে সবুজপত্রের আসরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন সত্যেন্দ্রনাথ, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র স্ব-বৃত্তেই আবদ্ধ থাকলেন না, বিজ্ঞানের আঙিনা পেরিয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং জ্ঞানের নানাবিধ রাজ্যে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করেছেন। মধুকরের মত সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানের নন্দনকানন থেকে নানা রঙের ফুল, বিবিধ স্বাদের মধু সংগ্রহ করেছেন এবং তা পরিবেশিত হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার্থীর কাছে। সত্যেন্দ্রনাথের এই বিদগ্ধ মনটির কথা শুনেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একখানা চিঠি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীমান হারীতকৃষ্ণ লিখেছেন যে, নানাকারণে তাঁর পক্ষে কাল ( ২৫।১১।১৯১৬ ) বিকেলে এখানে আসার সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আসেন তো বড় সুখী হব। যাঁরা লেখাপড়া করেছেন অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চা করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিশতে কথাবার্তা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকে পেয়েছি। কিন্তু সেইসব বইয়ের কথা প্রতি লোকের

ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তা ছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটে আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতদিন বাংলা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে, ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে 'সবুজপত্রে'র আসরে নামাতে চাই।'

সবুজ পত্রের আসরে সত্যেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে যেতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু ছাপার অক্ষরে একটি প্রবন্ধও লেখেন নি। সেজন্যে বীরবলের অভিমানও ছিল। হারীতকৃষ্ণকে একপত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না, বোধ হয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।' এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ ১৯১২ সালে যখন সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন একটি হাতেলেখা পত্রিকা বের করেছিলেন, তার নাম 'মনীষা'। ওতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে একটি গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। সত্যেন্দ্র-সুহৃদ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বাংলা-সরস্বতীর পুষ্পোদ্যানে ফুল ফোটাবার প্রথম প্রয়াস এটি সত্যেন্দ্রর।'

বাংলাভাষায় কলম ধরলেন আবার ১৩৩৮ সালে। সুহৃদ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন রায় প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখলেন 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধ। পাঠককুল চমকিত হলো ভাষার লালিত্য দেখে। বিজ্ঞানের বিষয়ের অভিনব প্রকাশ দেখে আশ্চর্য হলো সবাই। বঙ্কিমযুগে প্রবন্ধকারেরা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা এবং মননশীলতা সে যুগে প্রবন্ধ রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রযুগে প্রবন্ধ রচনা রীতির পরিবর্তন সাধিত হলো। এইযুগের বক্তব্যকে হৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলবার চেষ্টা হলো। প্রথম চৌধুরী রচনার নতুন ভঙ্গী দেখালেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই তিনের আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। এ কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ। বিশুদ্ধ প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে এই সমন্বয় বিরল বললেই চলে। অথচ তিনি প্রায় অনায়াসে এই কাজ সমাধা করেছেন। কঠোর গবেষণার বিষয়বস্তুকে তিনি নির্ধূম আলোকরেখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, আবার অতিমাত্রায় শিল্পশ্রীমণ্ডিত করবার তাড়নায় অনর্থক অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যাক। তার মধ্যে এ বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে।

'ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরও ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপ কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যাবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থ-রিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে।'

ঈথারে পরিপূর্ণ যাবতীয় শূন্যলোক। এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুর মধ্যে যে ব্যবধান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবীর মধ্যে যে অপরিমেয় দূরত্ব বর্তমান তাদের প্রত্যেককে সংযুক্ত করে রেখেছে ঈথারের তরঙ্গ। এই তরঙ্গমালায় প্রতিটি বস্তুনিচয় সংঘবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই ঈথার তরঙ্গের মাধ্যমেই চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা থেকে আসছে, এই পথেই সূর্যের আলো পৃথিবী পাচ্ছে এবং সূর্যের আলোই জীবনীশক্তির মূলে। এই তত্ত্ব সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় সুন্দর রূপ পেয়েছে—

"পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে-সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার—পথে আনিত সূর্যের কিরণরাজি। আলোক-তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার-তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলা খেলা চলেছে, এইটা আজকে পদার্থ বিজ্ঞানের মূল কথা।"

বাংলাভাষার বিজ্ঞান বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা শুধু যে সাবলীল তা নয়, সাহিত্যিক মুন্সিয়ানায় তা উজ্জ্বল। 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' প্রবন্ধটির আগাগোড়া তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(১) কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাষ্পময় নীহারিকা জমাট বেঁধে তারকাজগতের জন্ম দিল, আবার কোন্ দুর্যোগের ফলে তারকা ভেঙ্গেচুরে গ্রহজগতের সৃষ্টি হল,—এ সবের তথ্য তার কল্পনা তার প্রতিভা ধরতে চায়। চোখে দেখা যায় না যে সূক্ষ্ম কণারাশির জগৎ, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জানতে চায় তার অন্তরের মর্মকথা।

(২) কার্বনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে অতীতের আকাশে যে বিরাট পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড চারদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, প্রাণ সূর্যরশ্মির সাহায্যে তাকে নিযুক্ত করে, আবার সেই কার্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি কোটি উদ্ভিদের কায়বস্তু। অতীত যুগের বিরাট অরণ্য মাটির মধ্যে কবে কবর পেয়েছে। আজ তাদের সারবস্তু ভেঙ্গেচুরে কয়লা হয়ে গিয়েছে। তবু তার মধ্যে রয়েছে বহু যুগের সঞ্চিত ধন। কয়লাকে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হতে দিলে দাহের ফলে প্রকাশ হবে সেই অতীত যুগের সঞ্চিত তেজ।

(৩) প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার মধ্যেও সে (মানুষ) নিয়তির শাসনের সন্ধান পেয়েছে।

নিবিড় পরিচয়ের ফলে ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কার্যকারণের মধ্যে অমোঘ শৃঙ্খলা তার কাছে আজ স্পষ্ট। বহুধা বিচ্ছিন্ন বহু শত বৎসরের বহু পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে জমাট করে পেয়েছে বস্তুজগতের ব্যবহারিক সূত্র। তাই দিয়েই সে জ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার বোঝাই করে চলেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ কুশলতার (এবং মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় তো থাকবেই) পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধের অধিকাংশ বিজ্ঞানের জটিল ও রহস্যজালে পরিপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে রচিত। দুরূহ বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য করে তোলা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার কাজ। বিষয়বস্তুর উপর অসাধারণ অধিকার থাকলেই চলবে না। রচনায় যাদু থাকা প্রয়োজন। প্রথমটি সম্বন্ধে এ-ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই দেখা যায় তাঁর রচনার মধ্যে দুদিকেরই সার্থক সমন্বয়।

জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সময় সত্যেন্দ্রনাথ যে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন জীবনী-লেখকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বিজ্ঞানাচার্য প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা অপূর্ব। ভাষার প্রসাদগুণে তা সমৃদ্ধ তাঁর ভাষায়—'গ্রহ, সূর্য, নক্ষত্র, বিশ্বের সব জড় উপাদানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, আজ বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জড়ের জগতে বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আজ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। যে-সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তার মধ্যে বসুন্ধরার অবস্থান ও তার পরিণতির বৈশিষ্ট্য আজ গভীর গবেষণার বস্তু। নিরন্তর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোন্ সুদূর অতীত বস্তুজগতে প্রাণশক্তির সংঘাত হল, অজৈব পরিণতি ঠেকল এসে জীবজগতের প্রকাশে তার আলোচনা শুরু করেছিলেন বার্গস্য প্রমুখ দার্শনিকেরা। আজ বিজ্ঞানীরাও সেই কথা ভাবছেন ও তার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন মূলসূত্র আছে কি-না, তারই অনুসন্ধান করছেন।'

প্রাণের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জানি যে একটি মাত্র কোষের সৃষ্টিতে প্রাণের প্রকাশ পেল প্রথম। তারপরে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে লাগল। আনুমানিক একশ দশ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের স্পর্শ পেল পৃথিবী। সামুদ্রিক শ্যাওলা, অ্যালজি থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো প্রাণের ধারা নানাদিকে। অবশেষে মানুষ এল প্রাণের রঙ্গভূমিতে। এর মধ্যে বয়ে গেছে কত কোটি বছরের ইতিহাস। বিবর্তনের নিম্নস্তর থেকে উর্ধ্বস্তরে পৌঁছতে প্রাণশক্তি যে বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছে, তা হলো সহযোগিতা। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে, "বিবর্তনের উর্ধ্বস্তরে পৌঁছতে প্রাণশক্তি একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছে, সে হচ্ছে সহযোগিতা। প্রাণ ছিল প্রথমে দুর্বল, মাত্র একটি জীবকোষে নিবদ্ধ, বহুকোষের জীব হয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করল। উচ্চ পর্যায়ের জীবের দেহে কত সহস্রকোটি জীবকোষ পরিপূর্ণ সহযোগিতায় তাদের কাজ করে চলেছে, পরস্পরকে সাহায্য ও পরিপূর্ণ করে তুলেছে তাদের জীবন।"

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে ভাষা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে। ক্রমান্বয়ে তাঁর রচনাশৈলীর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর আশ্চর্যও হতে হচ্ছে। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা সীমিত; চিন্তা যত করেছেন তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লেখায় স্থান পায় নি। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা আজীবন মগ্ন

করে যান রচনার কাজে, দীর্ঘ অনুশীলন পদ্ধতির মাধ্যমে হয় তো অনেকে ভাব এবং ভাষাকে একত্র করতে সক্ষম হন, বলা বাহুল্য আমাদের দেশে তেমন প্রতিভাবান লেখকের সংখ্যা বিরল। সত্যেন্দ্রনাথ কখনো রচনাভঙ্গী নিয়ে সাধনা করেন নি, লিখেছেনও খুব কম অথচ পরিণত বয়সে যে সব রচনা তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তার মধ্যে অর্দ্ধশত বৎসরব্যাপী সুকঠিন সাধনার প্রতিচ্ছবি বর্তমান। 'আশুতোষ ও বাংলার শিক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। "এক সময় বাংলা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানও চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য এসবই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগের কথা। প্রতীচ্য দেশের ইংরেজী শিক্ষা ও আচারের উন্মাদিনী মদিরা দেশী হাঁড়িতে ঢালার ফলে যে অমৃত-গরল পাত্র ছাপিয়ে দেশে প্লাবনের ভয় দেখিয়েছিল, তা শেষ অবধি সমাজের অন্তর-তলে বেশীদূর পৌঁছাতে পারে নি।···হিন্দু কলেজের ছেলেরা ব্রাহ্মণের টিকি কেটে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে দেশের মধ্যে হুলস্থুল বাধাবার চেষ্টা করল। তবে শেষ পর্যন্ত এই বীরাচারীর অনেকেই উত্তেজনার অবসান হলে বাংলা মায়ের কোলে যখন ফিরে এসেছিল তখন ছুঁৎমার্গীরা সমাজের কোলে তাদের কোন স্থান দেয় নি। উন্মার্গে চলতে চলতে নানা কণ্টক ক্ষত-বিক্ষত করেছিল তাদের শরীর। তবে কখনও কখনও সেই সব কণ্টকই গোলাপে রূপান্তরিত হয়ে বাংলার সাহিত্য-বাগিচায় অপূর্ব বাহার দিয়েছে।"

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য যেন বৈঠকী মেজাজের। সাহিত্য-সভায় বা বাড়িতে যেমন তিনি বৈঠকী আমেজের সৃষ্টি করে থাকেন, অবিকল সেই ছবি তাঁর গদ্যে। এ ধারা বড়ো শক্ত ধারা। সবুজ-পত্রের অন্যতম সদস্য হয়েও তাঁর রচনার বৃত্তে স্বতন্ত্র সুর। সুরস্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ গদ্যরচনার এলাকায় সৃষ্টি করেছেন সুরবাহার। একবার সৃষ্টি হলে স্বগতিতেই ছুটে চলে।

প্রকাশের ভঙ্গী পরিমিত হলে গদ্যের চলার বেগ বাড়ে তার উদাহরণ মেলে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি লাইনে—'পূর্ববঙ্গে তখন ফুলারের লাটপনা চলেছে। নানা জায়গায় ছেলেরা গণ্ডগোল করছে—কর্তার রোষ গিয়ে পড়ল স্কুলগুলির উপর। এসব প্রতিষ্ঠানকে জব্দ করতে সরকারী মহল চাইল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ছেলে পাঠানোর অনুমতি পূর্ব থেকেই যেন সে-সব স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।"

আর একস্থানেও এর পরিচয় মেলে—'সূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ আর, আলো। সেই তেজ, আলো এবং উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে নতুন জীবজগৎ।'

সবুজপত্রের সমসাময়িক অনেকের রচনাভঙ্গীতে আতিশয্য-দোষের প্রাচুর্য বর্তমান, তা ছাড়া কয়েক ধরণের ম্যানারিজম থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেন নি। তার ফলে রচনা সর্বদা সাবলীল হয় নি। ভাষাকে তীর্যকগতিসম্পন্ন করবার তাগিদে তাঁরা অনেক সময় ভাষাকে মুচড়ে জটিল করেছেন, কৃত্রিম করে তুলেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতির বড় গুণ তাঁর ভারসাম্যতা। কখনোই তিনি অযথা প্রগল্‌ভ হন নি, বাকচাতুর্যে পাঠকের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে চান নি, বক্তব্যকে অতিক্রম করে ভাষা ছোটেনি। দুরূহ বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি দুরূহতর, কঠিনতর সবিনয়ে সফলকাম হয়েছেন অবলীলাক্রমে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

# হাসি

## দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর সহিত মানব মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এমনকি কেহ কেহ অনুমান করেছিলেন যে মানবের মন না থাকিলে এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। মানব বিষয়ী, এগুলি বিষয়। বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত মানবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এরূপভাবে আঘাত করিতেছে যে মানরের মন তাহা দ্বারা আলোড়িত না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার ফলে মানবের মনে বিভিন্ন অনুভূতির উৎপত্তি।

বাহ্যপ্রকৃতির তরঙ্গগুলি যদি চিরকাল এইরূপ হইত তাহা হইলে মানবের মন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত এবং তাহার ফলে কোন অনুভূতিই থাকিত না, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তরঙ্গগুলি মনকে হেলাইতেছে কখনও দুলাইতেছে কখনও বা বিষম আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া টুটিয়া ফেলিতেছে। তাই মানব হাসে তাই কাঁদে তাই ভয় পায়।

মানবমনের একটি বিশেষত্ব এই যে সে সংসারের বিষয়গুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুরূপ সংঘটন এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেইজন্যই হাসে অথবা কাঁদে। কোনও গভীর বিষয়ে আমাদের আশা ব্যর্থ হইয়া গেল আমরা কাঁদি এবং কোনও সামান্য বিষয়ে আমাদের ইচ্ছানুরূপ ঘটনা না ঘটিলে আমরা হাসি। সংসারে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যেও মানব একটা সাধারণ মানদণ্ড বাঁধিয়া লইয়াছে। কোনও একটি নূতন ঘটনা উপস্থাপিত হইলে সে অজ্ঞানসারে তাহাকে এই মানদণ্ডের সহিত তুলনা করে এবং উহা হইতে কোনও বিচ্যুতি হইলে হাসে বা কাঁদে। মানবজীবনে বিয়োগ ও মিলন সর্বপ্রধান জিনিস, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু অথবা অনুরূপ মানবের মনকে একবার আক্রমণ করিলে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে এবং যখন সে বন্ধন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে তখন মানব কাঁদিয়া সান্ত্বনা পায়। আবার যখন আমরা মূর্খ ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের ভাব তাহার সমঞ্জস হইবার পূর্বে যে অবসরটুকু থাকে সেই অবসরে হাসিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

আমরা যে সাধারণ মানদণ্ডের কথা বলিলাম তাহা হইতে কোনও একটি বিষয় অন্যরূপ হইলে তাহা মনকে একটি বিশিষ্ট প্রকারে আন্দোলিত করে। যদি কোনও ঘটনা এত গভীর হয় যে উহা ঐ পরিমাপ অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে উহা বিষাদজনক হইয়া উঠে এবং যে ঘটনা ইহার অনেক নিম্নে থাকে তাহা হাস্যোদ্দীপক হয়। এইজন্য দেখা যায় অসামঞ্জস্যই হাস্যের প্রধান কারণ এবং অন্যান্য কারণ ইহার অঙ্গীভূত। কোনও একটি বিষয় আমাদের মন কোনও একটি বিশেষ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে কিন্তু পরে যাহা ঘটে তাহা ঠিক অন্যরূপ। একজনের জ্বর হইয়াছিল তিনি অন্য একজনকে ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত ব্যক্তি বলিলেন 'বৃহৎ অট্টালিকাচূর্ণ'। দুইজন শিকারী পথ চলিতে চলিতে একস্থানে একটি গর্ত দেখিতে পাইলেন। প্রথম শিকারী বলিলেন তিনি সেই গর্তে একটা খরগোসকে ঢুকিতে

দেখিয়াছেন। শিকার বায়ুগ্রস্ত দ্বিতীয় শিকারীটি বহু পরিশ্রম করিয়া গর্ত খুঁড়িলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া সঙ্গীকে কৈফিয়ৎ তলব করায় তিনি বলিলেন 'হাঁ, দেখিয়াছি ঠিক, তবে সেটা বছর পাঁচেক আগে'। এক শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন 'ছোকরা, আলেকজাণ্ডার তোমার মত বয়সে তোমার চেয়ে একশ' গুণ বেশী জ্ঞানী ছিলেন।' ছাত্র উত্তর করিল 'তা বটে, এরিস্টটলের মত একজন লোক তাঁর শিক্ষক ছিলেন।'

এইরূপে দেখা যায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি মূর্খের মত কার্য করে, একজন লোক বীরপুরুষের বক্তৃতা করিয়া যদি কাপুরুষের মত কার্য করে তাহা হইলে আমরা হাসি। কৃপণের দানশীলতা, লম্পটের সচ্চরিত্রতা, তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তির তোষামোদে ঘৃণা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হাস্যোদ্দীপক। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজন মূর্খকে একটি কঠিন বিষয়ের প্রসঙ্গে যখন বলেন 'এ কথা আপনার আর বুঝতে কী বাকি আছে?' তখন নিজের মনেই হাসিতে থাকেন। একটি অভিমানোদ্ধত মূল্যবান পরিচ্ছদধারী ফ্যাসনপন্থী যুবক চলন্ত ট্রামগাড়িতে কায়দা করিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, রাস্তার কাদা তাঁহার দেহে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া গেল। যুবক যতই কর্দমাক্ত নানারকমে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন রাস্তার লোকজন ততই হাসিতে লাগিলেন। একজন পৌত্তলিকতাকে নিতান্ত ঘৃণা করেন তাঁহার নিকট একজন ঘোর পৌত্তলিক আসিয়া শিবঠাকুরের স্বপ্নাদ্য মাদুলীর গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা হঠাৎ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন, অপর একজন অভিনেতা তাঁহার বক্তৃতাটি দর্শকের শ্রুতিগোচরে তাঁহাকে মনে করাইয়া দিল, অথবা একজন অভিনেতা বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা উল্টাইয়া অথবা একসঙ্গে মিশাইয়া বলিয়া ফেলিল, তখন অপর একজন রঙ্গমঞ্চেই অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিল "আঃ! তুমি ওটা এখন বললে কেন? ভীমের বক্তৃতার শেষ কথা 'চল তবে ত্বরা করি' বলা শেষ হলে তবে তোমার 'অতিথি আজি এ পুরে' বলা উচিত ছিল।" এ সমস্ত ঘটনাগুলিই হাস্যোদ্দীপক। শেক্স্পীয়ারে মিড সামার নাইট্স্ ড্রীম নামক নাটকের মধ্যে যে নাটকাভিনয়টী আছে তাহা এ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়িতে পারে। একজনের নাসিকায় সর্প দংশন করায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু সংবাদে একজন বলিয়া উঠিলেন "চক্ষু মানুষের পরম ধন, চক্ষু দুটি বেঁচে গেছে।"

অসামঞ্জস্য কেবল যে ঘটনাতেই হয় তাহা নয়, কখনও কখনও কেবলমাত্র কথাদ্বারাও প্রকাশিত হয়। 'রক্ষিশূন্য কক্ষ' না বলিয়া 'কক্ষশূন্য রক্ষী' বলিলে হাসি পায়। এইরূপ 'নাবডারকেল' 'বক্ষের জলে চক্ষু ভাসিয়া যাওয়া' ইত্যাদি। এরূপ হাস্যোদ্দীপক উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এগুলির একটি চমকপ্রদ ক্রিয়া আছে। Wit-এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সিড্নী-স্মিথ বলিতেছেন যে ইহাতে ঘটনাগুলি কিঞ্চিৎ অসাধারণভাবে বর্ণিত হয় এবং তাহা মনে বিস্ময় আনয়ন করে। একটি লোক মারা গিয়েছে না বলিয়া 'পটোল তুলেছে' অথবা শিঙে ফুঁকেছে বলিলে হাসি পায়।

অসামঞ্জস্যতা হাস্যের কারণ বলিয়া অজ্ঞতাও হাস্যের একটি বিষয়, যেহেতু ইহা পূর্বকথিত সাধারণ পরিমাপের অনেক নিম্নে থাকে। সেকালে একজন পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় প্রথম আসিয়া যখন মোমবাতিকে কলাগাছের থোড় অথবা রাস্তার জলের কলকে শিবঠাকুর বলিত তখন হাস্য সংবরণ করা যাইত না। একই কার্যের বিভিন্নরূপ কারণ থাকে যাহার বহুদর্শিতা নাই সে

অজ্ঞতাবশতঃ সেই কার্য দেখিয়া সকল স্থানে নিজের অনুরূপ কারণটি আরোপ করে। ইহা হাস্যের বিষয়। একটা কল্পিত গল্প আছে যে একজনের গামছা হারাইয়া যাওয়ায় সে দাড়ি রাখিয়া নাপিতকে পয়সা না দিয়া গামছার দাম তুলিতেছিল, সে একটি লম্বা দাড়িবিশিষ্ট লোককে দেখিয়া ভাবিল তাহার নিশ্চয়ই শাল হারাইয়া থাকিবে।

সংসারের ব্যাপারগুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুরূপ সংঘটন ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই প্রভেদ থাকে। মানব নানারূপ সুখময় বস্তু কল্পনা করে কিন্তু পরক্ষণে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা দেখিয়া হাসি পায়। এস্থলে ঈশপের গল্পে গোয়ালিনীকুমারীর বিবাহ প্রস্তাবে অনিচ্ছাসূচক মস্তক কম্পন ও দুগ্ধভাণ্ড পতনের বিষয় আমাদের স্মরণ হয়। মানব সংসারের বিষয়গুলিকে তাহার অধীনে আনিতে চায় কিন্তু অবশেষে বিষয়গুলি মানবের প্রভু হইয়া উঠে। মানব বুঝিতে পারে যে তাহার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাপি সে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা অথবা প্রয়াস হইতে বিরত হয় না। অবশ্য ক্ষমতার মধ্যে প্রয়াস দোষের বিষয় নয় কিন্তু তাহাও অতি দ্রুত কল্পিত হইলে হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। অসম্ভব ব্যাপারের প্রয়াসের উদাহরণ বিষয়ে ইতিহাস হইতে এম্‌পিডক্‌লস্‌ ক্লিওম্‌ব্রোটাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

মানব যে বিষয়ে দুর্বল সেই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করা হয় তাহাও হাস্যের কারণ। তোষামোদে বোধ হয় মানবমাত্রেই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে তোষামোদ-প্রিয়তা এতই প্রবল যে তাঁহাদের মধ্যে যে জিনিসটির একান্ত অভাব কোনও লোক তাঁহাদের সেই জিনিসটি আছে বলিলে অত্যন্ত খুশী হন এবং এমনকি অন্য লোক না বলিলেও তাঁহাদের মনে মনে দৃঢ় ধারণা থাকে যে তাঁহাদের বাস্তবিকই সেই জিনিসটি আছে। একজনের বক্তৃতা কাহারও ভাল লাগে না তথাপি তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। একজনের শরীরে বর্ণ নিতান্ত কৃষ্ণ হইলেও চাটুকারের মুখে তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের প্রশংসা শুনিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

মানবের বৃথাডম্বরপ্রিয়তা হাস্যের একটি চিরন্তন উপাদান এবং এ ব্যাপারটিকে বিদ্রূপ করিতে কালজয়ী বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহারা মানব জাতির দোষ ও ভ্রমগুলিকে ইতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে সংক্রামিত করিয়াছেন। বানরের স্বভাবচপলতা কচ্ছপের মন্দগতি, শৃগালের বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তাহাদিগকে কথা বলাইয়া গল্প রচনা করা হইয়াছে। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক অথবা আকাশ উড্ডয়নেচ্ছু কচ্ছপের গল্প পড়িতে পড়িতে আমার যতটা উপদেশ পাই ততটা হাসিতেও থাকি। এ গল্পগুলিতে নৈতিকদর্শনকে যদিও প্রাকৃতিক ইতিহাসে পরিণত করিতে হইয়াছে তথাপি ইহাদের মধ্যে হাস্যরস মিশ্রিত না থাকিলে ইংরাজ সমালোচক হেজ্‌লিট এরূপ কথা বলিতেন না যে "আমি ইউক্লিডের জ্যামিতি অপেক্ষা ঈশপের গল্পের রচয়িতা হইতে ইচ্ছা করি।"

শুধু কথা ব্যতীত অনেক সময়ে আকারইঙ্গিতেও হাস্য আনয়ন করা হয়। অভিনয়ে বিদূষকগণ কখনও হস্তসঞ্চালন কখনও ভ্রূকুঞ্চন কখনও বিকট চিৎকার প্রভৃতির দ্বারা হাস্য আনয়ন করে। এরূপ হাস্য র‍্যাবিলেশের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। এরূপ হাস্যের টান অনেক

সময়ে আদি রসের দিকে থাকে এবং অভিনয়ে যত কৃতকার্য পাঠকালে তত নয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঠিক অন্য ধরণের আর একপ্রকার হাস্য আছে তাহা কেবল উন্নত ও শিক্ষিত মনবিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারে অনেক গুরু বস্তু আছে এবং অনেক লঘু বস্তুও আছে, মন যখন কোনও একটা গভীর বিষয় লইয়া অলোচনা করিতেছে তখন তাহাকে পরক্ষণেই কতকগুলি অতি সামান্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় এবং মানব তাহাতে স্বভাবতঃই হাসে। চার্লস্ ল্যাম্ব এবং ইংরাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক স্যার টমাস ব্রাউনের হাস্য এইরূপ ঘটনা হইতে উদ্ভূত। এই পৃথিবী তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী কিন্তু তাঁদের মন আর একটি কল্পনাময় পৃথিবীতে সর্বদা বিচরণ করিত, তাঁহারা এই দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অক্ষম। এরূপ মনের স্বাভাবিক অভির্ব্যক্তি হাস্য। কিন্তু ইহাদের মনে হাস্যের সহিত বিষাদের তরঙ্গও প্রতিনিয়ত কখনও যুগপৎ উঠিতেছে, কখনও একটি তরঙ্গ অপর একটি বিলীন হইয়া তাহা হইতে পুনরায় উঠিতেছে এবং কখনও বা একটি তরঙ্গ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবার পূর্বেই অন্য একটি আসিয়া তাহাতে আঘাত করিতেছে। কখনও সাধারণভাবে হাস্যোদ্দীপক, কখনও প্রকারান্তরে, কখনও সামান্য কথা দ্বারা, কখনও আকার ইঙ্গিতে এবং কখনও বা হাসাইতে হাসাইতে পাঠককে একটি উর্দ্ধতন রাজ্যে লইয়া গিয়া বিষাদের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জন। কিন্তু যখন তাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে নিজমনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন তখন দেখা যায় সেই হাস্যের বাহ্য আবরণের পশ্চাতে বিষাদের কলঙ্করেখা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং কখনও বা বাহ্য আবরণটি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আমরা সেই কলঙ্করেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের হাস্য ক্রন্দন আছে কিন্তু ক্রন্দনের হাস্য নাই। তাঁহাদের হাস্যের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর যেমন আধ গৌরী আধ শঙ্কর, আধ জ্যোতি আধ ছায়া সেইরূপ ইঁহাদের হাস্য অর্দ্ধেক কবিতা অর্দ্ধেক কল্পনা, অর্দ্ধেক বিষাদ অর্দ্ধেক সহৃদয়তা, অর্দ্ধেক চিন্তা অর্দ্ধেক অনুভূতি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ইঁহাদের হাস্য অপেক্ষা ক্রন্দন অধিক কেন? তবে সংসারের সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক? পূজ্যপাদ রামেন্দ্র ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটিতে লিখিয়া কোনও একটি দিকে অধিক টান দিয়াছেন আশঙ্কা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন কেন? শেক্স্‌পীয়ারের 'কিংলীয়র' নাটকের বিদূষককে বিদূষক না 'বিষাদ' বলিব?

সাধারণ জীবন বিকৃত দেখিলে স্থলবিশেষে হাসি পায়। দুই তোত্‌লার কলহ শুনিয়া অথবা তোতলা ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিতে না পারিলে শিশুগণ হাসে। জীবন বিকৃতি দেখিলে হাসি পায় বলিয়া কতক লেখক সাধারণ জীবন হইতে কিঞ্চিত অসাধারণ ঘটনা ঘটাইয়া হাস্য আনয়ন করিয়াছেন। মোলিয়ারের পুস্তকগুলিতে অফুরন্ত হাস্য আছে কিন্তু ঘটনাগুলি কিছু অসাধারণ, বাস্তবজীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটে কিনা সন্দেহ। সেরূপ হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ঘটাইবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিতে হয় তাহা সব সময়ে হয়ত বাস্তবজীবনে সত্য নয়।

অতিরঞ্জন ব্যাপারটি জীবন বিকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অতিরঞ্জনপ্রিয়তা মানবমাত্রেই দেখা যায় তবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক। একটি ঘটনায় যে ব্যাপারটুকু

যোগ করিয়া নিলে হাস্য আনয়ন অথবা বৃদ্ধি করা যায় তাহা যোগ করিয়া নিতে অনেকে কসুর করেন না। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই।

ক্ষুদ্রবস্তুকে মহৎ অথবা মহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র করিয়া বর্ণনা করিতে হাসি পায়। এস্থলে 'বিষবৃক্ষে' হুকার বর্ণনা স্মরণ হয়। এইরূপ 'প্যারডী' অর্থাৎ ব্যঙ্গানুকরণ হাস্যের একটি কারণ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জন্মভূমি' গানটির অনুকরণে চশমা প্রভৃতি বিষয় লইয়া গান রচিত হইয়াছে এবং মাইকেলের লেখার অনুকরণে 'টেবুলিলা সূত্রধর কাপড়িলা তাঁতী' এবং ছুঁচুন্দরীবধ কাব্য লিখিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় অসদৃশ বিষয়ের উপমাতেও হাসি পায়। জনৈক মহিলা ডক্টর জনসনকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহার বয়স সতর বৎসর। ডক্টর জনসন শেষবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "yes yes I know that, beacuse truth is oft repeated."

অসামঞ্জস্য হাস্যের কারণ বলিয়া ভণ্ডামিও হাস্যের কারণ। একজন হাতে মালা জপিতেছে কিন্তু অন্তরে কাহার সর্বনাশ করিবে তাহা ভাবিতেছে। অনেকস্থলে দেখা যায় এরূপ লোকের চাতুরী ধরা পড়িলে তাহারা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পুনরায় নূতন চাতুরী কল্পনা করে, তাহাও হাস্যোদ্দীপক। মোলিয়রের মক-ডক্টর এইরূপ চরিত্রের লোক। এরূপ ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত আমরা বেন জনসনের নাটকগুলিতে অনেক পাই। এরূপ লোকের কার্যকলাপ দেখিয়া হাসি পায়—যদিও তাহার সহিত ঘৃণামিশ্রিত থাকে—এবং যাহাদের মূর্খতাকে লইয়া ইহারা ক্রীড়া করে তাহাদের কার্য দেখিলেও হাসি পায়—যদিও তাহার সহিত সহানুভূতি মিশ্রিত থাকে।

মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা একেবারে জানে না অথবা অতি অল্পই জানে এরূপ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে কথোপকথন বড়ই হাস্যোদ্দীপক। একজন বাঙ্গালী একজন বিহারীর সহিত হিন্দীতে কথা বলিতে গিয়া সমস্তটাই বাঙ্গলা বলিতেছেন, কেবল ক্রিয়াপদের সময় 'হ্যায়' শব্দটি যোগ করিয়া দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে একটা 'লেকিস' কিম্বা 'মগর' যোগ করিয়া মনে করিতেছেন তিনি খুব হিন্দী বলিতেছেন। একজন বাঙ্গালীকে কোথা হইতে তিনি কিছু হিন্দী শিখিতে পারিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন হিন্দুস্থানে থাক্ থাক্ করকে কুচ্ কুচ্ হিন্দী শিখ্থা। একখানি গ্রামোফোন রেকর্ডে একসময়ে শুনিয়াছিলাম একজন বাঙ্গালী ক্যানভাসার হাওড়া পশ্চিমগামী একটি রেলগাড়িতে চড়িয়া বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিতেছেন এবং গাড়িতে অবাঙ্গালী যাত্রী থাকায় তাহাদের বুঝাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে উহার হিন্দীতে তরজমা করিয়া দিতেছেন। তিনি বাঙ্গালায় "বিলাসে ব্যসনে আর কি কাটিবে?" বলিয়া হিন্দীতে তরজমা করিলেন "বিলাসমে ব্যসনমে আউর কি কাটেগা?" একজন স্কচ্ পাদ্রী বাঙ্গলা কবিতায় বাইবেলের গান ধরলেন "গৌয়াল গরে কে। শৌয়েছেন জাব্ পাটরেতে।। ঔনি যীশু মুকুটিডাটা। ঔনি জগটের মাটা" ইত্যাদি।

দ্ব্যর্থবোধক কথার ক্রীড়ার দ্বারা যে হাস্য আনয়ন করা হয় তাহাকে ইংরাজীতে pun বলে। বক্তা এক অর্থে কথাটি প্রয়োগ করিতেছেন এবং শ্রোতা অপর অর্থে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। পাঠকদের এস্থলে গোপালভাঁড়ের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির' কথা স্মরণ হইতে পারে।

বুভুক্ষু ব্যক্তির নিকট কেহ যদি সন্দেশ আনিয়াছে বলিলে তিনি যত আনন্দিত হন সে সন্দেশটা কোনও ময়রার না হইয়া সংবাদপত্রের হইলে ততোধিক দুঃখিত হন। প্রশ্ন—আপনার ঠাকুরের ( অর্থাৎ পিতাঠাকুরের ) নাম কী ? উত্তর—শালগ্রাম। প্রশ্ন—আপনাদের কী মেল ? উত্তর—বোম্বাই মেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' এবং শেক্‌স্‌পীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের প্রথম অঙ্কে ইহার অনেকগুলি উদাহরণ আছে।

একজনে একটি প্রশ্ন করিতেছে অন্য ব্যক্তি ভুল শুনিয়া অথবা একেবারে না শুনিয়া প্রশ্নটি অনুমান করিয়া লইয়া যে উত্তর দেয় তাহাতে হাসি পায়। একজনে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুঁটুলিতে কী ?" উত্তর হইল "রাধানগর যাচ্ছি।" এক ধনী ব্যক্তির পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোনও ফল হইল না দেখিয়া পিতা হতাশ হইয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন বধির মোসাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খোকাকে এখন কে দেখচে ?" পিতা বিরক্তির সহিত অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন "দেখবে আর কে—যম।" মোসাহেবটি কথাটা ভাল করিয়া না শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন "হঁ্যা, চিনি খুব ভাল ডাক্তার শুনেছি, উনি যে রোগীকে দেখেন তাকেই ভাল করে দেন।"

মানবমাত্রেই একটা বিবেচনাশক্তি আছে এবং বিভিন্ন মানব বিভিন্নভাবে চিন্তা করে। অবশ্য একজনের মত অন্য কোনও জনের মতের সহিত মিলিয়া যায় কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁদের নিজেদের কোনও মতামত নাই অথবা থাকিলেও স্বার্থের খাতিরে অথবা নৈতিক সাহসের অভাবে তাহা প্রকাশ করে না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে অন্য লোকের চিত্তসমর্থন করিতে থাকেন। এরূপ লোকের কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া হাসি পায়। এজন্য রাজাগণের মোসাহেবগুলি চিরবিদ্রূপস্থল। সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে ইহা যদি রাজার মত হয় তাহা হইলে ইঁহাদের মতও তাহাই।

জোভের-পদকের মত সংসারের প্রত্যেক জিনিসের দুইটি দিক আছে তাহাদের একটি দিক আনন্দময় অপর দিক বিষাদময়। এদুটি যষ্টির দুই প্রান্ত যেমন কখনও পৃথক করিতে পারা যায় না এদুটিও তদ্রূপ। নির্মল হাস্য ( humour) এই দুইটি দিক সমান দৃষ্টিতে দেখে। এই দৃষ্টি কেন্দ্রচ্যুত হইলে একদিকে অতি তুচ্ছ ও কৃত্রিম হাস্যে পরিণত হয় এবং অপর দিকে নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হয়। মানব তাহার নিজের নিকট অতি মহৎ কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনায় যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য শক্তিহীন জীব এবং মানবজীবনের ইহা অতি সাধারণ বৈরতা। নির্মল হাস্য এই উভয় দিকের উপর সমান সহানুভূতি রাখিয়া কোনটিকে প্রধান হইতে দেয় না। শেক্‌স্‌পীয়রের হাস্য ঠিক এই ধরণের। প্রথমে দেখা যায় ম্যালভোলিও তাঁহার তুলাদণ্ডের বিদ্রূপের প্রান্তে ঝুলিতেছে এবং পরক্ষণেই দেখা যায় সে তাঁহার অপরিসীম সহানুভূতিভাজন হইয়াছে।

হাস্যে এইরূপ সহানুভূতি না থাকিয়া যদি নৃশংসতা মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে তাহা কঠোর বিদ্রূপের আকার (satire) ধারণ করে। কখনও কখনও এরূপ বিদ্রূপের বিষযুক্ত শর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি জঘন্য। জুভিনাল এইরূপ বিদ্রূপের জন্য চির প্রসিদ্ধ এবং তিনি ড্রাইডেন ও পোপের মহাজন। ড্রাইডেনের বিদ্রূপে উদারতা মিশ্রিত আছে বলিয়াও যদিও তিনি এ দোষে সর্বতোভাবে দুষ্ট নহেন

অ্যাডিসনের উপর পোপের যে বিদ্রূপ তাহা সাহিত্য হিসাবে যত মধুর নৈতিক হিসাবে ততোধিক ঘৃণিত। ব্যক্তিবিশেষের বিদ্রূপে এত হিংসা ও সঙ্কীর্ণতা ছিল বলিয়া পোপের বিদ্রূপ এত হেয় কিন্তু বায়রণের 'ভিসন অফ্ জাজমেণ্ট' এরূপ উদারভাবে লিখিত যে তাহা পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের ঘৃণার ভাব আসে না। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' এর প্রতি কাব্যবিশারদের ব্যঙ্গ বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

এই বিদ্রূপ ক্রমশঃ ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া সমাজ এবং সমাজকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর উপরও সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। সৃষ্টিরহস্য অদ্যাবধি কেহ ভেদ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ পারিবেও না তথাপি মানবের স্বভাব এই যে উহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে এরূপ প্রয়াসে অকৃতকার্য হইয়া কাহারও মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি অবিমিশ্র হাস্য যথা সিড্‌নী স্মিথ, কাহারও হাসিকান্নার সংমিশ্রণও অপরিমেয় সহানুভূতি যথা শেক্‌স্‌পীয়ার, কাহারও বা গভীর সন্দেহ যথা মন্‌টেন ও বেকন এবং কাহারও বা নৃশংস বিদ্রূপ যথা সুইফ্‌ট্। সুখ ও দুঃখ বোধহয় সমান পরিমাণেই আছে, তথাপি মানব দুঃখকে সংসার হইতে বিতাড়িত করিতে চায় এবং না পারিলে তাহার মনে বিভিন্নরূপ অবস্থা হয়—কাহারও হাস্যের চিরন্তন তরঙ্গ, কাহারও অতলস্পর্শ জলধির গভীরতা, কাহারও বা হাসি-কান্নার সংমিশ্রণ অথবা ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ও তিরোভাব। কিন্তু অধিকস্থলে দেখা যায় হাসি অপেক্ষা কান্না, সহানুভূতি অপেক্ষা বৈরিতা এবং সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহের ভাগ অধিক। এরূপ বিষাদ (melancholy) ও সন্দেহ প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্লেটোর মধ্যে আছে, ইহা মন্‌টেনের মধ্যে আছে, ইহা শেক্‌স্‌পীয়ার মিলটন বেকন প্রভৃতির মধ্যে আছে এবং কাহার মধ্যেই বা নাই? মন্‌টেনের সম্বন্ধে একটি রচনাতে ইমারসন বলিতেছেন—who shall forbid scepticism, seeing that there is no practical question on which anything more than an approximete soliution can be had?

কখনও কখনও হাস্যের উদ্দেশ্য থাকে কখনও বা থাকে না। শেক্‌স্‌পীয়ার, অ্যারিষ্টোফেন্‌স্‌, মোলিয়র, সুইফট্ প্রভৃতির হাস্যের একটি মহত্ব এই যে উহা উদ্দেশ্য মূলক (means to an end)। কিন্তু ইহার বিপরীত একরূপ হাস্য আছে তাহা নিরুদ্দেশ্য। ইহা উত্থিত হয়, তরঙ্গিত হয় কিন্তু ইহার কোনও গতি নাই, ইহা একটি ঘূর্ণীতে আত্মহারা হয়! এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যাহাদের চক্ষে সংসারের প্রত্যেক জিনিস হাস্যময় অথবা হাস্যের সম্ভবনাপূর্ণ। এইরূপ নিরুদ্দেশ্য হাস্যের মূল্য কিছুই নাই তথাপি দেখা যায় কোনও কোনও গ্রন্থকার—যথা সিড্‌নী স্মিথ—এরূপ ভাবে উহা প্রদান করিয়াছেন যে তাহা সাহিত্যে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

হাস্যের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ব্যতীত অন্য অনেকরূপ কারণ আছে এবং সেগুলি এই কারণগুলির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অধিকাংশস্থলে ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আকার ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদনের সহায়তা হয়। আরও দেখা যায় একই ঘটনা কেবল বর্ণনার তারতম্য অনুসারে হর্ষ অথবা বিষাদ আনয়ন করে। কতকগুলি লেখক আছেন তাঁহাদের হাস্য বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। চসারের হাস্য কিঞ্চিত বায়ব ধরণের এবং আমাদের স্পর্শকে প্রতারিত করে।

## দর্শক ও নাটক

ইদানীং ব্যক্তিচিন্তাই সাহিত্যরূপে প্রতিপন্ন করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং ইউরোপের কোন কোন দেশের অনুসরণে এদেশেও তার তরঙ্গ দেখা দিয়েছে। আজকের কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিচিন্তারই প্রতিভাস ; গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু এধরণের চেষ্টা নজরে পড়ে তবে লেখার প্রসাদগুণ থাকলে পাঠকের পক্ষে এদের রসাস্বাদও অসম্ভব নয়। কবিতা গল্প-উপন্যাস ব্যক্তিগত রুচির অনুপূরক বলে খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা নয় আর সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন মানুষও এগুলিকে আত্মস্থ করতে পারে। নাটকের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। যেখানে নাটক তথা নাট্যকার যতটা মূল্য দাবী করেন নট ও দর্শকের মূল্য তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে বেশীই বলতে হবে। প্রসঙ্গতঃ নট-নাট্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে শিশিরকুমার—শরৎচন্দ্র কাহিনী স্মর্তব্য। শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের নাটকের পরিবর্তন-পরিবর্জন করায়, শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমার কথা কুকুরের মুখে দিলে জমে যায় আর শিশির কিনা তাকে বদলায়। কথাটা শুনে শিশিরকুমার নাকি বলেছিলেন, অনেক সময় ভাল অভিনেতার মুখেও যে জমে না তার প্রমাণ আছে কিন্তু শিশিরকুমার যে ধারাপাত পড়লেও জমে যায় তাও দেখানো গেছে। এই কথাগুলি সত্যি তিনি বলেছিলেন কিনা জানি না কিন্তু আমাদের কাছে বলেছিলেন। 'পল্লীসমাজ যখন চলল না তখন শরৎদা এসে বললেন, শিশির ওরা বুঁদে বানাতে পারে সন্দেশ নয়। তুমি বইটা কেটে-টেটে যেমন করে হয় দেখিয়ে দাও যে আমার বই চলে।'

তখনকার দিনের দর্শক সন্দেশের বদলে বুঁদে হজম করতে নারাজ ছিল বলেই বোধ হয় শরৎচন্দ্রকে শিশিরকুমারের কাছে আসতে হয়েছিল। আজকের দিনে বিপরীত ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। অন্ততঃ পেশাদারী নাট্যশালায় যে ধরণের নাটক তথা নট প্রশংসা পাচ্ছে তাতে বুঁদেরই যে এখন কদর বেশী তা মনে করলে কি খুব বেশী ভুল হবে ? শুধু পেশাদারীই বা বলি কেন সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সৌখীন সম্প্রদায়ের বা কি অবস্থা ? দৃষ্টান্তস্বরূপ চিকিৎসকদের কথাই ধরা যাক না। একদা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের খুবই সুনাম ছিল। বহু পেশাদারী নাটক প্রথমে চিকিৎসকরা মঞ্চস্থ করেন এবং পরে তা পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়। আজকের-দিনে সেই চিকিৎসকদের নাটকের মান নাট্যকার কবির ভাষায়, 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়বঙ্গে'।

কেন এমন হ'ল ? কেন নাট্যাভিনয়ের সর্বাধিক প্রেরণা দর্শকের উচ্চ বিচারশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে ? এর কারণ অনুধাবন করতে হলে এদেশের দর্শকদের শ্রেণী বিচার ও তার ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

এদেশে নাটক সম্পূর্ণভাবে মধ্যবিত্তের সৃষ্টি—এ মধ্যবিত্তও বিশেষ এক অঞ্চলের তথা শ্রেণীর। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্য থেকেই প্রথমদিকার নট-নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাই তৎকালীন অভিনীত নাটকে স্থানীয় সমাজের কাজকর্ম, ধ্যান-ধারণা, বিচার বিবেচনা সবই স্থান পেয়েছিল। দীনবন্ধুর নীল দর্পণ বোধ হয় এর একমাত্র ব্যতিক্রম এবং এই ব্যতিক্রমই নিয়মশৃঙ্খলাকে আরো পরিস্ফুট করেছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির নাটকে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে তাদেরই আশ-পাশে সম্পূর্ণ স্পষ্ট আকার নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। যোগেশ, রমেশ, সুরেশের মত ছেলে, উমাসুন্দরীর মত মা, প্রফুল্ল-জ্ঞানদার মত স্ত্রী বা করুণাময়ের মত বাপ, দুলালচাঁদের মত ছেলেও ঘরে ঘরে পাওয়া যেত। দর্শকেরাও তাই নিজেদের অতি পরিচিত চরিত্রদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা সবকিছুর সঙ্গে অতি সহজেই একাত্ম হতে পারতেন, ফলে নটদের অভিনয় বিকশিত হবার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত হয়ে থাকত। একদিক থেকে এই ঘনিষ্ঠ পরিবেশ নটদের পক্ষে যেমন সহায়ক হয়েছিল অন্যদিক থেকে তেমনি বিপদের বীজও উপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নটরা জানতেন কি প্যাঁচে দর্শকদের বশ করা যাবে, নাটক 'ঝুলে যাচ্ছে' সন্দেহ হওয়া মাত্রই তারা বহু ব্যবহৃত সেই সব প্যাঁচ প্রয়োগ করে সামলে নিতেন। অভিনয়ের দুরূহ কলা-কৌশল রপ্ত করার চেয়ে এইসব প্যাঁচ রপ্ত করা সহজ ছিল বলেই অধিকাংশ অভিনেতা সেগুলি নিজের নিজের তূণে ভরে নিতেন এবং তারপর অভিনয় ক্ষমতার ব্রহ্মাস্ত্র সাধনার রত হতেন। অধিকাংশই এ সাধনায় সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন না করলেও নিরলস সাধনা করতেই হত, না হলে পরিচিত পরিবেশের দর্শকরা কিছুদিন পরে প্যাঁচের কারসাজি ধরে ফেলত আর তাহলেই নটের অপমৃত্যু অনিবার্য ছিল।

শহর কলকাতা কিন্তু অনড় ছিলনা, একটু একটু করে তার পরিধি বাড়ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো পল্লীতে ভাঙন ধরছিল। নানা জায়গা থেকে নানাজনে এসে নতুন পরিবেশে ঘর বাঁধতে লাগল। নাট্যশালাগুলি কিন্তু পুরোনো পরিবেশেই রয়ে গেল, নট আর দর্শকদের মধ্যে বিভেদের সুর ফুটে উঠতে লাগল।

ভাঙনটা আরো বাড়িয়ে দিতে দেখা দিল চলচ্চিত্র, সুরু হ'ল তার সঙ্গে বি-সম প্রতিযোগিতা। চলচ্চিত্র একই কাহিনীকে অধিকতর বর্ণাঢ্যরূপে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করল, অথচ দর্শকের ব্যয় কমল। মঞ্চের অনেক প্যাঁচ সূক্ষ্মতর ও সুন্দরতররূপে দর্শকদের আকৃষ্ট করল। দিনে দিনে চলচ্চিত্রের প্রাথমিক বিকৃতিক্রমে দূর হয়ে তা সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে লাগল আর মঞ্চ ততই পেছু হঠতে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘায়ে মঞ্চ আরো দুরাবস্থাগ্রস্ত হ'ল, পক্ষান্তরে চলচ্চিত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। মনে হ'ল বার্দ্ধক্যের ভারে মঞ্চ বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ে। হয়ত পড়তও, বাঁচিয়ে দিল আর একটা চরম অভিশাপ—দেশ বিভাগ। চলচ্চিত্র একটা প্রকাণ্ড আঘাত খেয়ে বিকল হয়ে পড়ার অবস্থায় এসে দাঁড়াল, অন্যদিকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বেশ কিছু সংখ্যক কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে এসে স্থায়ী আস্তানা গড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে নাট্যরসিকদের সংখ্যা খুব অল্প ছিল না। এঁরা এতকাল সুযোগ অভাবে নিয়মিত অভিনয় দেখতে পান নি, এবার সে সুযোগের সদ্ব্যবহার

করতে লাগলেন। মরা গাঙে অকস্মাৎ এলো প্রচণ্ড জোয়ার।

সে জোয়ারের টান আজও চলছে কিন্তু কতদিন তা চলবে? দর্শকরা যেদিন বুঝবেন তাঁদের পিটুলী গোলায় মন ভরতে হচ্ছে সেইদিনই আবার পুনর্মুষিকোভব। অবশ্য আজ বা কাল সে ঘটনা ঘটবে না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে; আর তাই নাট্যশালা সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে।

অভিনয় মানে যে আলোর খেলা নয়, অভিনয়ের যে ট্রেণ বা জলোচ্ছ্বাস বিকল্প নয় এ বোধটা দর্শক মনে জাগ্রত হওয়া দরকার। অভিনয় দেখতে গিয়ে আনন্দ পাবার ইচ্ছাটা অস্বাভাবিক নয় এ তথ্য স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, অভিনয় জাতির দর্পণ, দর্পণের প্রতিফলন যদি যথাযথ না হয় তাহলে দোষ যতটা দর্পণের ততটাই দ্রষ্টার। আজকের বাঙলা নাটকে যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অস্থিরতা চঞ্চলতা নিত্যকার দুঃখ বেদনা, ক্ষয়-ক্ষতি ঠিকভাবে প্রতিফলিত না হয়ত অপরাধটা শুধু নাট্যকারের বা নটের নয়, দর্শকরাও তার সমান দায়ভাগী। কাঁচ আর হীরে যদি আমাদের কাছে একই দরে বিকোয় তো কাঁচের জায়গায় হীরে দিতে যাবে কোন আহাম্মক।

দর্শকদের তাই রূপায়িত সত্য প্রকৃত সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়েছে কিনা তা বিচার করতে হবে এবং সত্যের যে শ্রেষ্ঠতর রূপ এইভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করা যাতে হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। যারা ভেজালের পাইকার তাদের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। নাটকের গতিটা তথাকথিত অগ্র না পশ্চাৎগামী সেকথা না ভেবে সেটা প্রকৃত নাটকপদবাচ্য হয়েছে কিনা সে বিচার সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। এ দেশের লোকের মানসিকতা এতই মোটা ধরণের যে কাতুকুতু না দিলে তাদের হাসানো যাবে না এ তথ্য বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আর দর্শকেরা পছন্দ না করলে বহুদিন ধরে যে তা চালানো যাবে না এ তথ্য আজ আর কারো অবিদিত নেই। তবে নাটকের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছে না কেন এ নিয়ে দর্শকদেরই বিবেচনা করে দেখতে বলছি। একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, নাট্যশালার আপাতঃ সুবিধা স্বত্বেও যৌবন অতিক্রান্ত মঞ্চের ভবিষ্যত সন্দেহজনক। অপমৃত্যুর হাত থেকে নাট্যশালাকে বাঁচাতে ত্রস্ত হন দর্শকরা।

**রবি মিত্র**

## ছোট গল্পের দু-এক কথা

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধ ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। উত্তর পঞ্চাশ উনিশ শতাব্দীর সাহিত্যের আসরে নিয়ে এসেছে ছোটগল্পকে। বড় বড় যুদ্ধ, পরিবর্তন ও ভাববিপ্লবের মধ্যে মানুষের ছোট দুঃখ, ছোট ব্যথা নিয়ে গড়ে উঠলো এক মহৎ শিল্পধারা।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, একই দিকে সাহিত্যের এই একমুখীনতা, বিভিন্ন উপনদী একযোগে যেন সেই মহাসমুদ্রের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। আরো বিস্ময়কর সাহিত্যের এই শাখাটির সমধর্মিতা। পৃথিবীর ছোটগল্পের ইতিহাসে পত্রপত্রিকার প্রভাব ও প্রযত্ন অনন্য। স্বল্পমূল্যের ও সংক্ষিপ্ত আকারের পত্রিকাগুলো এগিয়ে না এলে ছোটগল্পের আগমন আরো কত দেরী হতো কে জানে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ছোটগল্পকারদের প্রথম স্থান দিয়েছে সাময়িক পত্র আর সম্মান দিয়েছে তার পাঠকরা।

বৈদেশিক সাহিত্যকর্মে ইংরেজী সাহিত্য ভাবগাম্ভীর্যে ও রচনা সম্ভারে বিপুল কিন্তু ছোটগল্পে ইংরেজী সাহিত্য দুর্বল। শুধু ছোটগল্প কেন উপন্যাস ইংলণ্ডের মাটিতে উপেক্ষিত। শেক্সপীয়ার-মিল্টনের কাব্যধারা আর নাটকের নিটোল বাঁধনে কথাশিল্প অস্ফুট। মানুষের মহত্ত্বকে রূপ দিতে গিয়ে সামান্য জীবনের খণ্ডবেদনা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাজা, রাজপুত্র আর সমরনায়কদের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও শৌর্যের মহিমার পাশে সাধারণ মানুষের কান্নাহাসির কোন দোলাই লাগেনি। গ্রীকস্থপতির বিস্ময়ের পাশে ফুটে থাকা বনফুলের ব্যঞ্জনার যে বঞ্চনা, সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ তেমনি ইংরেজী সাহিত্যে অনুচ্চারিত। তবু কিন্তু এলো উপন্যাস—অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব, নতুন উপনিবেশ স্থাপন, যন্ত্রযুগের সূচনায় সাহিত্যে এলো পাখা বদলের হাওয়া। কিন্তু ছোটগল্পের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না—'এখন রয়েছে অনেক বাকী'। এই বাকী থাকার বিকেলেই অন্যদিগন্তে ছোট গল্পের স্বর্ণ ও সার্থক রশ্মি দেখা গিয়েছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে লঘু চালে প্রবন্ধ রচনার ভাষার সৃষ্টি হয়েছে! সেই নতুন ভাষা ও ভাবকে প্রচার করার জন্য আমদানী হলো পত্রপত্রিকার। ছোট নভেল, বড় গল্পের চলন হলো, ছোট গল্পের তখনও চালচুলো নেই, কিন্তু সাহিত্য রসিকদের মনে ছোট গল্পের মেজাজ তৈরী হয়েছে।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রিটিশের বাহুমুক্ত সাহিত্যসংস্কৃতিশূন্য একটি নতুন দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই নতুন পরিবেশে একটি অভিশপ্ত পরিবারের একজন ছেলে ছন্নছাড়া জীবনযাপন করতে করতে সৃষ্টি করলেন ছোট গল্প এযুগে ছোট গল্পের জনক এডগার এলান পো (১৮০৯-৫১)।

উনিশ শতকে জার্নালিস্‌মের মধ্য দিয়েই রচনা সাহিত্যের সৃষ্টি। আর এই পত্রিকার

পাতাভরাটের জন্য বসলো গল্পের আসর। সংবাদপত্রের কর্মকর্তাদের আদেশে সেই সীমিত স্থানে অবয়ব তৈরী হোল—একটি প্রসঙ্গের আরম্ভ ও শেষ। আর এই সংক্ষিপ্ততার জন্য গল্পের গতি হলো দ্রুত। মনের কথা, বুকের কান্না, জীবনের যন্ত্রণা, সাফল্যের সমারোহ, সবিস্তারে প্রকাশের স্থান কোথায় সংবাদপত্রের পাতায়! তাই উপন্যাসের বিলম্বিত লয় নয়, গল্পে এলো নৃত্যের গতি। সাময়িকপত্রের স্থান সমস্যা অথচ পাঠকমন পরিতৃপ্তির দোটানায় অলক্ষ্যে সৃষ্টি হলো একটি শিল্প—এলো ছোটগল্পের 'ফর্ম'।

পো এই বাজে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করলেন সংসারের দাবী মেটাতে। নিজের লেখা আর গল্প ফেরি করে উনিশ শতকের আমেরিকার সাহিত্যে পো বেঁচে রইলেন। তখন আমেরিকার সাহিত্য জগৎটা ছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দ্বীপশলাকায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করেছিলেন এলান পো, মৃত্যুর পর পো গল্পে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর গল্পের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র, সকল লেখককে।

এলান পো সম্বন্ধে Hervey Allen বলছেন :...his method is subje tive rather than obje tive—and the modern short story, particularly the tale of retio ination, the detective story for instan e, is largely his invention. His theories as the to proper construction and use of meterial for the short story have became the stock in trade of thousands of su cesful tradewriters as well as convenient mechinery of some "great once". (Introdu tion on com. works. of Poe.)

এলান পো শুধু ছোট গল্পের দেহ নির্মাণই করলেন না, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো ছোট গল্পের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। ঐতিহ্যহীন, সংস্কৃতিশূন্য, সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরু করলো ছোট গল্পের মহোৎসব। এমনি ছোট গল্পের নিখাদ নির্মাণ প্রয়াস আর কোথাও দেখা যায়নি। ফ্রান্সে ফ্লবেয়ারের উপন্যাসের পাশে মোঁপাসার কারুশিল্প, রাশিয়ার তলস্তয় আর তুর্গেনিভের উপন্যাসের মহীরুহ ঘিরে ছোট গল্পের লতা বিস্তার, কিন্তু আমেরিকা, মার্কিনী মানুষরা সযত্ন শ্রমে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীন ভূমিতে রোপন করেছে ছোট গল্পের পুষ্পকানন, পালন করেছে সেই বীথিকা, জলসিঞ্চন করেছে ছোট গল্পের তরুতলে। তাই, সাহিত্যের সংবাদে আজও, এই বিশ শতকের ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে আমেরিকার গল্পের আনাগোনা।

এলান পো'র অবয়বের সহিত শিল্পরূপ দিলেন রাশিয়ার লেখক আন্তন চেকভ ( ১৮৬০-১৯০৪ )। ছোটগল্পের সংজ্ঞাটি যেন ঠিক তিনি ধরতে পেরেছিলেন। বিস্তার নয়, বক্তব্যকে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া, তাকে বিদ্যুৎ দীপ্তি ও গতিতে প্রকাশনা—ছোট গল্পের এখানেই সফলতা। চেকভ তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, 'গল্পলেখার' জন্য কি চাই—সামান্য একটা ashtray নিয়েও গল্প লেখা যায়—তিনি পারতেন। শুধু একটি concentrated ideaর দরকার, শুধু প্রয়োজন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখার দৃষ্টি। সাহিত্যিক অন্তন চেকভের ব্যাক্তিজীবনের পরিচয় চিকিৎসক চেকভ নিজে বলেছেন "medicine is my lawful wife but literature is my mistress"—সেই নর্মসহচরীর সন্তুষ্টিতে, সফলতায়, সৌন্দর্যসাধনায় চেকভ আত্মনিবেদন

করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান হয়ত তাঁর জন্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিন্তু সাহিত্য জগৎ লাভ করেছে একটি সফলশিল্পী। চিকিৎসকের মনন ও সাহিত্যিকের হৃদয় দিয়ে তিনি জগৎকে দেখিয়েছিলেন, তাই জীবনের স্বল্পসংক্ষিপ্ত ক্ষণদীপ্ত মুহূর্তকে চিরকালের সম্পদ করে তুলেছেন। নিহিলিস্ট আন্দোলনের অগ্নিকণা চেকভের ভাষায়, জারতন্ত্রের অত্যাচার জর্জরিত রাশিয়ার ঘনঘটার ধূসর ছায়া চেকভের চরিত্রে। আমেরিকার ভবঘুরে ছেলেটির তৈরী করা ছায়াকায়ার ওপর আত্মা আনলেন আন্তন চেকভ—ছোট গল্পের ব্যঞ্জনা, ছোট গল্পের সুর, ছোট গল্পের চরিত্র, চিত্রকে চেকভ দিলেন পরিপূর্ণতা; চেকভ বিনা দ্বিধায় সফল শিল্পী। আঙ্গিকের অভিনবত্বে, কলারীতির কারুকার্যে, গল্পগ্রন্থণের সুদৃঢ়তায়, ভাষার পরিমিতিতে চেকভ গল্পসাহিত্যে 'the master" !

আধুনিক ছোটগল্পের ইতিহাসে মোপাসাঁর (১৮৫০-১৮৯৩) প্রভাব অসাধারণ—রাশিয়া ও আমেরিকার সাহিত্যে মোপাসাঁর প্রভাব প্রভূত। মোপাসাঁর সিদ্ধি ছোট গল্পে—ছোটগল্পের সার্থকশিল্পী মোপাসাঁ। ফরাসী দেশের সে এক দুঃস্বপ্নের দিন—রূপবতী প্যারীর নগরজীবন পঙ্কিল, রাজকীয় ব্যভিচারে শাসনতন্ত্র বিকৃত evening in Paris পাপে পরিপূর্ণ। এই ক্লেদ, জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা মোপাসাঁর গল্পে।

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিকতার অগ্রদূত রুসো—man is born free, but is every where in Chains, জন্মমুক্ত মানুষের প্রতিপদক্ষেপে শৃঙ্খল।—তবু তো মুক্তজন্ম!! সেই মুক্তমানুষের আকুলতার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় অনুভূতি রুসোকে করে তুলেছে রোমান্টিক। তবু ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিকতা ক্ষণস্থায়ী। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীযুগের রাজনীতিক ঘটনাগুলো জীবনের মূল্যবোধের ওপর আঘাত করেছে—এই বাস্তবতার সুর সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনলো 'মাদাম বোভারী'—'এম্ বোভারী'র স্রষ্টা গুস্তের ফ্লবেয়ারের (১৮১৯-৮০) রচনায় রিয়ালিজমের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ।

ছোট গল্পের সার্থক শিল্পী মোপাসাঁর সাহিত্যে মন্ত্রদীক্ষা ফ্লবেয়ারের কাছে······it was form him that Moupasant learnt the secrets of his art and it was he who prevented Maupassant from prematurely publishing anything that would be unworthy of him. (short story : Maupassant—G, Hopkins)

মোপাসাঁর সাহিত্যে প্রবেশ সংবাদপত্রের হাত ধরে। তাই বলছিলাম, ছোট গল্পের একটা সমধর্মিতা, ঐতিহ্যকে সমকালে সকলে লালিত পালিত করছে। মোপাসাঁর লেখায় একটা জ্বালা আছে, সেই সঙ্গে নিরাশার দুঃখবোধ—তাই জ্বলে ওঠে না মোপাসাঁর নায়ক নায়িকা—দুঃখে বেদনায় শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে "নেকলেস" গল্পটি,—মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প। মেয়েটি ও ছেলেটি তাদের পরিপূর্ণ যৌবনের অপচয়ে মেটালো নকল মুক্তোর মূল্য—অভিযোগের ভাষা হারিয়েছে তারা, অভিযোগের আশা ছেড়েছেন মোপাসাঁ।

মোপাসাঁর মনে বিফল বিপ্লবের মরুতৃষ্ণা, সেই মরুতপ্ত পিপাসার প্রশ্ন মোপাসাঁর গল্পে। মোপাসাঁর মনে দুটি কুঠরী পরস্পর বিরোধী। এক কক্ষে নরম্যাণ্ডীর নরম মাটির শস্যসুফলা প্রাণপ্রাচুর্য, আর এক প্রান্তে প্যারী নগরের বিসূচিকার তিক্ততা। কিন্তু তিক্ত বেদনা মোপাসাঁকে

মুখর করে তুলেছিল—নরম্যাণ্ডীর কৃষকজীবনের আনন্দদীপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। অকালমৃত্যু এই শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতার সম্মুখে মানুষের পূর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করার অবকাশ আর দেয়নি। কিন্তু মোপাসাঁ গল্পের একটা নিজস্ব form তৈরী করেছেন—ঠিক চেকভ যেমন স্বনির্মিত গল্পদেহকে গৌরবান্বিত করেছেন ভাবে, ভাষায়। মোপাসাঁ নভেলও লিখেছেন, কিন্তু সিদ্ধি ছোট গল্পে।

গুরু ফ্লবেয়ারের মানসপুত্র, 'মাদাম বোভারী'র রচয়িতার ভাবশিষ্য মোপাসাঁ ছোট গল্পের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে একের পর এক, নব নব উন্মেষশালী ছোট গল্পে সোনার ভাণ্ড পূর্ণ করেছেন, তখন কৃষ্ণসাগরের তীরে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে, তুষারবিস্তৃত সাইবেরিয়ার অসম ভূমে ভবঘুরের মতো বিচরণ করছেন রুশীয় গল্পকার ও স্ববৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ম্যাক্সিম গোর্কী (১৮৯৮-১৯৩৬)

গোর্কীর প্রথম গল্প প্রকাশ পায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিফলিসের সংবাদপত্র Kavkazএর পাতায়। সেই থেকেই গোর্কীর সাহিত্যিকজীবন শুরু হলো—ভল্গার বিখ্যাত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় আলেক্সি পেশকভের নতুন পরিচিতি "ম্যাক্সিম গোর্কী"। গোর্কী সজ্ঞানে কোন বিশেষ শিল্পধারায় প্রবর্তন করেননি তাঁর রচনায়, কিন্তু তাঁর উদাসীন ব্যক্তিত্ব তাঁকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করেছে : the short story written in 'revolutionary-romantic' style আর অবলীলাক্রমে তার অনুসারী হয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তরুণশিল্পীরা। উনিশ শতকে সাহিত্যরচনাশিল্পে যে নতুন উদ্দীপনা দেখা গেল তার পথপ্রদর্শক ম্যাক্সিম গোর্কী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা যা জগতে একদিন আসবেই—যার জন্য সাধারণ শ্রমিক আর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংগ্রাম—তারই সত্যরূপ গোর্কীর গল্পে। বিপ্লবী চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গোর্কীর সাহিত্য সাধনা চললো মহত্তম মানবপ্রীতির অভিমুখে। গোর্কীর ছোট গল্পে বিপ্লবের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ চেতনার চাঞ্চল্য। বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় গোর্কীর গল্পে শিল্পকলার সুগ্রন্থন নেই, শিথিলবদ্ধ অমার্জিত এই গল্পসাহিত্যে পাই চরিত্রের বিপুল ও বিচিত্র সমাবেশ। এই বিচিত্র চরিত্রের চিত্রসমৃদ্ধিতে গোর্কীর অনলস লেখনী চালনা।

বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের আঙ্গিনায় যখন এই অবস্থা ঠিক সেই সময়, কলরবতিক্ত, শান্তিপিয়াসী একটি অনবদ্য ব্যক্তিত্ব কোলকাতা ছেড়ে নৌকা ভাসালেন পদ্মার বুকে, আশ্রয় নিলেন শিলাইদহের ছায়াশীতল শ্যামল গ্রামাঞ্চলে—তিনি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। পৃথিবীর ছোটগল্প রচয়িতাদের সর্বোচ্চ সোপানধারীদের অন্যতম। আর বাংলা ছোটগল্পের সার্থক পুরোধা। পদ্মার জলধারায় আর শিলাইদহের জনপদে বাংলা সাহিত্যের সূচনা, পূর্ববঙ্গের এই নদীনালা ও ভূখণ্ডই বাংলা ছোটগল্পের সূতিকাগৃহ আর রবীন্দ্রনাথ তার স্রষ্টা। কিন্তু সে আর অধ্যায়।।

ভারতী সরকার

## সমালোচনা

**মানুষের নামে** ॥ সম্পাদক—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা-১২ ॥ এক টাকা ॥

সভ্যতার সঙ্কট তখনই অনিবার্যরূপে দেখা দেয় যখন সভ্য মানুষ মানুষেরই বিরুদ্ধে জিঘাংসায় মেতে ওঠে। পাকিস্থান এবং ভারত, উভয় দেশেরই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ সতেরো বৎসর পরেও বিশেষ এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ আর এক গোষ্ঠী যে কারণেই হোক না কেন এবং যে নেপথ্য রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হোক না কেন, পরস্পর হিংসায় উন্মত্ত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন সামাজিক হৃদয়কে গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

উভয় বঙ্গের উভয় দেশের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয় দেশের প্রতিটি সামাজিক হৃদয় এই অন্ধকার দিনগুলিকে প্রতিনিয়ত ধিক্কার দিয়েছেন এবং এই অশুভ ছায়া সমাজ থেকে সমূলে বিদূরিত করবার জন্য প্রত্যেকেই নিজস্ব ভূমিকায় বিশেষভাবে উদ্‌বেলিত হয়েছেন এবং অনেকেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

'মানুষের নামে' কবিতা সংকলনটি সাম্প্রদায়িক দ্বেষ, হত্যা ও অমানুষিকতার বিরুদ্ধে উভয় বাংলার কবিকণ্ঠের প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকালের ও উভয় বঙ্গের মোট সাতাশজন কবির এই সামাজিক অমানুষিকতার বিরুদ্ধে ঘোষিত প্রতিবাদ বর্তমান সঙ্কলনে সঙ্কলিত হয়েছে। 'সাম্প্রতিক কালের অনেক বাঙ্গালী কবিই অত্যন্ত দেশকাল-সচেতন। পৃথিবীর, বিশেষভাবে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যখনই এমন ঢেউ ওঠে যা' সাময়িকভাবে হলেও জীবনের গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখনই তাঁরা অন্য দশজনের মতই বিচলিত বোধ করেন যা খুবই স্বাভাবিক ; তাঁদের সমস্ত জীবনের মূলে তখন টান পড়ে। সাময়িক হেতু সঞ্জাত হলেও সার্থক কবির লেখনীতে সার্থক কবিতার উৎসরণ তখন সত্য হয়। বিচিত্র কারণে গভীরভাবে আলোড়িত আমাদের এইকালে তেমন সার্থক সাময়িক কবিতা অনেক লেখা হয়েছে ও হচ্ছে'।

( মুখবন্ধ : নীহাররঞ্জন রায়। )

বলা বাহুল্য, এই গ্লানিকর সাম্প্রদায়িক বিরোধ একদা রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিককালের কবিসত্তাকে কিভাবে তীব্র বেদনায় আন্দোলিত তৎসহ বিচিন্তিত করেছে আলোচ্য সংকলনে সেই বিশেষ আয়লাড়নের প্রতিফলন নানা ভাবে নানা কণ্ঠে এক বেদনাবিমূঢ় অভিব্যক্তিতে প্রতিবাদমুখর :

তবু আছে ভয় আর হিংস্র জয়োল্লাস,<br>
শুধু মৃত্যু, শুধু প্রাণ-ধারণের শ্বাস,<br>
শুধু জৈব, অন্ধ আত্ম-বিস্তার-তাড়না।

তারই মাঝে নিহত চেতনা
সর্বদায়মুক্ত।

সীমাহীন সময়ের এ ক্ষণিক মরীচিকা-মায়া,
মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন,
কেন আর ?

( প্রহসন/প্রেমেন্দ্র মিত্র )

কিংবা,

……'প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝরণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে হরিণের পিছু আজো ধায়,
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে।'

( ১৯৪৬-৪৭/জীবনানন্দ দাশ। )

এই দুঃসময়ে পৃথিবী যখন মুখ ঢেকেছে তখন কবিসভা আত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেঁদেছে—আলোর দিকে তাকাতে চেয়েছে কিন্তু কী আশ্চর্য অন্ধকার যেন সুযোগ বুঝে আরো বেশি ঘন হয়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করতে উৎসাহিত হয়েছে। কবিসভা তখন সভ্যতার সঙ্কটকে এড়িয়ে যান নি।

'মানুষের নামে' সঙ্কলনে তরুণ কবিকুলের কণ্ঠস্বরও মানব মহিমায় উচ্চারিত। সাম্প্রদায়িক দ্বেষ, হিংসা, হত্যা ও অমানুষিকতার বিপক্ষে কবিসমাজ কখনো বেদনায় বিমূঢ়, আধুনিক তথাকথিত সভ্যতার প্রতি কখনো তীর্যক শ্লেষ, কটাক্ষ, কখনো মানবিকতার অপমানে ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত তৎসহ প্রদীপ্ত প্রতিবাদে মুখর। প্রসঙ্গত পরভেজ শাহিদী, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণধর, চিত্ত ঘোষ, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার, মণীন্দ্র রায়, তারাপদ রায়, সানাউল হকের কবিকণ্ঠ ও হৃদয়ের উত্তাপ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানুষের নামে' গ্রন্থটিতে যদিচ সাময়িক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি সমাজের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন বিধৃত তথাপি সভ্যতার সঙ্কট তৎসহ মানবিকতার লাঞ্ছনার এই তামসময় দিনে এজাতীয় একটি সঙ্কলনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। একটি বিশেষ সময়ের ছবির পাশাপাশি কবিকণ্ঠের চ্যালেঞ্জ 'মানুষের নামে'।

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ
বিপর্যস্ত নৈতিক মূল্যবোধ,
অসুস্থ রুচি ও
বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।
জাতির সুস্থ
নৈতিক জীবনে এই বিকৃতিকে
সংক্রামিত হতে
না দেবার দায়িত্ব
প্রতিটি
সচেতন নাগরিকের
উপর ন্যস্ত।
পূর্ব রেলওয়ে

# সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭১

কেবলমাত্র
কিলোগ্রামে কিনুন

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

দ্বাদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' একাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

## সূচীপত্র



সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার<br>হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

# আইন-ই-আকবরীর সুবে বাঙলা

**নারায়ণ দত্ত**

আইন-ই-আকবরীর বাঙলা দেশ সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের চল্লিশতম বর্ষের সুবে বাঙলা। আইন-ই-আকবরীর মতে নাকি একশ পঁচিশটি সরকার, দু'হাজার সাত'শ সাইত্রিশটি কুশবা বা শহর নিয়ে ছিল আকবরের ভারত সাম্রাজ্য। সুবা ছিল বারটি। এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা আজমীর, আহমদাবাদ, বেহার, বাঙলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান ও মালবার—-এই ছিল আকবরের ভারতবর্ষের বারটি সুবা। আকবর যখন পরে খান্দেশ, বেরার আর আহমদনগর জয় করেন তখন এদের একটি একটি সুবা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুবার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিল সুবাদার। সুবাদার যখন নিয়োগ করতেন সম্রাট, অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বারো লক্ষ পান বা তাম্বুলপত্র বিলি করার এক বিচিত্র রেওয়াজ ছিল সেকালে।

আল্লামা আবুলফজল বলছেন বাঙলাকে আগে 'বঙ্গ' বলাই হত। এই 'আল' প্রত্যয়টুকু এসেছে প্রাচীন রাজাদের তৈরী মাটির ঢিপির সংখ্যাধিক্য থেকে। এই ঢিপিগুলিকে নাকি 'আল' বলা হত। এগুলি হত বিশহাত চওড়া, দশহাত উঁচু। সুবে বাঙলার আয়তন ছিল একদিকে চট্টগ্রাম থেকে কুহী—চার'শ ক্রোশ। অপর দিকে উত্তরের পর্বতমালা থেকে গড় মান্দারন পর্যন্ত দু'শ ক্রোশ। উড়িষ্যার সঙ্গে মাপলে সুবে বাঙলা লম্বায় আরও তেতাল্লিশ ক্রোশ বাড়বে। চওড়ায় বাড়বে ক্রোশ বিশ।

এই সুবার সীমারেখা নির্ধারণ করে আল্লামা আবুল ফজল বলেছেন, এর পূবে সমুদ্র, উত্তর দক্ষিণে পর্বতমালা আর পশ্চিমে সুবে বেহার। এই দেশের বিশেষভাবে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক শুধু এর আমের কথা বলেছেন। বলেছেন গাছগুলো ছোট ছোট। প্রমাণ মানুষের চেয়ে বড়

নয়। কিন্তু ফল খুবই রসাল। খুবই সুস্বাদু। বাঙলা দেশের সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। এদেশের নৃপতির 'মাণিক্য' উপাধির কথাও বলেছেন আর ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নামের সাথে থাকত 'নারায়ণ'। ত্রিপুরার অস্ত্রসজ্জার মধ্যে ছিল দুইলক্ষ পদাতিক। এক হাজার হাতী। ত্রিপুরার নাকি কোন অশ্বারোহীবাহিনী ছিল না।

বাঙলা দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে ছিল কোচ দেশ। কোচের একাংশে ছিল কামরূপ। কামরূপের লোকেদের নাকি সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল সেকালে। আর ছিল যাদুবিদ্যার অধিকার। শোনা যেত এখানে ফুল তোলার একমাস পরেও তাতে সৌগন্ধ থাকত। গাছ কাটার পর তা, থেকে সুস্বাদু রস বেরোত ( আবুলফজল কি খেজুর গাছের কথা বলেছেন নাকি ? না তাল গাছ ? ) আঙুর বনে নাকি আম হত!

আসাম রাজ্যের সীমান্ত গিয়ে মিশত কামরূপে। আসামরাজের শক্তিমত্তার খুবই প্রশংসা করেছেন মুঘল ঐতিহাসিক। আর বলেছেন রাজা মারা গেলে তাঁর স্ত্রীপুরুষ সকল পারিষদকেই জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল।

আবুল ফজল বাঙলাদেশের নদ-নদীর কথা বলতে ভোলেননি। ভোলেননি গঙ্গার কথা। বলেছেন হিন্দুদের বিশ্বাস গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটা থেকে। উত্তরের পর্বতমালার গা বেয়ে নেমে দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, বিহার পেরিয়ে এসে পুণ্যপীযূষ স্তন্যদায়িনী গঙ্গা বাঙলার কোল ভরিয়ে তুলেছে। সরকার বারককপুরের শহর কাজীহাটের কাছে গঙ্গা ভেঙে হয়েছে পদ্মাবতী। পদ্মা সমুদ্রে মিশেছে চট্টগ্রামে। দক্ষিণমুখী গঙ্গা ত্রিধা হয়ে হলেন গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী। এদের সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী হিন্দুদের মহাপুণ্যতীর্থ। সেকালে গঙ্গা সমুদ্রে মিশেছিল সাতগাঁয়ে। সংস্কৃত শাস্ত্রে গঙ্গা প্রশস্তির অসদ্ভাব নেই। আবুল ফজল বলেছেন গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য সর্বকালের। শুধু পবিত্রতার জন্য নয়, সুরধনী ধারার স্বাদুতা, সহজতা এবং এর স্বাস্থ্যকরতার জন্যও এর খ্যাতি। গঙ্গাজলের আর একটা গুণের কথা বলেছেন আবুল ফজল। বহু বৎসর ধরে আবদ্ধ রাখলেও পূতিগন্ধ হয়ে ওঠে না। ব্রহ্মপুত্রের কথাও বলেছেন আবুল ফজল। খাটাই থেকে কোচ দেশ বাজুহা হয়ে তখন সাগরে পড়েছিল ব্রহ্মপুত্র।

বাঙলা দেশে যে সেকালে বহু ধরণের ধান হত নদীর অববাহিকায় তারও উল্লেখ রয়েছে আইন-ই-আকবরীতে। একদানা ধান থেকে দু' সের থেকে তিন সের পর্যন্ত ফসল হত। এক একটা জমিতে বছরে তিনটে করে ফসলের চাষ হত। বলা হয়েছে এখানে ধানের বাড় এত বেশী ছিল যে জলও যেমন বাড়ত, ধান গাছও বেড়ে চলত। বাড়ন্ত জল প্রবাহ কখনও ধানের শিষ ডোবাতে পারত না। অভিজ্ঞ মহল নাকি আবুল ফজলকে বলেছিল যে এক রাতে দু'হাত পর্যন্ত গাছ বাড়তে দেখা গেছে। এটা অবশ্যই অতিশয়োক্তি।

সুবে বাঙলার রাজস্ব দেওয়ার ধরণটাও অবুল ফজলের নজর এড়ায়নি। প্রজা হিসাবে সুবে বাঙলার বাসিন্দারা ছিল বাধ্য। সরকারী খাজনাখানায় তারা নিজে থেকেই আট মাসের কিস্তিতে কিস্তিতে সালিয়ানা খাজনা দিয়ে আসত। লোকে টাকা বা মোহরে খাজনা দিত। সরকার থেকে ফসলের ভাগ নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। শস্যের দর বেশ সস্তাই ছিল। আকবর

বাদশা খাজনা বেশ বেঁধে দিয়েছিল। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা করেছিল, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। আকবরের আমলে বাঙলা দেশে কিন্তু দুধ-ভাতের চেয়ে মাছ ভাতের প্রতিই বাঙালী গৃহস্থের বেশী আকর্ষণ ছিল। আবুল ফজল অন্ততঃ তাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আকবরের ঐতিহাসিক বলেছেন যে বাঙালীরা গম খেতে চাইতো না। যবের প্রতিও বাঙালীর ছিল চরম বিরাগ। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বাঙালী যে চিরকালই নিরাসক্ত, সে তথ্যও জানা যায়। কটিবাস ছাড়া সারাদেহে অঙ্গবাসের বড় একটা প্রয়োজন হত না। শক্তি পুজার দেশে মেয়েরা যে পথেঘাটে দাঁড়িয়ে বেসাত করত সে আর নতুন খবর কি ?

বাঙলা দেশের তখন বাঁশের ঘর। তবে তা বলে সেগুলি যে সামান্য তা নয়। এক একটা বাড়ির জন্যে পাঁচ হাজারের বেশী টাকা খরচ পড়তে দেখা যেত। তবে হ্যাঁ। সে সব বাড়িঘর চলত অনেকদিন। বর্ষায় মাঠঘাটের সঙ্গে সারা দেশই প্রায় ভেসে যেত। আর তখন নৌকা ছাড়া কিছুই চলত না। আবুল ফজল বলেছেন এ দেশে এমন ধরণের রণতরী তৈরী হত যে তীরে ঠেকলে তারা দুর্গের চেয়েও বেশী উঁচু হত। আর তা থেকে আক্রমণের খুবই সুবিধে হত। আর যানবাহন হিসেবে ছিল সুখাসন। একালের পাল্কি বা ডুলি। মঙ্গলকাব্যগুলোতে ডুলি, পাল্কির যে সব রঙচঙে, নানা ধাতব সুক্ষ্ম কার্যের ব্যবহারের কথা দেখি আইন-ই-আকবরীতে তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুবে বাঙলায় হাতীর প্রচলন ছিল কিন্তু ঘোড়ার চলন ছিল না। এদেশে পাটের কার্পেট তৈরী হত যা নাকি প্রায় সিল্কের মত। বাঙালিরা নাকি নূন খুব ভালবাসত। বাঙালীর তাম্বুল রস-রসিকতার কথাও বলেছেন আবুল ফজল।

শহর হিসাবে প্রথমেই লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় বা জেন্নাতাবাদের কথা বলা হয়েছে আইন-ই-আকবরীতে। আর বলা হয়েছে মাহমুদাবাদের কথা। এই দুটো জায়গাতেই দুটি বিশাল দুর্গ ছিল বলে জানা যায়। সরকার বলতে গৌড়, মাহমুদাবাদ ছাড়াও খালিপুতাবাদ, বাকলা, ঘোড়াঘাট বারবকাবাদ, বাজুহা, সোনারগাঁ, শিলেট, সাতগাঁ আর মান্দারাণের কথা বলা হয়েছে। মাহমুদাবাদে তখন লম্বা লম্বা লঙ্কা হত। বাকলা সহর ছিল সমুদ্র তীরে। গড় বাকলা ছিল অরণ্য বেষ্টিত। আবুল ফজল সরকার বাকলার এক দৈবদুর্বিপাকের কাহিনী বলেছেন। ঘটনাটা পনের 'শ পঁচাশি সালের। একদিন অপরাহ্নে দুর্যোগের ফলে মেঘে গড় বাকলার আকাশ ঢেকে গেল। ঈশানের কোন থেকে এল উনপঞ্চাশ পবনের দৌরাত্ম্য। আর স্ফীত সমুদ্রের রাশি রাশি কালো ঢেউয়ে একসময় সারা গড় বাকলা গেল ডুবে। রাজা ও তাঁর পুত্র পরমানন্দ রায় একটা নৌকা করে সপরিবারে আশ্রয় নিলেন একটি হিন্দু মন্দিরে। সারা রাজ্য ডুবে গেল। কিন্তু দেবতার সেই মন্দিরটি নয়। মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রকারান্তরে হিন্দুধর্মের এই মাহাত্ম্যখ্যাপন ইতিবৃত্তাকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টির কথাই ঘোষণা করে।

সরকার ঘোড়াঘাটে পাওয়া যেত কাঁচা সিল্ক। চট এবং প্রচুর তানখাই ঘোড়া। এখানে আবুল ফজল লিখেছেন লটকেন নামে একপ্রকার ফল পাওয়া যেত। দেখতে আখরোটের মত। স্বাদ ডালিম বেদানার মত। ফলটার তিনটে বীচি থাকত। সরকার বরবকাবাদের খ্যাতি ছিল তার 'গঙ্গাজল' কাপড়ের জন্য। এখানে আর ছিল কমলালেবুর প্রাচুর্য। সরকার বাজুহার ছিল

অরণ্য সম্পদ। এখানের কাঠে নৌকা তৈরী হত। বাড়ির কড়ি বরগা হত। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাজুহারে একটা লোহার খনি ছিল সেকালে। সরকার সোনারগাঁ বা ঢাকা বিখ্যাত ছিল তার কাষায় বস্ত্রের জন্যে। এখানে কাতারে সুন্দর শহরে এমন একটি পুষ্করিণী ছিল যেখানে কাপড় কাচলে বকের পালকের মত সাদা হত কাপড়চোপড়। সরকার শিলেট থেকে যেত মুঘল হারেমের খোজা দাসের দল। আজকের মতই সেকালের শিলেটী কমলার আদর ছিল সেকালে। শিলেটী কমলাকে বলত 'সনতারা'। সেগুলো আকারে উপরে নীচে একটু চ্যাপটা হত। মুঘল ঐতিহাসিক সিলেটের অগুরু কাঠ, বনরাজ ও শিওরগাঞ্জ পাখীর কথা বলেছেন। চট্টগ্রামে তখনই খ্রীষ্টান বণিক সম্প্রদায়দের আনাগোনা সুরু হয়েছে। চট্টগ্রামে বিরাট গঞ্জের কথাও বলেছেন আবুল ফজল। শেরিফাবাদের বলদের উল্লেখ রয়েছে আইন ই-আকবরীতে। এরা নাকি পনের মন পর্যন্ত মাল বইতে পারত স্বচ্ছন্দে। এখানের ছাগল ও মুরগীর লড়াই-এর কথাও বলা হয়েছে।

সাতগাঁয়ের কাছে দুটো বড় গঞ্জ ছিল—এক সাতগাঁয়ে আর একটা হুগলিতে। আর এই দুটোই ছিল য়ুরোপীয় অধিকারে। এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। আকবর রাজ্য লাভ করেন পনর'শ ছাপ্পান্নয়। আকবরের রাজত্বের সাতচল্লিশতম বর্ষের অবস্থা আইন-ই-আকবরীতে বিবৃত করা হয়েছে। অথচ ষোল'শ তিন সালের কাহিনী। কিন্তু ষোল'শ তিন সালে কি সাতগাঁ মুঘল অধিকারে আসে নি? যতদূর জানা যায় পনের'শ পচাত্তর সাল নাগাত মুজিম খাঁর নেতৃত্বে টোডরমল্ল বর্ধমান সহ ঘোড়াঘাট (২৫°৫৮´ উঃ ৮৮° ৩´ পূঃ) অধিকার করেন। তা হলে আইনীতে আবুলফজল এ কথা লিখলেন কেন? অবশ্য একথা ঠিক সাতগাঁ থেকে পর্তুগীজ প্রভাব একেবারে নির্মূল করার জন্যে আমাদের সাজাহানের আমল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। টোডরমল্লের এই বঙ্গজয়ের অন্তঃসারশূন্যতা, আবুল ফজলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে বোধ হয় আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

সে কথা যাক, সেকালের সাতগাঁয়ে ডালিম বেদানা হত। আর গড়মান্দারনের হুনেরে বলে জায়গায় নাকি একটা হীরের খনি ছিল! আইনী-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডে সুবে বাঙলার তকসীম জমসা বা জমির কর নির্ধারণেরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। সরকার তান্দে বা সরকার উদুম্বনের মহাল ছিল বাহান্নটি। কর ছিল ২৪,০৭৯,৩২৯॥ দাম। সরকার গৌড়ে ছিল ৬৬টি মহাল। কর ১,৫৭৩, ১২৮ দাম। গৌড়ে একটা ইঁটের দুর্গ ছিল। আর প্রয়োজনে মুঘলবাহিনীতে দেয় ছিল পাঁচ'শ অশ্বারোহী, সতেরো হাজার পদাতিক। সরকার ফতেহবাদে ছিল ৮৮টি মহাল। কর—১১,৬১০, ২৫৬ দাম। অশ্বারোহী দেয় ছিল দু'শ। পদাতিক—১০,১০০। খলিফেতাবাদের মহাল পঁয়ত্রিশ, কর—৫,৪০২,১৫০ দাম। যশোহর যার বাদশাহীনাম রসুলপুর এই সরকারের মধ্যে পড়ত। দেয় অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল এক'শ। পদাতিক ১৫,১৫০। সরকার বকলা ছিল সবচেয়ে ছোট। চারটে মহাল। কিন্তু আয় অনেকের চেয়ে বেশী—৭,১৩০,৬৪৫ দাম। সরকার পূর্ণিয়ার নয়টা মহাল। কর—৬,৪০৮,৭৯৩ দাম। পদাতিক পাঁচ হাজার। অশ্বারোহী—এক'শ। সরকার তাজেপুরের উনত্রিশটি মহাল। কর—৬,৪৮৩,৮৫৭ দাম। সৈন্যসংখ্যা কিন্তু সরকার পূর্ণিয়ার মতই। সরকার ঘোড়াঘাট বৃহত্তম সরকার। চুরাশিটি মহাল। কর—৮,৩৮৩,৩৭২॥ দাম। এর ঘোড়া মহালে একটা কাস্টমস্ অফিস ছিল। এর দেয় অশ্বারোহী ছিল নয়'শ। পদাতিক ছিল

৩২,৬০০। পঞ্চাশটি হাতী দেবার আয়োজন ছিল। সরকার পিঞ্জেরার ছিল একুশটি মহাল। কর—৫,৮০৩,২৭৫ দাম। মুঘল বাহিনীতে দিত পঞ্চাশটি অশ্বারোহী, সাতহাজার পদাতিক। সরকার বারবকাবাদের ৩৮টি মহাল। কর—১৭,৪৫১,০৩২ দাম। এর চুকহুল মহালের শষ্যের গন্ধ হিসেবে খুব নাম ছিল। অশ্বারোহী দিত ৫০। পদাতিক—৭,০০০। সরকার বাজুহার ছিল বত্রিশটি মহাল। কর—৩৯৫১৬,৮৭১ দাম। এখান থেকে অশ্বারোহী যেত সতের'শ। পদাতিক—৪৫,৩০০। হাতি—১০টা। সরকার সোনারগাঁ বা ঢাকার ছিল বাহান্ন মহাল। কর ঠিক ছিল—১০,৩৩১,৩৩৩। পদাতিক—৬,০০০। হাতি—দু'শ। অশ্বারোহী দিতে হত দেড় হাজার। সরকার সিলেটের (শ্রীহট্ট) আটটি মহাল। কর—৬,৬৮১, ৬২০ দাম। এগার'শ অশ্বারোহী। হাতী—১৯০টা। পদাতিক—৪২,৯২০। সরকার চাটগাঁর মহাল সাতটি। কর—১১,৪২,৩১ দাম। এক'শ অশ্বারোহী। পদাতিক—১৫০০। সরকার সেরিফাবাদের অন্যতম মহাল ছিল বর্ধমান। এর মোট মহাল ছিল—২৬। কর—২ ,৪৮৮,৭৫০ দাম। অশ্বারোহী—২০০। পদাতিক—৫,০০০। সরকার সলিমানাবাদের মহাল—একত্রিশটা। কর—১৭,৬২৯, ৯৬৪ দাম। অশ্বারোহী—১০০। পদাতিক ৫,০০০। সরকার সাতগাঁর ছিল ৫৩টী মহাল। কর—১৬,৭২৪,৭২০ দাম। অশ্বারোহী—৫০। পদাতিক—৬,০০০। এর মহালের মধ্যে রয়েছে কলকাতা, মেকুমা ও বরবাকপুর নামে তিনটী মহাল একসঙ্গে। রয়েছে নদীয়া ও শান্তিপুর দুইটী মহাল। (২) সরকার মান্দারনের মধ্যে রয়েছে ষোলটী মহাল। কর—৯,৪০৩,৩০০ দাম। এর মধ্যে মহাল বীরভূমের নাম দেখা যায়। এ ছাড়াও উড়িষ্যার মধ্যের সরকার জেলাসির,ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ দণ্ডপাট, রাজা মহেন্দ্রের উল্লেখ আছে। সরকার জেলাসিরের মধ্যে রয়েছে তমলুক ও মেদিনীপুর মহাল। এখানে বেশ কয়েটী দুর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১)

---

(১) এই রচনাটীর জন্য ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনের অনূদিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

(২) সরকার সাতগাঁ-এ আরও কয়েকটী পরিচিত মহালের কথা রয়েছে। যেমন মুড়াগাছা, শালকে। সালখে (sellky) র কথা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডীতে রয়েছে, —

ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়।　　চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥

আরও একটি পরিচিত মহলের কথা রয়েছে দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে। মহাল—মকরা। ধনপতি সাজু বা তার পুত্র শ্রীমন্ত উভয়েই গঙ্গা বেয়ে সাগরে পড়বার মুখেই মকরা বলে একটা জায়গা পেরিয়েছে। উভয়েরই এই জায়গায় প্রবল দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। 'মেটারী' আর আর একটী মহলের কথা রয়েছে কবিকঙ্কণ অবশ্য মেটারির কথা বলেছেন—

তাণ্ডসিংহের ঘাটখান ডাহিনে রাখিয়া।　　মেটারির ঘাট যায় বামে তেয়াগিয়া॥

অবশ্য ঐ থেকে কিছুই সঠিকভাবে প্রমাণ হয় না। কেননা, নামে মিল হলেই যে ভৌগলিক অবস্থিতিতেই মিল হবে তার কোন কথা নেই। তবে আকবরের সমসাময়িক বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এই নামগুলির উল্লেখ আমাদের মোটামুটী একটা হদিশ দিতে পারে—এই ভেবেই পাঠকদের কাছে এই তথ্যটী তুলে ধরা হল।

# দ্বারকানাথের ইউরোপে পদার্পণ

**অমৃতময় মুখোপাধ্যায়**

মাল্টা থেকে "পলিফিমাস" জাহাজে দ্বারকানাথ সিসিলির তীর বরাবর যান। মেসিনা পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পেয়েছিলেন। সিসিলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে "দেখে জমি খুব উর্বরা বলে মনে হয়।" এইখানে তিনি প্রথম আগ্নেয়গিরি দেখলেন এট্‌না পর্বত। তারপর দেখলেন ষ্ট্রম্বোলি আগ্নেয়গিরি, তখন ষ্ট্রম্বোলি থেকে ধোঁয়া আর আগুন বেরোচ্ছিল সেকথা তিনি লিখেছেন। ১৪ই তারিখে দ্বারকানাথ নেপল্‌স পৌঁছান। নেপল্‌স উপসাগর দিয়ে নেপল্‌স আসার পথটি "বিদেশীর পক্ষে অতীব মনোমুগ্ধকর" বলেছেন। সহরের উপর মাথা উঁচিয়ে আছে ভিসুভিয়াস্‌ পর্বত—সমস্ত সহর থেকেই দেখা যায়। তখনকার নেপল্‌স সহর আজকের থেকে অনেক অন্যরকম ছিল। সহরটায় ছিল কেবল আঁকাবাঁকা নোংরা গলি-ঘুঁজি আর বস্তী ধরণের আধভাঙ্গা, আধোভাঙ্গা বাড়ি। তাতেই ঠেলাঠেলি করে লোকের বসতি। আর নেপল্‌সের রাজা তখন দ্বিতীয় ফার্ডিলাণ্ড ওরফে রাজা "বোম্বা" যার স্বৈরাচারিতার জন্য গ্লাডস্টোন বলেছিলেন যে "ঐ রাজ্যে ভগবানের অস্তিত্ব নেই"। প্রধান রাজপথের উপর ছিল অনেকগুলি থিয়েটার ও প্রাসাদ আর বহু জমকালো দোকান। নেপল্‌স থেকে ঘোড়ারগাড়ি করে রোম পৌঁছাতে দ্বারকানাথের দুদিন লেগেছিল। উঁচু-নীচু পথ হওয়ায় যাত্রা খুব আরামদায়ক হয়নি এ কথা দ্বারকানাথ ডাইরীতে স্বীকার করেছেন তবে পথের দুধারের লাল রংয়ের ফুল সুগন্ধলতা ও গাছপালা দেখতে দেখতে যাওয়ায় পথশ্রান্তি অনেকটা লাঘব হয়েছিল।

রোমে দেখবার জিনিস অসংখ্য। ভাস্কর্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর কিছু জ্ঞান ও অগাধ সখ দুই ছিল কাজেই রোম তার কাছে অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। তিনি চিঠিতে লিখেছেন "বর্ণনা দিয়ে রোমের সৌন্দর্য অতি সামান্যই বোঝানো যায়। সব কিছুই এখানে বিশালাকার। মাল্টার সেণ্টজন গির্জা দেখে যে এত ভালো লেগেছিল বা নেপলসের গির্জা, সেণ্টপিটার্স গির্জার কাছে কিছুই না। ওদের গোটাকুড়ি সেণ্টপিটার্সের ভিতর ধরে যাবে এটা এত বিরাট ও শ্রী সৌন্দর্যেও বহুগুণ বেশী। প্রত্যেকদিন এখানে গেলেও এমন নতুন জিনিস নজরে পড়বে যা দেখবার মত। সেকথা এখানকার যাদুঘর, গ্রন্থাগার চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, ফোয়ারা, পুরানো ধ্বংসাবশেষ সব কিছু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সত্যই সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে রোমের তুলনা নাই।

রোমে থাকাকালীন দ্বারকানাথ একদিন পোপের দরবারে যান। তখনও পোপের ক্ষমতা কেবল ধর্ম ব্যাপারেই নিবদ্ধ হয় নাই। তখনও তিনি রোমের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা—সৈন্য সামন্ত পুলিশ দিয়ে দেশ শাসন করেন। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের শিক্ষার জন্য যে ইংলিশ কলেজ আছে তার প্রিন্সিপাল পোপের কাছে নিয়ে গিয়ে দ্বারকানাথকে পরিচয় করিয়ে দেন। দ্বারকানাথ গিয়েছিলেন পাগড়ী পরে। পাশ্চাত্য কায়দায় টুপি খুলে সম্মান না দেখিয়ে তিনি পাগড়ী পরেই থাকেন এবং পোপকে জানান যে ভারতীয় প্রথায় সম্মানিত লোকের কাছে মাথা খুলে যাওয়া তাঁকে

অসম্মান করা, তাই তিনি পাগড়ী পরে এসেছেন। (১) তখন ১৬শ গ্রেগরী পোপ। তাঁকে তিনি কিছু ভারতীয় সম্ভার উপহার দেন এবং পোপ তাঁকে প্রত্যুপহার হিসেবে একটি র‍্যাফেলের আঁকা শিশু যীশু ক্রোড়ে মেরীর ছবির কপি উপহার দেন। ( ২ )

সেণ্ট পিটার্স গির্জায় নিরন্তর পূজা ইত্যাদি এবং তৎসহ প্রদীপ জ্বালা, ঘণ্টা বাজানো, ধূপধুনা দেওয়া, পূণ্যজল ছিটানো প্রভৃতি দেখে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মনে হয় এ যেন হিন্দু পূজারই নামান্তর মাত্র।

যেদিন তিনি পোপের সঙ্গে দেখা করতে যান, সেইদিনই বিকেলে কর্ণেল কল্ডওয়েলের বাড়িতে এক আসরে প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিকের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐখানে বিদুষী জ্যোতির্বিদ মিসেস সোমারভিলের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে।

রোম দ্বারকানাথের বড় ভালো লেগেছিল। বর্তমান ধারার পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপীঠ বলেই নয়, প্রাকৃতিক ও মানুষের গড়া সৌন্দর্যের জন্যও। বড় বড় মনোরম অট্টালিকা, সুদৃশ্য বাগানে নানা রংয়ের ফুলের প্রাচুর্য—গোলাপ, যুঁই, হানিসাক্‌ল্‌, মার্টল্‌স্‌—নানারকমের কেয়ারীর মধ্যে মধ্যে বেড়াবার, বসবার জায়গায়, সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা। মানুষ এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন নিজের বুদ্ধি দিয়ে আরও বাড়িয়েছে। এই এপ্রিল মাসের রোমের আবহাওয়াও তাঁর খুব পছন্দসই ছিল—গরমে কষ্ট হয় না অথচ শীতও বিশেষ নেই—অনেকটা আমাদের দেশের বসন্তকালের মত।

রোমের একটা জিনিস কেবল তাঁকে বড় ব্যথা দিয়েছিল—সেটা কলসিয়াম। (৩) সহস্র সহস্র লোকের দীর্ঘশ্বাস আর আর্তনাদের স্মৃতিজড়িত এই জায়গা দেখে দ্বারকানাথ এত বিচলিত হন যে প্রায় অসুস্থ বোধ করতে থাকেন।

সারাজীবনই দ্বারকানাথের এই ভাবপ্রবণতা ছিল একটা বিরাট দুর্বলতা। চোখের জল দেখতে পারতেন না, সইতে পারতেন না, কল্পনা করতেও কষ্ট পেতেন। এটা আদর্শগুণ বলে মনে হলেও এর জন্য বহু রকমে বহুবার তাঁকে ঠকতে হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণ ছিলেন বটে কিন্তু কেউ কেঁদে পড়লে তিনি না ভেবেচিন্তে বিনা বিচারে সাহায্য করতেন। অনেকে বিশেষতঃ সাহেবরা তাঁর এই দুর্বলতার প্রচুর সুযোগ নিত। অবশ্য "ইহাতে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, তেমনি প্রতিপত্তি লাভ হইত। সরকারী কর্মচারী সকলেই এজন্য একপ্রকার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলপ্রকার কার্যেই তাঁহার সাহায্য করিতেন।" দেশীয়দের মধ্যেও এইমত ঝোঁকের মুখে দানগুলিই কাহিনী কথিকা হয়ে এতদিন তাঁর স্মৃতি অন্ততঃ ক্ষীণভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রোমের পর দ্বারকানাথের রোজনামচায় যে বড় সহরের নাম পাওয়া যায় তাহা ফিরেন্‌জে বা ফ্লোরেন্স। এখানেও গির্জে, মূর্তি, ছবি দেখবার পালা। এখানকার বড় গির্জাটি সম্বন্ধে দ্বারকানাথ লেখেন যে এটা "খুব বড় উঁচুও তবে সেণ্টপিটার্সের তুলনায় কিছুই নয়"। এই শহরে উফিজি প্রাসাদে পাশ্চাত্য চিত্র ও ভাস্কর্যের বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাজানো আছে। এই প্রাসাদের দ্বিতলে একটা আটকোণ ঘরে এই মিউজিয়ামের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি সাজানো থাকে। এই ঘরটার নাম "ট্রিবিউনা"। এখানে র‍্যাফেল, টিসিয়ান, ডুরের প্রভৃতির ছবি টাঙ্গানো। মূর্তির মধ্যে বেছে পাঁচটা মূর্তি রাখা

থাকে। দ্বারকানাথের সময়ে আসল গ্রীক মূর্তিগুলির অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয় নি। ভিনাস ডি মিলো নামে ১৮২০ সালে এক চাষা মাঠে চাষ করতে গিয়ে পায় কিন্তু শিল্পীমহলে তখনও তার প্রচার হয় নি। তখন "মেডিচি ভিনাস"-এর যুগ। সেই "মেডিচি ভিনাস (৪) এই ঘরে রাখা ছিল। তাই দেখে দ্বারকানাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন—"অপূর্ব, এরকমটা আর কোথাও দেখা যাবে না"।

ফ্লোরেন্স চামড়া ও মোজেইকের কাজের জন্য বিখ্যাত। দ্বারকানাথ রোজনামচায় উল্লেখ করেছেন "এমন সব মোজেইক টেবিল দেখলাম যার দাম একটা দেড়লক্ষ টাকা।" তারপর তিনি ইটালীর এই অংশের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে গরীবদের কুটীরগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছানো। গ্রামবাসীদের সাজপোষাক চেহারার মধ্যে এমন একটা নিশ্চিন্তভাব আছে যা যেদেশে চাষীরা আশাহীন বন্দীর জীবন কাটায় তাদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না।

এখান থেকে দ্বারকানাথ গেলেন ভেনিসে। সেখানে গণ্ডোলা বা নৌকা করে ঘুরে বেড়ালেন। ঠিক রাস্তা থেকে ঘরে ঢোকবার মতন কিরকম নৌকা বাড়ির দরজায় লাগিয়ে ভিতরে যাওয়া যায় দেখে লিখেছিলেন যে "প্রধান খালটা নগরীর রাজপথের মত। বাড়িগুলি যে জলের মধ্য থেকেই উঠেছে এমনভাবে খালের উপর তাদের সদর দরজা। বাড়িগুলি সুন্দর ও থামের উপর গৃহস্বামীর কুলচিহ্ন (৫) আঁকা। এখানে দ্বারকানাথ ডিউকাল প্রাসাদে ভেনিসের "ডোজে"দের (৬) ছবি, মিউজিয়াম ও সেন্টমার্কের গির্জা দেখেন বলে জানতে পারা যায়। তখনও সেন্টমার্কের কাম্বনিল বা ঘণ্টাস্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েনি (৭)। দ্বারকনাথ বোধহয় বলেছিলেন যে সেন্টকার্ক বা সেন্টপিটার্স, তাজমহলের মত এত সুন্দর নয়—এই কথা এদেশে প্রচার হতে এখানকার সাহেবী কাগজে তা নিয়ে জোর আলোচনা হয়। (৮) এখান থেকে খুব পাতলা ও রঙ্গীন কাঁচের বাসন যার জন্য বিখ্যাত -সেইসব পছন্দমত ডিজাইন দিয়ে তৈরী করে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। (৯)

এখানে টিসিয়ানের আঁকা ছবি দেখে দ্বারকানাথ মোহিত হন। টিসিয়ানের আঁকা ওঁর এত ভালো লেগেছিল যে বেলগাছিয়া ভিলার জন্য তিনি পরে দুটি টিসিয়ান বা তাঁর শিষ্যদের আঁকা দুটি বড় ছবি কিনে আনেন।

১৬ই ভেনিস ছেড়ে উত্তরদিকে চললেন দ্বারকানাথ। তাঁর ডায়রীতে আলুসের প্রথম দর্শনের যে বর্ননা লিখেছিলেন সেটার উল্লেখ করেছেন কিশোরীচাঁদ কিন্তু তার কোন অংশই উদ্ধৃত করেন নি। ভেনিস থেকে যেখানে দ্বারকানাথ পৌছান সেটা ফ্রেন্ট সহর। এখানেই ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বৈঠকের অধিবেশন হয় তাতেই রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সাধারণ নিয়মবিধি ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অনুশীলনগুলি পাকাভাবে বাঁধা হয়। তার চিহ্ন রয়ে গেছে চওড়া রাস্তা, প্রাসাদ, অট্টালিকা, স্তম্ভসমূহে। সেখান থেকে ব্রেনার গিরিবর্ত পার হয়ে দ্বারকানাথ গেলেন জার্মানীর দিকে। তখনকার দিনে এই পথে আলপস্ পার হওয়াই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক। যে-কটা গিরিপথ সরাসরি আলপস্ পর্বতশ্রেণী পার হয়েছে তার মধ্যে ব্রেনারই সবচাইতে নীচু (৪৪৯৫ ফিট)। সেইজন্য রোমান যুগ থেকেই এই পথ প্রচলিত। ১৭৭২ সালে রাস্তাটিকে কেটে এমন চওড়া করা হয় যে ঘোড়ার গাড়িতে করেও এই গিরিবর্ত পার হওয়া যায়।

এখান থেকে তিনি পৌঁছালেন স্টুটগার্টে। পথের বর্ণনায় এ অংশকে দ্বারকানাথ একটী বিরাট বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আলপস্-এর উত্তর ও দক্ষিণে উভয় ভাগেই জমি খুব উর্বর। ফসল সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন—ইটালীয় অংশে আঙ্গুরলতা প্রধান, তাছাড়া নানারকমের শস্য। জার্মানীর অংশে নানা জাতের ফল—আপেল, পেয়ারা, চেরি, আখরোট, চেস্টনার্ট প্রভৃতি।

স্টুটগার্ট থেকে তিনি গেলেন হাইডেনবার্গ শহরে। এই সহর পুরানো ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিচিত। এখানে তিনি জার্মানদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ও শিক্ষাপ্রণালী দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন, "ইটালীর তুলনায় জার্মানীর শিক্ষাপ্রসার বহুগুণে উল্লেখযোগ্য। ইটালীতে কেহই প্রায় ইটালীয় ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, কিন্তু এখানে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সকলেই ফরাসী তো জানেই, অনেকে ইংরেজীও জানে। শহরে একটী ভিক্ষুক নজরে পড়ে নি। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের হাতেই দেখেছি বই। ব্যাভেরিয়ার রাজা নিজেও উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁর রাজ্যে স্কুলবিহীন কোন গ্রাম নেই। ধনী দরিদ্র সকলের ইস্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। দরিদ্র ছাত্ররা পড়ে অবৈতনিক, ধনী ছাত্রদের কিছু করে টাকা দিতে হয়। পানীয় জল ও ফোয়ারার অভাব দেশের কোথাও নেই।"

এখান থেকে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়ে পৌঁছান ৩১শে মে। দ্বারকানাথের রোজনামচায় এ শহরে কেবল থিয়েটার ও আমোদপ্রমোদ সংক্রান্ত উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি ঘটনার বিষয় "ইংলিশ-ম্যান" কাগজে বার হয় তা নিয়ে কলিকাতায় হৈচৈ পড়ে যায়। ঐ কাগজে প্রকাশ করা হয় যে "ফ্রাঙ্কফোর্টের দ্রষ্টব্যগুলি দেখে দ্বারকানাথ ফেরার পরেই কাপ্তেন ম্যাডেন ও আরেকজন ইংলণ্ডীয় সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। করমর্দ্দন ও কয়েকটী শিষ্টাচারের পরেই আফগানিস্থানের বিপত্তি (১০) ও কাবুলের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ সম্বন্ধে কথা উঠে। বিশবৎসর ভারতে থেকে ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কাপ্তেন সাহেব জোর দিয়ে বলেন যে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে এদেশীয় সৈন্যেরা এত নিরুদ্দম হইয়া পড়িবে যে আর যুদ্ধের উপযুক্ত থাকিবে না। বাবু এবিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে বরং এর উল্টোটাই সম্ভব। সেনাপতি এল্‌ফিন্‌স্টোনের নির্বুদ্ধি অক্ষমতায় তারা যা কিছু হারিয়েছে, নিজেদের সাহসের অভাবে নয়। কাজেই হৃতগৌরব উদ্ধার করিতে তার সাহসী দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। তিনি ঠিক এই কথাগুলি ব্যবহার করেন এবং কোন সৈন্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া এর চেয়ে বড় নিন্দা সম্ভব নয়। স্যার জন কীনের সৈন্যেরা দোস্ত মহমুদকে দেশ থেকে তাড়ানোর পর তাঁর সঙ্গে লর্ড অকল্যাণ্ডের বাড়িতে বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এটা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না যে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে বা দেশের মঙ্গলকল্পে আফগানরা কিছু করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল লুটতরাজ ও সেজন্য যতই খুনজখম করতে হয় তাহাতে তাদের কিছু আসে যায় না। বাবু অবশ্য একথাও শেষকালে বলেন যে উত্তর ভারতে আমাদের সৈন্যদের আশু জয়লাভ নিশ্চিত।"

এর উপর টিপ্পনী কেটে বেঙ্গল হরকরা লিখলেন—

এসব খবর কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয়না। এই রকম বাজে কথা বলবার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন দ্বারকানাথ হতে পারেন না। তা ছাড়া এদেশীয় একজন ভদ্রলোকের কাছে কাপ্তেন

ম্যাডেন এদেশীয় পল্টনের প্রতি নিন্দার্হ ইঙ্গিত করবেন বলে মনে হয় না। কাপ্তেন ম্যাডেন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না তবে জানি যে ঐ সম্পাদরের লেখকটির বর্ণনামত অশোভন ব্যববহার তিনি করতে পারেন না। ঐ প্রবন্ধেই তার কিছু আগে বলা হয়েছে যে দ্বারকানাথ নাকি বলেছেন যে তার এত টাকা আছে যে কি করবেন জানে না। এই দুঃসময়ে কলিকাতার কোন ব্যাপারীর পক্ষে এটা আজব কথা।

ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে রেলে চড়ে দ্বারকানাথ মেইন্স পৌছান। সম্ভবতঃ এই তার প্রথম রেলে চড়া কিন্তু সে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ডাইরীতে তিনি কিছু লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না। এখানে এসে এক নৌকার পুলের উপর দিয়ে রাইন্ নদী পার হয়ে ষ্টীমারে চড়ে কলোন সহরে আসেন। সেখানকার বিখ্যাত গির্জা দেখে তার বৃহদায়তন সম্বন্ধে উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন যে সবই ভালো কিন্তু বড় গরম—কেমন যেন দম আটকে আসে—এখানে টানা পাখার ব্যবস্থা করলে বেশ হয়।

কলোন থেকে আবার রেলে চড়ে তিনি গেলেন এ-লা-শ্যাপেলে (১১)। এটি জার্মানীর অন্যতম পুরাতনতম সহর। এইখানেই "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট শার্লেমেন বা চার্লস দি গ্রেট। তাঁর রাজত্বকালের ( ৭৪২ থেকে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ ) কিছু চিহ্ন এখানে তখনও ছিল। এ সহরে দ্বারকানাথের আরেকটি আকর্ষণ ছিল। এটি একটী "স্পা"—এখানে কুণ্ডস্নান করিলে বাত-যন্ত্রণা কমে যায় এং সেইজন্য চিকিৎসার্থেও বহু লোক আসেন।

এই এলাশ্যাপেল থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে লীজ ও সেখান থেকে রেলে করে ব্রাসেলস্ হয়ে অষ্টেণ্ডে পৌছান। পথে বেলজিয়ামের পুরানো সহর সেণ্টও দেখেছিলেন কিনা জানা নেই। কেবল এইটুকু জানা যায় যে ঘোড়ার ডাকগাড়ি করে অষ্টেন থেকে ফ্রান্সের ক্যালেতে পৌছান। ঐখানে কারঠাকুর কোম্পানীর কার সাহেব ও দ্বারকানাথের আরেকজন বন্ধু ব্রাউনরবার্টস্ সাহেব এসে দ্বারকানাথের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর সদলবলে ৯ই জুন ক্যালে থেকে ডোভার তিনঘণ্টায় পার হয়ে খাস ইংলণ্ডে আসেন। ইংলণ্ডের প্রথম যা তাঁর নজরে পড়ে সেটা জাহাজ থেকে ডোভারের সাদা খড়িমাটির পাহাড় ও তার উপরে দুর্গ। ডোভারে নেমে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে সেইদিনই ক্যাণ্টারবেরিতে উপস্থিত হন। পৃথিবীর সেই কয়েকটি গির্জা দেখে আসার পর এখানকার গির্জা দেখে যে খুব উচ্ছ্বসিত হবেন না, এটা আশা করাই স্বাভাবিক, তবু দেখি বর্ণনায় এটিকে জমকালো বলেছেন। এখানে দুটি স্মৃতিচিহ্নের তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন—একটি ব্ল্যাক প্রিন্স-এর অন্যটি ইমাম মেকেটের (১২)।

এখান থেকে চ্যাথামও ও রচেষ্টার হয়ে লণ্ডনে যাবার পুরাণো ডোভার রোড—পথে চড়াই উৎরাই প্রচুর। গ্রীষ্মকালে এ পথ অতি সুন্দর—দুই পাশে শস্যপূর্ণ চাষজমি আর মাঝে মাঝে বাগান ও বাড়িগুলি সাজানো ছবির মত।

তার পরদিন ১০ই জুন দ্বারকানাথ লণ্ডনে পৌছান।

লণ্ডনের প্রথম অভিজ্ঞতার বিষয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লেখেন "ইউরোপীয় মহাদেশের সবকিছু দেখার পরেও এই ছোট দ্বীপটি এরকম অপূর্ব মনে হবে আশা করি নাই। কিন্তু লণ্ডন সত্যই

আজব শহর—এখানকার শহরের কর্মব্যস্ততা, যানবাহন, দোকান-পাট বিশেষতঃ সহরবাসী লোকেদের দেখে আমি মুগ্ধ।”

(১) কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রসঙ্গ কথায় ২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখছেন “পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে দ্বারকানাথ পাগড়ি না জুতো কোনটি খুলতে অস্বীকার করেছিলেন তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কিশোরীচাঁদ উষ্ণীষের উল্লেখ করেছেন। ‘বসুধারা’ শ্রাবণ ১৩৬৩ ( পৃ ৩৯০ ) সংখ্যায় পুরাণজ্ঞ যমদত্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে “দ্বারকানাথই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পোপের সহিত জুতা পায়ে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।” পোপের সহিত জুতা-পরা অবস্থায় অনেকের ছবি দেখিয়াছি কিন্তু টুপি-পরা অবস্থায় কাহারও ছবি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তা ছাড়া কিশোরীচাঁদ দ্বারকানাথের ডাইরীও এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন সুতরাং তাঁর কথাই ঠিক বলিয়া মানা গেল।

(২) এই তৈলচিত্রটী বৎসরদশেক আগেও বেলগাছিয়া ভিলায় দেখিয়াছি। এক ফুটের কিছু বেশি লম্বা ও দশ বা বারো ইঞ্চি চওড়া ম্যাডোনার প্রতিকৃতি। উহা র‍্যাফেলের আঁকা একটী ছবি থেকে জনৈক ( যতদূর মনে পড়ে ) জর্মান শিল্পী করা কপি।

(৩) রোমীয় সম্রাট ভেস্পাসিয়নের সময়ে তৈরী আরম্ভ হয়ে ৮০ খৃষ্টাব্দে টিটাস কর্তৃক ইহার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই ক্রীড়া ক্ষেত্রের ৬০৭ ফুট দীর্ঘ, ৫১২ ফুট চওড়া ও ১৫৯ ফুট উচু ধ্বংসাবশেষ রোমের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। ইহাতে ৮৭,০০০ দর্শকের বসিবার স্থান ছিল। এইখানে ক্রীতদাসগণ ও বন্দীরা বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর সহিত লড়াই করিয়া দর্শকের চিত্তবিনোদন করিত।

(৪) এই মূর্তিটী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে রোমের সম্রাট হেড্রিয়ানের ভিলা থেকে খুঁড়ে বের করা হয়। তখন এর হাত দুটী ভাঙ্গা ছিল। এটি ভিলা মেডিচিতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। ঐ সালে লিওপল্ডে মেডিচি মূর্তিটিকে সারিয়ে উফিজি প্রাসাদে আনেন। এই সারাবার সময় বাঁ হাত ও ডান হাত আন্দাজমত ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। সেটা এখন দেখলে কেমন যেন লাগে কিন্তু সেযুগের পছন্দসই হয়েছিল নিশ্চয়ই কারণ ১৭ শতাব্দীর বড় বড় সমালোচক একাদিক্রমে একে অপূর্ব বলেছেন। মূর্তিটীর তলায় লেখা অনুসারে এটী এথেন্সের ক্লিয়োমিনিসের তৈরী। ঐনামের এক ভাস্কর অগাষ্টাসের সময়ে রোমে এসেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

(৫) Heraldic colours.

(৬) ৬৯৭খৃ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত ভেনিসে যখন সাধারণতন্ত্র ছিল তখনকার প্রধান বিচারপতির আখ্যা।

(৭) গির্জ্জার পাশে বা নিকটে অবস্থিত ঘণ্টাস্তম্ভ। সেণ্টমার্কের স্তম্ভটির শিখরে একটি ১৬ ফুট দেবমূর্তি ছিল। এটি সমেত উচ্চতা ছিল ৩২২ ফিট। এর তৈরী আরম্ভ হয় ৯০২ খৃষ্টাব্দে। ঠিক হাজার বছর বাদে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এটি ভেঙ্গে পড়ে। বর্তমানে ঠিক পুরাতন নক্সামত এটিকে পুনর্নিমাণ করা হয়েছে।

(৮) “আমাদের বন্ধুবর্গের কয়েকজন খোঁটা দিয়েছেন যে দ্বারকানাথকে হাস্যাস্পদ করতে

বিলাতের সংবাদ পত্রগুলিকে আমরা সাহায্য করেছি। আমাদের অপরাধ বিলাতের খবর থেকে আমাদের প্রিয় বন্ধু সম্বন্ধে ইউরোপের নানা দেশে যা বলা হয়েছে তাহা উদ্ধৃত করা—এবং আরও বড় অপরাধ হল দ্বারকানাথ যা বলেছেন বলে শোনা গিয়েছে তাহা প্রকাশ করা—এ সবই যেন অবিশ্বাস্য। * * * যদি তাঁকে বুঝতে কোথাও ভুল হয়ে থাকে (মিথ্যাকথন তাঁর সাধ্যাতীত) এবং শুনা যায় তিনি বলেছেন যে আগ্রা দিল্লীর পর রোমের গির্জা দেখেও তিনি স্তম্ভিত হন নাই তাতে হাস্যাস্পদ কি আছে? যাঁরা তাজমহল দেখেছেন এবং স্থাপত্য বোঝেন, তাঁরা একমত যে রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলি যতই চমকপ্রদ হউক, সৌন্দর্যে এই বিখ্যাত সমাধির তুল্য নয়।"
—ইংলিশম্যান ৩১শে আগষ্ট ১৮৪২।

(৯) এর কিছু নিদর্শন গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরদের কাছে ১৯৪১ কি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ছিল; ঐ সময়ে যখন ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়ি বিক্রী হয়ে যায় সে সময়ে ঐগুলিও বোধহয় বেচে দেওয়া হয়। ঐ বাড়ির এক পুরানো চাকরের কাছে আক্ষেপ শুনেছি—"উনিশ ঝুড়ি কাঁচের বাসন সব নিয়ে গেল বৌবাজার থেকে লোক এসে।"

(১০) ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে জামিন স্বরূপ কয়েকজন ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১০ হাজার সৈন্যকে আফগানীরা হত্যা করে। একজন মাত্র পালিয়ে এসে লাহোরে খবর নিয়ে আসে।

(১১) ২৫শে আগষ্ট ১৮৪২।

(১২) বর্তমান নাম আকেন্।

(১৩) টমাস এবেকেট (১১১৮-১১৭০) ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রির সময়ে ক্যাণ্টারবারির প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। রাজার বন্ধু হলেও তিনি রাজার উপরেও পোপের আদেশ বলায় ও প্রচার করায় গির্জার ভিতরেই ২৯শে ডিসেম্বর নিহত হন।

# শ্রাদ্ধ

## চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হিন্দুর ধর্মকার্যের মধ্যে শ্রাদ্ধ সুপ্রাচীন কাল হইতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীনকালে নানা সময় নানা উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। মরণোত্তর শ্রাদ্ধ, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা, নবগৃহ প্রবেশ, নবান্ন, সন্তানোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধ শাস্ত্র বিহিত ছিল। মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধই এখন বেশি পরিচিত হইলেও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাও একেবারে অজ্ঞাত নহে। মৃত্যুর পর অশৌচ কাল শেষ হইবার পরদিন যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার নাম আদ্যশ্রাদ্ধ। মৃতের সহিত আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব অনুসারে এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অশৌচকাল দশদিন, (১) বারদিন, পনরদিন, একমাস, তিনদিন বা একদিন মাত্র হইয়া থাকে। মরণাশৌচে ক্ষৌরকর্ম ও মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে অশৌচকালে সন্তানদের হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে হয় ও অশৌচান্তদিনে পুত্রদের মস্তক মুণ্ডন কর্তব্য। কোথাও কোথাও ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রেরাও মুণ্ডন করিয়া থাকেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ :মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধের পূর্বেও পিণ্ডদান ও তর্পণের ব্যবস্থা আছে। শ্মশানে শবদাহের পূর্বে পিণ্ড দান করা হয় এবং দাহের পর মৃতের তৃপ্তির জন্য এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করা হয়। অশৌচের মধ্যে প্রতিদিন বা অশৌচের শেষদিনে পূরকপিণ্ড দান করিতে হয়—পূরকপিণ্ডের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ দশ। বলা হয়, এক একটি পূরক-পিণ্ডদানের ফলে মৃতের এক একটি অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে বা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে নীরক্ষীর দানের কথাও উল্লেখযোগ্য। অশৌচের সময় প্রতি সন্ধ্যায় মৃতকে উদ্দেশ করিয়া দুইটি পাত্র বাহিরে টাঙ্গাইয়া কিছু জল ও দুধ দেওয়া হয়। শ্মশানের আগুনে দগ্ধ, বান্ধব পরিত্যক্ত, আকাশস্থ, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, বায়ুভূত মৃতব্যক্তি এই জলে স্নান করেন ও এই দুগ্ধ পান করেন।

শ্রাদ্ধ শব্দের মূল অর্থ হইল মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক দান। মৃতের তৃপ্তি কামনা করিয়া এই দান করা হয়। পূর্বে নানা গুণসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের হাতেই পরলোকগত পিতৃপুরুষকে দেয় বস্তুসমূহ (—আসন, অর্ঘ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অন্ন) দেওয়া হইত। এক হিসাবে তাঁহারাই ছিলেন পিতৃপুরুষের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি মারফৎই পিতৃপুরুষেরা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। অনেকদিন যাবৎ সেরকম ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের পরিবর্তে কুশকে ব্রাহ্মণ কল্পনা করিয়া তাহারই উপর শ্রাদ্ধ করা হয়। পরে শ্রাদ্ধের দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণ করা এখন অনেকে অসম্মানজনক মনে করেন। তাই উহা গরুকে বা জলে দেওয়া হয়। তবে কোথাও কোথাও পিণ্ড পর্যন্ত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতেন এরূপ রীতি ছিল। মৃতের উদ্দেশ্যে এই দান ছাড়া মৃতের স্বর্গাদি কামনায় ব্রাহ্মণকে নানা জিনিস স্বতন্ত্রভাবে দান করিবার ব্যবস্থাও আছে।

দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ পৈতা ডান কাঁধ হইতে ঝুলাইয়া

মধ্যাহ্নকালে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করেন অন্য জাতির লোক আমান্ন বা শুকনা চালে। বিবাহাদি উপলক্ষ্যে করণীয় শ্রাদ্ধে নিয়ম নাই। সকল শ্রাদ্ধেই কলাগাছের খোলা দিয়া তৈয়ারি পাত্র ও সাদা ফুল ব্যবহার করা হয়—কলার পাতা ও রঙীন ফুল ব্যবহার নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধের পূর্বদিন শ্রাদ্ধকর্তাকে একাহারী ও নিরামিষভোজী হইতে হয়। শ্রাদ্ধদিনেও একবার আহার করণীয়। ঐদিন দণ্ডকাষ্ঠ, তৈলের ব্যবহার, দূরপথ ভ্রমণ, দ্যূতক্রীড়া, অধ্যয়ন ও মৈথুন বর্জনীয়।

আদ্যশ্রাদ্ধের একটি মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য অন্নের সহিত আমিষ প্রদান। পুরুষ ও সধবা নারীর ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধান্নের সহিত পোড়া মাছ বা কোথাও কোথাও রান্না করা মাছ এবং বিধবার ক্ষেত্রে কাঁচা কলা পোড়া দেওয়ার রীতি আছে। আদ্যশ্রাদ্ধের দিন পূর্বাহ্নে চতুর্ধা শান্তি বা চার রকমের শান্তি মন্ত্র পাঠ, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত বা স্বর্ণদান, তিল কাঞ্চন দান এবং শক্তি অনুসারে ষোড়শদান ( ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গাভী, স্বর্ণ, রৌপ্য ), ছয় দান ( ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন ) অথবা তিন দানের ( অন্ন, জল, বস্ত্র ) নিয়ম আছে। যমদ্বারে অবস্থিত তপ্ত বৈতরণী নদী যাহাতে সুখে পার হওয়া যায় সেজন্য মৃত্যুর পূর্বেই সবৎসা গাভী বা সামান্য গোমূল্য দানের ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুর পূর্বে তাহা করা না হইলে আদ্যশ্রাদ্ধের দিন তাহা করিতে হয়। এই অনুষ্ঠান বৈতরণী দান নামে পরিচিত। এ সমস্তই আদ্য শ্রাদ্ধের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃতের প্রেতত্ব মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের পর এক বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাসে মৃত্যু তিথিতে বা কৃষ্ণা একাদশী কি অমাবস্যায় মাসিক, ছয় মাস পরে প্রথম ষান্মাসিক, বৎসরান্তে দ্বিতীয় ষান্মাসিক ও সপিণ্ডিকরণ শ্রাদ্ধ করণীয়। সপিণ্ডীকরণে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডের সহিত প্রেতের পিণ্ডের সমন্বয় বা মিলন সাধন করিয়া প্রেতত্ব মোচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেত শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত সমস্ত শ্রাদ্ধই জ্যেষ্ঠপুত্র তদভাবে দ্বিতীয় পুত্র এই ক্রমে মুখ্যাধিকারীর কর্তব্য—প্রতিনিধি দ্বারা ইহা করা চলে না। সপিণ্ডীকরণ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধগুলি একজনের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম একোদ্দিষ্ট। কাহারও মৃত্যুতিথিতে বা অন্যদিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির ( মাতা, পিতা, স্ত্রী, স্বামী প্রভৃতি ) এই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ভাতের দ্বারা এই সমস্ত শ্রাদ্ধ করেন—অন্য বর্ণের লোকেরা শুকনা চালের দ্বারা।

আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত না হইলেও সাধারণতঃ ইহার সঙ্গেই বিচিত্রাসন বা সুখাসন দান, মহান্ন দান, মচলন্দ শয্যা দান, বিলক্ষণ শয্যা দান, দানসাগর, বৃষোৎসর্গ, চন্দনধেনু দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। শ্রাদ্ধকর্তা নিজের সামর্থ ও ইচ্ছা অনুসারে এই সমস্ত দানের আয়োজন করেন। দানের দ্রব্য গুরু পুরোহিত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিলক্ষণ শয্যাদানে কোনও ব্রাহ্মণ দম্পতিকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া শয্যা দান করা হয় এবং দানান্তে তাঁহাদিগকে উহাতে উপবেশন করান হয়। তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ এই দান গ্রহণ করেন না। এক সঙ্গে ষোলটি ষোড়শ দান করার নাম দানসাগর। শ্রাদ্ধের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এই দান সাগরের গৌরব সর্বাধিক। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে

ধনী ব্যক্তিরা একাধিক দানসাগর করিতেন—কেহ কেহ সোনা ও রূপার দ্রব্য দিয়াও দানসাগর করিতেন এরূপ জানা যায়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত দানসাগরের ও শ্রাদ্ধাড়ম্বরের উল্লেখ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সধবা পুত্রবতী রমণী রজোনিবৃত্তির পূর্বে পরলোকগমন করিলে চন্দনাঙ্কিতা সবৎসা ধেনু দান বিহিত। অন্য সকলের ক্ষেত্রে চারিটি গাই বাছুর সহ একটি বৃষ উৎসর্গ করা বা ছাড়িয়া দেওয়ার বিধান আছে। পূর্বে চন্দন ধেনুদান ও বৃষোৎসর্গ অবশ্য করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। চারিটি বাছুর যাঁহার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইত না তিনি একটি বাছুর দিয়াও কাজ চালাইতেন। বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান অতি বিস্তৃত ও বহু ব্যয়সাধ্য। তাহা ছাড়া, বর্তমানে ইহার তেমন সার্থকতা নাই—উৎসর্গ করা গরু বাছুর যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবে, ইহাদের কেহ কোনও কাজে লাগাইবে না ইহা কার্যতঃ সম্ভব নয়। তাই ইহার প্রচলন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

আদ্যশ্রাদ্ধের পর প্রচলনের দিক দিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ উল্লেখযোগ্য। কোন অভ্যুদয় (নবগৃহ প্রবেশ, তীর্থযাত্রা, পুত্রকন্যার বিবাহাদি সংস্কার) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম আভ্যুদয়িক। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ (বৃদ্ধির বা উন্নতির জন্য যাহা অনুষ্ঠিত) বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ (যে শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের মুখে নান্দী বা প্রশস্তি উচ্চারিত হয়) নামেও ইহা পরিচিত। বর্তমানে উপনয়ন ও বিবাহেই ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়—নবগৃহে প্রবেশ বা তীর্থযাত্রা বা তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ইহার অনুষ্ঠান ক্বচিৎ হয়। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের মত ইহাতে কেবল এক জনের শ্রাদ্ধ করা হয় না। ইহাতে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ছয় জনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী সহ নয় জনের শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। বর্তমানে বাংলা দেশে ইহা আমান্ন শ্রাদ্ধ একোদিষ্টের মত ইহাতে অন্নপাকের প্রয়োজন হয় না। ইহা অন্য শ্রাদ্ধের মত দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাবীতি অর্থাৎ ডান কাঁধ হইতে পৈতা ঝুলাইয়া মধ্যাহ্নে করিতে হয় না। ইহা মুখ্যতঃ পূর্বাহ্নকৃত্য। অন্য শ্রাদ্ধের মত এই শ্রাদ্ধে তিলের প্রয়োজন হয় না তিলের পরিবর্তে যব বা ধান্য ব্যবহৃত হয়। সমস্ত শ্রাদ্ধের উপকরণ দধি মিশ্রিত করিতে হয়। কার্যতঃ একটু দধি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সহিত গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। মাটিতে পিটুলি দিয়া আঁকা সিন্দুরের ফোটা দেওয়া ষোলটি কুণ্ডলিতে অথবা কলাগাছের খোলায় ষোলটি সিন্দুরের দাগ দিয়া তাহার এক একটির উপর গৌরী পদ্মা শচী মেধা প্রভৃতি এক এক মাতৃকার পূজা করা হয়। বটপাতায় করিয়া দইছিটান শুকনা চালকলার নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি আছে। ঘরের পূর্ব বা উত্তর দিকের দেওয়ালে নাভি সমান উচ্চ স্থানে গোবরের তাল লাগাইয়া উহাতে পাঁচটি বা সাতটি কড়ি আটকাইয়া দেওয়া হয় এবং সিন্দুর বা চন্দনের দ্বারা সাতটি দাগ কাটিয়া তাহার উপর ঘৃতধারা বর্ষণ এবং চেদিরাজ বসুর পূজা করা হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে পশু যাগবিষয়ে দেবতা ও ঋষিদের বিতর্কে উপরিচর বসু দেবপক্ষ সমর্থন করায় ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং দেবতাদের বরে পাতালে বাম কানে যজ্ঞে প্রদত্ত বসুধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৭।২৫-৮)। বিবাহাদি কার্যে আভ্যুদয়িকের অব্যবহিত পূর্বে

ষষ্ঠী দেবী ও চিরজীবী মার্কেণ্ডেয় ঋষির পূজা ও যাহার বিবাহ, উপনয়ন বা অন্নপ্রাশন তাহার অধিবাস করা হয়। মন্ত্রপূত বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করাইয়া শরীরকে পবিত্র করা শেষোক্ত অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই। অবশ্য সমস্ত উৎসবেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল শ্রাদ্ধ। তবে তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বা নূতন শস্য ঘরে আনিয়া নবান্ন উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহার নাম পার্বণ শ্রাদ্ধ। পর্ব উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহার নাম পার্বণ। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্বনামে ইহা পরিচিত। আশ্বিনের অমাবস্যায় অনেকে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অনুসারে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবার কথা। এখন অনেকে তর্পণের দ্বারা নিয়ম রক্ষা করেন। গ্রহণ-কালে পার্বণ-শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য আরও অনেক সময় পার্বণ-শ্রাদ্ধের বিধান আছে। পার্বণে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ছয় পুরুষের শ্রাদ্ধ করা হয়। বর্তমানে বাংলা দেশে ইহাও আমান্ন শ্রাদ্ধ অর্থাৎ শুকনা চাল দিয়া এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

অন্নদান, মধুদান ও পিণ্ডদান শ্রাদ্ধের বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাদের মধ্য দিয়া শ্রাদ্ধ তথা ভারতীয় জীবনযাত্রার আদর্শ ফুটিয়া উঠে। সুনিয়ন্ত্রিত গার্হস্থ্যই ভারতের লক্ষ্য। পুত্রোৎপাদনে এই জীবনের পূর্ণতা—আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব তথা সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধনের প্রয়াসে তাহার সার্থকতা। অন্নদান প্রসঙ্গে যে রুচিস্তব ( ৩ ) পাঠের রীতি আছে তাহা গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা বর্ণনে পরিপূর্ণ। সংযতাচার অনাসক্ত রুচি দারপরিগ্রহ দুঃখ, পাপ ও অধোগতির কারণ মনে করিয়া বিবাহ করেন নাই। পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বিবাহ ও সংসার ধর্ম-পালনের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিলে তিনি বিবাহে সম্মত হন। পিতৃগণ তাঁহাকে মনোরমা পত্নী ও খ্যাতিমান্ পুত্র লাভের বরদান করেন। মধুদান উপলক্ষে পঠিত 'মধুবাতা' ইত্যাদি মন্ত্রে সমস্ত জগতের সুখশান্তি কামনা করা হয়। পিণ্ডদান প্রসঙ্গে বংশ বৃদ্ধি ও ধন কামনা করা হয়। এ ধন কেবল নিজের ভোগের জন্য নয় পাঁচজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভোগ করিবার জন্য। তাই প্রচুর ধন কামনার সঙ্গে সঙ্গে অতিথির ও প্রার্থীর কামনা। কামনার তাৎপর্য এই যে অতিথি ও প্রার্থীতে দেশ ভরিয়া যাউক। বস্তুতঃ যাচ্ঞা প্রশংসার বিষয় ছিল না। তাই প্রার্থনীয় পূর্ণরূপ—'আমার কাছে প্রার্থী আসুক, আমার যেন কাহারও কাছে প্রার্থনা করিতে না হয়।' উচ্চ আদর্শের কথা কিছু না থাকিলেও মাতৃষোড়শীর মন্ত্রে পুত্রের জন্য মাতার বিবিধ দুঃখভোগের প্রাণময় বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। গয়াতীর্থে মাতার উদ্দেশ্যে ষোলটি পিণ্ড দেওয়ার অনুষ্ঠানের নাম মাতৃষোড়শী। যতদিন পুত্র জন্মগ্রহণ না করে ততদিন মাতার দুঃখ, গর্ভধারণকালে কষ্ট, প্রসবে কষ্ট, শিশুপুত্র নিয়া শীতে ও গ্রীষ্মে কষ্ট, পুত্র পীড়িত হইলে মাতার দুঃখ, পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতার কটুদ্রব্য ও কাথ ভক্ষণের দুঃখ, ক্রোড়স্থিত পুত্রের পদাঘাতের দুঃখ, পুত্রের শৈশবে মাতার অন্নগ্রহণের অসুবিধা, রাত্রে পুত্রের মূত্রপুরীষে মাতার ক্লেশ—এক একটি করিয়া এই সমস্ত দুঃখকষ্টের উল্লেখপূর্বক তার প্রতিবিধানের নিমিত্ত মাতার উদ্দেশ্যে এক একটি পিণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরই করা হয়। কিন্তু পিণ্ডদান ও তর্পণ আত্মীয়

অনাত্মীয় পরিচিত অপরিচিত জ্ঞাত অজ্ঞাত, ছোট বড় সকলের উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে। ইহাতে কোনও আড়ম্বর বা ব্যয়বাহুল্য নাই। তর্পণে মৃতের উদ্দেশ্যে এক এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল বা তিল মিশ্রিত জল দিতে হয়। ইহা প্রতিদিন অনুষ্ঠেয়। পিণ্ডদানে চালকলা, ভাতকলা বা ছাতুকলার বিল্বপ্রমাণ বা বদরীপ্রমাণ দলা নিবেদন করিতে হয়। সকল শ্রাদ্ধেই প্রথম অগ্নিদগ্ধ বা অদগ্ধ, পিতামাতা বন্ধুবান্ধবহীন ব্যক্তিবর্গকে একটি পিণ্ড দেওয়া হয়। ইহার নাম চলতি কথায় 'অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড।' তর্পণেও বান্ধব, অবান্ধব, অন্য জন্মের বান্ধব, নরকের যাতনায় নিপীড়িত, অতীত কুলকোটির সপ্তদ্বীপ নিবাসী পূর্বপুরুষগণ এবং আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত জগৎকে লক্ষ্য করিয়া এক এক গণ্ডূষ জল দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ষোড়শ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে তাহাতে ব্যাপকভাবে যাহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাঁহারা হইতেছেন পিতৃকুলে, মাতামহকুলে ও বন্ধুকুলে মৃত ব্যক্তিগণ যাঁহাদের সদগতি হয় নাই যাঁহারা দাবদাহে মৃত, সিংহ ব্যাঘ্র বা অন্যজন্তু কর্তৃক নিহত, যাঁহারা উদ্বন্ধনে মৃত, বিষশস্ত্রহত বা আত্মঘাতী, যাঁহারা অরণ্যে বা পথে ক্ষুধার্তৃষ্ণায় হত, যাঁহারা অনেক যাতনার মধ্যে প্রেতলোকে অবস্থিত, যমকিঙ্করদ্বারা নীত, যাঁহারা পশুযোনিগত পক্ষীকীট সরীসৃপ প্রভৃতি, যাঁহার বৃক্ষযোনিস্থিত, যাঁহারা কর্মফলে জন্মান্তর সহস্রের মধ্যে ভ্রমণশীল; মনুষ্যজন্ম যাঁহাদের নিকট দুর্লভ—স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে অবস্থিত মৃত ও অসংস্কৃত পিতৃপুরুষ ও বান্ধবগণ—বংশের পুত্র দারহীন লুপ্তপিণ্ড ব্যক্তিগণ, জন্মান্ধ, পঙ্গু, বিরূপ, ভ্রূণ, জ্ঞাত, অজ্ঞাত যাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য লুপ্ত—পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের ভৃত্য, আশ্রিত ও সেবক, বন্ধু, পশু, কীট, যাঁহারা দৃষ্ট, অদৃষ্ট উপকারী এবং জন্মান্তরে দাসদাসীগণ।

(১) বর্তমানে জাতিনির্বিশেষে অনেকেই দশদিনের বেশি অশৌচ পালন করেন না।

(২) বর্তমানে বাংলা দেশে এই দিনটি মহালয়া নামে প্রসিদ্ধ।। প্রাচীন গ্রন্থে মহালয়া নাম পাওয়া যায়; তাহার অর্থ করা হয় পিতৃপক্ষ বা আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। এই অমাবস্যার শ্রাদ্ধ পূর্বে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত। এখনও এই দিনটি সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে পরিগণিত।

(৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৯৫—৯৭), গরুড় পুরাণ (৮৮—৮৯) অধ্যায়।

# ভারতচন্দ্র

## দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতচন্দ্র যে একজন বড় কবি ছিলেন তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয় তিনি কবিতা না বলিয়া মুখ খুলিতে পারিতেন না অথবা কবিতা না লিখিয়া কালিতে কলম ডুবাইতে পারিতেন না। প্রকৃতিদেবী প্রতিনিয়ত নিজের ইতিহাস লিখিতে ব্যস্ত; কিন্তু তিনি কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচনের শক্তি দিয়া এই ইতিহাস লিখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই জন্য দেখা যায় প্রসিদ্ধ লেখকগণ কেবল লিখবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতচন্দ্রও শুধু কবিতা লিখবার জন্যই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর অনুভবশক্তি, শব্দের উপর অসামান্য প্রভুত্ব, আত্মপ্রকাশের অলৌকিক ধারা এবং ছন্দের উপর একছত্র আধিপত্য বাঙ্গালা কবিতায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং বাঙ্গালার কাব্যগগনে তিনি যে পরিমাণ জ্যোতি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী অনেকে অদ্যাবধি ঠিক সেরূপ করিতে পারেন নাই।

এইরূপ একটি বড় কবির জীবনী না জানি কতই কাব্যময় হইবে! কিন্তু সাধারণ লোকের কথায় তাঁহার জীবন একেবারেই কাব্যময় ছিল না। কবিমাত্রেই যে একটা ঔপন্যাসিক জীবনযাপন করেন তাহা নহে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের সকলেরই দারিদ্র, গার্হস্থ্য জীবনে অশান্তি, মনের মধ্যে চিন্তাকালিমার বিসদৃশ রেখা, অস্বাস্থ্য প্রভৃতি অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। হয়ত বায়রণের মত একটা কবির জীবনে উপন্যাস, রহোন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ কবির জীবন-ইতিবৃত্ত একটা দুঃখের ইতিবৃত্ত। অতএব দুঃখময়কে কাব্যময় যাঁহারা বলিতে প্রস্তুত তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক কবির জীবনীই কাব্যময়। দান্তের নির্বাসন, স্পেন্সারের গৃহদাহ, দুটি উদরান্নের জন্য বালক চ্যাটারটনের আত্মহত্যা, মাইকেলের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু ইত্যাদিতে যদি কাব্য থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে ভারতচন্দ্রের সর্বস্বান্ত হওয়া, স্বহস্তে একবেলা পাক করিয়া ব্যঞ্জনহীন ভাত দুইবেলা আহার করা, মাত্র বিবাহের দিনে স্ত্রীকে দেখিয়া প্রায় ষোল বৎসর উদাসীন জীবন যাপন করিবার পর স্ত্রীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাত, দুর্বৃত্তগণের চক্রান্তে বিনাপরাধে কারাবাসের মধ্যেও যথেষ্ট কবিত্ব আছে।

ভারতী দেবীর চিরকাল একটা কুখ্যাতি আছে যে যে ব্যক্তি তাঁর পদসেবা করে সে-ই দরিদ্র হয়। ভারতচন্দ্র রাজার সন্তান কিন্তু কবি বলিয়া দরিদ্র। তাঁহার গুণরাশিনাশী দারিদ্রের বিষয় প্রমাণ করিতে আমাদিকে অধিকদূর যাইতে হইবে না, ইহা তাঁহার নিজের মুখেই প্রকাশ 'বিদ্যাসুন্দর'-এ তিনি তাঁহার নিজের স্ত্রীর মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে  
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।  
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে  
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোকপড়ি সারে।

শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু
কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু।

কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য ও অন্যান্য যাবতীয় দুঃখকষ্টের বিষয়ে আমরা আর অভিযোগ করিব না। কিজানি তাঁহার বৈরাগ্য ও কারাবাস না ঘটিলে হয়ত আমরা 'অন্নদামঙ্গল' অথবা 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত জিনিস পাইতাম।

একজন ব্যক্তির রীতিমত বয়সের পূর্বে মস্তিষ্কের স্ফুরণ হইলেই যে তিনি ভবিষ্যতে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন একথা যদিও সকল ক্ষেত্রে সত্য নয় তথাপি দেখা যায় প্রতিভা শৈশব হইতেই তাহার ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ভারতচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বয়সে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া পারস্য ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় গোপনে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি একদিনে একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি লিখিতে পারিয়াছেন এবং তাহা যথেষ্ট মনোহারীও হইয়াছে। কথিত আছে এই সময়ে তিনি চৌপদীতে আর একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করেন। এই সময়ে তাঁহার কবিত্বশক্তি কেবল উপাদান অনুসন্ধান করিতেছিল। যখন তিনি বেগুন-পোড়াটা দিয়া স্বহস্তপচিত ভাত খাইতে থাকিতেন তখন হয়তো উর্বশীর রূপ বর্ণনা, শকুন্তলার স্বামীবিষয়ক চিন্তা, সাবিত্রীর যম দর্শন প্রভৃতির কবিতাবস্তুর খসড়ার ছবি তাঁহার মনের সম্মুখ দিয়া আলোকচিত্রের ন্যায় অভিযান করিত।

যে ফুলটি ফুটিয়া সুগন্ধে আজ কানন আমোদিত করিয়াছে তাহা একসময় কুঁড়ির আকারে ছিল; যে ঢেউটি এখন তীরে আসিয়া সজোরে ভাঙ্গিতেছে তাহা বহু পূর্ব হইতে একটু একটু করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে। ভারতচন্দ্র এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি লিখিয়া যে শক্তি অর্জন করিতেছিলেন তাহা পরিশেষ কলাপের আকারে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দরে' দেখা দিল। যখন তিনি বৈরাগ্য, কারাবাস ও অন্যান্য দৈন্যদশার ভিতর দিয়া নিজের দুর্বিসহ জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার শক্তি অন্তর্নিহিত অবস্থায় ছিল। তাহার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে সে শক্তি যেন পরিবর্দ্ধিত তেজে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, সুষুপ্ত সিংহ যেন সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল; তাঁহার রচনার প্রকার দেখিয়া আমাদের ইংরাজ সমালোচক হেজ্‌লিটের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা যায় যে প্রতিভার ক্রমোন্নতি নাই, প্রতিভা কিছুদিন ধরিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়া সহসা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হইয়া পড়ে।

ভারতচন্দ্র যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী সভাকবি ছিলেন ইহা তাঁহার পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা পড়িতে না পড়িতেই আমরা জানিতে পারি। কবিজীবনের ইহা আরও একটি বিসদৃশ ঘটনা যে কবিগণকে জীবিকার জন্য অন্যলোকের—অধিকাংশস্থলে মূর্খের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার চিত্ত সমর্থন করিতে হয়। অতএব কবি জীবিকার বিনিময়ে নিজের মনোবৃত্তিগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্রোতে কবি আর চলিতে পারেন না, সেগুলিকে কোনও একটা বিষয়ের অধীন করাইতে হয়। এজন্য ভুক্তভোগী কোল্‌রিজ বড়ই দুঃখের সহিত বলিয়া গিয়াছেন জীবিকার জন্য যেন কেহ কখনও কিছু না লিখে। ভারতচন্দ্রের সভাকবিত্ব আমাদিগকে

ইংরাজী সাহিত্যের অ্যাংলো স্যাক্সন সময়ের স্কোপাগণের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। স্কোপাগণ একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন, তাঁহারা কেবল পৃষ্ঠপোষকের গুণকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং বিনিময়ে অর্থ, জমি ও অন্যান্য পুরস্কার পাইতেন। এরূপ সভাকবিগুলির সমস্ত প্রয়াস পৃষ্ঠপোষকের চাটুবাক্য রচনাতে পর্যবসিত হইত। কিন্তু এবিষয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভূত গুণ ছিল যে তিনি ভারতচন্দ্রকে শুধু সেরূপ করিতে আদেশ করেন নাই। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের কাব্য বহুদিন পূর্বে ভ্রান্তির কবলে বিলীন হইত অথবা কেবল গবেষকের মনের একদেশে স্থান পাইত।

পক্ষান্তরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে অন্নদামঙ্গল প্রণয়নের অনুমতি দিলেন। নিপুণ চিত্রকরকে যে কোনও পট দেওয়া যাক না কেন সে তাহাতে নিজের কৌশল পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়া দিবে। এইরূপে যে প্রকৃত কবি তাকে সোফা, স্বর্গপুর প্রাপ্তি, হরগৌরী মাহাত্ম্য অথবা বিদ্যাসুন্দর যে কোনও বিষয়ই দেওয়া যাক না কেন সে তাহাতে অমরত্ব লাভ করিবে। বিদ্যাসুন্দরের গল্পের মত একটা তুচ্ছ উপাদান লইয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করা অমানুষিক শক্তির পরিচয়। কিন্তু অন্নদামঙ্গল রূপ বিষয় নির্বাচনের একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে ভারতচন্দ্রের এবং তাঁহার পূর্ববর্তী যুগে এবং শিব চরিত্রটী লোকের কল্পনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে যেমন রাজা আর্থারের কাহিনী অসংখ্য কবিকে কাব্যরসে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাঙ্গালায় শিব চরিত্রটীও ঠিক সেইরূপ এবং ইহা আজ পর্যন্তও যে কবিগণের কল্পনাকে একেবারে অতিক্রম করিয়াছে ইহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মনও রুদ্রের মূর্তিতে আচ্ছন্ন ছিল—'রুদ্র তোমার দারুণ মূর্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া,' 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ' ইত্যাদি। শিবের বিষয় কবিতা ও গান রচনা তখন যে একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ভারতচন্দ্রও যে সেই তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি আয়াসসাধ্য সাঁতারে অন্য সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' সাহিত্যজগতে একটী যুগান্তরকারী কীর্তিস্তম্ভ।

অন্নদামঙ্গল পড়িয়া অনেকে ভারতচন্দ্রকে চুরির (plagiarism) অপরাধে অভিযুক্ত করেন। অবশ্য মুকুন্দরামের নিকট তিনি যে প্রচুর পরিমাণে ঋণী একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু অন্যলোকের সহিত অসদৃশ হইলেই যে মৌলিক হয় একথা আমরা স্বীকার করি না। মৌমাছির মৌচাক অথবা বাবুই পাখির বাসা নির্মাণরূপ বিষয় ব্যতীত যদি অন্য কিছুকে আমরা মৌলিক না বলি তাহা হইলে কোনও মহৎ ব্যক্তিই মৌলিক নহেন এবং সাহিত্যের আদিম দুই-একজনের লিখিত পুস্তকগুলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। পরন্তু দেখা যায় সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিভা পূর্ববর্তীগণের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় খাতক এবং পরবর্তীগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় মহাজন। কবি যে তাঁহার যুগের সহিত একটা অসংলগ্ন বস্তু তাহা নয়, পরন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ তদানীন্তন দেশ-কাল-পাত্রের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ। অতএব তিনি ক্রান্তদর্শী না হইয়া পারেন না, এইরূপে দেখা যায় সমস্ত মৌলিকত্ব সম্বন্ধ সাপেক্ষ। চিন্তা কোনও বিশেষ একটী লোকের সম্পত্তি হইতে পারে না, যে তাহার অভ্যর্থনা অথবা ব্যবহার করিবে তাহারই। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের ঋণরূপে গৃহীত বস্তুতে

একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। লেখক সেগুলির উপর স্বীয় ছাপ দিয়া সেগুলিকে নিজস্ব করিয়া ফেলেন এবং এই ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'এ এমন ছাপ দিয়াছেন যে যদি আমরা তাহার কোনও স্থান হইতে কয়েকছত্র তুলিয়া মাঠের মধ্যে উচ্চারণ করি তাহা হইলে প্রতিধ্বনি উত্তর করিবে—ভারতচন্দ্র।

আমরা এরূপ বলিলাম বটে তথাপি মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের ঋণের পরিমাণ দেখিয়া আমাদিগকেও হয়ত একটা অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দোষ একেবারে ছিল না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞাধীন ভৃত্য মাত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র যখন কবিকঙ্কণের ভাষা ও রচনাপ্রণালীতে অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করিতে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন তখন তাহা না করিলে হয়ত তাহার অনাহারে প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও অধিক বিপদ আসিতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ তখনকার যুগে মৌলিক অপেক্ষা লৌকিক বিষয়ে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা অধিক ছিল। যদি তিনি প্রচলিত বিষয় না লিখিয়া স্বকপোলপ্রসূত একটী শ্রেষ্ঠতর কাব্যও লিখিতেন তাহা হইলে—তৎকালে বঙ্গদেশে সাহিত্যিকগণের আদরের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া—আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তাঁহার সেই কাব্যের পাণ্ডুলিপি কাহারও অন্নরন্ধনে কাষ্ঠাভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিত। তৃতীয়তঃ, তিনি যে সময়ে লিখিতেছিলেন সে সময়ের লোকেরা যাহাকে মৌলিকত্ব বলে তাহার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিল না।

মুকুন্দরামের নিকট হইতে মণিমাণিক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত স্বীয় প্রেরণা—সমুদ্ভুত ঐশ্বর্যগুলি যোগ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যাগার সর্বাংশে সমৃদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কি ভাষা, কি গল্প বর্ণনার কৌশল কি ছন্দ সমস্ত বিষয়েই তাঁহার পুস্তকখানি অধিকতর উন্নত ও লোভনীয় হইয়া উঠিল। তিনি মুকুন্দরামের রচনার সমস্তগুলিই প্রধানতঃ বজায় রাখিয়া কোথাও পরিবর্তন কোথাও পরিবর্দ্ধন করিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠকগণ এই দুইটী কবির শিবের বিবাহের বর্ণনা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।

গল্প-রচনা-চাতুর্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি সামান্য সামান্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করি তাহা হইলেও দেখিতে পাইব তিনি মধ্যে মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলিকা ছোঁয়াইয়াছেন তাহাও বড় মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ছন্দ বিষয়ে তাঁহার উন্নতি অপরিসীম। মুকুন্দরাম পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্য ছন্দে কবিতা রচনা করেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ছন্দের ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি যেখানে যে ছন্দটী বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেইখানে সেইটী ব্যবহার করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞ নাশে মুকুন্দরাম ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন, অবশ্য তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্যের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সেস্থানে ভারত যে তুনকছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ব্যঞ্জনা এরূপ যে কবিতাটী পড়িতে পড়িতে আমরা যেন সেইস্থানে বসিয়া ভূতপ্রেতগণের মারমার, খেরখার, হুপহাপ, দুপদাপ শব্দ, অট্টঅট্ট খট্টখট্ট ঘোর হাসি শুনিতে পাইতেছি। তাঁহার ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে শিবের দক্ষযজ্ঞ যাত্রা শিবের কি একটা প্রলয়ঙ্কর মূর্তিই-না আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়! মহারুদ্র যেভাবে সতী দে সতী দে সতী দে বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন তাহাতে মনে হয় যেন সতীকে না দিয়া আর রক্ষা নাই।

ইংরাজী কাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনেক বিষয়ে চসারের সহিত ভারতচন্দ্রের

সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। অন্নদামঙ্গল বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে তিনি অন্নপূর্ণা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুস্তক প্রণয়নে যত্নবান হন। বিনয় প্রচলিত রীতি, গ্রন্থের উপর সাধারণের ভক্তি আনয়ন, কবিতা রচনায় ঐশী অনুকম্পা সাপেক্ষতা ইত্যাদি যে কারণেই হউক প্রাচীন কবিগণের কাব্যে এরূপ একটা ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইংরাজ কবিগণ এ বিষয়টী ফ্রান্সের রোমান ডিলা রোজ নামক পুস্তক হইতে এত অধিক পরিমাণে অনুকরণ করিতে লাগিলেন যে অবশেষে চসার ও তৎকালীন প্রত্যেক কবির রচনাতে সেই নিদ্রা, সেই স্বপ্ন, সেই দেবতা কর্তৃক বর প্রদান এবং সেই নিদ্রাভঙ্গ নিরতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ইংরাজ কবিগণের তুলনায় ভারতচন্দ্রই ইহা কত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন দেখা যাউক—

অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে
স্বপনে কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে
অরে বাছা ভারত-শুনহ মোর বাণী
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তুষহ আমারে।
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত।
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে।
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা।

এই বিষয়টীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ভারতচন্দ্রের সমস্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মনোহর বর্ণনাচাতুর্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র। পাঠকগণ চসারের Legend of good women নামক পুস্তকের দীর্ঘভূমিকায় এই বর্ণনার অবিকল সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

অনেক লেখকের গ্রন্থ এত বৃহৎ যে পড়িতে পড়িতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এজন্য ঔপন্যাসিক স্কটের উপন্যাসগুলিকে কেহ কেহ ছাঁটিয়া ছোট করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র যথোচিত অনুপাতে গঠিত তাহাকে ছাঁটিয়া ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। পাছে গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়ে এজন্য তিনি লিখিবার কালে চসারের ন্যায় সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা দুই একটি শ্লোক উদ্ধার করিতে পারি—

"খুদমাখা কাদাখেড়ু নারিনু রচিতে
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে।"

"দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়
বুঝিবে পণ্ডিত চোর-পঞ্চাশী টীকায়।"

এস্থলে চসারের কাব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশ তুলনা করা যায়—

The wedding and the feste to devyese
Hit were to long, lest that I should slake
of thing that bereth more effect and charge
And fortoy to theffect then wol I skippe
And all the all the remenant I wol late hit slippe.

চসারের ন্যায় ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ তাঁহার ভাষা। যাহার চতুর্দশ বৎসর মাত্র বয়সে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ শেষ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার ভাষাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতাও আছে। যদিও জনপ্রিয়তার লোভে অধিকাংশস্থানে সাধারণ ভাষায় লিখিতেছেন তথাপি বৈচিত্র্য তাঁহার ভাষায় চরিত্রগত লক্ষণ। মিলটন অথবা মাইকেলের ভাষা পাঠ্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই উহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রধানতঃ বিদ্বান লোকের জন্য লিখিত। মিলটনের চরিত্র এবং প্রতিভা এত কঠোর ছিল যে তাহা নত হইয়া কখনও জনসাধারণের সমতলে আসিবে না। লোকে যদি চেষ্টার দ্বারা তাঁহার নিকটে উঠিতে পারিল তবে ভাল, নচেৎ তাঁহার কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয়তঃ মিলটন অথবা মাইকেল যে বিষয় এবং ছন্দ নির্বাচন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় লিখিতে হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রাক্ষরছন্দরূপ এত বড় একটা সাহায্য যখন ভারতচন্দ্রের দিকে আছে তখন তিনি ভাষায় বৈচিত্র্য দেখাইবার অনেক সুযোগ পাইয়াছেন। মাইকেলের ভাষা দৃঢ় ও কঠিন, ভারতের ভাষা কমনীয় ও নমনীয়; মাইকেলের ভাষা খাঁটি সোনা, ভারতের ভাষা কিঞ্চিৎ খাদযুক্ত অতএব অধিক কার্যকরী; মাইকেলের ভাষা স্বর্গীয়, ভারতের ভাষা লৌকিক। ভারতচন্দ্র ভাষা-চরিত্র এত গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন যে কাহার দ্বারা কোন কাব্য সম্ভব তাহা তাঁহার বিশেষভাবে জানা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বাক্যের বিস্তার ষড়্‌রসের উপর সমান পরিমাণে ছিল। মহাদেবের মহারুদ্র রূপের সঙ্গে তাঁহার ভাষা অলৌকিক গাম্ভীর্য ধারণ করিয়াছে আবার রতির বিলাপের সহিত তাঁহার ভাষা রতির হৃদয়ের কারুণিকতা লাভ করিয়াছে। মহাদেবের দক্ষযজ্ঞযাত্রা "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ইত্যাদি" অনেকবার উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার পুনরুক্তি করিব না, কেবল রতির খেদের কিয়দংশ পাঠকের সম্মুখে তুলনার জন্য উপস্থিত করিব—

আরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া
চরণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া।
আরেরে মলয় বাত তোরে হোক বজ্রাঘাত
ম'রে যারে ভ্রমরা কোকিলা

বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পালাইলা।

ভাষার উপর এইরূপ প্রভুত্ব লইয়া কবি বিষয়ে ইন্দ্রজালও তাঁহার নিকট সহজ হইয়া আসিল। যখনই তিনি বর্ণরাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতেছেন তখনই ভাষা ও ছন্দ তাঁহার দুইদিকে দুই হাত বাঁধিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহার অভ্রান্ত বর্ণনার জন্য ভাষা এবং ছন্দও অভ্রান্ত। তাঁহার তুলিকায় দুই চারিটি আঘাতে সম্পূর্ণ দৃশ্য উত্থিত হইয়া পড়ে এবং আমাদের মনে হয় আমরা সেই সেই স্থানে সেই সেই বস্তু দেখিতেছি তাঁহার কোনও একটি দৃশ্যের বর্ণনা পড়িয়া সেই সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা যে আরও একটি সম্পূর্ণ ও মনোহর বর্ণনা হইতে পারে ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার একটি অভ্যাস এই যে তিনি যখন যে জিনিষের নাম করিতে আরম্ভ করেন তখন তাহার শেষ না করিয়া ছাড়েন না। তাঁহার পঞ্চাশ প্রকার মৎস্যের নাম শুনিয়া আমরা এক বৃদ্ধ ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে কত প্রকার মৎস্যের নাম জানে। তাঁহার ফুলের বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে আমরা অসংখ্য ফুলের তীব্রগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। তাঁহার তিয়াত্তর প্রকার পক্ষীর নাম শুনিয়া আমরা মনে মনে জিজ্ঞাসা করি তবে কি তিনি পক্ষী-ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন? তিনি নিজে হয়ত একটা মাত্র ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইতেন কিন্তু অন্নপূর্ণার অসংখ্য ব্যঞ্জন যেন সর্বদা তাঁহার জিহ্বায় লাগিয়া রহিয়াছে! আমাদিগকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা হয়ত নিজের স্ত্রীর নামটাই ভুলিয়া যাই কিন্তু অন্নপূর্ণার নিকট যে এয়োগণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ১৯৯টির নাম তিনি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াছেন।

কি আদর্শ, কি বাস্তব উভয়রূপ বর্ণনাকলার উপর তাঁহার সমান অধিকার। অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ আদর্শ বর্ণনায় একটি সম্পূর্ণ মনোহর ছবি। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা ভারতচন্দ্রের বর্ণনার জন্য আমাদের কল্পনার চক্ষে আরও বিরাট আরও সম্পন্ন। আমরা একটি জিনিস শত শত বার দেখি তথাপি তাহা অবহেলা করি কিন্তু যেই মুহূর্তে তাহা চিত্রিত অথবা বর্ণিত হয় তখনই উহা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এইখানেই আর্টের সার্থকতা। অন্নপূর্ণা বুড়ি সাজিলেন। নিম্নলিখিত বর্ণনা অপেক্ষা একটি ভিখারী বুড়ির অধিক জীবন্ত বর্ণনা আর কী হইতে পারে?

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ি
ডানি করে ভাঙ্গণ লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ি
ঝাঁকরে মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি
কোটি কোটি কানকোটারীর কিলি কিলি
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে

বাতে বাঁকা সর্বঅঙ্গ পিঠে কুঁজা ভার
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার ॥

এমনকি যেখানে তিনি প্রধান গল্পটির স্রোতে দ্রুত চলিতে ব্যস্ত সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। যখন অন্নদার নিকট এয়োগণ আসিতেছেন তখন—

কার ছেলে কান্দে কার ছেলে চলে যায়
কার কোলে ছেলে কার ছেলে মাই খায়
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিনী
ঘন বাজে ঘুন ঘুন কঙ্কন কিঙ্কিনী
কেহ বলে এস সই চল সেঙাতিনী
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী
বড় মেজ সেজ বউ ন-বউ বলিয়া
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া
কেহ বলে রৈও রৈও পরে' আসি শাড়ি
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী
কার বেণী কারো খোঁপা কার এলো চুল
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল ।।

ভাষার স্বাতন্ত্র্যের সহিত ভারতচন্দ্রের রচনার রীতিরও একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল। আহার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ একটি রীতি থাকে সাহিত্যেও সেইরূপ। অনেক লেখক চিন্তা অথবা ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচনার রীতিটি একেবারে অবহেলা করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রীতিটিও একটি প্রধান জিনিস। ভারতচন্দ্র অনেক কথা বলিতে চাহেন না কিন্তু যাহা বলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে। পয়ার ছন্দে অনেকেই কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার স্বাতন্ত্র্য এইরূপ যে যদি ঐ ছন্দের সমস্ত বাঙ্গালা কবিতাগুলি একসঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহারগুলি অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যাইবে। তাঁহার পয়ারের প্রত্যেক শ্লোক অর্থও লালিত্য হিসাবে সম্পূর্ণ, তাহাদের শেষ শব্দের মিল তীক্ষ্ণ, পরিপাটিও চমৎকার। তিনি বেশী কথা অথবা বেশী গভীর কথা বলেন না; পাঠকের মনকে কল্পনার রথে চড়াইয়া একটা অজানা প্রদেশে ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার নাই, কিন্তু তিনি যেটুকু বলেন তাহা অতি পরিপাটি ও সঙ্গতভাবে। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উত্তম ভাবটি তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম কথার দ্বারা ব্যক্ত করেন এজন্য তাঁহার রচনাকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিবার প্রয়াস বৃথা। তাহার অপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট জিনিস পাইতে হইলে তাহার প্রকার পরিবর্তন করিতে হয়। তাঁহার গ্রন্থ বিশ্বকর্মা নির্মিত একটি বিরাট তাজমহল, পরিচ্ছেদগুলি তাহার স্তম্ভ ও প্রাচীর এবং শ্লোকগুলি মর্মরফলক স্বরূপ। শ্লোকগুলির একটি বাহির করিয়া লইলে মন্দিরটি যেরূপ শ্রীহীন দেখাইবে তাহার পরিবর্তে অন্য একটি বসাইলেও তদ্রূপ। বিশেষতঃ তাঁহার ভাষা ও রচনাপদ্ধতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে নয়, তাহাদের মধ্যে এমন একটা জিনিস অন্তর্নিহিত অবস্থায় আছে যাহা বাউল অথবা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের মত বাঙ্গালা দেশের একেবারে

নিজস্ব। আমাদের মস্তিষ্কের ধমনীগুলি এরূপভাবে নির্মিত যে তাহারা এরূপ বাক্য ব্যতীত অন্য বাক্যের পূর্ণ প্রতিধ্বনি করিবে না। এইজন্য ভারতচন্দ্র হইতে অনেক ছত্র আমরা একবার মাত্র পড়িয়া মনে রাখিতে পারি। তাঁহার রচনায় এইরূপ মনোহারী রীতি ও বর্ণনাকলার সীমাজ্ঞানের জন্য তাঁহার অনেক বাক্য প্রবাদবাক্যের সম্মানে সম্মানিত। সেগুলির ভাব, নিপুণ বিন্যাস, সহজ মহত্ত্ব ও ললিত ঝঙ্কার নিকষিত সুবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।
... ... ...
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
... ... ...
নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
... ... ...
মারীচ কুরঙ্গ রাবণের হাতে যথা
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার।
... ... ...
সহসা করিতে কর্ম ধর্মশাস্ত্রে মানা।
... ... ...
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
... ... ...
মিছা কথা সিঁচা জাল কতক্ষণ রয় ?

চসারের ন্যায় চরিত্র অঙ্কনেও ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র যদি একজন প্রসিদ্ধ কবি না হইতেন তাহা লইলে একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকার হইতে পারিতেন। লোকচরিত্র অধ্যয়ন তাঁহার প্রতিভার অন্যতম দিক। তাঁহাকে অনেকরকম লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে তিনি অনেক শঠ রাজকর্মচারীর হস্তে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এরূপ মন্দ ব্যবহার পাইয়াও তাঁহার উদার হৃদয় তাঁহাকে কোনও দিন সংসারের সম্বন্ধে একটা বিষময় ধারণা করিতে দেয় নাই। চসারের ন্যায় চরিত্রগুলির উপর তাঁহার অসীম সহানুভূতি বিদ্যমান। হীরা মালিনী—তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের পরাকাষ্ঠা। যাহার গাল গুয়াপানে ভরা, গলায় পাকি মালা, চূড়াবাঁধা চুল, পরিধানে সাদা শাড়ি এবং দেহে ছিটা-ফোঁটা সেই হীরা; যে বাতাসে ফাঁদ পাতিয়া কোন্দল ভেজায়, যে নানাছলে কথা কয়, মুচ্‌কি হাসিয়া মাজা দোলাইয়া ঘন ঘন হাত নাড়া দিয়া চলে সেই হীরা; এবং যে দোকানে তাহার মেকী টাকা দোকানদারের আসল টাকার সহিত মিশাইয়া দিয়া দোকানদারকে প্রবঞ্চক প্রমাণ করিয়া কাঁদিয়া নদী বহাইয়া দেয় সেই হীরা। হীরার বয়সটাতে যদিও চালশে ধরিয়াছে তথাপি একটা চেংড়াকে

দেখিয়া সে উদাসীনভাবে চলিয়া যায় তাহা নয়। সুন্দর যখন তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন সে একেবারেই খুশি হয় নাই। জনসাধারণের চরিত্র সম্বন্ধে হীরার নিজের চরিত্রই তাহার মাপকাঠি। সে নীল চশমা পরিয়া সংসারটাকে নীলবর্ণ দেখে। বিদ্যার সহচরীগণের মুখে এক, মনে আর, তাহারা ঠারেঠোরে কথা প্রচার করে জানিয়া বেচারা হীরা তাহাদিগকে দণ্ডবৎ করে।

হীরার কথায় হীরার ধার, আবার তাহার সাহিত্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আসিয়া যোগ দিয়াছিল। যে সময়ে যে কথাটি বলা দরকার হীরা তাহা একটা যথোচিত উপমা দিয়াও হৃদয়ে অনায়াসে প্রতিবিম্ব করিতে পারে। সে যখন সুন্দরের মোকদ্দমা লইয়া বিদ্যার নিকট আসিল তখন বিদ্যাকে উপদেশ দিতেছে যে যৌবনকালে যৌবনচিত কার্য না ঘটিলে বৃদ্ধ বয়সে তাহা অসম্ভব—নিদাঘ-জ্বালায় তরু জ্বলিয়া গেলে বরষা আসিয়া তাহার কী করিবে? সুন্দরের বিষয় বলিবার পর, বিদ্যার তিরস্কারের প্রত্যুত্তর স্বরূপ সে বলিতেছে "যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া সেইজন কহে চোর"। নিগ্রহের সময় হীরার উপস্থিত বুদ্ধি কোটালকে ডাকাতি ও জাতি নষ্টের অপরাধে অভিযুক্ত করিতেছে এবং কোটালের ঘরের যত কিছু অসৎ—সত্যই হউক মিথ্যাই হউক—কহিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইতেছে।

কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের সংঘটনে হীরা সর্বোতভাবে দোষী নয়, এজন্য হীরার প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি হয়। হীরা যে দোষটুকু করিয়াছিল নির্যাতনে তাহার শাস্তি হইয়া গিয়াছে, আর অধিক শাস্তি হওয়া উচিত নয়। রাজারও দয়া হইল, তিনি হীরাকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সুন্দরের আর একবার মালিনী মাসীকে মনে পড়িল, তিনি হীরাকে যথেষ্ট ধনরত্ন পুরস্কার দিয়া গেলেন।

ভারতচন্দ্রের এহেন এবং বর্ণিতব্য অন্যান্য ঐশ্বর্যগুলির বিষয় আমাদের দেশের যত লোক জানে, ভারতচন্দ্র যে অশ্লীল ইহা তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক জানে। তাঁহার অশ্লীলতা আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কাহাকে শ্লীল ও কাহাকে অশ্লীল বলা যাইবে? শ্লীলতার সীমা কোথায় শেষ এবং অশ্লীলতার সীমা কোথায় আরম্ভ হইয়াছে? তবে কি সমাজের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসুন্দরখানি পোড়াইয়া ফেলা উচিত? এ প্রশ্নগুলির উত্তর এই যে ভারতচন্দ্র কাহাকেও অসচ্চরিত্র করিতে পারেন না। যে খারাপ হইবে সে ভারতচন্দ্র না পড়িয়াও খারাপ হইবে এবং যে ভাল হইবে তাহার শরীরে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতায় শর কোনও ক্রিয়াই করিতে পারিবে না। এবং ভবিষ্যতে যদি তাঁহার গ্রন্থপাঠ নিবারণ করিয়া নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সে চেষ্টা একটি উন্মুক্ত স্থানে বাঁশের বেড়া দিয়া বায়ুরোধ করিবার মত হইবে।

অশ্লীল বলিয়া যদি ভারতচন্দ্র না পড়িতে হয় তাহা হইলে চসার শেক্‌স্‌পীয়র কালিদাস প্রভৃতি কবির গ্রন্থও বাদ দিতে হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারই বাদ চলিয়া যান। শেক্‌স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের মধ্যে যে অভিনয় আছে তাহা দেখিবার সময় হ্যামলেট ওফিলিয়ার কোলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া যেকথা বলিতেছেন অথবা চসারের 'নন প্রিস্‌টস্‌ টেল' পুস্তকে একটি কুক্কুট যে কথাগুলি কুক্কুটিকে বলিতেছে ভারতচন্দ্রের কথা কি তাহা অপেক্ষা আরও

অশ্লীল? তাহা হইলে আমরা তাঁহার অশ্লীল অংশগুলি বাদ দিয়া কেবল শ্লীল অংশগুলি লইয়া পুস্তকের সংস্করণ করিতে পারি। কিন্তু এখানেও আমাদের উপদেশ যেন ছাই ফেলিতে ফেলিতে আমরা সোনাটিও ফেলিয়া না দিই।

যেগুলিকে লোকে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা বলে সেগুলি তাঁহাকে আর এক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল—তাহা হাস্য। হাস্য ব্যতীত প্রতিভা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আমরা একেবারে বলিব যে ভারতচন্দ্রে অফুরন্ত হাস্য রহিয়াছে। মেনকা ও এয়োগণের মাঝে শিবের দিগম্বর বেশ, হীরা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার, নারীগণের পতিনিন্দা, রাজসভায় সুন্দরের পরিচয়দান, গর্ভ সম্বন্ধে বিদ্যার কৈফিয়ৎ প্রভৃতি স্থলে প্রত্যেক ছত্রে এত হাস্যরস সঞ্চারিত হইয়াছে যে তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের পেটে খিল ধরিয়া যায় এবং আমরা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে থাকি। মানবের মন স্বভাবতঃ পাপের পথে যাইতে চায় সেজন্য অশ্লীল কথাগুলি অধিক মনে থাকে অথবা ভারতচন্দ্রের রচনার কিছু মোহিনী শক্তি আছে বলিয়াই হউক তাঁহার হাস্যগুলি একবার মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে চায় না, চিরদিন সেইখানেই বাসা বাঁধিয়া থাকে। সুন্দরকে দেখিয়া একজন রমণী বলিতেছেন যদিও বিবাহের পর হইতে তাঁহার পতিসন্দর্শন ঘটে নাই তথাপি তাঁহার নিজের গুণে তাঁহার পতি পুত্রমুখ দেখিতে পান। তখন অপর একজন কুলীনের কন্যা বলিতেছেন তাঁহার বিবাহের সময় পণ্ডিতগণের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল তাঁহার বিবাহ আগে হইবে কিম্বা পুনর্বিবাহ আগে হইবে। রাণী বিদ্যার গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া রাজাকে বলিতেছেন—

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিলে নাতির মুখ
এড়াইয়ে ঝির বিয়া দায়।

অশ্লীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দোষটা ভারতচন্দ্রের উপর চাপাইয়া দেওয়া চলে না, পরন্তু তৎকালীন সমাজের রুচিও এজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী।

সে যাহাই হউক; যে দুইটি ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া ভারতচন্দ্র কবিতারাজ্য জয় করিতে আসিয়াছিলেন তাহার নাম ছন্দ ও অলঙ্কার। সংস্কৃত সাহিত্য ভাষার সহিত যদি এ দুইটি জিনিসও তাঁহাকে না দিয়া থাকে তাহা হইলে কিছুই দেয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার ভাষা অধিকাংশস্থানে সহজ। এরূপ সহজ ভাষার সহিত কিছু অলঙ্কার মিশ্রিত না থাকিলে উহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহার অলঙ্কার আভরণ, আড়ম্বর নহে। তাঁহার সাজসজ্জা ছিল কিন্তু তিনি বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার কবিতা কবিতা, বক্তৃতা অথবা শেষাক্ষরের মিল বিশিষ্ট বিভক্ত গদ্য নয়। অনুপ্রাস, যমক এবং অনুকার অন্যরূপ শব্দালঙ্কার তাঁহার কাব্যের নিত্য পরিধেয় বস্ত্র ছিল। মশানে সুন্দরের কালীস্তুতিতে তিনি অকার হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষ' পর্যন্ত প্রথমাক্ষর সংযোগে কালীদেবীর নাম করিয়া অনুপ্রাসের উপর যারপরনাই ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। অনুপ্রাসের আমরা যে কোনও স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি—

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

কমল পরিমল লয়ে শীতল জলে

পবনে ঢল ঢল উছল কূলে।

বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী

করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥

কুসুমে পুন পুন ভ্রমরের গুণ গুণ

মদন দিল গুণ ধনুক হুলে

যতেক উপবন কুসুম সুশোভন

মধুমুদিত মন ভারত ভুলে॥

ভিন্নার্থবোধক শব্দসমূহের পুনরাবৃত্তিকে যমক বলে। যমকের উদাহরণ যেথান সেখান হইতে উদ্ধার করা যায়—

"আটপণে আধসের কিনিয়াছি চিনি
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"
"অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়
অমৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়।"

অনুকার অব্যয় যথা—

চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে চমৎকার চমৎকার উপমাগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজের গ্রন্থের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও আমাদিগকে একটু সাবধানে কথা বলিতে হইবে। তাঁহার উপমাগুলি কেবলমাত্র অনুকরণ এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। তাঁহার নিকট একটি স্পর্শমণি ছিল, তিনি যাহা কিছু পাইতেন তাহাতে ঐ মণি ছোঁয়াইয়া সোনা করিয়া লইতেন। ভারতচন্দ্রের উপমা যে জানে না সে অন্যের উপমা ভাল বলিবে। গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে আমরা তাঁহার উপমা ও রূপকের উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া কৌষিকী-বন্দনা, লক্ষ্মী-বন্দনা, অন্নদার মোহিনী রূপ, বিদ্যার রূপ-বর্ণনা প্রভৃতিস্থল পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি।

আমরা এস্থলে তাঁহার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অলঙ্কারের পরিচয় দিব।

উৎপ্রেক্ষা—

সুন্দর হেন সময়

সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল ত্বরিতে

ভূমিতে চাঁদ উদয়।

বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়

সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ।

উল্লেখ— বিদ্যানামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

প্রতিযোগ— আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর
বুঝে দেখ প্রাণনাথ বিশেষ বিস্তর।
হাসিয়া সুন্দর ক'ন এ যুক্তি সুন্দর
তাই বলি চল প্রিয়ে শ্বশুরের ঘর।

অসঙ্গতি— উমার কেশ চামর ছটা, তোমার শালা বুড়ার জটা
উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ি শনের মুড়া।

দৃষ্টান্ত— দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার
হায় বিধি! চাঁদ কৈল রাহুর আহার।

ব্যতিরেক— কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদনখে প'ড়ে যায় আছে কতগুলা।

অর্থান্তরন্যাস— একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।

ব্যাজস্তুতি— সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধির নিপুণ দড়
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান
নাহি জানে ধর্ম নাহি জানে কর্ম
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।

অতঃপর ছন্দের কথা। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ছন্দ, বাঙ্গালা ছন্দ ভারতচন্দ্র। তাঁহার ছন্দবৈচিত্র্য দেখিয়া সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তিগণ হয়ত বলিবেন তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্য যে তাঁহার কর্ণ ও অভিরুচিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল একথা না বলিলে সত্য গোপন করা হয়। কিন্তু তাঁহার অলঙ্কারের ন্যায় ছন্দও কেবলমাত্র অনুকরণ নহে। বস্তুতঃ সেগুলি ছন্দবিষয়ে প্রেরণার গারমামণ্ডিত ফল। কবিতার মত ছন্দেরও একটা প্রেরণা আছে এবং সে প্রেরণা অনুকরণ হইতে একটি পৃথক বস্তু।

সংস্কৃত অথবা ইংরাজী পদ্য হ্রস্বদীর্ঘ বর্ণ, লঘুগুরু উচ্চারণ প্রভৃতি একটা মৌলিক নীতি অবলম্বনে রচিত কিন্তু বাঙ্গালা পদ্য রচনায় সেরূপ বিশেষ কিছু নিয়ম নাই, ইহাকে ইচ্ছানুরূপে হ্রস্বদীর্ঘভেদযুক্ত অথবা—বর্জিত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন রীতি বাঙ্গালা পদ্যে

প্রয়োগ করা উচিত তাহা আমরা এখানে আলোচনা করিব না, তবে ভারতচন্দ্র যে উভয়রূপ রীতিতেই পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ।

পয়ার ও ত্রিপদী বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ। ভারতচন্দ্র এ দুইটি ছন্দের বহুল প্রয়োগ করিয়াও কাহারও মনে কেবল ছন্দকে কবিতা বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে দেন নাই। সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদীর মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা যদিও খুব কম তথাপি ভারতচন্দ্রের নিপুণ হস্ত পাঠকের মনে কদাচ বিরক্তি আসিতে দেয় নাই। পয়ারের মধ্যে তিনি অষ্টম অক্ষরের পর যতি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং কদাচিৎ সে নিয়ম ভঙ্গও করিয়াছেন। খাঁটি পয়ার ও দুইরকম ত্রিপদী ছাড়া পয়ার ও ত্রিপদীকে ভাঙ্গিয়া এবং যদৃচ্ছাক্রমে মিশাইয়া তিনি হরেকরকম ছন্দের জন্ম দিয়াছেন। আমরা এরূপ মিশ্র ছন্দের কতকগুলি উদাহরণ দিব।

(১) ভঙ্গপয়ার—ভঙ্গপয়ারের প্রথম চরণ আট অক্ষরে গ্রথিত হয় ও তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল পয়ারের মত। যথা—

শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর।

(২) ভঙ্গলঘুত্রিপদী—ইহার দুই চরণে দুই পদ থাকে। এই দুইটি পদ আটটি করিয়া অক্ষরের সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল লঘুত্রিপদী। যথা—

হীরা বলে অরে বেটা　　তোরে ভয় করে কেটা
তোর গুণপনা　　জানে সর্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা।

(৩) ভঙ্গত্রিপদী—ইহার প্রথম চরণে দশটি অক্ষর বিশিষ্ট দুইটি পদ থাকে তাহাদের শেষাক্ষরের পরস্পর এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের শেষাক্ষরের সহিত মিল থাক। দ্বিতীয় চরণটি দীর্ঘত্রিপদী যথা—

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কন হানে　　অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে।

(৪) লঘুচৌপদী—ইহার প্রথম তিনটি পদে শেষাক্ষরের মিলবিশিষ্ট ছয়টি করিয়া অক্ষর থাকে চতুর্থ পদটিতে পূর্বপদত্রয় অপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক অক্ষর থাকে। যথা—

আহা মরে যাই　　লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই　　ভজি ইহারে
যোগিনী হইয়া　　ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া　　সাগর পারে

(৫) দীর্ঘললিত—ললিতছন্দ চৌপদীর মত কিন্তু প্রভেদ এই যে ইহার প্রথম দুই পদে মিল

থাকে, তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে। যথা—

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নানহেতু যেয়ো না লো যেয়ো না
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমল কানন পানে চেয়ো না লো চেয়ো না।

(৬) একাবলী—ইহার প্রত্যেক চরণে একাদশটি অক্ষর থাকে এবং পঞ্চম বা ষষ্ঠ ও একাদশতম অক্ষরে যতি পড়ে। যথা—

চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা
তোমার কাজে কি আমার হেলা ?

(৭) মালঝাঁপ—ইহার প্রতিচরণে চৌদ্দটি অক্ষর থাকে। প্রত্যেক চরণ চারি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম তিন খণ্ডের শেষাক্ষরের মিল হয়। যথা—

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে
ধরি বাণ খরসাণ হান হান হাঁকে।

উপরিউক্ত ছন্দগুলি কেবল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। মাত্রা ও অক্ষর উভয়ের মিলনে যে ছন্দগুলি তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

(৮) দোধক—ইহা একাদশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ। যথা—ভ ভ ভ গ গ।

(৯) কুসুমবিচিত্রা—ইহা দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ। যথা—ন য ন য।

(১০) ভুজঙ্গপ্রয়াত—ইহা দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ। যথা—য য য য।

(১১) তোটক—দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ। যথা—স স স স।

(১২) তুনক—ইহা পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ। যথা— র জ র জ র।

ভারতচন্দ্রের সমস্ত ছন্দগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে একটি পৃথক পুস্তক হইয়া পড়ে। আমরা সে ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

## অন্তিম অমর পর্ণটির জন্য

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ঈ।১৫

সমকালীন বাংলা কবিতা সম্পর্কে প্রতুল না হলেও, আলোচনা হয়েছে অল্পবিস্তর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কখনও অভিভাবকের তর্জন, কখনও অভিযোগের তর্জনী নির্দেশ, কখনও আসামী পক্ষের ঝাঁঝালো সওয়াল, কখনও বা পরস্পরের পৃষ্ঠ কণ্ডূয়ন এবং সর্বশেষে কিছু আত্ম-নিরীক্ষা ঘটেছে বিভিন্ন আলোচনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আলোচনা জ্যেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের নামের বৃত্ত ছাড়িয়ে যায় নি, ক্বচিৎ গবেষকের দৃষ্টি প্রোথিত হয়েছে বর্তমান সময়ের তরুণ ও তরুণতর কবি মানসের গভীরে। তাদের উৎকর্ষ ও উদ্দীপনা, বিচ্যুতি ও বিষাদ, বিভ্রান্তি ও উত্তরণের জন্য ব্যাকুলতা এবং এই সবের অন্তর্নিহিত কবিমানসের অস্থির জটিল প্রবাহের স্বরূপ অদ্যপি যথার্থ প্রতিবিম্বিত হয় নি। যোগ্যতর হাতে এই প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গচ্ছিত রেখে, আধুনিক কবিদের সম্পর্কে এক পাঠকের উচ্চাশা ও দাবী, নৈরাশ্য ও প্রশ্ন, বিশ্বাস ও ধারনা সবিনয়ে নিবেদিত বক্ষ্যমান আলোচনায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'শিল্প ও স্বাধীনতা' নিবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন: 'মনের চৈতন্যের ধারা না বদলাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে, এবং ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রম বিভাগে বাধ্য নয়, এমন কি এণ্ট্রোপি-র প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্থৈর্যটুকুও এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেক্সপীয়রের যুগ দূরের কথা, টেনিসন-এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষা, দম্ভ ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না…'

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও, সমকালীন তরুণ কবিদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। আজকের কবিদের কলম সত্যই আর অনায়াসগামী নয় এবং পূর্বতনকালের কবিদের থেকে তাদের দায়, দায়িত্ব অনেক বেশী। বর্তমানকালের একটি কবিতা সংকলনের সম্পাদকের মতে অসংখ্য বিরোধ অবিশ্বাস, ব্যতিক্রম, হিংসা, ক্রোধ, বৈরাগ্য, আসক্তি, ব্যঙ্গ, উন্মাদনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উল্লাস, প্রশান্তি, ঔদার্য, দ্বিধা, চপলতা, ক্লান্তি, সংশয়, নৈরাশ্য, অসহিষ্ণুতা, নির্মমতা, দুঃখ—নিয়ে আজকের বাংলা কবিতা। উল্লিখিত অনুভূতি বিষয়ে ব্যবসায়ী তরুণ কবিদের যুক্তিবাদী, অভিজ্ঞতা-সংপৃক্ত ও অনুভূতি অনূদিত কবিতা রচনার কঠিন সাধনায় ব্রতী হতে হয়েছে। তাদের আয়াস, যত্ন, মেধা ও নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু আবেগ নির্বাসন ব্যাপারেও আজকের কবিকে সতর্ক ও সচেতন হতে হয় কারণ শুদ্ধমাত্র যুক্তিবুদ্ধি ও অনুভব প্রয়োগের ফলে আজকের কবিতার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। পরিমিত

আবেগ কবিতার যৌবন এবং এই আবেগ কাল থেকে কালান্তরে হৃদয় হৃদয়ান্তরে প্রবাহিত এক দুর্মর মানব ধর্ম। কবি জানেন কি মন্ত্রে শুষ্কং কাষ্ঠংকে সজীব সবুজ করে তুলতে হয় এবং সেই শক্তি-ই কবিত্ব শক্তি। আমাদের এই ফুলভার নত বৃক্ষ শাখাটিকে নীরসতা থেকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা আজ তরুণ ও তরুণতর কবিদের কাছে।

কবিতার সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আত্মা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না তুলেই সম্ভবত বলা চলে কবিতা সৃষ্টিতে অধ্যবসায়, যত্ন, মেধা, চিত্রকল্প রচনার ক্ষমতা, ছন্দ ও ব্যাকরণে দক্ষতা, শব্দ নির্বাচন ও সংযোজনে চাতুর্য ও নৈপুণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন গুণরাশির পরও আরও দুটি জিনিস যথার্থ কবির নিকট খুবই জরুরী। একটি অনুপ্রেরণা, অন্যটি প্রতিভা। একটি যাদুদণ্ড, অন্যটি রত্ন প্রদীপ। সেই যাদুদণ্ডের স্পর্শে সব বরফ গলে যায়, বস্তুও পরিবেশের শুদ্ধ ও সুন্দর রূপ আবিষ্কারের হৃদয় ও চোখ খুলে যায়; সেই রত্ন প্রদীপের আলোতে তুচ্ছ ও মহিমময়, মূল্যবান হয়ে ওঠে, অভ্যস্ত ধ্বনি, রূপ ও ইঙ্গিত ছদ্মবেশ খুলে এক রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত করে দেয়।

প্রতিভার অনটন এ কালের বহুস্বীকৃত একটি তথ্য। তার জন্যে আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করবো। কিন্তু অনুপ্রেরণা? বস্তু জগতের অভিঘাতে ভাব জগতের রূপায়নের এক অলৌকিক প্রক্রিয়া কবি মানসের গভীরে ঘটতে থাকে। কবিকে অনুপ্রেরণা পেতেই হবে। তার অনুভবের এরিয়েল যখন হঠাৎ কেঁপে উঠবে, সে তার সাধা যন্ত্রে সুর তুলবে। সর্বদা নয়। অভ্যাসে, নিয়মাধিক আর যা-কিছুই রচনা করা সম্ভব হোক, কবিতা কখনো নয়। এই অনুপ্রেরণা কজন ভাগ্যবান কবির কাব্য রচনার উৎস? এটি আজ প্রথম আত্মজিজ্ঞাসা হোক—এই প্রস্তাব।

প্রতিভার বিচার সময়ের হাতে। কিন্তু অনুশীলনের দায়িত্ব কবির। অনুশীলনের মাধ্যমে কবিতার পরিশীলিত রূপ ফুটে ওঠে। অনেক সময় কবি নিজেই মনে করেন আরও সস্নেহ ও সতর্ক মার্জনায় কবিতাটির উৎকর্ষ ঘটতে পারতো; এই মার্জনার শিল্পোদ্যমের অভাব না ঘটুক। সরস্বতীর অর্ঘ অমলিন হোক।

একথা আজ তর্কাতীত যে অধুনাকালীন জটিলতা—রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি-গত বা শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভিঘাত কিংবা বস্তুগত অন্তর্লীন অনৈক্য ও পতনশীল মূল্যমান; আদর্শ, কল্পনা, অবচেতনার সঙ্গে পরুষ বাস্তব, অভাববোধ ও জড়ত্বের সংঘর্ষ আমাদের এমন আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করেছে যে এই হেতু হতাশা, বিক্ষোভ, অনীহা, ধূসরতা ও অনচ্ছতা প্রভৃতি আমাদের কবিতার শরীরে ও মনে প্রতিফলিত। এ-সব মেনে নিয়েও কবিকে এই সর্বব্যাপী কুয়াশার ব্যূহ ভেদ করতে হবে। এই জন্য বরং আরো সাহসী, তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী হতে হবে তাকে। এই কুয়াশা ও আপাত ফেনিলতার নিকট আত্মসমর্পণ ও এই কুয়াশার রূপ বর্ণনার হতাশায় আক্রোশে নিঃশেষিত হওয়া কাপুরুষতা। কবিকে অবশ্যই মধুনিমগ্ন মধুকরের নিয়তির উর্ধ্বে উঠতে হবে। বর্তমান কালের পরিবেশ, অনুষঙ্গ, অর্থনৈতিক অনৈক্য ও মহাকাশ বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পবিজ্ঞান সামগ্রীর ছায়া তার কবিতার রূপ বদলাবে, সময়ের আলোড়নকারী ও প্রভাবী রাজনৈতিক সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবের ঢেউ সে কবিতাকে স্পর্শ করবে, কিন্তু কবিতাকে তারপরও,

তারপরও আরো কিছু দেবার জন্য বিকশিত হতে হবে। এই 'আরো কিছু' কবির নিজস্ব সম্পদ, তা সময়ের ধুলি ঝড়ে হারিয়ে যায় না। তা সৌন্দর্য। তা চিরকালীনতায় সমর্পিত। পথের দুদিকে যা আছে, পথচারীকে তা দেখতে হবে, কিন্তু কোন জমকালো ভিড়ে থিতিয়ে গেলে ঐ পথের শেষে স্বর্ণ মন্দিরে আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কবি কি সেই স্বর্ণ মন্দির ভুলে থাকবেন? ভুলে থাকবেন পথিপার্শ্বের বিচিত্র সভার মুখ্য সভাসদ হয়ে?

কবিকে তাই প্রলোভন মুক্ত হতে হবে—এই দ্বিতীয় প্রস্তাব?

প্রশ্ন উঠবে: কিসের প্রলোভন?

বাইরের ঘরে আড্ডার প্রলোভন। চিত্রের প্রলোভন। রূপক, উপমা, প্রতীক, ধ্বনির প্রলোভন। আজকের কবিকে যুগপৎ বিলাসী ও সন্ন্যাসী হবার সাধনা করতে হবে। যাদুকরের খেলার পর করতালি, সেই করতালির পরও অনেক পথ যেতে হয় কবিকে, যেখানে সৌন্দর্য নিরলঙ্কার, সত্য নিরঞ্জন। সফেন ঢেউয়ের পর অগাধ সমুদ্র, রামধনু-কুহেলি বাষ্পের পর প্রগাঢ় নীলিমা। রামধনু, চিত্রিত মেঘ ও সফেন তরঙ্গের শোভা কি সৌন্দর্যের পূজারী কবি না দেখে থাকতে পারে? কদাপি নয়। কিন্তু তারপরও, তারপরও কবিকে দেখতে হয়। আরবণ হিরণ্ময় হলেও তা আবরণ—কবিকে সেই আবরণ উন্মোচন করতে হবে।

প্রকৃতি, মানব মন, সমাজ জীবন ইত্যাদির গভীরাশ্রয়ী যে বিচিত্র রূপ তা রূপাতীত সৌন্দর্যে কবির চোখে ধরা পড়ে, ধরা পড়ে 'ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে'। কবির অনুভূতি ও দেখার মধ্য দিয়ে আমরা সেই বিচিত্র রূপ আস্বাদ করবো। কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্যের সাধক এই কবি মনের বৈচিত্র্য আজ ক্ষীয়মান বলে যেন মনে না হয়; যেন মনে না হয় একই দর্পণে ভিন্ন ভিন্ন ছবি দেখছি আমরা। সমকালীনতার ও স্বাদেশিকতার ঐক্য মেনে নিয়েও এক একটি কবি এক একটি বিশিষ্ট কবি সত্বার আধার, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নিয়ে সকলেই যদি একই অর্কেষ্ট্রায় অংশ গ্রহণ করেন, আমরা ঐক্যতানের মধ্যে স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেলবো। এই স্বকীয়তার সাধনায় কবি তার অলৌকিক ভাব প্রকাশে অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক হবেন—এই আমাদের তৃতীয় প্রস্তাব।

বোদেলিয়রের নরক সাধনা, বীট কবিদের ঐতিহ্যবিহীন অহঙ্কার, আরোপিত ইউরোপ মনষ্কতা ইত্যাকার অগভীর কৃত্রিম সংস্কার ও রীতি ঝরে গেলে আত্মক্ষেত্রে সমাহিত, নিরীক্ষণশীল, সমাজের নিকট দায়বদ্ধ, সাহসী ও সৎ কবিকুল এমন কবিতা সৃষ্টি করবেন, যে কবিতায় তারা স্বকীয়ভাবে মিশে থাকবেন, স্বাদু ও সঞ্জীবনী পানীয়ে শর্করার মত।

কবি সমাজ—পরিবেশের দ্রষ্টা। তাকে জনসাধারণের, সমাজের হৃদয়ে আসন পেতে হবে, কোন অলীক গজদন্তমিনারে নয়। তাই অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতার উল্লেখ। কবি যা বিশ্বাস করেন না, অনুভব করেন না, গভীর থেকে যা উৎসারিত নয়—ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে কবিতা কখনও প্রকাশ করেন না। বক্তব্য বিষয়ে স্পষ্টতা ও দ্রষ্টব্য বিষয়ে স্বচ্ছতা সহসা অলভ্য, অনুশীলনে ও

গভীরতায় অর্জনীয় ; কিন্তু অর্জিত হলে আলংকারিক জটিলতা ও ভাবগত দুর্বোধ্যতার মুখোস খসে পড়ে। তখন তা নির্মল রৌদ্রের মত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, আলোকিত করে। অনেকে বলেন বর্তমান সময় গীতল কবিতার প্রতিকূলে। এটি সমাজ ও সাহিত্য গবেষকদের উপজীব্য হলেও, গীতল কবিতা সম্পর্কে তরুণতর কবিদের আনুকূল্য প্রার্থনা করে চতুর্থ প্রস্তাব পেশ করা হোল্। কবিতার ও সুরের দিন চিরকাল অফুরাণ। music of earth is never dead.

কবিতার সরলতা, গীতলতা ও পরিমিতি কবিতাকে পাঠকের হৃদয়ের বড়ো কাছে নিয়ে আসে।

আজকের কবিদের কাছে আমাদের অফুরন্ত আশা। রোগ জর্জর, দুখিনী মেয়ের সামনে এমন একটি কদমের সবুজ ডাল তাঁদের এঁকে দিতে হবে যার অন্তিম পর্ণটি হিমে, ঝড়ে, দুঃখের হিন্তাল স্পর্শেও ঝরবে না। সেই অন্তিম পত্রটি কৃত্রিম, কিন্তু সেই অসুখী মেয়েটির কাছে, বাঙ্গালী পাঠকের কাছে, সত্যের থেকেও সত্য। আর তা উপহার দিতে পারবেন আজকের তরুণ কবিরা—যারা যুদ্ধশেষের ক্ষতি, দেশ ব্যবচ্ছেদের শোক, ভ্রাতৃহত্যার আর্তনাদ, অনাহার ও অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রের বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ নিয়েছেন তাদের সুকুমার ও অনুভূতি প্রবণ চেতনায়। তাঁরাই সেই দুঃখের বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে সেই মৃত্যুমুখী তরুণীকে জীবনের সন্ধান দিতে পারবেন, যে জীবন সৌন্দর্যতৃষ্ণা, প্রত্যয় ও কল্পনায় চির-অপরাজিত ॥

বাসুদেব দেব

**আরও সূর্যের কাছে ॥** দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রদীপিকা, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

**হৃদয়ের গন্ধ ॥** সামসুল হক। নক্ষত্রের রাত প্রকাশনী, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

**রাত্রির টানেল থেকে ॥** কমল দে তরফদার। মানস প্রকাশনী, কলকাতা-১২। দু' টাকা।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুর খ্যাতি অন্যতম সাংবাদিক এবং কথাকার-প্রাবন্ধিক হিসেবে। কিন্তু বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ যে আকস্মিক বা অনধিকার নয় সে কথার প্রমাণ কবির দীর্ঘকালের কাব্যচর্চা এবং তাঁর আলোচ্য কাব্যসঙ্কলন 'আরো সূর্যের কাছে'।

'আরো সূর্যের কাছে' কবি দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রচিত কবির কবিতাবলী বর্তমান সঙ্কলনে স্থানলাভ করেছে।

দক্ষিণারঞ্জনের কাব্যগ্রন্থ কাব্যপাঠকের নিকট প্রত্যাশিত। কবি অবশ্য প্রারম্ভে স্বভাবসুলভ বিনয়ের আশ্রয় নিয়েছেন; 'এ আমার ইচ্ছের ফল নয়, অনেকের আগ্রহের।' বিভিন্ন ভাব ও ভাবনার মোট বাষট্টিটি কবিতা চয়িত হয়েছে বর্তমান সঙ্কলনে। কবিতাবলীর ক্রমপরিণতিতে পাঠক বিশেষ করে যে একটি আবিষ্কারে উদ্‌ভাসিত হবেন সেটি হলো বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে আদর্শবাদের সম্মিলন। প্রথম পর্যায়ের কিছু কবিতা বাদ দিলে কবি দক্ষিণারঞ্জন সর্বত্র সাবলীল, সংবেদনশীল:

'হৃদয়ে আগুন আছে সে আগুনে রয়েছে প্রত্যয়
ক্লান্ত সন্ধ্যা নিশিথের বোঝা অন্ধকার
পার হয়ে আসিবেই সোনালী সকাল।' (ময়ূরাক্ষী)

বহুবছর পূর্বে বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রাবন্ধিক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 'একালের একজন কবি' প্রসঙ্গে বর্তমান কবির কাব্যধারা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন: যাঁরা আধুনিকতার নামে এমন কিছু রচনা করেন যা 'ধূম-জ্যোতি সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ' না হয়ে ধূমজালের মতো আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে এবং যা শুধু অর্থহীনতা বা দুর্বোধ্যতার গুণেই এক শ্রেণীর পাঠক সমাজের বাহবা লাভ করে, তাঁদের কাব্য রচনার প্রয়াসকেই আমরা বিড়ম্বনা বলে মনে করি, আবার যাঁরা বাস্তবতার নামে ভোগ-সর্বস্বতারই জয়গান করেন, প্রেম যাঁদের চোখে একটা জৈব প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয়, ভালোবাসা ও রিরংসা যাঁদের অভিধানে সমার্থক শব্দ, তাঁদের কবিতাও কল্যাণের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট বলে আমরা মনে করি।···কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর কবিতায় এই সমাজ সচেতন মনের ও নিপীড়িত মানবতার প্রতি সমবেদনার পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই; আবার, তাঁর প্রেমের কবিতায় দেহ বা ভোগাকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি থাকলেও তা কখনো ভোগসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি।' বলা বাহুল্য, মানবতার প্রতি প্রবল বেদনাবোধ কবির কাব্যভাবনায় বিমূর্ত হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধির প্রশ্রয় অপেক্ষা ভাবনাকে হৃদয়ে আশ্রয়দানেই তাঁর লক্ষ্য :

'খুচরো দুঃখের স্তূপ
যদিই বা বিশাল পাহাড়, হীরের টুকরোর
মতো সুখই বা কী কম ? হয়তো কুহক !
তবুও যেটুকু পাওয়া তা নিয়েই খুশি
থাকা ভালো।'... ( এই জীবন )

কবি দক্ষিণারঞ্জন সাম্প্রতিক অনুভাবনাকে সময়ের স্বাক্ষর হিসেবে বর্জন করেন নি। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের ঘূর্ণাবর্তে বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর মনচিত্র এবং মানচিত্র যখন বদলাচ্ছে তখন কবি উচ্চারণ করেন :

'পৃথিবীতে ছিলো প্রেম প্রাণে ছিলো অনেক প্রত্যাশা,
আজ দেখি মানচিত্রে একেবারে সব এলোমেলো ;
আমারো মনের রাজ্যে অকস্মাৎ ওলটপালট !
( শ্রীমতীর চোখে ঘুম, নিরিবিলি একা সে ঘুমাক। ) (পরিক্রমা)

'অরণ্যকাল,' 'একটু নীলের স্পর্শ,' 'অন্তরূপা' 'নদী সমুদ্র ইত্যাদি,' 'অক্ষয়বট,' 'চীন : ১৯৬২,' 'আমার দেশ, আমার হৃৎপিণ্ড,' ইত্যাদি কবিতায় এক আশ্চর্য মমতা, এক অন্তর ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে। এক গভীর বেদনাবোধ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে যখন চীনা হামলায় তিনি বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন :

যাদের হয়ে আমরা অনেক লড়েছি,
যাদের হয়ে আমরা অনেক বলেছি,
আমরা যাদের প্রায় দু'হাজার বছর ধরে
পরমবন্ধু বলে মনে করে এসেছি,—
এই কি সেই দেশ ?
হিউয়েনসাঙ, তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক !
রবীন্দ্রনাথ, তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক ! (চীন : ১৯৬২)

প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষের নবজন্মলাভে কবি বিশ্বাসী। তিনি আশাবাদী। কবির দৃষ্টিতে প্রেমের সাধনা রূপান্তরের সাধনা ব্যতীত কিছু নয়। প্রাত্যহিক দুঃখ, ও অন্ধকারের মধ্যে কবি সেজন্য আশার কথা পরিবেশনেই মনোযোগী। দেশ ও সময়রেখাকে ছাড়িয়ে তিনি অন্যতর জগতে সেজন্য বিচরণ করতে পেরেছেন। কাব্য পাঠক 'আরো সূর্যের কাছে' পাঠ করে উৎসাহিত হবেন বলা যেতে পারে।

'হৃদয়ের গন্ধ' সামসুল হকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমেই উৎসাহী কাব্য পাঠকের নিকট কবি সামসুল হক ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন বর্তমান সংকলনের ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সময়কাল পর্যন্ত কবির রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমান সংকলনে কবির মোট বিয়াল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি বিভিন্ন ভাবের, কিন্তু তাঁর সামগ্রিক কাব্যশরীরে এক অভিন্ন রোমন্টিক মূর্চ্ছনা উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে :

'পৃথিবী আঁধার হ'লে তুমি যেন তারার শরীর :
বেদনায় নম্র হয়ে যার ফুল আমার হৃদয়ে
ঝ'রে গিয়ে স্থির হয়,—
অযুত বছর ধরে—অযুত নিশীথ ধরে—
অযুত নারীর চোখে বাংলার ছবি।'　　　( পৃথিবী আঁধার হলে )

কবির প্রশান্তি এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ; ভাব সম্মিলন আশ্চর্য লঘুপক্ষ বিস্তার করে রূপকল্পের আশ্রয়ে পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এবং,

'তোমরা পালিয়ে যাও প্রেমের একটু আগে ওই
বাগানের অন্ধকারে সাবধান ওখানেও সাপ থাকতে পারে
কে কাকে ডাকবে বলো অতএব অনর্থক কোনো হই-চই
ভালো নয় প্রেমের একটু আগে ওগো বন্ধু মুখ ঢেকে ফেলো।'
( ঘুমের একটু আগে : প্রেমের একটু আগে )

সামসুল হকের বর্তমান কাব্যগ্রন্থে বিষয়ের বৈচিত্র্য বিরল নয়। ক্ষেত্র বিশেষে আশ্চর্য বিষয়, নাটকীয় অনুচিন্তা তৎসহ অপূর্ব কিছু চিত্রকল্প দুর্লক্ষ্য নয়। তবে কিছু পরিমাণে অযত্নবিন্যস্ত চিত্রকল্প যেহেতু অনুভব উপস্থাপনার পরিপন্থী সেহেতু এ বিষয়ে আমরা কবির ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁকে মনোযোগী হতে অনুরোধ জানাবো। সামসুল হক নাটকীয় ভঙ্গীতে, ছোট গল্পে ব্যঞ্জনায় বারংবার অপূর্ব কিছু বলতে সচেষ্ট হয়েছেন, ক্ষেত্র বিশেষে কবিতার আবহাওয়া রচনায়ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন কিন্তু কবিতার শরীরে নিবিড় সজীবতা আনতে পারেন নি। এ বক্তব্যের অন্যতর উদাহরণে 'নগ্নসুন্দর', 'আমি একটি শিশু ও তার মা', 'মধুমতী', 'জেবুন্নিসা', 'সদ্য বিধবার উক্তি থেকে', ইত্যাদি। কিন্তু পাশাপাশি 'রূপসীর খেদ', 'শব্দের প্রত্যাশা', 'ঈশ্বর একটি কবিতা', 'পাগলটা', 'নির্বাসিতের লিপি', 'শবরী' কিংবা 'পয়লা পৌষ যার জন্মদিন' প্রভৃতি রচনায় 'হৃদয়ের গন্ধ' গ্রন্থের কবির মধ্যে আমরা নানাবিধ প্রতিশ্রুতি আবিষ্কার করতে পারি। বলা বাহুল্য উপরিউক্ত কবিতাগুচ্ছে এক ভিন্নতর কাব্য রসাস্বাদে পাঠক উৎসাহিত হবেন। বিশেষতঃ কবি যখন বলেন,

'তাকে যদি কবিতা বলি, না-জানা নির্ঝর :
একটি সুঠাম নিবিড়তম কবিতা ঈশ্বর।'　　　(ঈশ্বর একটি কবিতা)

ঈশ্বর শব্দটি সামসুল হকের কাব্যে একটি প্রতীকী আশ্রয়। এই ঈশ্বর কখনো প্রসন্নপরম কখনো নিবিড়তম কবিতা, কখনো সুহৃদ, কখনো ঈশ্বর···। ব্যক্তিস্বাক্ষরতার দিকে, অন্যতম তরুণ কবি সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সামসুল হকেরও প্রবণতা লক্ষণীয়। বিষয়টি অবশ্য দোষণীয় নয়—সুবিধে এই কাব্যশরীর নায়ক নায়িকা নির্ভর হওয়ায় নতুন মুড বা মেজাজের সূচনা করে। পরিশেষে উল্লেখনীয় গ্রন্থের মেরুদণ্ড 'হৃদয়ের গন্ধ' কবিতাটি। পাঠক এই দীর্ঘ কবিতাটি নিশ্চয় উপভোগ করবেন। সুখের কথা কবিতাটি আঙ্গিক সর্বস্ব নয়, পরিশীলিত কাব্যচর্চার নিদর্শন। ভূমিকা ব্যতিরেকে চৌদ্দটি অংশে কবিতাটি সমগ্র সংকলনের পারিজাত। কবির ভাবনা এখানে বিশিষ্ট পরিমণ্ডল রচনার সহায়ক ; বিশেষত যখন তিনি বলেন :

'কলকাতা কতো দূর—যেখানে বন্ধুরা আছে, আর সেই গ্রাম কতো দূর
যেখানে শিল্পীর সখী ক্ষমা ঘৃণা ইত্যাদির তুই হাতে দশটি আঙুলে
আগুন জ্বালাচ্ছে আর কেউ কোথা নেই দেখে রঙশুদ্ধ একটি ঘুঘুর
শরীরে প্রবেশ ক'রে কি কান্না কাঁদছে ত্যাখো জ্বালাময়ী ডানা তুটি খুলে। (হৃদয়ের গন্ধ)

'রাত্রির টানেল থেকে' তরুণ কবি কমল দে তরফদারের প্রথম কাব্য সংকলন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত রচিত মোট একুশটি কবিতা তাঁর বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। আলোচ্য আলোচনা পর্বে কমল দে তরফদার অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি, কিন্তু তাঁর কাব্য-ভাবনায় এমন একটি উষ্ণতা সঞ্চারিত যা কাব্য পাঠককে কিছু পরিমাণে কাছে টানবে। তবে কবি যেহেতু অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং যেহেতু তিনি এখনো নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিরত সেহেতু আগামী কালে তাঁর কাছে আমাদের পূর্ণতর ফসল প্রাপ্তির আকাঙ্খা সংগত কারণেই বিদ্যমান।

'রাত্রির টানেল' থেকে কবিতার আঙ্গিকে সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের সুনিপুণ ছলাকলা অবর্তমান। সহজ ভাবনাকে সহজ কথায় রূপদানের প্রতিই কবির আগ্রহ। তবে যেক্ষেত্রে তিনি আঙ্গিক সর্বস্ব হবার চেষ্টা করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বকীয়তা হারিয়েছেন; ফলত বক্তব্য প্রকাশে অনর্থক জটিলতার আশ্রয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন।

'রাত্রির টানেল থেকে' কবিতার মূল সুর রোমান্টিকতা। প্রকৃতি ও তৎসহ প্রেম কবিতাবলীর উপজীব্য হলেও মধ্যবিত্ত সমাজের তথাকথিত জীবনের যন্ত্রণা কবির ভাবনায় সহৃদয়তার সঙ্গে নিবেদিত :

'এখন সেদিন হারিয়ে গেছে
আমি পলাতক!
সুনীল হরিণ হারিয়ে গেছে
দীর্ঘ শ্বাসের মাঝে;
এখন বুনো মহিষ আসে
শিং উঁচিয়ে তেড়ে,
মুহুর্মুহু তীরে আঘাত
হৃৎপিণ্ডে বাজে।' (নীল হরিণ)

কবি দিন বদলের, সময়ের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করেছেন; কবি জেনেছেন 'আমাদের দৃষ্টি সরে গেছে | আমরা অন্য সুরে বলি | অন্যভাবে দেখি, সাজি, চিন্তা করি | অন্যভাবে চলি' এবং পরমুহূর্তেই তীব্র বেদনায় উচ্চারণ করেন :

'বৈশ্যকুল রাজসিংহাসনে;
বাতাসে কাগজী নোট ফুঁ দেয়;
কাঙালীরা আনাচে, গলিতে কোণে,
রাস্তায়, পায়ের তলায়
হাত পাতে, বড় চোখে চায়—
ছুড়ি নাড়ে সন্তর্পণে। (সানাই)

আলোচ্য সংকলনের 'সমাপ্ত,' : 'অপুর মন তুপুরে' 'অপুর মন : সন্ধ্যায়,' পূবের হাওয়ায়' ইত্যাদি নিপুণতার সৌকর্যে পাঠক-হৃদয়কে আন্দোলিত করবে। 'কাম সেপ্টম্বর' তীর্যকী অনুচিন্তার ফসল; অন্যান্য কবিতায় কাব্যিক মেজাজ একান্ত তুর্লভ না হলেও কাব্যভাবনা ও পরিশীলিত প্রতিবেদনের ফলশ্রুতি নয়। ভবিষ্যতে আমরা কবির দক্ষতর কবিকর্মের সাগ্রহ প্রত্যাশা করছি।

**ইন্দ্রনীল সেন**

সমকালীন
দ্বাদশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭১
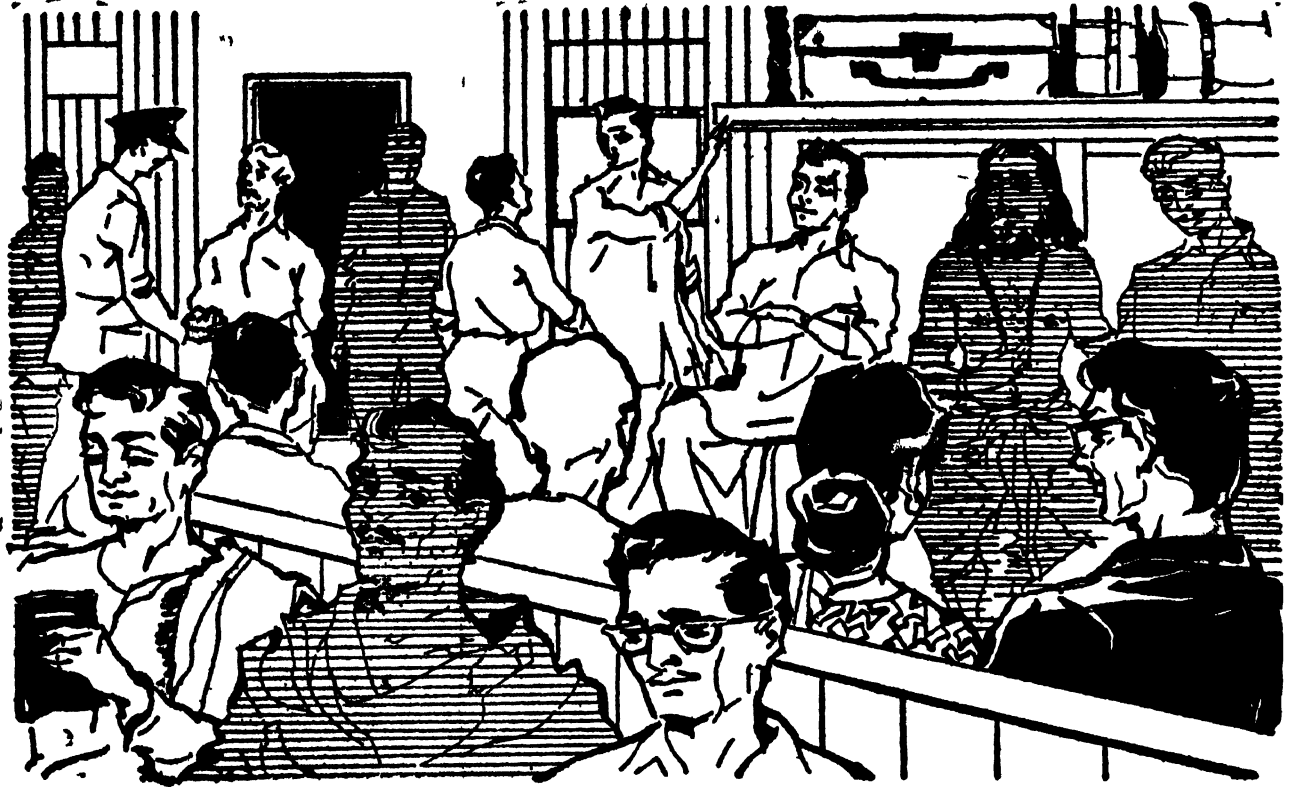
## পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

**বাংলার উৎসব**
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
১·২৫

**বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য**
নৃত্যবিদ্ শ্রী মণি বর্ধন
২·৯০

**বাংলার শিকার প্রাণী**
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩·০০

**পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা**
শ্রী আশীষ বসু
১·২৫

**চিত্রে ভারতের ইতিহাস**
৪·৬২
ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

**গান্ধী রচনাবলী**
১ম খণ্ড ( ১৮৯৪—১৮৯৬ )
২য় খণ্ড ( ১৮৯৬—১৮৯৭ )
প্রতি খণ্ড—৫·০০

---

**স্থানীয় বিক্রয় কেন্দ্র**

প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র

নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেষ্টিংস স্ট্রীট
কলিকাতা—১

**ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা**

প্রকাশন শাখা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড
আলিপুর, কলিকাতা—২৭

W.B.(P) Adv. D 1117(4)/65

মজুদকারী ও মুনাফাশিকারীদের লোভ দমিত রাখার জন্য আমি কি করতে পারি ?

প্রত্যেক ব্যবহারকারি নিজেকে সাহায্য করার জন্য সরকারকে সাহায্য করতে পারেন। এখন যা প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী কিছুতেই কিনবেন না। তা যদি করেন তাহলে তা প্রায় মজুদ করার পর্য্যায়ে পড়বে এবং তা মুনাফাশিকারীদেরই সাহায্য করবে।

DA 64/F8 | Beng.

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

হরিহর মিশ্র ॥ **কান্তা ও কাব্য** ৫·০০

রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ **কবি স্বরূপের সংজ্ঞা** ৪·০০

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ **চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি** ১২·৫০

ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি ॥ **চৈতন্য পরিকর** ১৬·০০

॥ রবীন্দ্র সাহিত্য ॥

বিমানবিহারী মজুমদার
**রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান** ৬·০০

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
**রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়** ১০·০০

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
**রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য** ১০·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
**শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী** ৫·০০

ধীরানন্দ ঠাকুর
**রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা** ১২·০০
**রাবীন্দ্রিকী** ৪·৫০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
**সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ** ৪·০০
**রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য়** প্রতি খণ্ড ৬·০০

॥ মনোরম সমালোচনা ॥

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
**বিষ্ণুপুর ঘরাণা** ৫·০০

মোহিতলাল মজুমদার
**শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র** ১০·০০

শিশির দাশ
**মধুসূদনের কবি মানস** ২·০

অহীন্দ্র চৌধুরী
**বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরীশচন্দ্র** ৫·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
**বিদেশী ভারত সাধক** ৩·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর
**বাংলা উচ্চারণ কোষ** ৩·০০

গোপালদাস চৌধুরী

অসিতকুমার হালদার
**রূপদর্শিকা** ১·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
**অনুন্নত দেশের অর্থনীতি** ৫·২৫

প্রিয়রঞ্জন সেন
**প্রবাদ বচন** ৬·০০

**বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

দ্বাদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

# বিষ্ণু সীতারাম সুখ্‌ঠন্‌কর

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে এক গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে বিষ্ণু সীতারাম সুখ্‌ঠন্‌কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সীতারাম সুখ্‌ঠন্‌কর একজন পূর্তবিদ (ইঞ্জিনীয়র) ছিলেন। বোম্বাই-এর মারাঠা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে অতি কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণু সীতারাম বোম্বাই-এর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবিষ্ট হন। এখান হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ১৯০৩ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেম্‌ব্রিজের সেণ্ট জনস্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন। কেম্‌ব্রিজে তিনি বিশেষভাবে গণিত অধ্যয়ন করেন ও পরে গণিতে কৃতিত্বের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রী অর্জন করেন। কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা শেষে সুখ্‌ঠন্‌কর এডিনবরায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন অধ্যয়নের জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বার্লিনে তিনি কয়েকজন স্বনামধন্য ভারত বিদ্যাবিশারদের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। ইহাঁদের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর লুডর্সের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্লিনের অবস্থানকালে সুখ্‌ঠন্‌কর জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটির পত্রিকায় (Z. D. M. G.) মম্মটের কাব্যপ্রকাশ সম্বন্ধে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১)। নানা অজ্ঞাত তথ্যপূর্ণ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সমন্বিত এই প্রবন্ধগুলি প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ শাকটায়ন রচিত ব্যাকরণের একাংশ অধ্যায়-১ পদ-১) ও যক্ষবর্মন রচিত এই ব্যাকরণের টিকা জার্মান অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ্, ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (২)

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুখ্‌ঠন্‌কর প্রথমে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থা হইতে একটি গবেষণা-বৃত্তি লাভ করেন, পরে তাঁহাকে এই সংস্থার পশ্চিম বিভাগীয় অঞ্চলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়।

১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থার কর্মীরূপে সুখ্‌ঠন্‌কর মধ্য ভারত পশ্চিম অঞ্চলের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি উদ্ধার করেন। স্বয়ং এইগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত তথ্য ঐতিহাসিকদের গোচরীভূত করেন। সুখ্‌ঠন্‌কর রচিত বিভিন্ন লিপিমালার ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধাবলী প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত পুরাতত্ত্ব সংস্থার দুইটি প্রতিবেদনও তিনি লিপিবদ্ধ করেন ( ৩ )।

১৯১২ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী তেরখানি অপ্রকাশিত পূর্ব পুঁথি আবিষ্কার করিয়া এইগুলি ত্রিবেন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভাসের নামযুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন। কালিদাস, বানভট্ট প্রভৃতি কবির রচনায় ভাসের নাম একজন প্রতিভাশালী প্রাচীন কবিরূপে উল্লিখিত থাকিলেও এযাবৎ ভাসের কোনও রচনা পাওয়া যায় নাই বা প্রকাশিত হয় নাই। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণবশতঃ ভাসের অস্তিত্ব ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে স্বদেশের ও বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সবিশেষ অবহিত হন। বিজ্ঞানের ( গণিত ) ও ভাষাতত্ত্বের তীক্ষ্ণধী ছাত্র সুখ্‌ঠন্‌কর এই সময়ে ভাস সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়া এই বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন ( ৪ )। এই সব প্রবন্ধে ভাসের নাটকের কাব্যাংশের ছন্দ, চারু দত্ত ও মৃচ্ছকটিকের সম্পর্ক, ভাসের রচনায় উপকরণ, ভাসের নাটকের প্রাকৃত ভাষা, ভাষা সমস্যার সমাধান প্রভৃতি নানা বিষয় সম্যগ ভাবে আলোচিত হয়। সুখ্‌ঠন্‌করের এই রচনাগুলি ভাসের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিল। অতঃপর সুখ্‌ঠন্‌কর একজন ভাস-বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুখ্‌ঠন্‌কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ও তথায় বাস করেন। এই সময় তিনি এই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-বিদ্যার নানা বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

ভারত-বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজ্যের পুণা নগরীতে প্রসিদ্ধ ভারতবেত্তা পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের নামানুসারে ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রায় ২০০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহাভারত প্রচলিত আছে, উহাদের মধ্যে যেমন লিপির পার্থক্য আছে, তেমনি নানাস্থানে ভাব এবং ভাষারও পার্থক্য আছে। বহুস্থলে উত্তর ভারতে প্রচলিত পাঠগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত পাঠের গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। ইতিপূর্বে মহাভারতের যতগুলি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সব অঞ্চলের পুঁথিগুলি মিলাইয়া শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করা হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উইণ্ট্যরনিংজ্, লুডর্স প্রমুখ ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই জন্যই মহাভারতের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের

চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টল ইনষ্টিটিউট দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই বৎসরের এপ্রিল মাসে স্বয়ং ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই কার্যের উদ্বোধন করেন। চারবৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের পর ভারতের নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত পুঁথি মিলাইয়া ডাঃ নারায়ণ বাপুজী উৎগিকর এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিরাট পর্বটি নমুনা সংখ্যা (Tentativo Edition) হিসাবে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এইটি পৃথিবীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিদ্বৎসংস্থাগুলিতে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য সংস্করণগুলি অপেক্ষা উন্নততর বিবেচিত হইলেও ইহা বহু পণ্ডিতের মনঃপূত না হওয়ায় কার্যপ্রণালী আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন লিপি বিশারদ, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ও ভারত বিদ্যার ক্ষেত্রে যশস্বী পণ্ডিত ডাঃ সুখ্‌ঠন্‌করকেই এই কার্যের উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রামাণ্য সংস্করণের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ডাঃ সুখ্‌ঠন্‌কর সানন্দে এই কার্যভার গ্রহণ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ১৭ বৎসরকাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব বহন করেন। ১৭ বৎসরকাল মহাভারত সম্পাদনের কাজে সুখ্‌ঠন্‌কর নিজেকে এমন ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন যে তিনি অতঃপর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আর স্বাধীন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। মহাভারত সম্পাদন কার্য গ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই সুখ্‌ঠন্‌করের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মুখপত্রটির (Anuals) প্রকাশ আরম্ভ হইলে প্রথম দুইবৎসরকাল সুখ্‌ঠন্‌কর উহার অন্যতম যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন।

মহাভারত সম্পাদনের কার্যভার গ্রহণ করার দুইবৎসর পর পঞ্চাশখানি বিভিন্ন লিপিতে লিখিত পুঁথিগুলির প্রতিটি শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিচারান্তে সুখ্‌ঠনকরের সম্পাদনায় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আদি পর্বের প্রথম দুই অধ্যায় প্রকাশিত হয়। গৃহীত মূল পাঠের সহিত উল্লেখযোগ্য পাঠান্তরগুলিও ইহাতে সংযোজিত হয়।

১৯২৮ হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রতিবৎসর আদিপর্বের বাকী অধ্যায়গুলি পর্যায়ক্রমে এক একটি ভাগে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আদিপর্বের অবশিষ্ট অংশ পরিশিষ্ট, টিকা ও সংযোজনী সহ সুখ্‌ঠন্‌করের নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের উপক্রমণিকা (prolegomena) শীর্ষক সার্দ্ধশত পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুতের কাজে যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে সুখ্‌ঠন্‌কর তাঁহার ব্যাখ্যান প্রকাশ করেন। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন কার্যের দিগ্‌দর্শনী হিসবে সুখ্‌ঠন্‌কর কৃত এই Prolegomena পণ্ডিত সমাজে প্রভূত আদরণীয় হইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সুখ্‌ঠন্‌করের সম্পাদনায় আদিপর্বের সবগুলি খণ্ডের প্রকাশ সমাপ্ত হইলে উহা মহাভারত বিশেষজ্ঞ ডাঃ লুডর্স, ডাঃ উইন্‌ট্যর্‌নিৎজ, সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পণ্ডিতদের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান কর্তৃকও তাঁহার কর্মপদ্ধতি অনুমোদিত হয়। ডাঃ উইট্যর্‌ নিৎজ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ভারত অথবা পাশ্চাত্য দেশের আর কোন পণ্ডিত এত নিপুণভাবে এই কার্য করিতে পারিতেন না "Neither in India nor in Europe any one scholar be found who could have done the work better

than Dr. Sukthankar ] ।

সুখঠন্‌কর সম্পাদিত আদিপর্বের সমালোচনা করিতে গিয়া ডাঃ উইণ্টারনিৎজ লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষাচর্চার ইতিহাসে ম্যাক্সমুল্যর সম্পাদিত সায়নভাষ্যসহ ঋগ্বেদ প্রকাশের পর মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণের আদিপর্ব খণ্ডের প্রকাশ অনুরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা [ I have no hesitation in saying that this is the most important event in the history of Sanskrit Philology since the publication of Max Muller's edition of the Rigveda with Sayana's commentary"—B. O. R. I, Vol.-18 ]

আদিপর্বের সম্পাদন কার্য শেষ করার পর সুখঠন্‌কর আরণ্যক পর্ব সম্পাদনার কাজে প্রবৃত্ত হন। নিজে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব রাখিয়া সুখঠন্‌কর ডাঃ রঘুবীরকে বিরাট পর্ব ও ডাঃ সুশীলকুমার দেকে উদ্যোগ পর্ব সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। ডাঃ রঘুবীর সম্পাদিত বিরাট পর্ব ১৯৩৬ ও ডাঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত উদ্যোগ পর্ব ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত খণ্ড দুইটির প্রতি ছত্র মুদ্রিত হইবার পূর্বে সাধারণ সম্পাদকরূপে ডাঃ সুখঠন্‌কর কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। ডাঃ রঘুবীর ও ডাঃ দে উভয়েই তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত খণ্ডগুলিতে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুখঠন্‌করের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতের বনপর্ব অথবা আরণ্যক পর্বটি সুখঠন্‌কর আদিপর্বের ন্যায় স্বয়ং সম্পাদন করেন। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ডাঃ ফাঙ্কলিন এডগারটন কর্তৃক সভাপর্ব ও ডাঃ শ্রীপাদ বেলভেলকর কর্তৃক ভীষ্ম-পর্বের সম্পাদন কার্যও প্রায় সমাপ্ত হয়। মহাভারতের ৮২, ১৫০ শ্লোকের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত ছয়টি পর্বের শ্লোক সংখ্যা ৩৬,০০০। মহাভারতের সম্পাদন কার্যে শতকরা ৪৫ কার্য কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন করিয়া ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী সুখঠন্‌কর সামান্য অসুস্থতার পর অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পক্ষাধিককাল পূর্বে ৪ঠা জানুয়ারী ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ প্রচেষ্টার রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি হিসাবে সুখঠন্‌করকে একটি পদক প্রদান দ্বারা সম্বর্ধিত করা হয়। পরদিন ৫ই জানুয়ারী এই উৎসব সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ Herman Oldenburg-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সুখঠন্‌কর বলেন যে মহাভারত সুপ্রাচীনকালে লিখিত হইলেও বর্তমান কালেও উহা পূর্ববৎ উপাদেয়, কারণ মহাভারত ভারতীয় মহাজাতির মিলিত প্রাণসত্তা এবং একক সত্তা [ " 'In the Mahabharata breathe the united soul of India, and the individual souls of her people'. And why is that ? Because Mahabharata is the national saga of India. It is in other words, the Contents of our collective unconciousness. And just for that reason it refuses to be discarded. ···We must therefore grasp this great book with both hands and face it squarely. Then we shall recognise that it is our past which has prolonged itself into the present. We are it. I mean the real WE !"

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সুখঠন্‌করের অকাল মৃত্যুতে মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের

শুভ প্রচেষ্টা খণ্ডিত হয় নাই। সুঠন্‌করের প্রদর্শিত প্রণালীতে তঁহার দ্বারা শিক্ষিত তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও সহকর্মীবৃন্দ শ্রীপাদ্‌ বেলভেলকর, পরশুরাম বৈদ্য, ডাণ্ডেকর, ভেলাঙ্কর, পরাঞ্জপে কর্মারকর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ১৯৫৯ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। পরিকল্পিত ২৪টি খণ্ডের বাকী ৫টী খণ্ড ( হরি বংশ, পরিশিষ্ট, সূচী প্রভৃতি ) অচির কালের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পুণা, লণ্ডন, লাহোর, বরদা, নেপাল, বিশ্বভারতী ( শান্তিনিকেতন ), ঢাকা, ইন্দোর, মহীশূর, তাঞ্জোর, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত ও শারদা ( কাশ্মীরী ), দেবনাগরী, মৈথিলী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি লিপিতে লিখিত প্রায় ৬০টী পুঁথির প্রতিটী পুঁথির প্রতিটী শব্দের পাঠ মিলাইয়া প্রামাণ্য সংস্করণগুলিতে ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা প্রতিটী শব্দের শুদ্ধপাঠ নির্ণয় করিয়া উহা মূল শ্লোকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকের তৃপ্তির জন্য উল্লেখযোগ্য পাঠান্তরগুলি ও পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক একটী খণ্ড প্রকাশ করিতে সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মিবৃন্দকে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মহাভারতের এই প্রামাণ্য সংস্করণ পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী ও কর্মিবৃন্দের অধ্যবসায় ও মণীষার একটী অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ রূপে চিরস্মরণীয় হইয়া বিরাজ করিবে সন্দেহ নাই। এই সাফল্যের কৃতিত্ব বহুলাংশে ডাঃ সুখ্‌ঠন্‌করের প্রাপ্য। এই কার্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের সাধারণ সম্পাদকরূপে সুখ্‌ঠন্‌কর আদিপর্বের প্রথম অংশের সহিত একটী ভূমিকা লেখেন ( Foreword, 1927 ), ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আদি পর্বের শেষ খণ্ডে তাঁহার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিকার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুখ্‌ঠন্‌কর রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটীর বোম্বাই শাখার পত্রিকা, ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পত্রিকা ও স্মারক গ্রন্থ প্রভৃতিতে রামায়ণ মহাভারত বিশেষতঃ মহাভারতীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন ( ৬, ৭ )।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭ বৎসর কাল ধরিয়া সুখ্‌ঠন্‌কর রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটীর বোম্বাই শাখার পত্রিকাটীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society)।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে সুখ্‌ঠন্‌কর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী ভাষণ দান করেন (Wilson Philogical Lectures,—Life and growth of the languages.)

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের দশম অধিবেশনে ভাষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে সুখ্‌ঠন্‌কর ভারতে ভাষা-বিদ্যাচর্চা বিষয়ে একটী ভাষণ দান করেন। এই ভাষণটী বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "ভারতীয়-বিদ্যা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ( ৮ )।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনেও সুখ্‌ঠন্‌কর একটী শাখার সভাপতিত্ব করেন।

ডাঃ সুখ্ঠন্‌কর বোম্বাই-এর রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটী শাখার 'ফেলো' ও আমেরিকান ওরিয়েণ্টল সোসাইটীর সম্মানিত সদস্য ( Honrari Member ) নির্বাচিত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে ডাঃ সুখ্ঠন্‌কর নিরভিমানতা, সারল্য, উদারতা প্রভৃতি নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। সুখ্ঠন্‌করের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বর্তমানে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই দেশে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে নেতৃস্থানীয় হইয়া আছেন।

ভারত-বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ সুখ্ঠন্‌করের সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ সম্বন্ধে সুখ্ঠন্‌করের গভীর মনীষার পরিচয় এই দুই খণ্ড পুস্তকে সুস্পষ্টরূপে বিধৃত হইয়া আছে। (Sukthankar Memorial Edition—Vol. I, Poona 1944 ; Vol. II, Poona, 1945.

১। Miscellaneous Notes on Mammata's Kabyaprakasa

( ক ) The two authors of Kabyaprakasa—Z.D.M.G, 1912

( খ ) A Note on Mammata's Samuchaya ,, 1912

( গ ) Another case of the practice of quoting names merely Honoris causa—Z.D.M.G. 1912.

২। Die Grammatik Sakatayana's—Leipzig, 1921.

৩। (ক) The Porumamila Tank Inscription—Epigrappica Indica, Vol-14.

( খ ) Bhandak Plates ,, ,,

( গ ) A new inscription of Siri Pulumavi ,, ,,

( ঘ ) Three Kshatrapa Inscriptions (with R.D. Banerjee) ,, Vol-16

( ঙ ) Two Kadamba Grants from Sirsi ,, ,,

( চ ) A Vakataka Inscription from Ganj ,, Vol-17

( ছ ) Two new grants of Dhrubasena ,, ,,

( জ ) On the Home of the so called Andhra Kings.
—Anuals of the B.O.R.I, Vol-1

( ঝ ) Besnagar Inscription of Heliodorus ,, ,,

( ঞ ) Palaeographic Notes—R.G. Bhandarkar. Comm. Vol.

( ট ) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, 1916-17

( ঠ ) ,, ,, 1917-18.

৪। Studies in Bhasa.

( ক ) Introduction, J.A.O.S, Vol-40

(খ) On the versification of the metrical portions of the drama, J.A.O.S, Vol-41,

(গ) On the Relationship between Carudutta and the Mricchakatika, J.A.O.S. Vol-42.

(ঘ) A Concordance of the dramas, A.B.O.R.I, Vol-4

(ঙ) A bibliographical note, J.B.B.R.A.S, Vol-26,

(চ) On the Prakrit of the Dramas—J.B.B.R.A.S, New series-1.

(ছ) The Bhasa Riddle : A proposed solution— ,, ,,

৫। Vasavadutta Shammaa Calcutta 1922, Oxford University Press—1923.

৬। Epic Studies.

(ক) Some Aspects of the Mahabharata Canon. J.B.B.BRA.S (NS), Vol-4

(খ) Further Text critical Notes—A.B.OR.I Vol-1I

(গ) Dr. Ruben on the critical Edn. of Mahabharata—A.B.O.R.I. Vol-II.

(ঘ) More Text critical Notes—A.B.ORI. Vol-16

(ঙ) Notes on the Mahabharata Commentators—A.B.O.R.I. Vol-17.

(চ) The Bhrigus and the Bharata : A Text historical study—A.B.O.R.I. Vol-18.

(ছ) Oldest extant mss of Adi Paravan A.B.O.R.I. Vol-19.

(জ) The Rama Episode & Ramayana—A Vol. of studies in Indology presented to Prof P.V. Kane.

(ঝ) Arjun Misra. Dr. Modi mem. Vol.

(ঞ) The Nala Episode and the Ramayana ( Studies in honour of Prof. F. W. Thomas ).

৭। Epic questions.

( i ) Does Indra. assume the form of a swan—Bulletin of the Deccan College Res. Inst, Vol-I.

( ii ) The Pravarasamgraha figures—A.B.O.R.I, Vol-23.

৮। The position of linguistic studies in India—Bharatiya Vidya, Vol-2.

# রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে যন্ত্রবাহন সভ্যতা

**অমিয়কুমার মজুমদার**

যন্ত্রবাহন সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বীতরাগ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সভ্যতার ভয়াবহ দিকটাই তাঁর দৃষ্টিতে সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার ফলশ্রুতিতে মানুষের মনে জেগেছে সোনা সঞ্চয়ের বিকৃত লিপ্সা। প্রাণের দাবী উপেক্ষিত, শুধু ধনের মদিরা পান করে সে দিবারাত্রি মাতাল হয়ে থাকতে চায়। পণ্যোৎপাদনের আকাঙ্খায় মানুষ আত্মবিস্মৃত। অন্ধকারে বক্ষ বিদীর্ণ করে সে সংগ্রহ করে চলেছে তাল তাল সোনা। আরও পাবার আকাজ্ঞা তাকে উন্মাদ করে তুলছে। এ মনোবৃত্তির কারণ কিন্তু সেই ধনাসক্ত মানুষেরও অজ্ঞাত। অবকাশকে সরিয়ে চলেছে অবকাশের উজানী স্রোত। সুন্দর আসক্তি তাকে উন্মনা করে তোলে না। তার শিল্পোৎপাদন বা ধন আহরণের অনুকূল নয় এমন কোন কর্মের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই তার কাছে। যাদের তা অবশিষ্ট আছে তারা আখ্যাত হয় অবাস্তব, অপরিণামদর্শী, অদূরদর্শী ইত্যাদি সংজ্ঞায়। স্বল্পবিত্তের অধিকারী অথচ মনুষ্যত্বের বহু গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আজ উপহসিত, উপেক্ষিত। বিদ্যাশিক্ষার মর্যাদা তখনই দেওয়া হয় যখন সেই বিদ্যার সাহায্যে রাশি রাশি অর্থ আনার সুবিধা ঘটে নচেৎ সেই সব মানুষের দল সমাজের তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হন। মানুষের মর্যাদাও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না যেহেতু যন্ত্রবাহন সভ্যতায় ধন-ই মানুষের শ্রেণী নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকৃত হয়েছে, অতএব সেই যুগে অবস্থান করে এক অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই তৃষ্ণা তীব্র, দুর্বার এবং বলাবাহুল্য শুভবুদ্ধির বিচারে তা ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বস্তু-রতিতে নিমজ্জমান এক ধনতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার ভয়ঙ্কর চিত্র। আজ "পণ্যোৎপাদনের সভ্যতা এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে পণ্য আর মানুষের প্রয়োজন মিটানোর সীমায় আবদ্ধ নেই। আপন মহিমায় আপনি সুন্দর, পণ্যানুসন্ধানে লিপ্ত মানুষের উপাস্য।" ১

যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্বের কোন মর্যাদা নেই, মানুষকে তার মনুষ্যত্বের বেদী থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সে পরিণত হয়েছে বস্তুতে। যন্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ বা পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন সামগ্রীর মত মানুষও যেন আজ পরিণত হয়েছে বস্তুতে। পার্থক্য কেবল হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে। অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের মতো মানুষকেও চিহ্নিত করা হচ্ছে প্রতীক দিয়ে, নম্বর দিয়ে। রক্তকরবীতে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

"যক্ষপুরের অঙ্কের পর অঙ্কের সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছায় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন সংখ্যা?

ফাগুলাল: পিঠের কাপড়ের দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু: আমি ৬ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে যারা শুধু জীবনকেই দেখে, একবার ফিরেও তাকায় না রূপের দিকে,

যারা নিজেদের ন্যূনতম স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বলি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে, যারা বস্তুর আয়োজনে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছে, যাদের দানবীয় যন্ত্রশক্তির নিষ্পেষণে প্রাণরস শুকিয়ে যাচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে পশু। এই যান্ত্রিকতা, লোভ এবং শক্তির নিপীড়নের দিক দেখানো হয়েছে রক্তকরবী নাটকে। যুদ্ধের কোলাহলের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দেখে এসেছেন পশ্চিমের মানব-বিদ্বেষী উগ্র রাষ্ট্রসচেতনতা, আমেরিকার বস্তুময় যান্ত্রিক সভ্যতা, যার প্রভাব বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পড়তে শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে কবি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী'তে লিখেছেন, "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম"। কবি মনে করতেন এই বস্তুসভ্যতা কখনোই চিরস্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, "পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্য তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে। সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।" ( পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী )

মুক্তধারায় কবি অভিজিৎকে দিয়ে যান্ত্রিকতার মূলে আঘাত হানলেন আর রক্তকরবীর জড়শক্তি পরাজিত হলো প্রাণের কাছে। রক্তকরবীতে কবি "শক্তিদানবের অন্তরেই তার শৃঙ্খলমুক্তির ঝংকার সঞ্চারিত করেছেন।" ২

রক্তকরবীর গ্রহণ-লাগা যক্ষপুরী আলোহীন। আশাহীন। তার জঠরের মধ্যে চলেছে শবসাধনা অগণিত মানুষ নিয়ে। প্রচণ্ড তার দানব-শক্তি। এর বিপরীত মানবীয়-বেদনা।

মানবীয় বেদনার দিক আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে পুত্রহারা মাতা অম্বার ( মুক্তধারা ) কাতর ক্রন্দনে এবং বিশুপাগলের ( রক্তকরবী ) মর্মান্তিক বিশ্লেষণে।

মুক্তধারা নাটকে অম্বার প্রাণফাটা বিলাপ যেন প্রতিটি মানুষের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। আর তার বিলাপ নিঃসন্দেহে নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা।

> 'যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল।
> এ পথের কি শেষ নেই? সুমন কি তবে এখনো চলেছে,
> কেবলি চলেছে, পশ্চিমে গৌরী শিখর পেরিয়ে যেখানে
> সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?' (মুক্তধারা)

রক্ত করবীতে পুত্রহারা জননীর কাতর আর্তনাদ শোনা যায় নি, যেহেতু সেখানকার সাধারণ শ্রমিকরাও যন্ত্রের কবলে পড়ে যন্ত্র হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জীবনের প্রকৃত বর্ণনা যখন শুনতে পাই, তখনই কি শোনা যায় না তাদের করুণ, প্রাণফাটা বিলাপ। তারা বর্ণনা করছে, "একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,—বলছে কাজ করো।"

২

"আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।" তাদের বেদনায় জীবনের ছবি আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

,, বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।'

কারখানা বা শিল্পসংস্থা সম্পর্কে কবির মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। রক্তকরবী রচনার পূর্বে শিল্পকেন্দ্রসমূহের বর্ণনা শোনেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এ প্রসংগে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কবি শিল্পকেন্দ্রসমূহের বীভৎসরূপের বর্ণনা পান, অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন ; এই সময়ে তিনি শিলঙে। কবির কাছে প্রায় আসেন ও নানা কথাবার্তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে। রাধাকমল লেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন ; তখন কি তিনি জানেন যে কবির মনে একটী নাটকের খোরাক জুটিতেছে…" ৩

কবি নিজে হয়ত দু-একটি মিল বা ফ্যাক্টরী দেখে থাকতে পারেন তাই বলে তাঁর ধারণা সমালোচনার উর্ধে তা বলা চলে না। যাহোক এ বিষয় নিয়ে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। আবার ফিরে আসি কবির বক্তব্যে। রক্তকরবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নানা সভ্যতার তারতম্যের কথা বলেছেন। কবির ভাষায় : "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবল উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ( বলাবাহুল্য কবি এখানে যন্ত্রবাহন সভ্যতার কথা বলেছেন ) ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই রচনাটী কবি (বাল্মীকি ) তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা সেকালের কথা, না এ কালের ? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা ? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল।

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীর লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হয়েছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটী গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে ; নইলে গ্রামে পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টীটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।…রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু। তারপরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের

মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা, বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি! একটীতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর একটীতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। ৪ কবি বলতে চান যন্ত্র এবং প্রাণ, প্রেম ও দার্ঢ্য, আনন্দ এবং কর্তব্য এই মিলিয়েই তো জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। কোন কারণে কোন সমাজে যখন যন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে তখন সমাজ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়। এমন অবস্থাতেই আবির্ভাব ঘটে নন্দিনীর।

রক্তকরবীর মকররাজ অমিত শক্তিসম্পন্ন। তার সহজাতবুদ্ধির সংগে মিলন হয়েছে বৈজ্ঞানিক শক্তির। তার ফলে তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী। অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

একথা সত্য বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে শক্তি, তার বলে মানুষ আজ দশানন, সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিপদ ঘটে তখনই যখন কিছুসংখ্যক মানুষ এই শক্তিকে কল্যাণ ধর্মে নিযুক্ত করে না। কবি বলেন মানুষ আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই ক্লান্তি দূর হতো যদি বৈজ্ঞানিক শক্তি আপনার প্রাণধর্মের সংগে যন্ত্রধর্মকে মিলিয়ে নিতে পারতো। আজ তো তা হয়ে উঠছে না। কবি আশঙ্কা করেছেন যন্ত্রের চাপে মানুষ পীড়িত হচ্ছে। প্রাণ নিপীড়নের জ্বালায় অস্থির। মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছে। মকররাজও তাই ক্লান্ত পীড়িত।

যন্ত্রসভ্যতার যুগে মানুষের ধনের প্রতি লালসা যেন উদগ্র হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ধ্বনি উঠছে, 'আরো চাই, আরো চাই'। এ যেন তৃষ্ণারাক্ষসীর অস্থির কামনা। আধুনিক সভ্যতার এই দিকটী কবি 'রক্তকরবী'তে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই প্রসংগে তিনি বলেছেন, "যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনচে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেচে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি। ভুলেচে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেচে।"৫

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের বক্তব্যের কিঞ্চিৎ অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।ঃ আধুনিক কালের পণ্যোৎপাদক সভ্যতা ঐ সভ্যতার তথাকথিত মুক্তির একটা সুনিবিড় রসসমৃদ্ধ চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অসামান্য মানবিকবোধে সিঞ্চিত কবি মানস যেন যক্ষপুরীর ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় পুঞ্জ পুঞ্জ পণ্যের স্তূপে স্তূপে পরিভ্রমণ করে তাদের সংগে একাত্ম হয়ে অনুভব করেছে এই সভ্যতার ভয়াবহতা, তার বিকৃত জীবন বোধের বর্বরোচিত অভিব্যক্তি। এবং অনুভব করে শিহরিত হয়েছে তাঁর চিত্ত। যক্ষপুরীর সমস্ত বন্দীমানুষের হয়ে তিনি এই ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েছেন, এবং প্রকৃত আনন্দময় মুক্তির আস্বাদন লাভের জন্য তাঁর চিত্তের ব্যাকুল আর্তি দুঃসহ বেদনায় মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। এই আর্তি আবেগ উচ্ছ্বাসমথিত মানবিক দরদে উজ্জ্বল। আর

তার মূলে গভীর এক প্রশান্তি—যেখানে সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষ, সমস্ত বেদনার অবসান, সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি।''৬

পশ্চিমে গিয়ে কবি লক্ষ্য করেছেন তাদের যন্ত্র সর্বস্বতার দিকে, তাদের বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতির গতি। তাদের কাছে বাইরের প্রয়োজনটাই হয়ে উঠেছে বড়ো। সেখানে তাই মনুষ্যত্বের ডাক সাড়া জাগায় না। লোভ যেন তার হিংস্র দন্ত প্রকাশ করে তেড়ে আসছে। কবি বলছেন, "সিদ্ধি, যাকে ইংরেজীতে বলে সাক্‌সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিকস্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।''৭

কবি যন্ত্রপুরীকে মনে করেন মানুষের দানবীয় শক্তি ও দম্ভের প্রকাশস্থল। এই যন্ত্রের পেষণে এবং শোষণে মানুষের প্রাণ হয়েছে অবরুদ্ধ। আত্মার মহিমা হয়েছে সঙ্কুচিত। কবির মনে হয়েছে কলবুদ্ধি উদ্যত হয়েছে মানুষের কলাবুদ্ধিকে ধ্বংস করার বীভৎস কার্যে। এখনকার মানুষ মনে করছে যন্ত্রটাই সত্যি আর সব মিথ্যে। রক্তকরবীতে কায়াগঠনের কালে কবি জোর দিয়েছেন আধুনিক কালের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরে। এই ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক সাধারণ মানুষকে শোষণ করে হয়ে উঠছে স্ফীতকায়। কবি তাদের বলেছেন, 'কলিযুগের রাক্ষস'। এদের কৌশলে বৃদ্ধি পেয়েছে কলকারখানার সংখ্যা। মানুষ পরিণত হয়েছে যন্ত্রে। রক্তকরবীর স্বর্ণ আহরণের কারখানা মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। রক্তকরবী রচনার পূর্বে সাতমাস কাল কবি আমেরিকায় ছিলেন। সেখানকার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে, ইংরেজীতে বলতে হলে বলতাম, 'টাইটানিক ওয়েলথ'। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ তলা বাড়ীর ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম, আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হচ্ছে এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ।'' সমাজের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে তার একটা কবিতায়

আমি যে দেখছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥ ৮

যন্ত্র বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে ব্যথিত কবির হৃদয়। বিজ্ঞান যদি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়. তবে তার জয়যাত্রা দেশের পক্ষে অমংগলকর। হয়ত এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কবি রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছিলেন, "বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত, পা, মুণ্ড অদৃশ্যভাবে

বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা সেই শক্তি বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, এমন আভাস নাটকে আছে।"

একথা যেন আমরা কখনো মনে না করি যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র-বিজ্ঞানকে সর্বদাই বিষদৃষ্টিতে দেখেছেন। এক কবিতায় তিনি বরং প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর বা প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে রত্ন লুকিয়ে আছে মানুষ তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, মানুষের মংগল সাধিত হয়েছে। কবি নিঃসন্দেহে কল্যাণকামী বিজ্ঞানের প্রসারতার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন।

কঠিন লোহা কঠিন মুখে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে।
লক্ষযুগের অন্ধকার ছিল সংগোপনে
ওগো তায় জাগাইনু রে।।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘদিনের মৌন তাহার আজ ভাঙ্গাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটছে ঐ জগৎ-জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।"

এই 'রাশ' বাগানোতেই কৃতিত্ব। তা না হলেই যন্ত্র আনে বন্ধন। কবি মনে করতেন যন্ত্রবাহন সভ্যতা এবং যান্ত্রিকতা থেকে জন্ম নেয় হিংসাত্মক জাতীয়তা সাম্রাজ্যবাদ। এ যে মানুষের অশেষ ক্ষতি করেছে সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মানুষের সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন এবং আত্মিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে এ কথা তিনি মনে করতেন। তাঁর ভাষায়, "It is the cotinual and stupendous dead pressure of this inhuman upon the loving human under which the modern world is groaning." ব্যঙ্গের আবরণে কবি যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণকে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছেন, তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ডক্টর পি. গুহঠাকুরতা লিখেছেন, "If the author has lashed materialism and worldly greed, it is with a silken whip. If he has rebuked tyranny, cruelty and falsehood, it is with a gentle and benavolent kindliness. His satire does not sting, it only awakens pity and understanding." ৯ যন্ত্রবাহন সভ্যতার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর রূপ দেখে ব্যথিত কবি যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর মূলবক্তব্যটি প্রোথিত। তিনি বলেছেন, "I have a stronger faith in the simple personality of man than in the prolific brood of machinery that wants to crowd it out. This personality—the divine essence of the Infinite on the vessel of the Finite—has its last treasure house in a woman's heart···The joy of this faith has inspired me to pour all my heart into pointing against the background of black shadows··

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার যে সমাধান দিয়ে গেছেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। "...নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া-শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?" এখানে যে সমাজের কথা বলা হয়েছে সে সমাজ ও সভ্যতা সামাজিক বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার নবরূপায়ণ সম্ভব কি করে? তা হলে তো বিবর্তনবাদকেই অস্বীকার করতে হয়। একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি সমাজেরই কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে, তাকে বাদ দিয়ে কোন বিবর্তন বা রূপান্তর সম্ভব নয়। যে পণ্যোৎপাদন সভ্যতার ধারা বর্তমানে চলেছে তাকে অনুসরণ করেই পুণর্গঠন সম্ভব, তাকে অস্বীকার করে নয়। রক্তকরবী নাটকের গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথ এ সমস্যাগুলি ভালভাবে বিচার করে দেখেছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের উল্লেখ করে কবি বলেছেন রত্নাকর যখন ধর্ষণ পরিত্যাগ করে কর্ষণবিদ্যাগ্রহণ করলেন, তখনই বেজে উঠল তাঁর বীণা। হয়ত এর মধ্যে দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন আধুনিক সভ্যতাকেও যদি ধর্ষণ বা দস্যুতা, শোষণ ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত না করে কর্ষণ অর্থাৎ কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাহলেই মানুষের জীবনে সুখ আসবে। শান্তি আসবে। ফিরে আসবে শ্রী ও সমৃদ্ধি। মানুষ যাপন করবে সাবলীল মুক্তজীবন। কিন্তু কৃষি সমাজ ব্যবস্থাতেও কি দাসত্ব এবং ধর্ষণ ছিল না? রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়েও কি তা উপলব্ধি করতে পারেন নি? হয়ত তাঁর এলাকায় স্বল্প মাত্রায় চলতে পারে কিন্তু তাঁর পূর্বে?

এর পরেও বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে যন্ত্রসভ্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবার যে সমাধান দিয়েছেন তা সামাজিক ক্রমের নিয়মানুযায়ী হয় নি, একারণেই তাকে বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। প্রশ্ন জাগে যে সমস্যা তিনি ঐ নাটকে তুলে ধরেছেন তা কতটা ইতিহাস-নিষ্ঠ। তা ছাড়া সামাজিক পরিবেশও কি তাঁর সমস্যার কথা বলে? আমরা যন্ত্রবাহন সভ্যতার আওতায় বাস করেছি। তাহলেও আমাদের দেশে নগর বা সহর কি রাতারাতি গড়ে উঠেছে? তা নিশ্চয়ই নয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নগর এবং নগর বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে তার সংখ্যা এখনও খুব বেশি নয়। আমাদের সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে একথাই কি মনে জাগে না যে এখানে না সামন্ততান্ত্রিক না ধনতান্ত্রিক না যন্ত্রভিত্তিক সমাজ আধিপত্য বিস্তার করছে। আমাদের মনও যেন তেমনি। বিশুদ্ধ নাগর সভ্যতার পরিধিতে বসবাস করলে যেরকম মানসভঙ্গী হওয়া প্রয়োজন তেমনটি কি এখনো হয়েছে আমাদের দেশে?

এখনও কি আমরা পুরোপুরি যন্ত্রমেজাজী? তা হয়নি। আমাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, আছে উচ্ছ্বাস, আছে সংবেদনশীলতা। যন্ত্রের পাঁচিলে তা ঘা খেয়ে গুম্‌রে মরে। বাস্তবিকপক্ষে যান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠবার জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা আমাদের নেই তার জন্যেই আমরা যন্ত্রের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করি।

এ ছাড়াও নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবাহন সভ্যতার পরিপন্থী। এ প্রসংগে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, "তাঁর (কবির) মানসজগৎ তপোবনের ঔদার্য ও প্রশান্তি দিয়ে নির্মিত। সেই ঔদার্যের সংগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মার কোথায় যেন মিল আছে বলে তাঁর সুগভীর প্রত্যয়। সুতরাং,

যে ব্যবস্থায় সেই আত্মার স্বীকৃতি নেই, রবীন্দ্রমানসেও সেই ব্যবস্থার কোন স্বীকৃতি নেই, বা তার জন্য কোন প্রেম নেই। পণ্যোৎপাদক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে সেই সভ্যতারই মালিক ও বিধায়ক রাজার আত্মিক বিদ্রোহ সংসাধন করে, এবং আত্মার স্বকীয়তা বিনাশী সভ্যতাকে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে রবীন্দ্রমানস পরিতৃপ্ত হ'লো। ইতিহাস কিন্তু নির্বাক, অবিচল।" ( ১০ )

এবারে আর একটি প্রসংগের অবতারণা করা যাক। যদি ধরে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে আমাদের দেশের প্রসংগ নিয়ে তেমন বলেন নি, বিদেশে যন্ত্রসভ্যতার রূপ দেখে তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন তাহলে অবশ্য আমার বক্তব্যের পুনর্বিচার করতে হবে। ১৯২৬ সালে রক্তকরবী রচনা করা হয়। সে সময় কবির যে ধারণা ছিল ১৯৩১ সালে হয়ত তার কিছু পরিবর্তন ঘটে। সোবিয়েৎ সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ কার্যের স্বল্পতা ( অনেকের মতে চির বিলুপ্তি ) দেখে হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যন্ত্রবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের ফলে শ্রমোপজীবী মানুষের জন্য আলোর বরাদ্দ জুটল।

নাগর সভ্যতা সম্পর্কে কবির অনেক বক্তব্য আছে। একটি এখানে উদ্ধৃত করবো। "ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্নের জন্যে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য, যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরী করে উঠতে পারে না। প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হলে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে অনেকলোক, আর অন্তরের মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই শহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখে।"১১ আমেরিকা গিয়ে কবির ভাল লাগে নি। তাঁর মনে হয়েছিল এদেশ যেন ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গ। সেখানে জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বেশি।

যন্ত্রসভ্যতার দাসে পরিণত হয়ে সেখানকার মানুষেরা শুধু সোজা সংগ্রহকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করেছে। লালসাগ্রস্ত মানুষের দল তাই শিল্প প্রসারে তৎপর। আর তার ঔরস থেকেই আসবে সঞ্চয়ের অর্থ। এখানে আতিথ্যের সুনিবিড় স্পর্শ নেই, আছে সন্দেহ। তিনি লিখেছেন, "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদগারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।" ১২

কবির ধারণা যান্ত্রিক সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁরমতেঃ সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসাবেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলা নিবিড়

আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তারপরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোন চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।” ১৩

১। রবীন্দ্র মানস : অরবিন্দ পোদ্দার
২। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় : ক্ষুদিরাম দাস
৩। রবীন্দ্র জীবনী ৩য় খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪। রক্তকরবী, প্রস্তাবনা, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫শ খণ্ড
৫। যাত্রী : রবীন্দ্রনাথ
৬। রবীন্দ্র মানস : অরবিন্দ পোদ্দার
৭। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী
৮। পরিশেষ, 'প্রশ্ন'
৯। The Bengali Drama
১০। রবীন্দ্র মানস : অরবিন্দ পোদ্দার
১১। যাত্রী
১২। যাত্রী
১৩। যাত্রী

# বাংলা গানের একটি পর্যায় ঃ নজরুলের গান

**বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**

ভালো কবিতা বোধ হয় কোনদিনই উচ্চগ্রামে সুর বাঁধে না। এটি সেই রক্তপদ্ম শান্তিময় মানসসরোবরে যার জন্ম। এখানে দুঃখ থাক কিন্তু উত্তেজনা নয়। অথচ নজরুল যেহেতু তাঁর কবিতাকেই সমাজহিতৈষণার হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন এবং প্রেরণাপরবশ প্রগল্ভতায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তাই অসামান্য শক্তি থাকলেও পরবর্তীকালের উপর তাঁর প্রভাব খুব সামান্য। এখন নিশ্চিন্তে বোধ একথা বলা যায়—কবি নজরুল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নামমাত্র—একটি নাম, যাঁর কবিতা একদিন বাংলাশুদ্ধু লোককে তোলপাড় করে তুলেছিল। অস্বীকার করব না, তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে, তাঁর কবিতা পাঠ করে উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তেজনার উর্দ্ধে উঠতে না পারলে যে হৃদয়ের পদ্মবনে ঢোকা যায় না। কারুকৃৎ রথ বানালেন রাজার রাজ্য জয়ের জন্য কিন্তু কবি বানালেন তপোবন। নইলে রাজা শকুন্তলার মনোজয় করবেন কেমন করে! কালের বিচারে কে টিকল?

তাই আধুনিক কবিতায় নজরুলবিস্মরণ আমার কাছে আদৌ কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি ভেবে পাই না যেখানে তিনি স্বরাজ্যে সম্রাট সেখানে তিনি কি করে এতদ্রুত পরবাসী হলেন! আমি তাঁর গানগুলির কথা বলছি। আধুনিক বাংলা গানের এই চরম দুঃসময়ে যেখানে সে অঞ্জলিভরে ঋণ গ্রহণ করতে পারত সেই ভাণ্ডারকে বাংলাগান ভুললো কেমন করে? সহজাত কবিশক্তিকে নজরুল কালদেবতার পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন কিন্তু গানেও কি তাই? আমার মনে হয়, কবি নজরুল কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ কিন্তু সঙ্গীতস্রষ্টা নজরুল চিরকালের।

সৌভাগ্যত, নজরুলের আগেই বাংলার সঙ্গীতজগৎ কয়েকটি প্রকৃত প্রতিভার আলোয় উজ্জ্বলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ একথাই প্রমাণ করে দিলেন, পাখির ওড়ার জন্য যেমন তার দুটি ডানাই আবশ্যক গানের ব্যাপারেও তেমনি সুর এবং কথার প্রয়োজন। সুরের সঙ্গে কথার সমন্বয় না হলে গান যেন কেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলা গানের সম্পূর্ণতা যদিও রবীন্দ্রনাথে তবু এর পূর্বাভাস যেন নিধুবাবুর টপ্পাগানগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সুর এবং কথার সঙ্গমসুখ যদি রবীন্দ্রনাথে হয় তবে তার পূর্বরাগ কি নিধুবাবুতে নয়? অবশ্য নিধুবাবু পূর্বরাগের চেয়ে বিরহের গানেই ওস্তাদ। কিন্তু যে কথা বলার তা হল ভালো গান সৃষ্টির জন্য স্রষ্টাকে একাধারে সুরকার এবং গীতিকার হতে হয়। যিনি গীতিকার তিনি যে কল্পনাকে মূর্তি দিয়েছেন তাঁর গীতিতে অপর আর একজন সুরকারের পক্ষে, তা যতই কেন না বোঝপড়া থাক, ঠিক সেই ভাবটি প্রকাশ করা অসম্ভব। কাব্যসঙ্গীতে যে অপূর্ব ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে আজকার আধুনিক বাংলাগান যে তা পারছে না তার একটা মোটা কারণ বোধহয় গীতিকারের আর সুরকারের পৃথকীকরণ। নিধুবাবু থেকে নজরুল একথাই প্রমাণ করেন। দিলীপকুমারকে বাদ দিলেও আধুনিক বাংলাগানের জনপ্রিয় সুরকার সলিল চৌধুরি কি একথাই প্রমাণ করেন না?

নজরুল তাঁর অসমাপ্ত জীবনে বড় কম গান রচনা করে যান নি। কিন্তু এদের অনেকগুলি আমাদের গাফিলতি, কিছুটা ভাগ্যবিপাকেও হারিয়ে গেছে। আর বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে কিছু গান রেকর্ডিং করা আছে, কিছু স্বরলিপির আকারে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। লজ্জার বিষয়, এখনও সেগুলি আমরা সংকলন করতে পারি নি।

নজরুলের গানকে যে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায় তাতে বিদ্রোহী কবিও কোথাও কোথাও প্রবলপ্রতাপে আত্মপ্রকাশিত কিন্তু তা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে নি। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসছেন ভারতে—চারিদিকে সাজসাজ রব, তারই মধ্যে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। নজরুল এই সময় গান বাঁধলেন 'ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বার খোল পুরবাসী'। এই সময়ে নজরুল কয়েকটি স্বদেশীগানও রচনা করেন। শব্দদৈন্য এবং ভাবদৈন্য রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে আজ আমাদের কিছুটা লজ্জা দিলেও, সেদিন যাঁরা সেই লোমহর্ষক গান শুনেছিলেন তাঁদের মনে একথা উঁকি মারেনি। বরং এই শব্দদৈন্য এবং ভাবদৈন্য সমগ্রসঙ্গীতে এক অকৃত্রিম সৌন্দর্য বিছিয়ে দিয়েছিল।

নজরুল কিছু গজল-ভাঙ্গা গান রচনা করছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রবর্তক নন কিন্তু প্রচারক। তাঁর আগে বোধহয় অতুলপ্রসাদই সত্যিকারের গজলসুর গ্রহণ করেন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি আর অধিক অনুশীলন চালান নি—নজরুল এই পথটি গ্রহণ করেন। গজল গানের প্রতি তাঁর মোহ আবাল্য। সৈনিকজীবনে আরব পারশ্য প্রভৃতি স্থানসমূহে ঘুরে তিনি বিশুদ্ধ গজল শুনেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি নজরুলের গজল-ভাঙ্গা গান। শ্যামাসঙ্গীত পল্লীসঙ্গীত বাউলগান যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ। তাই এ পর্বের গানগুলিতে তিনি স্বতোৎসারিত—রণক্লান্তের আশ্রয় রণরঙ্গিনীই হবেন। পল্লীসঙ্গীতে বিশেষত ঝুমুর-ভাটিয়ালীতেও তাঁর অবাধগতি 'আমার গহীন জলের নাইয়ায়' ভাটিয়ালীর কান্না কান পাতলেই শোনা যায়। 'নিয়ে কাদামাটির তাল খেলে হোলি ভূতের পাল' গোছের কিছু হাসির গানও নজরুল রচনা করেন।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার জীবনের শেষ অধ্যায়টুকু—আমি তাঁর প্রাগ্‌অসুস্থ কালটির কথাই বলতে চাইছি। কবি হিসাবে নজরুল অস্থির, মানুষ হিসেবেও খেয়ালী কিন্তু সুরস্রষ্টা হিসেবে আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর শেষজীবনটিতে তিনি প্রায়লুপ্ত, অবলুপ্ত এবং অপ্রচলিত রাগরাগিনী ঘেঁটে সুর সংগ্রহ শুরু করেন। এই সময় গান রচনা করতে গিয়ে তিনি এত বিভোর হয়ে যেতেন যে আহারবিহারের কথাও মনে থাকতনা। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর অর্থকষ্ট কবি গানে সুর দিয়েই মোচন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে আমরা তাঁর গানে মল্লারের প্রায় প্রতিটি রূপ—রামদাসী মল্লার, সুরদাসী মল্লার. মিয়া কি মল্লার, মেঘ মল্লার, নট মল্লার কিম্বা কানাড়ার মধ্যে মঙ্গল কানড়া মুদ্রাকী কানাড়া নাগধ্বনি কানাড়ার মনোহর প্রয়োগ পাই। গৌরসারং, শুদ্ধসারং, বৃন্দাবনীসারং, লঙ্কাদহন সারং প্রভৃতির ব্যবহারেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নীলাম্বরীতে গাওয়া 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি কে যায়' কাব্য হিসাবেও হৃদয়গ্রাহী নয় কি ?

নজরুল নিজে কয়েকটা রাগরাগিণী ভেঙ্গে নতুন রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট রাগ-রাগিণীর মধ্যে অরুণরঞ্জনী, দেবযানী. মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নজরুল তাঁর জীবনের শেষদিকে এগুলি অমানুষিক পরিশ্রম করে তৈরী করেন। এগুলির প্রায় ৫০।৬০টী গান একটী খাতায় লেখা হয়েছিল স্বরলিপির আকারে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু ১৯৪০ এর মার্চ মাসে সেই খাতাটী হারিয়ে যায়। নজরুল এতে মনে ভীষণ ব্যথা পান। তিনি এতদূর ভেঙ্গে পড়েন যে পুনর্বার স্বরলিপি প্রস্তুতের মনোবলও হারিয়ে ফেলেন। এইভাবে বাংলা সঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ আমরা চিরদিনের জন্য হারালাম। কেননা, এখনো হৃত গানগুলি অনাবিষ্কৃত আছে।

নজরুল বলেছেন 'দোলনচাঁপা' ধরণের কয়েকটি গান তিনি স্বপ্নে পাওয়া প্রেরণায় রচনা করেছেন। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ওস্তাদ সাহেব তানকর্তব করতে শুরু করে দিলেন—মজলিসে যা কিছুতেই গলায় আসছিল না সেই দুরূহ তানগুলি অবলীলায় গলায় খেলা করতে লাগল—একথা হামেশাই শুনেছি। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করে। কাজেই বাহ্যত ভাবতে খটকালাগলেও 'দোলনচাঁপাদের' সৃষ্টি তাই আমারকাছে অস্বাভাবিক নয়।

সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এক নজরুল-অনুরাগীর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারছি কবির আর্থিক অনটনের দিনে গান হয়েছিল সবচেয়ে বড় সহায়। । নজরুল স্মৃতিকার অন্তরঙ্গভাবে কবিকে দেখেছিলেন। তিনি গ্রন্থটীতে অনেক একপেশে উক্তি করেছেন অনেক সমস্যার সহজ-সমাধান করতে চেয়েছেন, যেগুলি বিশেষ বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু কবিজীবনের ঘরোয়া দিকটি তাঁর বিভ্রান্তিকর উক্তিগুলির মধ্যেও জ্বলজ্বল করছে। একটী ঘরোয়া চিত্র বলি, কবি তখন রেকর্ড কোম্পানীতে কাজ করেন। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় যদিও গান রচনা করে দুহাতে টাকা লুটছেন। কাবলিওয়ালার কাছেই তাঁর দুই হাজার টাকার ওপর ঋণ। বনগাঁ থেকে এক সাহিত্যসভার পরিচালক এসেছেন কবিকে সভাপতি করে নিয়ে যাবার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ভদ্রলোক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন কবির প্রতীক্ষায়। কবি অতঃপর বেরুলে ভদ্রলোক সবিনয়ে তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। শুনেই নজরুল বললেন, আমি যেতে পারব না—সময় নেই। এই যে গানের চাকরিতে যাচ্ছি, ফিরতে রাত দশ-এগারোটা হবে। এরপরই আর এক অংশে নজরুলস্মৃতিকার গানের অফিসের চিত্র দিচ্ছেন: নজরুল হাসতে হাসতে এলেন—অমনি সভার চেহারা গেল পাল্টে। কবি পান খাচ্ছেন আর গান শেখাচ্ছেন—কখনো ওরই মধ্যে সুযোগ করে করে গানের কথা লিখছেন। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অব্দি তিনি ক্রমাগত এখানে গান চালাতে লাগলেন—খাওয়ার কথা একবারও তাঁর মনে এল না!

চিত্রটী করুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে চাপ না আসলে কবি হয়তো অনেক গানই গাইতেন না, অনেক গানই লিখতেন না। চাপে পড়ে রচিত হলেও তাঁর গানগুলির অধিকাংশই কিন্তু রুটীরোজগারের তাগিদকে ছাপিয়ে উঠেছে। আসলে সঙ্গীতে তাঁর সহজাত অধিকার। এ অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর যোগ্যতা দিয়ে। অথচ এখনো তাঁর সঙ্গীত প্রায় অনালোচিতই—নজরুল গীতির সম্পূর্ণ স্বরলিপি নেই, নজরুলের গান রেডিওয় কদাচিৎ শোনা যায়—শিল্পীরাও তাঁকে ভুলতে বসেছে!

তবে কি এই সিদ্ধান্তই নেব যে রবীন্দ্রনাথেরও আমরা এই হাল করতাম যদি না নিজের কড়ি নিজে বুঝে নিতেন? ভাবতে দুঃখ হলেও, কথাটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়।

## সালভাদোর দ্য মাদারিয়াগা

বর্তমান স্পেনদেশীয় ভূ-খণ্ডের এক অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডক্টর সালভাদোর দ্য মাদারিয়াগা-র। ডক্টর মাদারিয়াগা স্প্যানিশ আধুনিক সাহিত্যের একজন দিকপাল। সাহিত্যে শুধুমাত্র এক অন্যতম উজ্জ্বল, বুদ্ধিজীবী প্রখ্যাত লেখক হিসেবে নন, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সুচিহ্নিত। সালভাদার দ্য মাদারিয়াগা-র বিশিষ্ট চিন্তাপ্রবাহ তাঁর স্বীয় খ্যাতিকে শুধু যে স্বদেশেই বিস্তৃত করেছে তা নয়, সমগ্র বিশ্বেই তিনি আজ আলোচিত।

ডক্টর মাদারিয়াগা-র জন্ম ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে জুলাই; স্পেনের করোনা শহরে। প্যারিসের কলেজ চ্যাপটালে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর কলেজীয় জীবনপ্রবাহের সূত্রপাত ঘটে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উত্তর স্পেনের এক রেলওয়ে কোম্পানীতে এঞ্জিনীয়ার হিসেবে তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় এবং তিনি সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেন এর অল্প কিছুকাল পরেই। সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ডক্টর মাদারিয়াগা-র আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর বা তাঁর কাছাকাছি আগে থেকে। এই দীর্ঘ পর্বের মধ্যে তিনি স্প্যানিশ, ইংরেজী এবং ফরাসি ভাষায় সুপ্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন, বলাবাহুল্য, তাঁর সাহিত্যদর্শন, পাণ্ডিত্য দেশ সীমাকে সহজেই অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর সর্বোপরি কৃতিত্ব মুখরিত নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিষয়ক কেন্দ্রিক জটিলতর আলোচনায় ক্ষেত্রেও তিনি বুদ্ধিজীবী উৎসাহী মহলে সশ্রদ্ধ অনুরাগভাজন হতে সক্ষম হয়েছেন। একযোগে এটী একমাত্র ডক্টর মাদারিয়াগা-র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি সমকালীন ফরাসি ও ইংরেজী জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবহিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ আশাকরি বাহুল্য নয়, এমন একটি সময় ছিলো যখন ছদ্মনামের অন্তরালে রচিত মাদ্রিদের বিভিন্ন বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক তাঁর বহুমুখী অনুচিন্তা বুদ্ধিজীবী মহলে রীতিমতো নিত্য নতুন চিন্তা-স্রোত প্রবাহের কারণ ঘটিয়েছিলো। অবশ্য আজও যে তার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেছে তা নয়। সামান্য কয়েক বছর পূর্বে তিনি ভারতদর্শনে এসেছিলেন এবং এখানে, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তাবিদদের এক আলোচনা সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন।

ডক্টর সালভাদোর দ্য মাদারিয়াগা অত্যন্ত পরিশ্রমী, অক্লান্ত লেখক? তাঁর প্রথম প্রাকশিত গ্রন্থ হলো 'ওয়ার সীন ফ্রম লণ্ডন'। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৭। ডক্টর মাদরিয়াগা লিখতে পেরেছেন এবং পারেনও প্রচুর। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকেই প্রায় প্রতি বছরই স্প্যানিশ বা ফরাসী কিংবা ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর উপন্যাস, নাটক, কাব্য জীবনী, ইতিহাস, সাহিত্য কিংবা প্রবন্ধাবলী অথবা অন্য কোন না কোনও বিষয়ক অন্যূন একটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'শেলি অ্যাণ্ড কেলডিরন' ডক্টর মাদারিয়াগা প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং,

বলা বাহুল্য একটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। বর্তমান আলোচনাগ্রন্থে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্প্যানীশীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে নানা আলোকপাত করেছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, স্পেন ও ইংল্যাণ্ড উভয় দেশের সাহিত্য প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে নতুনতর উজ্জ্বলচিন্তাপ্রবাহের মাধ্যমে বর্তমানগ্রন্থে তিনি তাঁর স্বকীয়পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাময়িক ঘটনা ও তথ্য সম্বলিত রচনায়ও ডক্টর মাদারিয়াগা কম আগ্রহী নন। তাঁর অনেক সৃষ্টিতে সাময়িক অনেক ঘটনা ইত্যাদি কেন্দ্রিভূত হয়ে চিন্তা ও কল্পনার সাজুয্যে এক নতুনতর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'স্প্যানিশ সাইক্ল' তাঁর এ জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ডক্টর মাদারিয়াগা-র জীবনীমূলক অনন্য সৃষ্টি হলো 'হার্পেন কর্টেজ' এবং তৎসহ আর একটি সুপরিচিত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হলো 'ক্রিষ্টোফার কলম্বাস'। তাঁর সুপ্রচুর রচনাবলীর মধ্যে উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী তাঁকে সাহিত্যের আসরে সুচিহ্নিত করে রেখেছে। তাঁর রচনাধারার মধ্যে মানবধর্মের এক অন্যতর রূপের সুসংহত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যের পাশাপাশি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসেবেও ডক্টর মাদারিয়াগা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনাবলীর মধ্যে উৎসাহী পাঠক সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে উচ্চারিত লেখকের সহানুভূতিশীল এক অনন্য হৃদয়ের কোমল হৃদয়ের স্পর্শ আবিষ্কার করবেন।

১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ স্পেনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য সময়কাল। সে সময়ে স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফানসো সিংহাসনচ্যুত হন এবং মিউসিপাল নির্বাচনে রিপাবলিকান দল ক্ষমতায় আসীন হলে স্পেনে গণতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন হয়। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তে প্রকাশিত হলো ডক্টর মাদারিয়াগা-র বিশিষ্ট চিন্তার যোগফল 'স্পেন' গ্রন্থটি। তথাকথিত এক নায়কতন্ত্রকে তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করা হয় বর্তমান গ্রন্থে। নীতির প্রশ্নে মাদারিয়া সম্পূর্ণ উদারপন্থী ; তিনি গণতন্ত্রে যতখানি বিশ্বাসী ঠিক ততখানি তাঁর অনাস্থা একনায়কতন্ত্রের প্রতি। তিনি কামনা করেন মানুষের সাংস্কৃতিক মুক্তির। যাই হোক, 'স্পেন' প্রকাশিত হবার অব্যবহিত মুহূর্তের মধ্যে তিনি মুক্তিকামী জনতার অভিনন্দন পেলেন। গ্রন্থটির প্রচার হলো আশ্চর্যরকম প্রচুর, বারংবার মুদ্রণ সৌভাগ্য অর্জন করলো গ্রন্থটি।

কিন্তু তরঙ্গ রোধিবে কে! আবার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজনীতির হাওয়া উল্টো বইতে শুরু করলো স্পেনে। আবার পট-পরিবর্তন। জনতার ভাগ্য পরিবর্তন। ১৯৩৬-এর নির্বাচনে সেখানকার পপুলার ফ্রন্ট জয়ী হলো। বর্তমান দলও সমানভাবে গণতন্ত্রের ভিত স্থায়ী করতে অগ্রণী হলেন। কিন্তু সহসা অন্য এক বিপর্যয়। সহসা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে দেশব্যাপী অরাজকতার সূত্রপাত ঘটলো। রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা একরকমই একটি সুযোগের অপেক্ষায় বোধকরি ছিলো। এবং এধরণের একটি আকাঙ্খিত চক্রান্তের সুযোগ পেয়ে রাজতন্ত্রানুসারী রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ মনের সুখে গণতন্ত্র-পিয়াসী জনতার ইচ্ছাকে দু'হাতে হত্যা করতে তৎপর হলেন। ফলম্ অধিকতর অরাজকতা। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টি সে সময় স্প্যানিশ সোস্যালিজম্-এর পাশাপাশি অনিবার্যভাবে ডক্টর মাদারিয়াগা-র উপরেও বিক্ষিপ্ত হলো। মাদারিয়াগা-র অপরাধ যেহেতু তিনি মুক্তির পূজারী তৎসহ মানবধর্মে অনুপ্রাণিত ॥

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

## প্রাচীন সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

সমালোচনার সার্থকতা শুধুমাত্র ভালোমন্দ বিচারের উপরেই নির্ভর করে না, কেবলমাত্র যথাযথত এবং উপযুক্ততা প্রমাণ করবার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না, সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন দৃষ্টি লাভ করি, নতুন অনুভূতি লাভ করি। এবং কবিকে বা কাব্যকে নতুন করে পাঠ করবার অনুভব করবার আগ্রহ লাভ করি। শ্রেষ্ঠ সকল সমালোচনার মূলে এই সৃজনীশক্তির অনস্বীকার্য, স্বাক্ষর বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অপরিমেয়। তিনিই বাঙালীর শেষ কবি যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পান করেছিলেন, যিনি তার বিপুল ভাণ্ডার থেকে মনি-মুক্তা আহরণ করে নব নব মালা তৈরি করতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মর্মলোকে তাঁর মতো আর কোনো আধুনিক বাঙালী কবি প্রবেশ লাভ করেননি।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যকে—বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্টকে আপন কবিদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং ঐ সমস্ত কবিদের রচনা বসন্তকালের পল্লবিত শাখার মতন অভিনব শোভা সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে নতুন রূপলাভ করেছে। ভাবমুগ্ধ কবি প্রাচীন যুগের কাব্য কমল বনে অবাধ ভ্রমণ করে দুহাতভরে রসপুষ্প আহরণ করেছেন এবং ভারতের কল্যাণ-লক্ষ্মীর শাশ্বত সৌন্দর্যের বেদীমূলে অর্ঘ্য রচনা করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচার করেননি, আলংকারিকের মন নিয়ে উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করেন নি, আপন মনের মাধুরী দিয়ে সমালোচনাকে এক অন্যতর সৃষ্টি করে তুলেছেন।

প্রাচীন সাহিত্য-তীর্থে পরিক্রমণ করে 'রামায়ণ'—'মেঘদূত'—'কুমারসম্ভব'—'শকুন্তলা' —'কাদম্বরী'—'ধম্মপদং' প্রভৃতি সাহিত্য মন্দিরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আদর্শের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সব গ্রন্থ পাঠে তাঁর সংবেদনশীল সৃষ্টিধর্মী কবি-মনে যে ভাবের উন্মেষ হয়েছিলো, সেই ভাবকে তিনি 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে রূপদান করেছেন। তাঁর সুদূর রোমান্টিক কবি-কল্পনায় এই গ্রন্থগুলি এক নতুন অপূর্ব রস-রূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে—যা এতোদিন সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে পড়ে নি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন অভিব্যক্ত হয়েছে, বিশ্বকবি তাঁর সৃষ্টিধর্মী জারকরসে একেবারে তাকে আত্মসাৎ করেছেন। তারপর তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়, অপূর্ব বিশ্লেষণে, বিচিত্র কলা-কৌশলে সেই জীবনদর্শনকে এই পুস্তকের সাতটি প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের কাছে নতুন ভাবে প্রকাশ করেছেন।

'রামায়ণ' মহাকাব্য বিচরনায় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন ভারতের আদর্শ সমাজবন্ধন। স্বকীয়তাকে বজায় রেখেও পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার

আত্মত্যাগ, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তুলনাহীন প্রেম, প্রজা ও রাজার মধ্যে কর্তব্যের সম্পর্ক, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে বিমল সৌহার্দ্য যে এই দেশে কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় মহর্ষি বাল্মীকির এই মহাকাব্যটিতে ব্যক্ত হয়েছে। চরিত্র-গৌরবে মানুষ যে কত উন্নত স্তরে আরোহণ করতে পারে রামায়ণের কবি তার মহনীয়রূপ বিবৃত করেছেন। রামায়ণ তাই মানুষের কাব্য-শাস্তরসাস্পদ গৃহাশ্রমের কাব্য। মুদির দোকান থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত যে এই মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে আদৃত হয়ে এসেছে তার বিশেষ কারণ, এই কাব্যে ঘরের কথাকেই কবি মহৎ ও বৃহৎ করে দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ ঘরের কথাকে এমন বিস্তৃত পরিবেশে পৃথিবীর আর কোনো মহাকাব্যে প্রকাশ করা হয় নি। এক কথায় বলা যায়, 'রামায়ণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত' কাব্যের একটি অপূর্ব রস-সমালোচনা। মেঘদূত কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যেন আবার নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রবন্ধে চিরন্তন মানুষের অনন্ত বিরহের মর্মকথা ভারতীয় ঋষির কণ্ঠেই বাণীরূপ লাভ করেছে। নির্বাসিত যক্ষের বিরহের আকুলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে অতল স্পর্শবিরহ ও মিলনের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা বর্তমান তা এক অপূর্ব রোমাণ্টিক কবি-অনুভাবনার দ্বারা আবিষ্কার করেছেন। চির সৌন্দর্যের লীলাভূমি কল্পলোক মানুষকে আকৃষ্ট করলেও, মানুষ সেই কল্পলোকে পৌঁছুতে পারে না। কল্পলোকের সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করা সহজ নয়—যে সৌন্দর্য চিরদিনই কামনার ধন। সৌন্দর্যের মানসী মূর্তির সংগে মিলিত হবার আকাংখা ও ব্যাকুলতাই চিরন্তন হয়ে থাকে, মিলন হয় না। কারণ, মিলনের মাধুরী অপেক্ষা মিলনের উৎকণ্ঠাই যে ভারতীয় আদর্শে রসঘন ও মধুর। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা সম্ভোগের চাইতে আকুলতাকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে। কালিদাস যেমন উজ্জয়িনীতে বসে সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি অলকার নিত্য সৌন্দর্য দর্শন ও উপভোগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের অপূর্ব লীলামাধুর্য আস্বাদন করেছিলেন আধুনিক যুগের বাংলাদেশে বসে। বর্তমানের এই গ্লানি-ক্লেশে-ভরা খণ্ডিত বিষাক্ত জীবন হতে মুক্তি পাবার জন্যে রবি-কবি অতীত ভারতের স্বপ্ন-সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন। রোমাণ্টিক কবিচিত্তের এই অতীত-প্রবণতা সর্বদেশেই আছে। বিশেষভাবে ইংরেজ-কবি কীট্‌স্ এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছেন বলে মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, যৌবনোচ্ছল আবেগচঞ্চল দেহাপেক্ষী প্রেমের পরিণাম শুভ নয়, এর স্থায়িত্বও অধিকক্ষণ ব্যাপী নয়—যে প্রেম ত্যাগে ও নিয়মব্রতে মহীয়ান সেই প্রেমই কল্যাণপ্রদ পূর্ণ ও সার্থক। যে রূপ কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই প্রলুব্ধ করে, যা শুদ্ধমাত্র মানবমনকে কামনা বাসনায় আলোড়িত করে—তা কালিদাসকে যেমন রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি তৃপ্তি দিতে পারে নি। ভোগ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে দম্পতির দেহকেন্দ্রিক যে প্রেম-মিলন, তা মরণ-মিলন। তাই দেহকেন্দ্রিক প্রেম অভিশপ্ত হয়েছে—'কুমারসম্ভবে' মদনভস্মে আর 'শকুন্তলায়' ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে। মদন এবং দুর্বাসা এই অকল্যাণকর প্রেমের রূপকমাত্র। জীবনে পূর্ণতা পেতে হলে প্রেম-সাধনার সংগে শ্রেয়-সাধনারও প্রয়োজন। প্রেয়-সাধনা

আত্মকেন্দ্রিক, শ্রেয়-সাধনা বিশ্বকেন্দ্রিক—ঋষির শাপে তা বিনষ্ট হয় না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবনের মনস্তত্ত্বটীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী শুধু পুরুষের কামিনী নয়, সে তার সহধর্মিনীও। তাই একদিকে সে যেমন উর্বশী, তেমনি অন্যদিকে সে কল্যাণীও। উমা-শকুন্তলাকে প্রথমদিকে উর্বশী মূর্তিতে দেখতে পাই, কিন্তু পরে তাদের মাতৃমূর্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতে নারীর প্রেয়সী মূর্তির চেয়ে তার মাতৃমূর্তিই বড়। কারণ, সন্তান-কামনা করা ভারতের ধর্মের অংঙ্গীভূত। প্রেয়সী এবং মাতা নারীর এই উভয় মূর্তির সমন্বয়-সাধন করেছেন কালিদাস তাঁর এই নাটকদ্বয়ে। একদিকে ফুল, অন্যদিকে ফল, একদিকে স্বর্গ, অন্যদিকে মর্ত্য, একদিকে প্রবৃত্তি, অন্যদিকে নিবৃত্তি, একদিকে বন্ধন, অন্যদিকে অবন্ধন, একদিকে গৃহীর ধর্ম, অন্যদিকে যোগীর ধর্ম—এই 'ভাবটীকে উম্মোচন করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। কালিদাসের কাব্যের মর্মকথা এর পূর্ব্বে ঠিক এরূপে আর কেও হৃদয়ংগম করতে এবং প্রকাশ করতে সমর্থ হন নি। রসবিচারের দিক দিয়ে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটীই প্রাচীন সাহিত্যের তথা সমগ্র রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোক-বিচ্ছুরণে কালিদাসের শিল্পসংসার আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ভাসমান হয়ে উঠেছে। প্রেয়র ও শ্রেয়র অদ্ভুত সমন্বয়-সাধন করেছেন বলে কালিদাস ও তাঁর কাব্য রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন। জগতের অন্য কোনো কবিকেই রবীন্দ্রনাথ এতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখেন নি। যে অভিনব দৃষ্টিভংগী দিয়ে রবিকবি কালিদাসকে নিজে দেখেছেন ও অপরকে দেখিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মানসশিষ্য, কালিদাসের সৌন্দর্য সাধনার উত্তরাধিকারী।

'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের একটি রস-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। কালিদাসের কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, বিদেশীর কাব্য বিচারের আদর্শদ্বারা বিকৃত করেও ফেলেন নি। আপন অন্তরের রসানুভূতি দিয়ে তার সত্য ও সৌন্দর্যকে লাভ করে ভারতীয় সমাজ-জীবনের ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফলের সাথে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘ থেকে উত্তরমেঘে পরিণতির মতনই শকুন্তলা নাটকে প্রেমকে স্বভাব-সৌন্দর্যের দেশ হতে মংগল সৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হয়েই শকুন্তলা-নাটকটি এক বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করেছে। মূক প্রকৃতিকে মানুষ হিসেবে রূপক রচনা বলে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত অর্থাৎ যথাযথ রেখে তাকে এমন সজীব করে তুলবার উদাহরণ অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভারতীয় জীবনের সংগে প্রকৃতির যোগসূত্র কত গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ এবং ইয়োরোপীয় জীবনের সংগে প্রকৃতির যোগসূত্র কত বাহ্যিক ও শূণ্যগর্ভ এবং প্রবৃত্তি প্রকাশে ভারতীয় জীবন কত সংযমপূর্ণ ও ইয়োরোপীয় জীবন কত উদ্দামময়, এগুলি রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক ও সেক্‌স্‌পিয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের পরস্পর তুলনা করে দেখিয়েছেন। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের সংবাদবাহক মেঘকে জগতের বহুতর চঞ্চল সৌন্দর্যের দেশ অতিক্রম করে অলকাপুরীর চির-সৌন্দর্য-তীর্থে পৌছুতে হয়েছিল। শকুন্তলায়ও নরনারীর প্রেম ধূলির জগতের কামনাপংকিলতা হতে যাত্রা করে, স্বল্পায়ু দেহকেন্দ্রিক সৌন্দর্য

অতিক্রম করে, নিষ্কলুষ স্বর্গীয় প্রেমের আনন্দতীর্থে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাসনাসর্ব্বস্ব প্রেমের এই আধ্যাত্মিক পরিণতি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে অপূর্ব মহিমা দান করেছে।

'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, শুধু কাদম্বরীর নয়, সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। গল্প, কাহিনী বা লোকচরিত্র আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মূলস্থান গ্রহণ করেনি, মূলস্থান গ্রহণ করেছে কাব্য—অর্থাৎ ভাষা, ভাষার গাম্ভীর্য, ধ্বনিতরংগ, শব্দতরংগ, কারুনৈপুণ্য, কলাকৌশল এবং ভাবসৌন্দর্য। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। সমগ্র কাদম্বরী কাব্য যেন একটা বিশাল চিত্রশালা—ভাষার কারুকার্য সম্বলিত ফ্রেম দিয়ে নির্মিত কাদম্বরী পট। এ যেন ভাষার শুধু 'তাজমহল'। এর কারণ, প্রাচীন ভারতের জনসাধারণ অত্যাশ্চর্য কাহিনী বা গল্প শুনতে ভালবাসত না। তার কারণ, ভারতীয় সভ্যতা আরণ্যক। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সভ্যতা নাগরিক বলে প্রাচীন ইউরোপীওরা অত্যাশ্চর্য কাহিনী বা গল্প শুনতে ভালবাসতো। মোটকথা, প্রাচীন ভারতবর্ষে কর্মজীবনের চেয়ে ভাবজীবন যে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল, তার নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যসমূহে প্রচুর মেলে। কাদম্বরী তারই অন্যতম।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রস-সম্ভোগ এবং সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী সাহিত্য-সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর রসসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের উপেক্ষিতা অবজ্ঞাতা নায়িকাদের অব্যক্ত হৃদয়বেদনাকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি যেন তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে তাদের অনুল্লেখিত যৌবনবেদনা, তাদের প্রণয়তৃষিত নারীহৃদয়ের সুদূর কামনাকে অনুভব করে স্বতোৎসারিত আবেগে নতুন করে তাদের অন্তরের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছিলেন পূজারীর বেশে। আত্মনিষ্ঠ ভক্তিদৃষ্টি নিয়ে তিনি সেই কাব্যভূমিতে স্বেচ্ছাবিচরণ করেছেন। পরিক্রমণকালে তাঁর কবিমন কাব্যকাননে অনাদৃতা চারিটি নারীকে ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে অনুভব করেছে। এদের অনাদরের কথা কবি-কল্পনার সৃষ্টি, ভাবুকমনের আবিষ্কার। রামায়ণের লক্ষ্মণজায়া ঊর্মিলা, শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এবং কাদম্বরীর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা স্ব স্ব কাব্যে খুবই সংকীর্ণস্থান অধিকার করে আছে।

'রামায়ণ' মহাকাব্যের প্রারম্ভে বিদেহ নগরীর বিবাহ-সভায় নববধূবেশিনী ঊর্মিলাকে একবারমাত্র উপস্থিত করেই কবি তাকে অযোধ্যার রাজ অবরোধের কোন এক অবজ্ঞাত প্রান্তে আড়াল করে ফেললেন, আর তাকে দেখা গেল না। ঊর্মিলা রাজপ্রাসাদের শুদ্ধান্তঃপুরে যেন চিরকালের মতো নির্বাসিতা হয়েছে। রামের সেবায় প্রাণপ্রিয়কে উৎসর্গ করে সুদীর্ঘ বিরহে বিশুষ্ক ব্রততীর মতো এই ব্রতচারিণী কাব্যকাননে অনাদৃতা হয়ে রইলো। রবীন্দ্রনাথ রসিক পাঠকের হৃদয়প্রীতির সিংহাসনে তাকে স্থায়ী আসন দান করেছেন। তেমনিভাবে 'শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অংকের পর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সহসা কাব্যলোক হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে। দেখা যায়, শকুন্তলাকে যারা অভিন্নহৃদয়া মনে করেছে, পরম দুঃখের সময় তাদের অবশ্যকবোধে বাদ দেওয়া কাব্য-বিচারের যুক্তি হিসেবে সংগত হলেও, হৃদয়ভাবের দিক হতে তাকে নিষ্ঠুর না বলে উপায় নেই। তাই কবি অনুযোগের সুরে বলেছেন, কালিদাস তাদের বিদায় দিলেও পাঠকের

হৃদয়মন্দিরে তারা শাশ্বত আসন অধিকার করে থাকবে চিরকাল। 'কাদম্বরী' কাব্যের কুলুতরাজ্যের তরুণযৌবনা কন্যা পত্রলেখা যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের নিত্য সহচরী। নবযৌবনা পত্রলেখার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনরেখা যেন সত্ত অংকিত অথচ কবি তার নারীত্বের প্রতি—তার যৌবনের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করলেন না। যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের সাথে তার যে সখিত্বের সুমধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তার তুলনা আর কোনো সাহিত্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ এই পাষাণীভূত রমণীমূর্তির অন্তরালে নারীহৃদয়ের প্রেমক্ষুধা কল্পনা করে উপেক্ষিতা পত্রলেখাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কাব্যের উপেক্ষিতা নির্বাচনে নিরূপণে ও প্রতিপাদনে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাই ক্রিয়াশীল। এই প্রবন্ধটি তাঁর সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ভারতের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি প্রাচীন পালিসাহিত্য বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদং'-এর মধ্য দিয়েও তিনি সনাতন ভারতের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন। সমস্ত বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে উঠে পরমপুরুষের সংগে মিলিত হওয়াই ভারতের সমস্ত ধর্মের মূল সত্য তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কীভাবে বুদ্ধদেব কতটা গ্রহণ করেছেন, তার হিসেব-নিকেশ এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ করেন নি। ধম্মপদের মধ্য দিয়ে ভারতের যে অন্তরতর বাণী প্রকাশিত তারই আভাষ তিনি দিয়াছেন এই 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে। ভারতের কৃষ্টি সভ্যতা ইতিহাসের ধারা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীতে অপূর্বত্ব লাভ করেছে।

এশিয়ার তথা নিখিল বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার জীবন্ত বিগ্রহ—তাঁর বাণী বাঙালীর প্রাণের বাণী, সেই বাণীর ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় ভারতের শাশ্বত আত্মা। রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় কল্পনা, মানবহৃদয়ের মর্মপ্রবেশিনী দৃষ্টি, প্রাণস্পর্শী রসসৃষ্টি, সূক্ষ্ম সমবেদনা এবং ঘনপিনদ্ধ ভাষা—এ সমস্তই তাঁর একান্ত নিজস্ব, 'মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।'

প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধ সমালোচনা—গতানুগতিক হয়ে ওঠে নি, সেগুলি যেন কবির কাব্যের এক একটি সম্পূর্ণ নিবিড় উপলব্ধি—ভাবে ভাষায় প্রাঞ্জলতায় সেগুলি এতই সুন্দর যে বিষয়বস্তু সেকালের হলেও তা নিখিল মানবের আস্বাদনের যোগ্য; বস্তুবিশেষ অবলম্বন করলেও নির্বিশেষ ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে সেই সকল আশ্চর্য সৃষ্টি। অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, বিচিত্র উপমায়, আশ্চর্য চিত্র-ধর্মীতায় ও রসধর্মীতায় 'প্রাচীন সাহিত্য' রবীন্দ্র-গদ্য-গ্রন্থগুলির অন্যতম দিগ্‌দর্শন।

ভোগের সহিত ত্যাগের, প্রেমের সহিত তপস্যার এবং কুঞ্জবনের সহিত তপোবনের গংগাযমুনাসংগম এখানে সাধিত হয়েছে। অধ্যাত্মরূপা গংগার গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী মূর্তির সহিত প্রেমরূপা রাধার লীলাকুলময়ী যমুনার মিলনে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীনসাহিত্য' যেন প্রয়াগতীর্থের গৌরব লাভ করেছে। কবির বর্ণাঢ্য কল্পনার আলোকসম্পাতে, যুগোচিত মনোভংগির প্রাণস্পর্শে 'প্রাচীনসাহিত্য' আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর রসাবেদনে উদ্‌ভাসিত।

ভূপেন্দ্রনাথ হালদার

## সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য্যবোধ

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিটাকেই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি বস্তু অপরটি অতিবস্তু। এ-দুটি একটি অপরটির পরিপূরক। চিত্রশিল্পি তুলিকা এবং তুলিকা চিত্রশিল্পি ভিন্ন যেমন অপূর্ণ, তেমনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ-দুটিও একটি অপরটির সহায়তা বা সহযোগিতা ছাড়া সার্থক নয়। এর প্রথমোক্তটি ধারণ করায় এবং দ্বিতীয়টি ধারণ করে। সৌন্দর্য হ'ল সেই অতি বস্তু বা বস্তুত্তর কোন অস্তিত্ব যে ধারণ করে এবং যার মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত কারণসমূহ সমাহিত। তখন সৌন্দর্যপ্রসূত যা কিছু তাকে আমরা সুন্দর বলি। বিশ্বের যা কিছু বস্তুর পর্য্যায়ে পড়ে তা সবই এই কারণসমূহের পানে ধাবিত হয়। এটাই চিরন্তন নিয়ম। বোধ হয়, যা কিছু বস্তু তাই ওই কারণগুলোকে অন্য কোন বস্তুরূপের মধ্যে প্রতিফলিত করে পূর্ণ হতে চায়। কিন্তু এই অপূর্ণতা চিরন্তন। তাই ফুল ফোটে; কিন্তু ফুল ফোটাই ফুলের চরম সার্থকতা নয়। ফুল থেকে হয় ফল; ফল থেকে বীজ; বীজ থেকে তরু; তরু থেকে আবার ফুল। সৃষ্টির এই ঘূর্ণির প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যে সৌন্দর্যের অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তা অন্তর্নিহিত। তাই বস্তুর মধ্যে পূর্ণ বিকাশের আকাঙ্ক্ষাটাও ধাবিত হয় এক উপাদান থেকে আর এক উপাদানে। তার এই ধাবমান গতি স্থিতিহীন।

সুতরাং কোন বস্তুকে সুন্দর বলা যায় তখনই যখন আমাদের উপলব্ধি সেই বস্তুর স্থূল সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং সেই স্থূলত্বের সঙ্গে সংপৃক্ত না থেকেও তার সত্তার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। এই উপলব্ধির কাছে বস্তুর যে আবেদন তা সীমাহীন; এবং এই সীমাহীনতার আবেদন আছে বলেই আমাদের মন সর্বদা অতৃপ্তিকর উপলব্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। চোখের সামনে ফুলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে সেই ফুলের কোন্ জায়গাটা সুন্দর তা বলা কঠিন; কারণ আমাদের সৌন্দর্যোপলব্ধি সেই ফুলটির কোন বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের কৌতূহলী মন ফুলের মধ্যেকার ফুলত্বকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়। সেই খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই শিল্পের জন্ম। প্রবাসজীবন চৌধুরী বলেছেন: "সৌন্দর্য কোন বস্তুতে তাহার রং বা আকারের মত লাগিয়া থাকেনা। বস্তুর ভাবলাবণ্য অনুভবের দ্বারা সৌন্দর্যকে আমরা পাই।...যখন একটি বস্তু কয়েকটি সাধারণ বোধও সংকেত দ্বারা আমাদের কোন হৃদয়বৃত্তিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে তখন আমরা সেই বস্তুকে সুন্দর বলি।"—(সৌন্দর্য-দর্শন)। ফুলের সৌন্দর্যোপলব্ধির কালে আমাদের কৌতূহলী মনের কাছে 'ফুলটা কি' এটা প্রধান কথা নয়, 'ফুলটা কেন' কেবল এ প্রশ্নটাই মুখ্য। মানুষের মনের চিরন্তন বিস্ময়বোধ, উপলব্ধি বস্তুর গভীরে তার আকর্ষণী শক্তিকে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করতে চায়। কিন্তু যে ভাবময় এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং সৌন্দর্য তেমনিই অধরাই থেকে যায়। মানুষের ঈপ্সা ও বস্তুর আকর্ষণী শক্তির মধ্যে যেন এমনি চিরকালের একটা লুকোচুরী খেলা চলে। মানুষের এই সৌন্দর্যেপ্সা উপলব্ধ বস্তুর কারণ বা কারণসমূহের পানে ছুটে চলে, কিন্তু

বস্তুর বস্তুত্ব চিরকালের জন্য নাগালের বাইরে থেকে যায়। বস্তুর এই সীমাহীন আহ্বান মানুষের মনকে সেই বস্তুর স্থুল অস্তিত্বের মাধ্যমে টেনে নিয়ে যায় অনন্তের দিকে। ফুলকে তাই ভালো লাগে—তাকে শতবার দেখলেও আমাদের ভালো লাগা শেষ হ'য়ে যায় না—আমরা বলি "বাঃ কি সুন্দর!"

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অধ্যায়। ফুলের রং বৈচিত্র্য তার পাপড়ির বিশেষ ধরণের শয্যা, তার আশে পাশে সবুজের সমারোহ—এ সব কিছুই যে পরিবেশের সৃষ্টি করে, মানুষের মন সেই পরিবেশের মোহে এসে তার মধ্যে সৌন্দর্য সত্তাকে খুঁজে পেতে চায়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য লক্ষ্মীর সন্ধানে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠেছেন "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে। তুমি বিচিত্র রূপিণী।" কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এই আকাশ মাটি আর আলো এমন এক সৌন্দর্যময়ী সত্তাকে সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছে যাকে বিশ্বের বিরাটত্বের মধ্যে কবি হারিয়ে ফেলছেন। অনেকের মতে জড় পদার্থের সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। ডঃ সুধীরকুমার নন্দী হেগেলীয় 'আইডিয়া' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন—"যেখানে প্রকৃতির বুকে Idea-র প্রকাশের ফলে প্রকৃতির জড় উপাদানে সাযুজ্য ও সমীপ্যবোধ আসে—আমরা প্রকৃতির মধ্যে unity খুঁজে পাই।"...এই unity of manifold' ( বহুধাভক্ত সৃষ্টির মধ্যে ঐক্যতান ) যেখানে আছে সেখানে আমরা সুন্দরকে পাই কিন্তু "একতাল লোহা তাকে আমরা সুন্দর বলবনা, কারণ তার বিভিন্ন অংশগুলি কোন সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে বিধৃত নয়—সেখানে সঙ্গতি নেই, মিল নেই, ছন্দ নেই, কাজে কাজেই সুন্দরও সেখানে অপ্রকাশ।" —( নন্দনতত্ত্ব )। কিন্তু মানুষের আপেক্ষিক ধারণা নিয়ে কি করে মেনে নেই যে, জড় পদার্থে সঙ্গতি নেই, মিল নেই বা ছন্দ নেই। স্বীকার করতে কুণ্ঠা আসে যে জড় পদার্থে বৈচিত্র্য নেই বা তার অংশগুলি কোন সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে বিধৃত নয়। জীবের মধ্যে যে লীলাচাঞ্চল্য আছে জড়ের মধ্যে সেটা নেই—এ কথা স্বীকার্য; কিন্তু তার মধ্যে জড়সত্তার পূর্ণতা নেই—এ কথাকে সহজে স্বীকার করা যায় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে জীবের মধ্যে যে পরিমাণে সীমাহীন ভাবের আভাস আছে জড় সে তুলনায় অনেক বেশী স্থুল: কিন্তু Environment বা পরিবেশের সাহায্যে যে কোন জড় পদার্থে সীমাহীনতা ফুটিয়ে তোলা যায়। তবে অন্যান্য জীব-সত্তার ভাব বা চেতনার মত সে বস্তু নিজের মধ্যে সীমাহীন নয়; কিন্তু পরিবেশ তাকে সীমাহীন ক'রে তুলতে পারে। সেই লৌহখণ্ডের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমানুপাতিক সাজসজ্জা যে একটি নন্দন-শিল্পের সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক বাসগৃহের বসবার ঘরে একটি শুকনো ডাল সাজিয়ে রাখলে তাকে সুন্দর লাগে; কিন্তু সেই শুকনো ডালই রাস্তায় বা মাঠে পড়ে থাকলে তাকে আবর্জনা বলে মনে হ'তে পারে। এক পোছ কালো রং-এর দুই পাশে-পাশে যদি ক্রমশঃ হাল্কা রং এবং ক্রমান্বয়ে বড় আকারের প্রলেপ ব্যবহার করা যায়, তবে সেই বৈচিত্র্যহীন কালো রং-এই সীমাহীনতা ফুটে উঠে। সুতরাং সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলাচাঞ্চল্য নয়, Environment-এরই প্রয়োজন বেশী।

সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও সাবজেক্‌টিভ। যখন আমরা কোন বস্তুকে সুন্দর বলি, তখন বুঝতে হবে আমাদের সুন্দর লাগাটাকে আমরা সেই বস্তুর উপর আরোপ করছি। শিল্পের সৌন্দর্যোপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। হেগেলীয় শিল্প ধারণাকে ডঃ সুধীরকুমার নন্দী সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন···"শিল্পরূপ আমাদের চোখের সামনে যাকে তুলে ধরে ভাবের ব্যঞ্জনা তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায় নব নব ভাব লোকের শিখরে শিখরে।"

সৌন্দর্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগ—এ দুটিই একমাত্র সম্বল। সুতরাং মানুষের ধারণা-ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেই সৌন্দর্যোপলব্ধির কারণ বা কারণ-সমূহ বিচার্য। সৌন্দর্যোপলব্ধির প্রধান কারণ হ'ল আকর্ষণ। আকর্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের আদিম পাশবিক প্রবৃত্তি যথেষ্ট কাজ করে; যেই কারণে চোখের সামনে গোলাপের পাপড়ি পড়ে থাকলে সেটাকে অন্যমনস্ক হ'য়ে আঙ্গুলের চাপে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করে। আবার, সৌন্দর্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের বস্তুত্তর অস্তিত্বের সীমা টানতে গেলেই কামভাবের উদ্রেক হয়; কারণ, মানুষের মন সর্বদা কোন স্থূল বস্তুর মাধ্যমে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চায়। কিন্তু যেহেতু সৌন্দর্যোপলব্ধি সীমাহীন উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে চলে, আর যেহেতু মানুষের সীমিত অনুধাবন শক্তি তার সঙ্গে পা ফেলে এগুতে পারে না, সেই কারণে মানুষ স্বভাবতই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই সৌন্দর্যকে পেতে কামনা করে। পায়না বলে তার কামনা আরও উদগ্র হ'য়ে উঠে। এ প্রত্যয় হয়ত অনেকের কাছে অভিনব বলে বোধ হবে এবং তাঁদের রূঢ় সমালোচনা উগ্র হ'য়ে উঠতে পারে। তবে বিষয়টিকে নিয়ে আরও বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন—এ কথা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন।

উপরোক্ত প্রত্যয়টি অসম্পূর্ণ, কারণ সৌন্দর্যোপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র মানবিক প্রবৃত্তির কথাই উল্লিখিত হ'য়েছে। উপলব্ধির আর-একটা দিক আছে—মানুষ যেখানে প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে সৌন্দর্যোপলব্ধি করে সেখানে অন্য এক রূপ ধারণ করে। তখন হৃদয়, উপলব্ধির দ্বারা যে সুন্দরকে পায় বুদ্ধি তার মধ্যে সত্যকে অন্বেষণ করে। প্রবাসজীবন চৌধুরী প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন: "আমাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে, তখনই সত্যকে চাই। এই অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হইলে আনন্দ পাই, কিন্তু এই আনন্দ সৌন্দর্যোপলব্ধির আনন্দ হইতে ভিন্ন। ······যখন সত্যকে চাই তখন কোনা বস্তুর সত্যটি ঠিক কেমন তাহাই জানিতে চাই, ঐ সত্যটি আমাদের কেমন লাগে এ কথা তখন অবান্তর। পক্ষান্তরে সুন্দরকে যখন উপলব্ধি করি তখনই আমাদের প্রকাশ-ইচ্ছা জাগিয়া উঠে······এই প্রকাশ ইচ্ছাটি সফল হইলে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়।"

রবীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের হীনতর বৃত্তি-প্রবৃত্তির বর্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাই চরম সৌন্দর্য। তবে তাঁর উর্বশী কবিতায় যে হেগেলীয় ফিউজিটিভ এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্যময়ী নারীর উল্লেখ পাই তাকে চিরকালের মানুষ কামনা ক'রে এসেছে এবং, তারই মাধ্যমে সত্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

কীট্‌স্‌-এর "La belle dame sans merci" কবিতায়ও এই অধরা নারীর উল্লেখ পাই যে মানুষের মনে প্রথমে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধরা দেয় কিন্তু পরে এক উদগ্র সৌন্দর্য পিপাসা জাগিয়ে তুলে হারিয়ে যায় চিরকালের বিস্ময় আর রহস্যময়তার কুয়াশার অন্তরালে। সৌন্দর্যের এ কামনা, মানুষের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের কামনা; সে কামনা ইন্দ্রিয় থেকে সরে গিয়ে যখন চেতনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে মানুষ তখনই উপলব্ধি করেছে সীমার মধ্যে এক অসীমকে। তবে এ প্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধে অবান্তর।

সৌন্দর্যের আহ্বানে সাড়া দেয়নি এমন মানুষ কোন যুগে, কোন লোকে নেই। কিন্তু যে এই আহ্বানের টানে ছুটে গেছে তাকেই চিরবিরহ ও চির-ঔদাসীন্য বরণ করতে হ'য়েছে। সে তার কল্পনার সৌন্দর্যলোকে এমন কিছু পায় যার জন্য পৃথিবীর বাস্তবতা তার কাছে অবাঞ্ছিত ও অর্থহীন বলে বোধ হয়। অথচ জগতের পার্থিবতাকেও সে হারিয়ে যেতে পারেনা—তাকে জীবন ধারণ করতে হয় এই পৃথিবীর মধ্যেই। তাই সে উদাসীন ও আপাতদৃষ্টিতে অতৃপ্ত। কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে যখন এমনি দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তখনই তার মন হ'য়ে ওঠে সৌন্দর্য-পিপাসী বা সৌন্দর্যান্বেষণ ব্রতী। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে এই সৌন্দর্যান্বেষণ বা Quest for beauty স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। কীট্‌স্‌-এর মধ্যে যে সৌন্দর্যসাধনা স্বল্পায়ুর জন্য পূর্ণ হ'তে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাই এক পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে।

যাকে গেটে বলেছেন Eternal woman দুই যুগের দুই মহান রোমান্টিক কবি, কীট্‌স্‌ এবং রবীন্দ্রনাথ, এই চিরন্তন ছলনাময়ী অধরা নারীকে এক বিচিত্র সৌন্দর্য সমাবেশের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। যেই সুমহান সৌন্দর্যকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং যেই অনধিকৃতা সৌন্দর্যকে একবার পেয়ে পৃথিবীর নানা বাস্তবতার মধ্যে হারিয়েছেন, তারই সন্ধানে কবিদ্বয় ছুটে গেছেন। কল্পনার এক বিস্তীর্ণ তেপান্তরের পথ বেয়ে। এ পথের শেষ নেই। 'সৌন্দর্য' এক ছলনাময়ী নারীর মতন চিরকালের মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে অনন্তের পানে।

**শোভন গুপ্ত**

## সাহিত্যে বাস্তবতা

বাস্তবতা ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে না। সাহিত্যের উৎস মানবজীবন। মানবজীবনই বাস্তবতার সর্ব্বাপেক্ষা শাশ্বত স্বরূপ। সাহিত্যের প্রকাশ ভাষায়। ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার, মাত্র লৌকিক জীবনের চাহিদায়ই। শুধুমাত্র, কোনও সাহিত্য সৃষ্টিতে অথবা কোনও সাহিত্যের বিশেষ কোনও যুগে বাস্তবতার প্রাধান্য অন্য সাহিত্য সৃষ্টি অথবা অন্য কোনও বিশেষ যুগ অপেক্ষা কম অথবা বেশী হইতে পারে। কেবল মাত্র পরিমাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, সম্পূর্ণ বস্তুটির লোপ সাহিত্য হইতে

ঘটিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা একটি ধর্ম্ম অথবা গুণমাত্র, তাহা কোনও দ্রব্য নহে ; এই জন্য সাহিত্যে বাস্তবতার নানা প্রকার ভেদ সম্ভব। মনস্তত্ত্ববাদ হইতে মার্কসপন্থীর বাস্তববাদ, সবই বাস্তবতা বলিয়া প্রচলিত।

সাহিত্যিকের সৃষ্টি বিজ্ঞানী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে কোনও বস্তু সমগ্র মানবজীবনের সহিত তুলনা মূলক তাৎপর্য্যে কি প্রতিপন্ন হয় তাহা দেখিতে চেষ্টা করেন। অতএব সত্যের সহিত, বাস্তবের সহিত, সাহিত্যিকের সম্বন্ধ অতি গভীর।

সাহিত্যের উৎস মানবজীবন। কবি অপরের মনের হাঁসিকান্না আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, উদ্দাম, শক্তি অথবা নিজ মনের কোনও বিশেষ চিন্তা অথবা ভাবকে ভাষায় রূপ দান করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি প্রকৃতির, বিশেষ কোনও প্রকাশের বর্ণনা, গুণকীর্ত্তন অথবা সমালোচনা করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। অন্য মানুষের সম্বন্ধে কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

"আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে
সকাল হ'তে সন্ধ্যে
আমরা চাষ করি আনন্দে।'

নিজ মনের কবিতায় লিখিয়াছেন—

"আমার মনে একটুও নাই বৈকুণ্ঠের আশা
এইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস
যার পরে ঐ মন্ত্র পড়ে
দক্ষিণে বাতাস।"

কবি স্বীয় ও বিশ্বমনের কবিতায় লিখিয়াছেন—

"পর্ব্বত চাহিল হোতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহাবা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

কারণ　　"বাজিল ব্যাকুল বাঁশী নিখিলের প্রাণে
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খানে'।

এই তিন ভাব ব্যতীত কবির ঝুলিতে অন্য কোনও ভাব নাই ; থাকিতে পারে না।

সাহিত্যের প্রকাশ ভাষায়। বহুযুগ পূর্ব্বে, সমাজ সৃষ্টির আদিম পর্ব্বে মানুষ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টির জন্যই ভাষার উদ্ভব হয়। অতএব ভাষা নেহাতই এক আটপৌরে বস্তু। একজনের জীবন ধারণের তাগিদ অপরের কাছে ব্যক্ত করার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ অমৃতের পুত্র সে যাহাই স্পর্শ করে তাহাতেই মহত্ব আনিতে পারে। ভাষারও তাই সময় ও উপলক্ষ বিশেষে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও তাৎপর্য্য ঘটিয়া থাকে। প্রতিদিনের ভাব প্রকাশের ভাষাকে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্য। দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাহার ভাষণ ও চমৎকারিত্বপূর্ণ উপমাগুলির যোগসূত্র আছে। কোনও সাহিত্যিক লিখিলেন "সোনার পাহাড়" ইহা বাস্তব জগতে হয়ত নাই। কিন্তু বাস্তব জগতে সোনা আছে, আর পাহাড় সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই বাস্তব পদার্থের সংমিশ্রণে এক অবাস্তব পদার্থের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভিত্তি বা উপাদান সর্ব্বদাই সেই বাস্তব জগত। পুরাতন ও মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে বাস্তবতার স্থান হয়ত আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বাস্তবতার ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলনা। ইতিহাসের পাতায় আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, সাহিত্য ততই বাস্তবধর্মী হইতেছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য সমূহে আমরা বাস্তবতার নিদর্শন নিশ্চয়ই পাই, কিন্তু তাহা আনুসঙ্গিক মাত্র। দেবদেবীর মঙ্গল পূজার তাহা কেবলমাত্র অনুপান। প্রাচীন যুগে দেব-দেবী ও বীর পূজা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জন্যই যে সেই যুগে দেবদেবীতে অগাধ বিশ্বাস ছিল। অলৌকিক চিন্তা তাঁহাদের মনের এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া থাকিত। এক হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, যাহা আমাদের নিকট অলৌকিক ও বাস্তব বিরোধী তাহা তাঁহাদের কাছে গভীর ভাবে সত্য ও বাস্তব ছিল। "ফুল্লরার বারমাস্যা'' কাব্যে আমরা এক বিশেষ বাস্তবতার প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা আমাদের এক বিশেষ যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে আমরা এক বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের খুঁটিনাটি, নানা বিষয় পরিচয় লাভ করি :—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়—বঙ্গ—উৎকল—অধিপ
যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে
হৈল রাজামামুদ সরিপ ॥
মন্ত্রী হলো রায়জাদা ব্যাপারিয়া ভাবে সদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হলো অরি।
মাপে কোপে দিয়া দড়া পোনের কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহারি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনাকম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ —ইত্যাদি

সমস্ত সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা ও জগতকে সত্যের প্রতি সহানুভূতিশীল করা। সত্যকে সাহিত্যিক উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে এক বিশেষ শক্তির

অধিকারী বলিয়া থাকি। এই শক্তি তাঁহার তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিশক্তি। তিনি তাঁহার বিশেষ শক্তির দ্বারা কোনও এক বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। সাহিত্যিকের কর্ম্ম ঐতিহাসিক অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও দৃঢ়তর। ঐতিহাসিক এক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া কোনও বিশেষ সত্যকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাহিত্যিক এক বিশেষ ঘটনাকে অন্য সকল ঘটনার সহিত এক যোগসূত্রে আবদ্ধ করেন। আপাত দৃষ্টিতে যাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্ম বিচারে তাহাকে বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। সাহিত্যিক মনুষ্যজীবনের উদার পটভূমিকায় বাস্তব কি তাহা নির্ধারণ করেন। বাস্তব বলিতে যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য শুধু তাহাই নহে। —বাস্তবতা একটি গুণবিশেষ। "পথের পাঁচালী"র অপু শুধুমাত্র এক রেখাচিত্র, একটি শুষ্ক, সমতল, ছবি হইতে পারিত। কিন্তু অপুর চরিত্র জীবন্ত, এবং জীবন্ত এই জন্যই যে কবি তাঁহাকে মানবজীবনের পটভূমিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অপুর মধ্য দিয়া মানুষের কতকগুলি চিরন্তন সত্যের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই চিরন্তন সত্যের বিকাশ না ঘটিলে, কোনও সাহিত্যিককে বাস্তবধর্মী বা সাফল্যমণ্ডিত বলা যায় না।

সাহিত্যের প্রধান গুণ এই যে উহা আমাদের সহানুভূতি সমূহের বিস্তার ঘটায়। আমরা এক যুগে বাস করিয়া নানা যুগের ঘটনা অনুভূত হইতে ইচ্ছা করি। একজন মানুষ হইয়া নানা মনুষ্যের জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাই। এবং ইহার ভিতর দিয়া আমরা কতকগুলি সত্য বারম্বার প্রকাশিত হইতে দেখি। অতএব সাহিত্য সৃষ্টির সময় সাহিত্যিক বাস্তবতার প্রতি দ্বিবিধ দৃষ্টি রাখেন। প্রথমত তিনি পাঠকের মনে এক বিশেষ ছবি উপস্থিত করেন, এবং সেই যুগের মানুষের সহিত-সহানুভূতিশীল করিতে চেষ্টা করেন। দুইকাল ও শ্রেণীর মধ্যে তিনি একই ভাব সমূহের যোগাযোগ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যিক সুসাহিত্যিক হইলে, বাস্তবকে এমন ভাবে উপস্থিত করেন যে পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সুর জাগিয়া উঠে। তাঁহার রচনা বিষয়ের যে যে প্রকৃত পরিচয়, তাহার যে অন্তর্নিহিত প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তাঁহার বিষয়ের যে প্রকৃত বাস্তব রূপ, যাহা শুধুমাত্র তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, সুধিগণ তাহা ভাষা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেন।

সাহিত্যিক কোনও বিশেষ সময়ে কোনও এক সত্যউপলব্ধি করিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে এই সত্যই বাস্তবসত্য, কারণ, শুধুমাত্র ইহাই, পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবার উপযোগী কারণ উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছে। সত্যের যে সৌন্দর্য্য, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শিল্পসৃষ্টি করিলেন। সাহিত্য যতই উন্নত স্তরের তাহাতে ভাবের উপর শিল্পের আমরা ততই আধিপত্য লক্ষ্য করি। কিন্তু শিল্প বাস্তবতার বিরোধী নহে। শিল্পী বস্তু হইতে তাহার বাস্তবতা গ্রহণ করিয়া তাহাকে সুন্দরের রূপদান্ করেন। অতএব শিল্প, সাহিত্যে বাস্তবতার এক অঙ্গ। ভাবকে ভাষা ও শিল্পের সাহায্য না দিলে ভাব জীবনধারণ করিতে পারেনা। সে শিল্প অতি সমৃদ্ধ অলঙ্কারও হইতে পারে, অথবা কঠোর সরলতাও হইতে পারে। কিন্তু শিল্পের সংযম ব্যতীত

বাস্তব সাহিত্যে সফল প্রকাশ হইতে পারে না।

তাই কবি বলিয়াছেন—

"এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা ॥"

**অদিতিনাথ সরকার**

**ঈশ্বরের সঙ্গে দু'দণ্ড ॥** স্বদেশরঞ্জন দত্ত। সাহিত্য। ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। দুই টাকা।

**বকুলতলা ॥** সুশান্ত বসু। সাহিত্য। ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০ ॥ দুই টাকা।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত এবং সুশান্ত বসুর কবিতা গ্রন্থ দু'টি পড়ে অনেক কথা মনে হয়েছে। এঁরা আধুনিক এবং তাঁদের কাব্য আধুনিক। কিন্তু আধুনিক কবিতা তো এমন কোন বস্তু নয় যাকে বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে বেঁধে ফেলা যেতে পারে। একটা ভাবনা সম্প্রতি উঁকি দিচ্ছে। মানুষের বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি এবং সন্ধানের বিচিত্র সুর ধ্বনিত হয় যে কবিতার মধ্যে তাই আধুনিক। কেবল তাই নয়, এরই মধ্যে নিহিত থাকবে জীবনের আনন্দ, বিস্ময় এবং বিশ্ববিধানে আস্থাবান হওয়ার প্রেরণা।

জীবনের নৈরাশ্যের মধ্যে আশার সন্ধান করা, সামাজিক জীবনের সংগ্রামের মধ্যে এক আলোময় জীবনের প্রত্যাশায় নিবিড় হয়ে থাকার সদিচ্ছা টের পাওয়া যাচ্ছে কতিপয় কবির কাব্যে। এতে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠছি।

কোন সমালোচক বলেছেন, "কবিতার উৎস মানুষের অনন্য গোপন সত্তা'। কথাটি সত্যি। গোপন ঠিকই। তাই বলে তো বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার আধার। আর এ অভিজ্ঞতার সুনিপুণ লিপিকার—কবি। কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাঁর ভাষা, শব্দ, জাদু এবং ধ্বনিমাধুর্যের অর্কেস্ট্রায় মানবের অভিজ্ঞার তাৎপর্য ধরা পড়ে। এক একটি কবিতা যেন সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, বিরহ-মিলনের নিভৃত অভিজ্ঞতার অক্ষয় অধিকারে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা। অনেক সময় তা তীব্র হয়ে দুর্বিসহ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সেই অসহ্য বিরস চেষ্টার পরিশেষে নির্বিঘ্ন উত্তরণ। আলোচ্য কবিকুলের কাব্য প্রচেষ্টায় এর পরিচয় মেলে।

স্বদেশরঞ্জন বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে মানুষের চিরন্তন বেদনার কাহিনী অগ্নি-অক্ষরে বিধৃত। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নামেই তা সুপ্রকাশ। ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে মানুষের জীবনের শোচনীয় গ্লানির বিষাক্ত উপাখ্যান বিবৃত করে ঘোষণা করতে হবে বিদ্রোহ! নির্বান্ধব যন্ত্রণাময় পরিপার্শ্ব দেখে কবি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, হৃদয়ের শোণিত ক্ষরিত হয়েছে। তা বলে তিনি জীবনকে পরিত্যাগ করতে প্রয়াসী নন। বরং জীবনের প্রতি গভীর মমতার আকর্ষণে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন।

বাস্তব জীবনের ছবি সজীব হয়েছে তাঁর কবিতার ছত্রে। এ বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার সুমেরু শিখর বলে যারা চেঁচাচ্ছে তারা তো ধনী সম্প্রদায় মাত্র। অত্যাচারের তীব্র দাহনে

শোষিতের দেহ পাংশুটে, বিবর্ণ। অত্যাচারী তো শ্বাপদের মতো হিংস্র। তাদের বুকে রক্তের তৃষা। এ চিত্রটি কবির লেখায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

'দোকানের শিয়রে মালিকের অদৃষ্ট হয়ে উলংগ শরীরে
বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা নিয়ে ঝুলে আছি—;
আমার পাংশুটে শরীরের রক্তহীন দড়ি পাকানো শুকনো হাড়গুলিকে
কেটে নিয়ে যাচ্ছে ওরা—
ওদের দারুণ ক্ষুধা ;
ঘরে গিয়ে ওরা নিশ্চয়ই কুকুরের মতো সেই হাড়গুলি চিবুচ্ছে
গালের কস্ বেয়ে হয়তো তখনো রক্ত গড়াচ্ছে—'

( 'দোকানের ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে' )

এ ছবি জীবন্ত অথচ কী বীভৎস!

জীবনের দৈনন্দিন গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়ে, প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আর তো বিবেক নেই, লজ্জা নেই, ইজ্জত নেই। মানুষ তার নাম হারিয়ে বসে আছে। তার সত্তার বিবর্তন হয়েছে। তা সামনের দিকে নয়; পশ্চাতের বিবর্ণ জগতের পঙ্কিল সলিলে তার নিমজ্জন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি মনের ছবিটা দেখা যেত! তাহলে বলা যেতো—

'আজ একটি অভ্যস্ত শামুক হয়ে আছি।
ভিক্ষে করতে করতে এখন স্পষ্ট ভিখিরী হয়ে উঠেছি।
আর লজ্জার বালাই নেই, ইজ্জত কবে কুকুরের দাঁত ছিঁড়ে নিয়েছে।
এখন যে কোন লোকের পা চাটতে পারি কুকুর কি শয়তানের ;
কারো মস্তকে পদাঘাত করতেও বিলম্ব করিনা, দ্বিধা নেই,
যখন যেমন প্রয়োজন।' ( যে কোন লোকের মত )

জীবন যেখানে যন্ত্রণাময় হাসি সেখানে অবলুপ্ত। আনন্দ সেখানে আসর জমাতে পারে না। নিপীড়িতের মুখে তা আসবেই বা কেমন করে? কবি বলছেন, 'মানুষ নাকি এক সময় হাসতো, প্রাণ খুলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হাসতো', আজ তো তার দর্শন মেলে না। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'একদিন মিউজিয়মে গিয়ে সেই ভয়ানক কংকালটাকে দেখে আস্‌বো।' এর পরে আধুনিক সভ্যতার প্রতি চাবুক চালালেন—

'তারপর ডক্টর হব একটা থিসিস্ লিখে :
মানুষ কখনো হেসে ছিল কিনা,
মানুষ কখনো ভালোবাসতো কিনা।'

দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে কবি এবার সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমায় প্রয়াসী। সারা বিশ্বে মানুষ উন্মত্ত। মমতার মদে অন্ধ। মানুষ জানে জীবন চিরস্থায়ী নয়, কীর্তি অবিনশ্বর। এ জেনেও তাণ্ডবতায়, পাশবিকতায় সে পশুকেও ছাড়িয়ে যায়।

'মানুষ আবার তার অহংকারে হিংসায় বর্বর,

লাঞ্ছিত করেছে চতুর্দিক

পরিণামে অন্ধকারে শুধু মানুষের নামে প্রেত প্রেতিনীরা

মানুষেরই পড়া হাড় মাংস ছিঁড়ে খাবে।' (পৃথিবীতে)

ক্ষুব্ধ ব্যথিত কবি ঈশ্বরের কাছে পেশ করলেন তাঁর পুঞ্জীভূত অভিযোগ। বললেন, 'সবি তোমার প্রতারণা, হে ঈশ্বর, মিথ্যা প্রাণের অঙ্গিকারে, ভরিয়ে দিলে আকাশ-মাটি কী যন্ত্রণায় হাহাকারে ;'।

বুকভরা ব্যথা, যন্ত্রণা। চারিদিকে হা-করা কালো অন্ধকার। নিচ্ছিদ্র গহ্বর। তবুও বুক বাঁধতে হবে। আশা মোহিনী। তা সঞ্জীবনী। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখার বাসনা তাঁর ছিল। আছে। এই অন্ধকারে তিনি অপেক্ষা করবেন। যেহেতু আলো আসবেই। তবুও দ্বিধা। দ্বন্দ্ব। সর্বাঙ্গে যে প্রচণ্ড দাহ তা শীতল হবে কোথায় গেলে। স্মৃতির অবশিষ্ট ক্যানভাসে এখনো আঁকা আছে নানা ল্যাণ্ডস্কেপ, আছে শৈশবের অমল আশ্রয় ভূমির জলরঙা ছবি। সেখানেই তৃপ্তি। সেখানেই শান্তি। মুক্তি কোথায়, শান্তি কোথায়? কবি আভাস দেন—

'...আলোকিত মায়াবি টেবিলে

ঈশ্বর, তোমার উপস্থিতি

মানুষেরা চিরকাল খুঁজে ফেরে একটু সবুজ স্নেহ প্রীতি।

এই সব সবুজ নদীতে স্নান, জলকেলি।

—যদি পায় এ প্রৌঢ়ে আবার

হৃদয় সবুজ হবে। সুখ হবে। ঘুচবে বুকের তৃষ্ণা, যাবে হাহাকার'

(ঈশ্বরের আলোয়)

কবি সুশান্ত বসুর আশ্রয়পট কিঞ্চিৎ পৃথক। প্রতিবেশ প্রতিকূল। জীবনের রঙ্গমঞ্চ জীর্ণ। শিল্প নামধারিণী নন্দিনী প্রতিমা আজ বিপন্নবাক্। এহেন অবস্থায় স্বপ্ন, স্মৃতি, শৈশব, নিসর্গ এবং অনতিস্ফুট প্রণয় প্রসঙ্গ কবির প্রস্থানভূমি। উচ্চারণে কবি মিতবাক্। অনুষঙ্গ যোজনায় প্রায়ই রাবীন্দ্রিক উল্লেখ আছে এবং রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রের (কাব্য বা কাহিনীতে) উল্লেখ আছে। যেমন—

'তৃষ্ণা নামক নদীর ওপার থেকে

শচীশ তোমার সামনের মরুভূমি

কোনো সাড়া পায় নি কো

দামিনী তবুও বিস্মরণীর কূলে

নীড় বাঁধে বুকে, চিরন্তনের আলো

জ্বালাবার ব্রত শ্রীবিলাশ তুমি শিখো।'

(ছিন্ন কবিতাবলী)

অথবা,—

'...এই বলে সে রমণী অচ্ছোদসরসীনীরে তবু দিয়ে সার

কখনো উঠলোনা, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আজো, স্মৃতির সংসার।'

(সেই রমণীর স্মরণে)

কবি স্বপ্নচারণ করলেও বাস্তবকে ভোলেন নি। তিনি জানেন, 'এখন ভীষণ আগুন জ্বললে, চতুর্দিকে ভীষণ কালো স্তব্ধ অন্ধকার।' কবি লক্ষ্য করেছেন—

ত্যাখো দুঃখ ঘুরছে ফিরছে ইতস্তত: পার্কে রেস্তোঁরায়

দশটা পাঁচটা ট্রাম, বাস অথবা ট্রেণের দীর্ঘশ্বাসে। (দৃশ্য)

ব্যস্ এ পর্যন্তই! স্বদেশরঞ্জনের মতো তিনি আর বীভৎস ছবি তোলেন নি, মানুষকে বাস্তব নরকের চিত্র আরও পোলসা করে বলেন নি, এবারে আশ্বাসের সমীরণ বয়ে চললো।

'রক্তের সমুদ্রে কোন পুনর্নবা সুখের আবহ
সঙ্গীতের শব্দ ওঠে, শুনি মুগ্ধ আনন্দের শ্লোকে।'

সাম্প্রতিক কালে অনেক কবির লেখাতেই একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই নৃশংস জগৎ থেকে তাঁরা সরে যেতে চান। দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চান স্মৃতিচারণ ক'রে। অতীতের সুখ স্মৃতির স্বপ্নে বর্তমানের নীরসতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চান। শৈশব দিনের কল্পনা, অতীতের স্মৃতি স্মরণ করলে তো ক্ষণিকের জন্যে যন্ত্রণা এড়ানো যায়। অস্ত্রোপচারের প্রাক্কালে ইথার ছিটিয়ে অসাড় করবার মতো। উবে গেলেই তীব্র দাহন। আর অতীত যে সর্বদাই তৃপ্তিকর তার কোন মানে নেই। সুশান্ত বসু অতীত স্মৃতির দুটি দিকই দেখিয়েছেন।

সুশান্ত বসুর কবিতার প্রধান আকর্ষণ, লাবণ্য। এই লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবিতা খণ্ডগুলি। কি নিসর্গ বর্ণনায়, কি প্রণয় প্রসঙ্গে কবি সৌন্দর্য প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন।

'ছাতিম গাছে সকালে রোদ্দুর
ভালোবাসার ফুল ফুটেছে গাছে
চতুর্দিকে বিশাল মুখরতা
অনন্তের দু-হাতে এই সকাল।' (চলচ্চিত্র)

সুশান্ত বসুর কবিতার মধ্যে একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার বা পূর্বসূরী নানা কবির দু-একটি পংক্তি অথবা শব্দের পরিগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। তার জন্যে কবি নিজেই পাঠকদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন '…শব্দ কিংবা পংক্তি প্রযুক্তি যে কেবলমাত্র পূর্বগামীদের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়, বরং স্বতন্ত্র কবিভাষায় পরিণত, এ তথ্যটি…বিচার্য'। যে কথাটা প্রথমেই বলা উচিত ছিল তা হলো প্রকাশ ভঙ্গীতে কবি লিরিকপন্থার অনুযাত্রী। তাঁর অধিকাংশ কবিতা পাঠককে এক স্বতন্ত্র দ্বীপের সন্ধান দেয়

মনে হচ্ছে বাংলা কবিতার জগতে আবার পালা বদল আসন্ন। রবীন্দ্রনাথ যে চিরন্তনের সাধনায় সফলকাম হয়েছেন, সেই সাধনার ধারা নব কলেবরে যেন ফিরে আসছে। কবিতায় বাঁক নেবার যে সময় এসেছে তার পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে। এতে আমরা আনন্দিত। কবি-শিল্পী মলয়শংকর তাঁর তুলির পরিমিত ও সফল প্রয়োগে গ্রন্থ দুটির বিশেষতঃ 'বকুলতলা'র সজ্জা স্নিগ্ধ করে তুলেছেন।

অমিয়কুমার মজুমদার

# নিয়মাবলী

**প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা**

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত **প্রবন্ধই** বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

**সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩**

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ঃ ২৩-৫১৫৫

Statement in From IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1 56.

SAMAKALIN

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Place of Publication | Calcutta. |
| 2. | Periodicity of its Publication | Monthly. |
| 3. | Printer's Name | Anandagopal Sengupta. |
| | Nationality | Indian. |
| | Address | 24, Chowringhe Road, Calcutta. |
| 4. | Publisher's Name | Anandagopal Sengupta. |
| | Nationality | Indian. |
| | Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta. |
| 5. | Editor's Name | Anandagopal Sengupta. |
| | Nationality | Indian. |
| | Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta |
| 6. | Names and address of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital. | Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road, Calcutta-13. |

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

*Signature of Publisher.*

Dated, 1st March, 1965. (Sd.) A. G. SENGUPTA.

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 March'65 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন
দ্বাদশ বর্ষ । চৈত্র ১৩৭১

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA
DASAN
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা দশন
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দ্বাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' একাত্তর

**সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা**

## সূচীপত্র



সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মেট্রিক পদ্ধতি · একমাত্র আইনসঙ্গত পদ্ধতি

# মেট্রিক পদ্ধতিই একমাত্র আইনসঙ্গত পদ্ধতি

সব সময়েই

কিনুন

DA/64/676 (Bengali)

দ্বাদশ বর্ষ ॥ ১৩৭১

মে' ১৯৬৪—এপ্রিল ১৯৬৫

# সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

## সূচীপত্র

### বৈশাখ



### জ্যৈষ্ঠ

## আষাঢ়



## শ্রাবণ



## ভাদ্র

## আশ্বিন



## কার্তিক



## অগ্রহায়ণ



## পৌষ

## মাঘ



## ফাল্গুন



## চৈত্র

# রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় : জীবনবাদ

**শুভব্রত রায়চৌধুরী**

"The bad critic is the arrogant one, who wants to foist himself upon the work, and who assumes a superior attitude towards it. Instead of adopting a schoolmasterish approach, the critic should be the pupil of the work."

Eugene Ionesco.

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যময়। পিটিশন-পন্থা, সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থান, অহিংস অসহযোগ—এই ত্রিমুখী স্রোতের ভিতর দিয়ে আমাদের স্বরাজ-সাধনার ক্রমবিকাশ। এদের মধ্যে অহিংস আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সার্থকতা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে অনেক বেশী সক্রিয় সন্দেহ নেই; কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী মনের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদের আবেদন নিবিড়। বস্তুত, সন্ত্রাসবাদের ঐতিহ্য প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো। **আনন্দমঠ**-বর্ণিত সন্তানবিদ্রোহের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সহিংস অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হ'ল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিযুগে। তার শেষ আহুতি চট্টগ্রাম বিপ্লবে। এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাধনায় ব্যর্থতার যতি পড়েছে অনেকবার। কিন্তু যাঁরা শক্তি সাধনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা দুরাশার দুঃসাহসে নির্ভীক তেজস্বিতায় অকুণ্ঠ মৃত্যুবরণে আত্মোৎসর্গের মহিমময় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তাঁদের স্মৃতি বাঙালী চিত্তে অমর হয়ে আছে। সন্ত্রাসবাদ সংগত কি অসংগত, সে প্রশ্ন নিঃসন্দেহে বহুবার জেগেছে; তার যথাযথ উত্তরও মিলেছে। কিন্তু মৃত্যু দিয়ে যাঁরা অমরতার গৌরব অর্জন করলেন তাঁদের জন্য বাঙালী হৃদয় জ্বালিয়ে রাখল স্নেহের অনির্বাণ শিখা। মা যেমন তার দামাল দস্যি ছেলের প্রতি স্নেহশীলা প্রশ্রয়শীলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের

আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে দুঃসাহসী বিপ্লবীরাও তেমনি এক ভালোবাসার ধন হয়ে উঠেছিলেন। দুর্ধর্ষ ইংরেজশক্তি—যার রাজ্যে সূর্য না কি কখনো অস্ত যায় না—তারই সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামল মুষ্টিমেয় নবীনের দল! এই হারের খেলায় গৌরব শুধু দুঃসাহসিকতার, মহত্ত্ব শুধু মরবার মত মরতে পারায়। সেই গৌরব এবং মহত্ত্ব বাংলার বুকে বিপ্লবী শহিদদের জন্য এক গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

১৯৩৭ সাল। বাংলার ঘরে ঘরে তখন চট্টগ্রাম বিপ্লবের বীর্য-গাথা রূপকথার আসন নিয়েছে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অনিবার্য শূন্য পরিণাম এবং অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিকতা জাতিকে যুগপৎ সকরুণ বেদনায় এবং আত্মসচেতন গর্বে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। এমনি এক ভাবাবেগ-তপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার মধ্যে আবির্ভূত হ'ল **চার অধ্যায়** *।

সার্থক রচনামাত্রই প্রগাঢ় সমাজচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। বৈশ্বমানবিক আদর্শ এবং চিরন্তন শ্রেয়বোধ সেই সমাজচেতনার বুনিয়াদ। যে-মনীষা হ'তে সার্থক রচনা উৎসারিত হয়, সে-মনীষা কেবলমাত্র যুগচেতনার প্রতিবিম্ব নয়; যুগচিন্তাকে অতিক্রম করেই তার আত্মবিকাশ। এই প্রসঙ্গে Alavdair Mac-Intyre-এর একটি সুচিন্তিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

"Moreover, the greatest writers both express and transcend their age. They show us the possibilities in the age of going beyond it, whereas lesser writers exhibit the limitations imposed upon them by the age." সাধারণ মনীষার অভিব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই যুগমানসের পক্ষে কালের প্রভাব কাটিয়ে যুগ-জাত অভিজ্ঞতার সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়া দুরূহ। কিন্তু মানবসমাজে মাঝে মাঝে এমন লোকোত্তর প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটে, যাঁদের মনীষা তৃতীয় নয়নের মত সুদূরপ্রসারী, তলাবগাহী, সর্ব-খর্বতাদাহক, সত্য-স্মারক। তাঁদের চিন্তায় অনুভাবে ধরা দেয় সর্বকালিক সর্বজনীন কল্যাণশ্রী—তাঁদের রচনায় রূপায়িত হয়ে ওঠে কালাতীত মানুষের শাশ্বত আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস। এমন প্রতিভার সঙ্গে যুগমানসের সংঘর্ষ ঘটেছে বহুবার। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু পথিকৃৎ প্রতিভার অবিচল সত্যনিষ্ঠা হার মানে নি। আর, হার মানে নি ব'লেই সম্ভব হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতি। মানবতার চিরন্তন আদর্শের অনির্বাণ আলোয় সেই প্রতিভার রচনাবলী ভাস্বর হয়ে আছে। অবশ্য এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, যুগ-বন্দী মেধার অদূরদর্শী সমালোচনা মেঘের ছায়া ফেলেছে যুগবিপ্লবী চিন্তাধারার উপর। কিন্তু বারে বারে প্রমাণ হয়েছে সে ছায়া ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীকালের ধীগুণ-প্রযুক্ত নূতন মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেমংকর রচনার মানবিক সার্থকতা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনি ক'রেই এগিয়ে চলে শ্রেয়াশ্রয়ী চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ।

১৯২১ সালে দীনবন্ধু এ্যানড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, "Politics are so wholly against my nature; and yet, belonging to an unfortunate country, born to an abnormal situation, we find it so difficult to

* বর্তমান আলোচনায় চার অধ্যায়-এর পৃষ্ঠা নির্দেশ প্রথম সংস্করণ অনুসারে।

avoid their outbursts." রাজনীতির সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না বটে, কিন্তু তাই ব'লে তিনি "ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের মত" নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্যে রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে চলেন নি। ভারতবর্ষে যে নূতন ইতিহাস রচনার সাধনা শুরু হয়েছিল, তার শঙ্খধ্বনি কবির প্রাণেও গভীর সুরে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনিও আহ্বান করেছিলেন, "বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো।" কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার বর্ণনায় মহাত্মা গান্ধী যথার্থ ই বলেছেন, "I regard the Poet as a sentinel warning us against the approach of enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Ignorance and other members of that brood." যেখানে যখনি অবুদ্ধির গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতার অত্যাচার, আলস-বিলাস, অজ্ঞানতার মূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, যখনি মনুষ্যত্ব হয়েছে উপেক্ষিত উপদ্রুত, কবি তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন কঠিন কণ্ঠে। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, জীবনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম মমতা। মানবতার লাঞ্ছনা, জীবনধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য তাঁকে বিচলিত ক'রে তুলত। স্বাধীনতা সংগ্রামকেও তিনি এই সর্বজনীন কল্যাণবোধের উত্তাপবিহীন পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন। সেই জন্য তাঁর পক্ষে মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার আত্মিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল।

রবীন্দ্র মানসের মর্মকথা হ'ল আত্মশক্তি, দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ যাকে soul force আখ্যা দিয়েছেন। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার আত্মশক্তিতে। এই আত্মশক্তির সন্ধানে কবি জীবন প্রভাতেই স্বপ্ন-ভাঙা নির্ঝরের মত যাত্রা শুরু করেছিলেন মহামানবের সাগর তীর অভিমুখে। আত্মশক্তির 'পরে অটল বিশ্বাস তাঁর সাহিত্যের সৌরজগতে সূর্যপ্রতিম, তাঁর শ্রেয়বোধের ধ্রুবা, জীবনমূল্যায়নের মানদণ্ড। আত্মশক্তির অবমাননা-উপেক্ষা-অস্বীকার তাই তাঁকে উতলা করত তা সে বিদেশী শাসন কিংবা স্বদেশী সাধনা যে নামের আড়ালেই হোক না কেন। তখন তিনি কাব্যলোকের সুদূর নিবাস ছেড়ে নেমে আসতেন সকলের মাঝখানে, সেখানে গুরুদেবের আসন গ্রহণ করতেন, শাসন করতেন পথভ্রান্তকে, নির্দেশ দিতেন সত্যপথের। তাঁর সেই শাসন-সংকেত, সেই পথ-নির্দেশ বহন ক'রে আজও তাঁর রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে এক নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠার। দীনবন্ধু যথার্থ ই বলেছেন, "···Whenever the popular methods appeared to diverge from that high standard, he became pained and immediately expressed in writing."

কবির সত্যনিষ্ঠা ও মানবধর্মিতার একটি কালজয়ী সাক্ষী হ'ল **চার অধ্যায়**। রাজনীতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসখানি তৎকালীন যুগমানসে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, কারণ যে-বিশ্বাসের উপর এই কাহিনীর ভিত্তি সে-বিশ্বাস তদানীন্তন ভাবধারার পরিপন্থী ছিল। সত্য কথা বলতে কি, চার অধ্যায়ের ভাগ্যে যে তীব্র বিরোধিতা জুটেছিল তার তুলনা মেলে একমাত্র **ঘরে বাইরে** উপন্যাসের প্রকাশান্তর বিক্ষোভে। বাংলার বিদগ্ধ সমাজ এই গ্রন্থখানির বিরুদ্ধে সমালোচনার এমন তুফান তুলেছিলেন যে, উপন্যাসখানি প্রায় ভরাডুবি হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয়, সেই বিক্ষোভের স্মৃতি এবং কারণ আজও মিলিয়ে যায় নি।

তাই, অন্যান্য বহু-বিতর্কিত রচনা কালের তরী বেয়ে রসোত্তরণের মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু চার অধ্যায় আজও "হতাশের নিষ্ফলের দলে।"

সার্থক রচনামাত্রেরই দুটি দিক আছে—একটি তার সাহিত্যিক দিক, দ্বিতীয়টি Philosophy of life বা জীবনবাদের দিক। "Poetry is life's criticism"—এই সুপ্রসিদ্ধ উক্তির মধ্যে কথাটার তাৎপর্য নিহিত আছে। রচনা যখন জীবনবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে অদ্বৈত সমন্বয়ের রূপ নেয়, তখনি সৃষ্টি হয় সার্থক। জীবনবাদকে বাদ দিলে রচনা তো শব্দ সমষ্টির অলিগুঞ্জন। তেমনি আবার সাহিত্যিক দিক বাদ প'ড়ে গেলে যা তৈরি হয় তা হচ্ছে, কবির ভাষায়, "এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র"। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাহিত্যকার জীবনবাদকে প্রকাশ করবার বাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেন না। কিন্তু তাঁর রচনাস্রোত এক নির্দিষ্ট জীবনবাদের পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়। তটকে বাদ দিয়ে যেমন তটিনীকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি জীবনবাদ শূন্য রচনাও সাহিত্যিক সত্তাহীন।

চার অধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার একটা প্রধান কারণ হ'ল গ্রন্থ-ব্যক্ত বিশ্বাস এবং জীবনবাদ। সে যুগের পাঠক কাহিনীর দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে জীবনবাদের দিকটা নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এই আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা তার অধিকাংশই সাহিত্য বিচারের বাইরে প'ড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা সেটা রাষ্ট্র চেষ্টা আলোড়িত বর্তমান বাংলা দেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশী কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এই জন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।" ( রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ খণ্ড | ৫৪৩ পৃঃ ) তাঁর বিশ্বাস ছিল, সময়ের ব্যবধানে যখন ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্নতা কেটে যাবে, তখন অনাসক্ত উত্তরকাল রচনাটির সাহিত্যরস উপভোগ করতে সমর্থ হবে।

আজ ত্রিশ বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের উত্তাপবিহীন দৃষ্টি নিয়ে চার অধ্যায় বর্ণিত জীবনবাদকে দেখবার নিরাসক্তি জেগেছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও যে কাহিনীর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে তা মনে হয় না। একালীন সমালোচনার ধুয়া হ'ল, তত্ত্বের খরতাপে সাহিত্যরূপ শুকিয়ে গেছে। লেখক যেন একটা মত প্রচার করবার জন্যই লিখতে বসেছেন; অতএব তাঁর মন প্রচারকার্যে এত বেশী ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, কাহিনীর সাহিত্যরূপের দিকে তিনি আর দৃষ্টি দিতে পারেন নি। এমন একটা অভিযোগ বড়ই অদ্ভুত লাগে। "সাহিত্যকার"—এই পরিচয়টাই যাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তিনিই কি না রচনার সাহিত্যিক দিকের প্রতি উদাসীন!

এ কথা অবশ্য কেউই অস্বীকার করবে না যে, চার অধ্যায়ে জীবনবাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু তাই ব'লে যে তার সাহিত্যিক গুণ কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে তা মেনে নেওয়া কঠিন। জীবনবাদের দৃঢ় অঙ্গুলী সংকেত তো রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। **গোরা, ঘরে বাইরে, রক্তকরবী, তাসের দেশ**; তাদের গায়ে জীবনবাদের দাগ লেগেছে ব'লে কি তারা সাহিত্য সমাজে অন্ত্যজ? রবীন্দ্রনাথ "ইন্‌টেলেকচুয়েল অত্যাড়ম্বরের" হঠাৎ নবাবিকে অবজ্ঞা করতেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "প্রব্‌লেমের গ্রন্থি-মোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়।" (সাহিত্যের স্বরূপ। ১৫ পৃঃ) সুতরাং এ কথা বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হয় না যে, যিনি কবিগুরু তিনি শেষ পর্যন্ত "সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা"-কে উপেক্ষা করে "ইন্‌টেলেকচুয়েল অত্যাড়ম্বরে" মোহিত হয়ে পড়েছিলেন।

**গোরা** ও **ঘরে বাইরে**-র তত্ত্বপ্রাধান্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে ক'রে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা-গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা থাকে তবে এই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্‌লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে, জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিকবে না।" ("সাহিত্যের মাত্রা"—সাহিত্যের স্বরূপ। ১৫ পৃঃ) চার অধ্যায়ের সম্বন্ধেও সেই একই প্রশ্ন: সেখানে তত্ত্ব জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে? জীবনবাদ যদি চরিত্র কটির প্রাণগত উপাদান না হয়ে থাকে, তবে সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে চার অধ্যায় অবশ্যই ব্যর্থ। এলা অতীন্দ্র ইন্দ্রনাথের আপন আপন ব্যক্তিমানসই যদি রূপ না পেল, তবে আর কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্য কোথায়!

প্রত্যেক মানুষের একটি অভিজ্ঞতার কাঠামো আছে, মনস্তত্ত্বে যাকে বলা হয় frame of refernce. এই কাঠামো স্থিতিস্থাপক; জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করতে পারে এমন গুণ আছে এর মধ্যে। অভিজ্ঞতার কাঠামোর মাধ্যমে বিকশিত হয় মানুষের জীবনবাদ—জীবনকে বিশেষভাবে দেখবার বুঝবার জানবার অনুভব করবার দৃষ্টিকোণ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি নিয়ে। এই প্রবৃত্তিসমষ্টি তার শিক্ষাদীক্ষা প্রতিবেশের রৌদ্রছায়ায় ক্রমস্ফুট হয়ে গড়ে তোলে তার আদর্শ-বিশ্বাস, শ্রেয়-প্রেয়বোধ, তার জীবনবাদ। মানুষ যে তার জৈবিক সত্তাকে অতিক্রম করতে পারে, সে যে কেবল Sensation-perceptionএর গণ্ডীবদ্ধ প্রাণীমাত্র নয়, সে যে জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করে ভালোমন্দর বিচার করে শ্রেয়পথের নিশানা খোঁজে—তারই সাক্ষ্য দেয় ব্যক্তি পুরুষের জীবনবাদ। যদি কোনো ব্যক্তিমানসকে বুঝতে হয়, তবে তার জীবনবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

চার অধ্যায়ের নায়ক-নায়িকা এমন দুটি চরিত্র যাদের ব্যক্তিত্ব শিক্ষায় দীক্ষায় বৈদগ্ধ্যে সুগঠিত, যাদের মননধর্মিতা সুনির্দিষ্ট। আপন আপন শ্রেয়বোধের মানদণ্ডে বিচার ক'রে তারা বেছে নিয়েছে জীবনের পথ। কিন্তু কোথায় যেন তাদের বিচারে ভুল হয়ে গেল, হিসাবে ঘটল মস্ত একটা গরমিল। দুঃসহ-বিষণ্ণ সমাপ্তির কিনারায় দাঁড়িয়ে তারা আপন আপন জীবনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানবার চেষ্টা করে কোথায় তাদের ভুল হ'ল, কেনই বা হ'ল। তাদের ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিসঞ্জাত বেদনাকে অনুভব করতে না পারলে তারা আমাদের কাছে অচেনা অস্পষ্ট অলীক থেকে যাবে। আর, তাদের ভ্রান্তিকে বুঝবার জন্য জানতে হবে তাদের জীবনবাদ যার জারক রসে সঞ্জীবিত তাদের চরিত্রমানস। অন্যথায়, বৃন্তকে বাদ দিয়ে ফুলের পরিপূর্ণ রূপ উপভোগ করবার মতই অপচেষ্টার দোষ ঘটবে। অতীন্দ্র এলা ইন্দ্রনাথ—কেউই জীবনবাদের ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে চলে না; জীবনবাদের সঙ্গে তাদের প্রাণগত ঐক্য। যখনই পাঠকমন এই ঐক্য অনুভব করতে পারে, তখনি চরিত্র ক'টি তার কাছে গোটা মানুষ হয়ে উঠে। তখনি চার অধ্যায়ের সাহিত্যরূপ রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসখানির বৈশিষ্ট্যই হ'ল সাহিত্য ও জীবনবাদের সুমিত সমন্বয়।

কাহিনীর আরম্ভ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহোদয়ের জীবনসংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার আভাসে। বিপ্লবপ্রবণ পোলিটিকাল যুগে যদি এক বিপ্লবীর মুখে শোনা যায়, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে", তবে তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। এমন একটি স্বীকারোক্তির মাঝে ভাবপ্রবণ বাঙালী মন বিপ্লবী বীরদের প্রতি এক তির্যক কটাক্ষ লক্ষ্য করল। যারা দেশের গৌরব, তাদের সম্বন্ধে এমন কটাক্ষ যেন একমাত্র ইংরেজের খয়ের খাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই এমন কথাও সে যুগে শোনা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ না-কি এই কাহিনী শাসকসম্প্রদায়ের প্ররোচনাতেই লিখেছিলেন!

কবি দেশকে ভালবাসতেন না, এ রকম অভিযোগ অনেকবার উঠেছে, অনেক নিন্দা অপমান তাঁকে সইতে হয়েছে তার জন্য। কটু সমালোচনা যে কেবলমাত্র "কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা"-দের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তা নয়; দেশের "গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও" তাঁর সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এটা কবির বেদনার কারণ ছিল। **ঘরে বাইরে** প্রকাশের পর এ জাতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন, "আর একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তাহলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের পথ নয়, সে-পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তাহলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি।" ( রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম।৫২৭ পৃঃ ) লোকপ্রিয়তার লোভ কোনো দিনই তাকে সত্যভ্রষ্ট করে নি। অপ্রিয়তার কালিমা গায়ে নিয়েছেন, তবু সত্যভাষণে দ্বিধা করেন নি কখনো।

স্বাদেশিকতার পটভূমিকায় রচিত চরিত্রগুলির মাধ্যমে কবি সাধারণত দু' জাতীয় মানুষ

সৃষ্টি করেছেন—হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী। একদিক থেকে, দেশের পরিচয় নদী-পাহাড়ের বেড়া-দেওয়া স্থূল ভৌগলিক সত্তায়। আর এক দিকে আছে তার আত্মিক পরিচয়। এক ভৌগলিক ভূ-খণ্ডের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে ব'লেই সেই ভূ-খণ্ড দেশ হয়ে যায় না। তাকে মানুষ যখন আপন আত্মশক্তির সাহায্যে "আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে" সৃষ্টি ক'রে তোলে তখনি সে হয় যথার্থ দেশ। না-ধর্মীর দেশপ্রেমে অনেকখানি স্থূল লোলুপতা আছে; ভৌগোলিক গণ্ডীটাই তার কাছে একমাত্র সত্য। না-ধর্মীর দৃষ্টি কখনো এই গণ্ডীর বাইরে যায় না; আশু ফললাভের এক অপরিমেয় লোভ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যেমন-তেমন পথে স্বার্থসিদ্ধির অন্বেষণে। দেশের আত্মিক সত্তার কথাটা তার কাছে, সন্দীপের ভাষায়, "ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে" বেড়ানোর মতই উপহসনীয়। কিন্তু হাঁ-ধর্মীর কাছে দেশের আত্মাই বড়। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় আত্মা সম্বন্ধে একটি সহজ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা।" তাই, দেশের আত্মার অন্বেষণে হাঁ-ধর্মীর দৃষ্টি বেড়া ডিঙিয়ে যায়, খুঁজে বেড়ায় মানুষের যোগসূত্র; তার পথ দুঃখের তার তপস্যা প্রেমের। নিখিলেশের কথায় তার মর্মবাণী শোনা যায়, "দেশ যেখানে বলে আমি আমাকেই লক্ষ্য করব, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়—যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের চেয়ে বড়ো করে, সেখানে সকল ফলকেই খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৮ম।২৩৭ পৃঃ) না-ধর্মী সন্দীপ যখন বলে. "আমি আজকের দিনের ফলটাই চাই, সেই ফলটাই আমার", তখন হাঁ-ধর্মী নিখিলেশের দৃঢ় উত্তর শোনা যায়, "আমি কালকের দিনের ফলটাই চাই, সেই ফলটাই সকলের।" (রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম। ২৫৭ পৃঃ)।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যে-যে দিকে "আজকের দিনের ফলটা"ই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দেখা দিয়েছিল অসহনশীল ভাবোন্মত্ততার অমিতাচার, সাধারণ মানুষের প্রতি স্বার্থান্ধ ঔদাসীন্য। অসহযোগ আন্দোলন যখন নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াই হয়ে দাঁড়াল, তার অমানবিক অর্থহারা আতিশয্যতা কবির কাছে গণ-উপদ্রবের নামান্তর ব'লে প্রতিভাত হ'ল। নিখিলেশের মাষ্টারমশাই চন্দ্রবাবুর জবানীতে তাই আমরা শুনতে পাই, "দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ; এরা সইবে কেন আর এদের সইতে দেব কেন?" (রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম।২৩৭ পৃঃ) স্বরাজসাধনা যখন মানুষকে উপেক্ষা ক'রে উপদ্রবের লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত হয়, তখন তা শুধু "স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল" দেবার ব্যর্থ চেষ্টা। মানুষ নিয়ে দেশ, মানুষই হ'ল দেশের আত্মা। উপদ্রবের রথ যদি তারই বুকের উপর দিয়ে নির্মম ঔদাসীন্যে ছুটতে শুরু করে, তবে সে রথের মাথায় স্বাদেশিকতার পতাকা থাকলেও হ্যাঁ-ধর্মী দেশপ্রেমিকের কাছে সেটা শত্রুযান। তার কর্কশ চক্রধ্বনির মাঝে এক বৈনাশিক অমানবিক উল্লাসের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদের মাঝেও সেই একই সুর; অতীন্দ্রের ভাষায়, "দেশের আত্মাকে মোর দেশের

প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা"র প্রাগ‍্ভিশপ্ত উন্মত্ত চেষ্টা। বরং তার রূপ আরও ভয়ংকর, কারণ "মুখোস-পরা চুরি-ডাকাতির অন্ধকারে" তার হিংস্র পদসঞ্চারণ। মনুষ্যত্ব সেখানে অবহেলিত উপদ্রুত—মানুষের আত্মা অধোগত।

হাঁ-ধর্মীর জীবনবাদের বুনিয়াদ হ'ল মানুষ। মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা বিচার্য। স্বাধীনতা চাই, কারণ আত্মকর্তৃত্বের অধিকার না পেলে মানুষের মূল্য মানুষের শ্রদ্ধেয়তা কখনই স্বীকৃতি পায় না। পরাধীনতা হীন, কেন না সে মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটায়। বিপ্লবী ইন্দ্রনাথও সে কথা বিশ্বাস করত; সে বলেছে, "ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটা ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে···।" আত্মলোপ মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ; আত্মস্বীকৃতিই তার লক্ষ্য। পরবশতা নীতিহীন, কারণ সে আত্মবিলোপের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়। স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশের জন্য, সার্বিক জীবনের প্রাণময় উপলব্ধির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিত্ব যথাযথ স্বীকৃতি পাবে, এই মানবিক আদর্শই স্বাধীনতা লাভের আকুতি জাগায় প্রেরণা জোগায়। "মানুষ ব'লেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি": কবি-বর্ণীত এই ধর্মবুদ্ধি হ'ল স্বরাজসাধনার যথার্থ পথ-প্রদর্শক। ব্যক্তিত্বের অবমাননা-অবহেলা উপদ্রব-অবরোধ এই ধর্মবুদ্ধিকে আহত করে। তারা অবুদ্ধি-সঞ্জাত। পরাধীন দেশে উপদ্রব-অবরোধ-অবমাননার উৎস হ'ল বিদেশী শাসন। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, অপরাধ যে কেবল শাসকেরই তা নয়; কারণ, স্বাদেশিকতার পবিত্র মানবিক আদর্শের অন্তরালে অবিচার-অসহিষ্ণুতা-উপদ্রব প্রকাশ পেয়েছে দেশবাসীর শ্রেণীবিভেদে, আত্মকলহে, সংকীর্ণচিত্ত অবিশ্বাসে। মানুষ যেখানে কলহ-লিপ্ত রিপু-তাড়িত আত্মসুখসন্ধানী, আশু ফল লাভের স্বার্থপর লোভে উন্মত্ত, সেখানে সে অবুদ্ধির তামসজালে বন্দী। সে তখন জৈবিক সত্তার সীমানা অতিক্রম করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মনুষ্যত্ব-বিকাশের জন্য প্রয়োজন—অবুদ্ধির কুয়াশাজয়, ভেদবুদ্ধির বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সহজ প্রীতির সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত হওয়া। এমনি ক'রেই আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে, স্বরাজসাধনার মধ্যে জেগে ওঠে এক সার্বিক কল্যাণরূপ।

স্বাধীনতার আন্দোলন যখন সমস্ত দেশবাসীকে অন্তরের দিক থেকে যুক্ত করেছে, কবি তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাখীবন্ধনের গান রচনা করেছেন, "একই সূত্রে গাঁথা আছে সহস্রটি মন।" আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে তখন তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে।" সেই আহ্বানের সার্থকতা "সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের" মধ্যে নয়, "হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার" মধ্যেও নয়। তার ঐতিহাসিক এবং আত্মিক মূল্য এই যে, সে দেশের অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ করেছে—"সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই-যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি—এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে, ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম। ৪৮৩ পৃঃ)

"মানুষের দিকে মানুষের টান"—এই তো মানবতার কেন্দ্রকথা, স্বরাজের মূলমন্ত্র। এই

মন্ত্রের প্রণোদনায়”···নিত্য-সম্মুখগামী মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব––সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগ যুগের নব নব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।” ( কালান্তর।৮৩ পৃঃ ) প্রেমও সত্যের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ এই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত ছিল ব'লে কবি উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, “আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল।” ( কালান্তর।২০১ পৃঃ )

অতিশয় পন্থার মধ্যে শুভবুদ্ধির স্বাক্ষর নেই। তাই কবির কাছে সেটা মনুষ্যত্বের অবমাননার পথ। কি বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি, কি স্বদেশী মুক্তিসংগ্রাম—কারুর অতিশয় পন্থাকেই কবি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। একবার “এক ভারতজীবী ইংরেজী কাগজ” তাকে এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট ব'লে সমালোচনা করেছিল। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয় পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এ কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতেই আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয় পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌ম্‌ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি; সেই জন্যই আমি জোরের সঙ্গে বলিবার অধিকার রাখি যে, এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌ম্‌ গবর্ণমেণ্টের নীতিতেও অপরাধ।” ( কালান্তর।১০০ পৃঃ )

সন্ত্রাসবাদ অতিশয়পন্থার পথিক। সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ ক'রে সুড়ঙ্গ পথে রাতারাতি লক্ষ্যে পৌছুবার আগ্রহ তাকে উন্মাদনা জোগায়। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, “দেশ ভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্‌ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ লইয়া তাঁহার পূজা?” ( কালান্তর | ১০৩ পৃঃ ) এই আন্দোলন তাঁর কাছে “পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তি”-রূপে প্রতিভাত হয়েছে—এর দৈন্য এবং জড়তার মাঝে তিনি যে আত্ম-শ্রদ্ধার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন, তা মানবতার পরিপন্থী। অবশ্য সন্ত্রাসবাদের গোপনচারী সাধনায় যাঁরা নিজেদের আহুতি দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, “তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলের নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।” ( কালান্তর | ১২৮ পৃঃ ) এত মহান আত্মত্যাগ, তবু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল তাঁদের প্রচেষ্টা। এর জন্য দায়ী শুধু পথ।

জাতির জীবনে স্বরাজ সাধনার আত্মিক মূল্য গভীর। এ তার নিজেকে সৃষ্টি করার

সাধনা। এ তার মোহতন্ত্রমুক্তির, আত্মশুদ্ধির, আত্মজাগৃতির তপস্যা। ব্যক্তিমানসের পূর্ণবিকাশের জন্য যে-আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজন তার সাধনায় কোনো "শর্ট-কাট" নেই। বস্তুত কোনো মহৎ কাজই "শর্ট-কাটের" পথ ধ'রে সফল হয় না। "যে জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই, জিনিসও জোটে না।" ( কালান্তর | ১৯৮ পৃঃ ) স্বাধীনতার লক্ষ্য মহৎ। সে লক্ষ্যে পৌছবার পথ হ'ল সত্যাশ্রয়ী ন্যায়ধর্মী, মানবতার আলোয় উজ্জ্বল। এ পথের অভিযাত্রী যারা তাদের প্রাণে অতীন্দ্রের কথাই অনুরণিত হয়, "মরতে মরতে প্রমাণ করে যাবো, আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো।" ( চার অধ্যায় | ১০৮ পৃঃ ]

"পরম নিঃশব্দ গরম-পন্থা" অবৈধ ; তার একটা বড় কারণ হ'ল এখানে নীতির প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতির চেয়ে শক্তির খেলাটাই আসল। "কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদ সাধন" ঘটানো অবৈধ তো নয়ই, বরং প্রয়োজনীয়। এই মনোভাবটাই গর্হিত। অধর্মের সাহায্যে যে সাফল্য লাভ করা যায় এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না ; বরং হয়তো অতি সহজেই করা যায়। কিন্তু সেই লাভের মধ্যে ক্ষতির অঙ্ক মস্ত বড় হয়ে পড়ে, কারণ মানবিক শ্রেয়বোধ বিনাশ পায় সমূলে। ভারতবর্ষে চিন্তাধারার সঙ্গে এই সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির কোনো আত্মিক যোগ নেই ; এর গায়ে লাগানো আছে "Made in Europe" লেবেল। এই সুবিধাবাদী নীতি-অন্ধ শক্তিসন্ধ মতবাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁরা "পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিমি সোনার সহিত খাদ মিশানোর মত মনে করেন, মনে করেন এটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপর বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্—বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কোনো অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহা নহে, আমাদের গুরু-মশায়দের যেখানে বীভৎসতা সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি।" ( কালান্তর | ১০২ পৃষ্ঠা )

বিদেশী গুরুমশায়দের কাছে যে সহিংস পন্থার দীক্ষা নিয়ে স্বদেশী সন্ত্রাসবাদ, তার কাছে লক্ষ্যটাই বড়। লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তবে যেমন ক'রে হোক রাতারাতি সেখানে পৌছুতে হবে ; গুপ্ত দস্যুবৃত্তি খুনোখুনী কিছুই অবৈধ নয় যদি তারা আশু ফল লাভের লোভটাকে চরিতার্থ করতে পারে। Sanctity of means বা পথের শুচিতা ব'লে সন্ত্রাসবাদীর অভিধানে কিছুই নেই। এখানেই মানবতাবাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের গভীর বিভেদ। মানবধর্মী বলে, "পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোট ; কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌছনো যায় না, মাঝের থেকে পা দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়।" ( কালান্তর | ১৯৮ ) লক্ষ্যস্থলে পৌছবার জন্য মানবতাবাদ কখনো এমন পথ বেছে নেবে না যে-পথ শুভবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে, "মানুষের দিকে মানুষের টান"-কে পারস্পরিক অবিশ্বাসের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে চায়। মনুষ্যত্ব-বিমুখ পথ দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছনোর চেষ্টা, অতীন্দ্রের ভাষায় "কুমীরের পিঠে চড়ে নদী

পার হওয়া"র মতই অপচেষ্টা।

সন্ত্রাসবাদের এই সমালোচনাকে শুধু যদি আমাদের সহিংস রাষ্ট্র-আন্দোলনের সংকীর্ণ গণ্ডীর পটভূমিকায় বিচার করি, তবে তার প্রকৃত সার্থকতা অনুভূত হবে না। আজকের দিনে প্রতীচীও ভাবছে, সভ্যতা হ'ল "মানুষের দিকে মানুষের টান"-এর মন্ত্র ও হিংসার আশ্রয়ে সে মন্ত্র সাধন সম্ভব নয়। হিংস্রতা কুমীরের মতই—তার পিঠে চ'ড়ে নদী পারের প্রচেষ্টায় নামলে, পৌছুতে হবে জলের নীচে পাঁকের তলায়। হিংস্রতার স্বভাবে আছে একটা সাহজিক জান্তব ধূর্ততা। একবার প্রশ্রয় পেলে নানা গালভরা যুক্তিতর্কের মনভোলানো প্রভাব ছড়িয়ে সে সমস্ত মনকে গ্রাস ক'রে ফেলে। তারপর ক্রমশ আত্মঘাতী সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে। হিংসাপ্রবণ মনোভাব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করছে—কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের এলাকাতেও। এই সমস্যা অধুনাতন প্রগতিশীল মনীষীদের বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। অত্যুন্নত আমেরিকার দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র সহজ লভ্য। কিন্তু এই সহজ লভ্যতাই মার্কিন সমাজের কাল হয়েছে। কারণ, তা হিংস্রাশ্রয়ী মনোভাবের প্রসার পথকে মসৃণ ক'রে দিচ্ছে। কেমন ক'রে তাকে প্রতিরোধ করা যায় সেই চিন্তাই যুক্তরাষ্ট্রের যুগনায়কদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে রচিত "Freedom of Guns" শীর্ষক একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে (New Statesman, December 25 1964) Max Lerner প্রশ্ন তুলেছেন, "What would America be like if every American toted a gun, or had one stashed away at home—without a permit—for handy use?··· If arms were so widely distributed, what would be the chances in the next decade of their being used, not to hunt animals or against some conjectural communist takeover of the country, but quite nakedly against each other, brother against brother?" কেন এই প্রশ্ন?—"There is a prevalent violence in America today, which outdoes anything in the nation's past and which has many of the best minds on the country worriod—government officials, psychiatrists, lawyers, criminologists, policeheads······It seems to have infected every class, every ethnic group, every region, every age-level. It is both a 'cause' of violence and a violence of 'rebels without a cause." সুখৈশ্বর্যের অমিত সম্ভাবনা নিয়ে গ'ড়ে উঠছে যে Affment Society, তার বুকে হিংস্রতার এ কি বৃশ্চিক দংশন! আসল সমস্যা এই যে, হিংস্রতা যদি আজ আত্মপ্রকাশের জন্য সমর্থনযোগ্য কারণ খুঁজে পায়, তবে অমনি সে মানুষের মনে পাকাপোক্ত আসন দখল ক'রে বসে—আগামী কাল কারণ ছাড়াই সে নগ্নরূপে দেখা দেবে সমাজে আন্তর্ব্যক্তিক হানাহানির মধ্য দিয়ে। আজ যেটা violence of rebels with a cause, কাল দেখা যাবে সেটাই violence of 'rebels without a cause' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ তবে কেমন ক'রে আমরা বাঁচিয়ে রাখব?

মানবতার দিক থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আর একটা বড় অভিযোগ : ব্যক্তিত্ব-বিলোপ।

সন্ত্রাসবাদে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নেই। দলের কাজ ব্যক্তিত্ব-দলন। সুড়ঙ্গ-বিহারীর পক্ষে দলীয় একনিষ্ঠতা অপরিহার্য। গুপ্ত পথে যখন লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে, তখন দলগত ঐক্যের অভাব ঘটলে গোপনতার আবরণ টুটে যাবে। সমষ্টি-মানসের কাছে ব্যষ্টি-মানস মূল্যহীন ব'লে দলের কাছে মতবিরোধ কঠিন অপরাধ, দলগত স্বার্থের অন্তরায়। "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"—এটাই দলের নীতি। যূথপতির আদেশ যদি রুচিবিরোধী শ্রেয়বোধদ্রোহী স্বধর্মসংহারী হয়, তবুও অনুচরকুলের কাছে তা মান্য। যার মনে সংকোচ বা প্রশ্ন জাগবে তার পক্ষে দলের সংশ্রব ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। আর, দল যদি মনে করে তার দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তবে জীবন তার সংশয়সংকুল। "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"—এই নীতি অনুসরণের ফলে সন্ত্রাসবাদী দলের ইতিহাস এক পুতুল নাচের ইতিকথায় রূপান্তরিত হয়। আত্মকর্তৃত্বের 'অধিকার লাভের আশায় যে—সাধনার উদ্বোধন, তারই শেষ পরিণাম হ'ল আত্মকর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন। ভুক্তভোগী অতীন্দ্র গভীর ক্ষোভের মুখে এই নির্মম সত্যের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে: "মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমড় বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়। কত হোল চিরজন্মের মত পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না। পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গায়ে। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করে দিতে স্পর্দ্ধা করেই রাজি হোল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ।" (চার অধ্যায়।৭১ পৃঃ)

এই পুতুল নাচের মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে শক্তি যান্ত্রিক, আত্মিক নয়। আজকের দিনে মানুষ সে কথা স্বীকার করছে। দেহকে তালিম দিয়ে তাল-ঠোকানো শেখানো যায়, কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে মনকেও যদি নিরন্তর চলতে হয়—'কেন কোথায় কি' এই প্রশ্নগুলিকে নিঃসংকোচ আনুগত্যের gass-chamberএ জ্বালিয়ে দিয়ে—তাহলে অচিরেই মানুষ বিকারগ্রস্ত অমানুষ হয়ে পড়ে। এ যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অতীন্দ্রের ভাষায়, মানুষ হল "আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব"। ঠিক এমনি একটি কথা পরবর্তী কালে C. E M. Joadএর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে:

"Human beings are in fact, by nature very different, different in their sources of pleasure and their susceptibislities to pain, and unless there is a corroesponding differenee in their ways of life they wont get their fair share of happiness, and they won't be able to develop along the lines of their own distinctive idividualities." মানুষের এই বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব থেকেই উৎসারিত হয় আত্মশক্তি। এই বৈচিত্র্যকে কেটে ছেটে বাদ দিয়ে, তার চেতনাকে ভাব-ভাবনা-ইচ্ছাকে যখন কোন উপরওয়ালার নির্দেশসম্মত ছাঁচে ঢালাই করা হয়, তখন মানুষের অবস্থা গ্রীকপুরাণ-কথিত প্রোক্রাস্টিয়াসের বলির মতই দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

তালিম-দেওয়া মনোবৃত্তি আজকের দিনে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে, আরব্যোপন্যাসের বোতলবাসী দৈত্যটার মত। এও তো একরকমের সন্ত্রাসবাদ। গোষ্ঠী বেঁধে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দ--পোষাকে-আসাকে চলায় বলায় ভাবে-ভাবনায়। তারই তালে তালে পা মিলিয়ে চলতে হয় তাকে। একটু যদি বেতাল হল কারুর চরণ ফেলা, পঞ্চায়তের রক্তচক্ষু তার প্রাণে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এ কারণে বর্তমান যুগকে Age of Conformity আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনের মানুষের সামনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যা এক বিরাট প্রশ্নবোধক উক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পবিপ্লবেরও যুগে যে ব্যক্তিক বিকাশের মহড়া শুরু হয়েছিল সমাজে রাষ্ট্রে ধর্মে দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে, আজ তা এমন এক জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে যেখানে মানুষ না-হয়েছে একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিপুরুষ, না-হতে পেরেছে একটা পুরোপুরি যান্ত্রিক পুতুল। বিশ্ববন্দিত মনীষী Albert Schweitzer যথার্থই বলেছেন, "The modern man is lost in the mass in way which is without precedent in history, and this is perhaps the most characteristic trait in him" ১৯২৩ সালে লিখিত এই মন্তব্যটি সে যুগে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি আছে ; শুধু তাই নয়, বরং তার সত্যতা আজ আরও ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে। আধুনিক মানুষ পা চালাতে শিখেছে তাল মিলিয়ে, কিন্তু মন তার মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে উঠছে, বলেছে "ভাঙো তাল !" Mal-adjustment কথাটার সঙ্গে এ যুগের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। সেটা তো আর কিছুই নয়, শুধু বেতাল চরণ ফেলার ব্যাধি। সমষ্টি-শাসিত ব্যক্তিমানসের প্রধূমিত বিদ্রোহ, অসহনীয় নিষ্ক্রিয়তাবোধ, অন্তঃসলিলা কান্না শুনতে পাওয়া যায় বর্তমান সাহিত্যে সমাজদর্শনে। অতীন্দ্র এক পরিস্থিতিতে—এ যুগের মানুষ আর এক পরিস্থিতিতে—mal, —adjusted ব্যক্তিমানস। দু'জনের হৃদয়বেদনার মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়তা আছে। সে আমাদের অতি জানা মানুষ। তাই তার গুমরে-ওঠা হাহাকার যেন অনেকদিনের ওপার হতে ভেসে এসে আমাদের অবচেতনার তটে ভেঙে পড়ে, প্রতিধ্বনি জায়গায় অন্তরে। অতীন্দ্র দেশাতীত কালাতীত পুরুষ।

যুগে যুগে সমাজবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবতার যে আদর্শ বিকাশ লাভ করেছে এবং করবে, তার দাবি শুধু একটি—মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাও, তার বৈচিত্র্যবান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করো, তার জিজীবিষাকে গ্রহণ করো। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, মানুষের খণ্ডতা আছে, আছে দীনতা নীচতা ক্ষুদ্রতা। কিন্তু এগুলি তো আর তার সত্য পরিচয় নয়। তার খণ্ডতা-খর্বতা এক জৈবিক সত্তার পরিচয় বহন ক'রে বেড়ায়। তার দৈন্য অপ্রকাশের দৈন্য। তার হীনতা ভেদ-বুদ্ধি-সঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। ক্ষুদ্রতা-খর্বতার সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার ক্ষমতাও তার আছে। সেই ক্ষমতাই তার আত্মশক্তি। আত্মশক্তির প্রণোদনায় মানুষ অচলায়তনের আকাশ-ছোঁয়া দেয়াল ভাঙে, যক্ষপুরীর ধ্বজা ধুলায় ফেলে, 'দেবতার অমর মহিমা'র আশায় আপন মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে ফেলে, শক্তিপরীক্ষা-পদ্ধতির দিক থেকে এখানেই সন্ত্রাসবাদ বা ঐ জাতীয় যান্ত্রিক জীবনবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের দুরপনেয় প্রভেদ। সন্ত্রাসবাদ জৈবিক শক্তিসাধনায় রত। মানবতাবাদ আত্মার শক্তিবিকাশে ব্রতী। সন্ত্রাসবাদ মানবতা-বিমুখ ; কারণ মানুষের

আত্মমর্যাদা, মানুষের জিজীবিষা, মানুষের বৈচিত্র্যময় আত্মশক্তির স্বীকৃতি নেই সন্ত্রাসবাদী জীবনদর্শনে। সহিংস বিপ্লবীর সাধনায় মন-মিলানো মহাসংগীতের সুর নেই।

জৈবিক শক্তির তুলনায় আত্মশক্তির বল কোথায়? জৈবিক শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে অনুভব করা তো সহজ কথা। কিন্তু আত্মশক্তি? তাকে কেমন করে অনুভব করব, কেমন ক'রেই বা তার সার্থকতা হৃদয়ংগম করব? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের স্থিতপ্রজ্ঞ মানবিক বিশ্বাসে: '…তাহা সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার শক্তি হউক। জগতে কাহারো সাধ্য নাই—দুঃখের শক্তিতে, ত্যাগের শক্তিকে ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।' (কালান্তর ১১৩ পৃঃ)

# ঈশপ ও বিষ্ণুশর্মা

## দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মানব মাত্রেই একটা গল্পশ্রবণলালসা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই মানবজাতি প্রেমিকপ্রেমিকাকে যেরূপ ভালবাসে গল্পকেও তদ্রূপ ভালবাসিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের অভিধানে ঠানদিদির ব্যাখ্যা গল্পের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া লিখিলেও ক্ষতি হইবে না। গল্পদ্বারা শিশুগণের বিবাদ মিটাইতে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে অথবা ঘুম পাড়াইতে তাহাদের তুল্য আর কেহ নাই। যখন মুদ্রাঙ্কণ প্রথা প্রচলিত ছিল না তখন গল্পগুলি উত্তরাধিকার ও হস্তান্তর সূত্রে স্মৃতিপথে চলিয়া আসিতেছিল। বর্তমান সময়ে যদিও অনেকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি এখনও যে কত শত গল্প ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

কল্পনাশক্তি যখন অতিশয় প্রবল থাকে তখন মানবের মন লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনাতে অধিকতর আনন্দ পায়। একটি পারিবারিক গল্প অপেক্ষা একটি ভূতপ্রেতবিশিষ্ট গল্প শুনিতে শিশু অধিক ভালবাসে। তাহারপর যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত কল্পনাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস ও সংযত হইয়া আসে তখন প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে বাস্তবজীবনে সেরূপ ঘটনা সম্ভবপর কিনা। ব্যক্তিগত মানবজীবনের পক্ষে যেরূপ সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ঠিক তাহাই। পৃথিবীর শৈশব চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবী এক্ষণে মানব অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাই ভুতপ্রেত দৈত্যদানবের গল্প ছাড়িয়া আমরা শরীরী জীবের গল্প শুনিতেছি।

কেবল বাস্তব উপাদানে গঠিত বলিয়াই যে আমরা অশরীরী ত্যাগ করিয়া শরীরী জীবের গল্প শুনি তাহা নহে, বস্তুতঃ সেগুলি অন্য একটি কারণে মানবের বহুমূল্য সামগ্রী। মানব যাহাকিছু নিরীক্ষণ করে তাহা নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিবেচনা করে; বিশেষতঃ ধর্ম ও নীতি বিষয়ে মানব যখন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তখন সমস্ত বিষয় হইতে একটা নীতি বাহির করিবার ইচ্ছা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বৃক্ষটি ফলভরে নত দেখিলেই গুণভরে নত মানবের কথা স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। মানবজাতির উপর এ গল্পগুলির শিক্ষাদানরূপ প্রভাব আছে বলিয়াই এগুলি এত মূল্যবান।

নীতিপ্রদ বটে, কিন্তু তাহারই সঙ্গে এগুলির যদি মনোরঞ্জনের ক্ষমতাও না থাকিত তাহা হইলে এগুলি এত বিশ্বব্যাপক হইত না। এগুলি অমনি খাইতেও মিষ্টি অথচ পরিমাণে উপকারী—এগুলি হিতকর অথচ মনোহারী। যিনি প্রকৃত গল্প-কথক তিনি গল্প বলিয়া কেবলমাত্র হাস্যোৎপাদন অথবা চিত্তবিনোদন করেন না, পরন্তু মানবের ভাবের অভিব্যক্তি, মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধন ও শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয় তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সেগুলিকে ইতর প্রাণীর কথোপকথন আকার ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা এরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে পাঠক তাহা জানিতে পারে না অথচ অজ্ঞাতসারে নীতিগুলি শিক্ষা করিতে থাকে এবং স্বতঃই তাহার উত্তম চরিত্রগুলির উপর সহানুভূতি এবং অধমচরিত্রগুলির উপর অবজ্ঞা জন্মে।

এ গল্পগুলি কবে কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইল এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক মানবের মনে এরূপ গল্পের বীজ উপক্ষিপ্ত। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রকার গল্প বর্ণনার ইতিহাসের সূচনাতেই আমরা দুইটি বিরাট মূর্তির সম্মুখীন হই তাহা গ্রীস দেশীয় ঈশপ ও অস্মদেশীয় বিষ্ণুশর্মা। তাঁহাদের পর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশপ ও বিষ্ণুশর্মা মূল গল্পগুলিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, কাজেই কোনগুলি ঠিক তাঁদের এবং কোনগুলি পরবর্তী হস্তক্ষেপকের তাহা বলিবার উপায় নাই। আরও দেখা যায় অনেক গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্য সাধারণ সম্পত্তির এরূপ পরিবর্তন হইয়াই থাকে কিন্তু ঈশপ ও বিষ্ণুশর্মার প্রতিভা এগুলির মধ্যে চিরকাল ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে।

বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ সমব্যবসায়ী হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঈশপের রচনা উপদেশাত্মক গল্প, বিষ্ণুশর্মার রচনা কঠোর রূপক। ঈশপের রচনায় গল্পটি বলবান, বিষ্ণুশর্মার নীতিটি। বিষ্ণুশর্মার গল্পে দেখা যায় তিনি যে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন একথা বড় নির্দয়ভাবে জানাইয়া দিতেছেন। উপদেষ্টার শ্রেষ্টত্বজ্ঞান পাঠকের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর, বিশেষতঃ তিনি যদি নিজেকে লুক্কায়িত না রাখিয়া নিজের শ্রেষ্টত্ব প্রচার করেন তাহা হইলে আরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। 'হিতোপদেশ' পড়িতে পড়িতে আমরা গল্প পড়িতেছি এরূপ মনে হয় না, আমাদের মনে হয় আমরা বিষ্ণুশর্মার নিকট ধর্মগ্রন্থ শুনিতেছি। তাঁহার গ্রন্থের লক্ষণগুলি এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে :—

(১) প্রথমতঃ, তাঁর গ্রন্থখানির নাম 'হিতোপদেশ'। নামমাত্র শুনিয়া লোকে ইহাকে নীতিপুস্তক ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিবে না ;

(২) বইখানির নামের মত চরিত্রগুলির নামও রূপকাত্মক। সেগুলিতে যেন নীতির ছাপ দেওয়া হইয়াছে। কাহারও নাম 'অনাগত বিধাতা,' কাহারও নাম 'প্রত্যুৎপন্নমতি' এবং কাহারও নাম 'যদ্ভবিষ্য'। কাহারও নাম 'ধর্মবুদ্ধি' কাহারও নাম 'পাপবুদ্ধি'। এ বিষয়ে যে হিতোপদেশকার কোনও অংশে দোষী তাহা আমরা বলিতে পারি না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটা সময় চলিয়া গিয়াছে যখন তথায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন—রূপক (allegory) এই রূপকের বিষম বাতাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের সাহিত্যাকাশকে এরূপভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহার আক্রমণ হইতে কোনও সাহিত্যিকই রক্ষা পান নাই। ইংরাজী সাহিত্যে যখন আমরা 'work—while—there—is—time—or—they—dame—will—beat—thee' অপেক্ষাও বড় রকমের নাম পাই তখন আমরা বলি বিষ্ণুশর্মার মধ্যে রূপক একেবারেই নাই। কিন্তু ঈশপের পুস্তকে এরূপ ভয়াবহ রূপক আদৌ নাই।

(৩) 'হিতোপদেশে'র প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে একটি করিয়া শ্লোক দেওয়া থাকে তাহাতে নীতিটি ও গল্পের শেষ ফলটি উল্লিখিত থাকে, যথা—

"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ
"মার্জোরস্য হি দোষেণ হতো বৃদ্ধো জরদ্গবঃ।"
"অব্যাপারে ব্যাপারঃ যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি

স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কীলোৎপাটীব বানরঃ।”

গল্পের শেষ ফলটি পূর্ব হইতে জানা হইয়া গেলে গল্পের আকর্ষণশক্তি কমিয়া আসে। গল্পের নীতিটিও এরূপ সাধারণ হওয়া উচিত এবং গল্পের সহিত এরূপভাবে মিশ্রিত থাকা উচিত যে গ্রন্থকার না বলিয়া দিলেও যেন সমস্ত পাঠক উহার একই রূপ ব্যাখ্যা করে। বিষ্ণুশর্মা নিজেই নীতিটির উল্লেখ করিতেছেন দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি যে নীতির দৃষ্টান্ত দিতে চাহিতেছেন তাহা পাঠক পড়িয়া ধরিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

(৪) ‘হিতোপদেশ’ গল্পের সহিত ধর্মনীতি জড়িত আছে কিন্তু ঈশপের গল্পে তাহা নাই। তজ্জন্য ঈশপের গল্পগুলির সার্বজনীনতা অধিক। সেগুলি দেশকালনিরপেক্ষ এবং মানবের সাধারণ দোষগুণ অবলম্বনে রচিত। ‘হিতোপদেশের’ গল্পগুলি আমাদের দেশের লোকের নিকট যতদূর বোধগম্য অন্য দেশের লোকের নিকট ততদূর নহে। ‘নিত্যস্নায়ী’ ‘নিরামিশাষী’ প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য দেশের লোকের অপেক্ষা আমরা বেশী বুঝি। এগুলিতে পরলোকে বিশ্বাস, কর্মফল প্রভৃতি হিন্দুধর্মের তথ্যগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাপ ও পুণ্যের ফল হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কাজেই এগুলি অন্য দেশের লোকের ততটা ভাল না লাগিবার কথা।

(৫) কলানৈপুণ্য হিসাবে বিষ্ণুশর্মার গল্পগুলিকে একটি চীনাবাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একটি প্রধান গল্প হইতে ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা বাহির হইতে থাকে। তাঁহার একটি সাধারণ কৌশল এই যে কোনও একটি ঘটনার স্থলে একটি চরিত্র তাহার সঙ্গী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক বলে। তাহাতে দ্বিতীয় চরিত্রটি কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে ‘সে কিরূপ ?’ তখন প্রথম চরিত্রটি গল্প বলিতে আরম্ভ করে এবং গল্পের শেষে “এইজন্য আমি বলিতেছিলাম” বলিয়া তাঁহার পুনরাবৃত্তি করে। পক্ষান্তরে দেখা যায় ঈশপের গল্পগুলি স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ। অবশ্য গল্পের ভিতর গল্প বলাও যা’ গল্পগুলি স্বতন্ত্রভাবে বলাও তাই। তথাপি বিষ্ণুশর্মার প্রণালীটি এক ছাঁচে ঢালা।

বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ উভয়েই মানবের সাধারণ দোষগুণ ধরিয়াছেন যথা—বন্ধুত্ব, একতা ভণ্ডামি, যদৃচ্ছাচারিতা, অবিবেকিতা, লোভ, কুসংসর্গ ইত্যাদি, কিন্তু ঈশপের মস্তিষ্ক বিষ্ণুশর্মার অপেক্ষা অধিক উর্বর। বিষ্ণুশর্মা যাহা দিয়াছেন ঈশপ তাহা অপেক্ষা অধিক দিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার উদ্দেশ্য এক হলেও প্রণালী বিভিন্ন। একজন নীতিটাকে অজ্ঞাতসারে প্রধান করিতেছেন, অন্যজন কঠোর ভাবে। একজনের গল্প দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ বলিয়া বিশ্বব্যাপী, অন্যজনের গল্প একটি দেশবিশেষের ধর্ম ও গার্হস্থ্য নীতি মিশ্রিত বলিয়া সীমাবদ্ধ, কিন্তু উভয়েই বিশ্বকালীন গল্পসাহিত্যের দুইটি আদিম ও অকৃত্রিম মহিমান্বিত মূর্তি।

# অন্ধকারে বেড়াচাঁপা

## বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগে যখন এসেছি তখন এই বনরাজিনীলার চক্রবালে রক্ত—রায়টের রক্ত লেগেছিল। তখন খোদাবক্স আর জবাদআলি মণ্ডলের চোখে দেখেছিলুম শঙ্কিতের চাহনি, চায়ের দোকানের ছোকরাটি সভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল 'কোথায় যাবেন' ?

আর এখন আকাশের সন্ধ্যার লাল আঁচল উড়ছে, পথে পিদিম হাতে ফকির গাইছে, 'মুস্কিলে আসান করে দয়াল গোরাপীর'। রাস্তায় অবিরাম জনস্রোত—জীবন প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন কলঙ্কের চিহ্ন নেই !

গঞ্জের মাঠে এতক্ষণে বিকিকিনি বোধ হয় শেষ হল, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানগুলো উচ্চ গ্রামে গালাগালি দিচ্ছে আর সঙ্গে হাতের চাবুক চলেছে শপাশপ। নিহিত অর্থেই গোধুলি নামলো বেড়াচাঁপার এই প্রান্তরে, অন্ধকার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে—সন্ধ্যা পালিয়ে গেল। গোধুলি নিশীথ হল, নিশীথ নীরব হল। এখন চারিদিকে অন্ধকার থৈ থৈ অন্ধকার। এখন চারিদিকে শুধু নীরবতা, টইটম্বুর নীরবতা। এখন, বেড়াচাঁপার এই মাটির পাহাড়ের ওপর দাড়িয়ে এই ভগ্নস্তূপের কাছে বলতে ইচ্ছে করছে 'কথা বল'।

হঠাৎ ঝুপ করে শব্দ হল। আমি উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব। এই বুঝি শুরু। কিন্তু প্রহর গেল তবু নিশীথ নীরব, মাটি কথা কইল না।

আচ্ছা, নীরবতা কি কথা বলে ? আমার মনে পড়ল উপকথার সেই চন্দ্রকেতু রাজার কথা দেউলিয়ার রাজা তিনি। লোকে বলে, এই মাটির পাহাড়ের নীচে চাপা রয়েছে রাজার গড়। উপাখ্যানটাও মনে এল : রাজা চন্দ্রকেতুকে গোড়াই গাজী চেয়েছিল মুসলমান বানাতে। রাজা কিছুতেই রাজি নন। ফলে ভয়ানক যুদ্ধ। যুদ্ধে চন্দ্রকেতুই জিৎলেন। কিন্তু একটা বড় রকমের ভুল হয়ে গেল। যুদ্ধে রাজার জয় হলেও প্রাসাদে যে পায়রাটা প্রেরণ করা হল সেটি পরাজয়ের প্রতীক কালো পায়রা। রাণী সেই কালো পায়রা দেখে রাজার পরাজয় হয়েছে মনে করলেন। হরিষে বিষাদ হল। যবনের হাতে নিজেকে না তুলে দিয়ে রাণী রাজদীঘিতে ডুব দিলেন। সেই যে ডুব দিলেন, সে-ই শেষ। রাজা এলেন হন্তদন্ত হয়ে তিনি তো জানেন না এত সব ব্যাপার। প্রাসাদে ঢুকেই তাঁর গা-টা ছম ছম করে করে উঠল। কোথায় রাজ্য জুড়ে বাজবে আজ জয়ভেরী, প্রাসাদপুরী আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠবে, তা না এ কী অলুক্ষণে কাণ্ড! সবস্তব্ধ, সব নিঝুম! তবে কি কোন অঘটন ঘটল ?

কিন্তু ততক্ষণে রাণীর দেহ ভেসে উঠেছে রাজদীঘির কাকচক্ষু জলে। চন্দ্রকেতু দেখলেন রাণীর ফুলে-ফেঁপে-ওঠা দেহটা। চন্দ্রকেতু এ শোক সামলাতে পারলেন না। তিনিও ডুব দিলেন রাজদীঘির ঐ অতল জলে।

আমি এই অন্ধকারে, বেড়াচাঁপার এই মাটির পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রণজয়ী চন্দ্রকেতুকে

স্পষ্ট দেখতে পেলুম। চোখে মুখে তাঁর কি বিপুল বিমর্ষতা। গাজী সাহেবের দর্পচূর্ণ করেছেন অথচ রাণী দেখতে পেলেন না! চন্দ্রকেতুর অভাগিনী রাণীকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। চরণে অলক্তরাগ, ভালে সিন্দুরটীকা, পরণে পট্টবস্ত্র। রাণী একবার আকাশের দিকে তাকালেন আর একবার শূণ্য প্রাসাদের পানে। তাঁর হৃদয়খানা যেন হাহাকার করে উঠল। রাজাকে আর তাঁর যাদুমাণিক তিন ছেলেকে তিনিই তো পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধে। রাণী এগিয়ে চলেছেন—মাথার ওপর আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। রাণী রাজদীঘির কূলে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত দুটি জোড় হয়ে এল। তিনি নমস্কার করলেন। তারপর নেমে গেলেন সেই অতল গভীর জলে। বুদ্‌বুদ উঠল, মিলিয়ে গেল।

স্মৃতি বোধ হয় বৃষ্টি ; ঝুরু ঝুরু ঝরে। আমি যেন বুড়ো বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছি, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বুড়ো বটগাছ—থান—ঝ্যাটা হাতে লৌকিক দেবী। আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি গোড়াই গাজীকে। বেচারী গোড়াই চন্দ্রকেতুর সঙ্গে হেরে গেল, এল সুন্দরবনের হাতিয়াগড়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য। এখানে রাজা মহীদানন্দের ছেলে অকানন্দ আর বকানন্দের সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হল। বকানন্দ গোড়াই-এর হাতে মারা গেল। গোড়াই-ও সাংঘাতিক আহত হল। সে তো আর যে-সে মানুষ নয়। বহুৎ ফুস মন্ত্র তার জানা আছে, তাছাড়া খোদার মেহেরবান তার কপালে। কাজেই আহত হয়ে সে সঙ্গীদের কাছে একটা পান চাইল—এই পান খেলেই সে সেরে উঠবে। কিন্তু সঙ্গীরা কেউ আর পান জোটাতে পারে না। তখন সে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে আহত অবস্থায় কুলটি-বিহারী গ্রামে গেল। সেখানে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

প্রতিদিন গোয়ালা কালুঘোষের একটা গরু তার কাছে আসে আর সকলের অলক্ষ্যে তার মুখে দুধ ঢেলে দেয়। এভাবে সাত দিন যদি গরুটা দুধ দিত তবে নাকি গোড়াই ভাল হয়ে উঠত। কিন্তু সাতদিনের দিন কালুঘোষ ব্যাপারটা কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল। সে-ও সেদিন গরুটার সঙ্গে হাজির হল গোডাই গাজীর কাছে। গোড়াই যেই কালুকে দেখল, বুঝতে পারল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু কালু ঘোষের ওপর সে রাগ করল না বিধির বিধান বলেই ব্যাপারটা মেনে নিল। কালুকেই বলল সে: আমার তো দিন ফুরিয়ে এল, আমাকে তুমি হাড়োয়ার মাটিতে কবর দিও।

এই কথামত কালুঘোষ গোড়াইকে হাড়োয়াতে কবর দিল (গোড়াই গাজীর হাড় থেকেই কি হাড়োয়া?) কালু ঘোষের এই কাজের মধ্যে তার প্রতিবেশীরা মুসলমানপ্রীতির গন্ধ পেয়েছিল। এই নিয়ে তারা কালুকে ঠাট্টা করতেও কসুর করে নি। কালুঘোষ ছিল বদরাগী। রেগে গিয়ে সে একজনকে খুনই করে ফেলে। শাসনকর্তা আলাউদ্দিনের বিচারে কালুঘোষের প্রাণদণ্ড হয়। কালু তখন গোড়ায়ের স্মরণ নেয়। শোনা যায়, গোড়াই নাকি কবর থেকে উঠে এসে কালুর প্রাণভিক্ষা চায় আলাউদ্দিনের কাছে। আলাউদ্দিন প্রাণদণ্ড মুকুব করেন।

হাড়োয়াতে এখনো বছরে একবার ফাল্‌গুণের বারো তারিখে গোড়াই গাজীর কবরের পাশে একটা বড় রকমের মেলা বসে। এখনো এ অঞ্চলের গ্রাম্য ফকির পিদিম জ্বালিয়ে চামর দুলিয়ে

'পীর গোড়াচাঁদ মুস্কিলে আসান' গান গেয়ে গেয়ে ফেরে। এখনো এখানকার লোক পীর গোরাচাঁদের মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা, লোহার ঢেলাকে পাকা কলা করবার অলৌকিক কাহিনী বাখায়। এই পীর গোড়াচাঁদ আর কেউ নয়, গোড়াই গাজী-ই। আমি এই আঁধারে বেড়াচাপার এই নিভৃতে পীর গোরাচাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম—পরণে আলখাল্লা, মুখটা দাড়ি গোঁফে ভরা।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর—চোখের সামনে ভেসে উঠল ঠানদিদির আসর। মেলাই শিশু বসে আছে। ঠানদিদি কখনো গলাটা নামাচ্ছে কখনো চড়াচ্ছে—কখনো আনন্দে তাঁর মুখখানি উদ্বেল হয়ে উঠছে, কখনো দুঃখে বিষণ্ণ এবং করুণ। তিনি ডালিমকুমার আর ফুলকুমারীদের কথা বলছেন—রূপকথার রাজপুত্তুর বীণা বাজচ্ছে আর অচিন দেশের রাজকন্যা সেই বীণার তালে তালে নাচছে। মেঘমালা আর মণিমালারা, কাঁকনবতী আর রূপবতীরা সবাই সারি দিয়ে চলছে। খোঁপায় ওদের ফুল গোঁজা, হাতে ওদের বাঁশি ( অনার্যদের কাছ থেকেই না আর্যরা কুসুম অলঙ্কার গ্রহণ করে ? )।

আচ্ছা, আজকের দশটা পাঁচটা করা মায়েরা যেদিন ঠানদিদি হবেন ? আমার মনে হল ওরা ঠাকুরমা হবেন কিন্তু ঠানদিদি কক্ষণো নয়। আমার হিংসে হচ্ছিল শিশু শ্রোতাদের কথা ভেবে। আসরে তখন রাক্ষস খোক্কসরা সব অদ্ভুত সাজগোজ করে বেরিয়েছে রাত্রির শিকারে। পক্ষীরাজে চড়া-রাজা, গজমতী হাতী, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখী, পোষা পায়রা আর শুকসারিরা সব মিছিল করে চলেছে।

রূপকথার এই কল্পলোক কিছুটা অচেনা মনে হলেও একেবারে বোধ হয় আকস্মিক নয়। পক্ষীরাজকে হয় তো কোনদিন দেখি নি কিন্তু পাখি তো আমার চেনা এবং রাজাও আমার অপরিচিত নয়। আসলে কি গল্প বলা, কি ছবি আঁকা, কি পুতুল গড়া এ সব ব্যাপারেই মানুষের ইচ্ছেটা যেন বড় বেশি করে ধরা পড়ে যায়। কথাটা আর একবার মনে হয়েছিল বেড়াচাঁপার মাটি থেকে পাওয়া পুতুলগুলি দেখে। আশুতোষ মিউজিয়ামের তদারকিতে কয়েক বছর আগে বেড়াচাঁপায় এক খনন কাজ শুরু হয়। এই খনন কাজের ফলে যেসব পুতুল পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে হাতী ঘোড়া ভেড়া ছাগল ষাঁড় ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারের সংখ্যাই বেশি। ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মত। হাতী যে এক কালে বাংলাদেশে বিস্তর ছিল তার বহু প্রমাণ আছে। এমন কি হাতী পোষ মানানোর ব্যাপারেও বাঙালীর হাতযশ ছিল ভুবনজোড়া। রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধত্রিপিটক জাতক এবং জৈন অঙ্গগ্রন্থে পোষমানা হাতীর কথা পাওয়া যায়। এই পোষ মানানোর কাজটি করত বাঙালীরাই। ব্রহ্মপুত্র এবং সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গা জুড়ে সেদিন চলত এই হাতী পোষমানানোর কাজ। যারা এই কাজ করত তাদের চেহারা ছিল লম্বাচওড়া, গায়ের রং ছিল সোনালি। তারা চুল রাখত ঝাঁকডা ঝাঁকড়া, গায়ে পরত চামড়ার আবরণী। হাতীর সঙ্গে হিমালয়ের চুড়ো থেকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত তারা ছোটাছুটি করত। তারা যে আজ কোথায় গেল কিম্বা থেকে গেলে কিভাবে রয়ে গেল তার আর কোন হদিশ নেই।

এই প্রসঙ্গে টোটেম পূজোর কথাও কিন্তু মনে আসে। আগেকার দিনের মানুষের এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। তারা ভাবত, যে আমার শত্রু তার মূর্তি যদি আমি সঙ্গে রাখি তবে সে আমার কোন

ক্ষতি করতে পারবে না কিম্বা তার ছবিতে বা মূর্তিতে যদি আমি আঘাত করি তবে তারও অনুরূপ আঘাত ঘটবে। বেড়াচাঁপায় পাওয়া পুতুলগুলির মধ্যে জন্তুজানোয়ারের সংখ্যাধিক্য তাই একটা ইঙ্গিত তুলে ধরেছে—এটি আর কিছু নয়, সেদিনের বনবেষ্টিত মানুষের মনের একটা অসহায় ভাব। পুরনো ছড়াগুলি কিথা রূপকথার গল্পগুলি নাড়াচাড়া করলেও এই একই অবস্থা দেখা যাবে। জন্তুজানোয়ারদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ওদের নিয়ে এত ছবি, এত পুতুল—ওদের নিয়ে এত ছড়া, এত গান গাওয়া হয়েছে প্রাচীন বাংলায়।

এই সব সাতকাহন ভাবতে ভাবতে কখন জানি না আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদ তো নয় যেন তরতরে কিশোরীর বুকে ক্ষীণ পয়োধর—তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। হাহা করছে হাওয়া। খোলা মাঠ আর হলদে জ্যোৎস্নায় জড়াজড়ি করে আছে। কে বলবে এই কিছুক্ষণ আগেও এখানে ছিল জমাট অন্ধকার।

পশ্চিম দিকে আবারো ঝুপ করে শব্দ হল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম। দেখলুম, কিছু নয় একটা পাকা বেল—হাওয়ায় পাশের গাছ থেকে পড়েছে। বেলটা তুলে নিলুম। রহস্য উন্মোচিত হল। কিন্তু এই মাঠ, এই মাটি কি কোন কথাই বলে নি ? আমি মনে মনে চেয়েছিলুম মাটি কথা বলুক। মাটি কথা বলে নি। কিন্তু গোড়াই গাজী আর চন্দ্রকেতুর কথা, রূপবতী আর কাঁকনবতীর কথা কি মাটির কথা নয় ?

# রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক গল্প

**অজয়কুমার ঘোষ**

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিস্তৃত ক্ষেত্র উপন্যাসের রাজ্য। উপন্যাসের কলেবর বিরাট। সম্পূর্ণ জীবনটাই তার বিষয়। তাই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অবসর সেখানে প্রচুর, প্রয়োজনও বেশি। কেননা মানুষ ত' কেবল বাইরের দৃশ্য জীবনটুকু নিয়েই সম্পূর্ণ নয়,—ভিতর-বাহির মিলিয়েই সে সম্পূর্ণ, আর বাইরের বিভিন্ন, বিচিত্র আচরণে তার কখনও স্বতোবিরোধ, কখনও মনের অপার রহস্য লীলার বিস্ময়কর চমক—আমাদের মনে অবিশ্বাস ও সংশয়ের সৃষ্টি করে।

মানুষের মন এক জটিল বস্তু। তাই, বাইরের ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হ'লে চাই তার পেছনে জটিল মনোরাজ্যের অরণ্য সন্ধান। গল্প-উপন্যাস লেখককে তাই মনোরাজ্যের গহনচারী হ'তে হয়। তবু এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা খুব বেশি দিনের নয়। (গল্প-উপন্যাসই ত' সাহিত্যের রাজ্যে নবীন আগন্তুক।) যুক্তি ও বুদ্ধি মানুষের চৈতন্যকে শাণিত করেছে। তাই প্রাচীনকালের মত কেবল গল্প পাঠেই আমাদের রসতৃপ্তি ঘটে না, সে-ঘটনার কার্যকারণ এবং কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রের মানসিক বিকাশ ও মনোরাজ্যের সমস্ত খবরাখবর আমাদের চাই। রূপকথা-উপকথার দিন বহুদিন গত হয়েছে। "চোখের বালি"র ভূমিকায় (দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী '৩য় খণ্ড' বিশ্বভারতী) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের ক'রে দেখানো।" অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতেই 'চোখের বালি' উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' গল্প দিয়েই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত। এ দুটির রচনাকাল ও পত্রিকায় প্রকাশ কাল প্রায় সমসাময়িক। চোখের বালি—বঙ্গ দর্শন—১৩০৮ (বৈশাখ—কার্তিক) নষ্টনীড়—ভারতী ১৩০৮ (বৈশাখ—অগ্রহায়ণ)

আধুনিক ছোট গল্পে মনস্তত্ত্ব একটি বড়ো বিষয়। বাঙ্‌লা গল্পে মনস্তত্ত্বের আমদানী ছোট-গল্পের জন্ম ও যৌবনদাতা রবীন্দ্রনাথের হাতেই। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ও অনন্য। তার পথ তিনি নিজের হাতেই করে নিয়েছেন।

আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পই মনস্তত্ত্ব প্রধান বা মনস্তত্ত্বসর্বস্ব নয়। অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই গল্পগুলির প্রধান লক্ষ্য নয়। তবে বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য কি? বাঙ্‌লা ছোট গল্পের স্রষ্টা ও পোষ্টা রবীন্দ্রনাথের হাতে গল্পসাহিত্যের যে বর্ণ বৈচিত্র্য, বিষয় বৈচিত্র্য, ভাব বৈচিত্র্য ও রীতি বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের রীতিটিও এসেছে। কয়েকটি সার্থক সুন্দর ছোটগল্পের আলোচনা করে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রীতি প্রকৃতি ও এই জাতীয় গল্পে তাঁর বিশিষ্টতাটুকু কোথায় তা' দেখানোই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তবে এ আলোচনা শুধু গল্পগুচ্ছের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। 'তিনসঙ্গী'কে ধরা হয়নি। তার জন্য পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি। তাঁর কবি হৃদয়ের স্পর্শে সমস্ত রচনাই অপূর্ব ভাবলাবণ্যে উদ্‌ভাসিত। ছোট গল্পও তার থেকে মুক্ত নয়। তীব্র গভীর কবির অনুভূতির রশ্মিতেই তিনি মানব মনের রহস্যের ওপর আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর গভীর জীবনবোধ বাস্তব অভিজ্ঞতা-নির্ভর ততটা নয়, যতটা সার্বভৌম অনুভূতি-নির্ভর। অনুভূতির গর্ভেই তাঁর জীবন-বোধের উৎস নিহিত। কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা ও অনুভবের আকাশব্যাপ্ত প্রসারতা দিয়েই তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাস্তববাদী ন্যাচারালিষ্টের দৃষ্টিতে নয়। তাই স্বভাবতঃই তাঁর গল্পগুলিতে আধুনিক ইউরোপীয় কোন গল্পকারেরই এমন কি মোপাসাঁ, চেকভ ও পো-র মত গল্প সাহিত্যিকদেরও সহধর্মিতা খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনারই নামান্তর। তাঁদের জীবনবোধ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে পার্থক্য দুস্তর।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটা বিশিষ্ট স্বাদ আছে যা' পৃথিবীর কোন গল্পকারের লেখায় আছে কিনা সন্দেহ এবং থাকলেও তা' বিচার বিতর্কের বিষয়। সে স্বাদটি অপূর্ব এক 'ভাবদ্যুতি সুবলিত' সৌন্দর্য মাধুর্য লাবণ্য যা'কে ঠিক ভাষা দিয়ে বোধ করি বোঝানো যায় না। সমাজ সমস্যামূলক, প্রেমমূলক, মনস্তাত্ত্বিক বা যে কোন জাতের গল্পই হোক, প্রতিটি রচনাই রবীন্দ্রনাথের কি এক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে দিব্য বিভাদীপ্ত হয়েছে। তাই গল্প পাঠের ফলশ্রুতিতে সমাজ সমস্যা নয়, প্রেমতত্ত্ব নয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নয়,—আমাদের কাছে সেই দিব্য বিভাদীপ্তি ও ভাবলাবণ্যই পরম প্রাপ্তি ব'লে মনে হয়। যা' বার বার পড়েও নিত্য নবীন হয়ে আসে। তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলি বিচারের পূর্বেও এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক গল্পে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের প্রভাবে অবচেতন মনের আরণ্যক পশু সন্ধান প্রবল হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন ও সমাজ সত্তাকে বাদ দিয়ে কেবল মনটাকে নিয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা ও বুদ্ধির কসরৎ থাকতে পারে কিন্তু জীবনের সংবেদনা না থাকলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানব মনের ক্রুর-কুটিল-ক্লেদাক্ত-পিচ্ছিল সরীসৃপ গতিপথ সন্ধানে মনোবিজ্ঞানের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু আঁকা-বাঁকা পথ সন্ধান করতে গিয়ে জীবনটাই যদি পেছনে পড়ে থাকে তবে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? কেবল মনটাকে নিয়ে অর্থাৎ মনের চেতন-অবচেতন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কিংবা Stream of Consciousness বা চেতনাপ্রবাহের নামে সুপ্ত যৌনতার বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থ চিত্তাবিকৃতির জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কখনও এই সর্ব পরিচ্ছিন্ন মনের কারবারী নন্। মন-ব্যবচ্ছেদ তাঁর ব্যবসায় নয়। 'চোখের বালি' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক্। সেখানে তিনি যে সুগভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যে তা' শরৎচন্দ্রের জন্ম-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। বিনোদিনীর যে অকাল বৈধব্যগ্রস্ত অচরিতার্থ ব্যর্থ জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতময় ট্রাজেডি তিনি সৃষ্টি করেছেন তা' তাঁর গভীর সমাজবোধ, সংযম ও সহানুভূতি থেকে জাত পর্যবেক্ষণ শক্তিরই পরিচায়ক—ফ্রয়েড-সুলভ Pschyco-analysis নয়। মনস্তত্ত্ব-কৈবল্য তাঁর কোন গল্পের উপজীব্য নয়। অথাৎ নিছক মনোবিশ্লেষণই যদি মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মাপকাঠি হয়, তাহ'লে তাঁর কোন গল্পই নিরঙ্কুশ মনস্তাত্ত্বিক নয়—নিতান্ত একটি কি দু'টি

বাদে। সুগভীর মানবপ্রীতি, জীবননিষ্ঠা, দেশপ্রীতি, সমাজবোধ ও প্রকৃতিপ্রীতিই তার মনস্তত্ত্ব-মূলকও অন্য শ্রেণীর—এক কথায় সর্বশ্রেণীর গল্পগুলির জন্ম মূলে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে 'তিনসঙ্গী'র অদ্ভুত রকম প্রদীপ্ত গল্প তিনটিতে তিনি অবচেতন মনোরাজ্যের রহস্য কুঠুরীর দরজা হঠাৎ উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন মাত্র। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' গ্রন্থে তিনসঙ্গীর রচনাকে বলেছেন, "অবচেতন মুখী"। কিন্তু 'তিনসঙ্গী'কে আমাদের ঐ আলোচনা-সীমার বাইরে রেখেছি।

হৃদয়বৃত্তির লীলা বৈচিত্র্য—যাদের উদ্ভব আমাদের জীবনের মর্মস্থল থেকে এবং যার আবেদন পাঠকের সুগভীর ভাবানুভূতির মধ্যে,—রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে তার পরিচয় মেলে। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক মনস্তত্ত্বমূলক গল্প বলা যায় না। তাঁর সুগভীর ভাবানুভূতি, কবিদৃষ্টি ও সৌন্দর্য-বোধই মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলিকে গভীর রসাবিষ্ট ক'রে অপার সৌন্দর্য ও লাবণ্য দান করেছে। কারুণ্যের ঝঙ্কার, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, প্রকৃতির প্রভাব এই গল্পগুলিকে রসস্নিগ্ধ ক'রেছে। এগুলো অবশ্য অন্যান্য গল্পেরও সাধারণ ধর্ম।

মনের অব্যক্ত গুহান্বিত গোপন ধারাটি সব সময় প্রকাশ্য ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে না। তাকে ইঙ্গিতে-প্রতীকে-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে হয়। এতে গল্পের শিল্প মূল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে আশ্চর্য সুন্দর ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের ব্যবহার গল্পগুলিকে অত্যুচ্চ রসলোকে নিয়ে গেছে। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যায় 'নষ্টনীড়' গল্পে চারু-অমলের রচিত উদ্যান। এ' উদ্যান চারু ও অমলের একান্ত দু'জনের। ভূপতির এখানে প্রবেশাধিকার নেই। এ' উদ্যান চারু-অমলের প্রীতির নিদর্শন। আবার অন্য দিক থেকে এ' যেন চারুর হৃদয়কুঞ্জ—সেখানে একমাত্র অমলেরই পূর্ণ আসন। এমনি ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কবি মনোবিশ্লেষণটিকে গভীর ও সার্থক ক'রে তুলেছেন।

নষ্টনীড়ের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন সেটির কথাই প্রথমে সেরে নেওয়া যাক। সমগ্র গল্পগুচ্ছে "নষ্টনীড়"ই বোধ করি একমাত্র খাঁটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। এ'র রচনাকাল যে চোখের বালি রচনার সমসময়িক তা' পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাই দুয়ের মধ্যে বিশ্লেষণের স্বাধর্ম্য আছে। ১৩১২ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে নষ্টনীড়কে উপন্যাস বলা হয়েছিল। পরে এটি গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, "নষ্টনীড় যথার্থভাবে ক্ষুদ্র উপন্যাস- ছোট গল্প নহে।" ( দ্রঃ রবীন্দ্র জীবনী/২য় খণ্ড/৬২ পৃঃ ) কারণ তাঁর মতে, "নষ্টনীড়ের মধ্যে যে সমস্যা লেখক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা কখনও ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বিচারণীয় নহে; কারণ গল্প ছোট হইলেই ছোট গল্প হয় না এবং কাহিনীকে বৃহৎ করিলেই উপন্যাস হয় না। ( দ্রঃ ঐ, ৬২ পৃঃ )

কিন্তু ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বিচারে এটি সার্থক গল্পই। কারণ এর লক্ষ্য এক মুখী। বক্তব্য সেই একমুখী লক্ষ্যে তির্যকগতিতে ধাবিত হয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসের বিরাটব্যাপ্ত পটভূমি নেই। উপকাহিনী ও চরিত্রবাহুল্য নেই। কাহিনীর জটিলতা নেই। একটি পারিবারের তিনটি-চারিটি পাত্র-পাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটুকুর মধ্যেই এর যা কিছু জটিলতা। তবে

এ কথা ঠিক যে বিশ্লেষণ প্রাধান্যে এ'টি খানিকটা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত।

'নষ্টনীড়' গল্পে যে নির্মমতা ও দুঃসাহসিকতা আছে তার জন্যে সে যুগে রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই সহ্য করতে হয়েছে। চারু-অমলের প্রেম আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত অনুচিত মনে হতে পারে, কিন্তু তাকে আর আমরা অস্বাভাবিক ও অসুন্দর বলতে পারি না। খুব স্বাভাবিক গতিতে অপ্রতিরোধ্য হৃদয়াবেগ নিয়ে ধীরে ধীরে এ প্রেম বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তা' হৃদয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে অসংযত পথে পা বাড়ায়নি। লেখক অসাধারণ শিল্প কৌশল, অসামান্য সংযম ও বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে চারুর হৃদয় বেদনাকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ভূপতির নিস্পৃহ ঔদাসীন্য, চারু-অমলের ঘনিষ্ঠতা, তা'দের সাহিত্য চর্চা, মান-অভিমান, মন্দাকে কেন্দ্র ক'রে ঈর্ষ্যা বেদনা—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই দেবর-ভ্রাতৃজায়ার নিষিদ্ধ এবং অপ্রকাশিতব্য প্রেম সম্পর্কটি অনিবার্যবেগে ও অন্তঃশীলারূপে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে। পরিশেষে অমলের বিবাহ সংবাদে এবং বিশেষ ক'রে তার বিলেত যাওয়ার পর এই প্রেম দুর্বার বন্যাস্রোতের মতো সমস্ত বাধা-বন্ধনের তটভূম ছাপিয়ে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। এর সমস্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলি ও তার কার্যকারণ শৃঙ্খলাটি নিপুণ বিশ্লেষণে বর্ণিত হয়েছে। চারুলতার "আঁতের কথাটি" অপূর্ব শিল্প সংযত ভঙ্গিতে লেখক বের ক'রে দেখিয়েছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে গল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটল এই দুঃসাহসিক অথচ শিল্পসার্থক গল্প দিয়ে। দুরাশা গল্পে প্রথমে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূত্রপাত আছে। কিন্তু এ গল্পের রস মনস্তত্ত্বের উপর প্রস্থাপিত নয়। আসলে এটি একটি মহান্ আত্মত্যাগশুভ্র প্রেম কাহিনী। বদ্রাওনের নবাবপুত্রী কর্তৃক ব্রাহ্মণ কেশবলালকে ভালোবাসার এবং ধীরে ধীরে জনৈক মুসলমানীর ব্রাহ্মণীতে মানসিক রূপান্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটুকু এতে আছে বটে, কিন্তু সেটিই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। মুখ্য হয়েছে ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নবাবপুত্রীর আত্মদহনদীপ্ত ত্যাগসুন্দর, করুণ কাহিনীটি এবং সেই "কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্বিকার ব্রাহ্মণ" কেশবলালের বাস্তব অথচ চমকপ্রদ পরিণতিটুকু। নবাবপুত্রীর অচরিতার্থ ব্যর্থপ্রেম ও ব্যর্থ জীবন যৌবনের করুণ কাহিনীটিই দার্জিলিঙের কুয়াশাগুণ্ঠিত পরিবেশে অপূর্ব এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

তাছাড়া গল্পটির সারা দেহ জুড়ে বর্ণনার বাণীলাবণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। যথা—"বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল, যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধ-শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দ মধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, যাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ।"—( উদ্ধৃত কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যায়। )

কিংবা আরও উদ্ধৃত করা যায়—"কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্র বনের ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্না চিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্র ভাগ, সকলেই নিঃশব্দ গম্ভীর ঐক্যতানে মৃত্যুর গান গাহিল ; সেই নিশীথে গ্রহ-চন্দ্র-তারা খচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে এক বাক্যে মরিতে কহিল।"—ইত্যাদি।

'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত দুর্বার প্রাণচঞ্চলা বালিকা মৃন্ময়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে তরুণী সুলভ

যে প্রেম প্রকৃতি ও গাম্ভীর্য বিকশিত হয়েছে তার নিপুণ ও মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনাটি অপূর্ব। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। এ গল্পে বাঙ্‌লার পল্লীপ্রকৃতি,—তার আকাশ-মাটি-জল,—আর গল্পের কেন্দ্র চরিত্র মৃন্ময়ী একাকার হয়ে গেছে। মৃন্ময়ী নামটিতেও বোধ করি তা সঙ্কেতিত। বর্ণনার ভাবত্ব-মাধুর্য ও স্নিগ্ধতা আমাদের অধিক মুগ্ধ করে। মনস্তত্ব বিশ্লেষণটুকু কবিত্বের স্পর্শেই আরও মোহনীয় হয়ে উঠেছে।

'দিদি' গল্পটির মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মাতাপিতৃহীন ভাইটিকে নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার মনস্তত্ত্বসম্মত চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। শশিকলা ও জয়গোপালের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে শশিকলার ভাই নীলমণিকে নিয়ে স্বার্থ ও স্নেহের দ্বন্দ্বটি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। লেখকের কথায়, "কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল" এবং "এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।"

'নিশীথে' গল্পটিতে দক্ষিণাচরণের প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলাজনিত অপরাধবোধ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মধ্যে একটা স্নায়বিক মনোবিকার জাগিয়ে তুলেছে। মৃত্যু শয্যাশায়িতা স্ত্রী মনোরমাকে দেখে করুণকাতর প্রশ্ন, "ওকে, ওকে, ওকে গো"—কথাটুকু দক্ষিণাচরণের মস্তিষ্কে এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর জল-স্থল-আকাশ-বাতাস জুড়ে 'ওকে—ওকে-ওকে গো' কথাটি যেন অশরীরী শিহরণ সৃষ্টি ক'রে খানিকটা অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশের আবহ নিয়ে আছে। অথচ গল্পটি কোন ক্রমেই অতিপ্রাকৃতিক বা ভৌতিক নয়।

বরাহনগরের নির্জন বাগান বাড়ীর ঈষৎ চন্দ্রালোকিত প্রস্তরবেদী, পদ্মাতীরবর্তী কাশবন ও নির্জন বালুতটের মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এটি একটি সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক গল্পই হতে পারত কিন্তু রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার স্পর্শে এটি তথা কথিত মনস্তাত্ত্বিকতার সীমা ছাড়িয়ে আরও উন্নত শিল্পবস্তু হয়ে উঠেছে। এ ভাবে প্রতিটি প্রায়-মনস্তাত্ত্বিক হয়ে ওঠা গল্পই অপূর্ব ভাব-কল্পনা-কবিত্বের মায়াস্পর্শে অশেষ বাণীলাবণ্য লাভ করেছে।

'মণিহারা' গল্পটিতেও 'নিশীথে' গল্পের মতই সদ্যঃ পত্নী বিয়োগ কাতর স্বামীর মনোবিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষণ মুখর জন্মাষ্টমী দিনের এবং গভীর রাত্রের "জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারের" পটভূমিকায় একটি স্বপ্ন ঘটনার মাধ্যমে এর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণটি অপূর্ব সুন্দর। এ ছাড়া বর্ণনাভঙ্গি অতিপ্রাকৃতের ভাবাবহ নিয়ে আসে বটে, কিন্তু সেটিই মুখ্য নয়। একটি শোকতপ্ত মনের অপূর্ব বিশ্লেষণ গল্পটিকে কবিত্ব কল্পনার কোন্ এক ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গেছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি প্রেমের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও সান্ত্বনাদান এবং তার রোগতপ্ত মনের বিকারটি সার্থক সুন্দর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

'কঙ্কাল' গল্পটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ্য করবার মত। কবির কল্পনা ও জীবন রসবোধ এটিকে তথাকথিত ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক গল্প ক'রে তোলে নি। আসলে এটি একটি জীবনরসের আলেখ্য। কঙ্কালটি যখন রূপলাবণ্যবতী শরীরিণী ছিল, তখনকার জীবন-

কথা তার মুখ দিয়েই বলা হয়েছে। এতে একটি নারী মনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ও তার প্রেমতৃষ্ণার্ত হৃদয়ের গুপ্ত কথাটি বর্ণিত হয়েছে। ডাক্তার শশিশেখরের সঙ্গে তার আচরণের মনস্তত্ত্বটি লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। অথচ পরিকল্পনার নবীনত্বে, কবিত্বময় বর্ণনায় এর মনস্তত্ত্বটুকু অপূর্ব সৌন্দর্য ও অত্যুচ্চ শিল্প কলার দাবী রাখে।

'মধ্যবর্তিনী গল্পে কবিত্ব নয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই প্রধান স্থান অধিকার করেছে বলে মনে হয়। বাঙালী জীবনের অতি সাধারণ একটি পারিবারিক ঘটনার মধ্যে তিনটি নর-নারীর (নিবারণ-হরসুন্দরী-শৈলবালা) পারস্পরিক প্রেমের গভীর প্রভাব যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপূর্ব শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। রোগ গ্রস্তা হরসুন্দরীর সীমার জন্য আত্মত্যাগ ও তাকে পুনরায় বিবাহ দিয়ে একটা বিরাট কিছু করার বাসনা, অপর দিকে শৈলবালাকে ঘরে আনার পর থেকে তার মধ্যে হঠাৎ-জাগ্রত অকাল প্রেম বাসনার দ্বন্দ্বটুকু অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আরও কিছু গল্প বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ ও কবিত্বশক্তির পরিচয়টিই পাব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের ক্ষেত্রে প্রধান কথা—রবীন্দ্রমানসের যে বিশিষ্ট জীবনবোধ তারই পরিমণ্ডলের মধ্যে এদের অবস্থান। তাই প্রচলিত মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের থেকে এদের অনন্য বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। অবশ্য প্রতি লেখকেরই বিশিষ্ট জীবনবোধ তার গল্পে বা উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য এনে থাকেই।

সমাজ নিয়মের বাঁধা কাঠামোর মধ্যেই মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরা। মানুষ সামনের দিকে চল্‌তে থাকে নানা নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সামাজিক নিয়ম-কানুন ত নিত্য পালটায় না। পুরোণো মন অনেক দূর চ'লে আসে আর পুরোণো সংস্কার-বিশ্বাস-ধারণা তাকে সব সময় তাড়া করে। বাইরের চালচলন এই সংস্কার বিশ্বাসের ভয়ে খানিকটা সংযত হয়ে চললেও মনটা প্রতি মুহূর্তেই ঘা খায়। আর তার চলা শুরু হয় অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত পথে। গল্পকার তথা কথাসাহিত্যিক মানব মনের এই দ্বন্দ্ব জটিল গহন গভীর আরণ্যক দিকটা তুলে ধরেন অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি ও যুক্তির প্রাখর্য দিয়ে। কারণ যুক্তি ও বুদ্ধির হাতিয়ার ছাড়া মানব মনের এই জটিল মহারণ্যে পথ কেটে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নয়, তাছাড়া যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যেই তো তাকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। তবে, যুক্তি-বুদ্ধি গ্রাহ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু নয়, সর্বোপরি তাকে শিল্পবস্তু হয়ে উঠ্‌তে হবে।

আর, রবীন্দ্রনাথ এখানেই সব থেকে উত্তীর্ণ। তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা অনেক পরিমাণে মুছে গিয়ে তা' হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিশেছে হৃদয়ের স্নিগ্ধতা, সূর্য শিখার সঙ্গে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের, বর্ণনা-চাতুর্যের সঙ্গে অপূর্ব শিল্পকৌশলের, বস্তুসত্যের সঙ্গে কল্পসৌন্দর্যের, বাস্তববাদীর সঙ্গে কবির সম্মিলন।

তাই পরিশেষে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলিতে নর-নারীর "আঁতের কথা" বের ক'রে দেখিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শুধু নয়, দেখিয়েছেন কবি হৃদয়ের সহানুভূতি ও কল্পনার আলোক সম্পাতে। তাই তাঁর গল্পগুলি তথাকথিত মনস্তত্ত্বমূলক গল্প নয়।

## সোভিয়েতে ভারতচর্চা

সুখের কথা, বিশেষত স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশে-বিদেশে নানা জিজ্ঞাসা, গবেষণা উৎসাহিত হচ্ছে। যদিও ভারত সম্পর্কে দেশ-বিদেশের আগ্রহ নতুন কোনো ব্যাপার নয়, তথাপি কোনো দেশ যদি বিশেষ এক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত চর্চার নানা স্বাক্ষর স্থাপনে উদ্যোগী হন তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে প্রাচ্যবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পর্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র তাঁদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের তর্জমা প্রকাশ করে রবীন্দ্র সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরম প্রকাশের মাধ্যমে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা তৎসহ আপনাপন প্রীতির সেতুবন্ধন করেছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর পূর্ব নজির যদিচ দুর্লক্ষ্য নয়, তথাপি সম্প্রতিকালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এক সুপরিকল্পিত ভারত জিজ্ঞাসা সাহিত্য পাঠক পরন্তু সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চেতনা সম্পন্ন জিজ্ঞাসুকে প্রদীপ্ত করবে।

সোভিয়েতের 'নৌকা' প্রকাশন সংস্থা সম্প্রতি ভারত জিজ্ঞাসায় যে পরিমাণ উৎসাহ প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন তৎসহ আধুনিক ও ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যে গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছেন তা যে কোনো ভারতীয়ের বিশেষত উৎসাহী সাহিত্য পাঠকের নিকট আনন্দের বিষয়। এই প্রকাশন তালিকার কিছু কিছু গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রকাশের পথে কিংবা অন্যভাবে প্রস্তুতির পথে।

উপরোক্ত তালিকায় 'Castes in India' একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ। প্রখ্যাত সোভিয়েত ভারতবিদগণের দীর্ঘকালের গবেষণার ফসল বর্তমান গ্রন্থটি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পুঁথিপত্র, প্রাচীন পারসিকে বিধৃত মুস্লিম ঘটনাপঞ্জী এবং তৎসহ প্রথম দিককার বিদেশী বিশেষত প্রতীচ্যের ভ্রমণকারীদের দিনলিপি থেকে বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য উপাদান বৈজ্ঞানিকভাবে আহৃত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় জাতি প্রথার মুল উৎস, বিকাশ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গেও আলোক-পাতের অসম্ভাব ঘটেনি। প্রকাশন সংস্থার মতে গ্রন্থটি নাকি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

খ্যাতিমান সোভিয়েত পণ্ডিত, অধ্যাপক এ. এম. দেয়াকভ দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ভারতের সামাজিক-অর্থনীতিক সমস্যাবলীর পাশাপাশি রাজ্যসমূহের ভাষা ভিত্তিক বিবিধ জটিল অবস্থাবলী পর্যালোচনা করেছেন বর্তমান রচনায়। আজ সামাজিক-অর্থনীতিক তৎসহ ভাষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যখন বিব্রত তখন

অধ্যাপক দেয়াকভের এতৎ সংক্রান্ত 'The National question in Modern India' হয়তো উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে।

ধর্মীয় ইতিহাসে বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আদর্শবাদের বিরোধ সুপ্রাচীন। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বিভিন্ন বস্তুতান্ত্রিক মতাদর্শের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে আদর্শের সংঘর্ষ মানব সভ্যতার বিশেষত আধ্যাত্ম জীবন বেদের ইতিহাসে এক বিশেষ দিকচিহ্নের সূত্রপাত করেছে। প্রকাশিতব্য On Materialistic Traditions in Indian Philosophy' গ্রন্থে এন, এনিকেয়েভ ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বস্তুতত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং তার বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিকশিত দার্শনিক তাৎপর্য যে প্রাচ্যের দর্শনের পরন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলীর প্রকারান্তর বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য সেকথা নানা তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লাভ করেছেন।

ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের কয়েকটি প্রকাশন-উদ্যোগ সোভিয়েতে ভারত সম্পর্কিত বর্তমান গ্রন্থ তালিকাকে উজ্জ্বল করবে। এই পর্যায়ে দু'টি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ্য। প্রথম গ্রন্থটি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত। গ্রন্থটির হচ্ছে 'Economic Development of India on the the Eve of the European Conquest'; রচয়িতা এ. চিচেরভ। এ. চিচেরভের বর্তমান গ্রন্থটিতে তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনীতি সম্পর্কিত নানা উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ বিশেষত উপনিবেশিক শাসন প্রচলনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিপদ সংকেত, তৎকালীন ভূম্যধিকারী অর্থনীতির মধ্যে তথাকথিত ধনতন্ত্রের পদধ্বনি তৎকালীন রাষ্ট্রীক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন জি. কোটোভস্কি। তাঁর দীর্ঘকাল ভারত পরিভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা তৎসহ তৎসংক্রান্ত সামাজিক ও রাজনীতিক চরিত্র উদ্ঘাটনে তিনি প্রয়াস লাভ করেছেন। গ্রন্থটি হলো 'The Agrarian question in Modern India.' গ্রন্থকার গ্রন্থের উপাদানাবলী ভারত ভ্রমণকালে নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতীর পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দু'টি গ্রন্থ-ও বর্তমান প্রকাশন তালিকায় রয়েছে। একটি ডক্টর কে. অ্যান্টোনোভা'র অষ্টাদশ শতকের ভারত-রুশ সম্পর্ক সম্পর্কিত 'Russian—Indian Relations in the 18th Century'; অপরটি ই. লাস্টারনিকের 'Russian—Indian Relations in the 19th Century'. বিগত শতকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সংযোগ বিষয়ক বর্তমান গ্রন্থটিতে নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের অনেক অপ্রকাশিত মৈত্রী-সংযোগের নানা সূত্র, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাহার এই গ্রন্থে উৎসাহী পাঠক আবিষ্কার করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সেণ্ট পিটাসবার্গ আকাদেমী অব সায়েন্সস ভারত থেকে শ্রীরাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে আকাদেমীর সম্মানিত সদস্যপদে মনোনীত করলে ভারতীয় বিজ্ঞানী জানিয়েছিলেন যে, I have the honour of informing you of receipt of your letter, and I would ask you to be so kind as to

convey to the Academy of Sciences my sincerest thank for the high honour it has shown me by electing me as honorary member, and for the kind fellings expressed regarding me, a modest pioneer in the field of Sanskritology'. বিগত শতকের এমনি নানা অজ্ঞাত তথ্য বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত।

., বর্তমান প্রকাশনার পক্ষ থেকে ও, কে ড্রেয়ার নিবেদন করেছেন যে বর্তমানে নানা বিষয় সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য প্রায় চল্লিশখানি ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশন তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কয়েকখানি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ইতিহাস এবং ইতিহাস কাহিনী মধ্য এশিয়া সম্পর্কিত-ও। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো 'Kara-Tepe'. এ ছাড়া তালিকায় কে. আস্রফিয়ানের 'The Agrarian System in Northern India in the 13th—18th Centurees' এবং এল, কেন্যাঝিনস্কি'র আধুনিক রাজস্থান ও পি, শাস্তিটকোর নানা সাহেবের কাহিনী রয়েছে। ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহ সম্পর্কে এক গবেষণা গ্রন্থ অচিরেই প্রকাশ পাবে বলে জানা গেছে। প্রাচান টারমেজে অবস্থিত বৌদ্ধ গুহা ধর্মবিহার কারা টেপের সংস্কৃতি পুরাতাত্ত্বিক উদ্ধার, ইতিহাস ইত্যদি 'Kara-Tepe" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 'Kara-Tepe' অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জিজ্ঞাসায় আলোকপাত করবে।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে নানা তর্জমা গ্রন্থ প্রতি বছর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ বছরে তামিল ভাষার এক ধ্রুপদী উপন্যাস 'শিলাপ্পাধিকরম' রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি 'Stories, Tales and Parables of Ancient India' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। সংবাদে প্রকাশ, ষাট হাজার কপির এক সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত প্রায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সোভিয়েট সাহিত্য পাঠকের এ জাতীয় উৎসাহ নিঃসন্দেহে আমাদের ভালো লাগবার বিষয়। তামিল ভাষা, সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্য গ্রন্থও ইংরাজীতে প্রণয়ন করেছেন দুই সোভিয়েত পণ্ডিত। উভয়েই ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল। ভি. তপোরভ ও ভি. আইভোনভের 'Sanskrit' গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার মূল উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং ইতিমধ্যে ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাহিত্য সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আই. সেমেব্রিয়াকভের 'পাঞ্জাবী সাহিত্য' গ্রন্থকারের ভারতীয় ভাষাপ্রীতির নিদর্শন।

সোভিয়েত সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে ভারতবাসীর উৎসাহও কম নয়। বারান্তরে ভারতে সোভিয়েত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

## শিল্পের নীতি

শিল্প খুব করে শিক্ষা দেবে, না বেশ করে আনন্দ দেবে—এ প্রশ্ন চিরকালের। আর এ নিয়ে জল ঘোলাও কম হয় নি। সেই ঘোলা জলের উজান বেয়ে শেষ পর্যন্ত আনন্দের ভিত্তিখানাই ঘাটে এসে ভিড়েছে, আমরাও তাকে বাহন করে মন-পবনে ভেসে ভেসে ঘট ভরেছি শিল্পরসের তীর্থলোকে। তবু বুঝি সেই চলার সাথে শিক্ষার দাঁড়-টানার সঙ্গতটুকু একেবারে চাপা দেয়া যায় না। অবশ্য চলতি কথায় শিক্ষা বলতে যা বুঝে থাকি, এ শিক্ষা তেমন কিছু নয়; তার মানে—এ শিক্ষা বর্ণপরিচয়-বোধোদয়ের নয়, যদিও তা রসিক মনে বোধের উদয়ের জন্যে, জগৎ-জীবনের সঙ্গে নানা বর্ণের পরিচয়ের জন্যে।

সাধারণভাবে আমরা জানি, নীতির সংবিধানগুলো কষে রপ্ত করে নেবার নাম শিক্ষা। নীতির ঐ সব বিধান গড়ে উঠেছে মানুষের গোষ্ঠীবাঁধা সমাজ থেকে, যেখানে একজনের জীবন আরেকজনের জীবনের সঙ্গে সাত দুগুণে চোদ্দ পাকে বাঁধা, সেখান থেকে। সে সমাজে হাজার ভালো-মন্দের মাঝখানে একটা পাকা দাঁড়ি বেঁধে দিতে হয় জীবন-চালনাকে মেপে দেখবার জন্যে, নইলে জীবনের চলাফেরায় তার নিজের খেয়াল-খুশিটাই বড়ো হয়ে উঠলে যে ফেঁসে যায় গোটা সমাজের বুনুনি। তাই অধিনায়কেরা তাঁদের অভিজ্ঞতার জোরে একখানা ছক বানিয়ে বিছিয়ে ছিলেন সমাজের চলার পথে। কিন্তু জীবন সব সময়েই চায় নিজের আনন্দে নিজেকে মেলে ধরতে। ফলে, নীতির বিধান আর বাঁধন—দুটোকেই পায়ে পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে জীবন চলে আপন চালে। আর যে শিল্প জীবনের কথাই বলে, জীবনের ছবি আঁকে, গান গায়, মূর্তি গড়ে, সেও জীবনেরই সাথে তাল রেখে এড়িয়ে যায় ডাইনে-বাঁয়ে তর্জনী-তোলা নীতির পাকা সড়কের একঘেয়েমিকে। কারণ ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া যে-কদম ফেলে তাতে জোর যতোই ফেটে পড়ুক, অন্তত উচ্চৈঃশ্রবার চলন-ছন্দের ফুর্তিটুকু যে ফুটে ওঠে না এ কথা হলপ করেই বলতে পারি।

এ ছাড়া নীতির ভেতরে কল্যাণবোধের একটা ইসারা আছে। নীতি গড়া হয়েছিলো সমাজের শান্তি-স্বস্তির খাতিরে। কাজেই রোজদিনকার ঘরকরণার চাওয়াটাই ওর কাছে একমাত্র, এর বাইরে সে নারাজ। শিল্প কিন্তু আজকের সামান্য চাওয়াকে অসামান্যও করে তুলে অফুরন্ত কাল-পরশুর ঘরে পরম পাওয়াকে পৌঁছে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নীতি আর শিল্প—দুটোই ভিন্ন জাতের জিনিস—চরিত্রের দিক থেকে, সে সঙ্গে চারিত্রের দিক থেকেও। এমনি ধারা অবস্থায় চেষ্টা করলে দুয়ের মাঝে সাঁকো হয়তো একটা গড়া যায়, তবে সে সাঁকো খানদানী সমঝদারকে কখনোই রসলোকে উৎরে দেয় না। তার ওপর, নীতি আর শিল্পের

তু নৌকায় ভাবকে সওয়ার করলে সে ঘরেও যায় না, ঘাটেও যায় না, মাঝখান থেকে তার জলাঞ্জলিটাই সহজ হয়ে ওঠে। যেমন, ঈশপের গল্প ঠিক শিল্প নয়, শিল্পের মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই গল্পও নয়। কারণ ওর সব কথকতার গতি-পরিণতি ঐ নীতিকথার দিকে। ফলে নিরেট একটি উপদেশ বিলি করবার একরোখা ইচ্ছের তাড়ায় সেখানে শিল্পয়ানার জিরেন-কাটের সুযোগ মেলে নি।

অবশ্য গোড়াতেই শিক্ষার যে চওড়া মানেটা ধরেছি তাকে যদি মেনে নিই, তবে তো শিল্পের শিক্ষা দেয়া ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। এমন কি, শিল্পকে তখন স্বচ্ছন্দে নীতিবাগীশ বলতে পারি। করণ তখন নীতিকে দেখি ছাঁচে কেটে সমাজ গড়বার কাজে প্রাজ্ঞ-বচনের গুরুগিরি হিসেবে নয়, বরং নানা কোণ থেকে আলো-ফেলা ছবির মতো জগৎ-জীবনকে শিল্পের সকলমুখী পর্দায় ফুটিয়ে তুলে তার সঙ্গে মনের হাজার অনুভূতির আশনাই গড়বার কাজে নিশ্চিত নিরিখ হিসেবে। তবে এ কথা ঠিক। শিক্ষার এমনি ধারা একটা চওড়া মানে ধরে নিলে শিল্পের দাম আর যাচাই করা যাবে না। তখন তো জগৎ কিংবা জীবনের কোনো-না-কোনো খবর পৌঁছে দিয়েছে বলে সব শিল্পকে একই কারণে দামী বলতে হবে। তার ওপর, এমন অনেক শিল্পী আছেন, শুধু খবর ফেরী করাই যাঁদের উদ্দেশ্য নয়, যাঁরা দেখা-শোনা-ধরা-ছোঁয়ার নানান জিনিসের ভেতর দিয়ে রসিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান ভাবের বোঝাপড়ায়। তার মানে, পটের গায়ে তুলি টেনে গাছের পাতাগুলোকে সবুজ রঙে রঙিয়ে দিয়ে তাঁরা সবুজ পাতার কথা বলেন না, বলতে চান জীয়নকাঠি যৌবনের কথা। কাজেই নীতি-মাপার দাড়ি-পাল্লাটাকে অন্যভাবে সাজানো যাক। আমি বলি, রূপের চেয়ে ভাবটাই যখন বড়ো হয়ে ওঠে, শিল্প তখন নীতিবাগীশ। রূপ আর ভাব যখন মিলেমিশে হরগৌরী হয়, শিল্প তখন সত্যিকার শিল্প।

এদিক থেকে দেখলে শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলে রেখে আমাদের সেই আনন্দের দিকেই ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে। কারণ নীতির মন্ত্র আউড়ে শিল্প শুধুই শিক্ষা দেবে—গ্রীসদেশে যখন এমনি এক হাওয়া বইছিলো পুরোদমে, ঠিক তখ্‌ন দেখছি কাব্য কথায় যে সব দেবচরিত্র আঁকা হচ্ছিলো, তাদের ভেতরে ছিলো না কোনো নীতির নাম-গন্ধ, ছিলো স্বভাব সুলভ মানুষ এঁকে মানুষকে আনন্দ দেবার শিল্পমাফিক প্রেরণা। নীতির পেছনে ঘুরে ঘুরে খুর লেগেছিলো বলেই সেকালের কোনো কোনো শিল্পীর হাতে চরিত্রগুলো হয়ে উঠতো •হয় নিছক ভালো, নয়তো নিরেট মন্দ। কিন্তু আমরা জানি, কোনো মানুষই সকল-ভালো কিংবা সকল-মন্দের ডল-পুতুল হতে পারে না। সব মন ভালো-মন্দের লালে-নীলে ময়ূরকণ্ঠী রঙে ছাপানো। তাই জোরালো তুলিতে কোনো মজবুত চরিত্রের দুর্বলতাকে ফুটিয়ে তুললে তা একদিকে যেমন চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পরসের জোগানদারিকে সরস করে দেয়। কারণ চরিত্রের ত্রুটি কখনোই শিল্পের ত্রুটি নয়।

তবে নজর রাখতে হবে, রসের আগ্রহে শিল্প যেন শিল্পের খাতিরে গড়ে না ওঠে। মানুষের সব ইচ্ছের শেষ কথা হলো সুখ। নীতি আমাদের সেই সুখসায়রে যাবার পথ দেখায়,

শিল্প আমাদের সেখানে নিয়ে যায় সাথী করে। কাজেই শিল্পের খাতিরেই শিল্প গড়া হোলে আমাদের ইচ্ছাগুলো আর রসের ঘরে মান পায় না, সে সঙ্গে নীতির নিশানদারিও যায় ঘুচে। তাছাড়া দুনিয়া যখন মানুষের কাছে শত্রু শিবিরের মতো, তখন মানুষের স্বচ্ছন্দ চলনরেখা হচ্ছে মন্দ থেকে ভালোর দিকে নয়, অসুন্দর থেকে সুন্দরের দিকে, নেতি থেকে অস্তির দিকে। এ কাজে শিল্পই একমাত্র সহযাত্রী। কারণ সব অস্তিই শিল্পের বিশ্বস্ত ফসল। এ থেকে এটুকু মেনে নিতে পারি যে, শিল্প জীবনের এক একটা ছাঁচ গড়ে দেয়, আর সেই শিল্পের ধাঁচে আমরা জীবন গড়তে চাই। সমাজ ভেঙে পড়ছে মানে মানুষের ত্রিশঙ্কু-জীবন সুরু হতে চলেছে—এমন আজগুবি ধারণার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আসলে পালাবদল চলেছে—গোষ্ঠীসমাজ থেকে গণসমাজে। এমনি এক অবস্থায় শিল্পকলার ওপর জোর দিলে শুধু অ্যাকোয়ারিয়ামে শহরবাসীর সাগর-বিলাস হয়ে উঠবে, আর নীতিকে মদত জোগালে সব শিল্পকেই উপাসনাগারের প্রার্থনা-শেষের ভাষণ বলে মনে হবে।

তবু কিন্তু অনেকেই শিল্পের সব দায়িত্ব নীতির হাতে সঁপে দিতে চান। তাঁরা বলেন, নীতিই হচ্ছে শিল্পের সেরা পরিণতি, কারণ এই নীতিই মানুষের ন্যায়বোধকে ধারালো আর ধর্মবুদ্ধিকে জোরালো করে তোলে, সে সঙ্গে জীবনকে দেয় বস্তুসুখের আস্বাদ। নীতির দলীরা তাই আনন্দকে দেখেছেন নীতিবিকাশের তোরণবীথি হিসেবে। ফলে আনন্দ, তাদের মতে, শিল্পের লক্ষ্য নয়, যদিও তা শিল্পের একটা উপলক্ষ। আমার বিশ্বাস, শিল্পকে যাঁরা এমনিকরে নীতিসর্বস্ব করে তুলবার কাজে উৎসাহী, তাঁরা নিশ্চয়ই মধ্যযুগের পোপপুরোহিতের সমাজ চালনার আদলটিকে প্রাণপণে মক্শো· করে চলেছেন। তাছাড়া এ তো জানা কথা, ওষুধ দিয়ে হয়তো রোগ সারানো যায়, কিন্তু উপদেশ দিয়ে পাপকে পুণ্য করা যায় না। বিশেষ করে মানুষের সব চারণ আর আচরণকে যদি তার স্বভাব বলে ধরে নিই, তবে তো পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটাকে বেমালুম খারিজ করে দিতে হয়।

কেউ কেউ অবশ্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে আনন্দ দেয়াকে শিল্পের নিশানা বলে ধরে নিয়েছেন। আমরা জানি, শিক্ষা জিনিষটা বুদ্ধির ব্যাপার, আনন্দটা হৃদয়ের। এখন, বুদ্ধির মারফৎ হৃদয়কে ছুঁতে গেলে সে-ছোঁয়াটুকু ছোঁয়াচে হয়ে ওঠে না। ফলে বুদ্ধির দৌলতে উচিত-অনুচিতের জেরায় হৃদয় রোমাঞ্চ হারায়। শিল্প-উপভোগের এমনি একটা ঋতুকে যদি বেশিদিন জীইয়ে রাখি তবে কালে দেখবো, শিল্প একেবারে বিশ্বামিত্রের স্বর্গ হয়ে উঠেছে, আর বুদ্ধি যে-শিল্পকে বরমালা পরায় না, আমরা তাকে দুর্নীতির পোষ্টা বলতে শুরু করেছি। তাছাড়া উচিত-অনুচিতের ধুয়ো তুললে স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে ফিরে সেই ভালো-মন্দ-পাপ-পুণ্যের কথা এসে পড়ে, যদিও খাঁটি শিল্পের কারুশালায় এদের কোনো দাম নেই। কারণ ভালো-মন্দ-পাপ-পুণ্যের মাপকাঠিতে শিল্পকে যাচাই করতে গেলে নৈতিক আদর্শের জয়ধ্বজা ওড়ানো ছাড়া শিল্পের পাসমার্কা পাবার কোনো ভরসা থাকে না। তাই যাঁরা বলেন, শিল্পের পক্ষে নীতিবাগীশ হওয়াটাই উচিত, আমি তাঁদের কথার ঐ 'উচিত' শব্দটিকে মেনে নিতে পারছি নে। 'উচিত' সবসময়েই আমাদের চলার পথটাকে দেয় বেঁধে, চলার চালটাকেও। এখানে এই 'উচিতে'র প্রয়োগ নিশ্চয়ই শিল্পের খাতিরে না হয়ে

নীতির খাতিরে। আর শিল্পের দিক থেকে উচিত বলে কিছু যদি মানতেই হয়, তবে শিল্প যা হয়ে উঠতে চায়, শিল্পের পক্ষে সেটাই একমাত্র উচিত। আমার বিশ্বাস, শিল্পের নৈতিকতা কথনো সত্য হতে পারে না—নীতির তপোলোকেও নয়, শিল্পের রসলোকেও নয়। নীতিই বরং নিজেকে জাহির করবার জন্যে শিল্পের মুখোশে নিজের মুখ লুকোয়। শিল্পের কল্পকলার কারিগরিতে নীতির ওস্তাগরী মুন্সিয়ানার কলি না ধরালেও চলে।

তাই যতোই দিন যাচ্ছে, নীতি ততোই জনকল্যাণের দায় এড়িয়ে শিশু-তাড়নের বিষয় হয়ে উঠছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন হয় তো সেখান থেকেও তার পাট উঠবে। এমনিধারা নীতিকে আঁকড়ে যদি শিল্প নিজেকে মেলে ধরতে চায় তবে তো কালে মুছে যাওয়া ছাড়া শিল্পের আর কোনো পরিণতি আমরা ভাবতে পারি নে। অন্যদিকে, সরাসরি কিছু শিক্ষা না দিলেও শিল্পের ভাব কিন্তু আমাদের মন্‌কে নিয়ে যেতে পারে অনেক উঁচুতে—জগৎ-জীবনের সঙ্গে নানা বর্ণের পরিচয় ঘটিয়ে আমাদের বোধের উদয়ের ভেতর দিয়ে। সেজন্যে, ধর্মচেতনাই বলি, সংস্কারমুক্তিই বলি, আর শ্রেণীসংগ্রামই বলি—সব জায়গাতে শিল্পকেই কাজে লাগানো হয় সেরা হাতিয়ার হিসেবে। কারণ নীতি তখন নিজেকে শিল্পরসে জারিয়ে নিয়ে শিল্পীর দর্শন হয়ে ওঠে, তারপর জনমনকে সেই দর্শনের আওতায় নিয়ে আসবার জন্যে জনগণের আবেগকে দেয় জাগিয়ে।

কাজেই নীতি বলতে আমি দর্শনের কথা বুঝেছি। আমার মতে, শিল্পরচনার পেছনে যদি শিল্পীর নিজের কোনো দর্শন বা মানসভঙ্গিমা জড়িয়ে থাকে, তবে শিল্পের পক্ষে সেটাই পরম নৈতিকতা, আর তখনই শিল্প নীতিবাগীশ না হয়ে নীতিবাদী। দর্শনছাড়া শিল্প তো পারদ ছাড়া আয়নার মতো, নিশানা খুঁজে পাওয়া ভার। তাছাড়া শিল্পীর দর্শনের ছাপটি নিয়েই রচনা ঠিকমতো শিল্প হয়ে ওঠে; সে সঙ্গে শিল্পীর নিজের হয়ে ওঠে। তবু সেই দর্শনকেই শিল্পের নৈতিকতা বলে রায় দিলে, আমার মনে হয়, নীতির চল্‌তি মানে থেকে সরে গিয়ে নোতুন একটি চওড়া মানেতে মুক্তির পথ বাৎলে দেয়া হবে। এর ফলে গোষ্ঠীভাঙা সমাজের হৃদয়দোলার তাল এসে লাগবে নীতির সেকেলে ধারণায়, চিরকালের আনন্দের কথা বলতে বলতে শিল্প যাবে কালান্তরে। এখানে মনে রাখা দরকার, দর্শনের চোখে সবকিছুকে দেখতে গেলে শিল্পের রস যাবে শুকিয়ে, বরং সবকিছুকে দেখার ভেতর দিয়ে দর্শককে গড়ে তুললে শিল্পের গুলবাগে ফুল ফুটবে আনন্দের। তাই শিল্পে নীতি না থাকলে সুখী হবো, যদিও শিল্পের একটা নীতি না থাকলে খুশি হবো না।

দেবব্রত চক্রবর্তী

## নাট্যতত্ত্ব: অভিনয়ে আলঙ্কারিক রীতি

নাট্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন একটি কথা উঠেছিল যা বিচার সাপেক্ষ—পশ্চিমী দেশগুলিতে বর্তমানে মঞ্চায়নে ষ্টাইলাইডজ বা আলঙ্কারিক যে রীতি প্রচলিত হয়েছে তা এদেশেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত হওয়া উচিত।

প্রশ্নটির গঠনের ত্রুটিকে বড় করে দেখা অপ্রয়োজনীয় হলেও, একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আলঙ্কারিক রীতি সর্বত্র প্রচলিত হয়নি; কোন কোন অঞ্চলে এ রীতি সম্পূর্ণ অস্বীকার হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু পরিমাণ নট ও নাট্যকার এ রীতি অনুসারী হওয়ায় একে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

আমাদের দেশে এ রীতি কি প্রচলিত করা সম্ভব? এ প্রশ্নটি বিচার করার আগে বিদেশে কিভাবে এরীতি প্রচলিত হ'ল তা একটু পর্যালোচনা করা দরকার। দুই মহাযুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশ বিধ্বস্ত হয়, সমাজের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, নিয়ম-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় আর বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয় না। ফলে সমস্ত বিধি-নিষেধকে ভাঙার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাতেও তার প্রভাব বাড়তে থাকে। সাধারণ নাট্য-রচনারীতি তথা অভিনয়ে প্রচলিত রীতিকে অস্বীকারের ঝোঁক ফুটে ওঠে।

নাট্যরচনারীতিতে এ প্রভাবের ফলশ্রুতি আয়োনেস্কো, বেকেট, জন আর্ডেন প্রভৃতির নাটক। এসব নাট্যকারের রচনা এ ধরণের এমন কথা বলা চলে না। তবে মোটামুটি একটা মিল এঁদের মধ্যে দেখা যায়। এঁদের নাটকের গঠনরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট একটা কাহিনীর প্রকাশ ঘটে না। সংলাপ লেখা হয় কিছুটা অন্যভাবে। অর্থাৎ আংশিকভাবে কিছুটা অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলা হয়। অবশ্য এই অস্বাভাবিকতার পূর্বতন প্রস্তুতি ছিল।

অনেকদিন আগে থেকেই চিত্রাঙ্কনে বিমূর্ত রীতি ওদেশে প্রচলিত। ক্রমান্বয়ে তা কবিতা, উপন্যাস ও গল্প প্রভৃতিতেও দেখা দিতে থাকে। অত্যন্ত ধীরে হলেও অন্ততঃ কিছুসংখ্যক লোক এই ধারার অন্তর্নিহিত রূপ ধরতে পেরেছেন বলে দাবী জানান এরপর মঞ্চে যে সেই ধারার প্রতিফলন পড়বে তা নিশ্চিত করে বলা চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপের নাট্যশালায় এধরণের নাটক দেখা যেতে লাগল।

এধরণের নাটককে গতানুগতিক অভিনয়ের দ্বারা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভভ নয় বিবেচনা করেই আলঙ্কারিক অভিনয়রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হ'ল।

ঐতিহাসিক এ পটভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত থাকলে আলঙ্কারিক অভিনয়রীতি কোন কোন নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব তা বোঝা কষ্টকর হয় না।

এবার আমাদের দেশের অবস্থা বিচার করা যাক। এদেশে আজো অভিনয়রীতি, মঞ্চায়ন প্রভৃতিতে পুরানো রীতিরই প্রাধান্য। কিছুটা আনুষঙ্গিক সর্বাধুনিক হয়েছে বটে কিন্তু কিছু অন্য বিষয়ে পরিবর্তনের হাওয়া মস্কো আর্ট থিয়েটার তথা স্তানিস্লাভস্কি পর্যন্ত এগিয়েই থেকে গেছে। এমনকি থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির অভিনয়ের ধাঁচও আজকের বাঙলা নাট্যশালায় দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগামীতা বার্ণাড শ, চেখভ বা পিরান্দেলোতেই সীমাবদ্ধ পেছনের দিকে গেলে আমরা অবশ্য সোফোক্লিস পর্যন্ত পৌছেছি। অবশ্য আন্তর্জাতিক হবার পথে বাধা মনে হতে পারে বলে সংস্কৃত নাটকের ধার ঘেঁসিনা, ১৯ শতকের কিছু প্রহসন আমাদের ঐতিহ্য বলে উপস্থাপিত করি।

এহেন অবস্থায় আধুনিকতম বিমূর্ত রীতির নাটক মঞ্চস্থ করার প্রচেষ্টা একান্তভাবে সৌখীন থাকতে বাধ্য। আর তাই তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে আলঙ্কারিক রীতির প্রচলন এখন পর্যন্ত বিশেষ হয় নি।

এটা গেল একদিকের কথা অর্থাৎ রীতিটা কেন প্রচলন হয়নি তার কথা। এর অন্য দিকটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রীতিটার প্রচলন উচিত কি না—?

আলঙ্কারিক রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতা। এই রীতিতে মানুষ মানুষ থাকবে না, সে হয় কাঠের পুতুল বা জানোয়ার ঐ ধরণের কিছু একটা হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'এর কথা ধরা যেতে পারে। এখানে তাস বংশীয়দের দ্বিমাত্রিকতা বোঝাবার প্রচেষ্টায় ক সাহেব, রাণী, হরতনী, দহলাপণ্ডিত বা তুরিতুরির চলা-ফেরার মধ্যে যান্ত্রিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা সমস্ত ব্যাপারটির অবাস্তবতা সম্বন্ধে দর্শক মনকে সজাগ করে থাকবে। একদিক থেকে বিচার করলে তাতে দর্শকের কাছে তাসের দেশ-এর নবরূপায়ণ যেমন ঘটবে ঠিক তেমনি কাহিনীর পূর্ণ রসাস্বাদনে বাধা ঘটবে।

এমন কোন নাটকের পূর্ণ রসাস্বাদনে অভিনয়রীতি যদি বাধা দেয়ও তাকে প্রশংসনীয় কিছু নিশ্চয় বলা চলে না এবং তাকে পরিত্যাগ করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হবে।

তবে কোন কোন নাটকের ক্ষেত্রে এ রীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যেমন আয়োনেস্কো বা বেকেটের নাটক যদি মঞ্চায়িত করতে হয় তাহলে আলঙ্কারিক রীতির সাহায্য নেওয়া দরকার। কারণ তা হলেই নাটকের রস যথাযথ ভাবে গ্রহণ সম্ভব হবে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের দেশের রসিক দর্শকরা এ রীতি গ্রহণ করতে রাজী হবেন কিনা?

প্রায় একশতাব্দী কাল নিয়মিত ভাবে দেখার পরও যদি ফ্রেমে আঁটা থিয়েটারকে এদেশে আত্মস্থ করা সম্ভব না হয়ে থাকে, যদি আজো যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় প্রতিবারেই যাত্রা জয়লাভ করেও নবতর রীতির সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়? যদি দীর্ঘদিবস নাট্যশালাকেই সর্বস্ব বলে কাটাবার পর মহান অভিনেতা যাত্রাতেই এদেশী নাট্যসৃষ্টি পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে বলে মত প্রকাশ করেন ত কোন অভিনেতা নতুন রীতির প্রচলনের ঝুঁকি ঘাড়ে নেবে?

কাজই ধরে নেওয়া যায়, আলঙ্কারিক রীতি প্রচলন প্রায় অসম্ভব। এমন একটা অসম্ভব

প্রচেষ্টার জন্ম সময়, অর্থ ও শক্তির অপব্যয়ের কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা সন্দেহ।

এমন অবস্থায় আলঙ্কারিক অভিনয় রীতি প্রচলন বা তদনুযায়ী নাটক মঞ্চায়ন অর্থহীন বাড়াবাড়ি বলা চলে। আমাদের অভিনেতাদের এধরণের কাজের মোহ ত্যাগ করাই সমীচিন; তাহলেই বাঙলা নাটক, নাট্যশালা তথা অভিনয়ের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে ব্যথা না করে নাটক ও নাট্যশালার সমস্যাদি দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করলে একটা প্রকৃত কাজ করা হবে এবং আখেরে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই লাভ।

রবি মিত্র

**সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস** ॥ কলিকাতা সংস্কৃতমহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা ক্রমিক সংখ্যা ২৯। শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৫৲।

একাধিক কারণে বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ সমালোচনাসাহিত্যের গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহা একখানি মূল্যবান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সংস্কৃত অলঙ্কারসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে হাস্যরসের উপর এরূপ বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয় নাই। সংস্কৃতসাহিত্যের বিশেষতঃ তাহার দৃশ্যকাব্যসমূহের ভিন্নভিন্ন বিভাগে এই রসের উপাদান একত্রে আলোচনায় সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের তাৎপর্য অনুধাবনে বিশেষ উপযোগিতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্বের দৃষ্টি প্রাচীনভারতীয় (আর্ষ) সিদ্ধান্তের নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আনুসঙ্গিকভাবে সমভাবাপন্ন বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের একাধিক লক্ষণ পরীক্ষায় সাধারণ পাঠক উপকৃত হইবেন। উল্লেখযোগ্য এই যে বিদগ্ধ ও সহৃদয় সুধী এই আলোচনায় চিন্তার ও উদ্দীপনার পরিচয় পাইয়া যথার্থ সন্তোষ অনুভব করিবেন।

বক্তব্য উপস্থাপনে ও তাহার বিভাগে সমঞ্জস ভঙ্গী, সিদ্ধান্তসমর্থনে প্রচুর যুক্তিবিন্যাস প্রয়োগের অনবদ্য নিদর্শন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আধুনিক সূরিগণের বিচক্ষণ মন্তব্যের উদ্ধার, সূচীর অবস্থান, ক্ষুদ্র হইলেও নিতান্ত উপযোগিপরিশিষ্ট যোজনা একদিকে যেমন গ্রন্থের অন্তরঙ্গকে সমৃদ্ধ করিয়াছে অপরদিকে তেমনই যথাসাধ্য পরিপাটী মুদ্রণও তাহার বহিরঙ্গকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। রসতত্ত্বের নির্দেশক মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে হাস্যরস শৃঙ্গাররস হইতে উৎপন্ন ও শৃঙ্গারানুকৃতি বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের দিক দিয়া এই নির্দেশ প্রণিধানযোগ্য। নন্দনতত্ত্বের বিচারে শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি। অভিনেয় কাব্য ভেদের উপাদান নিরূপণে নন্দনতত্ত্বের বিনোদ ও আনন্দবিধান, যাহা কৌতুক (amusement) অনাবিল স্ফূর্তি (mirth) ও তাহার অতর্কিত ভাবে আবির্ভাব (unexpectedness) এবং অবসাদের তিরোধান ও লাঘব (diverson) প্রভৃতি সাহায্যে আত্মপ্রকাশনায় তাহার তুল্য বলিয়া প্রথম বিশ্লেষণ সার্থক।

নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে দশপ্রকার রূপকের মধ্যে সমবকারের বিষয়গুলির সঙ্কীর্ণ অস্পষ্টতার কথা বাদ দিলে বীথী ও প্রহসন বলিয়া নির্দিষ্ট রূপক ভেদে প্রত্যক্ষ ভাবে ও ভাণনাটক ও প্রকরণ বলিয়া অভিহিত তিনবিভাগে অপ্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় উক্তির উপযোগিতা উপলব্ধ হয়। ভরতের গ্রন্থে উহাদের লক্ষণে আখ্যানবস্তু ও তাহার ঘটনার বিন্যাসভঙ্গী ও পাত্রের ভাষণের বৈশিষ্ট্যে হাস্যরসের অবকাশের কথা নিরূপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য কোবিদ্‌বর্গের হাস্যরসাশ্রিতরূপকে (stage play) উল্লেখ্য গ্রামীণ সভ্যতার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছে।

এইপ্রকার অবান্তর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিচয় জাতকল শাস্ত্রকারের নির্দিষ্ট উপরূপকে প্রসিদ্ধ ও লক্ষণীয়। রসসর্বস্ববেদী অভিনবগুপ্ত হাস্যরসকে ব্যাখ্যানের ধারাবাহিক পদ্ধতির ব্যতিক্রমে উপরঞ্জক বা রঞ্জক প্রধানরসের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের relief বা relaxation পর্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ অভিনবভারতীতে উপরঞ্জক ও রঞ্জক শব্দের একাধিক প্রয়োগ এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন তাঁহার দশরূপক নিরূপণ প্রকরণে রঞ্জন প্রধান তত্ত্ববিশ্লেষণ হাস্যরসের মতো করুণেও প্রযুক্ত হইয়াছে। পরিপূরকরূপে ও এই অর্থের অনেকত্র প্রয়োগ ও বিরল নহে। হাস্য সম্বন্ধে রসিক সম্প্রদায় সিদ্ধ রসাভাস পদটি তাহার নিকৃষ্টতার দ্যোতক নহে। হাস্যও স্থলবিশেষে রসাভাস যেমন রাবণের সীতাগত রতি; আলঙ্কারিক সম্প্রদায় সিদ্ধান্তে হাস্য এইখানে বিশেষ স্থায়িপদবাচ্য নহে বলিয়া অনৌচিত্যের প্রসঙ্গ উদিত হয়। অথবা শোকে—যাহার বন্ধু নহে তাহার বিষয়ে শোকে, করুণপদবাচ্য ভাব হাস্যপদের দ্বারা অবিহিত হইবে। এইরূপ অনৌচিত্য অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও সম্ভূত হইয়া হাস্যের অবতারণা হয়। এ কারণে হাস্যের অন্যত্র রসবিচারে রসত্বের হানি হয় না। এই অনৌচিত্য সাধারণ জ্ঞানের অসঙ্গতি পরিমিতি বোধ ( sense of proportion) বা মাত্রাজ্ঞানের অভাবরূপে সাহিত্যে দেখা যায়। সাধারণ জ্ঞানের অনৌচিত্য পারিভাষিক অনৌচিত্য হইতে স্বতন্ত্র—সে কারণে প্রকৃত হাস্যরসে রসভঙ্গ বা রসত্বসিদ্ধির হানি হয় না। রসের আনন্দময় বৈশিষ্ট্য তাহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকট। হাস্যরসের অনুভাব রূপে স্মিত ও হসিত উত্তমপ্রকৃতির নায়কের পক্ষেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নীচপাত্রতা হাস্যরসের আপাত লক্ষণ বলিয়া অনেকত্র প্রতিভাত হইলেও তাহা তাহার স্বরূপ নহে। "হাসও স্বভাবতঃ সংক্রমণ শীল" অভিনবগুপ্ত এইরূপে হাসকে অন্যভাব হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়াছেন মাত্র। জ্ঞানের উৎকর্ষাপকর্ষ পরিমাণ করেন নাই। বস্তুতঃ নীচপাত্রোচিত গ্রাম্যতা হাস্যের পর্যায়ভুক্ত নহে। এ বিষয়ে এই নিবন্ধে রসশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কিছুটা অস্পষ্ট হইয়া রসতত্ত্বের সিদ্ধস্বরূপকে ম্লান করিয়াছে। তাঁহার উক্তি হাস্য স্থায়িভাব সত্ত্বগুণবর্জিত" একদেশদর্শিতার দোষদুষ্ট। হাস্যও অন্যরসের মতো অন্তর্ভুক্ত হইয়া রূপকে ঘটনা পরম্পরা, সংস্থান, যোগ্য চরিত্র চিত্রণ ও ভাষণ ভঙ্গীর বিদগ্ধতার ( pleasant and agreeable expression ) শেষোক্ত উপাদান মুখ্যত গাম্ভীর্য ও কৃত্রিমতাকে বর্জন করিয়া লোকস্বভাবসিদ্ধ (familiar) সাবলীলতাকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বাক্‌কেলি ছল প্রভৃতি মনোভাবস্থলে উপযুক্ত ভঙ্গীর মাধ্যমে হাস্যে প্রকাশ নিবন্ধকার যথাযোগ্যভাবে দেখাইয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ কেহ কেহ মনে করেন ভাষার চটুলতায় যে হাস্যরসের সৃষ্টির আয়োজন তাহা নিম্নস্তরের হাস্য। ইহার উত্তরে বক্তব্য সকল ভাষার সাহিত্যে এই উপাদানের চর্চা লক্ষণীয়—উদাহরণস্বরূপে শেক্সপীয়ারের হাস্যরসনিরূপণে এই উপকরণের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এমনকি তাহা নিম্নস্তরের গ্রাম্যতার উপরও ( valgarity ) নির্ভরশীল। সংস্কৃত ব্যঙ্গসাহিত্য চরিত্রচিত্রণের উৎকট অসঙ্গতি যে প্রকারভেদের যোজনা করে তাহা সর্বত্র জীবনের অনুগামী ও তাহাতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়।

হাস্যরসের ব্যাপ্তি ও আকর্ষণ সর্বত্র স্বীকৃত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আদর্শমূলক উদাত্ততার লক্ষ্যে জাগরূক হইলেও বস্তুতন্ত্র ও সহজাত সরসতাকে বর্জন করে নাই। প্রাচীন ঋষির আম্নাত

সংহিতায় তত্ত্বান্বেষী ব্রহ্মজ্ঞানীর উপনিষদ্ রহস্যে ঋষি বাল্মীকির অমরসূক্তিনিঃস্যন্দরূপী রামায়ণ এবং মহাভারত ও পুরাণে প্রধানত আখ্যানের চরিত্রউদ্ভাবনে এই সরস চটুলতাকে বিদ্যুৎদীপ্তিতে স্ফুরিত দেখি। দার্শনিক মনীষিগণের সূত্রে ও অনিখাদ গাম্ভীর্যের অচলায়তন আগন্তুক লৌকিক ন্যায়ের অবতারণায় ইহা উপভোগ্য হইয়াছে। চারুসাহিত্যের বিভিন্ন কলায় মহাকাব্য নাটক ও পোষাকী আড়ম্বরবলে গদ্যসাহিত্যেও ভাস কালিদাস শূদ্রক বাণভট্ট মাঘকবি ও নৈষধকাব্য ইহাদের সর্বত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত সহজহাস্যের অবতারণা সংস্কৃতানুরাগী পাঠক মাত্রেরই অবিদিত থাকিবার কথা নহে। এমনকি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও এই উপাদান তাহার একাধিক উপাখ্যানের দ্বারা রচনা সাধারণেরও অভিগম্য করিতে হইয়াছে। এমনকি তত্ত্ববাদী শঙ্করের ধর্মপ্রচারকের মহাপ্রভু চৈতন্যের চরিত্র চিত্রণের চেষ্টায় প্রয়াসী এই ধারা উপেক্ষিত হয় নাই। লেখকের নিবন্ধে ইহার আভাস অস্পষ্ট নহে।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের দৃষ্টিতে হাস্যরসের উপর এই আলোচনা বিদেশীয় মতবাদ ও গম্ভীর দার্শনিকতার সম্বন্ধে একাধিক প্রশ্ন ও সমস্যা এই গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। হাস্যরসের যে অভিমানরূপ মূর্তিতে প্রচার ( exploiltion ) কোহল প্রভৃতির উক্তিতে এমন কি উপরূপকেও যাহা আত্মমর্যাদায় প্রকট গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের কল্পিত ব্যবধানকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সাহিত্যে wit ও humourএর প্রকৃত বিকাশের অভাব সম্বন্ধে আধুনিক সুধিজনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া লেখক শুধু সৎসাহসেরই পরিচয় দেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সন্ধান ও আলোচনায় যে সাম্য তাহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রস প্রাচীন ভারতীয় মতে নিত্য হইলেও তাহার বিকাশ' এক হইতে অন্যের উৎপত্তি। সকল রস হাস্যের অন্তর্ভুক্তি হইতে পারে ( অভিনব গুপ্তের মন্তব্য ) হাস্যরসের অপব্যবহার, মঙ্গলপরিপন্থী বলিয়া হীনজনের অশ্লীল ভাষা ও উক্তির ব্যবহার ( ভরতের মন্তব্যানুযায়ী ) রোমাঞ্চের বিবর্তন, comedy of errors. জীবন-যাত্রাপযোগী আচারাদির সহিত পূর্ণমাত্রায় লোকসাহিত্যের সামঞ্জস্য, মধ্যযুগের ম্যানিয়র ফিল্ডিং, অ্যাডিসন সুইফ্ট্ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ডিকেন্স, থ্যাকারে, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি পাশ্চাত্য হাস্য রসস্রষ্টা মনীষীর প্রচারিত মত ও অনুসৃত পথের তত্ত্বানুসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় মতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এ বিষয়ে সুনিপুণ ধীশক্তির অপেক্ষা রাখে। তরুণ গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এ বিষয়ে তাঁহার পরিণত প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিলে বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

শি. প্র. ভ.

# দেখুন !

## আপনার বসবার জায়গা বেদখল করেছে কে?